

বঙ্গাধিপ-পরাজয় ।

(বঙ্গেশ-বিজয় ।)

“কথং কৃত্বা ককুৎসু যৎ তে অস্তি উকুবৎ
নবীয়েো জনয়স্ব বৈজ্ঞঃ ।———

কলিকাতা,

১৮৮২নং প্রবাসীচরণ দত্তের ট্রাষ্ট, বঙ্গবাসী ইলেকট্রো-মেসিন-প্রেসে,

ত্রিংশতবর্ষ চতুর্দশী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

মূল ১০১৫ নাল ।

মূল্য ১০/-

প্রকাশকের নিবেদন ।

৩২ আটত্রিশ বৎসর পূর্বে “বঙ্গাধিপ পরাজয়” প্রথম প্রকাশিত হয়।
ল ও পরবর্তী সময়ে এই গ্রন্থ ক্রিপা সমালুত হইয়াছিল, এবং আজও
সাহিত্য-সংসারে ক্রিপা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহা সকলেই
আছেন। মধ্যে “বঙ্গাধিপ পরাজয়” নিঃশেষ হইয়াছিল; অনেক
হচ্ছা সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ কিনিতে পান নাই। সংগ্রহিত গ্রন্থকারের সম্মতি-
রামরা ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। বঙ্গভাষায় এই অমূল্য
নিঃপ্রকাশিত হইল। একপে বয়ে বয়ে এই গ্রন্থ বিবাজ করুক,
আমাদের বাসনা! ইতি ৩১শে চৈত্র, ১৩১৪ সাল।

প্রকাশক ।

অপেক্ষনক

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

মান্যবর সমী

বিগত স্ত্রের পর্যালোচনায় যথেষ্ট সুখ সম্ভবে। 'ব'
নির্মল প্রেম পুনর্লাভের আর কণামাত্রও আশা করি
তচিন্তা অধুনা বর্তমান দুঃখের উপশম-কারণ হইয়
পরিবর্তিত হইয়াছে, ভবিষ্যত আমাকে দূরদেশে রাখিয়া
আপনার সঙ্গে পুনর্নির্ঘটন নিতান্ত অসম্ভব! তবে যদি র
দৈববশে শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারি, অবশ্যই আরও দর্শ
ইতোমধ্যে অবকাশ পাইয়া দেশের চিন্তা বলবতী হইল।
রম্য উপবন ও অতি নির্জন পত্রাচ্ছাদিত কণ্টকাকীর্ণ
স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল। মন ব্যাকুল হওয়ায় এই গ্রন্থখ
করিলাম। কোন মহান্নোকে নামের সহায়তা আবশ্য
আপনি বঙ্গভাষার প্রচারক, আমার আমার বাল্যকালে
বিশেষে ঐ রায়গড়ে রাতদিন একত্রে বলস্বভাব-সুলভ নির
করিয়া অতীব জীন্মের প্রথর সূর্য্যতাপ হইতে শ্রান্তি পাই
আনন্দ পাইয়াছি। এই গ্রন্থখানি আপন কে অর্পণ করিলাম

২রা আশ্বিন, }
সন ১২৭৫ }

গ্রন্থকার।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ।

(১৭৯১ শক)

বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের প্রথমখণ্ড জনসমাজে প্রচারিত হইল । এক্ষণে ইহা সাধারণ-সমীপে সম্যক সমাদৃত হউক, বা না হউক, প্রচারিত হইয়াছে । নিরীক্ষিতমিরমের পরতন্ত্র না হইয়া কেবল একমাত্র স্বভাবে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থটি রচিত হইল । অলকারের অনুরোধে স্বভাবে পত্রিত্যাগ করা হয় নাই । অনেকস্থলে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের মনোবৃত্তি স্পষ্ট বর্ণনা না করিয়া তাহাদিগের বাক্য ও আচার ব্যবহারে প্রকাশ করা হইয়াছে । স্পষ্ট বর্ণনার পাঠকবর্গের কল্পনা নিষেধ ও নিরস্ত থাকায় তাদৃশ আশ্রয় অসম্ভব, যদিচ গ্রন্থকারের পক্ষে সুলভ হয় বটে । গ্রন্থের আরম্ভ অবধি শেষ পর্যন্ত যেমত যেমত ঘটনা উদ্ভূত হইয়াছে, প্রোক্তপ্রতি ব্যক্তিগণের স্বভাব ও বাহার বৈকল্য অবস্থান্তরে রূপান্তর লভ্য, তাহাই প্রকটিত হইয়াছে । যত্নে গ্রন্থটি পাঠ করিলে প্রত্যেক শব্দ ব্যবহারের কারণ প্রতীয়মান হইবে । সামান্য ঘটনা কালে প্রভুল হয়, গ্রন্থটি আন্যোপাত্ত পড়িলে পাঠকবর্গে স্বীকার করিবেন । কোথাও কাহার অবস্থা, অস্বাভাবিক একটীমাত্র কথার কাহার কপোলযোগ বর্ণিত হইয়াছে ; কেহ বা থাকিয়া থাকিয়া অসংলগ্ন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়াছে । গ্রন্থের শেষপর্যন্ত পাঠে অবশ্যই সে সকল সামান্য বৃত্তি ও চিন্তা প্রকাশক অস্বভাবের অর্থ বুঝিতে পারিবেন । নায়কদিগের মনোবৃত্তি বর্ণনাই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য । বোধ করি, এ গ্রন্থে তাহার অভাব নাই । গ্রন্থে অনেকগুলি নায়ক নায়িকা বর্ণিত আছে । বোধ করি, কাহার স্বভাবের সহিত অগ্র কাহার স্বভাব মিলিবে না । সকলেই ভিন্ন ভিন্ন । একের কথা পড়িলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সেটি কোন্ ব্যক্তির উক্তি । বহু নায়ক নায়িকা থাকায় একের একবার উল্লেখের অনেক পরে আবার তাহার পুনরাবলম্বন হইয়াছে । সামান্য নিয়মপত্রতন্ত্র হইলে পাঠক জুলিয়া যান, অতি বিস্তারিত অধ্যায়ের মধ্যে তাহাকে যত্নমিত্তে আলোচ্য কর্তব্য হয়, কিন্তু এ গ্রন্থে তাহার অনুরোধ করা হয় নাই । স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহে যে যেমত লক্ষ্যগোচর হইয়াছে, তাহার তখনই উল্লেখ আছে ।

এ হর তাহার একটিও অশ্লীল কথা প্রয়োগ নাই । পবিত্র সংস্কৃত ভাষা লব্ধি অধিক ব্যবহার হইয়াছে ; কেবল যেখানে সামান্য বঙ্গালা কথা ব্যতীত প্রকৃতভাবে প্রকাশ করা হুঃসাধ্য, সেই ধানেই অপভ্রংশ লব্ধি নিযুক্ত হইয়াছে । অতি উচ্চ পবিত্র সংস্কৃত কথার বর্ণনা হইতে হইতে হয়ত কোথায় একটি সামান্য ইতর ভাষা

ব্যবহার হইয়াছে। পাঠক মহাশয় হঠাৎ দেখিলে মোক্ষ বলিবেন না, সে স্থলে সে ইতর কথাটি না দিলে সাধারণ বাঙ্গালীর মনের ভাব সেমত প্রকাশ পায় না।

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যদিচ সাধারণে তাহার সমভাব শব্দগুলিকে একপর্ষায় শব্দরূপে ব্যবহার করেন। যেমত হিন্দুকোষ, প্রগ্রীব, বরগু। যদিচ সামান্যত এক পর্ষায় শব্দ কিন্তু পরিভাষা শাস্ত্রে পরস্পরের ভেদ থাকিতে এ গ্রন্থে শব্দগুলি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যক্ত হইল। আবার কতকগুলি শব্দ পরিভাষা শাস্ত্রেও এক পর্ষায় বলিয়া গণ্য, কিন্তু এ গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিযুক্ত হইল, যেমত খলীন ও কবিকা পক্ষে অশ্বের মুখমণ্ডল বল্গা যোজনায় লৌহখণ্ড। কঠিন গ্রীব অশ্বের বেগ সংযমান্বয়ে যে লৌহখণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহার নাম খলীন, খলীনের উভয় পার্শ্ব হইতে লৌহ কীলদ্বয় বহির্গত হইয়া অপর লৌহখণ্ডে একত্রীকৃত ইহার অগভাগে বল্গার রশ্মিদ্বয় যোজিত হয়। ইহার সামান্য ইতর ভাষায় নাম দহানা। কবিকা একখান লৌহখণ্ড মাত্র। তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি লৌহবলয়। ইহাকে ইতর ভাষায় কজাই বলে।

স্বভাবত বাহাদিগের ধেরূপ বাক্য সম্ভব, তাহাদিগের মুখ হইতে সেইরূপই বাক্য নিঃসৃত হইতে দেওয়া গিয়াছে; কিন্তু একান্ত গ্রাম্য বিকৃতি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। জজ্ঞাধরের মুখে সকলেরই সম্পর্কে জ্ঞানানুচক জ্ঞানোদন আছে; কেবল যেস্থলে আত্মীয়তানুরোধে আদর সম্ভবে, সেইখানেই প্রিয় বাক্য যোজিত হইল। যে সভায় যে ব্যক্তির ধেরূপ মান্য, তাহার সম্পর্কে সেইরূপ মানের কথায় লিখিত থাকায় এক ব্যক্তিকে এক অধ্যায়ে, হয়ত এক অধ্যায়ের এক স্থলে “তিনি” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, আবার অপরাধায়ে, কি অপর স্থলে “সে” প্রয়োগ করা হইয়াছে। বর্ণ সংযোগের বিষয়ে একটি প্রশালী অবলম্বন করা গেল। য্যাকরণানুসারে যে সবল বর্ণের রেফ যোগে বিকলে দ্বিত্ব সম্পাদন হইয়া থাকে; অল্লাগাস সিদ্ধান্তরোধে দ্বিত্ব পরিত্যাগ করা হইল। যথা ব্যাকরণানুসারে “পূর্ক” ও “পূর্ব” উভয়ই সিদ্ধ, কিন্তু “পূর্ক”ই ব্যবহার হইয়াছে। অন্যান্য শব্দ বিষয়েও এইরূপ, কেবল যথা দ্বিত্ব হইয়া বর্ণের রূপান্তর হইয়াছে, তথায় দ্বিত্ব ব্যবহারই প্রসিদ্ধ বিবেচনায় তাহাই রাখা হইয়াছে। যথা “পার্প”।

কুটির অনুরোধে উপদেশ ভগ্ন সংক্ষেপ করা হয় নাই। স্বভাব বর্ণনে ও প্রচলিত রীতি বহির্ভূত ঘটনা প্রশালী স্বীকার করায় যোধ হয় গ্রন্থটি নিতান্ত দূষিত হয় নাই। অকারণ কোন বর্ণনা বা বাক্য প্রয়োগ হয় নাই, যত্নে পাঠ করিলে অবশ্য মর্ম্মজ্ঞ হইবেন। রানপ্রবণ পাঠকের পক্ষে দার্ষ ছন্দের নৈমগ্নিক ও প্রাকৃতিক বর্ণনা অসহ্য হইতে পারে; কিন্তু গ্রন্থখানি কোন বিশেষ শ্রেণী পাঠকের প্রীতিকর জন্য রচিত নহে। সাধারণ বাঙ্গালীর প্রিয় হইলেই ভ্রম সম্বল।

গ্রন্থের নাম “বঙ্গেশবিজয়” দিয়া মুদ্রাস্থনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন

তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে, উক্তাঙ্কি-
থের শ্রীমুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের রচিত একখানি গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য্য
বন্ধে ছাপা হইয়াছে, একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রীমুক্ত সিংহ মহোদয়ের ও
আমার মধ্যস্থ আজ্ঞায়ের অনুরোধে “বঙ্গেশবিজয়” নামের পরিবর্তে এই গ্রন্থের নাম
“বঙ্গাধিপ পরাজয়” দিলাম।

ইহাতে বঙ্গেশ বিজয় পর্য্যন্ত আছে। শিরঃপীড়ার ভয়ে মহারাধ প্রতাপাদিত্যের
ও সূর্য্যকুমার, মালিকরাজ, কচুরায় ও অন্যান্য সকলের উত্তরচরিত সংক্ষেপে শেষে
কপিপয় পংক্তিতে লিখিত হইল। অগ্গাশ ও উৎসাহ পাইলেই অপর এক খণ্ডে
তাহা সম্পূর্ণ করা যাইবেক।

রায়গড়ের ব্যাপার আশ্রয় করিয়া আদ্যোপান্ত প্রকটিত হইল। রায়গড়ের বর্ত-
মান অবস্থা দেখিলে এখন তালপুকুরের তালের জায় বোধ হয়। সে স্বচ্ছ অতি
পবিত্র প্রকাণ্ড দীর্ঘকার পরিবর্তে কেবল হোগল ও নলের বনমাত্র দেখা যায়। এখন
সেই হিন্দুমণ্ডীর আবাস নাই। এখন সেখানে বহু বরাহ ও সর্পের আবাস হইয়াছে।
ফলে সহরের এত নিকটে যে এত অগম্য বিজন বন আছে, ইহা চান্দ্রুষ না হইলে
কাহার বিশ্বাস হয় না। এরূপ মনোরম স্থানও আর কোত্রাপি দেখা যায় না। এত
অবর্ণনীয় শোভাচয়ের সমষ্টি আর কোথায় নাই। বনে উৎকৃষ্ট আম, জাম, গোলাব-
জাম, পেয়ারা, বেল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলও তরুচয় সদা যথা কালে সুকলে শোভিত।
ঝোপের মধ্যে দিব্য সিন্ধুতি গোলাব, জাতি যুবা, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প সমু-
হে গুচ্ছ। আহা সে অপরূপাশ্রয় তরুণ্যাদি আচ্ছাদিত, দিব্য পরিষ্কার স্থানে
বৈষ্ণব, জৈষ্ঠের প্রথর সূর্য্যোপাস হইতে বসিতে কি সুখকর! সত্য বলিতে কি,
যে সকল ফল ও ফুল বহু যত্নে উদ্যানে রোপিত হইয়াও যথেষ্ট প্রসূত হয় না, সে
রায়গড়ে অমত্রে আপনি জন্মিতেছে। এবং অদ্যাবধি সহরের অধিকাংশ পীচ, লিচু,
পেয়ারা আনারস, লকট, আম্র ইত্যাদি সুমিষ্ট ফল বেহালা হইতে আসিয়া থাকে।
আর ইহানগরের লোভে ই কত শত বানাজাতীয় পক্ষিচয় সে স্থান আশ্রয় করিয়াছে।
আহা যে ভোগ করিয়াছে সেই বোঝে। চারিদিকে অতি সুতান মিষ্ট স্বরে দয়াল,
পাপিয়া ও বেনেবট পক্ষির সিন ও গান। আহা কি চমৎকার! বসিবে বোধ হয়
যেন আমার জন্ম এ টি ড়াখানা শ্রুত হইয়াছে। এ দিক হইতে এক দল ছাতারে
কিচ্-কিচ্ করিয়া লেজ নাচাইয়া থপ্-থপ্ করিয়া একটি বিশাল, অতি পুরাতন,
আম্র বৃক্ষের তলা হইতে একটি কামফল নামে বন, অন্ধকার ছায়ায় গেল। অদূরে
রায়গড়ে দাবির কুলের রিক্ত কোপে বসিয়া ভায়বৎ কুণ্ডো পাকি কুব্-কুব্ করিতেছে।
দূরে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের ডালে অদৃশ্য হইয়া বসন্তবউর অধিশ্রমে এক ডাকে

বন বন প্রতিধ্বনিত পান পাইতেছে। আহা! ক মনোরম! ঐ দেখ একটি বুল-
 বুল পিক্‌ডু কর কর করিয়া উড়িয়া গেল। ঐ ডালের ছায়ার বসিতা দুইটি শুষ্ক
 ভাঙিতেছে। তরানক উত্তাপে নৃধ্যদেব প্রথর রশ্মি নিক্ষেপিতেছেন। নীরবে সমু-
 খের ভোবার পানার উপর ঝঞ্জন নৃত্য করিয়া কীটাহার করিতেছে। রবিতাপে তপ্ত
 একটি নেকড়ে বাঘ রায়দীঘির দক্ষিণ কূলে অতি অঙ্গে অঙ্গে আসিতেছে। গ্রীষ্মের
 তাপে তাহার জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। বন বন হুলিতেছে। বিন্দু বিন্দু
 ঝর ঝর ডুবাইয়া ঝড় হেঁট করিয়া চক্ চক্ করিয়া উন্নয় পুরিয়া জল খাইল।
 ওতীরে একদল বরাহ, শাবক শাবকী সঙ্গে লইয়া জল খাইল। পরে তাহারা পকে
 আপলানিগের শরীর ভিড়াইয়া চলিয়া গেল। ভোবার ধারের গর্ভ হইতে একটি
 গোখা মতর্কে চারিদিকে দেখিয়া অঙ্গে অঙ্গে জলে ডুবিল। ক্রমে নৃধ্যের তাপ বৃদ্ধি
 পাইল। ক্রমে বন প্রাণিশৃঙ্খল হইল।

রায়গড়।

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা ।

(১৮০১ শক)

‘বঙ্গাধিপ পরাজয়ের’ দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হওয়ার গ্রন্থকার ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন—প্রথমখণ্ডে সমুচিত সমাদর ও উৎসাহ পাইলেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারের আভিষেক ছিল, সমুচিত সমাদর হইয়াছে কি না পাঠকেরা তাহা অবগত আছেন। শাস্ত্রে বলে, “বরনেকাজতিঃকালে লাকালে লক্ষকোটঃ,” কিন্তু নব্য দার্শনিকেরা বলেন, এককালে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া প্রায়স্বর।

যখন প্রথম খণ্ড প্রচারিত হয় সেই সময়েই অবশিষ্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যহেতু তৎকালে কেবল প্রথম খণ্ডমাত্র মুদ্রিত করিয়া নিরন্তর থাকিতে হইয়াছিল। পরে সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে পাণ্ডুলিপিখানি হস্তান্তর হয়। যদিচ জনৈক আত্মীয় বিশেষ যত্নে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু অগত্যা পুরাতন পাণ্ডুলিপির অভাবে নতুন পাণ্ডুলিপি প্রকটন করিতে বাধ্য হওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের পর অন্যান্য দ্বাদশবার সূর্য্যদেব রাশিচক্র ভোগ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকহস্তও স্মৃতিপথ অতিক্রম করিয়াছে, সুতরাং গ্রন্থকারকে প্রথমখণ্ড আদ্যন্ত পাঠ করিতে হইল।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইবার পর কয়েকজন কৃতবিদ্য কায়স্থ কুলভিলক মহাশয়েরা পুস্তকস্থ প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়া গ্রন্থকারকে দৃষ্টি-হিলেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রতাপাদিত্যের চরিত্র প্রকৃত এত কলুষিত ছিল না; গ্রন্থকার অত্যাচার করিয়া প্রতাপাদিত্যকে কদম্বাবর্ণে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কলিকাতা রিভিউ লেখক বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের সমালোচনায় অপরাপর দোষসহজের মধ্যে বলেন যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গের একজন সামান্য জমিদার ছিলেন, তাঁহাকে দ্বিতীয় সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করা ইয়া উচ্চপদ দেওয়া অত্যাচার হইয়াছে ও ইতি-হাসের বিপরীত বর্ণন হইয়াছে।

গ্রন্থের আদিতে “অত্মাপ্যাদাহরন্তোমমিতিহাসং পুরাতনং” বলিয়া গ্রন্থহুচনা করার, উল্লিখিত দোষারোপের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু গ্রন্থকার যত্নেই এমনতর সন্দেহ যে, “সাক্ষাই” সাক্ষ্য দিতে তাহারা অপারগ—এজ্ঞ গ্রন্থের শেষে নোর্থে’র ছলে কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তক ২২০০ কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা গেল। ইংরাজীবিৎ পণ্ডিতেরা নায়িকা বর্ণন অস্বীকার বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, আবার প্রেম কাহাকে বলে, বঙ্গের লোকেরা অবগত নহে বলিয়া—সম্রা

স্বাক্ষরকারের ব্যবহার নিত্য অনৈসর্গিক বলিয়াছেন। প্রেম বিষয়ের বিচারের মধ্যস্থ—সহনয় বঙ্গবাসিগণ আর নায়কনারিকারূপ বর্ণনের অশ্লীলবিষয়ক নজর—সংস্কৃত কাব্যমাত্রেরই, তবে অতীব বিস্ময়জনকরূপ ইংরাজীবিৎ নব্যসম্প্রদায় বিজাতীয় চসমায় সকল বিষয় দৃষ্টি করিলে হতভাগ্য ভারতবাসিদিগের আর পরিত্রাণ নাই, শিবপূজা, জগদ্ধাতৃদেবের মন্দির, দশম সংস্কারের কয়েকটি সংস্কার বিজয়াকৃত্যাদি ভাগ্য করিতে হয় ও বঙ্গগ্রন্থকারদিগের সর্বনাশ বলিতে হইবে। বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের বিষয়—বান্ধালী, গ্রন্থকর্ত্তা—বান্ধালী, অতএব ভাব প্রণালী সমস্তই বান্ধালী, তাহাতে ভালই হউক, আর মন্দই হউক বান্ধালীর চক্ষে প্রিয় হওয়া উচিত। বিজাতীয় ভাবের বঙ্গাকরে বর্ণন, বিজাতীয় প্রণালী বঙ্গশব্দে লিপিকরণ, বিজাতীয় বস্তু বঙ্গ-ভাষায় বিজ্ঞান, অনুবাদে যতদূর মঙ্গলকর তাহাই হয় কিন্তু তদুদারা স্বজাতীয় ভাষার স্বতন্ত্রতায় লোপ পায়। আমরা এমনই মুগ্ধ যে যখন সভ্য ইউরোপ ও সভ্যতম আমেরিকা ভারতীয় কাব্য, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় সৌন্দর্য, ভারতীয় অলঙ্কার, ভাব ও প্রণালীর উৎকর্ষ প্রশংসা করিয়া গ্রহণ করিতেছে ও এমত কি দেশ-বিদেশের বিশ্বপ্রদর্শনীতে কাশ্মীরশাল, ঢাকার মসনব, ঝারপসী জড়ী, মুর্শিদাবাদের গভদন্ত দ্রব্য, বিদ্যারী পাত্রাদিতে ইউরোপীয় অলঙ্কার ও প্রণালী থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করে, তখন আমরা আমাদের নব্য বান্ধালাকাব্য কেবল ইংরাজী আশ্রয়ে বঙ্গাকরে বিজ্ঞান করিয়া দেশের লোকের প্ররুতি পরিবর্তন করিতে চেষ্টা পাই তাহায় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থগুলি গ্রামকূটের রুচিদায়ক হইয়া সুপণ্য হয়।

যাহারা বঙ্গাধিপ-পরাজয়োল্লিখিত ঘটনা অমূলক বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তোষের জন্য ও প্রত্নবিদ্যানুরাগী পাঠকবর্গের ওপরেচ্ছায় ‘ঐতিহাস-বংশাবলি’ নামক পুরাতন মূলসংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বঙ্গাদি বিষয়ক কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অপিচ কয়েকখানি পুরাতন হস্তাপ্য পুস্তক ও এসিয়াটিক সোসাইটির জরনাল হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে আপাততঃ প্রত্নবিদ্যানুরাগিগণমধ্যে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবনবৃত্তান্ত কতক হৃদ্বোধ হইবেক। ইতিহাসটি নিত্য অমূলক নহে,—রায়গড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ অংশের প্রায় ২০ বৎসর পূর্বের ‘ফটোগ্রাফ’ হইতে কয়েকখানি চিত্র দেওয়া গেল। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত ফরাদপুর হইতে আনীত একটি লৌহপিঞ্জরের প্রতিক্রপও দেওয়া গেল। আদর্শের একটি হাত অভাব ছিল বলিয়া চিত্রেও সেইরূপ অঙ্গহীন পিঞ্জর অঙ্কিত হইল। আইন আকবরী গ্রন্থ হইতে দিল্লীর কয়েকটি রাজলিঙ্গ যথা ধ্বজ, পঞ্জা, অশ্বাদান জালিকাকুক প্রভৃতি চিত্র দিয়া বর্ণনার ‘খাম’ পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রচনায় অসম্ভব পাঠকগণ চিত্র দেখিয়া প্রীতিলভ করুন। গ্রন্থে নৈসর্গিক বিষয় যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে ও যে সকল

আপাততঃ দৃষ্টিবিরুদ্ধ প্রথা বর্ণিত আছে, তাহা সমস্তই সমূলক, প্রমাণ প্রয়োগ দিবার এস্থান নহে।

পূর্ব প্রতিজ্ঞামতে সংস্কৃত ও অত্র পারিভাষিক শব্দ যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার নিষেদ শেষে দেওয়া গেল—সময় মত প্রয়োজনে আসিতে পারে।

বৃত্তান্তমূল, মানচিত্র, চিত্র ও নিষেদ দিয়াও যদ্যপি পাঠকের মন না পাই তবে নিঃশব্দ হওয়া বিবেচনায় স্থিতি বলিয়া নীরব হইলাম। ইতি।

রায়গড়

শক ১৮০৬

}

প্রস্তুতকার ।

বঙ্গাধিপ-পরাজয়

বঙ্গেশ-নিজস্ব ।

প্রথম অধ্যায় ।

“কালঃ স্মরতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ ।”

সহরের অনতিদূরে দক্ষিণ অকলে কতকগুলি গ্রামের নাম বেহালা । খিদিরপুর পোল হ'তে তিনটি প্রশস্ত রাজমার্গ তিন দিকে প্রবাহিত হয়েছে । পশ্চিমস্থ পথে মুচিখোলা প্রভৃতি কাটিগজার তীরস্থ নির্জন স্মৃতিস্মরণোত্তিত উৎসবোৎসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি আছে ; এক্ষণে লক্ষ্মী রাত্র্যের সিংহাসনচ্যুত নবাব ঐ দিকে বাস করেন ও তাঁহার বহুল কর্মচারিগণ ঐ দিক্ অধিকার করেছে । পূর্বাধিকার রাস্তায় লোকসমাগম অধিক ও খিদিরপুরের প্রকৃত বাজারই এই দিকে । গঙ্গা সন্নিবিষ্টায় নৌ ঘানে বানিজ্য দ্রব্যাদি সমাগম স্রুগতাবশত বা নিকটস্থ চর্চের কার্খচারিগণের অসুখ্য অসুখ্য-ফণ্ডের ব্যয়ে নতুন ঢাক খিলান করা দোকান বর ধাকা অনুবোধেই বা, যে কারনেই হউক, এই দিকেই খিদিরপুরের বাজারের জাঁক বড় । বোধ হয় পূর্ন কারনেই বাজার উন্নতির মূল । কেননা বহুকালাবধি এই দিকের বাজার বড় গুলজার ও কলিকাতার দক্ষিণ অকলের ব্যবসায়ের স্বায়ত্বরূপ । রাস্তার দুই ধারে সন্দেশ, মিঠাই, ফলকরা-দিগর, বেণেমসলা ও ডাল-কড়াইয়ের ডাল ভাল দোকান । বিপণিমালা রাস্তার পশ্চিম পাশে প্রায় গির্জার দক্ষিণ পর্ধান্ত গিয়েছে । সহরের দোকানর সঙ্গে এ সকল দোকানের তুলনা হয় না । ফোর্ট উইলিয়মের এমনি আশ্রয় ইন্দ্রজাল যে, ইহার এলেকা পার হলোই এককালে সহরে ঢেকুনাই লোপ পায়, ও তার পরিবর্তে গ্রাম্য খেলো রকম দেখা দেয় । মিঠাইয়ের দোকান আছে, কিন্তু জিলেবির বাড়ি মোটা ও কাল ; মতিচূর কোয় দেখা যায় না ; পেলাও অনেক, এক একটা দানা প্রায় কেতুরের মত মোটা ;

লক্ষেশ ময়লা, চিনিভাৰা ও ফাটা; কচুৰি ভেলে ভাজা; গজাই প্ৰায় সকল দোকানের মান রাখিবার এক মাত্র অবলম্বন। নিকটে নদী থাকতে ডাল বড়াইয়ের দোকান অধিক ও যশোরের আমদানি, মুকে ফেকো পড়া, নেনো দোকানদারই প্ৰচুর। কাঠের হাতা, দড়ি, সাবান ও লক্ষা পণ্যদ্রব্য। পেরুজ ও লক্ষার চান্দারি প্ৰধান পুঞ্জ। সহর পায় হলেই কিছু ফড়ের দোকান জঁকালো হয় না। বরং অধিক স্থলে আদৌ নাই। কিন্তু বিদ্যাপুরের বাজারকে সে মাছ দিতে হবে; কেন না এখন রাস্তার পশ্চিমদিকে দুখানা ফলের দোকান হয়েছে। দুকাঁদি শুকনো ঠাটে কঁটালি কলা খুন্টে, রাশটাক শুকনো পানফল ও কংবেলই অনেক। তিন খানা মহিয়ারির দোকানে মালা, ঘুনসি, আরসি ও চিকুপি সমস্ত থাকে থাকে সাজান আছে; এ সমস্তায় গুলিস্ত, পয়সায় পচিশটে ঝুঁচ, সেফ্টি ম্যাচের হলদে টিকিট মাঝা বাহু ও দেখা দিচ্ছে। রাস্তার পূৰ্ব্বদিকে একটা ঘরের বকে গোটা তিনেক গ্লাসকেশের ভিতল বড় বড় কাঁদালা শিশি, একটা সাদা গোল খল ও একটা নিক্তি ডিনপেন্সরির আনবাব। দুই শিশি কুইনাইন্, এক শিশি সোডা, সেস দুই ম্যাগনিমিয়ম ও জ্বল বেকনের আলম্বিকে চোয়ান গন্ধকের আরক বা মহাদ্রাবক জরদারদে বাহার দিচ্ছে। মাঝখানে মজগজে তেপাইয়ের উপর একটা ময়লা মড়ার মাতা, ডাক্তারখানার কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক প্ৰাবণের (১) দীপ্তিমান সাক্ষী। দরজার উপরে কাল তক্তায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা “দি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল হল” ও নিচে ছোট হরফে “হোলমেল অ্যাণ্ড হিটেল মেডিসিন্সেলর”টীও লিখতে ভোলেন নাই। ফলে সহরের দক্ষিণ অঞ্চলের অগ্রাভ্য বাজার অপেক্ষা “মাজুকলাই” বাজার অধিক চায়েন। বাজার পায় হয়ে দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল দুমার গাছ দেখা যায়। রাস্তাটা ফোশখানেক এগি সরল যে, ঠিক বোধ হয় যেন রাস্তা ত্ৰমে সরু হয়ে অবশেষে একটা মাত্র গাছে বন্ধ হয়েছে; দূরের গাছগুলি পৰ্যায়পরাম্পরায় ছোট হয়ে অবশেষে যান একটা বোপমাত্র। বাজারের পরই রাস্তার দৌড় প্ৰায় উত্তর দক্ষিণ। রাস্তার পূৰ্ব্বদিকে লম্বা একটা প্রকাণ্ড পণ্ডার “অরফান্-গল্লের” দক্ষিণ হাতে সুরু হয়ে বরাবর রাস্তাঘরে চলেছে। রাস্তাটা কোন গ্রাম ভেদ করে যায় নাই। দুই ধারেই পতিত বাগান কেবল “অরফান্ গল্লের” নিকট গোটাকতক হালি কুঠি দেখতে পাওয়া যায়। দুধায় দেখিলেই এককালে বেশ বিশ্বাস হয় যে, পূৰ্বে এ সকল বাগান ছিল; কিন্তু সময়ে ও অবস্থে উপবনমাত্র হয়েছে। বড় বড় আমগাছ ও মাঝে মাঝে এক অধ বড় কলাই অণ্ডলাত। কখন কখন তেঁতুল, তাল ও খেজুর দেখা যায়। কিছু দূরে পর বড় বড় বাঁশবন। আধুনিক শান্তি রক্ষকদিগের আশ্বাস উপহাস করে, স্থানে স্থানে এক একটা

বাঁশ রাস্তা ঘুড়ে পড়ে আছে, অন্ধকারে বোধ হয় যেন শাকচূর্ণীতে গোড়া চেপে ধরে, অসাবধান পথিকের নষ্টের জন্য ফাঁদ পেতে, বসে আছে। এই রাস্তার পর কতক দূর গেলেই হুর্গাপুর। হুর্গাপুরের বড় সাঁকোর পাশে দেওয়ান মানিকচাঁদের চারিদিকে পড়কাটা প্রকাণ্ড বাগান। এখনও তার কালচর্কিত ফাটকের একটা শুষ্ক দেখিলেই বোধ হয়, পূর্বে ইহা কোন আমীরের বাসস্থান ছিল। রাস্তার উপরেই ফাটক, ফাটকের দুই পার্শ্বে রাস্তার ধারে অতি প্রশস্ত গড়খান। ফাটকের মধ্যে প্রবেশ করিলে এক বিস্তৃত পুকুর দেখা যায়, তাহার ষাট ও বসিবার চাতালের আদল দেখিলে বোধ হয়, বড় সামান্য লোকের ব্যয়ে প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে কোন মরিকের মা হয়ে গৌড়াগাড় পেয়েছেন। ঐ বাগান উইনে রেখে রাস্তা বরে কিছু দূর গেলেই বাজার বেহালা। বাজার-বেহালার পূর্বে তাম্লেত-বেহালা। এইখান হতেই বেহালা আরম্ভ হল। রাস্তা বাজার-বেহালার মধ্য দিয়া তাম্লেত-বেহালা বামে রেখে উত্তর-বেহালা দিগে গঙ্গারামপুরের মাঠে গিয়ে পড়লো। মাঠ পার হলেই বড়সে-বেহালা। বড়সে-বেহালার পর এই রাস্তা কাওরা-পুতুর হয়ে বরাবর দক্ষিণবাহী হয়ে চলেছে, অবশেষে কলাগেছে গিয়ে থেমেছে। কাওরা-পুতুরের উত্তর-পূর্বে চড়েলের খাল ও পোল। চড়েলের খাল কাটিগঙ্গা থেকে সুরু হয়ে পূর্ববাহিনী হয়েছে। ক্রমে দক্ষিণ বেহালার মাঠ দিগে একেবেঁকে বাষপোতার পাশ দিয়ে কাওরাপুতুরে গে মিলেছে। গঙ্গারাম-পুরের মাঠের পশ্চিমেই রাস্তার পূর্ব ও পশ্চিমবাহিনী দুই শাখা বেরিয়েছে। পূর্ব শাখা দিগে গঙ্গার চিরস্রবীণ (সরস্বতার স্রোতের স্থাপিত ও নিশ্চিত) করুণাময়ীর ষাটে ষাওয়া যায়। পশ্চিমের রাস্তা সঠিক বরাবর সরস্বতা-বেহালার উত্তর দিগে চটামহেশ-তলা ভেদ করে বজবজের পাশে কাটিগঙ্গার তীরে গেছে। এই শাখাটিকে এক্ষণে বজ-বজের বাঁধা রাস্তা বলে। ইহা কিছু দূর বাগানবেড় ভেদ করে মাঠে পড়বার পূর্বেই দক্ষিণে এক শাখা দিগেছে; কালেক্টরের ম্যাপে এইটিকে সরস্বতার, সীতারাম স্রোতের রাস্তা বলে লেখে। বজবজের রাস্তার ধারে মাঠে পড়বার অতি অল্প পূর্বে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। ইহার উপর এখন ন্যূনসংখ্যা চার হাত লম্বা হয়েছে ও দীর্ঘ উপরে শর, মল ও হোগলাবন বসেছে; লম্বা এত বন যে, গ্রামস্থ লোকেরা তার উপর দিগে অগ্রেণে চলে যায় ও লম্বা হ হোগলা ও নলশূণ্ড শাখালীজ (১) স্থানে গিয়ে বন্যবরাহ শিকারার্থে বসে থাকে। এই দীর্ঘের জলকর প্রায় ষাট বিঘা। এই দীর্ঘিকাটি সরস্বতার উত্তরাংশে, ইহার উত্তর পার্শ্বেই এক্ষণে দিবা রাস্তা আছে ও ইহার নিজ দক্ষিণ ধারে সরস্বতার স্রোতের পেছক ভদ্রাসন। এই দীর্ঘিকার নাম রায়দীঘ।

সময়ে সকল পরিবর্ত্ত হয় ; কালের কয়ালকবলে কঠিন পাথরও পারি পায় না, অস্ত্রের কথা কি ? কুঠারাত্তে কাতও বিন্দুপাতে কালসহকারে ক্ষয় পায়। কালে তরুতরু ধ্বংস হয়ে হিন্দুরাজও লয় পেয়েছে। কালে সমুদ্র শুষ্ক হয়, বীপ জমে ও হয় “বিউনল আইরসের” মত অত্যাচ শিখর প্রসব করে। মন্দরনিরির গগনস্পৃক শূন্য আজিও সাগর নর্ভোদ্ধৃত বলিয়া শুষ্কসমুদ্র চিত্তবিরূপ শিরে ধারণ করিতেছে। নববীপ অনেকপথগায় অচিরস্থায়ী প্রবাহের প্রমাণ। সত্যযুগের পরিত্যক্তা হয় ও এক্ষণে কোন গভীরাজির অভ্যন্তরে প্রবালচরের আশ্রয় হয়েছে এবং কালবশে, কে বলিতে পারে, লক্ষ বীপের এক জন গণ্য না হইবে। প্রাক্তনবন (১) এক্ষণে ভূমি জরায়ুবদ্ধ কয়লারূপে পরিণত হইয়া আধুনিক ভরুগুণকে ভ্রমণে বসের স্থান নিয়াছে। কলনা বলিতে সাহস করে না কে, প্রাচীরের সাঙলা পূর্বের ভরুসিংহের শেষ বংশাকুর। অদৃষ্টদেবীও এমনি খামখেয়ালী যে, অন্য বাহাকে অনুগ্রহ করে জগন্নাথ ও গণ্য করিলেন, হয় ত কাল তাহাকে সন্ন্যাসপের অপেক্ষা অধম করিবেন। তাঁহার সপত্নী লক্ষ্মীদেবীও সেইরূপ চকলা। পরন্তু এই চকলাতাই যেম প্রস্তার চরাচর ব্যাপ্তির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বিধির দৃঢ় নিয়ম পালন করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডে শক্তি কি সুপরিমিত। একের ঋদ্ধি, অস্ত্রের বা ইতরচরের ক্ষয়মুদ্রক। যখন সকলের এককালে উন্নতি অসম্ভব, অথচ সকলকে সমভাবে ভোগী করিতে হইবে, তখন পর্যায়ক্রমে উন্নত না করিলে, উদ্বেগ সাধনের আর কি উপায়। চন্দ্র ও সূর্যকে (সাধারণ পদার্থব্যয়) রশ্মিরাশি বিতরণে ও সূর্যকিরণ কর্ত্ত করিতে বাধ্য থাকায় প্রত্যাহই পৃথীকে ভ্রমণ করিতে হইতেছে।

তিনশত বৎসর পূর্বে সরস্বতীর আর এক অবস্থা ছিল। কাটাগঙ্গার তীর হতে আরম্ভ হয়ে টালিগঞ্জের আদিগঙ্গার কূলে কলপাময়ীর বাটের নিকট পর্য্যন্ত যে বাঁধা রাস্তা পুরাতন লোকেরা তাহাকে হারির-জাঙ্গাল বলে জানে। পূর্বকালে বর্ত্তমান রাজার এই অঞ্চলে রাজধানী ছিল। দেওয়ান মানিকচাঁদের বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে লক্ষ্মণপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে অন্যান্যদি জনপ্রবাস, পুরাতন প্রাচীরের অবশিষ্ট, নষ্টমঠের ভূপ, চটানবিলের ভাঙ্গা বাটকে রাজকীর্ত্তির সাক্ষীরূপে জ্ঞান করে। রাজার-দীঘি রাণীরদীঘি আজও কত শত শুকতালু পথিককে বৈশাখের প্রথর সূর্য্যতাপ হতে রক্ষা করে। লক্ষ্মণপুরে রাজার ছাউনি ছিল ও তখনকার বাইমহল এক্ষণে বেহালা নামে খ্যাত। বৈষ্ণে-বেহালা রাজার খাসমহল ও দক্ষিণ বেহালাই বেড়াপলী। রাজার সন্তানরহিতা এক বৃদ্ধা হারি নামে মহিলা ছিল, সে বৃত্তকালে রাজমহলের লবাকে বহু ধন দিয়া দায় এবং দেশোন্নতি আশয়ে কোন কীর্ত্তি স্থাপন

করিতে অসুযোগ করে। তাহার ব্যয়ে নবাবের কর্তৃত্বাধীন সাহায্যে দক্ষিণরাজ্যে স্থানে স্থানে জাঙ্গাল নির্মিত হয়। আজও সুন্দরবনের অগম্য প্রদেশে মেরুপৃষ্ঠের মত উচ্চ জাঙ্গাল দেখা যায়। জনশ্রুতি এই যে, ঐ সকল জাঙ্গাল দ্বারির ব্যয়ে নির্মিত।

“দ্বারির জাঙ্গাল” প্রাচ্যে প্রায় ত্রিশ হাত। ইহার দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড পন্যার ছিল। জাঙ্গালের তল প্রায় এক বিঘা চৌড়া। জাঙ্গাল উর্দ্ধে প্রায় কুড়ি হাত। জাঙ্গালের গড়ের ধারে কেবল বাবলা গাছই অধিক। স্থানে স্থানে পলাশ, অশ্বথ ও বট। জাঙ্গালের সুইধারেই জলা। জলার মাঝে মাঝে এক এক দ্বীপের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামগুলি জলা হতে প্রায় চার হাত উচ্চ। দূর হতে ঠিক যেন কোণের মত বোধ হয়। গ্রামের চতুর্দিকে বাবলা ও পালতেমাদারের বন; মাঝে মাঝে এক একটা তাল বা নারকেল গাছ যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ঘৌঁকি দিতে ও বৃহৎ বৃহৎ বায়ুর হিম্মলে হাত নেড়ে শ্রান্ত পথিককে আহ্বান কচে, কোথাও বা বীশের বেড়ায় পাশ থেকে বড় খেজুর গাছ বালুদা মেড়ে ছুঁইবুজি লম্বাকে শাসাতে ও গ্রামের নিকট হতে নিষেধ কচে। জাঙ্গাল সরসুনা বাসুদেবপুরের মধ্য দিয়া গেছে। সরসুন্যার এলাকা পার হলেই প্রায় দুই কোশ ক্রমাগত জলা দেখা যায়, ইহার মধ্যে জাঙ্গালের নিকট আর কোম বসতি নাই। রামনারায়ণ সরসুন্যার উত্তর পূর্বে কোণে। রামনারায়ণ একখানি প্রকাণ্ড গ্রাম, ইহার উত্তর দিকে দ্বারির জাঙ্গাল, পশ্চিমে সরসুনা, পূর্বে গঙ্গারামপুরের মাঠ ও দক্ষিণ বেহাগার খাস মহলের জঙ্গল, সীতারাম ঘোষের রাস্তা দক্ষিণ সীমা। রামনারায়ণে প্রায় দুই শত ঘর বসতি; ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, কলিয়ার ও কায়স্থ অধিক। সরসুন্যার ইত্তর আতি, বাগনি, কাঁড়রা ও মুচিই অনেক। সরসুন্যার প্রধান ধনী হুর্ভাগাবশত একজন চাঁড়াল, তাহার নাম ঈগ্রসেন। রামনারায়ণ ও সরসুন্যার নিজ উত্তর জাঙ্গাল পারে বাহুলেশপুর পড়ই।

বেলা প্রায় চারি দণ্ড আছে। মাঝরাস, মাঠের জল শুকিয়েছে। কিন্তু জাঙ্গালের উত্তরধানের গভীরতাবশত ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি যেতে পারে এমন জল আছে। জাঙ্গালের দক্ষিণের খাদ শুক ও জলহীন। একে সীতকাল, তাতে আবার অপরাহ্ন, দিবাকর শ্রান্ত হয়ে ‘যেন বেগার সাধিতে জিলে রকমে দাঁড়িয়ে চৌকীদারের মত আধ চোক বুড়িয়ে চুলছেন। সূর্যমণ্ডল প্রায় রাস্তা হয়েছিল। পাখীগুলো সমুখ রাত্রি ভেবে সবলে আধার মুখে লয়ে বাসার দিকে উড়ছে, ভাবছে হয় ত আজকের মত এই শেষ। গ্রামের ঘুমসকল উঠেছে, কিন্তু হিমের ভয়ে একখানি পাতলা মেঘের মত দুর্লভ তাল-গাছের পাতা আগ্রহ করে, অশ্বথ গাছের ডালে ঝুলছে। একটু একটু দক্ষিণেবাওয়া! দিতে। বহুকালের পর আগমন করেছে বলে পাখীগুলো এক একবার কপছে লম্বা দিতে। বহুকালের পর আগমন করেছে বলে পাখীগুলো এক একবার কপছে লম্বা দিতে। বহুকালের পর আগমন করেছে বলে পাখীগুলো এক একবার কপছে লম্বা দিতে।

পাড় দেখা যায়। পাড়ের উপর বড় বড় ভালগাছ। দক্ষিণদিকের পাড়ের ধারে একটা পুন্ড্রাতন কুলগাছ হেলে রয়েছে। সেই কুলগাছ আশ্রয় করে একজন আধবুড় লোক পা ছুটি লম্বা করে হাতের নীচে একগাছি লাঠি রেখে বিশ্রাম করছে। তাহার মাথায় একখানা ময়লা কাপড় জড়ান। পরিধান বসনও ময়লা ও অলপ পরিসর, জাহ্নবীর অর্ধেকের উপর উঠেছে; তাহার শরীরের গঠন কিন্তু বড় হীনবলের মত নয়। চুপ থেকে বোধ হয় অত্যন্ত পরিশ্রমী একটা চাসা জোন। তাহার বাম দিকে প্রায় এক হাত লম্বা একগাছা উলুর বেওয়ানা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু হুম উঠছে বলেই বোধ হচ্ছে সেটা আশুপ রক্ষার জন্য। তাহারই নিকটে একটা ভাল পাতার খুন্সি। ইহার ঢাকা খোলা আছে বলেই তাহার ভিতরস্থ পানের বিড়, চুণের ও তামাকের কোঁটা ও একটা কন্ডে দেখা যাচ্ছে। মাঠে গরুগুলি চরছিল বেলা অবসান হয়েছে দেখে ক্রমে সেই পুকুরের পাড়ের চারিদিকে এসে জমতে লাগলো ও অল্পে এক আধ খাবলা শুকনো নাড়া খেতে লাগলো। চাসাটি ষাড় তুলে কত বেলা আছে দেখবার উপক্রম করে অমনি পুকুরের পশ্চিম পাড়ের আড়াল থেকে একজন লোককে বেরিয়ে দক্ষিণ পূর্বমুখে যেতে দেখিল; দেখেই বলে মশাই! অবধান; সাইমুখে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? পাছটি আস্তে আস্তে মুখ তুলে দেখলেন এবং কোন উত্তর না দিয়ে পুকুরিয়ার পাড়ের উপর উঠে বসেন। নদীরাম! তুমি যে এখন মাঠে আছ? পাল দিয়ে গ্রামে যাবে না?

নদীরাম বলিল। “মশাই! এই যাব বলে উঠেছিলাম, আপনাকে দেখতে পেলাম তামাক ইচ্ছে করবেন? বলেই কন্ডে করে তামাক লেজে উলুর বেনাটা মেড়ে কন্ডে-চার উপর কিছু ভেঙ্গে দিয়ে কন্ডেটা সমস্ত “মশাই নিন” তার হাতে দিল। মশাই। “না তুমি আগে টান।” নদীরাম বলিল “হাঁ তা কি হয়” বলতে না বলতেই মশাই কন্ডে দিয়ে টানতে টানতে বললেন। “নদীরাম! তুমি বড় তামাক প্রিয়।”

মশাইটি গ্রামের গুরুমহাশয়। রামনারায়ণে তাহার পাঠশালা। নিকটস্থ কয়েক খানা গ্রামের বালকবৃন্দ তাহারই পাঠশালার শিক্ষা পায়, রামনারায়ণের রাজা বসন্তরায়ের বৃত্তিভোগী পাল পার্শ্বের রাজবাটিতে সিদে পেয়ে থাকেন ও মাঝে মাঝে তোলে নিমন্ত্রণও হয়। মশাই প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর মানবশরীর ধারণ করেছেন; শরীর বেশ বাঁধা আছে; কপালের সামনেটায় টাক পড়েছে। মশাই জাতিতে ব্রাহ্মণ কুন্সী উপাধি। তাঁহার নাম বলত, ঠোঁট দুটি মোটা, নাকটা কিছু চাপা, দাড়িটি সরু, শরীর মোহারা, মশায়ের ভাতশালা নামক নিকটস্থ গ্রামে জন্ম, কিন্তু বাল্যকালাবধি রাজপ্রতিপালিত বশত গ্রাম-নারায়ণে বাড়ী ঘর দোর করেছেন। মশায়ের বাল্যকালে বিবাহ হয়েছিল; কিন্তু ঐবাহের অর্ধদিন পরেই গৃহশূন্য হয়েছে; সুতরাং মশায়ের সংসার চিড়ায় লেশমাত্র

ছিল না। স্বভাব সরল ও লোকটা নিরীহ বলেই গ্রামের সকলের সঙ্গে মিলপ্রীতি ছিল। মশাই বালককালে ভাল করে লেখা পড়া শেখেছিলেন, অতি অল্প বয়সে উদয়ের চিন্তায় মশাইগিরি কর্ত্তে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল বটে; কিন্তু অভ্যস্ত বিদ্যার আলোচনা ত্যাগ করেন নাই, সর্বদা অবকাশ পেলেই লেখা পড়া নিয়ে গৃহমধ্যে থাকিতেন।

কল্কেটা নসীরামের হাতে দিয়ে বল্লেন, নসীরাম! ভাল, যুবরাজের কোন সংবাদ পেয়েছ? বাজারে শুনেও পাই, আকবর বাদসাহ আর নাই মেলিম নাকি জাহাঙ্গীর নামে সিংহাসনে বসেছেন। যুবরাজ ত আজ সাত বৎসর আম'দের ছেড়ে গেছেন রাজ্য কত নিবেধ করলেন রাণীই বা কত কাঁদলেন। তখন যাবার সময় যুবরাজ বলে গেলেন যে মা! আশীর্বাদ কর অতি শীঘ্র দিল্লীপুরের প্রিয়কাৰ্য্য করে কোম প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হয়ে আবার তোমার শ্রীচরণে এসে উপস্থিত হব। যুবরাজ কি সাহসী! তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তবে একজন প্রকৃত বীর হবেম, ঐ বীর করুন তিনি আমাদের দেশে শীঘ্র উদয় হউন।”

নসীরাম উত্তর দিল, হায় সে দিন কতদূর? এ পাপ অনঙ্গের দৌরাণ্ডো আর বাঁচা যায় না, বিমলারই বা কি আচরণ!

বল্লভ বলিল “ভাল, তুমি কি শুন নাই যে যুবরাজ কোথায়?”

নসীরাম বলিল, “যুবরাজের নাম আজ চার পাঁচ বৎসর রায়চরণের ভিতর উঠে নাই, সকলেই প্রায় ভুলে গেছে। কেবল দেওয়ানজীর কথা উপস্থিত হয়, তখনই চাকর থাকেররা বলে যুবরাজ থাকলে তাজ কি আমাদের এ দশা হত।

বল্লভ বলিল। “ভাল রাণী কি কখন যুবরাজের জন্য ভাবেন না।”

নসীরাম বলিল। “কই আমি ত তা কখন শুনি নাই, কমলা দেবীকে কখন দেখি নাই। ভাববার মধ্যে কেবল ইন্দুমতী। তিনি যখন একবার গোয়াল ঘরে আসেন, তখনই কেবল তাঁর মলিন মুখ দেখতে পাই দেখলেই প্রাণটা যেন ফেটে যায়।”

বল্লভ বলিল। “ইন্দুমতীর কি গোসেবার বড় যত্ন?”

নসীরাম বলিল। “তার কোন সংকল্পে যত্ন নাই তা জানি না। তিনি বাড়ীর সকল লোককেই যত্ন করেন, মশাই কি কখন তা দেখেন নাই?”

বল্লভ বলিল। “হাঁ গত পিঠে পার্শ্বের দিন যখন রাজবাটীর ভিতর খেতে গিয়ে-ছিলাম, তখনই দেখেছি ইন্দুমতী কেমন যত্ন করে আপনি সকলের আহার দেখছিলেন ও মাঝে মাঝে আপনিই পরিবেশন করছিলেন। ইন্দুমতী আবার পণ্ডিতা। সন্ন্যাসী বতি ব্রহ্মচারীদিগকে রাজদ্বারে আসতে দেখলেই যত্ন করে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে নিয়ে বাস ও বিচার এবং শাস্ত্রালোচনা করেন। কিন্তু কই রাণীদিগের সে যত্ন কম কিছুই দেখি না। বোধ হয় মহারাজের পরলোক হওয়া অবধি কেমন জড়ভরত হয়েছেন।”

নসীরাম বলিল। “হাঁ তাই হবে। কে জানে বাবা। রাজা রাজদার কথায় আমাদের মত চালায় কি কাষ। চল এখন যাওয়া যাক। হেদে, (গোপালের প্রতি) চল চল বেলা গেলো।” (বলে চৌকর) গোপালেরা একেবারে খাওয়া বন্ধ করে চেয়ে দেখেই পূর্বাভিমুখে চলতে লাগলো। বঙ্গ ও নসীরাম তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নসীরামের কক্ষে তালপাতার ঝুড়ি, হস্তিণ হস্তে হেঁতালের লাঠি ও খেজুর ছড়ি। বঙ্গভের কাঁধে এক গোপাতার ছাতা ও হাতের লাঠিতে নামছা জড়ান। গাভীগুলি মাথা নাড়তে নাড়তে হেলহুলে চলতে লাগল। দূর হতে সমুদ্রের জোতের ন্যায় বোধ হতে লাগলো আর কাল কাল পুচ্ছগুলি নাড়াতে ঠিক যেন জোতের উপর ছোট পাখীর নৃত্যের ন্যায় দেখাল। কিছু দূর যেতে যেতে গ্রামের ভিতর হতে শব্দের ধ্বনি উঠল, বঙ্গ ও নসীরাম দূরস্থ প্রথম দীপ দেখিবামাত্র কৃতাজ্জলিশুটে সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার করিল। খালের ধারে এসে নসীরাম জিজ্ঞাসা করলে “মশাই! জলটুকু পার হয়ে যাবেন না সাঁকোর উপর দিয়ে যাবেন?” বঙ্গ বলিল চল সাঁকোর উপর দিয়ে যাই, কেন শীতের সময় কাপড় ভেজাব গরুর জলে কষ্ট হবে।” এই স্থির করে গোপাল নিয়ে উভয়ে খালের তীর বেয়ে সাঁকোর নিকট পৌঁছিল। সাঁকোর উপর এক খামি মুদির দোকান আছে ঐ দোকানে বঙ্গ তামাক খাইবার ইচ্ছায় দাঁড়াল, নসীরাম পাল নিয়ে গ্রামাভিমুখে চলে গেল। রশি খানেক গিয়ে নসীরাম ফিরে এসে বলিল “মশাই! একবার বাহির হন, ঐ খালে পাঁচ ছয় খানা নৌকা দেখতে পাচ্ছি; সন্ধ্যার সময় এত নৌকা কখন দেখি নাই। বোধ হয় কোন মহাজন পূর্বরাজ্যে যাচ্ছে। বঙ্গ তাড়াতাড়ি দোকানের ভিতর হতে হাতে ছকা করে বাহির হল, দোকানিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকা দর্শনাশয়ে বাহিরে এল; দোকানে আরও তিন জন লোক ছিল, তাহারাও কি আসছে দেখতে উৎসুক হয়ে বাইরে এল। বঙ্গ সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে দেখতে পেলে যে, নয় দশ খানা ডিগ্রি সমভেজে বেয়ে আসছে এক একটার প্রায় এগার বারো জন করে লোক। নৌকা সব দূরে থাকতে স্পষ্ট দেখা গেল না যে চড়ন-দারেরা কে? কিন্তু নৌকার আকারে বেশ বিশ্বাস হল যে, উহা মালের নৌকা নয়, উহার ছত্রি লাই, কমচওড়া। বঙ্গ বলিল “নসীরাম! এ ত মহাজনের নৌকা নয়?”

নসীরাম বলিল, “না মশাই, আমি দূর হতে দেখেছিলাম তাতে আবার শুমুকে আল মশাই এয়া কার?” কিন্তু মশাই নিতান্ত অশুস্থ হইয়া বলিল “বলতে ত পারি নে।” দোকানী বলিল, “এত ব্যস্ত হন কেন এখনি এই দোকানের নৌচে দিয়ে যেতে হবে। তখনই জায়া যাবে।”

বঙ্গ বলিল। “হাঁ তাই হবে কিন্তু ওয়া যে তেজে বছে, দণ্ড দুইয়ের মধ্যেই এসে পৌঁছিবো?”

দোকানস্থ তিন জনের মধ্যে অল্প বয়স্কটী বলিল, “মশাই ! শুনছেন কেমন ঝপ ঝপ শব্দ হচ্ছে, ওঃ কি জোরে বাইচে ।” এইরূপ উহাদের কথোপকথন হতে হতে ঐ নৌ-দল হঠাৎ দূরে ধামিল ও তাহাদের মধ্যে একজন নৌকার উপর দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল । সাঁকোর উপর বাহারা ছিল তাহারা শীতের ভয়ে দোকানের ভিতর থেকে নৌকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

“মাহুজ্জবা হি বৎসস্ত স্তম্ভোত্তবতি বন্ধনে ।”

দোকানে প্রত্যাগমন করিলে দোকানদার পুন্সরায় তামাক সাজলে, বলন্ত তামাক খেয়ে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল, অপর তিন জন তাহার সঙ্গী হইল । পথে অন্ধকার-বশত কিছুই দেখা যাইছিল না । কিন্তু বলন্তের সেই পথ নথদর্পণে থাকায়, না দেখেই সজোরে চলিতে ছিল । সঙ্গী তিনজন কিছুদূর সেইরূপ বেগে গিয়ে বলিল, “মশাই ! যদি একটু আশ্রয় যান, তবে আমরা আপনায় সঙ্গে যেতে পারি।” বলন্ত শব্দ শুনিমাত্র খেমে বলিল “তোমরা কি আশিতিছ, ত এস ।” এই বলতে বলতে তাহারা বলন্তের পার্শ্বে এসে উপস্থিত হল ।

বলন্ত বলিল । “শঙ্কর ! আজ কোথা গিয়েছিলে ?”

শঙ্কর একজন সূত্রধর, নিজকর্ণে অত্যন্ত নিপুণ ও ঐ অঞ্চলের সকলের চিহ্নিত । উর্দ্ধে প্রায় তিসহাতের কম, কীর্ণ-বপু, কৃষ্ণবর্ণ শঙ্করের মাচ্টি টীকল যেন বাটালিকাটা । শঙ্করের চক্ষু দুটি প্রায় গোল, বহু পরিভ্রমে যদিও বসে গিয়েছিল, কিন্তু এখনও ডব ডব কটে । শঙ্করের ঠোঁট দুটি কিছু ঝাঁকান ও মুখের হাঁ ছোট, শঙ্করের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও বাহুদ্বয়, বিশেষে দক্ষিণ বাহু অত্যন্ত বলিষ্ঠ । তাহার শরীরের মাংসগুলি পাকান, অথচ ইহাতে শঙ্করকে দেখিতে নিতান্ত কদম্ব্য হয় নাই । অত্যন্ত ঘন অন্ধকার বশত শঙ্করের বিশেষ লক্ষণ সকল দেখা গেল না ; কিন্তু দিনে তাহাকে দেখিলে একজন সুবুদ্ধি ও নিপুণ শিকারী বোধ হয় ।

শঙ্কর বলিল । “মহাশয় ! আমি ধমুন-পকুই হতে আসিতেছি । বশোয়ের মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ আট দিন ঐ গ্রামে এসেছেন । তাঁর সৈন্তসামন্তদিগের স্বরের টুকটাক মেঝামেঝের ছত্র আমাকে ডেকে পাঠান । পরে রাজা পুরী যাত্রা করিবেন বলে সামগ্রী সব বাকুল-বন্দী করিতে হচ্ছে । প্রত্যাহই প্রাতে যেতে হয় ।

হুপুর বেলা সেই ধানেই ব্রাহ্মণ-রান্না তাত পাই, সন্ধ্যার প্রহরটাক থাকতে ছুটি পাই। এ দুজনাও আমার সঙ্গে কাষে যায়। কি করি পেটের জালায় সর্ব্বত্রই যেতে হয়। হুই জোশ পথ যেতে হয়, ও রোজ ফিরে আসতে এত বেলা যায়। আজ কিন্তু দেক প্রহরের সময় অবকাশ পেয়েছিলেম, পথে প্রয়োজন ছিল। আমাদিগের হুঁচাগো বলন্তরায়েরও অকালে কাল হল। যুবরাজও ফিরে এলেন না। গ্রামে কোল কাষ নাই; তাতে আবার দেওয়ানজী মশায়ের যে দৌরায়্য?”

বলন্ত বলিল। “প্রতাপাদিত্যকে দেখেছ?”

শঙ্কর বলিল। “কেন, মশায় কি দেখেন নি? তিনি তো এখানে আজ বৎসর তিন হল এসেছিলেন। রায়গুর্গে মাসাবধি ছিলেন, প্রায় প্রত্যহই দ্বারির আদালে ও ‘হেমবতী-কুঞ্জে’ বেড়াতে যেতেন।”

বলন্ত বলিল। “হাঁ তখন দেখেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে কেমন আছেন, তাই জিজ্ঞাসা করচি।”

শঙ্কর বলিল। “আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। যে কয়েক দিন আমি সেখান বাইতেছি, সে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর আমার আবেশনের দিকে গত্যগত হয় নাই। শুনিলাম যমুনাতে উপস্থিত হয়েই সীড়িত হয়েছেন। অন্য শুনেছিলাম, মহারাজ তাঁহার সৈন্য দেখিতে হুই প্রহরের সময় বাহির হবেন।” এই কথা বলিতে বলিতে তাহার রায়গুর্গের হস্তিনখ দেশে উপস্থিত হল।

বলন্ত বলিল। “শঙ্কর! ভূমিত আমার চেয়ে অধিকবার রায়গড়ে গিয়েছিলে, কেমন বল দেখি আমাদিগের রাজার গড় ভাল, না বর্দ্ধমানের রাজার লঙ্করপুর ভাল?”

শঙ্কর বলিল। “এ কথা যদি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে ভেবে বলতে হবে। পূর্বে আমাদিগের গড় লঙ্করপুরের গড়ের চেয়ে দুমো মজবুত ও উত্তম হুইয়ে গড়া বোধ করিতাম। কিন্তু এখন লঙ্করপুরের গড়ের অনেক বদল হয়েছে। কে এক জন ফিরোজি এসে নতুন কারখানা লাগিয়েছে, আর বর্দ্ধমানওয়ারা বড় মজবুত। তারা যে রকমে—(অগ্নিপদের শব্দ পাইয়া) ওকি, ঘোড়া যে?”

বলন্ত পশ্চাৎ দিকে দৌঁধিয়া বলিল। “তাই তো ঘোড়সওয়ারা বোধ হয়। (এক মনে শব্দে কর্ণপাত করিয়া) এই দিকেই আসছে।”

শঙ্করের সঙ্গী হু জনা বলে উঠিলো। “ঐ দেখ সাকোর উপর তার বলয়ের কলা চমকচ্ছে।”

বলন্ত সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল। “তাইত সওয়ারটা বেঁটাড়াল?” মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হইয়া চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অঝরোহী পুনরায় বিহ্বলভাবে

পূর্বাভিমুখে, যে দিকে বল্লভ বাইতেছিল, অশ্চালন করিল। পর্য্যবেশ (১) মন মন ধ্বনি, অস্ত্রের কল্লনা, অশ্বের ঘন ঘন সুপ্রশস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে অনির্বচনীয় শব্দ উদ্ভাবিত হইল। অশ্বটা বহুদূর দ্রুত গমনে বর্ণাঙ্গাবিত-কলেবর হইয়াছে। খলৌন (২) চক্ষুণে মুখ ফেপসকুলে আবৃত। গ্রীবাদেশ বঙ্গাস্পর্শে, কটিদেশ কটিবন্ধ-হিম্মোলে ও পশ্চাত্তের পদবয়ের মধ্য পরস্পরের সর্ষণে শুভ্র-ফেবরাশিতে পুরিয়াছে। দীর্ঘবপু, উচ্চৈঃশ্রবা, বক্রগ্রীব, বক্রপৃষ্ঠ, ভীমকায় অত্যাশ্রিত অশ্ব বহুদূর গেল। অশ্বের পদাঘাতে বোধ হয় ধরাগুল কাঁপিতে লাগিল।

বল্লভ একদৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া পুস্তলিকার হ্রাস স্পন্দরহিত হইল।

শব্দ শ্রবণ হইয়া অশ্বারোহীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সচরাচর সোণারয়ের মধ্যে কণ্ঠ করাতে অশ্বারোহী দেখিয়া ভয় হইল না, কিছু আশ্চর্য্য হইল। এ দেশে বহুকালাবধি সান্ত্র অশ্বারোহী প্রায় দেখা যায় নাই। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর সৈন্তেরা নিশ্চিত ছিল, অশ্বারোহী প্রতিহারী আর রাত্রিকালে রায়গড়ে পাহারা দিত না এবং মাসে মাসে সৈন্ত সব একত্রীকৃত হইয়া মহারাজের বলপ্রকাশ করিত না। সুতরাং সে সময়ে সন্দেহ অশ্বারোহী রাত্রিকালে অতিবেগে গ্রামান্তর হইতে সেই পথে বাওয়া নিতান্ত নূতন ঘটনা বোধ হইত। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী রায়গড়ের কাটকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফটকস্থ দৌয়ারিক বসিয়া গান করিতেছিল, অশ্বারোহীকে কাটকে দাঁড়াইতে দেখিয়া উঠিয়া নিকটে আসিল। অশ্বারোহী তাহার সহিত কিছু কথোপকথন করিলে দ্বারবান্ দ্বারের গোপুর-দেশে (৩) বাইরা আর এক জনকে ডাকিয়া কিছু করিয়া দিল।

বল্লভ, শব্দ ও তাহারের সঙ্গী দুই জন সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই দ্বারী ইঙ্গিত করিলে অশ্বারোহী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারীর হস্তে ষোড়রা বঙ্গা দিয়া তেরণ (৪) দেশ দিয়া গড়মধ্যে চলিয়া গেল। দ্বারীও ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব লইয়া গেল। দ্বারে অপর দুই জন গড়ের ভিতর হইতে আসিয়া বসিল। অশ্বারোহী ও অশ্ব দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে বল্লভ শব্দকে জিজ্ঞাসা করিল “এ ব্যাপারটা কি, আমার জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে; চল ফটকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।

শব্দ বলিল। “মহাশয়! সন্ধ্যা ফল অত্যন্ত হইয়াছে, আবার ফরিয়া যেতে অধিক বিলম্ব হইবে; আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এখন ঘরে যাই।”

(১) জিন।

(২) দহানা।

(৩) লগরদ্বার।

(৪) বহির্দ্বারের খলান।

বলত তাহাতে সায় দিয়া কিছু দূর বাইয়া, দক্ষিণবাহী এক ক্ষুদ্র রাস্তার চলিয়া গেল। শব্দর “সমস্কার মশায়” বলিয়া পথাত্তরে বিদায় হইল। রাত্রি অধিক হইয়াছে প্রায় এক প্রহর হইল বলিয়াই বলত কিছু বেশী চলিতে লাগিল এবং অন্যকার বৈকালের ঘটনা সমস্ত মনে মনে ওলট পাগল করিতে লাগিল। যেতে যেতে একবার আকাশ দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখে, নক্ষত্রগুলি নিস্তকে মিট মিট করচে। পূর্বাধিক ক্রমে ফরসা হয়ে আসিতেছে ও ক্রমে চন্দ্র দেখা দিতে। বলত খানিক চন্দ্রপানে চাহিয়া দাঁড়াইল ও নিকটস্থ গাছের গোড়ায় বসিবার উদ্যোগ করিল। বলতের মন স্থির নাই। তলার গিয়া বসিল। সেটা এক পুরাতন বট গাছ। শুড়ি অত্যন্ত মোটা, এমন কি পাঁচ জনে আকুড়ে পার না। মোটা হুই ডাল হইতে মাজে মাজে করিকরের স্বায় লগ্না নামিয়াছে। এক এক নায় এক একটা পৃথক্ গাছের মত দাঁড়িয়াছে। গাছটা ডাল পালা সহিত প্রায় চার বিঘা জমী জুড়িয়া অঙ্ককার করিয়াছে। পৃথিবীর জোনাকপোকা সেই গাছকেই আশ্রয় করেছে। আশ্চর্য এই যে তাহারা থেকে থেকে অগ্নি উঠে ছ ও নিবে থাকে; সব পোকা গুলিই যেন পরামর্শ করেছে। ঐ গাছের তলার কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের হুইটি দেহহীন মাটির মুণ্ড আছে। কালুরায় ও দক্ষিণরায় লুতন দেবতা তাহাদিগের চুড়ায় গঠন যেন “বিষপের মাইটরড টুপি র স্ট্যানারি টুপি র মত।” গাছটি যে কেবল দেবতায়ের আশ্রয় হয়েছে, তাহা নহে। গাছে অনেক ঈকটীকিও আছে। এবং তয়ালক শুক্কের কুঁচের মত চন্দ্র দিবাতানে কখন কখন কোটির হইতে দেখা যায়, ও গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে তাহার বন বন উয়ানক গভীর শব্দে চতুর্দিকে নির্জন বনের শান্তি নষ্ট করে। গাছের নীচেটি পরিষ্কার একটি বাস নাই। প্রত্যহ কালুরায়ের পণ্ডিত কাট দেন ও পোময় দিয়া নিকোন। গাছের পাশেই রাস্তা, রাস্তাটি প্রায় ছয় হাত পরিময়। রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি ছোট জলমিকানি পগার। পগার পায় বন ও কাহারও বেমারামতি বাগান; কেবল ঝোপে পরিপূর্ণ, এমন কি ছোট ছোট বাব অক্লেশে লুকিয়ে থাকতে পারে। এ অকালে বাবের তর প্রায় ছিল না। কদাচ শীতকালে এক আধটা নেকড়ে দেখা দিত, ও হুই চারি দিন বাছুরটা ও ছাগলটা ধরলেই, অমনি মারা পড়তো। বনে, বন্যবরাহ ও অগ্নি কুস্তীর অত্যন্ত। অধিক বন থাকতে সর্পও অধিক। কিন্তু গ্রামস্থ মনসাধেবীর এমনি অনুগ্রহ, যে বৎসরে গ্রামের মধ্যে হুই তিনটায় অধিক লোক বাল হত না; আবার সেই হুই তিনটিই প্রায় অপরাধী। বলত গাছতলায় বসিয়া নিশ্চক হইল। চতুর্দিক শব্দহীন। একটু একটু যে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছিল তাহাও বন্ধ হইল। গাছের পাতাটি আর নড়ে না। বলত যখন বসিয়াছিল, তখন সেইখানে কোন শব্দই ছিল না, শব্দমাত্র বলতের বন বন নিবাস। মুহূর্তকাল পরেই চীরায় বি বি শব্দ শুনা গেল ও তাহার পরে গাছের পাতা একটু নড়িল ও বলতের

মাথার উপরের ডাল হইতে, ভক্তের ভয়ানক ডাকের প্রথম গলা খাকারি শোণ দেল । বলত বৃকের উপর দাড়ি রেখে ভাবিতেছিল ; সেই ভয়ানক বিকট শব্দ শুনে কলের মত বাড়টা উপর দিকে তুলিল ও পরেই পুনরায় আপনায় চিন্তায় নিমগ্ন হল । ক্ষণেক পরে আপনা আপনি বলতে লাগল, “আঃ কত দিন আছে আমিত আর পারি না । কি হুজুর্নেই রাত্রি ভোর হয়েছিল । আমার চিরজীবন কি কষ্টেই যাচে ! ঈশ্বর কি অনুগ্রহ করবেন না । কি ! অনুগ্রহ ! ওনাম আমার মুখে আনাও কর্তব্য নয় ।” কতই ভাব উঠছে কতই বা চিন্তা । মনটা যেন গুলিয়ে উঠছে । “হা বিধাতা !” এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রেরই তাহার শরীরের লোমাঞ্চ হইল ও বলত শিহরিয়া উঠিল । বলভের আর বাকুনিষ্পত্তি হইল না । বলভ পুনরায় পুতুলিকার মত প্রান্তরময় হইল । ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল ও তাহার প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বর্ণ উদ্ভাবিত হইল । বলভ হতাশ হইয়া চক্ষুঃস্রোত করিল । নেত্রদ্বয় যেন তাহার কপালদেশ হইতে লক্ষ দিবে, এই ভাবে একনিমেষ হইয়া কিছুক্ষণ শূন্যমার্গে কৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল । তাহার মনে অশ্রুশিশিতে ভাসিতে লাগিল ও নাসাপুট হইতে বিন্দু বিন্দু স্বাম পড়িতে লাগিল । হস্ত দ্বারা নেত্রদ্বয় আবরণ করিয়া বলভ কিছুক্ষণ রোদন করিলে মনের বোঝা কমিয়া গেল ; বস্ত্রদ্বারা বক্ষুঃস্থর মুছিয়া বলভ দণ্ডায়মান হইল, চারিদিকে একবার চক্ষু বুলাইয়া পূর্ব পথ দিয়া গৃহাভিমুখে অতি অজ অজ পদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল । গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারের শৃঙ্খল ধরিয়া নাড়া দিলে, কিছুক্ষণ পরেই একজন বৃদ্ধা দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া এক পাশে দাঁড়াইল । বলভ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, পুনরায় দ্বারের অর্গল বড় বড় করিয়া টানিয়া নিল । বলভের বাটী গ্রামের প্রান্তভাগে । বাটীর চতুর্দিকে মাঠ, একটাও গাছ নাই, কোপ নাই, কেবল বাসের মাঠ । বলভ আপন ব্যয়ে নিকটস্থ জমী পরিষ্কার রাখিয়াছিল । ঐ জমী ও বাড়ীটি রাজার । কিন্তু গ্রামের গুরুমহাশয়ের বাসের জন্ত নিষেধাজ্ঞিত ।

“মহাশয়” ৮ জগন্নাথ কুন্ডার বংশজ । জগন্নাথ কুন্ডা এক জন সরস্বতীস্থ ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন । পুরাতন লোকের মুখে শুনা যায় । তাঁহার ব্যয়ে ১২২৩ শকে এক মঠ প্রস্তুত হয় । দেটি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখা যাইত । বলভের পিতা আপন অপরিমিত ব্যয়ে সকল ধন ক্ষয় করেন । বলভকে পাঁচ বৎসরের রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন । বলভের মাতা পতিহীন হইয়া যত কষ্ট না পাইলেন, বলভের পালন উপায়ে ততোধিক দুঃখিতা হইলেন । এমন সঙ্গতি ছিল না যে, মা-পোষের দৈনন্দিন আহার হয়,—অন্যতঃ রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইল । রাজা দয়ালীল, ও কুন্ডাবংশ বহুকালের জন্য জানিয়া, বলভকে অবশ্যপ্রতিপাল্য জ্ঞানে, কিছু বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ও নাথোত্তম জমীও দিলেন । বলভ বাল্যকালে চতুর্পাঠিতে অধ্যয়ন করেন । অতি অল্প বয়সে

মেধাধী বলিয়া খ্যাত হন। তাহার পোনের বৎসর বয়ঃক্রমে দৈবশ্রুত্বোপে এক ব্রাহ্মণ ঠাঁহাকে কস্তানান করেন। বলভের বিবাহ করায় বিপদ উপস্থিত হইল। বলভের ব্যয় বৃদ্ধি হইল। রাজবৃত্তিতে পরিবারের উদয় পূৰ্ণ না হওয়ায়, বলভ চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া রাজদ্বারে কৰ্ম্মাভিলাষে উপস্থিত হন। সেই সময়ে গ্রাহ্মের গুরুমহাশয়ের কাল হওয়ায়, বলভের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। বলভ গুরুমহাশয় পদে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বলভের মাতার ও স্ত্রীর কাল হইল। বলভ বৈরাগ্যোদয়ে আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া এই গৃহে বাস করিলেন।

বলভের বাসালয়ের নিকটেই পাঠশালা ছিল। বলভের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই কেবল পুখীর রাশি দেখা যায়। পাঠশালার কৰ্ম্ম বেলা দেড় প্রহরের মধ্যেই সমাধা করিয়া তিনি বেলা দুই প্রহরের পূৰ্বেই ভোজন করিয়া প্রায় সমস্ত দিন আপন পুরাতন পুখীর পাতের মধ্যে বসিয়া কাটাইতেন। বলভ রাত্রি দুই প্রহরের পূৰ্বে কখন শয়ন করিতেন না। কিন্তু আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে বলভের রাত্রে নিদ্রা নাই বলিলেই হয়। বলভ প্রায় সমস্ত রাত্রি আপন স্বরে বসিয়া পড়িতেন, বা ছাদের উপর ও উঠানে বেড়াইতেন। অন্য বলভ আপন স্বরে বাইয়া প্রদীপ জালিলেন ও একথানা পুখীর তাক্কা লামাইয়া পড়িবার উদ্দেশ্যে পুখীর পাতা খুলিলেন; দুই দণ্ড হইয়া গেল, বলভের আর সে পাতা পড়া হইল না। বহুক্ষণ পরে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইলে বলভ পুখীর পাতা বন্ধ করিয়া শয়নাগারে গেলেন; তথাকার দীপটি জালিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বর্ণে মহাকলরব লাগিল। শব্দ শুনিবামাত্র চমকে উঠিলেন। যদিচ তাঁহার স্বভাব ভীক্ৰ নহে, কিন্তু অকস্মাৎ রাত্রিকালে জনকোলাহল শ্রবণে অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিয়া শয়ন-গৃহ ত্যাগ করত বাটীর ছাদে উঠিলেন এবং দেখিলেন যে, রাঘবগুর্গের দিকে আলোক ও ঐ দিকেই শব্দ হইতেছে। রামনারায়ণের অমেক উল্লর স্বর ছিল। তাহাতে আশুপ লাগিয়াছে বোধে বলভ ব্যস্ত হইয়া ছাদের উপর হইতে লামিয়া দ্বার খুলিয়া যেমন বেরুবেন, অমনি টিক্‌টিক্‌ পড়লো। এ বাধা অগ্রাহ করিয়া বাটীর বাহরে গেলে পায়ে হাঁচট লাগিল। বলভ ভীত হইয়া বিচক্ষণ হিঁর চিত্তে জুগাম জপ করিয়া পুনরায় গমনোন্মুখ হইবামাত্র, তাঁহার স্বপ্ন হইতে উত্তরীয় বসিয়া পড়িল। ক্রমে কোলাহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলভ তড়াতাড়ি উত্তরীয় তুলে নিয়ে রাস্তায় এসে পড়লেন, ও রায়গড়ের দিকে দৌড়িলেন। দেওয়ানজীর দ্বারের উপর দিয়ে রায়গড়ের পথ। সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র বলভের বুকেটা চমকে উঠলো। দেখেন, দ্বারের ত্রিতর একটি অলবয়স্ক স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। তাহাকে দেখে বলভ দাঁড়ালেন ও তাহার পানে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালাটি তাঁহাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল। বলভ ঠায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া

বলিলেন, “কেও প্রভাবতী নাকি? তুমি যে এখন ভেগে, তোমাদের দরজা এখনও খোলা কেন?” প্রভাবতী বলিল “রায়দুর্গের দিকে কি একটা গোল উঠেছে, আলোও দেখা যাচ্ছে, তাই বাবামহাশয় উঠে দেখতে গেছেন। বোধ হয় পাঠানের হাঙ্গামা। বাটীর সকল পুরুষ কেউ লাঠি, কেউ তলওয়ার কেউ তীর লয়ে নৌড়ে গেছে। বাবা-মহাশয় বেরুলেন, তাই আমিও দরজায় এসেছি, কিন্তু তুমি কোথা থেকে?”

বলন্ত বলিল। “আমিও গোল শুনে রায়দুর্গে যাচ্ছি, তুমি এখন ঘরে যাও।” এই বলিয়া দ্রুতবেগে রায়দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

প্রভাবতী “দাঁড়াও দাঁড়াও” বলিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, “তুমি যেও না। ওখানে তুমি গিয়ে কি করবে, ঐ শুনছো না ওখানে কাটাকাটি হচ্ছে। তোমায় হাতে অস্ত্র নাই, তাতে তুমি আবার যে ব্যবদায়ী, তোমার হেঙ্গামায় যাওয়া উচিত নয়। তুমি এইখানে থাকো লোকেরা ফিরিয়া আসিলে সব স্নানিতে পাইবে।”

বলন্ত বলিল। “না, আমি দেখিয়া আসি।”

প্রভাবতী বলিল। “দেখে তোমার কি লাভ, এত ব্যস্ত কেন? একটু ধামেই শুন্তে পাবে। আমি বাবামহাশয়কে যেতে অনেক নিষেধ করেছিলাম। তিনি আমার বারণ কোন মতেই শুনলেন না, এবার তলওয়ার লইয়া বেগে চলিয়া গেলেন ও বলিলেন, ‘প্রভাবতী! আমার রায়দুর্গের পালিত। আমাদের রায়দুর্গের বিপদের সময় নিশ্চিত থাকাকর্তব্য নহে। আমি অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।’ তিনি না যাইয়াই যা কি করেন, রাজ্যের বিপদের সময় রাজমন্ত্রীর নিশ্চিত থাকাকর্তব্য নহে।”

বলন্ত বলিল। “তোমার পিতাকে যদি পাইতে দিয়াছ, তবে আমাকেও যাইতে দাও, রায়দুর্গের বিপদে আমারও উপস্থিত হওয়া বিধেয়। আমিও রায়দুর্গের প্রতিপালিত।”

প্রভাবতী বলিল। “তোমার তো অস্ত্র নাই। পিতা রাজকর্নচারী ও অস্ত্রবিদ্যায় পটু। তুমি কখন অস্ত্র চালাও নাই।”

বলন্ত বলিল। “প্রভাবতী! আমার অস্ত্রব্যবসা নাই বটে, কিন্তু গুরুবলে দলু ভাড়নের মত অস্ত্রবিদ্যাও শিখিয়াছি।”

প্রভাবতী বলিল। “তা তোমার অস্ত্র কই?”

বলন্ত বলিল। “রায়দুর্গে অনেক অস্ত্র আছে, প্রয়োজন হয় সেইখানেই পাইব।”

প্রভাবতী বলিল। “না তোমার গিয়া কাজ নাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে তোমার কোন বিপদ ঘটে। আমার পিতার অনুপস্থিতিতে সেখানে রক্ষা করে, এমন লোক নাই; সকলেই ছোট ছোট কর্ণচারী, অধ্যক্ষ অভাবে তাহারা নিতান্ত হীনবল।

পরামর্শ দেয় এমন লোক নাই। কেবল তুই রাণী ও ইন্দুমতী। তোমার না বাণেশ্বরে কোন হানি হইতে পারে না।”

বল্লভ বলিল। “প্রভাবতী! সত্য, আমার না বাণেশ্বর কিছু ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সে কি আমার উচিত? আমি পক্ষু নহি, তাতে আবার রাজ্যের পোষা, আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, তাহাই আমার করা কর্তব্য।”

প্রভাবতী বলিল। “রাজকাৰ্য্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট আছে। কর্মচারিগণ আপন আপন কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেই, তাহাদিগের ধর্মপূর্বক কর্ম করা হইল। তুমি শিক্ষক, বালকবৃন্দের শিক্ষাদানেই তোমার দেশের কর্ম করা হল। তোমার বুদ্ধ করা কর্ম নহে। চৌকিদার ও শিপাইরা হুগ্ন রক্ষা করিবে।”

বল্লভ বাক্যে কালব্যয় জ্ঞান করিয়া কিছু অধৈর্য্য হইয়া বলিল, “তোমার সঙ্গে ক’ল বিচার করিব। এক্ষণে বিচারের সময় নাই, আমি জীবন ধারণ করিতে রায়হুগ্ন কখন বিপদে পড়িবে না। ঐ দেখ ক্রমে গোল বুদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় পাঠানেরা জরী হইল। যখনরা হিন্দুরাজ্য অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে না, কি দৌরাশ্ব্য! আমি চলিলাম।”

প্রভাবতী বলিল। “যদি একান্তই যাবে তবে দাঁড়াও, আমি কিছু অস্ত্র ও সময়োপযোগী বস্ত্র আনিয়া দি।” বলিয়া বিছাঘেগে অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিল। যেম তাহার চরণ ভূমি স্পর্শ করিল না। দ্রুত গমনে তাহার আলুলায়িত কেশভার পৃষ্ঠোপরি লব্ধ জলধরের দ্বার তুলিতে লাগিল। প্রভাবতী গোচর-বহির্ভূত হইলে বল্লভ ভাবিল “বিধি কি ইহাতেই গুণসমুচ্চর একত্র করিয়াছেন? কিন্তু আমি কি এত পুরস্কারের পাত্র?” একটা বন্দুকের শব্দ হইল। “বন্দুকও চলিতেছে, তবে ব্যাপার বড় সহজ নহে। ভাল দেখা যাক, এখন মিস্ত্র জামা গেল না যে কিসের হেতু? যখন রাজ্য কি শিথিল। পাঠানেরা কি দুর্দম। দেশের শান্তিরক্ষা হইতেছে না। হয়ত এতক্ষণে রায়গড় যারা গেল ও পুরজম বন্দী হল। কচুরায় থাকিলে আজ কখন এমন হইত না। আমি দেখিতেছি এতকাল পরে রায়হুগ্ন পরাবীন হল ও রায়বংশ ধ্বংস হলো। রায়বংশই বা কে আছে? কচুরায় যদি বাঁচিয়া থাকে, সেই পিণ্ডদানের একমাত্র আশ্রয়। সংসার কি অনিত্য! এ সকল মায়ার কর্ম। কেহ বাহাকেও নষ্ট করিতে পারে না। তিনিই খড়্গা হইয়া ছেদ করেন, আবার জীব হইয়া ছেদিত হইবেন। উভয়ই তাঁহার লীলা। পাপ পুণ্যের ভোগাভোগ অলৌকিক। তিনিই যমরাজ, আবার পাশী।” বলিয়া বল্লভ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, ও হেঁটমুণ্ডে নিস্তব্ধ হইল। কিছুক্ষণ এই অবস্থার থাকিয়া “প্রভাবতী যে এখনও এলো না। আমার আর বিলম্ব সহ্য নহে। আমি যাই।” বলিয়া, আর একবার অস্ত্রপুর্নিক চাহিয়া দেখিল। প্রভাবতীও সেই সময়ে ব্যস্তে বহির্গত

হইয়া বলিল। “অল্পবয়সে চাষি ছিল, তাহা খুজিয়া পাই নাই, চাষি ভাঙ্গিয়া এই সব আনিয়াছি। এই লও ধনু, এই তুণ, তনুত্রাণ-(১) ইহা শুভ্রাটের নির্মিত। এই লও পারন্ত দেশের তলবার, এই লও বল্লম। একটা বন্দুকও আনিয়াছি। তমিলাম রায়তুর্গে বন্দুকও চলিতেছে, এইটেতে গুলি ও বারুদ আছে। তুমি কি বন্দুক ছুড়িতে জান?”

বল্লভ “এ সবল অস্ত্রে জয় করা যায় না। এমন শত্রুই নাই নাও” বলিয়া বন্দুক লইয়া দেখিল ও তাহার বারুদ আর গুলি পুরিয়া লইল। একটা মৃত্যুর লড়িতে আশ্রয় লাগাইয়া সমাজীকৃত হইয়া রায়তুর্গের দিকে চলিল।

প্রভাবতী “ঈশ্বর তোমার জয় করুন” বলিয়া বিশায় দিল, বল্লভ যতক্ষণ তাহার চুষ্টি পথ অতিক্রম না করিল, ততক্ষণ এ চুষ্টিতে তাহার দিকে দেখিল, পরে যৌন হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই এক জন অধারোহী ক্ষতবেগে এই বায়ে উপস্থিত হইয়া বলিল। “প্রভাবতী! তোমার পিতা তাহার বন্দুক চাহিতেছেন, শীঘ্র নাও, বিলম্ব করিও না, সমুদ্র বিপদ। অতিথি-কিরিজীয়া প্রায় গড় লঞ্চল করিয়াছে। সংকল্পের এই ফল। অজ্ঞাতকুলশীলকে বাস দেওয়ার এই লাভ। হিতে বিপরীত। কিন্তু আমাদের বোদ্ধা দল কিছু নিভাঙ্ক হইল বল নহে; তাতে আবার তোমার পিতা সেনানী।” প্রভাবতী মুহূর্তমধ্যে রৌপ্য ভড়িত ও মানাধি প্রস্তরখচিত ছোট একটি বন্দুক আনি ও তাহার সঙ্গে বারুদ ও গুলির তোষড়া টুটাও আনি। এ বন্দুকটিতে চকুমকির পাখর ছিল। বন্দুকটি অধারোহীর হাতে দিয়া দ্বিজ্ঞান করিল, “পথে বল্লভকে দেখিয়াছ?” অধারোহী বলিল। “হঁ। বল্লভ ক্ষতবেগে রায়তুর্গে প্রবেশ করিয়া অতি তীক্ষ্ণরে হুই ভিন জনা কিরিসিকে বিদ্ধ করিয়াছে, ও যেখানে তুমুল ধুন্ধ হইতেছে, সেইখানে গিয়া লৈলনিগকে উৎসাহ দিতেছে। গ্রামের গুরুমহাশয়ের বে এত কমতা, তা আমি জামি না। আমাদের অনেকের অপেক্ষা সাহসী ও রূপশাস্ত্রে নিপুণ। পণ্ডিতকে কোন কর্তাই আটক যায় না। কিন্তু অব্যাকার বুদ্ধ বোধ হয় সুবিধা। যে এক জন অধারোহী বোদ্ধা, অন্য সাংকালে পড়ে আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই বোধ করি অব্যাকার মান-রক্ষা করিবেন। কি অমানুষী সাহস। কিইবা বুদ্ধপ্রণী! সার্থক রে সেই দেশ বেধা সে জন্মেছে! সার্থক রে সেই পুত্র যে তারে ধরেছে!” বলিয়া বায়বেগে চলিয়া গেল।

প্রভাবতী, দ্বারের প্রস্তরময় সোপানে বসিলেন ও ললিত বাহনতার করপদে কোমল কপোল ন্যস্ত হইল। কেশপাণ মণিবন্ধ আচ্ছাদন করিয়া সব্যজানু আবৃত করিল; তাহাতে সূহৃদক সমীরণে উগ্রিসমূহ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন অতল-

স্পর্শহ্রদের মসীবর্ণ জলে আকাশস্থ বন মেঘের প্রতি বিম্ব বায়ুচালনে নৃত্য করিতেছে । এক একবার পবনসকারে কেশরাশির মধ্য হইতে শরীরের বিমলকান্তি, তমাল তরুণ শ্যামল পল্লবক্ষেদ্র দিয়া চন্দ্রমণ্ডলের ত্রায় দেখা যাইতে লাগিল । তাহার নিখুঁত নেত্র অবনত হইয়া যেন ধরার ভূগর্ভের রূপ একতান হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । মুহূ-মুহু নিখাস বহিতে লাগিল ও তুঙ্গন্তনধর্য অতি অল্পে অল্পে স্ফলিত হইতে লাগিল । শিখিল বসন ককাস হইতে খসিল, বক্ষস্থ-বস্ত্র স্বর্ণে নীলীকৃত কুচবৃত্তধর দেখা দিল । বক্ষঃস্থল সুগোল, একটি টোল নাই । কুচধর, কক্ষের ও বক্ষের কোন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রেরণীর হৃদয়স্থিত পুরুষ বাতীত আর কেহ দূর হইতে বলিতে পারে না । আহা বাহুযুগলের কি ভাব ; আর স্বকন্দেশেরই বা কি মাধুরী ! অবনত মুখ-চন্দ্রকে পশ্চাৎ হইতে মৃণালের মত কর্ণদেশেই বা কি শোভা দিচ্ছে । অধর প্রফুল্ল ; গোলাপের পাব্‌ড়ির মত কি ভাবে উল্টে পড়েছে ও কি রস ; ঈষৎ রক্তিমাধ্বর্ণ, যেন পাতলা আলতা শুলে দেওয়া হয়েছে । অধরোষ্ঠের মধ্য স্থলটি একটু টেপা, যেন ঐ স্থান হইতে বক্ত্রেখাধর দুই দিকে ওষ্ঠের শেষে গিয়াছে । ওষ্ঠও তদনুরূপ, ওষ্ঠের উপরে ও নাসার অগ্রভাগের নীচে যেন পক্ষকোণ একটা খাদ আছে । খাদের নিম্নের তিনটি কোণের কাছে ক্রমে খাদটি পুরে এসেছে । নাসিকা সটান । কপাল হইতে নামিয়াছে । নাসামূল কোথা আর কপালের শেষ কোথা, কিছুই বলা যায় না ; কেবল ভ্রমলধয়ের ঈষৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল লোমের আরম্ভ মাত্র । ভ্রমলোম এই স্থান হইতে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া চক্ষুর অপর কোণ অতিক্রম করিয়া প্রায় গুরু (১) নবীন লোমের গুরুত্ব স্পর্শ করিয়াছে । সমস্ত মুখটি বাদামে । গোল নহ, লম্বাও নহে । মুখটি যেন রসে ঢল ঢল করিতেছে । প্রভাবতীর চোঁট তুটি ঈষৎ খোলা, বোধ হয় যেন কি বলিবেন । ওষ্ঠধরের বিচ্ছেদ দিয়া মুক্তার মত শুভ্র ও সজ্যোতি দন্তপঙ্ক্তি দেখা যাইতেছে । দন্তগুলি ছোট ছোট ও সব সমান ; যেন হতা ধরে বসান হয়েছে । বন, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে নাই, অথচ তাহাদিগের মধ্যে কাঁক নাই । প্রভাবতী একান্ত বহুক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিল । কিছুক্ষণ পরেই একটা বিবট শব্দ হইল, বোধ হইল যেন কোন ভায়র জয়ধ্বনি । প্রভাবতীর হৃদয় কঁপিয়া উঠিল ও অমন দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিল । “একি ক্রন্দনের শব্দ পাই যে । মুক্তার কি ভয়ানক শব্দ । বন্যভর কি হইল ; পিতাই বা কি করিতেছেন । পুনরায় অতীব হঃসহ হৃতাযাতনার শব্দ উঠিতেই প্রভাবতী শব্দ উদ্দেশ্যে দৌড়িল, কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই প্রত্যাগমন করিল । গৃহমধ্যে প্রবেশ

করিয়া, অন্নক্রম মধ্যে কটিলেশ বন্ধ করিয়া, মল্লবেশে, খড়্গ ও বরষা হাতে লইয়া রায়গড়ে চলিল ।

প্রভাবতী বালিকা । অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়াতে রাজমন্ত্রী অনঙ্গপালের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল । অনঙ্গপালও প্রভাবতীর অমতে কোন কৰ্ম্ম করিতেন না । সৰ্ব্বদাই প্রভাবতীকে সঙ্গে লইয়া রায়গড়ে বাইতেন । প্রভাবতী স্বভাবত অত্যন্ত চঞ্চলা, তাতে আবার পিতার শাসন মাই বলিয়া, এককালে স্বৈচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিয়াছিল । সৰ্ব্বদা রাজব্যাপার স্বচক্ষে দেখায় অত্যন্ত সাহসী ছিল । এক্ষণে পিতার আনিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া অস্থির হইল । বল্লভের কুশলচিন্তাও ততোধিক । আপনিই বোদ্ধবশে তত্ত্বাবধারণে বহিষ্কৃত হইল । পথে শব্বরের সহিত দেখা হইল । শব্বর একত বোদ্ধবশে অথারোহণে চলিয়াছে । তাহার সঙ্গে পঁচিশ জন অথারোহী, সকলেই অস্ত্রবান্ ও দীর্ঘবপু, কেবল শব্বর তাহাদের মধ্যে খৰ্জ । শব্বরের দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড বল্লম । বল্লমের উপরে ধ্বজা । শব্বর আপনার পায়ে উপর বল্লমের অপর দিকটি রাখিয়া অতিবেগে অগ্রসর হইতেছে । পঁচিশ জন অথারোহী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নন্নর বন্দ করিয়া চলিয়াছে ।

শব্বর প্রভাবতীকে দেখিয়াই অশ্বেশ সংযত করিয়া কহিল “দেবি! আপনার এ বেশ কেন, আর কোথায় বা যাইতেছেন?”

প্রভাবতী বলিল । “দুর্গে বুদ্ধার্থে যাইতেছি ।”

শব্বর বলিল । “যদি দুর্গে বুদ্ধার্থে যাইতেন, তবে এক অশ্বে চলুন,” (প্রভাবতীর চমক ভাঙ্গিয়া গেল) কহিলেন “ভাল বলিয়াছ, তা আমি এখন অশ্ব কোথা পাই ।”

শব্বর । “আমার অশ্ব জড়েন । ভাল হইল, আমরা আপনার ভবীল হইয়া বাইব ।” বলিয়া আপনার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল । ও আপনার বর্ষা দেবীকে দিয়া, অপর একজনকে অশ্বে আপনি চলিল । প্রভাবতী অশ্বে আরোহণ করিলে তাঁহার মূর্তি আর এক ভাব ধারণ করিল । এক্ষণে যদিও কোমল অঙ্গের কিছু কাঠিন্য হইল না, কিন্তু দর্শনে অত্যন্ত তয়ানক হইল । কঠিন উকীষ তাহার কবরী বন্ধ করিয়া মণি খচিত কিরীটের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল । গলে মুক্তার হাড়, হীরকের কণ্ঠী । বক্ষস্থলে কাঁচুণী আঁটা । তাহার উপর লোহের তুর্ডেন্য বস্ত্র । দক্ষিণ পার্শ্বে তলবারী । বামপক্ষে বন্দুক, ও বামহস্তে সপাতকটু মুষ্টিধৃত শেল । প্রভাবতী সেনানী হইয়া কি অপূৰ্ণ প্রভা বিতরণ করিতে লাগিল । সৈন্তদেরই বা কি অনন্তবনৌর স্তুতি-উদ্ভাবিত হইল । সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার পশ্চাৎ হইল । তিনি দক্ষিণ করে তুরী ধরিয়া অদম্ব নাদে ধ্বনি করিলে, তুরীদিনাদে চতুর্দিক কাঁপিয়া উঠিল ।

শব্দ চারিদিকের পাছে ঘোষিল। পল্লিতে ঘোষিল। রায়গড়ের প্রাচীরে ঘোষিল। কুমল শব্দে দেশ পুরিল। সংসার ভেদিয়া আকাশে অমুনাদিত হইল। মেঘচর যাক্ত করিয়া জোরে উত্তরিল। শত্রুর হৃদয় বিদারিত হইল। দূরের কল্লোল নিস্তর হইল। সৈন্তাধিপের ঘূর্ণিত নেত্র হইতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। এক লক্ষ অশগুলি নয়নের অগোচর হইল। আর কিছুই শুনা যায় না। ক্রমে দূরস্থ কল্লোল আবার বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও অশপদাঘাত শব্দ ফাণ হইয়া জনকলে লে আবৃত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

“অলিতং ন হিরণ্যরেতসং চয়মাস্কন্দতি ভয়নাং জনঃ।

অতিভূতিভয়াদহনতঃ সুখমুজ্জ্বলতি ন ধাম মানিঃ॥”

বেলা বেড় প্রহর অতীত হইয়াছে, প্রতাপাদিত্যের স্বর্গাবারে (১) বড়ই গোল। বমুনা পুরুইয়ের আসা অবধি মহারাজ একদিনও আপন স্বর হইতে বাহির হন নাই। অন্য বাহিরে আসিয়া সৈন্তবাহিনী দেখিবেন এই সমাচার শিবির মধ্যে বিদ্যাতের দ্বার ছুটিল। সকলেই সযত্নে আপন আপন অস্ত্র ও বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে কেহ বা ভাল করিয়া আপনায় ঘোড়াটির গা মেছাইতেছে ও পরিপাটী করিয়া তাহার উপর পাখ্যাণ (২) দিতেছে। ছাউনির মধ্যস্থানে রাজতাস্ত্র। তাহার উপর পতাকা উড়িতেছে। ঐ তাম্রটির উপর ছিট দিয়া মোড়া। উহা সবল তাম্র অপেক্ষা বড় ও উৎকৃষ্ট। উহার উপর চারিটি সোণার কলস। উহার দড়িস্থলি রক্তবেরঙ্গের রেলমের। উহার ভিতরে মধ্যমলের উপর অগ্নির কাষ করা। উহার চতুর্পার্শ্বে এক বিহার মধ্যে আর তাম্র নাই। চারি দিকেই সওয়ার পাহারা। তাম্রটি অস্ত্রাঘ তাম্র অপেক্ষা দুই তিন গুণ উচ্চ, সকল তাম্র যেন তাহার বটদেশে পধ্যস্ত। তাম্র চারি দিক্ খেলা। তাহার ভিতরে আমাড়ি সমেত হাতি বাইতে পারে এমন উচ্চ। তাম্র মধ্যে এক উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনটি পিতলের। তাহার লাণ্ডগুলি রূপার ও ছত্রটি সোণার। চারিদিক্ হইতে যুক্তার কালর খুলিতেছে। তাম্র কিছু অন্তরে চারিদিক্ জুড়িয়া আর ছ-টি তাম্র ছিল। সে ছটি প্রধান অমাত্য, সেনানী ও আমীরের। ইহাদের চতুর্দিকে নান সংখ্যা চারিশত তাম্র আছে, এই সকল তাম্রতে রাজার সেনা। স্বর্গাবারের চতুর্দিকে প্রতৌলীপ্রাকার। (৩)

(১) রাজসমীপস্থ সেনামণ্ডলীর ছাউনী—Encampment. (২) জিন।

(৩) হুগের চতুর্দিকের উচ্চ প্রাচীর। Rampars,

তাহার নীচেই গভীর পরিখা । (১) সেই পরিখার উপর দিয়া পশ্চিম দিকে একটি পালী । (২) পালিটি প্রায় ত্রিশ হাত পরিসর । স্বক্কাবাদের সেতু হইতে পশ্চিমবাহিনী বরাবর প্রশস্ত রাজপথ কিছু দূর গিয়াই উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি শাখা দিয়াছে । শাখাৱণ্ড অত্যন্ত বিস্তৃত । চতুষ্পথের পরেই উত্তর-দক্ষিণবাহিনী রাজপথের উপর, পশ্চিমবাহিনী রাজপথের পার্শ্বে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাসমন্দির । তাহার চতুর্দিকে বৃহৎ খাদ । খাদের উপর দিয়া একটি মাত্র সেতুর উপর সুবিস্তৃত পথ । খাদের উপরই মাটির উচ্চ প্রাকার । প্রাকারটি সম্মুখের দিকে সটান উচ্চ । ভিতর হইতে ক্রমে গড়ানে প্রাকারটির পর ছোট ছোট ইটের ঘর ; তাহাওই রাজকক্ষচারীদিগের বাস । এক সারি ঘরের পর একটি অল্প পরিসর পথ । পথের পরই কতকগুলি ছোট ছোট ঘর ; সে গুলিতে সামান্য দাস দাসী বাস করে । তাহার পর প্রশস্ত রাজমার্গ । তাহার পর মহারাজের উদ্যান । উদ্যানের মধ্যে মহারাজের আবাস । আবাসঘর হইতে উদ্যান ভেদ করিয়া বরাবর সেতু দিয়া পূর্ববাহি বর্গ স্বক্কাবাদের সেতুতে গিয়া মিলিয়াছে । রাজবাটীর মধ্যে মনোরম মহা-মৌলবল্লবৃত্ত গুল্মকোষগৃহ । লব্ধনামা (৩) হ'স্তলকল ও মনোজবঙ্গামী (৪) ঘোটক রাজমন্দিরের নিচে স্থাপিত । নৃপতির দ্বার-দেশে সপজ্জ যুদ্ধে গা মহাদত্তা (৫) ও সপজ্জ বেগবান্ তুরস্কের উপর যোদ্ধা । উদ্যানের মধ্যে উচ্চ মুরচার উপর নহোবত ।

ছাউনির বাহিরে মাঠ । মাঠের উত্তর পার্শ্বে এক বড় রাজ্য চন্দ্রাতপটাক্সন হইয়াছে । সেটাও অত্যন্ত উচ্চ ! সেখানে সিংহাসন নাই, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড রৌপ্যখচিত চৌকি পড়িয়া আছে । তাহার দুই পার্শ্বে আরও দুইটা চৌকি । সেখানেও পাহারা, কিন্তু তাহারা অঝোরোহী নহে । চন্দ্রাতপের সম্মুখে মাঠের দিকে এক বড় ধ্বজার (৬) প্রশস্ত নিশান উড়িতেছে । ধ্বজার নীচেই এক জন অঝোরোহী । ছাউনির মধ্যে সৈন্তেরা কেহ বৃষ্টি পরিয়া, কেহ বা শুষ্ক পায় জামা, কেহবা উলঙ্গমুণ্ডে, এক তামু হইতে অগ্ন তামুতে, কাহার কি প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে ।

এখান অমাত্যের তাম্বুর একটি দ্বার,—দ্বারটি প্রহরীদ্বয়রক্ষিত । দূরে একটি তেরি ও বর বর করিয়া তাসা বাজিয়া উঠিল । ছাউনির মধ্যে লোকেরা আরও ব্যস্ত হইল, ছুটা ছুটি হুঙ্কি পাইল । এমন সময় অমাত্যের দ্বারে এক জন অঝোরোহী আকারে বোধ হয়, কোন আত্মীর হইবেন, আসিয়া পৌঁছিল । অগ্ন হইতে অবতীর্ণ হইয়া এক জন প্রহরীর

(১) গড়খাই । (২) দুর্গের দ্বারের প্রধান সেতু ।

(৩) বে লকল হস্তি নাম ধরিয়া ডাকিলে উত্তর দের অর্থাৎ স্থানিকৃত ।

(৪) অতি দ্রুতগামী অশ্ব । (৫) বৃহদন্ত হস্তী । (৬) নিশানের দণ্ড ।

হস্তে তাহার বলগা দিয়া, তাম্বুর ভিতর চলিয়া গেল । প্রতি পদে পদে তাহার পার্শ্বস্থিত তলবারী ভূমিস্পর্শ করিতে কেমন অনির্বচনীয় স্রুতান মিষ্টশব্দ হইতে লাগিল । অমাত্য সঙ্গ হইয়া এক চারপাইয়ের উপর বসিয়াছিল । সম্মুখে এক জন বাটার পান লইয়া দাঁড়াইয়াছিল । ঐ আমীরটিকে তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সন্ত্রমে কহিল “এস হজুরমল আমিও প্রস্তুত ।” হজুরমল এক জন পাঠান ধনী ; প্রতাপাদিত্যের রাআ বাস করেন ; পূর্বে দিল্লীখবের অনেক কর্তৃচাৰী ছিলেন, পরে প্রতাপাদিত্য মহারাজের আরাগে ও অনুগ্রহে সহস্র অখারোহীর অধাঙ্ক । হজুরমল যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ঐ চারপাইয়ে বসিলেন । অমাত্য কহিল । “কেমন তোমার সহস্র অখ কি প্রস্তুত হইয়াছে ?”

হজুরমল বলিল । “তাহারা সকলেই প্রস্তুত, আমি তাহাদের ছাউনি দিয়া আসিলাম । দেখিলাম, সকলেই আপন আপন অশ্বের নিকট দাঁড়াইয়া কেহ পান খাইতেছে, কেহ জল ও সরবত পান করিতেছে । তাহাদিগের জন্ত আশাকে কখন মাধা মোয়াইতে হইবে না ।”

অমাত্য কহিল । “আমি তা জানি তোমাকে তাহারা অত্যন্ত ভাল বাসে । যাহাতে তুমি সমুদ্র থাক, তাহারা সর্সদা সেইরূপই অচরণ করে । তুমি কি আমাদিগের সেনা নীর নিকট হইতে আসিতেছ ?”

হজুরমল বলিল । “না আমি বরাবর আপন শিবির হইতে আসিতেছি, কিন্তু বোধ হয় কখনাধ প্রস্তুত আছেন ।”

অমাত্য কহিল । “মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন । তিনি অতি শীঘ্র পুরুষোত্তমে যাত্রা করিবেন । বোধ হয় নৈমন্ত সামন্ত অধিকাংশ রাঙ্গগড়ে রাখিয়া, কেবল তোমার হাজার অখারোহী লইয়া সপ্তাহের মধ্যে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন ।”

হজুরমল বলিল । “গত সন্ধ্যায় রাজার নিকট গিয়াছিলাম ; কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না, শুনিলাম, তিনি অগ্রস্থ আছেন ; তবে আজ কেন সৈন্ত লেখেন বলে আদেশ বেরুলো ?”

অমাত্য উত্তরিল । “রাত্রি আমি যখন রাজসম্মুখে গেলাম, তখন মহারাজ কহিলেন, ‘বিজয়কৃষ্ণ ! আর এখানে থাকা কর্তব্য নহে, চল, যে উদ্দেশে যশোর হইতে আসিয়াছি, সেখানে যাই । পুরুষোত্তম অতি পবিত্র স্থান, তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিব । তাহাতে আমি কহিলাম, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, কিন্তু এত সৈন্ত সামন্ত কোথায় লইয়া যাইবেন ? ইহারা কি যশোহরে ফিরিয়া যাইবে । তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন ‘না, আমি কেবল হজুরমলের সহস্র অখারোহী লইয়া পুরুষোত্তমে যাইব ; তোমাকে সঙ্গে বাইতে হইবে । তোমার পুত্র মালিকরাজ তোমার দুই সহস্র সৈন্ত লইয়া যশোহরে ফিরিয়া যান । কখনাধ অপর সমস্ত সেনা লইয়া রাঙ্গগড়ে আমার প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা

কক্ষ'। আমি বলিলাম, রায়গড়ে যে কুখনাথকে আপনার এত সৈন্ত সমেত থাকিতে कहিলেন, তাহাতে অনঙ্গপাল আপত্তি করিতে পারে। মহারাজ कहিলেন 'কেন আপত্তি করিবে? রায়গড় কি আমার অধিকারের অন্তর্গত নহে? আর অনঙ্গপালই বা কে? আমি তাহাকে রায়গড়ের দেওয়ানি দিই নাই।' আমি বলিলাম, মহারাজ! সত্য আপত্তি তাহাকে দেওয়ানি দেন নাই, কিন্তু রায়গড়ও বহুদিন অবধি আপনার অধীন বলিয়া স্বীকার করে না। আপনার সিংহাসনে অভিষেকের পূর্বে, আপনার খুড়া বনস্ত-রায় মহারাজ রায়গড়ে বাস করেন ও অত্রত্য বর্দ্ধমানাধিপতির দখলের অনেক মহল তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, কতক বা নবাবের অনুমতি ক্রমে, আর অনেক আকবর পাতসাহের ফরমান বলে, দখল করেন ইহাতে মহারাজ कहিলেন 'সে কথা পরে হইবে, এক্ষণে কল্য আমার সৈন্তবল দেখিব; দুই প্রহরের প্রাক্কালে সবলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দাও,' সেই আজ্ঞামত আমরা সকলে প্রস্তুত হইতেছি। তিনি শারীরিক অশুভ আছেন। কিন্তু অতি শীঘ্র বোধ হয় সৈন্তদল দিয়ায় দিয়া পুনঃযোগ্য হইবেন। আমার বোধ হয় তাহার পূর্বে একবার রায়গড়েও যাইবেন ও লক্ষ্মণপুরে বর্দ্ধমানাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যাহা হউক সৈন্ত চালন ও সন্দর্শন মহারাজের ও সৈন্ত-দলের জ্ঞেয়ঃ।

হজুরমল বলিল। 'মহারাজের বর্দ্ধমানাধিপতির সহিত কি কিছু প্রয়োজন আছে? না কেবল আশ্রয়তা প্রকাশ মাত্র।'

বিজয়কৃষ্ণ कहিল। "নিভাত্ত অনাবশ্যক নহে। বোধ হয় কোন প্রয়োজন আছে; তন্নিলাম আরাকানের অধিপতি জাভা তুপুসাম এক্ষণে বর্দ্ধমানের মহারাজের সহিত আছেন।"

হজুরমল বলিল। "বর্দ্ধমানের রাজার আরাকানের রাজার জাভার সহিত কিছু পরামর্শ আছে; নতুবা সেই বা দেন এখনে আসিবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "ঐ নাও স্বর্ধাকুমার আসিতেছে।" স্বর্ধাকুমারের প্রতি।

"এস! এত বিলম্ব কেন?"

স্বর্ধাকুমার বলিল। 'মহাশয়! নমস্কার! হজুরমল যে, তুমি কতক্ষণ? আমি এই তোমার তামু দিয়া আসিলাম, তন্নিলাম তুমি অতি ওলক্ষণ হইল তোমার রাজারের দিকে গিয়াছ। তবে বিজয়কৃষ্ণ! এখনও যে ঘন্ট বদে? রাজার বাহিরে আসিবার কি সময় হয় নাই? এখন যদি না আইসেন, তবে কি বৈকালে সৈন্ত দেখবেন। অন্য-সকল্য সময় চন্দ্র নাই যে জ্যোৎস্নায় আমরা খেড়াইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তা তোমার এত ভাবনা কেন? আর এখনই বা বৈকাল কোথা, সবে এই দেড় প্রহর মাত্র। কই হজুরমলের তো কিছু চিন্তা হতে না।"

স্বর্ধ্যকুমার বলিল। “হজুরমল গাধা চালাবেন, তাতে রাত্রি হইলেই ভাল, আমার তো তা নয়। হজুরমলের মত রাত্রি আমার চক্ষু জ্বল না। প্রহৃত যোদ্ধা কখন অন্ধকারে ঢেলা মারেন না।”

হজুরমল বলিল। “মহাশয়! ববাজীর বড়াইটা শুনলেন। মোটে ঠুঁর গোটা-কতক ছেঁড়া ষোড়া, তারই এত গর্ব।”

স্বর্ধ্যকুমার বলিল। “ছেঁড়া ষোড়া! এঃ, আমার একটা ষোড়ার বল তোমার সমস্ত সহস্র সহ্য করিতে পারে না। সে দিন যখন বসন্তরায়ের বাটা গিয়াছিলাম, তখন কে পেছিয়ে পড়লো। সব ভুলিলে না কি?”

হজুরমল বলিল। “হাঁ সেতো বড়ই বাহাহুরী। আমরাগিরে ষোড়া তো গোসাপ নয়, যে খানের তিতর দিয়ে জলসাতরে রাত্রিকালে যাবে।” (বিজয়কৃষ্ণের প্রতি)
“আপনি সে দিন ছিলেন না। আঃ কি ভয়ানক, যখন মহারাজ আদেশ দিলেন যে অন্যই বসন্ত রায়ের বাটা এই পত্র লইয়া যাইতে হইবে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তাতে কি তোমাদের যেতে হল। কেন পত্র বহাতো সামান্য কাজ।”

স্বর্ধ্যকুমার বলিল। “না মহাশয়! মে বড় সামান্য কাজ নয়। যেতেন ছোটের-টাতে। মহারাজ বসন্তরায়ের বাটা হইতে যে দিন ফিরিয়া আসিলাম, সেই দিন রাত্রি আড়াই দণ্ডের সময় আমাকে ও ঐ যোদ্ধা মশাইকে (বলিয়া হজুরমলের প্রতি ইঙ্গিত) ডাকিয়া কহিলেন ‘তোমরা দুইই আমার প্রিয়পাত্র। তোমাদের দ্বারা একটি কর্ম সমাধা করিতে চাহি, প্রস্তুত আছ?’ ইহাতে হজুরমল কহিল ‘আপনার কর্মে আমরাগিরকে কবে অপ্রস্তুত পাইয়াছেন? আজ্ঞা বলুন।’ আমি বিস্তৃত মুখে পো দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরে মহারাজ আমরাগিরকে উত্তরকে বসিতে বলিয়া কহিলেন ‘দেখ আমি তোমাগিরকে যে কর্ম নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা আপাততঃ সামান্য লোকের কর্ম বোধ হইবে, কিন্তু ফলে তাহা মহে’ হজুরমল বলিল ‘মহারাজ? তাহার এত ভূমিকার প্রয়োজন কি, আপনার আজ্ঞায় বৈধাঐব আমরা কখন বিচার করি না—ও আপনার রাজ্যের অতিরিক্ত কোন কর্মই করি নাই। তবে কেন এ সকল বিবরণ? মহারাজ কহিলেন, ‘আমি তা জানি কিন্তু এ সকল না বলিলে আমার মন সুস্থির হয় না—ইহাতে কিছু তোমাগিরের মানে খর্ব করিয়াম না, হজুরমল কহিল “আজ্ঞা করুন” রাজা বলিলেন ‘মহারাজ বসন্তরায় খুল্লাভাতের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতী বিমলা মাতার অভ্যস্ত অসুখ হইয়াছিল। আমি যখন ব্রাহ্মণ হইতে আনি, তখন তিনি আমাকে আমার নিকটস্থ সৌগন্ধ্যার রায় মহাশয়ের ঔষধ পঠাইতে অনুরোধ করেন। আমি সেই

ঔষধ তোমাদের দ্বারা পাঠাইতে ইচ্ছা করি । ঔষধের সহিত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা পত্র দিব, তাহা খড়ী ঠাকুরাণীর হস্তে দিবা, তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা অবিচারে পালন করিবা । পথ অত্যন্ত দুরূহ, সাবধানে যাইবা, কল্যাণেতে তাঁহার অনুমতি লইয়া যত শীঘ্র পার আমাকে সমাচার দিবা । ইহাতে তোমাদিগের কি মত ? মহা-
রাজের কথা সাদ্র না হইতেই হজুরমল কহিল ‘মহারাজের ইচ্ছাই আমাদের কর্তব্য করিবার প্রশংসা, ইহাতে আমাদের মতামত নাই ।’ মহারাজ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ‘কেমন শূর্য্যকুমার তুমি কি বল ?’ শূর্য্যকুমার কি বলিবেন তাহারা স্থির করিতে না পারিয়া, কহিলেন যতদূর পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সহিত সঙ্গত হয় ও শূর্য্যকুমারের নিজের স্বার্থের প্রতিচ্ছন্দ না হয় ‘শূর্য্যকুমার মহারাজের আদেশ ততদূর অতিক্রম করেন না ।’ মহারাজ কহিলেন ‘তোমার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না । আমি যাহা কহিলাম তাতে তোমার ধর্ম্মের কিসের বিরুদ্ধ হইল । তুমি কি আমার বিজ্ঞভোগী নও ?’ আমি মহারাজের এই কথায় কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম, ‘মহারাজের কিসে আমি বিজ্ঞভোগী ? মহারাজ আমার কিছু অভিশিলাল অন্নদান করিতেছেন না ! মহারাজের দ্বারা আমি ক্ষিপ্ত নহি । মহারাজ পূর্ব্বপুরুষদিগের রাজ্য আমার অজ্ঞানাবস্থায় বলে অধিকার করিয়াছেন, আবার এক্ষণে আমি মহারাজের একজন সৈন্তাধ্যক্ষ বলিয়া আমাকে কিছু জায়গীর দিতেছেন ।’ রাজা বলিলেন ‘আমি ত তোমাকে জায়গীর দিতে বাধ্য নহি । তাতে আবার তুমি যেক্রম সৈন্তাধ্যক্ষ তোমার পদোপযুক্ত জায়গীর হওয়া কর্তব্য । তুমি দশজন অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ, তোমার এক শত দিবা জায়গীর বিধেয় । আমি কিন্তু তোমাতে অনুগ্রহ করিয়া দুই শত গ্রাম দিয়াছি । তাহাতেও তুমি অসন্তুষ্ট ?’ আমি কহিলাম, মহারাজ ! দিল্লীখর যদি আপনার ছত্রনগ বলপূর্ব্বক লইয়া তাহার পরিবর্তে সহস্র গ্রামের জায়গীর দেন আপনি কি তাহাতে সন্তোষ হন ।’ আমার সহিত এইরূপ বাকবিতণ্ডা হইতে হইতে মহারাজের ক্রমে চিন্তা-চাক্ষুঃ ক্রুদ্ধ হইলেন । ‘আমি তোমাকে রাজ্যচ্যুত করি নাই । তোমার পিতার বাল হইলে, তুমি বালক, রাজ্য-শাসনে অক্ষম, তোমার রাজ্যে অনেক বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল, তোমার রাজ্যে এমন লোক ছিল না যে, সে সকল উপদ্রব দমন করে । দেশের হিতসাধন উদ্দেশে তোমাকে শিক্ষালানান্তিলাষে স্বয়ং তোমার রাজ্যভার লইয়া শান্তি রক্ষা করিলাম । তোমাকে শিক্ষা দিলাম । অবশেষে অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে দুই শত গ্রামের অধিকারী করিলাম । ইহাতেও তুমি অসন্তুষ্ট ! রে কুত্তর ! হরচার, আমার সম্মুখ হইতে বহিষ্কৃত হও ।’ বলিয়া চক্ষু হুটি রক্তিমাবর্ণ করিয়া বর হইতে উঠিয়া গেলেন । হজুর-মল কাঁঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিল । কোপে আমার অধর কাঁপিতে লাগিল, আমি অন্ধকার দেখিলাম । কণেক পরেই প্রতাপাদিত্য আবার ঐ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হজুরমলকে

‘ধয় এই ঔষধটি নাও, এই পত্রটি বিমলাদেবীর হস্তে দিবে, বলিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।’

বিজয়রূক্ষ বলিল। ‘তোমাদিগের এত হাঙ্গামা হইয়াছিল তা আমিও কিছু ভূমি নাই। তার পর?’

স্বর্ধাকুমার বলিল। ‘কেন হজুরমল রাজপত্র ও ঔষধ লইয়া আপন শিবিরে আসিয়াই গমনের উদ্যোগ পাইলেন। আমি সেই সবেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক একবার আমার জীবনে ঘৃণা হইতে লাগিল ও এক একবার প্রতাপাদিত্যের উপর ক্রোধ জন্মিতে লাগিল। আমার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার ছাউনি ত্যাগ করিয়া যথেষ্ট গমন করি। কখনও দিল্লীখরের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, আপনার রাজ্যে যাই ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে ডকাইয়া তাহাদিগের নিকট আমার জীবন সমর্পণ করি। তাঁহারা আমার পিতার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া অবশ্যই আমার প্রতি দয়া করিবে ও আমাকে পুনর্বার সিংহাসনাভিষিক্ত করিবে। প্রতাপাদিত্যের সেবাপেক্ষা বাদশাহ সন্নিধানে যাওয়া হীন কর্ম্ম জ্ঞানে সে মনঃপ্রাণ ত্যাগ করিলাম। যবনের উপর আমার জনমানষি আত্মক্রোধ ছিল। (হজুরমল তুমি রাগ করিও না) প্রতাপাদিত্যের দৌরাত্ম্য আমার শতগুণে ভাল জ্ঞান হইল। এইরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আমি একা সেই সবে, করে নিক্ষেপিত অসি লইয়া পদচালন করিতেছিলাম, এমন সময় প্রতাপাদিত্যে সেইখানে আসিয়া আমার স্বকদেশে হস্তক্ষেপ করিলেন। ও কহিলেন। ‘স্বর্ধাকুমার, বালস্বভাব-মূলভ উগ্রতা ত্যাগ কর। পুংস্কের কথা বিস্মৃত হও। আমি কিছু তোমাকে স্পীড়া দিতে ক্রোধকল্প বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমি তখন কেমন হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইলাম। ভুল করি নাই। এখন তোমার নিকট অপরাধী।’ মহারাজের এইরূপ বিনীত বাক্য শুনিবামাত্র আমার সমস্ত মন পরিবর্তিত হইল। আমি আপনার অদৃষ্টকে দৃষ্টিলাম ও আমার বালককালের স্নেহ ও অনুগ্রহগর্ভ আবেদন ও বাক্যসকল স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতে লাগিল। কহিলাম, ‘মহারাজ! আমার অপরাধ হইয়াছে আমি অকারণ মহাশয়কে অবমাননা করিয়াছি, ক্ষমা করুন।’ মহারাজ আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, ‘স্বর্ধাকুমার! তুমি আমার শ্রিয়পুত্র, আমি তোমার অপরাধ দেখি না। তোমার রাগের কারণ আছে, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুদ্র হইও না। তোমার মঙ্গলচিন্তা আমার নিত্য লক্ষ্য। বীরবংশে মিথ্যাছ। বীরস্বভাব বশত আপন রাজ্যলাভে যত্ববান হইয়াছ বলিয়া, আমি সন্তুষ্ট বই অস্বার্থী নহি। তোমাকে আমি অপত্যবাৎসল্যের অধিক স্নেহে পালন করিয়াছি, অতএব ইচ্ছা করি, তুমি শীঘ্র কিরীটী হও। আমি মহারাজের চরণধর মস্তকে রাখিতে গেলাম। মহারাজ আমাকে উঠাইয়া, বসিতে বলিলেন ও আপনিও বসিলেন। আমি

বলিলাম, ‘মহারাজ! আমাকে অচেতন মাংসপিণ্ড হইতে এত বড় করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন, সর্বদা স্বত্রে রাখেন, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি এক্ষণে আপনায় কণ্ঠে যাই। আপনার ঔষধের নাম শুনিবামাত্র কেমন আমার মনে অনির্বচনীয় ঘৃণা উপজিল; তাহাতে আমি আপনাকে অযোগ্য রুঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। অত্যাচারণ করিয়াছি, এখন জ্ঞান হইতেছে।’ এই বলিয়া আমি দ্রুতপদে গৃহ হইতে নির্গত হইলাম। মহারাজ ঐশ্বর তোমার মঙ্গল করুন’ বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। “তোমরা যে অতি সামান্য কথায় বৃত্ত ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিলে। কি আশ্চর্য! দিন যায় তো ক্ষণ যায় না।”

হজুরমল বলিল। “মহাশয়! সে দিন যদি স্বর্ধকুমারের মূর্ত্তি দেখিতেন। স্বর্ধকুমার যেন প্রকৃত স্বর্ধের স্থায় তেজস্বী হইয়াছিলেন। গতিকে আমি বোঝ করিয়াছিলাম, বুঝি স্বর্ধকুমার হইতে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐশ্বরের অভিক্রটি।”

বিজয়কৃষ্ণ হাসিয়া চারপাই হইতে উঠিলেন ও বলিলেন। “চল একবার রাজ-শিবিরে যাই।” স্বর্ধকুমার ও হজুরমল তাহার অনুগমন করিল। শিবিরে মহারাজ এখন আসেননি দেখিয়া তাহারা আবার চলিল। কিছু পথ যাইয়া বিজয়কৃষ্ণ স্বর্ধকুমারকে কহিল। “তোমার ঘোড়ার বড়াই কি হলো?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “হাঁ আমি রাজস্বার হইতে বাহিরে আসিয়া আমার শিবিরে যাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া হজুরমলের নিকটে গেলাম। দেখি মিয়াসাহেব বসিয়া চা খাইতেছেন। বিবিজান পাশের ঘোড়ায় বসে ষাড় ছেঁট করে অছেন। মিয়াজি নিতান্ত উদাস। আমি যাইতেই কহিলেন ‘স্বর্ধকুমার তুমি ভাল বলিয়াছ। রাজার কিছু বিবেচনা নাই। এই অন্ধকার রাত্রে জলা দিয়ে পত্র লইয়া যেতে হবে। কেন আমি কি পত্রবাহক। মহারাজের এত পত্রবাহক থাকিতে আমাকে পাঠন কি বিবেচনার কাৰ্য? আমার হাজারেরা আর আমাকে মানিবে না। আমি যাইব না, ঐ চিঠি, আর একজন সোওয়ার দিয়া পাঠাইব কি বল?’ আমি বলিলাম, কেন অন্ধকারে কি তর হইল? না বিবির অনুমতি হল না। বিবিজানকে ছেড়ে যেতে বুঝি ইচ্ছা হচ্চে না ভাল, তর কি, তুমি যাও, আমি বিবিজানের পাহারায় রহিলাম।’ হাজারাবাক বলিলেন। (হজুরমলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোষা কহিবেন না।) ‘তোমার সকল সময়েই তামাসা, ঐ তামাসার গোষে তখন ধমক খাইয়াছ। কিন্তু তুমি অত কঠিন কঠিন বলিলে কেন? তোমার কি সাহস! মহারাজ যত বলিতে লাগিলেন, তুমি ততই ফুলিতে লাগিলে।’ আমি বলিলাম, ‘হজুরমল এখন যাইবে, কি না, কি স্থির করিলে!’ হজুরমল বলিলেন। ‘আমি যাইব না; অথচ মহারাজের কর্তব্য সমাধা করিব। হেঁকুমতে মারিব। এক জন চাষা লোককে পাঠাইব। আর কাল প্রাতে মহারাজের নিকট তাহার সমাচার

লইয়া বাইব।’ আমি বলিলাম, সেটা ভাল হয় না। মহারাজ অন্য লোক দিয়া পত্র পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তোমাকে পাঠাইবার কোন বিশেষ কারণ থাকিবেক। অতএব তুমি যাও। আমি শিবিরে থাকিব। বিবিকে লইয়া আমোদ প্রমোদে রাত্রি কাটাইব। বিবি এক দণ্ডের তরে তোমার অভাব জানিতে পারিবেন না।’ বিবিকে কহিলাম। কি বলেন বিবিজান! বিবি হাসিয়া উত্তর দিলেন। ‘তাহাতেই বা ক্রটি কি?’ আমি বলিলাম। তবে আর কি। হজুরমল! উঠ পোষাক লও, চাহ তো সঙ্গে এক জনা অখারোহী লইয়া যাও, আমি বিবির এই খানেই রহিলাম। বিবিজান পোলাও ছকুম দিবেন। বিবি কহিলেন ‘স্বর্ধকুমার। তুমি যদি আমাদের পোলাও এক দিন খাও, তবে আর কখন এরূপ উপহাস করিবে না।’ আমি বলিলাম ঠিক বলিয়াছ, তোমাদিগের পলাতনগন্ধি পোলাও খাইলে আর কথা সর্বে না, তার কি?’

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তুমি কি কখন পলাতন খাও নাই?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “আপনার মহারাজের অন্তঃপুরে কি পলাতন বায়, যে একথা আমার জিজ্ঞাসা করিলেন?”

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। “কেন তুমি কি অল্প কোথাও ভোজন কর নাই?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “ঠেক, আপনি ও কখন নিমন্ত্রণ করেন নাই?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল “ভাল তার পর?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “তার পর হজুরমল বলিল ‘উপহাস ত্যাগ কর, একশকার উপায় কি?’ আমি বলিলাম কেন, তুমি যাও না? তাহাতে হজুরমল বলিল ‘আমি তা পারিব না’, আমি বলিলাম, তবে কেন রাজ-সমীপে স্বীকার পাইলে, স্পষ্ট বলিলে তিনি কিছু মাথাটা কাটিয়া কেলিতেন না। হজুরমল বলিল। ‘সে যা হবার তা হইয়াছে, এক্ষণে কি করা যায়।’ আমি, বলিলাম, চল আমিও বাইব। হজুরমল কিছু আনন্দিত হইল ও মুখ তুলিয়া বলিল। ‘সত্য? তবে ভাল হইল, তুই জন পরস্পরের রক্ষা করিব।’ আমি বলিলাম সে বিবেচনা পরে হইবে; এক্ষণে উঠ। হজুরমল বিবির নিকট বিদায় লইয়া গাজোখান করিল। উভয়ে অখারোহী হইয়া ঔষধ ও পত্র লইয়া ছাউনীর বার হইলাম। বাহিরে বাইরা হজুরমল বলিল ‘তুমি মত কিরাইয়া ভাল করিয়াছ। রাজা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী; তোমাতে অত্যন্ত যত্ন করেন। তাঁহার মতামুযায়ী হইলে তোমার কুল হইবে।’ আমি বলিলাম, যাহা হউক তাঁহার মতের বৈপরীত্যচরণ আমার কর্তব্য নহে।

“এইরূপ কথা বার্তা হইতে হইতে আমরা উভয়ে রাজমার্গ দিয়া, অতি বেগে পার্শ্ব-পার্শ্ব করিয়া চলিলাম। রাত্রি যখন দেড় প্রহর, তখন আমরা পলায়নপূর্ব্বক মাঠে নামিলাম। মিথিড় অন্ধকার, গ্রীষ্মকাল—এক স্পন্দমাত্র বাতাস নাই, শব্দ নাই, সেই

জনশূন্য-মাঠে কেবল আমাদিগের অশ্বের পদাঘাত শব্দ। যাকে যাকে শূন্যল কুকুরের
 ভীষণ ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। কি ভয়ানক শব্দ! মনে, হইলে হৃৎকম্প
 হয়। আমি মনে ব্যস্ত-শ্রীকার করিয়াছি, তাহার বোর-গভীর বজ্রাঘাত-শব্দ শুনিয়াছি,
 তাহার বিকট সম্ভার তুল্য মুখে কঠিন অর্গলসম দংষ্ট্রা দেখিয়াছি। আমার হস্ত স্পন্দমাত্র
 হয় নাই, আমার বাহর শিরা শিথিল হয় নাই। আমি স্থিরসন্ধানে তাহার অগ্নিকুণ্ড
 চক্ষুর্দ্বয় শব্দে ভেল করিয়াছি। আমি মদমত্ত বাহবের পর্বতগুহাভ্যন্তর ভীমনিদানে, অকৃতো-
 ক্তরে তাহার শুণ্ড ধারণ করিয়া ভেগা দিয়া ছেদন করিয়াছি। মুহূর্তের অন্ত চকল হই
 নাই। তাহার গিরিরাশিশূন্য-তুল্য দর্শন ও অনাগাস-সিংহস্বরম্বাধী ভীষণস্তম্ভাকার পালো-
 ভোলনে তাহা শেলবিন্দু করিয়া আমার মস্তক হইতে অংশুত করিয়াছি। আমি অস্ত্র-
 শিকারার্থে যখন পশ্চিমরাভ্যে গিয়াছিলাম, তখন আকবর সম্রাটের সেনাপতির অনৈ-
 সর্গিক তুমুল যুদ্ধ ও যুগহৃদয় অশ্রুদগারক বিকট-বজ্রপাতাধিক পঁচিশ তোপধ্বনি
 এককালে শুনিয়াছি; তাৎকালে ধরা কাঁপিয়া উঠিয়াছে ও পর্বতাহি পাতিত হইয়াছে,
 কিন্তু আমার উৎসাহ বৃদ্ধি বই আর কমে নাই। আমার ওষ্ঠ তাহাতে কাঁপে নাই
 ও চক্ষুর নিমেষমাত্র পড়ে নাই। কিন্তু বিজয়কৃৎ! হজুরমলকে জিজ্ঞাসা কর,
 সেই জনশূন্য নিরস্ত্রাকার-মাঠে ভয়াবহ অথচ দুঃখপ্রকাশক স্বারোহণ কি প্রকার।
 আমি বলিতে ভয় করি না, কিন্তু সেই শব্দ, সমুদ্রের ধ্বনির মতম বিতীর্ণিক।
 দেখাইয়াছে। আমার কর্ণকুহরে কি প্রবেশ করিয়াছে! আমার হৃৎকম্প হইল।
 আমরা দুই জনে শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদিগের মন শূন্য হইল। অব কর্ণবর
 উচ্চ করিল। তাহার স্বাক্ষর কেশরগুলি শব্দকর্ষের মত উর্জিত হইল। অববর
 পুচ্ছ তুলিয়া, কলিয়ার ভিতর হইতে বর বর করিয়া শব্দ করিল। বল্লা মালিন লা।
 চায় পা তুলিয়া এমনি যেহিসাবে দৌড়িতে লাগিল যে, প্রতিপদেই আমাদিগের
 বোধ হইতে লাগিল ঠিকুরিয়া পড়িব। আমরা পদবর অশ্বের পার্শ্বে বদ্ধ করিলাম
 ও নিত্যন্ত অধৈর্য হইয়া অশ্বগ্রীবা ধারণ করিলাম। কিছুদূর গমনে অশ্বের গ্রীবা
 ত্যাগ করিয়া বল্লা ধারণ করিয়া তাহার বেগ সংবত করিতে চেষ্টা করিলাম।
 চতুর্দিকে দেখিলাম যে কোন্ দিকে যাইতেছি। অন্ধকারে নিকটে পোল ও ঘাসের
 জাদাল দেখা গেল। অশ্বের বেগ সংবত করিতে করিতে অববর খালের জলে দিয়া
 কাঁপ দিল। অমনি আমরা উভয়েই অববরের সহিত জলে ডুবিলাম। মুহূর্তে
 জীবনাশ ত্যাগ করিলাম। হতাল হইয়া অচেতন রহিলাম। ধন্ত যে অব। তার
 পরকণ্ঠেই দেখিলাম আমরা সেই দুঃখ খাল পার হারির জাদালের উপর। চতুর্দিকে
 নিরীক্ষণ করিলাম। স্থিরবোধ হইল না যে রায়গড় বামে, কি দক্ষিণে। বহুকণের
 পথে বামে দৃষ্টি দীপালোক দেখিয়া নিশ্চয় করিলাম, যে রায়গড় বামেই অট।

অমনি সেই দিকে ধাবমান হইলাম। কিছুদূর পূর্বমুখ বাইতে হজুরমলের অৰ্ধ দক্ষিণদিকে কোঁক দিয়া এককালে জাঙ্গাল হইতে নামিল। ধাতুক্ষেত্রে নিম্না পড়িল। যদিচ জ্যৈষ্ঠমাস, সে ক্ষেত্রে তখন মাত্র প্রায় দেড়হাত জল ছিল। জলে পড়িয়া হজুরমলের অৰ্ধের পা আর কোনমতে উঠিল না। বত চেষ্টা করে, তত প্রতিপদেই অধিকতর পা বসিয়া যায়। হজুরমল বলিল ‘স্বর্ঘ্যকুমার আমার অৰ্ধ আর চলিবে না। বেল্লশ পাঁক, আর বোধ হয় কিছুদূর যাইলে বসিয়া পড়িবে।’ আমি হজুরমলের কথা শুনিয়া, আমার অৰ্ধকে চলিতে দেখিয়া তাহার অৰ্ধ চলিতে পারে জানে সেই দিকে অৰ্ধ চলাইলাম। আমি অগ্রসর হইয়া হজুরমলকে তাহার অৰ্ধ চলাইতে কহিলাম। হজুরমলের অৰ্ধ আমার অৰ্ধের পশ্চাৎবর্তী হইয়া অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিছুদূর বাইয়া জ্ঞাত হইয়া দাঁড়াইল। পরে আমি আপন অৰ্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হজুরমলের সাহায্যে তাহার অৰ্ধকে সে পাঁক হইতে বহির্গত করিলাম। কিছুকণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিলাম। পরে উভয়ে রায়গড়াভিমুখে পুনরায় অখাগোহী হইয়া চলিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের পর রায়গড়ের দ্বারে উপনীত হইলাম।”

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। “তোমরা কখন ফিরিলে।”

স্বর্ঘ্যকুমার বলিল। “আমি পত্র ও ঔষধ দিয়া রাণী বিমলার উত্তর লইয়া এক-প্রহর রাত্রি থাকিতে রায়গড় হইতে বহির্গত হইলাম। হজুরমল রাণীর অনুরোধে কলে তিনদিন তথায় বাস করিল ও তৃতীয়দিনের বৈকালে যমুনা পরাইয়ে মহারাজ বসন্তরায়ের মৃত্যু সংবাদ আনিল। বসন্তরায় কি রাজাই ছিলেন। যেমন দেখিতে ত্রীমান বীর, তেমনি জ্ঞানে ও বিদ্যায় জগজ্জয়ী পণ্ডিত। আমাকে কত যত্নই করিলেন। আমি প্রতাপাদিত্যকে উত্তর দিতে চলিয়া আসিলাম।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আমি বসন্তরায় মহারাজকে বেশ জানিতাম ও তাঁহার নিকট ছুই বৎসর কর্ম করিয়াছিলাম। প্রতাপাদিত্য তখন যুবরাজ। তাঁহার তুল্য রাজকর্মে নিপুণ রাজা! আর দেখিব না। তাঁহার শাসনে বশোহর ইন্দ্রপুরী হইয়াছিল।”

স্বর্ঘ্যকুমার বলিল। “আমার পিতার কথা কতই জিজ্ঞাসা করিলেন ও বহুমতে তাঁহার চরিত্র প্রশংসা করিয়া অবশেষে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কতই খেদ করিলেন। মহাশয়! কি আমার পিতাকে দেখিয়াছিলেন।”

হজুরমল বলিল। “বিজয়কৃষ্ণ বোধ হয় দেখেন নাই; কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখি-রাছি। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি বলিতে কি, পরাজিত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার নিকট পরাজিত হওয়ার মান বুদ্ধি ব্যতীত অপমানের কথা নহে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আমি দেখিনাই ব.ট কিন্তু তাঁহারও রাজ্যপ্রাণীর অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। হজুরমল! তুমি তাঁহার সহিত কবে যুদ্ধ করিলে?”

হজুরমল বলিল। “কেন আমি যখন নবাব কুতুব কুলিয়ার অধীনে সেনাপতি ছিলাম। তখন তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করি।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “হাঁ যে যুদ্ধে দেও-আফগান বড় রবী বলিয়া গণ্য হয় ও বাহাদুর হইতে খেলাত পায়।”

হজুরমল বলিল। “হাঁ”।

এই কথা শুনি হইবার পূর্বেই তাহার ছাউনির বাহিরে আদিল' রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া কথা হইতেছিল। কথাবসানে দ্বারে প্রবেশ করিল। ছাউনিতে যন যন তুরী বাজিতে লাগিল। সেনাপতিরা আপন আপন সৈন্য একত্রিত দেখিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় ।

“পশ্চে নৃপো হস্তিহথাধিপত্যং সামুদ্রিকং বোধগবৎ পৃথক্ চ।”

রাজ দ্বারে পলাশটি হাতি সমাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের গলে রৌপ্য-খচিত বশ্টাশালা। মস্তক খড়ি দেখা যাইতেছে। কর্ণধর সিন্দূরলিপি ও কুন্তলর মধ্যে এক প্রকাণ্ড সিন্দূর ফোটা। পুষ্ঠের উপর দেহোপযোগী আবাড়ি (১) বন্ধনরজ্জুলি রক্তবর্ণ। স্বকের উপর খর্ষপ্রাণ মাজত। তাহার হস্তে বন্দণ স্বরূপ বক্ষ অঙ্গুল। আশাড়ির উপর চারিজন করিয়া সমাজ যোদ্ধা। কোন হস্তীর গলদেশে একটা প্রকাণ্ড বশ্টা, হস্তীর গলচাপনে দৃষ্টেন্দ্রী মিনাদ করিতেছে। হস্তিলিপি হুইশ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্বারের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরে চক্রবর্ত্যযুক্ত প্রায় দুই শত রথের মেইনাল দুই পঙ্ক্তি। তাহার পরে সহস্র অশ্বারোহী। এসবলের পশ্চাৎ পাঁচ হাজার পদাতি। যাবো যাবো এক একটা শিশান উড়িতেছে। অন্তরে থাকিয়া একদল বাদ্যকারেরা তুরী, ডেরী, জয়ঢাক লাগরা প্রভৃতি বসন্ত জয়বাদ্য বাজাইতেছে। দ্বারের অনতি দূরে হস্তলিপি প্রভৃতি রাজচিহ্ন। একজনর হাতে একটি রূপার দ্বাণ্ডিতে ব্রহ্মের শিশান, তাহে পারস্ত শিল্প বক্ষর করির কাষে লেখা। আর একজনের হাতে

রূপায় বড় পানপত্রাকৃতি বিচিত্র অভয় । ঘরের সমুখেরে একটি উচ্চ বেতবর্ণ অথ ।
 তাহাতে লাল রক্ত শোভা সম্পাদন করিতেছে । অথের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ । তাহার থলীন
 (২) সোণায় ও বলগা জরির । রেকাব রূপায় । অথটি অত্যন্ত তেজস্বী । প্রীতি বস্ত্র ।
 কর্ণবস্ত্র উচ্চ । পদবিক্ষেপে ধরা ধমন করিতেছে । অথের বলগা ধরিয়া এক জন
 হুসজ্জিত রাজপুরুষ দাঁড়াইয়াছে । তাহার বামদিকে আর একজন একটা বর্ণ বস্ত্রে
 প্রোক্ত রেসমের পতাকা ধরিয়াছে । পতাকার মধ্যস্থল হৃদয়চিহ্ন । সকলেরই বাম
 কটি হইতে সর্বোচ্চ তীক্ষ্ণ বস্ত্রগুলি ঝুলিতেছে । মাঝে মাঝে এক জন উচ্চপদাভিষিক্ত
 অথারোহী প্রেরণের মধ্যস্থ পথ ধরিয়া বাতায়ন করিতেছে । সেতুর উপর উঠিলে
 তাহাণের শোভা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে । সেপাণ্ডিত্তে শব্দমাত্রটি নাই ।
 সকলে নিস্তব্ধ । কেবল মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষ অথারোহীর তুরাধ্বনি । ঘরের ভিতর
 রূপায় আশা ও মোটাধারী বিশ জন দাঁড়াইয়া আছে । তাহার পার্শ্বে শট্টকা ধরিয়া
 একটি সুবেশী হুন্দর বালক দাঁড়াইয়া আছে । তাহার পার্শ্বেই আর দুইটি বালক
 বেতচামরবারা । তাহারাও হুন্দর ।

কিছুক্ষণ পরেই দুইটি তোপের শব্দ হইল । অমনি সকলে নিধান ধরিয়া ঘরের
 দিকে দৃষ্টি করিল । তুরী রাজঘর হইতে বাজিলে দূরস্থ বাদ্যকরেরা স্থির হইল !
 ঘরস্থ পতাকাধারীরা পতাকা উঠাইতে লাগিল । ক্রমে শেষ পতাকা উঠাইলেই অমনি
 দুটি তোপের শব্দ এককালে শুনা গেল । আবার দুটি তোপ । আবার দুটি । ঘরস্থ
 হস্তধারী হস্তে উচ্চ করিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল । আবার দুটি তোপ । জোড়ার
 উপর ওড়না গায়ে, মাথায় পাগড়ি, পায়ে লেগেটা জুতা পরা নকীব (২) বামহাতে
 কামাল লইয়া বাহির হইল । আবার দুটি তোপ । তুরী বাজিল । নকীব ফুকারিতে
 লাগিল ।

“বশোরনগর থাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
 মহারাজ বঙ্গ কায়স্থ ।

নাহি মানে পাতসার, কেহ নাহি আঁটে তার,
 ভয়ে বড় ভূপতি ঘরস্থ ।

বরপুত্র তবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
 বাহার হাজার বার ঢালী ।

যোদ্ধা হলকা হাতি, অযুত ছুরঙ্গ সাত্তি,
 যুদ্ধকালে সেপাণ্ডি কালী ॥”

নকীব খামিল । অমনি আবার দুটি তোপ । তাহার পরেই দুই জন সর্পের আশা ও সোঁট। লইয়া বার হইতে বাহির হইল । তাহার পরেই দুই জন স্বর্ণশেলধারী । আবার দুটি তোপ । তাহার পরেই প্রভাময় সমপ্রভা অত্যন্ত বলবানু তেজসী ভীষণাকার প্রতাপাদিত্য সৈন্তদলের দৃষ্টিমণ্ডলে উদ্ভিত হইলেন । বান্যকাহেরা ভাল পরিবর্ত করিল । “জয় প্রতাপাদিত্যের জয়” বলি সৈন্যেরা এককালে শব্দ করিয়া উঠিল । জয়ধ্বনি গগন স্পর্শ করিল । সৈন্তেরা জয়ধ্বনি করিয়া আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া একবার শিরোদেশে উঠাইয়া এককালে ভূমিতে ঠেকাইল । অরক্ষণালেন এক আশ্চর্যজনক উদ্ভাসিত হইল ও বক্রবৃদ্ধের অরক্ত রক্তে অলগ্না উঠিল । আবার দুটি তোপ । হস্তীর উপরস্থ ষোড়শা আপন আপন তুরী বাজাইল ও মাছের অক্ষুণ্ণভাবে হস্তীগুলি শুণ্ডগুলি মাথার উপর উঠাইয়া গর্জন করিল । শারদজলধেরই বাকি গর্জনে । গর্জনে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল । মহারাজ শুভবস্ত্র পরিয়াছিলেন । মহারাজের উকীষ শুভ্র, শুভ্র অর্থে একলক্ষ আয়োজন করিলেন । রাজপুরুষ মহারাজের হস্তে বল্গা তুলিয়া দিল । অশ্বটী ত্রীবা আরও বক্র করিল । দক্ষিণকা চক্ষু করিতে লাগিল, শব্দনিষ্ক্ষেপে ধূলি উড়াইল ও আগে আগে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল । সৈন্তেরা পূর্ব্বার জয় উচ্চারণ করিল । আবার দুটি তোপ । বান্যকাহেরা জয়বাদ্য বাজাইল । হস্তী গর্জন করিয়া উঠিল । ষোড়শা তুরীধ্বনি করিল । এই সকল শব্দে ভূমল হইল । মহারাজ অর্ধে অঘটিত হইয়া পার্শ্বস্থ দণ্ডারমান ফিরিঙ্গি এক জনকে অথারোহণ করিতে ইচ্ছিত বহিলেন । রাজপুরুষ এক জন এক অশ্ব আনিল । ফিরিঙ্গি সেই অর্ধে এক লক্ষ আয়োজন করিল । পরে মহারাজ অধারুত সূর্যকুমারকে বামপার্শ্বে আসিতে ইচ্ছিত করিলেন । সূর্যকুমার ইচ্ছিতমাত্র আপনাব বলবানু অশ্ব রাজপথে লইয়া গেল । ফিরিঙ্গি দক্ষিণে অশ্ব লইল । মহারাজ মধ্যস্থ হইলেন । আবার দুই তোপ । কৃষ্ণনাথ রাজ-সন্নিধানে আসিয়া বঙ্গবিধি আবেদন করিয়া পুনরায় দোড়িয়া অগ্রসর হইলেন । মহারাজের পশ্চাৎ অমাত্য ও অপরাপর আমীরেরা স্ব স্ব অর্ধে আরুত হইয়া রাজাকে অগ্রসরণ করিতে লাগিলেন । রাজা একবার বেগে একবার ধীরে অশ্ব-চালন করিতে লাগিলেন । স্বর্ণ আশা ও সোঁটধারিরা অর্ধে অর্ধে অধারুত হইয়া চলিল । তাহার অর্ধে পতাকাধারিরাও অর্ধে চলিল ও তাহার অর্ধে নকীব এক সাধা টাটু চড়িয়া রুমাল অশ্বের গলদেশে বাধিয় চলিল । বালকস্বর ছোট ছোট টাটু চড়িয়া রাজার পশ্চাতে চামর লইয়া চলিল । ছত্রধারী, অধারুত হইয়া অধারুত পশ্চাতে চলিল । তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে রোপ্য আশা ও সোঁটধারী অর্ধে চলিল । আবার দুই তোপ । সর্বপশ্চাতে দুই শত রাজস্বহরী

রক্তপূত নিকোষিত তলবারী করে অগ্নে চলিল। তাহার পরে এক ছোট হস্তীতে মহারাজের শট্কা লইয়া বালক চলিল। অপর একটা ছোট হস্তীতে তাসুল-বরক্বাহী। অপর একটা সেইরূপ ছোট হস্তীতে রাজার অস্ত্রাস্ত্র ভূত্যাগণ। তাহার পশ্চাতে কুড়ি খানি শিবিকা চলিল। তাহার রক্ষার্থে দুই শত অশ্বারোহীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আবার দুই তোপ। সৈন্যেরা দুই পংক্তি ক্রমে অগ্রসর হইল। মধ্যে কেবল ফাকা জমি প্রায় তিরিশ হিঙ্গ অড়রে বাল্য দল দুই পংক্তি বোণ করিয়াছে। রাজসৈন্য যেন বিগত তুফানের স্থির সাগরোদ্ধির জ্বায় দুলিতে লাগিল। মহারাজের অগ্ন নাচিতে নাচিতে চলিল। মহারাজের বাম পাশের সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গা-কোষ দুলিতে লাগিল। মহারাজ একবার অশ্চালন করিয়া পশ্চিদ্দিক্কার মধ্য দিয়া দৌড়িয়া গেলেন আবার ফিরিঙ্গি ও সূর্য্যকুমার কুড়ি হাত বাইতে না বাইতে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বেগচালনে সৈন্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলেন।

ফিরিঙ্গি বলিল। “মহারাজ আপনার সেনা সব অতি সুশিক্ষিত দেখিতেছি। যেন আমাদের দেশের সেনার মত।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মহাশয় এ সকল মহারাজ বসন্তরাজের কীর্ত্তি। তিনিই এ সকল প্রণালী প্রচুর করেন। ক্রমশঃ তাঁহারই রবশাস্ত্রে ছাত্র ও বুদ্ধবোধলে তাঁহাকে সম্বলিত করিতে ‘রণবীর বাহাদুর’ উপাধি পান।”

ফিরিঙ্গি বলিল। “এতদেশে বর্ত্তমানাবিগত সৈন্যশিক্ষায় পটু স্তানলাম। এক জন আমাদিগের স্বজাতি সৈন্যশিক্ষায় উত্তম বেতন ভোগ করেন।”

সূর্য্যকুমার কহিল। “হাঁ! শুনিয়াছি সে ব্যক্তি এ সকল কর্ম্মে দক্ষ, কিন্তু আপনাদের দেশেও কি এইরূপ লক্ষ্য।”

ফিরিঙ্গি কহিল। “প্রায় এইরূপই বাটে, কিন্তু আমরা যুদ্ধে হস্তী বা রথ লইয়া বাই না। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রথ ব্যবহার করিতেন।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “যক্ষপুত্রের সৈন্য দেখিয়াছেন, সে কি রূপ।”

ফিরিঙ্গি কহিল। “ঐশাণেরও প্রায় এইরূপ, কিন্তু তাহাদিগের হস্তী অনেক ও আশ্চর্য্যসম্পন্ন এত নাই। কেবল সম্ভ্রান্ত দুই ফোঁড়ে আরোহণ ব্যবহৃত হইতেছে। তোমাদিগের তোপ কিছু ঘন ঘন ছেড়া হইতেছে। এত ঘন ঘন আকৃষ্য সম্রটের সৈন্য ছুড়িতে পারে না। তোমাদিগের এক তোপ প্রহরে কতবার ছুড়িতে পারে?”

সূর্য্যকুমার উত্তর করিল। “প্রহরে চারি বার অনায়াসে হয়। কখন কখন ছয়বারও হইয়া থাকে। মহারাজের অনেক তোপ থাকিতে এত নীচ নীচ ছোড়া হইতেছে।”

প্রজাপাদিত্য ফিরিঙ্গির নিবটে অসিদ্ধা কহিলেন। “শিখাষ্টিকি কহিতেছে?”

ফিরিঙ্গি বলিল। “মহারাজের সৈন্যের প্রশংসা করিতেছি।”

মহারাজ বাললেন। “এ সৈন্যসংল ভোগ্যই, ইহার মধ্যে বাহাকে প্রয়োজন হয় সঙ্গে লইবে।”

আবার দুই তোপ।

ইহারা এ রূপ কথোপকথন করিতে করিতে সৈন্যবেষ্টিত হইয়া চলিলেন, ক্রমে দূরত্ব চম্ভাতপের পতাকা দেখা গেল। অন্তর হইতে চম্ভাতপের দক্ষিণস্থ মার্চ কেবল পদ্মতি, রথী, অধারোহী ও হস্তীতে আবৃত। সৈন্যকিরীটের নন হইল, বস্ত্রের বন, হস্তীর ডরক ও রথের ঘূর্ণ। পতাকামেঘে গগন আচ্ছন্ন করিল। বাণ্যে কর্ণধর পুরিষা, উঠিল। সাহস উত্তেজিত হইল। মৃত্যুভয় সংলগ্ন হইতে অপমৃত হইল। সকলেরই নেত্রে উৎসাহ দৃষ্টি হইল। যতক্ষণ ইহারা পদে পদে চম্ভাতপের দিকে বাহিতে লাগিলেন, ততক্ষণ ইহাদিগের মনে অস্ত্র কোন ভাব স্থান পাইল না, কেবল বীরত্ব, বীরবুদ্ধি, শত্রুকর্মই মূল চিন্তা।

চম্ভাতপের পশ্চিম দিকে আর একটি ছোট চম্ভাতপ পড়িয়াছে। তাহার তিন দিকে কানাত, কেবল পূর্ব দিকে চিহ্ন। চিকের ভিতর কতকগুলি আসন পড়িয়াছে। বড় চম্ভাতপের দুই পার্শ্বে দুই হস্তীর উপর নহোবত বাজিতেছে। অপর হস্তীর উপর ডকা। সমুখস্থ প্রকাণ্ড ধ্বজায় রৌপ্যশৃঙ্খলে এক ব্যাঘ্র বাঁধা। ব্যাঘ্রটি ধ্বজার নীচে চার পা পাড়িয়া বসিয়াছে। জিহ্বা বাহির করিয়া নাড়িতেছে। জিহ্বাপুট হইতে বিন্দু বিন্দু বর্ষা পড়িতেছে। ব্যাঘ্রের পূর্বদিকে আটজন প্রায় উল্লস মন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর যেন লৌহনির্মিত, বক্ষস্থল বিশাল ও উচ্চ। বাহমূল কঠিন ও স্বচ্ছ হইতে মাংস-শুদ্ধত্ব বাহির হইয়া বাহমূলকে স্বচ্ছের সহিত দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়াছে। বাহর মধ্যস্থল স্থূল, কবের মাংস সব পাকান। অস্থূলগুলি মোটা। তাহাদিগের মস্তক কেশহীন ও ক্ষুদ্র। স্থানে স্থানে উচ্চ ও নীচ। কটিদেশ ক্ষীণ। উরুদয় অত্যন্ত স্থূল ও মূল হইতে ক্রমে সর হইয়াছে। পা গুলি বাকান। তাহাদিগের কটিদেশে লঙ্গোটা মাত্র আছে। সমস্ত অঙ্গ পূর্ণিলপ্ত। ললাটে চন্দনের ত্রিবলী। কর্ণদ্বয় ক্ষুদ্র ও চেপটা। বাড় ছোট ও মোটা, গৃষ্ঠদেশে কতই টোল খাল। সমস্ত শরীর মাংসের পাকে টোল খাওয়া। তাহারা বুক ফুসাইয়া মুখটা পশ্চাত্তানে ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের পার্শ্বেই আট জন দীর্ঘাকার আজানুলম্বিত যোদ্ধা। তাহাদিগেরও বক্ষস্থল প্রশস্ত, কিন্তু তাহাদিগের শরীর তত স্থূল নহে। পা গুলি সরল ও দীর্ঘ। মস্তকে দীর্ঘ কেশভার। ললাটদেশ হইতে টানিয়া পশ্চাত্তানে ফেলাতে প্রায় স্বচ্ছ পর্ধ্যস্ত ঢাকিয়াছে। এক একটা অপ্রশস্ত রুমালে ললাট হইতে কণা প্র পর্ধ্যস্ত দিয়া পশ্চাত্তানে ফেলিয়া দিয়া। তাহাদিগের হাতে এক একটা গাড়ে আট হাত

লম্বা, পাঁকা, রাস্তা, সরল, গাঁটান বঁশের লাঠি। তেলেতে পাকিয়া চক চক করিতেছে। দূর হইতে বোধ হয় যেন পুরাতন হাতির দাঁতের লাঠি। তাহানিগের দক্ষিণ পাদগুলি কিছু অগ্রসর। মুখ কিছু দক্ষিণ দিকে বঁকন। লাঠি ভূমি তন্ন দিয়া উর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে ধরিত্যাহ। ইহার পর একদল সাটিম্বর শুভ্র বস্ত্র কটি দশে আবদ্ধ। আত্মজ্ঞা অনাগত। মুণ্ডিত মুণ্ড স্বেদ্র অঙ্গুগাঢ়ী কাহার হস্তে শঙ্কর ম'ন্তপুচ্ছের চাবুক-কাহার বা হস্তে কার্পাস বজ্জ' কঠিন নোড়া। পক্ষ্মচী গলং মনোমন্ত মাতঙ্গমুখ বঙ্গীকরণে দক্ষ। ইহানিগের পশ্চাৎ দীর্ঘ সঙ্কটক সাঁড়াশিধারী পৃষ্ঠদেশে লৌহ গোখরপূর্ণ খলি। মস্তমাতঙ্গ বেগ অবরোধে পাশ্প। তাহার পর বজ্রমুষ্টি দল শুভ্র ভৌলীশ অঙ্গুধারী মুণ্ডিত মুণ্ড ও লৌহ তীক্ষ্ণ নখবিশিষ্ট মুষ্টিবদ্ধকর। বোধ হয় যেন প্রকাণ্ড প্রস্তর-ময় পুন্ডলিকা। তাহার পরে ছয় জন ধানুকী। তাহারা প্রায় মল্ল যোদ্ধানিগের মত বরং আরও ধর্ম্ম। কিন্তু তাহানিগের বজ্র প্রশস্ত, বহু মাংসল ও দীর্ঘ। তাহানিগের বাম হস্তে শবীর তুলা দীর্ঘ ধনুক। ধনুকের অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। তাহানিগের পৃষ্ঠে ধরশাণ শর পূর্ণ তুণস্বর। তাহানিগের কটিবন্ধে খড়গ খুলিতেছে। তাহানিগের উকীবে মস্তবশোভা সম্পাদন করিতেছে। উকীষ উপর বন্ধে এক একটি কাকপক্ষ লাগান। তাহার পরে চাতিখনি দুই চক্রে রথ। দুই চক্রের মধ্যগত দণ্ডের উপর আঁটা প্রায় দেড় হাত প্রশস্ত ও আড়াই হাত দীর্ঘ তক্তা। তক্তার মাঁচে হইতে লালল জোয়ালের মত এক দীর্ঘ বাঁকান কাঠ। তাহাতে এক বোত দুই অংগের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। তক্তার পশ্চাৎ দিকে সঁক। দুই পার্শ্ব হইতে কাঠের বেড়া ক্রমে উচ্চ হইয়া সম্মুখে প্রায় সেই তক্তাহ দণ্ডায়মান রথীর কটিদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। চক্রেদ্বিমধ্যে দুই খড়গ লাগান। রথের অংগের সাজ সব স্বর্ণনির্ম্মিত। রথীর দক্ষিণ হস্তে ভীষন শেল। বাম হস্তে অজ্ঞাত চর্ম্ম। পৃষ্ঠদেশে দুই তুণ। বাম কটিদেশে তীক্ষ্ণ খড়গ। সম্মুখস্থ কাঠের বাঁড়ে ধনুক হয়। তাহার দক্ষিণ দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া সারথি লাগায় আকর্ষণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর আট জন অধারোহী। অশগুলি কৃষ্ণবর্ণ, পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, তাহার পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ আসন। আসনে জরির কাজ। তাহার গলায় পুরাতন স্বর্ণ মুদ্রার মালা। অধারোহীও সমজ্ঞ। দক্ষিণ করে বল্লম। বামে বল্গা। বাম কটিতে গুলবাটী। পৃষ্ঠদেশে বন্দুক। মস্তকে উকীষ। তাহানিগের প্রকাণ্ড দাড়ি কুমাল দিয়া বীধা। তাহার পরে অশ্রুজ্ঞ বিবিধ রাজপুরুষ ও খোদ্ধারা দাঁড়াইয়া আছে। সকলের পরে দশজন বন্দুকধারী। দীর্ঘ-কায়া। দীর্ঘ-শাঙ্ক। দীর্ঘ-হস্ত। বাম করতলে দীর্ঘ বন্দুক। বন্দুকের শিরোভাগে দীর্ঘ সাজিনফলা। পশ্চাৎভাগে চামড়া দ্বারা তোতদাম। তার পরে কুড়িটা তোপ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সসভা রত্নভূমির নিকটে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার দুটি তোপ। মহারাজ রত্নভূমিতে বহিঃমন্ত্র ভেরী বাজিল, দামামা বাজিল ও ধ্বজার পতাকাটা টানিয়া ভাল করিয়া উঠান হইল। প্রকাণ্ড পতাকা খকিয়া খকিয়া পত পত শব্দ করিতে লাগিল। বাণ্যশল রত্নভূমিতে প্রবেশ করিয়া মাত্র ব্যস্ত দাঁড়ইল ও এক বার দক্ষিণে একবার বামে হেলিতে লাগিল। তাহার বর্ষণে পৌষ শৃঙ্খলটা বোধ হইল যুগ্ম ছাঁড়িয়া যায়। আবার দুটি তোপ। মহারাজ অস্থ হইতে উদ্যোক্ত হইলেন ও চন্দ্রাতপের ভিতর যাইয়া মধ্যকার চৌকিতে বসিলেন। গজানিন দক্ষিণে ও সূর্য্যকুমার বামে চৌকিতে বসিলেন। পূর্ণচন্দ্র এক বালে নম করিয়া আলিয়া উঠিল। ধূম তুলাবাণির মত গড় হইতে গড় হইতে অংকার করিল ও তাহারই অস্তিত্ব পরে এককালে বিরাট ফুড় তোপের শব্দ হইল। বাস্তব ঠাট্টা দাঁড়ইয়া পৃষ্ঠটি বুগাইয়া উজ্জ্বল তে তাহার পরই একটি ভীষণ গর্জন করিল। দূরের মেঘে অন্ধ নাচিতে লাগিল। রত্নভূমি একেই মহারাজের স্বাক্ষর হইতে নিঃসৃত হওয়া অবধি চন্দ্রাতপের সিংহাসনে বসি পর্য্যন্ত প্রতি পাঁচ পলে ধূম তোপের ধূমে অংকার ছিল, আবার এক কালে বিংশতি তোপের ধূম। বক্রপের গজ চারি দিকে ছুটিয়া। ধূমন্তলি ক্রমে হেলিতে হেলিতে উপরে উঠিয়া গেল। দক্ষিণ পংনে চন্দ্রাতপের উপর নিম্ন দৃষ্টির অপেক্ষা হইল। সমস্ত রত্নভূমি নগ্ন হইল। দূরস্থ সৈন্যশ্রেণী ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। নবোত্তম বাজা বন্ধ হইল। এত মুহূর্তের জন্ত সকলে বাকুহীন। কেবল দূরস্থ অশ্বের পদশব্দ, রথচক্রের স্বর্ষর ঘর্ষ ও অস্ত্রের বাজনা।

সোণার আশাস্টেটধারিরা চৌকর দুইপার্শ্বে দাঁড়ইল। সোণার শেলধারী রাজার পশ্চাতে ও চামরধারী বালকেরাও সেইখানে দাঁড়ইল। রূপার আশাস্টেটধারিরা চন্দ্রাতপের বাহিরে দাঁড়ইল। মন্ত্রী বিজয়রাম দক্ষিণদিকে দাঁড়ইল অপর অপর আমীরেরা আপন আপন স্থানে হাত নামাইয়া ভূমুষ্ঠিতে দাঁড়াইল। রাজার সঙ্গের লোক লঙ্কর কতক চন্দ্রাতপের মধ্যে কতক বা তাহার বাহিরে পার্শ্বে দাঁড়ইল। ছত্রধারী ছত্র ধরিল। বালকেরা চামর ঢলানল। ভাটে গান গাইতে লাগিল। মহারাজের ইঙ্গিত মাত্রে সটকা বরদার সটকা লইয়া পার্শ্বে দিল। অমনি আর এক জন পানের বাটা সামনে ধরিল। মহারাজ পান খাইলেন ও সটকার মল খুলিলেন। বাম পার্শ্বে একা যোধেরা হটিয়া গেল। ক্রমে দূরস্থ সৈন্যশ্রেণীতে মে দিক্ দিয়া বহিতে লাগিল। প্রথমে তোপপংক্তিসমূহ, তাহার পর হস্তী হলকা, তাহার পর রথপংক্তি তাহার পর অশ্বরোহী শ্রেণী, তাহার পর বন্ধুধারী পদাতি, তাহার পর ঢালী, তাহার পর ধাতুকীল ও তাহার পর লাঠিয়াল দল চলিল। বিংশতি জন করিয়া এক এক পংক্তি। এইরূপ পঞ্চাশ

বজাধিপ-পরাজয় ।

ক্ৰমে এক ফউজ। তাহার পকাশ জন নায়েব ও একজন ফউজদার। দারটি অঝোরোহী। প্রতি ফউজে দশটি তোপ, চারিটি হস্তী, এক শত রথ এক শত বন্দুকধারী। বাকী সব ঢালী। এরূপ ফউজের নাম হজুরী। ইহাদিগের সেনাপতির নামে ফউজের নাম। ফউজের প্রথমে পাঁচটি চলিল। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি হস্তী। তাহার পশ্চাৎ এক পংক্তি। ঢালীদিগের পংক্তির শেষে দুই জনা বন্দুকধারী ও তাহার দুই পার্শ্বে চারি একরূপে পকাশটি পংক্তি সাজান। সকলের পাঁচটি তোপ ও দুইটি হস্তী। প্রতি দ্বি দক্ষিণ করে তলবারি ও শেলধারী নায়েব। এ সকলের অগ্রে অঝোরোহী দার। তাহার অগ্রে পাঁচিশ জনার দলবদ্ধ ফউজের বাদ্যকারেরা। প্রতি নায়েব শেলের উপর ছোট ছোট নিশান ও নিশানে ফউজের নাম। বাদ্যকার দলের একজন একটা প্রায় চারহাত উচ্চ বজাধারী। তাহার প্রায় চতুর্দিকে আড়াই পরিমাণে এক পতাকা। তাহাতে জরির কাজে ফৌজের নাম ও মহারাজ প্রতাপার মধ্যস্থ স্থখের চিহ্ন। বাদ্যকারগণের কটিদেশে তলবারি। বাদ্য বজা নামাশা, ডামা চারিটা, নাগড়া চারিটা, জগঝম্প দুইটা, জয়ঢাক দুইটা, কাংড়, তুরী ছয়টা, ভেরী একটা ও নগড়া একটা।

হারাজের দশটি হজুরী ফউজ ছিল। তাহার। এরূপ দলবদ্ধ হইয়া ক্রমে রাজপার হইল। তাহার পর শুদ্ধ রথীদল, শুদ্ধ অঝোরোহী, শুদ্ধ ধারুকী, শুদ্ধ ঢালী, বন্দুকী ফউজ এইরূপ বাদ্য ও নিশান সঙ্গে চলিয়া গেল। তাহার পর শুদ্ধ ফউজ চারিটি চলিয়া গেল। প্রতি তোপের সঙ্গে কুড়ি জন পদাত, চারিটি ও দুই জন অঝোরোহী পতাকাধারী। তাহার পর রায়বাণধারী ফউজ চলিয়া গেল। গের একমাত্র বাদ্য ঢকা। তাহার পর আমীরের সৈন্ত। সর্বপ্রথমে হজুরসহস্র অঝোরোহী। তাহার পর বলরামসিংহের সহস্র পদাত। তাহার পর শত্রুর পাঁচ শত ধারুকী চলিল। এরূপ কত সৈন্ত তাহার সংখ্যা হয় না। ইহাদিগের কেহই বাদ্যকার দল ও পতাকী আগে আগে চলিল। ইহাদিগের পদচালনে গুলে ধূলি উঠিল ও চতুর্দিক আগত কাড়র পুর্কী অন্ধকারের মত হইল। ক্রমে সৈন্ত একবার রাজসম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মহারাজের সম্মুখীন সেনানী। রণবীর-বাহাহর মহারাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তুরী বাজাইলেন। অমনি রা দোড়িতে আরম্ভ করিল ও এককালে ধূলরাশির মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইল।

তোমধ্যে শিবিকাগুলি ছোট চক্রাতপের মধ্যে রাখিয়া বেহারারা বাহিরে দাঁড়াইল। পরে শিবিকা বাহিরে লইয়া অন্তরে চলিয়া গেল। শিবিকারক্ষক দুই শত রাহী চক্রাতপের পার্শ্বে দাঁড়াইল। কক্ষের রক্ষণা শুধা গেল, মলের মধুরধনি

তলা গেল। কিছুক্ষণ পরেই মেঘমধ্য হইতে যেন অস্ফুট চন্দ্র দেখা দিল। চিকের তিত্তর হইতে মহিলাগণকে আসনে উপবিষ্ট হইতে দেখা গেল।

সকল সৈন্য মহারাজের নয়ন আগোচর হইলে মহারাজ চৌকি ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সকলে সমস্ত্রমে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া স্থান দিল। গজালিস উঠিল। শূর্য্য-কুমারও রাজার পশ্চাদ্ধর্ত্ত হইল। মহারাজ ক্রমে চন্দ্রতাপের বাতির অগ্নিসলিলে অভিদূর প্রকাণ্ড রাজধ্বজা। ধ্বজাটি তিন ভাগে বিভক্ত। নীচের ধ্বজাটি বেগু প্রায় সাত পোয়া। তিরিশ হাত উচ্চ। ইহার উর্দ্ধদেশে দুইটি শোকার বড় লগান। তাহাতে অপর একটি ধ্বজা। সেটি প্রায় বড় হাত উচ্চ। আশার তাহার উপর একটি প্রায় চৌদ্দ হাত উর্দ্ধ। ইহার উপরে পতাকা। পতাকাটি চতুর্দশে প্রায় আট হাত প্রস্থ। ধ্বজাটি চারিদিকে রেশমের রক্তদ্বারা কণিন বকন পৌঁটের বঁধা। ক্রমে ধ্বজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ধ্বজাকে বাম হস্তে ধরিলেন ও দক্ষিণ হস্তের তল বিস্তারিয়া ব্যাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ধন্ত রে কৃতজ্ঞ সের! ব্যাজ অমনি অগ্নে অগ্নে আসিয়া তাহার মস্তক দেই করতলে অর্পণ করিল। মহারাজ তাহার মস্তক চুলকাইতে লাগিলেন। পরে রণবীর-বাহাদুর অগ্নে রাজসন্নিধানে অগ্নিস্রা দিড়াইলেন। শূর্য্যকুমার তাহার অগ্নের গ্রীবাধ ভর দিয়া রণবীর-বাহাদুরের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্রমে এক মধ্যাহ্নে বৃষ্টিপাত পবনকারণে অপরূপ হইলে মহারাজ দক্ষিণ দিকে দেখেন তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁহার সৈন্যেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি কুউজ দুই ভাগ হইয়া পূর্বা ও পশ্চিমের মত আশ্রয় করিয়াছে। স্থানে স্থানে দূত করিয়া উত্তম দলের সৈন্যেরা অবস্থান করিয়াছে। রণবাদ্য বাজিতেছে, এক দলের দক্ষিণ পক্ষ ক্রমে প্রধান দল হইতে অস্তর হইল। অতি মন্দ গতিতে ক্রমে অনেক দূরে গেল। এমন কি তখন এক এক ঢালী ব পদাতি আর দেখা যায় না। সেইখানে গিয়া এক চতুষ্কোণ ব্যুহ করিয়া অবস্থান করিল। যে দল হইতে তাহারা চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ক্রমে পশ্চিমে পাতলা করিয়া দীর্ঘে বিপক্ষ দলের মত হইল। এমন সময় জ্বরমল আপন অবাধ্যোহণ করিয়া মহারাজের পাশ হইতে নিকটবেগে দৌড়িয়া গেল ও সৈন্ত হইতে প্রায় দশ রশি অন্তরে ধাবিয়া তুরীন্দ্রনি করিল অমনি পশ্চিমের দলের ধাতুকীরা আপন আপন ধনুতে বণযোজনা করিয়া বিপক্ষদলের প্রত্যেক লোককে লক্ষ্য করিল। আশ্রয় পুরিয়া গুল টানিল। বোধ হইল যেন একটীমাত্র ধনুস্তম্ভ টানা হইল। বাণ ছাড়িল। নিমেষ পড়িতে না পড়িতে গগনদেশ অচ্ছন্ন হইয়া যেন লক্ষ লক্ষ শর শব্দ শব্দে চলিল। দর্শকমাত্র এক নিমেষে নোথতে লাগল। ভাবিল একি বিপদ! ইহারা আপনা আপনি মারামারি করিয়া কেন মরে? বোধ হইল এ বাণগুলি বিপক্ষদল ভেদ করিয়া চলিল। সকলে চমৎকৃত হইল। কি বেগে শর নিক্ষেপ হইয়াছে? সকল যত্নে

ভেদিয়া বাণ সবধেণে বাইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই দর্শকগণ যখন দেখিল যে শর বিপক্ষ-
সৈন্য-শরীর ভেদ করিয়াছে, কিন্তু কেহ নিশ্চিত হইল না, তখন তাহাদের আর আশ্রয়ের
সীমা রহিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ কিছুই বুঝিতে
পারিল না। ছোট চক্ষুতাপের মহিলাগণ শরনিক্ষেপমাত্রে একফলে চিংকার করিয়া
উঠিল। আবহাওয়া পরক্ষণে 'বপকদলে' সকলকে স্ব স্ব স্থানে থাকিতে দেখিয়া ব্যাকরহিত
স্বাক্ষরহিত রহিল। গজাশিস কহিল, ধন্ত মহারাজ ধন্ত! স্বর্ধাক্ষমরের হৃদয় ফুলিয়া
উঠিল, সাহসকারে সৈন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিল। ও বনবীর বাহাদুরের অথ আশ্রয় ত্যাগ
করিয়া দৌড়মান স্তম্ভের গায় দাঁড়াইল। বনবীর-বাহাদুর অশ্রুচোষায় ভর দিয়া কটিনেশ
বাঁকাইয়া মস্তক নত করিয়া স্বর্ধাক্ষমরের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সদল হইলেন ও
বাম হস্তের তল উল্টাইয়া আপন জামুহলে রাখিলেন। বক্ষঃস্থল হিম্মদ্রিত হইল।
বদন ঈষৎ বামপার্শ্বে হেলিল। নেত্রদ্বয় স্থির অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।
মহারাজ প্রত্যাপাদিত্য ব্যাস্র মস্তক ঈর্ষিত দক্ষিণ হস্ত অশ্রুত করিলেন। হস্তটি
আপন কটিনেশে রাখিলেন। মাথাটি ঈষৎ বাঁকাইলেন। ব্যাস্রের দিকে এক নিমেষে
দৃষ্টিপাত করিলেন। বাস্রটিও এমনি সুশিক্ষিত, অমনি মুখ নায়াইল। সম্মুখের
বাম পদ ক্রমে পাতিল ও তাহার উপর সম্মুখের দক্ষিণ পদ রাখিল। সম্মুখের
পদদ্বয় বেধানে মলিয়াছে তাহার উপর দক্ষিণ কর্ণে ভর দিয়া মাথাটি রাখিল ও
জিহ্বা অঙ্গ বাহির করিয়া অর্ধ উন্মোক্ত নেত্রে মহারাজের মুখত্ৰী দেখিতে লাগিল।
মহারাজও অমনি অস্ত্রে আপনার দক্ষিণপদ তাহার পাতিত মস্তকের উপর রাখিলেন।
রসভূমি কি শোভিল! দীর্ঘ উন্নত বশস্ত্র সপলাকধ্বজাঙ্গণ বামহস্তাশ্রিত, শেতবসন-
শোভিত, শুভ্র-উকোষ কিরাটাবাহী, দীর্ঘবপু, তেজস্বী, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ প্রত্যাপাদিত্য
মধ্যাহ্ন সূর্য্যোপম। তাহার পদতলে ভূস্থিত হস্তদ্বয়োপরি বিস্তৃতশির প্রকাণ্ড শাদুল।
হজুরমল পশ্চিমস্থ সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া বন বন তুরী বাজাইতেছেন। অপর
দলের মধ্যে মালিকরাজ। রণক্ষেত্রে যেন দুই স্বর্ধাদয় হইল। উভয়েই তুরী বিনাদ
করিয়া ছে ও উভয় দলেরই সৈন্যেরা শরসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে। অকাল কেবলই
শরের শব্দ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা গেল না। শূন্যমার্গে সপুঙ্খ বাণমালা
ব্যতীত আর কিছুই দেখা গেল না। মালিকরাজের সৈন্যেরা শর নিক্ষেপ করিতে
করিতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন এক পোতা পথ অহরে পৌছিল,
তখন তুরীশব্দে দুই তাল হইয়া দুই পার্শ্বে চলিয়া গেল অমনি পশ্চাৎ হইতে ঢালীয়া
মালিকরাজের অগ্নি বলিয়া মধ্য দিয়া নিক্ষেপিত অসি করে অতিবেগে দৌড়িয়া পশ্চিমস্থ
লোক আক্রমণ করিল। তাহাণের পদদ্বয়তে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কেবল তলবারীর
ধ্বনি শুনা গেল। অতি অস্বস্তি পাইয়াই দেখা গেল হজুরমলের সৈন্যের অধিকাংশই

পোল হইয়া চতুর্দিকে মুখ করিয়া মধ্যে তলবারী ঢালাইতেছে। তাহার চতুর্দিকে বালেন মত মালিকরাজের সৈন্য খড়গ চাপাইয়াছে। একবার বেধ হইতেছে যেন হজুরমলের সৈন্য মালিকরাজের সৈন্য ভেদ করিবে। আবার বেধ হইয়া যেন মালিকরাজের সৈন্য দু'বাং হজুরমলের সৈন্যকে অহাৎতে খণ্ড খণ্ড করিয়া পদে নিশ্চেষ্ট করিবে। মালিকরাজ পুনরায় তুগী বাজাইল। তাহার তোপাদম একতালে তোপধ্বনি করিতে লাগিল। তোপদম্বন্ধ মালিকরাজের চলিয়া দুইপার্শ্বে চলিয়া গেল। ফলে আবার তুগীধ্বনি হইয়া মাত্র দু'বৎ হজুরমলের সৈন্য মালিকরাজের তোপের পশ্চাত্তাপ আক্রমণ করিল ও সমুখস্থ সৈন্যের পার্শ্ববর্ত্ত মালিকরাজের সৈন্যের উপর চাপিল বলে অন্য চলন করিতে লাগিল। ইত্যন্থে হজুরমল তোপ সকলও আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষের তোপধ্বনিতে প্রদেশ প্রভিন্ত হইল। ঘুম ভুল গুল আচ্ছন্ন হইল। তোপদম আকাশে ব্যাপিল। ক্রমে বায়ু সকালনে চন্দ্রাতপ আচ্ছন্ন করিল ও ক্রমে নয়নধের অগোচর হইল। গুণন আর কিছুই দেখা যায় না। সমুখ যে স্থলে উভয় পক্ষের সৈন্যে যুদ্ধ করিতেছিল, তথায় একটি লোকও নাই। মর্টি শূন্যকার।

শম ও পূর্ক প্রান্তের দরহ বাণের শব্দ পাওয়া বাইতে লাগিল ও সাগর-প্রবাহের শব্দ উভয় পার্শ্বের সৈন্যশ্রেণীতে চলিতে চলিতে ক্রম মধ্যে আসিতে লাগিল। ক্রমকালে উভয়দল আসিয়া মিলিল ও একদল হইয়া পূর্কের মত চলিতে লাগিল। ভেদীর পর ভেদী, পশ্চিমের পর পশ্চিম মালার পর মালা, কেবলই সৈন্য, কেবলই বালা, কেবলই পতাকা। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল। পরে পশ্চিম হইতে অশ্ব মালিকরাজ ও হজুরমল পার্শ্বপার্শ্ব হইয়া চন্দ্রাতপের সমুখস্থ ধ্বংসটির নিকট আসিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে অভ্যর্থনা করিল। মহারাজ পশ্চাত্তাপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে তাম্বুল-করুকাহী বাটা লইয়া ধরিল। প্রতাপাদিত্য উভয়কে আপন হস্তে পান দিলেন। উভয়েই নতশিরে অঙ্গভিবদ্ধ হইয়া রাজদত্ত পান গ্রহণ করিলেন ও শিরে স্পর্শ করিয়া কিছুদূর পশ্চাতে আসিয়া পান চর্কণ করিতে লাগিলেন। ভাট আসিয়া মহারাজের অঙ্গ উচ্চারণ করিল। পরে রণবীর বাহাদুর রাজ-সম্মিধানে আসিয়া অবেদন করিলেন ও পরকণ্ঠেই শির নত করিয়া চলিয়া গেলেন। মহাবত ব্যক্তিভে লাগিল। পরে মঙ্গলোচ্ছ্বাসের মধ্য হইতে একজন রক্তভূমিতে আসিয়া শির নত করিয়া মহারাজকে নমস্কার করিল ও পরে ভূমি স্পর্শ করিয়া বাহ্যাস্কট করিয়া দাঁড়াইল। ভাট উর্ধ্ব-বরে বলিল,—“কেহ মঙ্গলক্ষেত্রে সিন্ধুর সাহিত বল পরিমাণ কংকাত চাহ, তবে অগ্রসর হও, মহারাজ জয়ী মনঃপূর্ণ।” এই কথা বলিতে বলিতেই আর একজন রক্তভূমিতে আসিল। মহারাজকে নমস্কার করিল। ভূমি স্পর্শ করিল ও বেচু সিন্ধুর অপর দিকে আর এক রশি অন্তরে দাঁড়াইল।

উভয়েই স্থলকার, উভয়েই খর্ব-প্রব, উভয়েই উল্লসপ্রায়, উভয়েই দৃষ্টিবদ্ধিত, উভয়েই পরস্পরের দিকে অস্বীকৃতিতে চাহিতে লাগিল। উভয়ের বাহ্যস্ফোটে বিকট শব্দ হইল। উভয়েই দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিল। বিপরীত দিকে দাঁড়াইল। পরস্পরের দিকে ঝাড়ু কিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে উভয়ে বিপরীত দিকে কিছু দূর যাইয়া পুনরায় মুখ ফিরাইল। পরেই উভয়ে পুনরায় বাহ্যস্ফোট করিল। কটিনেশ বাকাইল। হুই হস্ত ভূমি দিকে ঝুলাইয়া হুলাইতে হুলাইতে এক এক দীর্ঘপদে রসভূমি সমস্তই প্রায় বেড়াইল। উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের দিকে। উভয়েরই লক্ষ্য উভয়ের হস্ত পদাদি চালনে, পরস্পর পরস্পরের অস্বীকৃতি ও অসন্তর্ক অবস্থা লক্ষ্য করিতেছে। কেহই অবকাশ পাইতেছে না। ক্রমে এইরূপ কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের হস্ত পদাদি চালন দৃষ্টি করিলে বেচু সিংহ এক লম্ফ আসিয়া তাহার বিপক্ষের স্তম্ভের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্ত কঠিন করিয়া তাহার বিপক্ষের পশ্চাতের কটিস্থ লাঙ্গোট-বন্ধনের স্থলদ্বজ্জু ধরিল ও আপনার দক্ষিণ অঙ্গের উপর বিপক্ষের সমস্ত শরীরের ভার রাখিয়া দক্ষিণ পদ কিছু উচ্চ করিল ও বাম পদ ভূমি হইতে তুলিয়া বাম হস্ত ভূমির দিকে বিস্তারিয়া বিপক্ষকে স্পর্শে তুলিবার উপক্রম করিল। বিপক্ষ কঠোর সিংহ অমনি আপনার বাম পদদ্বারা বেচুর দক্ষিণ পদ আকর্ষণ করিয়া বেচুকে বামপার্শ্বে করিয়া বাম হস্তে তাহার কটিনেশ বেঁটন করিয়া সঙ্গেই ভূমিতে পাড়িল। বেচু অমনি তাহার কটিনেশ ত্যাগ করিল। এক টানে তাহার হস্ত আপন কটি হইতে অপসৃত করিল। তাহার দক্ষিণ বাহ্য নিয়মিত আপন দক্ষিণ বাহু চালাইয়া তাহাকে উ-টাইয়া ফেলিবার জন্ত হাঁটু গাঁড়িল। কঠোর তাহার জড়বস্তুর মধ্যে হস্ত দিয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল। এই রূপে একবার বা বেচু ভূমিসাৎ একবার বা কঠোর ভূমিসাৎ হইল। ক্রমে তাহারা মুণ্ডে মুণ্ডে, হস্তে হস্তে, পদে পদে, কটিতে কটিতে বদ্ধ হইল ও একের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বল অপরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলে যোজনাকারল। ক্রমে উভয়ের শরীর বর্ণাক্ত হইল। বল বল নিব্বস পাড়তে লাগিল। বহুকালের পর কঠোর আত্মবিষম প্রমে বেচুকে পরাস্ত করিল। লামামা বাজিল। মহারাজ প্রাগপালত্য অগ্রসর হইয়া কঠোরের হস্ত ধরিয়া তাহাকে চক্ষাতপের মধ্যে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর তথায় উপস্থিত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণও গেলেন। সূর্যকুমার কেবল ত্র্যস্ত্রের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজ পান দিলেন। কঠোর সমস্তে শিরে স্পর্শ করিল।

পরে মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে কহিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! বেলা প্রায় এক দণ্ড বাত্রা আছে, এখন প্রত্যেক বোদ্ধার বলবান্য দেখিবার আর সময় নাই।”

বিজয়রূক্ষ বলিল। “না আমার তো বোধ হয় এইভাবেই সকলকে বখাষণা পুরস্কার দিয়া বিদায় দেওয়া কর্তব্য। কি? আমা দলের সেনানীদের বল ও যুদ্ধকৌশল আপনার দেখা কর্তব্য।

মহারাজ কহিলেন। “তাহা দেখিবার কি সময় আছে?”

বিজয়রূক্ষ বলিল। “এক উপায় আছে। প্রত্যেক সেনানীকে একা একা যুদ্ধ করিতে না দিয়া ছুই দল করিয়া যুদ্ধ করাইলে ভাল হয়।”

মহারাজ তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বিজয়রূক্ষ চত্ৰাভ্যপন্ন বাহিরে গিয়া তাটকে ডাকিয়া কহিলেন।

তাট রত্নভূমিতে প্রবেশ করিবারাত্র দাম্যম্ থামিল। সকলে কোতুলন দৃষ্টিতে তাহার দিকে এক নিমেষে চাহিল। চিকের ভিতরে মহিলাগণ নিম্নরূপ হইল। মহারাজ-কস্তা বিদ্যাভ্যাসিত সরমা ব্যতীত আর দিকে এক নিমেষে দেখিতেছিলেন।

রাণী বলিলেন। “সরমা! কি দেখেছ, এ দিকে এস, এ দেখ তাট আবার কি বলে।”

সরমা কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন। “কি মা! তাট কি বলিবে?”

রাণী কহিলেন। “ওন ন কি বলে।”

তাট বলিল। “বশোভরাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে সভায় আমীর ওমরাওরা দুই দল ভুক্ত হইয়া আপন আপন বল প্রকাশ করুন। জয়ী রাজসম্মান পাইবেন।”

এই বলিয়া তাট ক্ষান্ত হইল। তুরী বাজিল। তুরীও ক্ষান্ত হইল।

রাণী বলিলেন। “সরমা! বল দেখি কেন কেন আমার একমুণ্ড ভুক্ত হইবে?”

সরমা বলিলেন। “বোধ হয় হজুরমল এক বর্গ ও কৃষ্ণনাথ অপর বর্গের অধ্যক্ষ হইবেন।”

রাণী বলিলেন। “বোধ হয় কৃষ্ণনাথ রত্নভূমিতে নাহি যেন না। মালিকরাজ ও হজুরমলেই তুমুল যুদ্ধ হইবে।”

সরমা বলিলেন। “কেন মা! কৃষ্ণনাথ কেন না যাবে না?”

রাণী বলিলেন। “বালকদ্বন্দ্বের সাহিত অসি চালনাতে ঐ হইলেও কৃষ্ণনাথের মান নাই জ্ঞান করেন।”

সরমা বলিলেন। “কেন মা! হজুরমল তো পুরাতন যোদ্ধা, আশ্রয় সস্ত্রের এক জন প্রধান সেনানী ছিলেন। তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করা বড় সামান্য কাজ নহে।”

সহচরী মালতী বলিল। “হজুরমলের মত যোদ্ধা বোধ হয় অমলিপের মহা-রাজের সভায় আর নাই। দেখিলে না, কিরূপ করিয়া সৈন্তচালন করিলেন। যখন

সৈন্তমধ্যে তলবারী করে অঃধ ক্রিরিত লাগিলেন, তখন যেন তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতি ছুটল। বত নেনাপতি ছিল, কেহই তেমন শোভিল না।”

রাণী বলিলেন। “ও সব প্রকৃত বলের চিহ্ন নহে। কৃষ্ণনাথ কেমন গম্ভীর হইয়া সিংহের ভায় দাঁড়াইয়াছেন।”

সরমা বলিলেন। “কেন সূর্য্যুহারই বা কি মন্দ? মালতি! দেখ বীরের নিকট হিংস্রক ভক্তও বশীভূত হয়। ব্যাঘ্রটিকে প্রকারে তাহার পা চাটিতেছে। মহারাজ যখন ব্যাঘ্রে। দিকে চাহিলেন, তখন ব্যাঘ্রটা তাহার হাতে মাথা দিল বটে, কিন্তু সে যেন তাঁহার বিকটভোগী বলিষ্ঠা অগত্যা কৃতস্ততা প্রকাশ করিয়াছিল। এখন যেন সূর্য্য-কুমারের বলাধকা ও বর্ধা সৌকার করিয় তাহাকে মান্য করিতেছে।”

রাণী অপর মহিলার সঙ্গে কথার ব্যস্ত ছিলেন, সরমার কথার কর্ণপাত করিলেন না।

মালতী গিল। “সূর্য্যুহার একজন বীর বটে, কিন্তু বড় ধীর স্বভাব। হজুর-মলের মত উঃ নগেন ও গোঃ করাই অঃসর হন না।”

সরমা বলিলেন। “স্বঃগঃ প্রকৃত বীর নয়, তাহাদিগের আচরণই ঐকঃ। তাহার আশ্রয়মাগে বড় বঃ থাকে না। উঃভ্যঃসুক লোকের মত আপনার ক্ষমতার বৃদ্ধি আশ্রয়ন করে না। ঐ দেখ কেমন স্থির দৃষ্টিতে বঃধের দিকে চাহিতেছেন ও কেমন স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঃর মঃস্তঃ হাত দিলেন।”

মালতী বলিল। “সরমা! সত্য সূর্য্যুহারের কেমন একই মোহিনী ক্ষমতা আছে, তাহাকে দেখেন অমনি তাহাকে বশীভূত করেন।”

সরমা বলিলেন। “আমার চক্ষু তো তাহার তুল্য আর কেহই ঠেকে না। মহারাজ আপনি বলিয়াছেন যে সূর্য্যকুমার প্রকৃত বীর। বীরপুত্র কেনই বা না হইবে।”

মালতী বলিল। “দেখ সরমা! সূর্য্যকুমার আমাদিগের দিকে দেখিতেছেন। বাহির হইতে কি আমাদিগকে দেখা যায়?।”

সরমা বলিলেন। “কেহই বা না বাইরে? তবে বড় স্পষ্ট দেখা না বাইতে পারে, যদি দেখা বাইত, তবে চক্ষুঃ কি প্রয়োজন?”

মালতী বলিল। “সরমা! সূর্য্যুহার একদৃষ্ট আমাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। কেমন শূঃ দৃষ্টি! আহা মুখটি বিছু বিমর্ষ হইয়াছে, বোধ হয় কিছু ভাবিতেছেন।”

সরমা বলিলেন। “দেখুন সুন্দর পুরুষকে ঐঃঃ বিমর্ষ হইলে কেমন ভাল দেখায়। ঐঃঃ মন হইলে পুরুষ স্বভাববাঞ্ছিতঃ কোমল হয়।”

সঃক্ষঃমিতে কৃষ্ণনাথ বঃবীর বাঃদুর নামিলেন। অমান তাহার সঙ্গে মালিকরাজ, হজুরমল, কঃভঃসিং, ডেজ খাঁ ও চেঃভঃসিং নামিলেন। ইঃরাঃ সকলেই একঃল

হইয়া রত্নভূমি অভিজ্ঞ করিয়া পশ্চিম দিকে দাঁড়াইলেন। সকলেই বীর, সকলেই অসামান্য। সকলেই শেলগারী, সকলেই দীর্ঘবশু, সবগেরই বামে অসি স্থলিভেদে, সকলেরই পৃষ্ঠদেশে কঠিন দুর্ভেদ্য চর্ম। সকলে যেন তেজঃপুঞ্জ ভানুষটকের মত অবস্থান করিলেন। রত্নভূমি উজ্জ্বল হইল। তুরী বাজিল। দামা বাজিল। তেরী বাজিল।

রাণী বলিলেন। “সরমা! অসাকার বুদ্ধ কি হইল না।”

সরমা বলিলেন। “কেন মা?”

রাণী বলিলেন। “দেখনা, মহারাজের শ্রেষ্ঠ রথী কখনই একতলে বদ্ধ হইল। আর কে আছে যে উহাদিগের সম্মুখীন হয়। কখনাথের ইহাতে মান বুদ্ধি হইল না। মালিকরাজের কণ্ঠ্য হয় নাই।”

মালতী বলিল। “মালিকরাজের দোষ কি? সে যখন কখনাথের অনুবর্তী হইল, তখন কিছু সে জানিত না যে সকলেই সেই দিকে ঝাইবে।”

রাণী বলিলেন। “বাহা হউক সকলেরই ভ্রম।”

সরমা বলিলেন। “কাহার ভ্রম নহে! সকলেই রণবীর বাহাদুরের বুদ্ধিবিক্রম আলিয়া ভয়ে তাহার বিপক্ষ হইতে পারিল না। ইহাতে কখনাথের মানবুদ্ধি বই আর ভ্রাস হইল না।”

রাণী বলিলেন। “তা বটে, কিন্তু মহারাজ আজ বোধ করি সভাতে আর বসিবেন না।”

মহাবতী বলিল। “মহারাজেরই লাভ। কাহাকেই আজ পুনঃস্বয়ং দিতে হবে না।”

রাণী বলিলেন। “বেশ বলেছ ছাত্ত। কিন্তু এত যে লোকসমাগম হ’ল, তাহদের কি লাভ। তারা বহুদিন বুদ্ধাভিনয় দেখে নাই। অন্য বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। বৃথা ভ্রম।”

যোদ্ধারা রত্নভূমিতে অবতীর্ণ হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য কিছু বিহব হইলেন। দেখেন, কাহার আর এমন সেনানী কেহই নাই যে, উহাদিগের সম্মুখীন হয়। সমস্ত দিনের আরোহণ সিঞ্চল হইল। বিজয়রত্নের মুখশ্রী স্নান হইল। তিনি এককূটে তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যোদ্ধারাও রত্নভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন ও এককালে ব্যাকরহিত হইলেন। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন, এ কি! আমি মনে করিয়াছিলাম, অস্ত্র চারি জন কখনাথের বিপক্ষ হইবেন। এ কি হইল। এক্ষণে প্রত্যাগমন কথা বুদ্ধ-নিয়মের বহুভূত কর্তব্য ও যে প্রত্যাগমন করিবে, তাহারা চিত্তের মত তাহার ব্যর্থের মুখে কালো দিবে। ইহা চিন্তিত্য কেহ একপাশে রাখা সচল না। কখনালের অস্ত্র

রক্তকূমি নিঃশব্দ হইল। প্রধান তাড়ি বিপক্ষ বোদ্ধার কিছুকণ প্রতীক্ষা করিয়া আবার পরিমিত গভীর গবেষনায় বসিল; “কেহ বীর থাক তো এই ছর ভায় বোদ্ধার সম্মুখীন হও, মহারাজ ভয়ীর পুরস্কার করিবেন।” আবার কুহী বাজিল। তুরীও বাজিল। রক্তকূমি ভেরনি আছে। কেহই আইসে নাই। সে ছর জন সুরতের মত দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই নতশির।

প্রতাপাদিত্য বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহিলেন। “কি কর্তব্য? আমার রাজ্যে কি এই ছর জন ব্যতীত আর বোদ্ধা নাই? এ ছর জনেরই বা কি বিবেচনা? ইহারা সকলেই একদলবদ্ধ হইল। কিছু মনে ভাবিল না যে, ইহাতে মহারাজের অপমান করা হইল। কৃষ্ণনাথেরই বা কি আচরণ? তাঁহার কথন প্রথমে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল না। সকলেই একতর হইয়াছে। আমি ইহাদিগের সকলকেই উচিত দণ্ড দিব। এক্ষণেই এইসকল বিদায় দাও?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপন আজ্ঞা শিরোধার্য, কিন্তু এক্ষণে সৈন্ত-দলকে বিদায় দিয়া অভিনয় ভাঙ্গিলে—”

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন। “অভিনয় কোথার যে ভাঙ্গিলে?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এক্ষণে অভিনয় না হইয়া সৈন্যদল বিদায় দিলে গজালিস কি মনে করিবেন? তিনি তা ববেল, মহারাজের রাজ্য এমনি অসুস্থ ও বিপৃথগ যে সুদৃষ্টিগোচরে সাক্ষ্য মিলিল না ও মহারাজকে নূরবে বে, মহারাজ পরামর্শ করিয়া আপনার সৈন্তের বৃথা মাম রাখিলেন।”

মহারাজ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন। “হাঁ আমি সে লব বৃন্নি, কিন্তু এককণার উপায় কর। বাহাতে মাম রক্ষা হয়, তাহা কর।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! যে ছর জন বোদ্ধা রক্তকূমিতে মুক্ত প্রাণনার অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনার সমস্ত লঙ্কর মধ্যে এমন কেহ লাই যে ইহাদিগের সম্মুখীন হয়। সুতরাং কথ্য কি?”

রাজা বলিলেন। “এমত যদি জানে, তবে কেন ছর জনই এক পক্ষ হইল?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! তাহারা কেহই জানিত না যে, অপর চারি জন কৃষ্ণনাথের বিপক্ষ হইবে না। সকলেই পরস্পর মনে করিল যে, রণবীর বাহাদুর ও সে অপর চারি জনের সমকক্ষ হইবে। তাহা হইলে কুমুল বুদ্ধ হইবে ও হঠাতো রণবীর ও সে উভয়ে অপর চারি জনকে পরাস্ত করিয়া রাজপুরস্কার পাইবে ও অপরাস্ত হইবে।”

রাজা বলিলেন। “হাঁ তা তো শোনা গেল, এক্ষণে কি করিবে?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “একশে ঐ ছয় জনের মধ্যে কেহই বিপদ দলভূক্ত হইতে পারিবে না। প্রথম আশ্রিত দল ভাগ করিলে তাহার মানের হানি হইবে ও মহারাজ আপনিও অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রিহৃত্য করিবেন।”

রাজা করিলেন। “তা তো বুদ্ধেরই নিয়ম। বদল ভাগ করা পাপের প্রায়-শ্চিত্ত নাই। কিন্তু সে কথা কলোদয় কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! তাগতে কলোদয় হুঁর খতুক, বেশণ অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে আপনার মান রক্ষা দুর্লভ।”

মহারাজের মলিন মুখচন্দ্র আরও ম্লান হইল। বিন্দু তিলু বর্ষা লগাটে দেখা দিল ও হতাশ হইয়া আপন চৌকির পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া একবেল হইয়া বসিলেন। তাঁহার হস্তের চৌকির দুইপাশ দিয়া খুলিয়া পড়িল ও শূন্য হুঁটে চাহিয়া রহিলেন। গজালিস মহারাজের অবস্থা দেখিয়া ছোট হুণ্ড হইয়া অন্তমনস্কের মত রহিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ মহারাজের পশ্চাৎ ভাবে দিয়া শিরো নম্ব করিয়া বলিল। “মহারাজ! গজালিস বর্জ্যধিপের নিকট বাইরা যখন এই কথা বলিবে, তখন বর্জ্যধিপই বা কি করিবেন?”

মহারাজ নয়ডল টলুটাইয়া বলিলেন। “কি বলিব?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আরকানের রাজার ভাতা অমুপরায় একলে লঙ্করপরে আছেন। তিনি অবশ্যই এ কথা শুনিবেন।”

মহারাজ নিশ্চেষ্ট হইয়া বলিলেন। “তিনিবেন যই কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! অমুপরায় অবশ্য দেশে দিয়া এ কথা প্রচার করিবেন।”

মহারাজ কলের মত প্রতিধ্বনি করিলেন। “করিবেন।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনার লঙ্করেরাও আপনা-আপনি এ কথা রটনা করবে।”

মহারাজ পুস্তলিকার মত উত্তর দিলেন। “করিবে?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! বেশোবরে এ কথা অবশ্যই রটিবে। ইহা নিবারণের আর উপায় নাই।”

মহারাজ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মস্তুর কথা সার দিলেন। “উপায় নাই”, ও ক্রমে আপনাতঃ মনে এ সবল দুর্নামের বিষয় তাহাতে ভাবিতে আরও দঃ হইয়া পেলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এ কথা দিলিতেও কালক্রমে রটিবে ও দিলীধর শুনিলে আপনাকে হুণা করিবেন।”

মহারাজ এই কথাই নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। “বিজয়রত্ন ! তোমার একপ বর্ণনার কি লাভ ? ইহাতে আমার ক্রোধ বৃদ্ধি বই ভ্রাস পাইতেছে না। ইহাতে উপহিত বিপদের উপায় যাত্র বলিলে না। উপদেশ দিতে অক্ষম হও হ্রস্ব হইয়া থাক। নিশ্চয়োজন অনর্থ বলিলে কি হইবে ?”

বিজয়রত্ন বলিল। “মহারাজ ! আপনি যহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা শিরোধার্য্য, কিন্তু সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত না হইল উপায় চিন্তা করা যায় না।”

রাজা কহিলেন। “এখন অবস্থা তো অবগত হইলে, উপায় চিন্তা কর।”

বিজয়রত্ন কহিল। “মহারাজ। ছয় অশ্বরোহীকে ধনলোভ দেখাইয়া এই ছয় জনের বিপক্ষ করিয়া দিলে ভাল হয় না ?

“রাজা কহিলেন “তাহাই কর।”

বিজয়রত্ন বলিল। “মহারাজ ! দ্বাদশজন হইলে আরও ভাল হয়। তাহারা অবশ্যই পরাজিত হইবে। তাহা হইলে আপনার ছয় সেনানীর মাত্র বৃদ্ধি হইবে।”

মহারাজ বলিলেন “ভাল তাহাই কর।”

বিজয়রত্ন বলিল। “তবে আমি সেই চিন্তায় যাই।”

বিজয়রত্ন এ কথা কহিয়া চন্দ্রভূপের বাহিরে আসিলে ভাট আবার কহিল। “কেহ যোদ্ধা থাক এই ছয় জনের সম্মুখীন হও। মহারাজ জয়ীর মাত্র করিবেন। এক জন হও বা বহু জন হও সম্মুখীন হও। মহারাজের রাজ্যে কি এই ছয়জন জিন আর বীর নাই ? এ রক্তভূমে কি আর কেহ বীর নাই, যে এই ছয় জনকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সম্মান লয় ?”

ছোট চন্দ্রভূপের মধ্যে রাণী সরমাকে কহিলেন। “সরমা ! কি দেখিতেছ ? এ ছয় জনের সম্মুখীন হয় এমন লোক এ অগণ্য লোকের মধ্যে দেখিতেছি না। বোধ হয় আজ মহারাজ অপমানিত হইবেন। ফিরিয়া গজালিস কি মনে করিবেন ? দেখিতেছ না ? মহারাজ কেমন বিমর্ষ হইয়া বসিয়াছেন ?”

সরমা বলিলেন। “মা ! রাজার মুখ দেখিয়া আমার হৃৎপিণ্ড হইতেছে। এরূপ তো কখনই ঘটে নাই। গতবার বশে,হরে যখন রণাভিনয় হয়, তখন মালিকরাজ ও হজুরমলে যুদ্ধ করিয়াছিল। চেতসিং কুকনাথের সহিত ও কতোসিং ডেজ বীর সহত যুদ্ধ করিয়াছিল ! এবার এমন হইল কেন ? আমার মনে কেমন অশ্রুচোয় জ্বলি হইতেছে। ব্যর্থ বৃথা না। বোধ হইতেছে যেন অমঙ্গল সঙ্গিকট। যেন আমার হৃৎপিণ্ডের উল্লস হইবেক।

রাণী বলিলেন। “ঐ দেখ, ভাট ঘন ঘন ডাকিতেছে ! তুরী বাজিতেছে। তথাপি কেহ দেখা দিতেছে না। আমার মনে কেমন অশ্রুট আশঙ্কা।

বেলাও আর অধিক নাই, বোধ করি আজ সকলকে বিমর্ষ হইয়া কিরিয়া দাঁড়িতে হইবে।”

সরমা বলিলেন। “এস আমরা পুরস্কার অর্পণ করি। তাহা হইলে মনের জড় ও ধনলোভে অবশ্যই কেহ না কেহ অগ্রসর হইবে।”

রাণী বলিলেন। “ভাল বলিয়াছ। বমুনা!”

বমুনা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাণী বলিলেন। “বমুনা! তুমি রত্নভূমিতে বাঙ ও বল, মহারাজের অধীন হউক বা অপর কেহ হউক, যে কেহ এই ছয় জন বোদ্ধার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে তাহা-
দিগকে পরাজয় করিবে, তাহাদিগকে আমার পালের এক হীরক হার দিব ও বহু মাজ করিব।”

সরমা কহিলেন। “আমারও হীরকের হার ও সূতার কণ্ঠী দিব ও আর্মিও তাহাকে বহু সম্মান করিব।”

ইহা বলিয়া সরমা আপন কণ্ঠ হইতে দুই আভরণ বুলিয়া বমুনার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণীও মালতীকে কহিলেন। “মালতী! আমার ভাল হীরকের হার একছড়া বমুনাকে দাও।”

বমুনা ও মালতী উভয়ে চম্ভাতপ হইতে বাহিরে গেল ও রাণীর শিবিকার নিকট বাইরা ভাহার মধ্য হইতে বাস্র লইল। মালতী বাস্র খুলিল ও বাহিরা উৎকণ্ঠ হীরকের হার এক ছড়া বমুনার হস্তে দিল। বমুনা হার লইয়া যায়।

মালতী বলিল। “বমুনা! রত্নভূমিতে তোমার এ বেশে বাওয়া উচিত নহে। কুমি বেশ বদল কর।”

বমুনা এক শিবিকা মধ্যে গিয়া আপনার বেশ পরিবর্তন করিল। মস্তকে উকীয় বাঁধিল। তাহার উপর কিরীট দিল। বক্ষস্থলে কাঁচুলি আঁটিল। ওজ পাআমা পরিল ও দক্ষিণ দিকে অঙ্গি ঝুলাইল। বামে তুরী ঝুলাইল। দক্ষিণ হস্তে অভঃপুরের বেত পতাকা ধরিল ও অখারোহী হইয়া রত্নভূমিতে যোখানে ভাট ডাকিতেছিল, তথায় আনিয়া উপস্থিত হইল। বাম হস্তে তুরী উঠাইয়া বাজাইল। সকলের নেত্র সেই দিকে গেল। তুরী বাজাইলে পর কহিল। “মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয় হউক।” আবার তুরী বাজাইল। পরে বলিল। “রাজা হউন, রাজপুত্র হউন এ দেশীয় হউন বা বিদেশীয় হউন ক্ষত্রিয় হউন বা ব্রাহ্মণ হউন যে কেহ একক হউন বা দলবদ্ধে হউন এই উপস্থিত ছয় জন বোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে অন্য পরাজয় করিবে, মহারাণী তাহাদিগের প্রত্যেককে এবং হীরকের হার দিবেন ও বহু মাজ করিবেন।”

আবার তুরী বাজাইল। পয়ে বলিল। “মহারাজ ঐতাপাদিত্যের জয় হউক। যে কেহ অন্য উপস্থিত ছয় জন বোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় করিবে, তাহানিগের ঐতোককে রাজকুমারী সরমা এইমত হীরকের হার ও মুক্তার কণ্ঠী দিবেন ও বহু সম্মান করিবেন। রসভূমিতে বীর থাক বীর পুত্র থাক অগ্রসর হও।”

এ দিকে মন্ত্রী আসিয়া মহারাজকে নিবেদন করিল। “মহারাজ! কেহই সাহস করিল না।” মহারাজ এককালে জলন্ত হতাশনের জ্বালায় হইলেন। আপন চৌকি ত্যাগ করিয়া ধ্বজার নীচে আসিলেন ও কহিলেন। “আমার অধিকারে কি এমনত বীর নাই, এ রসভূমিতে কি এমনত বীর নাই, যে ছয় জন বোদ্ধার অগ্রসর হয়।” কেহই উত্তর দিল না। মহারাজ পুনর্বার বলিলেন। “এ রসভূমিতে কি বীর নাই, যে ছয় জনের সম্মুখান হয়। একজনে হয় বা বিশ জনে বা একশত জনে এই ছয় জনকে পরাস্ত করিলেই আমার নিকট সম্মান পাইবে।” কেহ উত্তর করিল না।

যমুনা আবার তুরী বাজাইল ও পুনরায় বোদ্ধা আহ্বান করিল ও খেতপতাকা ভূমিতে পুতিয়া তাহার উপর আভরণ রাখিয়া নীচে দাঁড়াইল। কেহই অগ্রসর হইল না। মহারাজ হতাশ হইয়া মন্তক নত করিলেন ও ব্যাঘ্রের নিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

স্বর্ধাকুমার জন্মে মহারাজের নিকটস্থ হইয়া বোড়করে বলিল। “মহারাজ! আমার এক নিবেদন আছে।”

রাজা উত্তর করিলেন। “স্বর্ধাকুমার! তোমার কথা শুনিতে আমার বর্ণনয় সম্মতি অভিলাষ করে। বল কি বলিবে।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহারাজ! কায়স্থবংশে উন্নয়ন করিয়া কামরূপ কলকে আমার পবিত্র কুলমাস দূষিত করিব না। বীরবংশে জন্ম। আমি আর বাহিবে পাশ্রি না! আত্মা করেন তো রসভূমিতে যাই।”

রাজা বলিলেন। “স্বর্ধাকুমার! তুমি রাজপুত্র, ওদুপযুক্ত বীরব্যাক্যই বলিলে, কিন্তু তুমি বাগক, নবীন বোদ্ধা, একাকী এ ছয় জন শ্রোত্র বোদ্ধার সম্মুখান হওয়া কেবল পরাস্ত হইবার কারণ মাত্র। অতএব ক্ষান্ত হও, বাগন্তরে যখন একাকী মালিকরাজ যুদ্ধে আহ্বান করিবে তখন যাইও।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহারাজ! আপনার আশীর্বাদে কোন বর্গেই পরাস্ত হইব না। আপনার ভাট ডিনবার ডাকিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, কেহই অগ্রসর হয় নাই। আপনিও ডাকিলেন, কেহ অগ্রসর হইল না। আবার মহারাজী ও রাজ-কুমারী-সরমা যমুনা দ্বারা ডাকিতেছেন। আমার আর অবস্থান করা মানের জন্ত নহে। ‘নমস্কার! আশীর্বাদ করুন।’ ইহা বলিয়া এক লক্ষ রসভূমিতে পড়িল ও আপন অস্ত্রের উপর আয়োজন করিয়া পূর্বদিকে দাঁড়াইল। অমনি দক্ষিণ হইতে

সর্বত্র লোহ বর্ণের আচ্ছাদিত অপর এক জন অখারোহী সতেজে রত্নভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অশ্রু বর্ণাক্ত কলসের দেখিয়া বোধ হয় অনেক দূর হইতে দৌড়িয়া আসিতেছে। সে অখারোহীও পূর্বদিকে সূর্য্যকুমারের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল। ভাট ভূমী বাজাইল। বহুনাও ভূমী বাজাইল। হস্তির উপরের ডকা বাজিল। নাগাড়া বাজিল। ভেরীও বাজিল।

সূর্য্যকুমার এত শীঘ্র চলিয়া গেল, যে মহারাজ আপত্তি করিতে সময় পাইলেন না। তাঁহার কখন অগ্রেও বোধ হয় নাই যে, সূর্য্যকুমার বুদ্ধ নামিষেন। বিজয় কুককে ডাকিয়া বলিলেন। “বিজয়কুক! আজ কি কুশ্রুত! দেখ হরতো সূর্য্য-কুমার হইতে অসাদিপের মাথা কাটা যার। সে বালক উগ্রব্রতাব, নিবারণ মামিল না। দত্ত করিয়া অত্যন্ত যোদ্ধাদিপের সম্মুখীন হইল। একপেই পরাত হইবে। তখন আর আমার অপমানের সীমা থাকিবে না। আমার এত কালের পোষিত আশা উল্লুপিত হইল। মনে করিয়াছিলাম, কতই সুখ পাইব। বাহা হউক, বাহাতে সূর্য্য-কুমারের অর হর, তাহার উপায় কর।”

বিজয়কুক বলিল। “মহারাজ! আর অরের উপায় নাই। যোদ্ধাসিংহোপম হর অনেক সহিত বধন সূর্য্যকুমার একাকী রণ প্রার্থনা করিল, তখন আপনি জয়াশা পরি-ত্যাগ করুন।”

চন্দ্রতাপের ভিতর রাণী সূর্য্যকুমারকে বিপদগলে একাকী যাইতে দেখিয়া ভীত হইলেন ও কহিলেন, “সরমা! দেখ, সূর্য্যকুমার একা হরজনের সঙ্গে যুদ্ধাশ্রে যা ইতেছে। কি কিংকোষ! তাহার কি জ্ঞান হইল না যে, এ অবস্থায় তাহার অয়ের লেশমাত্র লভাবনা নাই?”

সরমা ভীত হইলেন ও রত্নভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলিত হইলেন তাঁহার কণ্ঠ ভবাইয়া গেল। বন বন মিথাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব হইতে অবিজ্ঞাত আগনের ত্রাস ছিল, এ বেন সেই আশঙ্কা স্পষ্টাক্ষরে তাহাকে অবসর করিল। রণীর কথাই কোল উত্তর দিলেন না। মালতীর হাত ধরিয়া কিছু অন্তরে গেলেন ও কিছুকণ তাহার সুখ পানে চাতিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। অবশেষে বিন্দু বিন্দু জলও পড়িতে লাগিল। বলিলেন “মাগতি! কি বিপদ! দেখ সূর্য্যকুমার নিভাত আশ্র-বিন্মুত হইরাছেন। অমূলক অহকারে তর দিয়া রত্নভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। এক ব্যরও তাহিলেন না যে, তথায় তাঁহার পক্ষে কেবল পরাজয় আছে। তামিলেন না যে; পরাজিত হইলে মহারাজের অপমান ও হরতো তিনি সত বদলাইবেন। অত্যাচার অধুষ্টে কতই কষ্ট আছে! মাগতি! আমি সকল শ্রুত দেখিতেছি।

বুঝিতে পারিতেছি না। রূপাভিনয়ে অর পরাজয় কিছু এত গুরুতর ব্যাপার নহে, অথচ আমার কেমন ভাবী বিপদের আশঙ্কা হইতেছে বলিতে পারি না। আমার ভবিষ্যৎ আর ভাবিতে পারি না; আমার জ্ঞান বিদীর্ণ হইবে। এমনি পোড়া অদৃষ্ট ও এমনি আমার দৃষ্টি বদল্য যে, বাহ্যের সুখে সুখী হই, বিধাতা তাহারই মন্দ বিধান করেন। আমি অর্থ প্রার্থনা করি না, বল চাহি না, রাজ্যভোগ চাহি না, কেবল মনে মনে ভাল বাসিব, কিন্তু হুটুগ্রহে ভাল বাসিতেও দিবে না। আমার মন কেমন ডরিয়ে উঠিতেছে। সূর্য্যকুমারের একবার ভাবা কর্তব্য ছিল।”

মালতী বলিল। “সরমা। বুঝা কেন আপনাকে কষ্ট দাও। সূর্য্যকুমার অবশ্যই আপনার বল জানিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। সূর্য্যকুমার বালক নহেন। বুঝার্থী বীরগণের ক্ষমতাও জ্ঞাত আছেন।”

সরমা বলিলেন। “মালতি! তুমি যেন অপার লোকের মত কথা বলিলে।”

মালতী বলিল। “কেন সরমা? আমি কি অশ্রায় বলিলাম? তোমরা স্নেহে অন্ধ হও। ইচ্ছা করিয়া অভিলাষ প্রতিকূল সত্য কথাও শুনিতে চাহ না।”

সরমা বলিলেন। “আমার যে মন কেমন হইতেছে। ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। দুর্ব্বটনাহুচক আতঙ্ক হইতেছে। ইচ্ছা হয় একশি সূর্য্যকুমারের হাত ধরে লয়ে আসি।”

মালতী বলিল। “ভাব কেন। ঈশ্বর অবশ্যই সাহসীর মান রাখিবেন। সূর্য্যকুমার জয়ী হইবেন ও বিগুণ জ্যোতির সহিত তোমার নিকট মনে নিতে আসিবেন।”

সরমা বলিলেন। “তাই হউক। মালতি! তোমার কথা যদিচ অমূলক বলে জানিতেছি, তথাপি আমার মনেও শ্রীতি জন্মাচ্ছে, বর্তমান অভিনয়ে আমার বিশেষ চিন্তা নাই, অথচ কি একটা অচিন্তনীর হৃদৈব ঘটিবে হুগাঁ জানেন।”

রাণী বলিলেন। “সরমা। ঐ দেখ, সূর্য্যকুমারের দলে আর একজন বোকা দাঁড়াইয়াছে।”

সরমা বলিলেন। “ওটি কে?”

রাণী বলিলেন। “তা আমি জানি না। মালতি! ভাল ও বোকাটি কে?”

মালতী বলিল। “আমি উহাকে কখন দেখি নাই। তাতে আমার যে বর্ষের সর্কাজ ঢাকা চেনা যায় না।”

রসকুমিতে নামিয়া সূর্য্যকুমার দ্বিধা দৃষ্টিতে আপন বিপক্ষ দলের প্রত্যেককে দেখিলেন ও আপন তুরী লইয়া এমন বলে বাজাইলেন যে, বিপক্ষের অধিকগুলি চমকিয়া উঠিল। তুঁহায় তুরীর শব্দ প্রোভর পার না হইতে হইতেই পার্থক্য অজ্ঞাত বোকাও আপন তুরী বাজাইল। সূর্য্যকুমার পার্থক্য বর্ণাবৃত্ত পুঙ্খক লক্ষ্য করেন নাই। রবে ছয়

রবার প্রতিকূলে একাই বিক্রম প্রকাশ করিবেন বলিয়া অকুতোভয়ে মহা আকাশলেন তুরী বাজাইয়াছিলেন। কিন্তু পার্থক্য তুরী ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলেন ও অজ্ঞাত-কুলঙ্গল ব্যক্তিরা সাহায্য গ্রহণে কঁকঃ হইন্তুত চিত্তা করিতে লাগিলেন। হুই তুরীর গভীর নিনাদে দশ দিক্ পূর্ণিল। তুগাশক ক্রমে দূরের বনে প্রবেশ করিল। আর কিছুই শুনা যায় না। তখন দক্ষিণ দিক্ হইতে আর এক জন বোদ্ধা রত্নভূমিতে অব-চালাইল। সেটি মহারাজের সহস্র পদাতির অধ্যক্ষ। তাহার নাম মৌর্য। তাহার পশ্চাতে আর তিন জনা অবগোহীও রত্নভূমিতে নামিল। তাহার রত্নভূমিতে নামিয়া একবার স্থির হইয়া চতুর্দিকে নারাক্ষণ করিল ও পরেই অতিবেগে সূর্য্যভূমার পর্বে আসিয়া দলভুক্ত হইল। কিছুক্ষণ পরেই তাহার প্রত্যেকে তুগী বাজাইল। সূর্য্যভূমার মৌর্যকে কক্ষবন্দিত পুরুষের বিষং প্রিজ্ঞাসা করায় তিনিও কোন সন্ধান দিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে রণবীর বাহাদুরের দলস্থ সকলে স্বপ্ন তুগী বাজাইল। তুরার শব্দ ভুলিল হইল। তুরীশক ধাম্মল ভাট আবার গভীর স্বরে বলিল। “এক্ষণে আমার তিন বার ডাকা হইয়াছে। যোগাঙ্গ আসিবার তাহার আদিয়াছেন। স্থায়িত্ব হইবে। ইহাতে যে কেহ অগ্নী হইবেন, তাঁহার রাজসমিধানে মান পাইবেন ও মহাবীর ও রাজকুমারীর দল আভরণ ও মান পাইবেন। পরাজিত বোদ্ধা আপনার অব, অস্ত্র, অলঙ্কার ও বস্ত্র জগীকে দিবেন। যুদ্ধের অগ্রাঙ্গ নিয়ম যেমন পক্ষত্র অংগ, এখানেও তেমনি। পরাজয় স্বীকার করিলে তাহার উপর কেহ অস্ত্র চালাইতে পারিবেন না ও মহারাজের ভেতরী বাজিলেই ক্ষেত্র হইতে হইবে। এক্ষণে বোদ্ধাদিগের যে যে অস্ত্র যুদ্ধেচ্ছা হয় ও প্রকৃত কি অস্ত্র স্পর্শমাত্র যেদপ যুদ্ধে অতিলাষ হয়, তাহা বোদ্ধারা প্রকাশ করুন।” ভাট ধাম্মল। আবার তুগী বাজিল।

সূর্য্যভূমার অগ্রসর হইলেন। ডাঙিলেন ছয় জনা সুবিখ্যাত বীরের বিপক্ষে শুভেষ্টিয় স্থায় যুদ্ধে কোন ফল নাই। পরাজয়ের অপমান লইয়া ভীত বাক্য অপেক্ষা যুদ্ধপ্রাণ ত্যাগ বিধেয়। প্রকৃত অন্তঃকরই একপ বিহম বণে আমার পক্ষে প্রের। এবং আপনার বলয়ের শাণিত অগ্রদেশ দিয়া প্রথমে কক্ষবান্ধের ও ক্রমে বাকি পঁচ জনার জয়দেশ স্পর্শ করিলেন। তাঁহার দলস্থ সকলেই সেইরূপ করিল।

সকলে সিহরিয়া উঠিল। মহারাজ একট দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন “বিজয়কৃক! দেখ নির্বোধ বালক কি হান্সাম উপস্থিত করিল। অনর্থক রক্তপ্রাব করিবে ও হয়তো এই যগরণ অস্পরণে আমার উৎকৃষ্ট সেনাপতি কর জন মষ্ট হইবে। এ অর্ধাচীনটার কি মৃত্যুভয় নাই?”

বিজয়কৃক। “মহারাজ! এতকালের পর হয়তো মনিরামরাজ নির্বংশ হইলেন।”
ওদিকে ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে সম্মা অধৈর্য হইয়াছেন। তাঁহার মুহু মুহু শ্বাস মাত্র

বহিষ্ঠেছে। সুখে ব'ক্য মাত্রটি নাই। মালতী তাঁহাকে হির হইতে পরামর্শ দিতেছে। রাণী নিতান্ত বিষয়া।

এ দিকে দামামা বাজিল ও নহোবডও বাজিল। কিছুকণ পরেই সকল বাণ্য থামিল। ক্রমে বোদ্ধাদিগের অশ্ব অস্থির হইল। বিকট বলে ঘন ঘন থলীন (১) চৰ্বেণ করিতে লাগিল। ফেনসকুল মুখ শুভ্রীকৃত হইল, পদাঘাতে ভূমি চৰিয়া কেগিল, হুলিরাশি পতীর তোপোদ্গারিত ধুমচেষ্টার দ্বার গড়াইতে লাগিল। এক একবার লস্করের পদাঘাত কোন প্রান্তরথণ্ডে লাগিয়া অগ্নিস্কুলজি নির্গত হইল। পরে মহারাজ আপন হস্তে তুরী লইয়া এক অবৈ আয়োজন করিয়া ব্যাঘ্রের অগ্রভাগে গিয়া মনে একবার ধ্বসি করিলেন।

স্বর্ধাকুমারের দল ক্রমে অশ্ব পাদবিক্ষেপে অশ্ব লইয়া বঙ্গভূমির দক্ষিণ প্রান্তে গেল। কৃষ্ণনাথও দক্ষিণ প্রান্তের পশ্চিম দিক্ প্রান্তর করিলেন। মহারাজ আবার তুরী বাজাইলেন। অমনি কৃষ্ণনাথ ও স্বর্ধাকুমার আপন আপন শেল বন্ধহলে রাখিলেন। তখন তাহাদিগের অশ্ব আর স্থির হয় না। বোদ্ধার মনও আর স্থির হয় না। উভয়েই দক্ষ অশ্বরোহী, উভয়েই দক্ষিণ হস্তে শেল, বাম কটিতে তলবারী ও বাম বাহতে চর্য। উভয়ে যেন উন্নত সিংহচেষ্টার দ্বার পরস্পরের উপর অগ্নি-দৃষ্টিপাত করিল। দর্শকগণ উৎসুক হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল।

কৃষ্ণনাথ বলিল। “স্বর্ধাকুমার! তোমার বৈভবতরী করিয়াছ? পিতৃতর্পণ করিয়াছ? না করিয়া থাক তো একবার তর্পণ করিয়া লও। তোমার পিতৃলোকেরা অন্য শেষ গণ্ডুষ জল পাইবেন। এখনো বলি, পরাজয় মানিয়া ফিরিয়া যাও।”

স্বর্ধাকুমার কিছুই বলিল না। উত্তর দিবার মধ্যে দত্ত নিশীড়ন করিয়া একবার হুকার দিল।

কৃষ্ণনাথের অশ্ব পাঁচ জন বোদ্ধা কৃষ্ণনাথের পশ্চাতে দাঁড়াইল। স্বর্ধাকুমারের চারি জন এক শ্রেণিতে দাঁড়াইল। তাহাদিগের পশ্চাৎ অজ্ঞাত অশ্বরোহী দাঁড়ইল।

মহারাজ বহুদূর তুরী লইয়া আবার বাজাইলে অমনি কৃষ্ণনাথ ও স্বর্ধাকুমার উভয়েই বিদ্রোহে অশ্ব চালনা করিলেন। হুলি উড়িল কিছুই দেখা গেল না। সরমার প্রাণও হুলির সঙ্গে উড়িল। চেতনাধীন। চিত্ত পুতলিকা মত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনিমেঘ বিস্ফারিত লোচন। ঈষৎ উন্মোচিত গুণ্ঠন। বকের ঘন ঘন হিলোল। কিন্তু তৎকণাৎ যেন বজ্রপাতের মত একটি কাপ্তানা শুনা গেল। তাহার পরেই দেখা গেল যে, উভয় অশ্বরোহীর শেলসত্তা ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়াছে।

যোদ্ধারা আবার পশ্চাত্তানে গিয়া পূর্নস্থান আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়াছে । সরমারও সহসা স্মৃতিতনত্র সত্বে স্বর্ধকুমারের মুখশ্রী লক্ষ্য করিতেছে । কপোল হইতে কঙ্কনা অবশমাত্রে বিলুপ্ত রাগ আবার ক্রমে পবিত্র কমলপ্রভ মুখকে আক্রমণ করিল । ললিত অথ বোদ্ধারা স্ব স্ব স্থানেই দাঁড়াইয়াছিল । রাজপুরুষেরা অমন উত্তর বোদ্ধাকে নুতন শেল দিল । মহারাজ বিজ্ঞানের জন্ত অলঙ্করণ দিয়া আশ্রয় তুরী বাজাইলেন । অমনি চুই বোদ্ধা পরস্পরের বিপক্ষে দৌড়িল । আবার একটি বন্ধন : শুনা গেল । আবার সরমা সংজ্ঞাহীন । বাপ্পাফুল লগট । কৃষ্ণনাথ স্বর্ধকুমারের অসহ বলে আপন অবস্থাতে নিপাতিত হইয়াছিল ; কিন্তু পরক্ষণেই দাঁড়াইয়া আপন কটিদেশ হইতে তলবার লইয়া অতিবেগে চলাইতে লাগিলেন । স্বর্ধকুমার কৃষ্ণনাথকে নিরস্ত বোধিয়া আপন অবস্থাতে অবতীর্ণ হইলেন ও তলবার লইয়া কৃষ্ণনাথকে আক্রমণ করিলেন । কৃষ্ণনাথের হাত লিখিল হইল । স্বর্ধকুমার কৃষ্ণনাথের আঘাত অতিক্রম করিয়া তাহার শিরোদেশে ধরতর আসি বিকট বিক্রমে উঠাইলেন ও এক আঘাতে তাহার স্বরূপ হইতে লক্ষণ বাহ ও মুণ্ড ভিন্ন করিতেন, কিন্তু পশ্চাত্ত হইতে হজুরমল আসিয়া এমত বেগে স্বর্ধকুমারের ববেদ্যত হস্তের উপর আসি মারিলেন যে, স্বর্ধকুমারের কঠিন বস্ত্র ঠনঠন করিয়া উঠিল ও হস্ত অবশ হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু হজুরমলের আসিও বেগে ঠোঁটেরা বও বও হইল । স্বর্ধকুমার কণেকের জন্ত জ্ঞানশূন্য প্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন । হজুরমলও হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল । কৃষ্ণনাথ আসি লইয়া ছেলোদেগে হস্ত উঠাইলেন । অমনি মালিকরাজ দৌড়িয়া খড়্গা উঠাইলেন ও স্বর্ধকুমারকে আঘাতশয়ে চালালেন । লক্ষণগণ এককালে চৌকর করিয়া বাজিল । “স্বর্ধকুমার ! মালিকরাজকে দেখ ।” সরমা অমনি চক্ষুর স্বাভাবিক বিচ্যুতের মত হস্ত-সংকরণ করিলেন । অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া উঠ হইয়া দাঁড়াইলেন । স্বর্ধকুমার লক্ষ্যমাত্র জ্ঞান পাইয়া যেমন দেখিলেন অমনি আপনায় বাহ হস্তে ধুঠার লইয়া শিরোদেশে এক আঘাতে কৃষ্ণনাথকে অচেতন করিয়া রূপভূমিতে পাড়িলেন । অমনি ফিরিয়া মালিকরাজকে লক্ষ্য করিতেই মালিকরাজ বিচ্যুতের মত তাহার শিরোদেশে খড়্গা চালাল । দূরস্থ অজ্ঞাত বোদ্ধা অমনি আসিয়া মালিকরাজকে আপনায় তলবারের এক আঘাতে ভূমিশায়ী করিলেন । মালিকরাজ অচেতনে স্থাপিতের মত অবস্থাতে ঝুলিয়া পড়িলেন । কৃষ্ণনাথ চৈতন্য পাইয়া আপন অবস্থার আহ্বান করিল । স্বর্ধকুমারও চৈতন্য পাইলে এক লক্ষ আপন অবস্থার বসিলেন । হজুরমল, ফতেসিং প্রভৃতি কৃষ্ণনাথের দল স্বর্ধকুমারের দলের উপর আক্রমণ করিল । লক্ষণগণ যোয় বুদ্ধ হইল । কে বাহাকে মার, যে কোথায় অবস্থায়, কিছুই দেখা যায় না, কিছুই শোনা যায় না । কেবল ধূলী মেঘ, অবশ্যে দ্রোণব, পদাঘাতের টকাটক

শব্দ ও অস্ত্রের চাঞ্চল্য। অজ্ঞাত বীর বিজ্ঞ কাহাকেও আক্রমণ করিলেন না। কেবল অস্ত্র বোদ্ধারা আক্রমণ করিলে অন্তর্চালন ঘরা তাহাদের ফরাইয়া গিলেন। ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনটা রথী পড়িল। তাহার পরকণ্ঠেই সূর্য্যকুমার হজুরমলকে নিরস্ত্র করিয়া আপনার প্রকাণ্ড কুঠারাবাণে তাহাকে ভূমণ্ডায় ও মালিকরাজকেও সেই অবস্থায় রাখিয়া কুকনাথের শিরোদেশে খেল লক্ষ্য করিয়া বিষমবেগে আঘাত করিলেন। কুকনাথ অথ হইতে পাতিত হইলেন। অমনি সূর্য্যকুমার আপন অস্ত্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া কুকনাথের বক্ষস্থলে দক্ষিণ পাদ দিয়া তলবারা উঠাইয়া কহিলেন, “পরাজয় স্বীকার কর। নতুবা তোমাকে সমালয় পাঠাই।” কুকনাথ কহিল, “কি! ভোর কাছে পরাজয়?”

মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপনার সেনাপতির অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধ ভঙ্গের ভেরী বাজাইলেন ও কহিলেন। “সূর্য্যকুমার! উহাকে প্রাণে মারিও না, ও পরাস্ত হইয়াছে। অন্যকার যুদ্ধে তুমিই বীর।” সূর্য্যকুমার আপন পাদ উঠাইয়া ব্যস্তে কুকনাথের পাদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল ও ব্যস্তে মালিকরাজের পার্শ্ব বসিয়া তাহার শুভ্রবা করিতে লাগিলেন। রাজপুরুষেরা মৃত তিন বোদ্ধার শব উঠাইল। দেখে, তেজ বাঁ, চেং নিং ও অপর একটা সূর্য্যকুমারের দলস্থ সেনাপতি। সূর্য্যকুমারের দলস্থ বোদ্ধারা যুদ্ধক লীন প্রায় অস্তরে ছিল বলিয়া আর কেহই আঘাত পায় নাই। মহারাজ বিজয়-কুককে বলিলেন। “তুমি সূর্য্যকুমারের তিন জন অশ্বারোহীকে মাত্র কর। আমি সূর্য্যকুমার ও অজ্ঞাত বোদ্ধাকে আনি।” এই বলিয়া রত্নভূমিতে নামিলে দেখেন, অজ্ঞাত অশ্বারোহী দক্ষিণ দিকে আপন অস্ত্র অতিবেগে চালাইয়া মাঠের প্রায় মাঝে গিয়াছে। তাহাকে অস্থান করিলেন, কিন্তু সে শুনিল না। আপন মনে একবেগেই চলিল। আবার ডুহীও বাজাইলেন, সে শুনিল না। পরে একজন অশ্বারোহী রাজপুরুষকে তাহাকে ডাকিতে বলিলেন, কিন্তু সে ঘাইতে ঘাইতে অজ্ঞাত অশ্বারোহী দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেল। আর লোক প্রেরণ বুঝা জ্ঞানে রাজপুরুষকে ডাকিলেন। ওদিকে বিজয়কুক তিন জন বোদ্ধাকে চন্দ্রাতপের নিকট রাখিয়া আপন পুত্র মালিক-রাজের নিকট আসিলেন। মালিকরাজ চেতনা পাইয়া আপন অস্ত্র আয়োজন করিয়া রত্নভূমি ত্যাগ করিয়া আপন শিবিরের দিকে চলিয়া গেল। হজুরমল ও কুকনাথ চৈতন্য পাইয়া আপন শিবিরে গেলেন। মহারাজ সূর্য্যকুমারকে অস্ত্র আয়োজন করাইয়া স্বয়ং অস্ত্র বলুগা (১) ধরিয়া চন্দ্রাতপের ভিতর লইয়া গেলেন। অস্ত্রচক্কা বাজিল। নহেবত রাজ্য। তুয়া রাজ্য। ভেরী বাজিল।

সরমার আর আশোনের সীমা নাই। সরমা প্রেমের দ্রবীভূত। স্বধ উপনিব। কিন্তু আনন্দপ্রবাহের মধ্যেও মন ব্যাকুল হইল। মগতীর কণ্ঠধারণ করিলেন। আঁহা প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হটল বটে, কিন্তু তাহে উত্তরের স্বধ উপজল। মগতী বুঁকল। সরমা পাইল। মগতীরও মন মজিল। আধ-মুদ্রিত মেতদলের লোম সরমার কোমল কপোলে মিলিল। সরমার উজ্জ্বলিত মনের উল্লসিত-তর্পিত তুঙ্গতন-ঘরের আক্ষ'লন মগতীর সম তুঙ্গতন-গুণে লাগিয়া ধিক্তগলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। কি পবিত্র প্রেম! কি সঙ্গের প্রার্যবায় স্বধ!

পরে মহারাজ আপন চৌকিতে স্বধ-হুমারকে বসাইয়া আপনি এক রাজপুরুষ আনীত অব লইয়া তাহাকে নিদেন ও উৎস উদ্যোগ উৎস বর্ষ ও উৎস অন্ত সকল তাহাকে দিয়া পুরস্কার করিলেন। দর্শকরা স্ব স্ব স্থানভিমুখে চলিয়া গেল। মহারাজ, স্বধকুমার, গঙ্গালিঙ্গ ও অচ্যুত রাজপুরুষেরা দলংক হইয়া রাজবতীর দিকে চলিল। পথে গঙ্গালিঙ্গ স্বধকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল। “স্বধকুমার! দিল্লীবরের সহিত মহারাজের কি প্রকার প্রণয়?” মহারাজ বলিলেন। “স্বধকুমার! গঙ্গালিঙ্গ তোমাকে কি বলিতেছেন?”

গঙ্গালিঙ্গ বলিল। “মহারাজ পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, গঙ্গা, অভয়, নহোবত প্রভৃতি কতিপয় রণ-সংক্রাম কেবল দিল্লীবর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন অস্ত্র কেহই ব্যবহার করিতে পারে না। আপনার সৈন্যमध्ये সেই সকলের ব্যবহার দেখিয়া স্বধকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যে আপনি কি দিল্লীবরের অনুমতি লইয়াছেন?”

মহারাজ সাহকারে বলিলেন। “কি! দিল্লীবরের অনুমতি! কেন অভয়, নহোবত অস্ত্রে ব্যবহার না করিবে? বাদশাহের নিবারণের কি ক্ষমতা আছে। তাঁহার অনুমতিতে ব্যবহার করা অপেক্ষা না করা ভাল।”

এইরূপ কথোপকথনে সকলে রাজ্যের প্রবেশ করিল।

পঞ্চম অধ্যায় ।

“লক্ষ্যভবের হৃৎকণ্ঠ জলেবু পল্লব ।”

রণাঙ্গিনের পর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন ঘরে আসিয়াই বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিলেন। বিজয়কৃষ্ণ উপস্থিত হইলে বলিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ! কৃষ্ণনাথ সেনাপতির কুশল বল। সূর্য্যকুমারের সহিত রণে তাহা কোন সাংঘাতিক চোট লাগে নাই ?

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। ‘মহারাজের পুণ্যপ্রতাপে কৃষ্ণনাথ হুস্থ শরীরে আছেন। আপনার সাক্ষাতে আসিতেছিলেন। কিন্তু পথ হঠাতে ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, ‘আমি আর’এ মুখ কি করিয়া মহারাজকে দেখাইব। যুদ্ধ কেন আমার মৃত্যু হইল না ! আমার কোন অস্ত্রই চোট লাগে নাই, অথচ আমি পরাজিত হইলাম।’ বাহা হউক সূর্য্যকুমার দিল্লী হইতে ভাল বুদ্ধ কৌশল শিখিয়াছে। মহারাজ ! কৃষ্ণনাথ নিজান্ত্র বিমর্ষ হইয়াছে। কিন্তু মালিকরাজ এখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে বলে, যুদ্ধে জয় পরাজয় অবগতই আছে। আমাদের কোভাপেক্ষা সমুদ্র হওয়া কর্তব্য। আমাদের মহারাজের প্রিয় পাত্র এমত বোদ্ধা হইয়াছে যে, আমাদের ছয় জনকে একাই পরাস্ত করিল।

মহারাজ বলিলেন। “সূর্য্যকুমার তাগর পিতার জায় বীর হইল। বিজয়কৃষ্ণ ! এক্ষণে তাহাকে বশীভূত রাধিতে পারিলেই আমরা অন্ত্রেশে মানসিংহকে তাড়াইয়া দিব। কেমন তোমার লোক বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “না আজ্ঞে অসে নাই। অন্য বর্দ্ধমান হইতে কতকগুলি ব্যবসায়ী আসিয়াছে, তাহাদের মুখে বা অনিলাম, তাহা বড় সূক্ষ্ম সমাচার নহে।’

রাজা বলিলেন। “তাহারা কোন্ গ্রামে বাস করে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “একজন বসন্তুরায়ের এলাকায় থাকে, বাকি কেহ বর্দ্ধমানাধিপের প্রজা, কেহবা বালেশ্বরের বাসিন্দা। আর দুই জন বশোরের লোক ও ছয় জন ঢাকার।

রাজা বলিলেন। “বশোরের লোক দুটি কে।’

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “রামপ্রসাদ বাবুর লোক। ইহারা সর্বদাই বর্দ্ধমানে বাস-
রাত করে।”

রাজা বলিলেন। “তাহারা কি সমাচার দিল।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তাহারা বলিল, দিল্লী হইতে ফৌজ আসিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছে। দিল্লীতে এক্ষণে জাহাঙ্গীর বাদশাহ হইয়াছে। কুন্নিখাঁ নবাব বর্দ্ধমানাধিপের নিঃস্ট দিল্লীর লঙ্কাকে রসত দিতে পত্র দিয়াছেন। লঙ্কর অতি অল্প দিন ভাঙ্গা অবস্থান করিয়া হয় পূর্ব্বরাজ্যে নব্বতো উড়িয়ায় বাইবে।’

রাজা বলিলেন । “তবে অন্য বর্ধমানরাজের নিকট যাইব । সেখানে অবশ্য সকল সমাচার পাইব ।”

বিজয়রত্নক বলিল । “দেখিবেন কোন ক্ষেত্রে আপনার মনের কথা যেন বর্ধমানরাজ না বুঝিতে পারেন । তাঁহার মত জরাজেঁদে লোককে একশে আশাধিনের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কৰ্ত্তব্য নহে ।”

রাজা বলিলেন । “তোমার সম্মুখের কি কিছু কারণ আছে ।”

বিজয়রত্নক বলিল । “মহারাজ ! সাম্রাজ্যের মার নাই । আর আপনার মন্ত্রণা সকলকে প্রকাশ করা উচিত নয় ।”

‘ রাজা বলিলেন । “সে চিন্তা করিও না, আমি কিছু বালক নহি ।”

বিজয়রত্নক বলিল । “যক্ষরাজ ভ্রাতা অনুপরাম কি সত্য লঙ্কায় গিয়েছেন ?”

রাজা বলিলেন । “বর্ধমানাধিপতো আমার এমনতর লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পত্রের মর্ম্ম সব আমি বুঝিলাম না । তিনি আমার পত্রের উত্তর দেন নাই, কেবল অল্প কথা লিখিয়া শেষে আমার সহিত সাক্ষাতে করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । লিখিয়াছেন যে অনুপরামও ওখায় আছেন, কিন্তু অনুপরামের আগমনের কারণ কি ও আমারই বা সঙ্গে তাঁহার কি প্রয়োজন ?”

বিজয়রত্নক বলিল । “আমি বোধ করি অনুপরামও আপাদিগের পক্ষ । সন্মুখ হয় না, পূর্বে শুনিয়াছিলেন যে অনুপরামের ভ্রাতা রাজ্যাভিষিক্ত হওয়াতে অনুপরাম রাজসভা ত্যাগ করিয়াছেন ।”

রাজা বলিলেন । “আমরা বদ্যাপি পঞ্জালিশকে আমাদিগের দলভুক্ত করিতে পারি ।”

বিজয়রত্নক বলিল । “আপনার এ সময় রায়গড়ের বিষয়ে হাত দেওয়া ভাল হয় নাই ।”

রাজা বলিলেন । “কেন রায়গড়ে আমার অল্প মন্ত্রণার কি ক্ষতি হইতে পারে ।”

বিজয়রত্নক বলিল । “স্পষ্ট ক্ষতি এখন কিছু দেখা যাইতেছে না, কিন্তু বখন একটা হানাদা উপস্থিত, তখন অস্ত্রাশ্র বাজে কাজে ব্যস্ত থাকিয়া সময় নষ্ট করা কি বিধেয় ।”

রাজা বলিলেন । “আত্মের কি বিধি আছে । আমিও সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়াছি । কমলা কোন মতেই রাজি হন না । সহজে কৰ্ম্ম সিদ্ধ হইল না বলে, কি নৈরাশ হয়ে ত্যাগ করবো । নৈরাশও কতবার হয়েছি । তোমার কথা শুনে কতবার প্রাণত্যাগ করেছি যে আর ভাবিব না । কিন্তু ভাবনা যেন কোথা থেকে এসে । সে যে যুব তা । কি কখন ভুলতে পারি । তাতে আমার বখন জানি যে সেটি আমার জন্যই বন্ধ করে প্রতিপালিত হয়েছে । আমি বরাবর মনে কর্ত্তাম যে, সে আমারি ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ কেন ইন্দুমতিকে ব'লৈ পাঠান না, তাতে দেখুন না তাঁর কি মত। আর তাঁর অমতেঃ ই বা কারণ কি। আপনি রাজপুত্র, যোগ্য পাত্র, বলবান্ রূপবান, তাতে আবার একশে স্বয়ং রাজা। তিনি রাজপুত্রের চেয়ে অবশ্যই যথেষ্ট ণাক্ষরেন ”

রাজা বলিলেন। “আমি কি বল'ত থাকি রেখেছি ? প্রথমবার বসন্তরায় বর্তমানে যখন রাজপুত্রে বাই, কেন তুমিও জান, আমার সে বার রাজপুত্র বাইবার উদ্দেশ্যই তাই ছিল। নতুবা খুড়া বসন্তরায়ের সঙ্গে দেখা করা আমার তত প্রয়োজন ছিল না।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “হাঁ, তাহে ইন্দুমতীও কিছু স্পষ্ট বলেন নাই।”

রাজা বলিলেন। “স্পষ্ট বলিবেন না কেন। স্পষ্টই ব'লেননি। তিনি বলিলেন, ‘মহারাজ আপনি রাজবংশী রাজা, তাহে আমার রূপযৌবন সম্পন্ন। আপনার মত আমি পাওয়া আমার পক্ষে মান্তকর নাট কিন্তু ইহা কোন ক্রমে সুখকর হইবে না। আপনি শাস্ত হউন। আমার অপেক্ষা রূপসৌ কত শত দানী আপনার আছে ও মনে করিলেই পাইতেও পাবেন। আমার আপনার সহিত কখনই মিলন হইবে না; আমি এক প্রকার বিবাহিতা ব'লিলেই হয়।’ তাহা'ত আমি ব'ললাম ব'দ বিবাহিত জ্ঞান কর, তবে আমার বেধ হয় তুমি বিধবা। সাংসারী বচুণায়ের আর সম'চার পাওয়া যায় না। আমার যৌব হয়, সে আকবর সম্রাটের কোন যুদ্ধে দেহত্যাগ করি'রাছে। বিজয়কৃষ্ণ! ইন্দুমতী আমার কথাটি শুনে অমান্ন মাতা নোরাইলেন, আর তাঁহার নেত্রের সহিতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তাহার মুখ দেখিয়া আমি আপনাকে থিকার দিলাম ও সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, তবে আবার এত অধৈর্য হন কেন। তাহার চিন্তা মন হইতে দূর করুন। আপনার মত বীর পুরুষ কি অতি সামান্ত স্ত্রীর নিবট পরামর্শ স্বীকার করিবে ?

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ ইন্দুমতীর চিন্তা দূর করিতে বলা অতি সহজ বলে, কিন্তু সে মুখশ্রী কি আমি কখন ভুলব। সে শ্রী আমার অস্থিতে চিহ্নিত হয়েছে। আমি অবশ্যই তাহাকে আমার অধীন করিব। প্রেমে জর করিতে পারি নাই, এ'বার বল ও কোণে অশ্রুই কৃতকার্য হইব। তুমি পুনঃপুনঃ আর আমাকে বিরত হইতে কহিও না। তোমার কথা শুনিলে রাগ জন্মে। আমার আর বিরত হইবার সময় নাই।

বিজয়কৃষ্ণ অতি চতুর রাজমন্ত্রী। বতবার সময়ে সময়ে মহারাজকে এইরূপ নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিরাছে, ওতবাসই মহারাজের বিরক্তি দেখিরাছে। কুরোজরাজ

প্রতাপাদিত্যের মত স্বার্থপর ও সাহসী রাজার বিপরীতচরণে আপনার জ্ঞানে কান্ড হইল। মনে মনে প্রতাপাদিত্যকে দিবা করিয়া এককালে মৃত বললাইয়া কহিল “মহারাজ, আমি কেবল আপনার প্রেমের বল পরিমাণ করিতে ছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম আপনি নিভাত্ত অনিবার্য্য। অতএব মহারাজ যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মৃত্যু। কিন্তু আপনি যে বর্জমানাধিপের নিকট বাইবেল, আপনার সঙ্গে কি লঙ্কর বাইবেল?”

রাজা কহিলেন। “না, কেবল আমি, গঙ্গালিস ও কুকনাথ তিন জনে ভবে বাইব। আমারদের সঙ্গে আর কাহাকেও বাইবে হইবে না। কৈ এখন গঙ্গালিস আসিল না কেন? দেখ কাহাকে বল, গঙ্গালিসকে ডাকিয়া দেয়।

বিজয়রক্ষা রাজার সম্মুখে হইতে চলিয়া গেল। মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, সরমা ও মহারানী বলিয়া আছেন। রাজমহিলাপণ অহারের উদ্যোগ করিতেছে। রাজাকে দেখিয়া রানী সসন্ত্রমে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, “আপনি কি এক্ষণে আহার করবেন।”

মহারাজ বলিলেন। “না আমি অন্য সময়কালের পর আহার করিব। কৈ, হৃদয়কুমার এখানে আসে নাই। তাহাকে অন্য বহু করিয়া খাওয়াইও।” রাজা বাহিরে চলিয়া গেলেন। পথে হৃদয়কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন। হৃদয়কুমার এক্ষণে আমার অবকাশ নাই, আমি বর্জমানাধিপের নিকট চলিলাম। বাও ভূমি একাকী থাক। সময়কালে এবত্রে বাইব। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তোমার কর্পোণবোণী পুরস্কার হয় নাই। তুমি প্রকৃত বীরের কাল করিয়াছ। আমি তোমার নিকট বাধ্য আছি। ভূমি অতি শীঘ্র কিন্নীটী হইবে।

হৃদয়কুমার মস্তক নত করিয়া সমস্ত করিল; অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বলিল। “মালতী কোথায়, কৈ যমুনাকে ডাক, আমার হার ও মাস্ত চাই। রানীকে গিয়া বল। সরমা কোথায়?” মালতী দূর হইতে উত্তর করিল “মহাশয়, আপনি ঐ পূর্বদিকের দালানে বান সকলকেই পাইবেন। আমি বাইতেছি। আমাকে পুরস্কার দিতে হইবে।” হৃদয়কুমারের শব্দ পাইয়া সরমা হাসিয়া আপন ঘরে গেলেন। হৃদয়কুমার রানীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রানী বলিলেন, “হৃদয়কুমার এত বিলম্ব কেন? আবার তোমার প্রতীক্য করিতেছিলাম।” হৃদয়কুমার রানীকে প্রণাম করিয়া বলিল, “কৈ সরমা কোথায়।”

রানী বলিল। “এই তোমার শব্দ পাইয়া উঠিয়া গেছেন। আমি ডাকিতেছি।” সরমাকে আহ্বান করিলেন।

সরমা বলিলেন। “না, আমি এখন বাইরে পারিব না, একটা কার্খো ব্যস্ত আছি।”

রাণী বলিলেন। “স্বর্ধাকুমার আহারের কিছু বিলম্ব আছে, তুমি দেখ, সরমা কি কর্ণে ব্যস্ত বে, উঠিয়া আসিতে পারেন না। স্বর্ধাকুমার গমনোন্মুখ হইয়া বলিল, “আমার কি পুরস্কার ও মান্য করিবেন, স্থির করিয়াছেন।”

রাণী বলিলেন। “আমি তোমাকে কি দিতে বা কি দাখিরাছি, তুমি বল দেখি, কি দিলে তোমার ভাল হয়।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “আপানার ভাল হারটি কি বখেই হইল ?

রাণী বলিলেন। “আমার বঠের হারটিই দিব” স্বর্ধাকুমার হাসিয়া বলিল “আমি সেটা কর্তেই রাখিব।”

স্বর্ধাকুমার সরমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সরমা এক খাটের উপর বসিয়া একটি কাগজে চিত্র আঁকিতেছেন। স্বর্ধাকুমারকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কাগজটি আপন বাস্তুর ভিতর রাখিলেন।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “সরমা কি কর্ণে ব্যস্ত !”

সরমা বলিলেন। “তুমি আমার এখন কেন এলে ? আমি কিছু ব্যস্ত আছি, একবার এখান থেকে বাও।” স্বর্ধাকুমার হাসিয়া বলিল, “না, কথার বাইব না, আমাকে হাত বরিয়া বাহির করিয়া দাও। নতুবা আমি এই বসিলাম।” সরমা হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা বস, আমার তাকে বিশেষ ক্ষতি নাই।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “তৈ আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও।”

সরমা বলিলেন। “না তোমাকে কি দিলেন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “ভালি আমাকে জাহার কর্তের হার দিবেন বলিয়াছেন। একপে তুমি কি দিবে তা বল।”

সরমা বলিলেন। “আমি তোমাকে কি দিব, তা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। তুমি বল দেখি আমি কি দিব ?”

স্বর্ধাকুমার মুহূর্ত্তে হাসিল ও সরমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, সরমা একবার চক্ষু দিয়া স্বর্ধাকুমারের প্রতি দেখিলেন। চারি চক্রে মিলিল। আহা উভয়ের কি দিব্য (১) আনন্দ জন্মিল। উভয়েই পরস্পরের মুখ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইল না। আর কোন চিন্তাই মনে নাই, মনে আর কোন ভাবই নাই। কোন শব্দই আর কর্ণে যায় না। সরমা কিছুকণ স্বর্ধাকুমারের চক্রে দিকে দেখিয়া অমনি নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পান নাই। স্পন্দরহিত হইয়া উভয়ে

সরমা বলিলেন। “আমি তোমাকে বা দিব তা তুমি কাল জানিতে পারিবে, দেখ না, রাজাই বা কি পুরস্কার করেন।”

মালতা স্বর আসিয়া বলিল। “স্বর্ধাকুমার! আহা! প্রস্তুত হইয়াছে, এস রাণী ডাকিতেছেন।” স্বর্ধাকুমার আর একবার সরমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অনন্ত হইয়া উঠিল। সরমা তাহার পশ্চাৎ হইলেন।

প্রতাপাদিত্য যখন সুবরাজ ছিলেন, তখন দুই বৎসরের বালক স্বর্ধাকুমারকে আপন গৃহে আনেন ও আপনার স্ত্রী একজনকার স্নান করিতে দেন। রাণীর সন্তান না থাকতে রাণী পুত্রবাৎসল্যে তাহাকে প্রতিপালন করেন। পরে সরমা জন্মিলেও স্বর্ধাকুমার যেন জ্যেষ্ঠ সন্তান-স্নেহে পালিত হন। স্বর্ধাকুমারের বয়স্ক্রম এখন প্রায় বাইশ বৎসর, তিনি সরমা অপেক্ষা প্রায় পাঁচ বৎসরের বড়। কিন্তু চিরকাল সরমার সহিত এবত্রে খেলা করিয়াছে ও সময়েকে যেমন আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিত। অন্য মহারাজের দুই তিন বার কথাপ্রণী তানিয়া ও রাণীরও কাস্তান্ত্রি দেখিয়া তাহার মনে যেমন নৃপতন তাব জন্মিয়াছিল। আবার এক্ষণে সরমার প্রতি দৃষ্টি হওয়ার কেমন জ্বলন্ত হইতে লাগিল। সরমা যদিচ বালিকা, কিন্তু প্রায় এক বৎসরের অধিক হইল স্বর্ধাকুমারকে দেখিলেই কিছু লজ্জিত হইতেন ও কখন কখন তাহার কোমল গুণদেশ আচ্ছন্ন হইত। অন্যকার চক্ষুরিলনে তাহার সেই ভাব আরও বাড়িল ও পূর্ণাপেক্ষা স্বর্ধাকুমারের আহ্বানের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিলেন। যদিচ তিনি স্বয়ং কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু ধূর্তা মালতা সেটি লক্ষ্য করিয়াছিল।

স্বর্ধাকুমার আহ্বারে সরমার স্বর পান খাইয়া কিছুকণ অবস্থান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। দেখে রাজা নাই। তিনি বর্জমানাধিপের নিকট গিয়াছেন। সভায় বিজয়রক্ষ বসিয়া আছেন। বিজয়রক্ষ স্বর্ধাকুমারকে দেখিয়া বলিল। “স্বর্ধাকুমার! সুদূর পথ তোমার সহিত কৃকনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “না কৃকনাথ সুদূর অব্যবহিত পরেই আমার নিকট তাহার অস্ত্র ও বস্ত্র ও অস্ত্রাদি সকল পাঠাইয়াছিল, কিন্তু আমি সে সকল ফিরাইয়া দিয়াছি, তাহাতে তাহার লোক আমাকে তৎপরিবর্তে পণ ধর্য্য করিতে কহে। আমি ভূখণ্ড হইয়া তাহার শিবিরে যাই, কিন্তু শুনিলাম, সে শিবিরে নাই।”

বিজয়রক্ষ বলিল। “আমার পুত্র তাহার অস্ত্রাদি পাঠান নাই?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে আমি একটি ধান মোহর মাত্র লইলাম। সেইরূপেই অস্ত্র কয়েক জনার সঙ্গে হিলাচ চুকিল। কৃকনাথ আমার প্রতি বোধ হয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাহার ক্রুদ্ধ হইবার কারণ নাই।

মৎকর্তৃক পরাজিত হওয়ার তাহার চূড়ান্ত হওয়া উচিত নয়। অর পরাজয় কাহারও হাত লেহে, বৈবেয় কর্তৃ। ঐ দেখে মালিকরাজ আশিত্তেছেন।”

মালিকরাজ বুকের পর রাজার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া রাজসভার আসিলেন সূর্যকুমার বলিল। “এস তাই কোলাহুলি করি।”

মালিকরাজ সূর্যকুমারের সমবয়স্ক ও বাণ্যাবধি বরাবর সূর্যকুমারের সঙ্গে একত্রে পাঠ ও দিল্লীতে অগ্রাশিকা বণত দিবা রাত্রি একত্রে বাস করেন। কলে সূর্যকুমার ও মালিকরাজ এক শিবিরেই থাকিতেন, কেবল আহাের সময় রাষ্ট্রের অনুরোধ বণত রাজবাটীতে বাইতেন, কিন্তু মাসের মধ্যে প্রায় বিশ দিন মালিকরাজকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে আহােরা আশিত্তেন।

মালিকরাজ বাহু প্রসারিয়া সূর্যকুমারকে আলিঙ্গন করিল ও উভয়ে হাত ধরাধরি করিল। একত্রে সে গৃহ হইতে বাহিরে গেল।

মালিকরাজ স্বভাবতঃ উদার। সূর্যকুমারের সহিত তাহার যথেষ্ট মৌহুদ্য ছিল। এমন কি, সূর্যকুমারকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না। সূর্যকুমারও মালিকরাজকে সমুচিত শ্রদ্ধ করিত, পরস্পরের প্রেম দেখিয়া অন্তে জ্ঞান করিত, ইহারা দুই ভ্রাতা।

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার আমি তোমার খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, তদিলান, তুমি রাজবাটীতে আসিয়াছ। ককনাথের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে ?

সূর্যকুমার বলিল। “না, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ ?”

মালিকরাজ বলিল। “হঁ। ককনাথ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছে। চল, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি।” ইহা বলিয়া উভয়ে পরস্পরের হৃদয় দেশে হস্ত রাখিয়া রাজবাটীর বাহিরে গিল; দেখে দূর হইতে ভিনজন অধারোদী সেই দিকে আসিতেছে।

সূর্যকুমার বলিল। “ঐ দেখে মহারাজ আসিতেছেন। সঙ্গে পঞ্জালিস। অর ওটি কে ?”

মালিকরাজ বলিল। “ককনাথ না ? যেন তাহারই মত বোধ হইতেছে।” ক্রমে তাহার নিকট হইলে সূর্যকুমার বলিল। “হঁ। ককনাথই তো বটে।”

ক্রমে অরকবেই তিন জন অর হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অরপাল সিংহ প্রান্ত হইয়াছে। সুখ ফেনে পূর্ণ। শরীর স্বাভাৱ। মহারাজ অর হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন। “সূর্যকুমার! তোমার সহিত কোন প্রয়োজন আছে, আইন।” সূর্যকুমার মালিকরাজকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া রাজাকে অনুসরণ করিল। ককনাথ ও পঞ্জালিস রাজার পশ্চাদ্ধর্তা হইল। পথে সূর্যকুমার ককনাথকে কহিল, “আমি মহাশয়ের শিবিরে বাইতেছিলাম” ককনাথ সূর্যকুমারকে কোন উত্তর না দিয়া রাজার সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সূর্যকুমার মনে কহিল, ককনাথ অনিতে পান নাই।

ভবনকার যুদ্ধাভিনয়ের প্রথাই এই ছিল। যোদ্ধারা যুদ্ধান্তে যেন সহোদরের মত ব্যবহার করিতেন। পরাজিতের লেশমাত্রও মনে থাকিত না যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন। অল্প সময়ে যেমত ভজের সহিত ভজের আচরণ করিতে হয়, সেই মতই হইত। কেবল যখন রণক্ষেত্রে মিলিত হইতেন তখনই বাহার যত বাধ্য, তাহা বিপক্ষকে শিক্ষা দিতে ক্রটি করিতেন না। এইরূপ উদার স্বভাব কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই ছিল। রণক্ষেত্রে অতীত হইলে বিপক্ষদের সেনারা ও সেনাপতিরা একত্রে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিত। কেহ কদাচ বিধাংস্বাদক হইত না। এক্ষণে হিন্দুরাজ্য শিথিল হওয়ার্তে মুসলমানদিগের দৌরাণ্ডে প্রায় এক প্রকার সে প্রথা ভীষ্মা গিয়াছিল; কেবল রণাভিনয়ে তাহার ছায়াস্বরূপ দেখা যাইত।

পর স্বর্ধকুমার রাজসভার উপস্থিত হইলে মহারাজ স্বর্ধকুমারকে ডাকিয় বলিলেন। ‘স্বর্ধকুমার, গঙ্গালিস তোমার রণপ্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমিও বৎসরো নাতি আল্লাদিত হইয়াছি, তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, বর্ধমানাধিপ গঙ্গালিসের নিকট তোমার বোধ তুমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন ‘আমি স্বর্ধকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিব।’ পরব লিবস বোধ হয় তিনি আমার নিকট আশ্বিবেল, তোমার বশোভোতি এ অঞ্চলকে ব্যাপিয়াছে। কৃষ্ণনাথ কিছু অপমানিত বোধ করিয়াছে। তুমি তাহার সহিত আলাপ কর।’ স্বর্ধকুমার, মহারাজের কথা সাক্ষ না হইতেই কৃষ্ণনাথের সম্মুখীন হইয়া বলিল। ‘মহাশয়! আমি আপনার শিবিরে গিয়াছিলাম, দেখা পাই নাই, আবার বাইতেছিলাম।’

কৃষ্ণনাথ। ‘‘আমি শিবিরে ছিলাম না’’ বলিয়া অতি কষ্টে আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন। ‘‘আমিও তোমার যুদ্ধকৌশল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।’’

রাজা বলিলেন। ‘‘স্বর্ধকুমার! তোমার অদ্যকার ভেজ দেখিয়া সবলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। গঙ্গালিসের সহিত তোমার বিশেষ আলাপ নাই।’’ গঙ্গালিস সঙ্গ্রমে অগ্রসর হইয়া আপন দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া কহিল ‘‘মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হওয়ার্তে অন্য আমি আপ্যায়িত হইলাম।’’

স্বর্ধকুমার কহিল। ‘‘উভয়তই। মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়াছি জানে আমার বৎসরোনাতি হুৎ বোধ হইল। মহাশয় বীর, আপনাদিগের মনোনীত হইতে পারিলেই আমি আশ্বাকে সার্থক জ্ঞান করি।’’

রাজা বলিলেন। ‘‘স্বর্ধকুমার তোমার সহিত আমার কিছু প্রয়োজন আছে।’’ স্বর্ধকুমার অমনি মহারাজের পার্শ্বে দাঁড়াইল। মহারাজ তাহার হস্ত ধরিয়া গৃহান্তরে গেলেন। গৃহে বাইয়া এক চৌকিতে বসিলেন ও অপর চৌকির উপর স্বর্ধকুমারকে

বসিতে অনুমতি দিলেন। হৃদয়কুমার বসিলে রাজা আপনার মনের কথা কি প্রকারে আরম্ভ করেন, ইহা চিন্তা করিতে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। হৃদয়কুমারও একটুটো ভূমি দেখিতে লাগিল। রাজা “হৃদয়কুমার।” বলিয়া কিছুক্ষণ কাত হইয়া রহিলেন। ভাবিয়া কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না যে, কি বলিয়া আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। “হৃদয়কুমার আমি তোমাকে পুত্রবাৎসল্যে বালক কাল অবধি পালন করিয়াছি। কখন তোমাকে অসন্তুষ্ট হইবার অণু মাত্রও কারণ দিই নাই। তোমার মঙ্গল প্রার্থনা দিব্যাত্র করি। ঐশ্বর করুন তুমি অতি শীঘ্র কিরীটী হও।”

হৃদয়কুমার বলিল। “মহারাজ! আমি সত্য আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি, বধাসাধ্য আপনার আজ্ঞাও প্রতিপালন করি। আমি কিছু কৃত্য নহি।”

রাজা বলিলেন। “হৃদয়কুমার। আমি তোমাকে আমার মনের ভাব বলিতে সাহস করিতেছি না।”

হৃদয়কুমার বলিল। “মহাশয়! আজ্ঞা করুন, সাধামত হয় ও ধর্মবিরুদ্ধ না হয় ও এ দীল শরীর ধারণ করিতে আপনার কর্তৃ অসিদ্ধ থাকিবে না।”

রাজা বলিলেন। “আমি তোমার গুণ বাধ্য হইয়াছি ও দেখিতেছি যে, তুমি ব্রাহ্ম্য শাসনে দক্ষ; অতএব তোমাকে তোমার রাজ্যে অভিবিক্ত করিতে বাসনা করি, কি বল?” হৃদয়কুমার এককালে বেন মহারাজ পাইল, অমনি অষ্টাব্ধে (১) ভর দিয়া সযত্নে মহারাজের পাদবস হস্তে ধরিল। তাহার চন্দ্রুর্দয় দিরা সুখবারি পড়িতে লাগিল। গল গল বচনে বলিল, “মহারাজ! এ মহারাজার মতই কর্তৃ হইয়াছে। আমার স্বপ্নেও ছিল না যে, এ হতভাগ্য আমার আপন রাজ্যে পুত্রভিষিক্ত হইবে। আমার আশার অধিক দান করিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন। “হৃদয়কুমার তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র, তোমার হস্তে তোমার রাজ্য সুখে থাকিবে। প্রজারা ধনী হইবে ও ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইবে। আমি এ মনন আজ প্রায় ৩০ বৎসর করিয়াছি, কিন্তু সময় পাই নাই বলিয়া তোমাকে অবগত করাই নাই। এক্ষণে তোমার পুত্রতার কাল আগিয়াছে, কি পুত্রতার দিব্য ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। মনে করিলাম, তোমার রাজ্য তোমাকে দিয়া তোমাকে ও অজ্ঞাত প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট করিব। দৈবে উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছি, সে সুযোগ ত্যাগ করিব না। তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অবশ্যই সুখে প্রজা পালন করিবে। তোমার রাজ্য বিদ্রোহের অধীন নহে। তুমি মনে করিলেই চিরকাল

স্বাধীন থাকিতে পারিবে । অতএব তোমার পার্শ্ব অগ্ৰাণ্ড রাজার সহিত তোমার আত্মীয়তা রাখা বিধেয় ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “আমারও কোন রাজার সঙ্গে কিছুই বিবাদের কারণ নাই ; কিন্তু মহারাজের সংপরাশ্রম চিরদিন সানন্দে স্বরণ করিব । আমার অগ্রেও কখন ইহা পরিশোধ করিতে পারিব না ।”

রাজা বলিলেন । “স্বর্ধাকুমার ! আমার বহুকাল অর্থি একটি মনের আশা আছে । বোধ করি এত কাল পরে তোমার দ্বারাই আমি সুখী হইব ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “মহারাজ ! আজ্ঞা করুন ।”

রাজা বলিলেন । “স্বর্ধাকুমার ! প্রেম কি বস্তু তা জান ? তুমি কি কখন কাহাকেও ভালবাসিয়াছ ? ভালবাসিয়া থাকত জানিতে পারিবে । তবেই তুমি আমার কষ্টের পরিমাণ পাইবে । সে যে কিরূপ কষ্ট ও সে কষ্টের কি খরচের দংশন তাহা তুমি ব্যক্তিই জানে । তুমি বালক, তোমার এখনও মনে সে ভাব উঠে নাই !” (স্বর্ধাকুমার রাজার কথা শুনি কিছু অসংযত হইল । বুঝিতে পারিল না যে কি উদ্দেশ্যে এ কথা প্রস্তাব হইতেছে । মনে ক্রমে সরমার কথা উঠিল । তাহিল, বুঝি মহারাজ স্বর্ধাকুমারকে অসঙ্গত জ্ঞান করেন । আবার মনে করিল, বুঝি মহারাজ সরমার প্রতি মেহের পরিমাণ বুঝিতেছেন । আবার তাহিল, বুঝি মহারাজ কোন অশ্লিষ্ট বলিষেন । বুঝি স্বর্ধাকুমারের স্বখমাশক কথা । ভয় পাইল । বুঝিল না, কি ভয় ভয় । ক্রমে রাজার কথা শুনিতে স্বর্ধাকুমারের মনে নতুন ভাবের উদয় হইল । সরমার প্রেম উদয় হইল । স্বর্ধাকুমার কিছু লজ্জিত হইল । মহারাজের বাক্য শ্রোত বহির্ভে-
ছিল ; তাহার প্রতি উদ্বিগ্নিতে স্বর্ধাকুমার একবার উত্তোষিত, একবার পাত্ত হইতে লানিল । ব্যাকুল হইল, আহা নবীন প্রবৃত্তি কি কষ্টই সহ করিল ! কখন মনে একরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় নাই । অন্য মন কেমন উদাস হইল । বুঝিতে পারিল না, মন উচ্ছাটিত হইলে কি কারণ উচ্ছাটিত হয় ; কিসেই বা উপশম হয়, তাহা জানে না । নৃত্য তপস্বী যোগের নিয়ম জ্ঞাত নহে । নিভান্ত ব্যবচ্ছিন্ন হইল ।) “তোমার আর হই চারি বৎসর মধ্যে মন পরিপক হইলে সে রমের বোধ হইবে ।” (স্বর্ধাকুমার মনে তাহিল “জন্মিবে কেন ? জন্মিয়াছে । মহারাজ অবগত নহেন যে, পবিত্র প্রেম কত শীঘ্র এত নবীন আশ্রয়ে বদ্ধমূল হয় । আর কি বলেই বা বুদ্ধিকে পার ।) “তখন তুমি আমার এখনকার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে । আমি নিভান্ত নির্বোধ নহি ।” (স্বর্ধাকুমার তাহিল, হাঁ ইনি কোন প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছেন ।) “আমি বিধর কর্মও ত্যাগ করি নাই, দিবা রাত্রি কিছু সেই চিন্তায় নিমগ্ন নহি ।” (স্বর্ধাকুমার তাহিল “ইহার প্রেম শুভ বদ্ধমূল নহে । বুঝি প্রেম পবিত্র নহেইবে, নতুবা কেন দিবা নিশি

উদিত থাকে না।”) “তখাচ আমার প্রতি কর্ণে, প্রতি পদে যেন সেই ডাবই উর্দয় হইতেছে। যেন আমার মন সে উদ্দেশেই সকল কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সূর্য্যকুমার! জুরি বালক, তোমাকে বলিতে আমার লজ্জা হইতেছে। লজ্জাই বা কি? যখন আমার প্রাণ-সংশয়, তখন রোগের শান্তি যাহাতে হয়, তহা করা কর্তব্য। অস্তায়ই বা কি, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা বলপূর্ব্বক কত প্রহণ করিয়া বিবাহ করা যাজ্ঞক্য বলিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন এত বড় বোকা ও ধনশীল, ভ্রাতার নিমিত্ত আত্মলিকাকে বলপূর্ব্বক প্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থের অস্ত্রচালনই ব্যবসা। অসি আমাদিগের জীবনোপায় ও উপার্জ্জনের যন্ত্র।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মহারাজ! একালেত প্রায় স্বয়ম্বর ও বলপূর্ব্বক ত্রী প্রহণ দেখা যায় না। তবে আপনার জন্ত যদ্যপি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতে আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! আশ্চর্য্যকর, কোন্ রাজার কত্থাকে আপনার জন্ত আনিতে হইবে, আমি তাহার নিকট বাই ও আপনার মত প্রকাশ করিলে যদ্যপি তাহাতে সম্মত না হয়, তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার কত্থাকে অন্যাই আনিয়া দিব।”

রাজা সূর্য্যকুমারের স্বভাব ভাল জানিডেন বলিয়া সূর্য্যকুমারের এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। মনে জানিডেন যে, যখন সূর্য্যকুমার তাঁহার মনের কথা শুনিবে, তখনই সে বক্র হইবে, কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিবেন না। অন্যাই তাঁহার সূর্য্যকুমারের সহায়তা আবশ্যক। বিশেষতঃ গঞ্জালিস সূর্য্যকুমারকে সঙ্গে লইতে একান্ত মত প্রকাশ করিয়াছে। তাহাকে কোথায় ধাইতে হইবে ও কোন্ রাজকত্থাকে অপহরণ করিতে হইবে, তাহা না ভাবিয়া বলিলে সূর্য্যকুমারের প্রকৃত সাহায্য পাইবেন না। বলিলেন ‘সূর্য্যকুমার! তোমার এরূপ উদার চরিত্রে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। একত্থাটি যৎল রাজকত্থা নহে। এটি এক রাজার পালিতা। ইহার পিতা মাতা কেহই নাই। রাজসংসারে বাল্যকালাবধি প্রতিপালিতা। ফলে বলিতে কি, আমার খুড়া মহারাজ বসন্তরায় ইহাকে কোন বন হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। জনশ্রুতি, এটি কোন রাজকত্থা। রায়গড়ে এক্ষণে বাস করিতেছে।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “কি ইন্দুমতী মহারাজের প্রেমাস্পদ?”

রাজা বলিলেন। “হাঁ সেই কোমল মাধুরীই।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মহারাজ! ইহা কোন্ বিচিত্র কথা। আমি অন্যাই রায়গড়ে যাইব ও আপনার খুড়ীদয় কমলা ও বিষলকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিব। তাঁহার কোন ক্ষমেই অমত হইবেন না। আপনি বিনা বৃদ্ধে আপনার হৃদয়েরঙ্গিত ইন্দুমতীকে পাইবেন।”

রাজা বলিলেন “স্বর্ধকুমার ! তুমি বালক, স্বভাবত সরল । সমস্ত সংসার এই রূপ সরল বুদ্ধিতেছ । ফলে তাহা নহে । সংসার একটি কষ্টকমর বন । আমরা বাহাধিপকে আপনার বলিয়া জানি, তাহারাই আমাদের পবন শত্রু । সংসারে কেহ কাহাকে মনে মনে বিখাল করে না, কেবল মৌখিক আত্মীয়তা ও বিশ্বাস প্রকাশ করে । কেহ কোন কৰ্ম্ম করিতে বলিলে অমনি মনে করে যে পরামর্শকের বুদ্ধি কোন গুঢ় উদ্দেশ্য আছে, নতুবা কেন এমন উপদেশ দেন । আমি ইন্দুমতীকে পাইবার জন্য মাতা কমলাকে বলিয়াছিলাম । কমলা মনে করিলেন বুদ্ধি আমার ইহার কোন গুহ মর্থ আছে । আমি অমত প্রকাশ করিলেন । কলে তিনি বাহা ভয় করিতেছেন, তাহা হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারিবেন না । স্মৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু তাঁহার মতান্তর বারী হইবে না । তিনি মনে করেন যে, আমি ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া রায়গড় দখল করিবার এক ছলনা সংগ্রহ করিব । কি নির্বোধ ! ইন্দুমতী কিছু রায়গড়ের অধিকারিণী নহেন । তাহার পাবিত্রহণে আমি কিছু রায়গড়ের স্বত্বাধিকারী হইব না । আমার খুড়ার মৃত্যুর পর তাঁহার আর কেহ উত্তরাধিকারী না থাকিতে রায়গড় আমারই হইয়াছে ।”

স্বর্ধকুমার এই সকল কথাই কিছু চমৎকৃত হইল । বিশেষ বস্ত্রে রাজার কথা শুনিতে লাগিল । প্রতি কথাই যেন গগন পরিষ্কার হইল ।

স্বর্ধকুমার বলিল । “কেন মহারাজ বসন্তরায়ের পুত্র কচুয়ার কি মাই ?”

রাজা বলিলেন “কচুয়ার আমার খুড়ার বর্জ্জমানে ১১ ১২ বৎসর হইল দেশত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না । আমার বোধ হয় এক মাস হইল দেশস্থ সকলে দাদশ বৎসর পর্যন্ত তাহার প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া শ্রদ্ধা উপর্শাদি করিয়াছে । এক্ষণে ধর্ম্মও আমিই রায়গড়ের অধিকারী ।”

স্বর্ধকুমার বলিল । “আপনার অপর খুড়ী বিমলা মাতার আমার বোধ হয় মৃত আছে । পত্ন্যবধন আমি পত্র লইয়া গিয়াছিলাম বিমলা তো আপনার প্রতি কবেই মেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।”

রাজা বলিলেন । “বিমলার সম্পূর্ণ মৃত আছে । কেবল কমলাই বিপদ ।”

স্বর্ধকুমার বলিল “মহারাজ তবে সে তার আমার । আমি বুঝাইয়া তাঁহার মত করিব । আপনাকে তাহার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না । কমলা মাতা অত্যন্ত দুঃখিত । তিনি আমাকে অত্যন্ত যত্ন করেন । তিনি আমার কথা কখন অগ্রাহ্য করিবেন না । আমি তাঁহার পদধর শিরে লইয়া বলিব, মাতা আমাকে এই দানটি দাও । আর তাঁহার ইচ্ছাতেই বা কি আপত্তি থাকিতে পারে ? ইন্দুমতীর বিবাহের

বরস' হইয়াছে, আপনিও রাজা, আপনাপেক্ষা সুপাত্র আর কোথা পাইবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তিনি কখন অসম্মত হইবেন না।”

রাজা বলিলেন। “স্বর্ধাকুমার তুমি তাঁহার স্বভাব জান না। তিনি বাহা একবার বলেন, তাহা তাঁহার অঙ্গেও কখন অগ্রথা করেন না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখেন। তাঁহারই কুমন্ত্রণায় মহারাজ বসন্তরায় আমার সঙ্গে বিবাহ করিয়াছিলেন ও আমাকে আমার পিতার ধর্ম্মসিংহাসন দিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহারাজ বসন্তরায় ত কদাচ আপনাকে রাজ্য দিতে অসম্মত ছিলেন না। সকলেই তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করে, আমি শুনিয়াছি, মহারাজ যে দিবস তাঁহার নিকট আপনার সিংহাসন প্রার্থনা করিলেন, তিনি সেই দিনই আপনাকে সিংহাসন দিয়া নিজ রাজ্য রায়গড়ে পেলেন। গত বার রায়গড়ে যখন গিয়াছিলাম, তখন তিনি আপনার কথা কতই জিজ্ঞাসা করিলেন ও কতই স্নেহসূচক বাক্য কহিলেন।”

রাজা বলিলেন। “স্বর্ধাকুমার তাঁহার মুখটি বড় মিষ্ট ছিল। তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারিত না। তিনি অত্যন্ত অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ছিলেন। তিনি আমাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, এমন কি নবাব সুতবুলী খাঁকে দিল্লীখরের নিকটে জামাইতে বলিয়াছিলেন। তিনিই ত দিল্লীখরকে আমার জাতশত্রু করিয়া দেন। তিনি লুকাইয়া আমার কতই দিন্দা করেন। কত শত পাপ, বাহা আমি স্বপ্নে দেখিলে শিহরি, আমাকে করিতে দেখিলেন। তাঁহার আন্তরিক হিংসা আমার উপর কতই কুরুত্ব লাগাইল। দিল্লীখর তাঁহার পত্র হইতে আমার দিন্দা শুনিলেন। আমার উপর জাতক্রোধ হইলেন। তিনি আমার প্রেমলাভের কণ্টক ছিলেন। আমি তাঁহার বর্ত্তমানে ইন্দ্রমতীকে তাঁহার নিকট হইতে চাহিতে, তিনি কটুবাণ্যে আমার বলিলেন, ‘পামর! ইহার প্রতি আর দৃষ্টি করিও না। বাহা করিয়াছ, তাহা তোমার বর্গের পথে যথেষ্ট কাঁটা দিয়াছে ও ইহার পিতার যথেষ্ট অপকায় করিয়াছে। এক্ষণে ইহাকে স্থখী হইয়া আমার নিকট বসিতে দাও। অবোধ বাল্য যদি তোমার প্রতি কখন প্রেম করে, কিন্তু আমার বোধ হয় না সে তোমার প্রেম জানিবে; তুমি ছাদিও, সে প্রেম অজ্ঞতা। সে তোমার আচরণ জানিলে শিহরিবে। আমি সব জানি, আমার বাণ্যে প্রতিবাক্য বলিও না। বাও আপন পুত্র বাও’ আরও তিনি কতই বলিলেন, আমি তার কিছু অর্থই বুঝিলাম না। আর আমি যে কি একারে সেই বালার পিতার মন করিয়াছি, তাহাও জানি না। আমার বোধ হইল এ সকল তাঁহার বার্ত্তব্য মতিভ্রমের চিহ্ন, তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত। আমি তাঁহার বলিলাম, মহাশয়! আপনি কি হেয়ালি বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, ‘মহাশয়! আর সে কথা উত্থাপন করিও না। এ বাদিকা

তাহা কিছুমাত্র জানে না। কেন আমার মুখ হইতে আমার অনিচ্ছার যে সকল ব্যক্ত করাইবে ও জনমের মত বালিকার সুখের মাথা ধাইবে। যাও আপনি রাজা শাসন কর। কখন যদি সে বালকটিকে পাও তে যত্ন রাখিও। দেখ যেন তাহাকে তাহারই পিতার পথে পাঠাইও না।”

রাজা প্রতাপাদিত্য বত এইরূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ততই তাহার মন বিচলিত হইল। ততই তাঁহার চমুর্দ্বয় উন্মীলিত হইতে লাগিল, ক্রমে বোধ হইল, যেন তাহার স্ব-গহ্বর হইতে লক্ষ দিবে। রাজা যদিও স্বভাবত অশান্ত পৃষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু স্বভাব-চাকলা বশতঃ সর্বদা ইচ্ছার অধিক বলিতেন, এমন কি প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিতে সকলেই তাঁহার সরল বাক্যকেও অগ্রভাবপন্ন জ্ঞান করিত। সম্প্রতি কিন্তু সরল স্বর্ধকুমার কেবল মহারাজের প্রেমধিকাই বুঝিল।

রাজা কিছুকণ ধামিয়া আশ্রয় করিলেন।

“স্বর্ধকুমার! আমার মন নিতান্ত উচ্চাটিত হইয়াছে। আমি সে বালা ইন্দুমতীর মূৰ্খতা না দেখিলে থাকিতে পারি না। আমার এক্ষণে এমন জ্ঞান হইতেছে যে, তাহাকে না পাইলে আমার রাজকাৰ্য্য ত্যাগ করিতে হইবে ও বোধ হয় অতি অল্প দিনের মধ্যে উদ্ভাব হইবে। তুমিই এক্ষণে আমার একমাত্র আশ্রয়।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “মহারাজ। আজ্ঞা করেন ত আমি একবার ইন্দুমতীর মনটা বুঝিয়া আসি, বোধ হয় আমি তাহাকে আপনায় করিতে পারিব।”

রাজা বলিলেন। “স্বর্ধকুমার! আমার সে আশালভারও মূল উচ্ছেদ হইয়াছে। সেখানে আর আমার আশার অঙ্গুরমাত্র নাই। আমি চেষ্টার ক্রটি করি নাই। কোন পাথ ও ভুলিতে ভুলি নাই, কিন্তু সর্বত্রই হতাশ হইয়াছি।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “মহারাজ কি ইন্দুমতীকে বলিয়াছিলেন?”

রাজা বলিলেন। “আমি আপনিই বলিয়াছিলাম, তাহাতে সে বলিল, ‘মহারাজ’ আপনায় সহিত মিলনে আমার মুখ হইবে না।’ আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোন্ পক্ষে সুখের অভাব হইবে ও কেনই বা হইবে। ইন্দুমতীর বা উদ্দেশ্য কি? আমার বোধ হয়, তাহার অগ্র কাহার উপর লক্ষ্য আছে। কিন্তু রাগগড়ে ত তাহার উপযুক্ত লোক দেখিতে পাই না। কচুরায় আজ ১২ বৎসর রাগগড়ে নাই। ইন্দুমতী কি বালাবধি তাহাকেই স্বামিরূপে লক্ষ্য করিয়াছে? ইহার ত বয়স ২১২২ বৎসর। সে কি ১০১১ বৎসর বয়সে প্রেম বুঝিয়াছিল? ইহাও অসম্ভব! তাতে আমার কচুরায় যদি বাঁচিয়া থাকে। নবীনবয়স্ক তাহারই বা কিসের বয়স? সে ১৮ বৎসর বয়সে রাগগড় ত্যাগ করিয়াছে। অত অল্প বয়সেই বা কি গুণে ইন্দুমতীকে মোহিত করিয়াছে। আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি শেষবার যখন সেবক পাঠাইয়া-

হিলাম, তাহাতেও সে বলিল, ইন্দুমতীর সেই মন আছে। তাহাতে আমার লোক কচুয়ার নাই বলিলেও সে মত পরিবর্ত্ত করিল না। আমি আপনাই বলিয়াছিলাম, তুমি বিধবা। তাতেও সে বলিল। ‘মহারাজ! তবে বিধবাকে কি বলিয়া প্রেরণী করিতে চাহেন?’

স্বর্ধ্যকুমার বলিল। “মহারাজ! তবে তাহাকে লইয়া কি সুখী হইবেন? সে যখন আপনার প্রেমের কণামাত্র স্বীকার করে না। তাহাকে বলপূর্ব্বক আনার ও মহাশয় সুখী হইবেন না।”

রাজা বলিলেন। “কি সে নয়; সে যখন আমার বাটীতে বাস করিবে, তখন সে ও আমারই হইল। সে যখন দেখিবে যে, আমার অধীন হইতে হইয়াছে, তখন অবশ্যই বশীভূত হইবে। বশীভূত না হয়, তাহাকে বিত্তীধিকা দেখাইব। সে তার আমার।”

স্বর্ধ্যকুমার বলিল। “তবে আজ্ঞা হয় ও আমি দুই শত অঝারোহী লইয়া একপেই তথায় যাইব।”

রাজা বলিলেন। “না, সে মতে তুমি পারিবে না। রায়গড় অধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।”

স্বর্ধ্যকুমার বলিল। “মহারাজ! আপনার দুই শত অঝারোহীকে পরাভূত করিতে রায়গড়ের দুই সহস্র অঝারোহী চাহি। তাহাদিগের তাহা নাই।”

রাজা বলিলেন। “তুমি রায়গড়ের অবস্থা জান না। রায়গড়ে সচরাচর ১০ জনের অধিক পদাতিক থাকে না। এক জনাও অঝারোহী নাই, কিন্তু রাম নারায়ণ, বাহুলেশ্বর প্রভৃতি গ্রামে বসন্তরায়ের বন্দোবস্তে ন্যূনসংখ্যা চারি সহস্র অঝারোহী বোদ্ধা ও দশ সহস্র পদাতি ঢালী আছে। তাহার প্রয়োজন হইলেই উপস্থিত হইবে ও প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে। এমনি বসন্তরায়ের প্রধানী যে, লেশমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলে অমনি রায়গড়ের সুরচা (১) হইতে তুরী বাজিবে ও উচ্চশ্রমে অগ্নি জ্বালা হইবে। চতুর্পার্শ্বে গ্রামের প্রজারা ভনিবামাত্র শাস্ত্র (২) রায়গড়ে আসিবে। অতএব দিবাতাগে সমুখ যুদ্ধে রায়গড় অধিকার করা বড় সুকঠিন। আমি যত্নপা করিয়াছি যে, রাজ্যবোধে হঠাৎ তুমি, গঞ্জালিস, অনুপরাম প্রভৃতি কয় জনা, চল্লিশ জন উত্তম যোদ্ধা লইয়া উপস্থিত হইবে ও ছল করিয়া রায়গড়ে প্রবেশ করিয়া ইন্দুমতীকে হরিবে। গঞ্জালিস তাহাকে লইয়া মৌ-বানে আসিবে। তোমরা যেমন অগ্নে যাইবে,

১। দুর্গাধিকারের চাকুল Turret tower.

২। দুর্গাধ্যক্ষ Governor.

অমনি অবে আসিবে । কর্ণটি এমনি সম্বর্ণে সম্পাদন করিতে হইবে যে, কেহ না জানে যে, ইহা আমার কর্ণ । গঞ্জালিসের সৈন্তেরা লোকের ভ্রম জমাইবার অস্ত্র অব্যাদিও কিছু লইবে, গ্রামস্থ সকলে জানিবে, যে ইটি ডাকাইতের কর্ণ । তুমি ইহাতে কি বল ? যদি যাইতে হয় ত অন্যই সময়কালে তথায় যাইতে হইবে । গঞ্জালিসের সঙ্গে পরামর্শ কর, হয় ত সেও তোমার সঙ্গে যাইবে । আর কোন্ স্থানে পূর্বে তাহার সৈন্তের সঙ্গে মিলনের স্থির করিয়াছে, তাহাও তোমার বলিয়া দিবে । কি বল ?”

হৃদ্যকুমার বলিল । “মহারাজ আমি এক নগের মধ্যে মহারাজকে আসিয়া বলি-
তেছি । আমার এক্ষণে মতের স্থির নাই । একবার শিবির হইতে আসি ।” হৃদ্যকুমার চলিয়া গেল ।

মহারাজ চোঁকি হইতে উঠিলেন । সত্যর আসিয়া দেখেন, বিজয়কৃষ্ণ, কৃকনাথ, হজুরমল, গঞ্জালিস, অনুপরাম ও অন্যান্য সত্যসদৃ সব বসিয়া আছেন । সত্যর আসিয়া অনুপরামকে বলিলেন । “বঙ্গরাজ ! কতক্ষণ আগমন হইয়াছে ?”

অনুপরাম বলিল । “মহারাজ ! এই আসিতেছি ।”

রাজা বলিলেন । “তুমি প্রস্তুত আছ ত ?”

বঙ্গরাজ বলিল । “না থাকিয়া আর কি করি, আমার প্রস্তুত হওয়া কেবল মহা-
রাজকে প্রস্তুত করিবার জন্য ।”

রাজা বলিলেন । “তুমি তাহাতে চিন্তিত হইও না, তোমার মঙ্গল চিন্তা আমার আপনার চিন্তার অপেক্ষা বলবতী আছে । আমি কখন অস্ত্র ত্যাগি না অন্য এই সামান্য ব্যাপারটি সাজ হইলে কল্য প্রাতে আমার সৈন্তেরা প্রস্তুত হইবে ও দুই তিন দিনের মধ্যে তোমাকে অনুসরণ করিবে । আমি ইচ্ছাবশতঃ পরামর্শে যাইব, হয়ত তোমার সনদ্বীপেও একবার যাইব । তুমি সৈন্তদল বিক্রমে পাঠাইবে, স্থির করিলে ?”

অনুপরাম বলিল । “সনদ্বীপে আপনার সৈন্তের সব একত্রিত হইলে গঞ্জালিস আপনার জাহাজ সকল একত্র করিবেন ও আশা আছে উড়িয়া হইতেও পাঠানরা লশ বার থালা জাহাজ দিবে । এই সকল জাহাজে অল্প অল্প করিয়া দৈনিক ক্রমে বোকা ই দিয়া, নামাইয়া দিবে । তাহারা সেই খানে স্তম্ভভাবে থাকিবে, ক্রমে সকল সৈন্ত একত্র হইলে এক কালে বঙ্গপুর আক্রমণ করিবে ।”

রাজা বলিলেন । “তোমার সৈন্তের রসদ কোথা হইতে আসিবে ?”

অনুপরাম বলিল । “তাহা এক প্রকার স্থির হইয়ছে, বর্তমানাধিপ তাঁহার আপন সন্তের রসদ দিবেন । তৎপরিবর্তে বঙ্গপুর অধিকার হইলে তাঁহাকে ১০ সহস্র বোহর দিতে হইবে । গঞ্জালিসেরও পাঠান সৈন্ত আপনাদিগের রসদ বঙ্গপুরে করিগ
লইবে । কে বল আপনার সৈন্তের রসদ আমার দিতে হইতেছে ।”

রাজা বলিলেন। “তাহা কোথা হইতে দিবে।”

অনুপরাম বলিল। “অদ্য সায়ংকালে আমি যেমন ক’রে পারি রায়গড়ে সংগ্রহ করিব। বসন্তরায় অত্যন্ত ধনী ছিলেন, তাহারে তাঁহার অনেক জহরাত আছে। সে সকল আমাকে সংগ্রহ করিতে হইবে।”

রাজা বলিলেন। “তবে রায়গড়ের ব্যাপারে কি আমার কতামাত্র লাভ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! সে ত বড় ভাল কথা নহে। গঞ্জালিস ও অনুপরাম উভয়ের কোষ পূর্ণ করিলে রায়গড়ে আর কি থাকিবে?”

কৃষ্ণনাথ বলিল। “মহারাজ! রায়গড় এক্ষণে আপনার অধিকার, সেখানকার ভাণ্ডার আপনার, তাহা যদ্যপি ইহঁরা উভয় লয়ন, তবে সে আপনারই বলে।”

হজুরমল বলিল। “এক উপায় আছে। আমার সৈন্তরা বন্ধপূরে আপন রসদ সংগ্রহ করিয়া লইবে, কেবল পাথের খরচ অনুপরাম রাজকে সহিতে হইবে।”

রাজা বলিলেন। অনুপরাম, তুমি কি পাথের দিতে পার না?”

অনুপরাম দেখিল যে, এক্ষণে সত্য আপনার অবস্থা প্রকাশ করিলে কোন মতেই স্বার্থী দিক্ হইতে পারে না। বলিলেন, “তবে তাহাই হইবে।”

গঞ্জালিস বলিল। “তবে মহারাজের সহিত স্বর্ধকুমারের কি কথা হইল? তিনি কি এক্ষণেই যাইবেন?”

রাজা বলিলেন। “আমার বোধ হয়, সে এক্ষণেই যাইবে, আপন শিবিরে গেল। বলিল, এক দণ্ড মধ্যে প্রত্যাগমন করিতেছি।”

গঞ্জালিস বলিল। “এরূপ ব্যাপারে এক এক যোদ্ধার বলাধিক্য আবশ্যক। স্বর্ধকুমার ও কৃষ্ণনাথ হইলেই ভাল হয়।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “কৃষ্ণনাথ সর্ষ-চিহ্নিত; তাহাকে এ বিষয়ে পাঠান ভাল হয় না, বরং হজুরমল ও স্বর্ধকুমার যান।”

হজুরমল বলিল। “আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজের আজ্ঞা হইলেই অগ্রসর হই।”

রাজা গাত্ৰোত্থান করিয়া হজুরমল ও বিজয়কৃষ্ণকে লইয়া বাহিরে গেলেন; কিছু অন্তরে যাইয়া বলিলেন। “দেখ হজুরমল! আমার রায়গড়ে তোমাকে পাঠাইবার কারণ ইন্দুমতী হরণ, দেখ যেন অনর্থক রায়গড় না লোটা হয়। রায়গড়ের ভাণ্ডার আমারই, তাহা কিছু শত্রুর নহে, অতএব তাহা গুটিগে আমার ক্ষতি হইবে। দেখিও গঞ্জালিস যেন যথাসর্ব্ব্ব না লয়। তাহাকে অসহ্য দিবে। বাকি যদ্যপি লোটে, তাহা তুমি লইয়া আসিবে। ইন্দুমতীকে তোমার সঙ্গে আনা বধেয় হইতেছে না। গঞ্জালিস নৌকার উপর দাঁধিলে তুমি চালিয়া আসিবে। গঞ্জালিস দ্বারীর জাহাজের খাল দিয়া চড়িলে খালে পড়িবে। লোকে জানিবে, সে দক্ষিণ দিকে গেল। পরে

কাটাগদায় ওজন বাহিয়া মনিখালির খাল দিয়া এখানে আসিবে । গোপনে যত সীত্র কর্ত্ত সাধিতে পার. সাধিবে । বহু বিলম্ব করিলে রায়গড়ে ফৌজ সমাগম হইবে, তবেই তোমাদিগের পলায়নের আর উপায় থাকিবে না । দেখ যেন প্রকাশ না পায় যে তোমরা আমার লোক ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “অনুপরাম অর্বসংগ্রহে ব্যস্ত থাকিবেন । কোশলে তর দেখাইয়া তাঁহাকে বিরত করিবে ।”

হজুরমল বলিল । “সে তার আমার উপর থাকিল । সূর্য্যকুমারকে এ সকল ভাল করিয়া বলিয়া দিবেন ও তাহাকে আমার আজ্ঞানুযায়ী হইতে বলিবেন । বিপদের সময় মতামত হইলে কর্ত্ত সুশৃঙ্খলে সমাধা হইবার সম্ভাবনা নাই ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “সূর্য্যকুমার এখনি আসিবে, তোমার সম্মুখে তাহাকে উপযুক্ত আদেশ দেওয়া হইবে । তাহাতে চিন্তিত হইও না ; সে বলক, তাতে বড় সুবোধ, তাহাকে যদ্যপি বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, এটি বীরের কর্ত্ত তাহা হইলে সে সকল পরামর্শ গুরু-আজ্ঞা বলিয়া মানিবে ।”

রাজা বলিলেন । “সে এবার বুঝিয়াছে যে, এ কর্ত্তী আমার মঙ্গলকর আর তাহারও মনোনীত । তাতে আবার তাহাকে রাজ্যে অভিযুক্ত করিবার আশা দিয়াছি । সে সম্প্রতি কোন মতে আমার মতের বিপরীত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে না ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “সূর্য্যকুমার কিন্তু গোতে ভুলিবার নহে । তাহার কর্ত্তি মনো-নীত না হইলে সে কোন ক্রমে কর্ত্তে হস্তক্ষেপ করিবে না ।”

হজুরমল বলিল । “মহারাজ, সে আপনার কথায় কি প্রকার তার প্রকাশ করিল ।”

রাজা বলিলেন । “প্রথমে অত্যন্ত উৎসুক হইল, পরে যখন ক্রমে সকল বিষয় শুনি, তখন যেন ভড় হইয়া ভুলিল !”

হজুরমল বলিল । “মহারাজ, তাহাকে কি সবল ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন ? সে কি ভাল হইল ?”

রাজা বলিলেন । “আমি তাহাকে সকল ভাঙ্গিয়া বলি নাই । কিন্তু অনেক বলিয়াছি । তাহা না বলিলে সে কোন মতে সম্মত হইবে না । সে যে এক প্রকারের মানুষ ।”

হজুরমল বলিল । “আজ্ঞা হয় ত আমি শিবির হইতে ফিরিয়া আসি । সূর্য্যকুমারের আসিবার পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইব ।”

রাজা অসুস্থতা দিলেন ও হজুরমল অভিবাধন করিয়া চলিয়া গেল । হজুরমল চলিয়া গেলে রাজা বাতলেন । “বিজয়কৃষ্ণ ! অদ্যকার কর্ত্তি সুশৃঙ্খলে সমাধা হইলে আমি তোমার মত সুখী হইব ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ তাহাই হউন, কিন্তু আমার বড় ভয় হয়। আমার বোধ হইতেছে, ইন্দুমতী কখনই আপনার বশীভূত হইবে না। অনুপমম ও গঞ্জালিস দুটিকে ত্রেটি করিবে না। আমার কেমন এ কণ্ঠটায় মল উঠিতেছে না। আবার আপনি অনুপমকে সাহায্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন। সেই বা কি? কেন অপরের জন্ত আপনার সৈন্যকর ও একজন ছত্রী রাজার সঙ্গে বিবাদ। দিল্লীর বাদচ বজপুর পর্যন্ত আপনার তলবারী লইয়া যান নাই, তথাপি এ সকল রাজবিদ্রোহ তাঁহার কর্ণপোচর অবশ্যই হইবে। তিনি কিছু নিশ্চয় থাকিবেন না। গঞ্জালিসের নামও তাঁহার কর্ণে উঠিয়াছে। গঞ্জালিসের দোরান্নে দক্ষিণ রাজ্য এককালে জনশূন্য হইয়াছে। এ সকল কিছু দিল্লীর সুনামা হইর নহেন।”

রাজা বলিলেন। “দিল্লীরকে আমার ভয় করিবার কারণ কি? আমি তাঁহার অধিকার মধ্যে নহি, তিনি আমার উপর কি করিবেন?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আপনার পাঠানদিগের সঙ্গে মিলিয়া বজপুর সৈন্য পাঠান বড় সুবিধার কথা নহে। পাঠানদিগের উপর দিল্লীরের সতত দৃষ্টি আছে, তাতে আবার সম্রাট সানভোছ, মানসিং বাহাদুর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি সুনিলে অবশ্য আপনাকে নাড়া না দিয়া বাহবেন না।”

রাজা বলিলেন। “আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কিছু তাহার প্রভুর আত্মা নাই। আর দিল্লীরেরও এমত অভাব নহে যে, তিনি নতুন রাজ্য অধিকার করিবার আশায় শত্রু বাদ্ধ করেন। তাহার অধিকারস্থ রাজাদিগের শাসন করুন, সে কর্ত্তে তাঁহার ব্যবস্থাবলি নিযুক্ত থাকিবে। পাঠানেরা বতবার পরাজিত হইয়াছে, ততবার আবার তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিয়াছে, তাহাদিগের জয় করাই এখন মানসিংহের কর্ত্তব্য। এখন আমাকে ত্যক্ত করিবেন না। আমার কথাই বা তাঁহার নিকট কিসে উঠিল?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “দিল্লীরের আপনার উপর চিরকাল মজর আছে। তাতে আবার তিনি যদি সানভে পান যে, আপনি গঞ্জালিসদ্বয়কে সাহায্য করিয়াছেন ও পাঠানের সঙ্গে মিলিয়াছেন; তবে আর আপনার পরিজ্ঞানের উপায় নাই। সানিয়াহি, দাক্ষিণ্য ফিরসী দস্যুল পরাজয় করা মানসিংহ মহারাজের এক প্রধান উদ্দেশ্য।”

রাজা বলিলেন। “তাহাতেই বা কি ভয়? মানসিংহের সাধ্য হইবে না যে, গঞ্জালিসকে জয় করে। গঞ্জালিস যুদ্ধপ্রণালীতে বিশেষ নিপুণ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “নিপুণই হউন আর দক্ষই হউন। বলের সম্বন্ধে কিছুই থাকিবে না। সম্রাটের ফৌজের কেমন বিভীষিকা শক্তি আছে, শত্রুদল দেখিলেই ভীত হয়, তাতে আবার সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ।”

রাজা বলিলেন । “তুমি ভয় পাইয়া থাক ত পলায়ন কর । আমার ভীত মন্ত্রীতে প্রয়োজন নাই, অকারণ কেবল ভয়ে জড় হইলে প্রকৃত বিপদ হইতে উদ্ধারের কি উপায় আছে ? মাননীয়ের নামেই তুমি পরাজিত হইয়াছ ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ ! পরাজিতের কথা নহে । আমি ভয়ও প্রকাশ করিতেছি না । আমি বুদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আপনার সুখা সেনানী অপেক্ষা সাহসী, ও বোধ করি, এখনও কৃষ্ণনাথকে রণে পরাস্ত করিতে পারি । কিন্তু সে কথায় প্রয়োজন নাই । ভয় আমার মন্ত্রণার কারণ নহে । আমি যুদ্ধকে ভয় কর না । আপনার মঙ্গলই সঙ্গী চিন্তা করি । যাহাতে আপনি নিকটকে রাজ্য করেন, সেই আমার অভিলাষ ও উদ্দেশ্যেই আমি মহারাজকে পরামর্শ দিতেছি । আপনি ইহাতে বিরক্ত হন, আমাকে নির্মূল্য হইতে হইবে ; কিন্তু আমার মনের চিন্তা দূর হইবে না । আমার কেমন আর্থ জ্ঞানে ভয় হইতেছে । ভয়ের কারণ জানি না ও বুঝাইতে পারি না । আমি আপনার পিতার সময়ের লোক মহারাজ বসন্তরায়ের নিকট বর্ষা শিক্ষা করিয়াছি । আপনার যাহাতে ভাল হয়, সে চেষ্টা আমাকে কায়মনোবাক্যে করিতে হইবে । ইহাতে আমি ধর্মের পথ পরিকার করিব ।”

রাজা বলিলেন । “খুড় বসন্তরায়ের ; রাজ্যবোধল অতি হীনশক্তি লোকের মত ছিল । তিনি আপন স্বরের দ্বার বদ্ধ করিয়া সিংহাসনে বসিয়া সুখ জ্ঞান করিতেন । তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও । তাঁহার মত কাপুরুষ যশোরের সিংহাসনে আর কেহ অপবিত্র করে নাই । তিনি বিনা যুদ্ধে দিল্লীধরকে পরা লিখিয়া দিলেন ও তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন । যশোরের স্বাধীনতা এককালে নষ্ট করিলেন ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “তিনি অস্থায় বা মানহীনের কর্ম করেন নাই । তখন বৈরাগ্য অবস্থা, তাহাতে প্রকৃত বুদ্ধিমানের মতই কর্ম করিয়াছেন ।”

রাজা বলিলেন । “হাঁ বড় বুদ্ধিমান । কাপুরুষেরা যুদ্ধকে ভয় করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করে ও সাহসী পুরুষকে অবোধ, গোঁয়ার বলে ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ বিচার করুন । যখন আপনার পিতার কাল হইল ; তখন আপনি বালক, রাজ্যের চির-পরিচিতি নিয়মে তিনি সিংহাসনারূঢ় হইলেন । আমি তখন একজন সামান্ত কর্মচারী ;—”

রাজার একখাটি অঙ্গ হইল, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, চিরপরিচিত নিয়মটা কি ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ ক্রোধ করিবেন না । আপনার বংশের নিয়ম বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ ও পর্যায়শ্রেষ্ঠ অগ্রে রাজ্যভার পান । আপনার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কাল হইলে আপনার পিতা সিংহাসনে বসেন । আপনার জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র যুবরাজ নৃসিংহ বর্তমান, তিনি দেশের প্রাণী মানিয়া ক্ষোভ ত করিলেন না । আপনার পিতা মহারাজের স্বর্ণ-

যাত্রার পর বসন্তরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সে সময় পরিস্থিতি হইয়াছে। হিন্দুদিগের একতা নাই, বিশেষতঃ বঙ্গে হিন্দু ক্রমে বলহীন হইতেছে। এ অবস্থায় অস্ত্রাশ্রয় করিয়া বঙ্গরাজ্যে ভুক্ত হইয়া অসহ দিল্লীখরের তোপের মুখে বাণের পরাভ হইবার কারণ। আবার রাজ্য-বিজ্ঞোহ উপস্থিত করিলে প্রজাবর্গের খল প্রাণ লাশ ও কষ্টেরই, সুখের নহে। তাতে আবার তিনি জানিতেন যে, দিল্লীখরের বিপক্ষ হইলেও কিছু স্বাধীনতা স্থাপনে কৃতকাৰ্য হইবেন না। এ সমস্ত অবস্থায় দিল্লীখরের সহিত শ্রীতি রাখা ব্যতীত আর কি সুবুদ্ধির কাজ ছিল। বিলা বিবাদে তিনি দিল্লীখরের নিকট লোক পাঠাইলেন। বুদ্ধ অনঙ্গপাল দেব দিল্লীতে যান ও সেইখানে লক্ষ্যার্হস্ত্রের আকবর সাহাকে উপঢৌকনাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বন্ধু বলিয়া স্বীকৃত হন। লক্ষিপত্রে কর দিবার নাম মাত্র ত নাই ও তিনি কখন কর ত দেন নাই। আকবর লক্ষ্যট বশোরের রাজকে আবীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরস্পর রায়-গড়ের বিপদের সময় সাহায্যদানে বদ্ধ হইলেন। তদবধি বশোরের মান বৃদ্ধি হইল। কণ্টক ক্ষেদিত হইল।”

রাজা বলিলেন। “আহা কি বুদ্ধিমানেরই কাজ! অনর্থক দিল্লীখরের সঙ্গে বশোরের বন্ধুতার কি লাভ হইল? জাতিশত্রু মুসলমানকে আপনার হস্ত দিলেন ও হিন্দুধর্মের বিপরীত আচরণ করিলেন। হিন্দুদিগের মন্তকচ্ছেদ করিলেন।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনি বিস্মৃত হইতেছেন। আর কি সে দিন আছে যে, দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দুরাজ বসিবেন। আমাদেরই সে অভিমান করা বৃথা, নানসিংহ বখন স্বয়ং দিল্লীখর আকবরকে ভর্গনো দিলেন, তখন আর অজ্ঞের কথা কি। একজনকার কৌশলই এই। দিল্লীখরের সহিত মিসিয়া থাকিতে পারিলেই দেশের মঙ্গল। হুমায়ুন সাহা বখন রাজ্যচ্যুত হইয়া আবার বীর পুত্র আকবরের বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তখন জানিবেন, দিল্লীখর অজ্ঞের। বসন্তরায় মহারাজ বাহা যুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাই দেশের পক্ষে জেয়ন্তর। তিনিও মুখে কাটাইয়াছেন। কিন্তু আমি তাবিতে সাহস করি না যে, আমাদেরই এ সকল বিজ্ঞোহী কৌশল কোথায় ক্ষান্ত পাইবে।”

রাজা বলিলেন। “তাল যথেষ্ট হইয়াছে। ভোমার ভয় নিবারণ করিতে পারি না। তুমি আপনার উপায় দেখ। এ বিজ্ঞোহ মধ্যে ভোমার থাকার অমঙ্গল ঘটবে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ যদি ত্রুদ্ধ হন তবে, আমি নাচার আমি কিছু আমার চিন্তার চিন্তিত নহি। আপনি বার বার কেবল এই কথাই বলিতেছেন কেন?।”

রাজা বিজয়কৃষ্ণের বাক্যে উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “হুত্! আপনার স্বার্থবোধ নাই, হয় ও এই নানান্ত্র জীৱ জন্তু রাজ্যচ্যুত হইবে। বলিলেই রাগ করে ও কেবল আমাকেই ভীত কাণ্ডুষ জ্ঞান করে।”

কৃষ্ণনাথকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিল। “কৃষ্ণনাথ! তোমার সমাচার কি?”

কৃষ্ণনাথ বলিল। মহারাজ আমার রাগনড়ে পাঠাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, আমার কি মনে হইল? বলিলেন, ‘না তোমার কষ্ট পাইতে হইবে না’; রাজার রাগনড়ে ব্যাণা-রটা কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “কেন তুমি কি জান না?”

কৃষ্ণনাথ বলিল। “আমার বিখ্যাস হয় না যে, এন্টা দ্বীপ জা এত করিবেন?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “দ্রোই ও সকল বিপদের মূল রাজা তাহার জন্ত এমত অব্যাহত হইয়াছেন যে, তাঁহার চৈতন্যমাত্র নাই :”

কৃষ্ণনাথ বলিল। “কই সে ও তাঁহারে চাহে না।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “এত আশ্চর্য্য!” ক্রমে পরস্পর আনিয়া উপস্থিত হইলে বিজয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাথ ত্যাগ করিয়া অপর কথা আরম্ভ করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

“অবিজ্ঞাতোহপি বন্ধো হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ।”

এদিকে সূর্য্যকুমার রাজসভা ত্যাগ করিয়া অতি ক্ষুব্ধবশে আপন শিবিরে আসিয়া দেখেন, মালিকরাজ তাঁহার বিছানায় শয়ন করিয়া আছে। মালিকরাজকে নিজ্ঞা হইতে জাগাইতে কিছু সন্দেহান হইলেন। মনে করিলেন, বুঝি কোন অশুভ হইয়া থাকিবে। সেই বিছানার একদেশে বহুতল-বস্ত্র বপোঃদেশ হইয়া বসিলেন। তাঁহার মনঃস্থির নাই। এক এক বার সন্ধ্যায় মুখস্ত্রী মনে উদয় হইতেছে, অমনি এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ও বাঁচিতেছেন। “আমার কি এত দৌড়গা হইবে। মহা-রাজ ও আমাকে আমার রাজত্ব দিবেন, এখন সে সিংহাসনে আমার কি স্থখ হইবে? সন্ধ্যা ব্যতীত কি সে সিংহাসনে শোভা পাইবে? আমি রাজবশ্য হইতে অবকাশ পাইলে কিরূপে সে বিষয় কণ্ঠের বিকট শ্রম দূর করিব? কেই বা আমার আহারের নিকট বসিয়া আমার আহার দেখিবে? আমার এ সংসারে আর কেহই নাই। আমি সিংহাসনে বসিব সত্য কিন্তু রাজকাৰ্য্যক্ষেত্রে কি করিব! একা কি কণ্ঠের বসিয়া কাল কাটাইব! সে বড় বিপদ, আমি হইতে তাহা সহ হইবে না। মালিকরাজ কি তাঁহার পিতার নিকট জাগ করিয়া আমার সঙ্গে বাইবেন? কেনই বা বাইবেন? তাঁহার বশোর রাজ্যে কত উচ্চ-

পদাভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা। যশোরের এফজম সামান্ত বেনাপতি, জয়ন্তী রাজ্যের প্রধান আমাত্য অপেক্ষা লক্ষপ্তম মানী ও ধনী। আমার মা নাই, কিন্তু বাল্যকালাবধি মাতৃহীন বলিয়া আমার বোধ হইত না। রানী কেমন ঘর করিতেন। অন্য আমি সংসার শূন্য দেখিতেছি। আমি রাজসমীপ ত্যাগ করিলে ইহারা ভুলিবে। কাহাকেও আর দেখিতে পাইব না। যদি সরমা—ত কি আমার হতভণ্য আছে? আমি এ কষ্টে রাজ্য ইচ্ছা করি না। সরমার স্ত্রী আমি চিরদিন চক্ষে দেখিব। কেবল দেখিব। মহা-
 রাজ্য আমার অস্ত কিছু পুরস্কার দিব। রাজ্য লইয়া কি করিব। হরত জয়ন্তীতে রাজ-
 বাটীও নাই, মহিলাদলের কথা কি? আমি কতকাল মহারাজের নিকট আছি, তাহাও জানি না। মহারাজ বলিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি রাজ্যপালনে অকম বলিয়া আমার রাজ্যভার গ্রহণ করেন ও আমাকে প্রতিপালন করেন। জয়ন্তীও কশোর হইতে অনেক দূর। উভয় রাজ্যের মধ্যে কত রাজা আছেন, তাঁহারা ই বা কেন রাজ্য ভার লইলেন না। প্রতাপাদিত্য ই বা কেন এত উৎসুক হইলেন। আমার মাতাবই বা কতদিন মৃত্যু হইয়াছে। আমি এ সকল কিছুই জানি না, আমার মন কেমন করিতেছে। এ সংসারে আমাকে এ সকল বিষয় অবগত করায়, বোধ হয় এমন কেহই নাই। হা বিধাতঃ! আমার স্ত্রীকে বন্টক দিলে! কেন আমাকে রাজবংশে জন্ম দিয়াছিল! আমি সামান্ত রাজপুরুষ হইলে, বোধ করি অধিক সুখী হইতাম। রাজা আমার রাজ্যদানে অসুখীই করিতেন। রাজ্য আমার প্রয়োজন নাই। আমি যশোরের রাজার ক্রৌড়দাস হইয়া কাল কাটাইব। আমি রানীকে মা বলিব ও সরমা আমার সমুখে থাকিয়া সদা সুখ-
 বর্জন করিবে। শ্রিয় মালিকরাজের সহিত সমস্ত দিন বাপন করিব। আমি এক্ষণেই রাজাকে গিয়া সব বলিব। এখন মালিকরাজ উঠিলে তাঁহাকে অবগত করাইয়া দাই। ডাকিব—?” বলিয়া একটু ভাবিলেন। আবার বলিলেন ‘না অসুস্থ না হইলে কখন বৈকালে নিদ্রা ঘাইত না।’ আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মালিকরাজের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখেন মালিকরাজ আগ্রত আছেন।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কিৎসরাজ! উঠ, আর শয়নে প্রয়োজন নাই, বসেই নিদ্রা হইয়াছে।”

মালিকরাজ হাসিয়া বলিল। “কি রাজ্যের কথা আপনা আপনি বলিতেছিলে? আমি জানি, আমরা নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন দেখি, তুমি যে আবার আগ্রত স্বপ্ন দেখ। কে তোমার রাজ্য দিল, আর কেনই বা তুমি সে রাজ্য অপ্রয়োজন জ্ঞানে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছে?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “মালিকরাজ সবুহ বিপদ উপস্থিত। এক্ষণে তোমার পরামর্শ আবশ্যক। বল দেখি কি করি? আমি অনেক কণ তোমার আগরণের আশরে বাঁসিয়া ছিলাম। যদি জানিতাম যে, তুমি নিদ্রিত নহ, তবে আমি তোমাকে ডাকিতাম।
এক

মালিকরাজ বলিল। “রাজা কি তোমার তোমার রাজ্য পুনর্ব্বার অতিবিক্ত করিয়াছেন?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “হাঁ তিনি অন্য আমার ডাকিয়া বলিলেন ‘তোমাকে তোমার রাজ্য দিব।’ কিন্তু আমার রাজ্য পাওয়ার কি লাভ? আমার রাজ্যে সুখ হইবে না। আমি একা জয়ন্তী পর্ব্বতের উপরে থাকিয়া কি করিব? আমার অন্তঃপুর নাই, মহিল নাই, কে আমাকে যত্ন করিবে। কে আমার রোগে সে বা করিবে। আমি সর্ব্বম্বাক না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। তুমি কিছু আমার সঙ্গে বাইবে না। আমার এ রূপ বনে রাজস্বের প্রয়োজন নাই।”

মালিকরাজ বলিল। “তোমার রাজ্যে যদি কোল মহাবলঃ। অতঃপাশ্বে ও রোগে-সেবাই প্রয়োজন থাকে, তবে ভাবিও না। তুমি সিংহাসনে বসিলেই তোমার আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসিবে ও তোমার যত্ন করিবে, সেবাও করিবে। ইহার অন্ত কোন চিন্তিত হও। আমার মণ্ডপতলত অস্ত্রায় উৎসাহ হইবে। রাজ্যের আত্মীয় অনেক হয়, কিন্তু আমি হতভাগ্য, কি করিব তাহাই ভাবিতেছি। চিরকাল তোমার সঙ্গে আছি, এখন তোমাকে ছাড়িয়া কি করে থাকিব; কাহারও সঙ্গে আমার ভাল লাগে না। ইচ্ছা কেবল দিবারাত্রি তোমারই মুখ গ্রী দেখি। কিন্তু বিধাতা বাম হইলেন। আমার অতি দীন সুখে বিষ দিলেন। স্বর্ধকুমার! সিংহাসনে বসিলে তোমার অন্ত অন্ত চিন্তা উপস্থিত হইবে, অন্যায়সে সমস্ত বহিয়া বাইবে। কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ বাতনা শেলের মত আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে। আমার ভাবিতে মন কেমন হইতেছে। স্বর্ধকুমার! আমি তোমার সঙ্গে বাইতাম, কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতার আমিই একমাত্র আশ্রয়। তাঁহার অসময়ে আমার ঠাহাকে ত্যাগ করা নারকিক কর্ম্ম। ধর্ম্ম রক্ষার্থে আমাকে তোমার সঙ্গে ছাড়িতে হইল। কি করি আমার কষ্ট আমিই সহ করিব। কিন্তু স্বর্ধকুমার! আমাকে বনে রাখিও। আমি ঈশ্বরের নিকট সত্য তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিব। দেখিও, যেন রূপদরাজের মত দীনবন্ধকে বিস্মৃত হইও না।” স্বর্ধকুমারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার ঈশ্বর শ্রদ্ধা মুখ দেখিয়া বলিল, “স্বর্ধকুমার! আমি দোহাণী সন্দেহ করিতেছি না। তোমার আমি ভাল জানি। তুমি আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু রাজকর্ম্মের বিঘ্নমাজলে পাছে পত্র লিখিতেও ভুলিয়া বাও। স্বর্ধকুমার! যে বাহকে ভাল বাসে, তাহার সম্বন্ধীয় কিছু পাইলেই তাহাতে আপ্যায়িত হয়। তুমি এখন বুকিতে পারিতেছ না যে, তোমার

হস্তলিপি পাইলে আমি কত সন্তুষ্ট হইব। ইচ্ছা হইবে, সেটি পুং-পুং পড়ি। আমার তোমার প্রতি অক্ষরে ও প্রতি চরণে যেন আত্মীয়তা প্রকাশ পাইবে। হয় ত তুমি বধন লিখিবে, তখন কিছু এত মনে করিয়া লিখিবে না, কিন্তু সেই সকল বাক্যের অমৃত-ময় অর্থ আমার মনে উঠিবে। সামান্যত পত্রে বাক্যের স্থানে 'নিত্য' তোমারই লিখিবে। এ পাঠ সকলে সকলকেই লেখে, কিন্তু আমার চক্ষে তাহার প্রকৃত অর্থই লাগিবে।”

হৃৎকুমার বলিল। “সত্য বলিরাছ। আমারও মনে এইরূপ ব্যুত্থেছে। আমি এক্ষণে যেন সরমায় হস্তলিপি পাইলেও অত্যন্ত আশ্চর্য হই। প্রেমে মানুষকে হীনবল করিয়া ফেলে; আমার বীরত্ব যেন সেই কোমল সরমায় নিকট ক্রান্ত পাই-তেছে। আমি পরাজিত হইয়াছি। আমি বালকের মত হীনবুদ্ধি হইয়াছি আমার এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, কোকিলের স্বরে ও কৃষ্ণবর্ণ রাবার দর্শনে মনে কৃষ্ণ-ভাবের উদয় হওয়া ও অতর্কিত কষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। মালিকরাজ! আমরা উভয়ে এক্ষণে এক কথা শুল্লির ভাব ভাল বুঝিয়াছি। কিন্তু প্রেম কি বীরের ধর্ম্য। আমি সরমাকে আর ভাবিব না। আমার মন হইতে দূর করিব। বধন লাভের কোন উপায় নাই, আর সম্ভাবনাও নাই, এখন শুদভাবে যে প্রকারে পারি, সন্তুষ্ট হইতে হইবে।”

মালিকরাজ বলিল। “হৃৎকুমার! তোমার অন্য কিছু মনের ভাবের ব্যত্যয় দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তোমার ত সরমায় উপর এরূপ ভাব ছিল না। তুমি অন্য কোন পুরাতন বিরহসহিত প্রেমিকের মত বধা বাঁধেছ। তোমার সঙ্গে কি সরমায় কোন কথা হইয়াছিল? সরমাকে কি তোমার প্রেমাস্পদ হইয়াছেন ও সরমাকে কি তুমি সহ্য করিতে অন্তিলাষ কর?”

হৃৎকুমার বলিল। “সত্যি বরং! আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কেমন হইয়াছে। আমি চিরকাল সরমায় আমার বিনীত ভগিনীর মত ভাল বাসিতাম। কিন্তু তোমাকে বলি নাই, অতঃপর এক বৎসর হইল। তাহার চক্ষে আমার চক্ষু মিলিলে অমনি যেন উভয়ে ঈহদ্ বজ্রিত হইয়া অস্ত্র দিকে দৃষ্টিপাত করি। অমনি যেন সরমায় গগনেশ ঈহদ্ রাস্তায় বর্ণ হয়। আমার ত সেই সময়ে নাড়ী কিছু জ্বল বেগে চলে। এইরূপেই প্রায় এক বৎসর গেল। অন্য রাজবাটীতে গিয়া সরমায় স্বরে বসিতাম। সরমা তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন ও আমিও যেন অকারণে মত তাঁহার রসপূর্ণ মুখের এবড়ান দৃষ্টিতে ভ্রমণে মগ্নবের মত পাল করিতে লাগিতাম। পরে আমার শরীর শিথিল, প্রত্যঙ্গ অবশ হইল। যে বাহ কৃষ্ণ-নাথের বিবম খড়া ভাজিয়াছিল, সে বাহ আর নড়ে না, স্পন্দ রহিত। সরমাও

সেইরূপ স্পন্দরহিতা। কিছুক্ষণ পরস্পরের নেত্র মিলিত ছিল। মালিকরাজ! বিশ্বাস করিবে না, তোমার নেত্রে আমার নেত্র মিলিত হইলে যে রূপ হয়, যেন ততো-
বিক আমার মন সন্তুষ্ট হইল। তাহার পর আর কখনো আমি কিছুই দেখিতে পাই
না, আমার কেমন হইতে লাগিল। দেখিলাম, সরমা হেঁটবুথ হইয়া ভাবিতেছেন।
সরমার বক্ষস্থল বন বন নিখাসে ঢুলিতেছে; যেন তিনি কি পরিশ্রম করিয়াছেন।
হায়! সে মুহূর্ত্ত কাল পুনর্লোকে আমি জীবনের সুখ হইতে বিরত হইতে পারি।”

মালিকরাজ সূর্য্যকুমারের দক্ষিণ কর আপনায় করে লইল ও এক চুষ্টে তাহার প্রতি
নিরীক্ষণ করিয়া বলিল। “সূর্য্যকুমার! ভালই হইয়াছে। আমার চির পরিচিত সখা
সহচরী পাইয়াছেন। -- ভাল, সখী বলিয়াও আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিলে সুখী
হইব। ঈশ্বর করুন, তোমার শীঘ্র মিলন হউক, আমি যেন সে মিলন দেখি ও
সুগলরূপ দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করি। সত্য সূর্য্যকুমার! তোমার উপযুক্ত মিলি-
য়াছে। এটি বিধির মহান অনুগ্রহ। মনোবৃত্তানুসারিণী প্রেয়সী পাণ্ডুর অতি সুকঠিন,
ডাঙে আবীর যখন সে প্রেয়সী তোমার প্রেমের প্রেমিক। আঃ! এ যে সুখের
একশেষ হইল। সূর্য্যকুমার! তোমার সুখ-চন্দ্রোদয়ে আমার মন পথান্ত প্রকৃত হইল।
যখন প্রেমিকবরের মনের মিলন হইয়াছে, তখন আর কোন বাধাই দাঁড়াইবে না।
অবশ্যই মিলন হইবে। বুঝিয়াছি তুমি সরমাকে ভাল বাস। সুখের কথা, সরমাও
তোমার ভাল বাসে। তবে তোমাদিগের মধ্যে কোন কথাবার্তা হইল না?”

সূর্য্যকুমার বলিল। “ঐক এমনি কিছু কথা-বার্তা হয় নাই, তবে আমি পূর্ব্বস্মার
চাহিলে সরমা বলিল, ‘বস দেখি, আমি কি দিব’। আহা! কি মিষ্ট স্বরেই সে
শব্দগুলি আমার কর্ণকে মোহিত করিল। আমি যোহিত হইলাম।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্য্যকুমার! রাজা তোমাকে যখন বৈষ্ণব রাজ্য দিতে
স্বাকার করিয়াছেন, তখন যে বসি তোমার অপর অভিলাষটিও পূর্ণ করিবেন।
তাহা হইলেই ভাল হয়।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমার অপর অভিলাষ কি? ও তাঁহারই বা সে অভিলাষ
পূর্ণ করণে কি ক্ষমতা আছে?”

মালিকরাজ বলিল। “কেন তোমাকে তিনি সরমা দান করিবেন মনে করিয়াছেন;
আমার ত এমত বোধ হয়। রাণী তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?”

সূর্য্যকুমার বলিল। “রাণী ও বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, কেবল আমি পূর্ব্বস্মার
চাহিলে তিনি বলিলেন, ‘আমি তোমার আশার কর্ণের হার দিব’। ইহার তাৎপর্য্য কি?
তিনি কর্ণের উপর স্মার দিয়া বলিলেন। আমি বুঝিলাম যে, সরমাকেই লক্ষ্য
করিলেন। তোমার কি বোধ হয়? ইহাতে কি সরমার উপর লক্ষ্য বোঝায়?”

মালিকরাজ বলিল। “আমারও তাহাই অনুমান হইতেছে। ভাল অপেক্ষা কর, দেখ কি হয়।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “অপেক্ষা না করিয়া কি করিব? এক্ষণে ঐমাত্র আশ্বসন্ত্বি উপায়। আশার বন্ধ হইয়া থাকি। আশালতা বড় কঠিন, বাহ্যকে বন্ধ করে, আঁতঃস্তম্ভও তাহাকে ছাড়ে না। আবার প্রতাপাদিত্যেরও সেইরূপ বটিয়াছে।”

মালিকরাজ বলিল। “তাহার আবার কি? তিনিও কি কাহারও প্রেমে বন্ধ হইয়া আশার প্রতীক্ষা করিতেছেন?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “হাঁ তিনি আমারই অবস্থা পাইয়াছেন। কেবল তাহার উগ্রস্বভাবে প্রতীক্ষা সহ হয় না।”

মালিকরাজ বলিল। “কেন কাহার উপর তাহার নজর পড়িয়াছে। আমিও আমাদিগের মধ্যে এমন কোন কস্তা দেখিতে পাই না। সে সৌভাগ্যবতী কে?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “সে হুর্ভাগ্যা রায়গড়ের ইন্দুমতী। মহারাজ তাহার রূপে মোহিত হইয়াছেন, তাহার ইচ্ছা, বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিবেন। ইন্দুমতী তাহার প্রেমের প্রোম্বিকা নন। মহারাজ তাহা জানিয়াও ক্রান্ত হইবেন না। মানুষেও ক্রান্ত হইতে পারে না। আমার ইহা কিছু অজ্ঞায় বোধ হইতেছে না।”

মালিকরাজ বলিল। “বলপূর্ব্বক আনিতে আজ্ঞা? এ কি অরাজক! এমন ত বঞ্চন তুমি নাই। কিন্তু রায়গড় বড় সামান্য দুর্গ নহে। মুহূর্ত্ত বাস্তায় প্রকৃত হইতে পারে, এমন দশ সহস্র অশ্বারোহী তাহার বন্দীভূত আছে। তাতে আবার অননুপাল দেব একটি প্রকৃত যোদ্ধা, যুদ্ধকৌশলে এমন নিপুণ! আমি জানি, মহারাজ বসন্তরায় বলিডেন যে, আমার দুর্গস্থ দশ সহস্র অশ্বারোহীতে দশ সহস্র আক্রমণী অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে সহ করিতে পারে। সত্য বটে গড়টীর চারি নিকে যে গভীর পগার, বারমাস তাতে জল থাকে, আবার তার পাড় এমন সোজা যে, পদাতি দাঁড়ইয়া উঠিতে পারে না তুমি দেখ নাই। সেরূপ দুর্গম দুর্গ আমি আর বুজাপি দেখি না। গড়ের চারি দ্বার। প্রতি দ্বারের উপর পুল, টানিলেই উঠিয়া পাড় ও হুর্ভেদ্য কবট হয়। তাতে মহারাজ বসন্তরায়ের স্বহস্তের গুলম্যাক মারা। এক একটি গুলের মাতা প্রায় চারি অনুল প্রশস্ত। তাহার মধ্যে লোহের পতর। মহারাজ সন্তরায় কবট প্রস্থত করিয়া তাহার উপর তোপ মারিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এক স্থানে দাদশবার আঁঠার সেরা পড়িয়াছিল। তাহাতেও সে টকায় নি। দুর্গের চতুর্দিকের পাড় দুই শত হাত উচ্চ ও অত্যন্ত মোটা। ক্রমে উপরে সমতল হইয়াছে। উপরের অধিকার চারি জন অশ্বারোহী পার্শ্বপাশী করিয়া বাহিতে পারে।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “তাহাতে কি তোপ আছে?”

মালিকরাজ বলিল । “তোপ কি আছে ! এত তোপ আছে যে, তোমার প্রতাপা-
দিত্যের প্রত্যেক ঢালীর উপর এক এক তোপ যোজন করিতে পারে। আশ্চর্য,
চতুর্দিকের পাড়ে কত কোণ ! এক একটি কোণ পাড়ের ব্যাস হ’তে প্রায় ২৮০ হাত
বাহির হইয়াছে, তাহার দুই দিকে অন্তরে অন্তরে তোপ বসান। আবার এমন গঠন-
কৌশল, যে গড়ের খালের অপর পাড় হইতে শত্রু-তোপের গোলা কোন মতেই উচ্চ-
পাড়ের শৃঙ্খল সৈন্তের গায়ে লাগে না, কিন্তু সেখানকার তোপের গোলা অল্পেই
বিশুদ্ধ-সৈন্তের উপর পড়ে। আর তোপেরই বা কি জোর। দুই কোণের মধ্যস্থ
স্থানে থাকিলে উভয় কোণ হইতে তোপ খাইতে হইবে। এই পাড়ের ভিতর পাকা
ইটের প্রাচীর। তাহার উপর স্থানে স্থানে মুরচা। মুরচার বাহিরের দিকে ভাল ক’রে
মাটি দেওয়া। কেবল মাকো মাকো গোলা ও গুলি চালাইবার রজ্জ। বিশুদ্ধ
তোপের গোলা মুরচার পৌঁছিলেও মাটিতে বসিয়া যায়, প্রাচীরে আঘাত লাগে না।
বসন্তরায়ের যে পরিমাণের গড়, অন্তরে সে পরিমাণের গড়ে ৫০ হাত অন্তর করিয়া
বড় তোপ রাখা যায় ; বসন্তরায়ের গড়ে তাহার অপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা ৩২ গুলি তোপ
থবে। অথচ রায় দুর্গের তোপ সব অত্যন্ত অন্তর অন্তর বসান। এমন কি প্রত্যেক
তোপের মধ্যে প্রায় ৮০ হাত জমি আছে।”

“ইটের প্রাচীরের ভিতর দিকে মাকো মাকো এক একটা মাটির প্রকাণ্ড চতুর্কোণ-
কলসবিশিষ্ট স্তূপ। তাহার ভিতর আয়ুধাগার।—বারুদ, গোলা, শর প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র
পরিপূর্ণ। বাহিরের পাড়ের ভিতর দিকে প্রাচীর ভেদ ক’রে এক এক ঘর। সে
ঘর দিয়া পাড়ের ভিতরের ঘরে যাওয়া যায়। ঘরের অপর দিকে এক একটি গবাক
খালের উপর খুলিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যে এক একটি তোপের চোকা দেখা যায়।
প্রতি প্রকাণ্ড গবাকঘরের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট ছিদ্র, সেইখান দিয়া মহারাজের
গোলন্দাজেরা লক্ষ্য করে। খানুকী ও বন্দুকীরা বাণ ও গুলি চালায়। এরূপ গবাক-
ক্ষেত্র, সমস্ত পাড়ে তিন সার। নিম্নস্থ সারের দুই গবাকের মধ্যে উচ্চস্থ সারের
এক এক গবাক। একুনে পাড়ের অধিত্যকা ল’য়ে চার সার তোপ গড়কে রক্ষা
করিতেছে। সে কি সামান্য গড় !”

সুহৃদ্ধমার বলিল। “এ সকল কৌশল চালাইতে তো গড়ে অনেক সৈন্তের
আবশ্যক। তা রায়গড়ে কি তত সৈন্ত আছে ?”

মালিকরাজ বলিল। “না এক্ষণে তত কেন, কিছুই নাই। সর্বসম্বিত বুদ্ধি
২০১২ জন হইবে। তাহার আবার সামান্য ভূত্যের কাজ করে। কিন্তু বসন্তরায়ের
এমনি বন্দোবস্ত যে, তাঁহার খানসামা ও পাচক পর্যন্ত অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ। বাটীর
দাসীরা অস্ত্রধারিণী। সেখানে অতি সহজে কোন কর্মই হইতে পারিলে না। আবার

রাজা বসন্তরাত্রে সময় এমন বন্দোবস্ত ছিল যে, গড়ের ঘুরচা হইতে তুরী বাজিলেই তাহার নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের জায়গীরদারেরা আপন আপন সৈন্ত লইয়া উপস্থিত হয়। এরূপ প্রণালী আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমার সন্দেহ হয় যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য সে গড়ে বল করিতে পারিবেন কি না? পারিতেন ত বসন্তরাত্রে বর্তমানে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন না, কিন্তু এখনও পারিবেন না। অমলপাল দেব বলিচ রাজপুত্র ও প্রজাবর্গের উপর অত্যন্ত দৌরাস্ত্য করেন, কিন্তু তিনি জানেন, কিরূপে তাহাদিগকে বন্দীভূত রাখিতে হয়। প্রজারা সকলেই তাহার উপর বিরক্ত; কিন্তু সে বিরক্তিতে তাহারা কখনই রায়গড়ের আক্রমণে স্থির হইয়া থাকিবে না। ভনিয়াছি, কমলা রাণী সকলকেই অত্যন্ত যত্ন করেন। তাতে আবার হিন্দুমতীর অলৌকিক দয়া ও নম্রতার সকলে ক্রৌণ্ড হইয়াছে। যেখানে ক্রীলোকে আপনারা স্বয়ং অস্ত্র ধরে, আবার দয়া বিতরণে সৈন্ত-প্রীতিলাভ করে, সেখানে কোন শত্রুই দণ্ডফুট করিতে পারিবে না।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধকৌশলে ভীষ্মদেব। তাতে আবার আমি বাইতেছি।”

মালিকরাজ বলিল। “তুমি বাইও না। কেন বুধা অপমান ক্রয় করিবে। তোমার সাধা নহে যে রায়-দুর্গ, দখল কর।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কি! আমি আপনার মত সৈন্ত পাইলে পৃথিবীর কোন দুর্গই ভেদ করিতে ভয় করি না।”

মালিকরাজ বলিল। “স্বর্ধাকুমার অদ্যকার ব্যাপারে তোমার যথেষ্ট যশোরাশি উপার্জন হইয়াছে। অনেক আশা করিতে গিয়া কেন তাহা কলঙ্কিত করিবে।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কি! পরাজিত হইব তয়ে আমি যুদ্ধে অপ্রস্তুত হইব? বরং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইব, বন্দী হইব। তথাপি নিশ্চয় পরাজয় জ্ঞানে পরাভূত হইব না। রণ প্রার্থনা করিলে স্বর্ধাকুমার কখন অস্বীকার করিবে না। মালিকরাজ, তুমি বীর হইয়া কেন এমন বলিতেছ?”

মালিকরাজ বলিল। “স্বর্ধাকুমার আমি কাপুরুষ নহি। যদিও মনুষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তোমার এরূপ বলভায়, তবে তোমার ভিন্নস্বার উপযুক্ত হইত। কিন্তু গড়ের সঙ্গে যুদ্ধ। ইহাতে তুমি নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। কিছুই করিতে পারিবে না।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কেন, যদি গড়ের ভিত্তর প্রবেশ করিতে পারি?”

মালিকরাজ বলিল। “হাঁ! যদি পরাজয় করিতে পার। কিন্তু কি প্রকারে প্রবেশ করিবে?”

হৃদ্যকুমার বলিল। “কেন শুণ্ডভাবে প্রবেশ করিব।”

মালিকরাজ বলিল। “তবে ত যোদ্ধার মত হইল না। সে ত চোরের কাজ। ভাল ভাই বা কি প্রকারে সম্ভব?”

হৃদ্যকুমার বলিল। “কেন গঞ্জালিস বলিগাছে আমরা অভিষি হইয়া প্রবেশ করিব।”

মালিকরাজ বলিল। “ভাল এই ত বীরেরই কাজ। আশ্রয়দাতার বিশ্বাস নষ্ট করিবা। গঞ্জালিসের উপযুক্ত পরামর্শ। নিজে দহ্মশ্রেষ্ঠ, দহ্মার মত বলিল।”

হৃদ্যকুমার বলিল। “তুমি তাহাকে কেন অকারণ দোষী করে আপনি পাপী হইতেছ। সে কি দহ্ম?”

মালিকরাজ বলিল। “হৃদ্যকুমার, তুমি তাহাকে চেন না। সে ফিল্লিঙ্গা। তাহার নাম সিধাষ্টিন গঞ্জালিস। সনদ্বীপে তাহার প্রধান অবস্থান। সে বোহেটের দল নইয়া সমস্ত দক্ষিণ রাজ্য জনশূন্য করিয়াছে। গ্রামকে গ্রাম বন হইয়াছে। সম্রাট আকবর তাহার শাসন জন্ত মহারাজ মানসিংহকে পাঠাইয়াছেন। তাতে আবার জিহাদির লাহ তন্তে বসিয়াই মানসিংহকে ফিল্লিঙ্গা দহ্মাদল এককালে নিশ্চুল করিতে আদেশ দিয়াছেন।”

হৃদ্যকুমার বলিল। “কি মহারাজ প্রতাপাদিত্য তবে আমাকে দহ্মাদলে পাঠাইতেছেন, আমি কখনই যাইব না। আমার বল ও বীর্য কখন নাচ কস্মে যোজিত হইবে না।”

মালিকরাজ বলিল। “তোমাকে কি মহারাজ গঞ্জালিসের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন?”

হৃদ্যকুমার ‘হাঁ’ বলিয়া আনুশূর্বিক মহারাজের আদেশ সব মালিকরাজকে বলিল।

মালিকরাজ শুনিয়া বলিল। “সব বোঝা গেল, বেন মহারাজ তোমার রাজ্য নিতে চাহিয়াছেন, ওত তাঁহার রাজ্য দেওয়া নয়। তোমার অপকৃষ্ট কর্ম করার বেতন। আমার বোধ হয় মহারাজ কেবল একই সন্ধানেছার তোমার লোভ দিয়াছেন। ও সকলে ভুলিও না”

হৃদ্যকুমার বলিল। “তুমি কি আমাকে এত নীচবুদ্ধি পাইলে? আমি এই বিষয়েই তোমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে যাই। মহারাজ আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গিয়া বলি যে, আমি হইতে মহারাজের এক কর্মটি হইবে না। মালিকরাজ বলিল, চল আমিও যাই।”

এই বলিয়া উভয়ে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখে—তাহার আগমনে বিনয় দেখিয়া হজুরমল, গঞ্জালিস ও অনুরূপাম তিনে অগ্ন্যবোধ করিয়া ধীরে গমনোন্মুখে দাঁড়ইয়াছেন। মহারাজ, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ, রণবীর বাহাদুর ষায়ে প্রত্যেকবেশে আছেন। হৃদ্যকুমার ও মালিকরাজকে আগত দেখিয়া বলিলেন। “এ হৃদ্যকুমার আসিতেছে, ভাল হইল। মালিকরাজও যান।”

পরে স্বর্ধকুমার নিকটস্থ হইলে বলিলেন “এত বিলম্ব কেন? মালিকরাজকেও লইয়া যাও, আমার আদেশ সব শ্রবণ থাকে। প্রত্যাগমন করিলেই তোমাকে অন্নভী রাজ্যের সিংহাসনের ফরমাস্ (১) দিব।”

স্বর্ধকুমার কৃতজ্ঞ হইয়া বলিল। “মহারাজ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।”

রাজা বলিলেন। “ক্ষমা করিগাম, প্রস্তুত হইতে বিলম্ব প্রায় হয়, তাহাতে বড় লোম নাই, বিশেষত অন্য যেরূপ ভ্রম করিয়াছ।”

মালিকরাজ মহারাজের ভ্রম বুঝিল। স্বর্ধকুমারের আগমনের কারণ ক্রীণবল চিহ্নিয়া অগ্রসর হইল। কৃতজ্ঞলিপটে বলিল। “মহারাজ! স্বর্ধকুমার অন্যকার পরিশ্রমে নিত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে। আমিও একান্ত হীনবল হইয়াছি। স্বর্ধকুমারের এমত বল নাই যে, অর্থে আরোহণ করে। আপনার নিবট লজ্জার বলিতে পারে নাই। আপনার নিকট হইতে শিবিরে যাইয়া একান্ত অস্থির হইল। এক্ষণে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে ও শিবিরে গিয়া নিজা বাইতে অনুমতি চাহে।”

আদৌ মহারাজের স্বর্ধকুমারকে এ ব্যাপারে পাঠাইতে কোন মতেই মত ছিল না, কেবল গঞ্জালিসের অনুরোধেই স্বর্ধকুমারকে বলিয়াছিলেন। বিশেষত তিনি স্বর্ধকুমারের মত-পরিবর্তনের ভয় সর্বদাই করিতেন। ভাবিতেন পাছে সেখানে গিয়া ইন্দুমতীর জ্বলনে মোহিত হয়, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, আর হয় ত বিপদজনক হইবে। এখন স্বর্ধকুমারের অনুরোধে তাহাকে বিশ্রামের অনুমতি দিলেন। গঞ্জালিসকে বলিলেন “তুমি আপনি অন্যকার পরিশ্রম দেখিয়াছ। স্বর্ধকুমার অর্থে আরোহণ করে এমত শক্তি নাই। এতএব এরূপ হীনবল যোদ্ধার তোমার কোন প্রয়োজন নাই।” গঞ্জালিস বিলম্ব হইতেছে জ্ঞানে উত্তর দিল “মহারাজ, হজুরমল হইতে সকল কস্মই সমাধা হইবে।”

মহারাজ বলিলেন। “কালী তোমানিগের ত্বরিত করুন।” গঞ্জালিস আপন অশ্ব চালাইল। হজুরমল ও অনুপারমও বেগে অশ্ব চালাইল। অশ্বত্রয় বেগে চলিল। গঞ্জালিস দূর হইতে আপনার টুপি হস্তে উঠাইয়া মহারাজকে বিদায় অভিবাদন করিল। মহারাজ দক্ষিণ হস্ত শিরোদেশে তুলিলেন ও আপন ক্রমাগত কোণ হাতে লইয়া উচ্চ করিয়া হুলাইয়া উত্তর দিলেন।”

গঞ্জালিস নবনপথের বহির্ভূত হইলে মহারাজ স্বর্ধকুমারকে বলিলেন। “এক্ষণে শিবিরে বিশ্রাম কর, আহরের সময় রাজবাঙ্গিতে আসিও।”

দুর্ধ্যকুমার বলিল। “অথ্য রাত্রে আহাৰ করিব না।” মহারাজ “তবে বিজ্ঞান করণে।” বলিয়া সভাসদ সকলকে লইয়া রাজবাটীতে গেলেন। দুর্ধ্যকুমার ও মালিক-রাজ পরস্পরের স্বকল্পে হস্ত রাখিয়া শিথিলভাবে চলিল।

দুর্ধ্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ। তোমার বড় প্রত্যাশারমতি, তুমি কেমন মহারাজের ভ্রম আশ্রয় করিয়া উত্তর দিলে।”

মালিকরাজ বলিল। “কেন সুযোগ ছাড়িবে। দস্যুর সঙ্গে বাইবে না, স্পষ্ট মহারাজকে বলিয়া কষ্ট করার লাভ কি?”

দুর্ধ্যকুমার বলিল। “গঞ্জালিসের সঙ্গে মহারাজের কিমতে আলাপ হইল; গঞ্জালিল ন্যূ, তাতে আবার ফিরিঙ্গী।”

মালিকরাজ বলিল। “অনুপরামের দ্বারা মহারাজের সঙ্গে গঞ্জালিসের আলাপ হইল। অনুপরাম বকপুরের রাজার ভ্রাতা। ইহার জ্যেষ্ঠ রাজ্যভিত্তিক হইয়াছে, ইনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বকপুর ত্যাগ করেন ও গঞ্জালিসের সঙ্গে কিছু দিন দস্যুত্ব করিলেন। যখনই, কোজহীন হইয়া বকপুর অধিকার করিতে অক্ষম। মহারাজের সাহায্য লাভার্থে যশোরে যান। তথায় মহারাজের সঙ্গে অনুপরামের আলাপ হয়। মহারাজ হেতুমা ভাল বাসেন, ইহাকে সাহায্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন। পরে রায়গড় অধিকারার্থে যমুনাতে সসৈন্তে আনিলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্ট অনুপরাম একক মহারাজের আশ্রমে না ভুলিয়া বন্ধুমানাধিপে নিকট গিয়া অবস্থান করে ও ক্রমে ইহাকে সাহায্য দিতে অনুরোধ করে, বন্ধুমানাধিপও সাহায্য দিতে স্বীকার পান। ইত্যবসরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রায়গড় দখল ও ইন্দুমতী লাভেচ্ছা অশ্রমে। অনুপরামের পরামর্শে গোপনে উত্তর কন্ঠ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া গঞ্জালিসকে ডাকিল ও তাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া অন্যকার ব্যাপারটি উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা হইলে কল্যাণে মহারাজ লোকমুখে রাগেদের অবস্থা শুনিয়া যেন ভয়ানকভাবে রায়গড়ে উপস্থিত হইবেন ও পরে এমত ঘটনা না হয় ও এই আশয়ে আপনাতঃ সমস্ত সৈন্ত কৃষ্ণনাথের অধীনে সেই দুর্গে রাখিয়া আপনি উড়িয়া দেশে যাত্রা করিবেন।

দুর্ধ্যকুমার বলিল। “মহারাজের উড়িয়াতেই বা গমনের উদ্দেশ্য কি?”

মালিকরাজ বলিল। পাঠানদিগের সঙ্গে সন্ধি। প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত হুই রাজা, স্বরাজ্যে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করেন, বঙ্গের অপর একাদশ রাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের কোপ জন্মিয়াছে। তাতে আবার অনুপরামকে সাহায্য দিতে স্বীকার হইলেন। এ সমাচার আশ্রয়দিগের রাজ্যে প্রকাশ না হইতে বইতেই দিল্লীর দিকে কর্ণে উঠিল। দিল্লীর ক্রমে চলিলেন যে, পাঠানদিগের লোক

বশোরে বাতাস ত করে। ইহাতে সন্দেহভিত্তি হইয়া মহারাজ মানসিংহকে উদ্ভিয়ার পাঠান শাসন, ফিরিকী-দফতর নষ্ট ও প্রতাপাদিত্যের ব্যবহার ও রাজনীতি লক্ষ্য করিতে পাঠান। লোকপল্লবের শুনিলাম, এমন অনুমতি আছে যে, মহারাজের দোষ দেখিলে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া শাসনও করেন। মহারাজ মানসিংহ এই অনুমতি লইয়া বাঙ্গালার রওয়ানা হইলে পর সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবরসাহের কাল হয়। জিহাদিরসাহ তাকে বসিলে মহারাজ মানসিংহ বর্জ্যমানে অবস্থান করিয়া নুতন বাগশাহের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে দিল্লী হইতে সমাচার আইলেই তিনি কর্ণে প্রবৃত্ত হইবেন। দিল্লী হইতে সমাচার আসিবার সময় হইয়াছে। বোধ করি, আজ কালের মধ্যে সমাচার আসিবে। তখনই প্রতাপাদিত্যের হরত পালা সাজ হইবে।”

সুখকুমার বলিল। “আমাদিগের রাজার মাহুলের বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত নজর। ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত পীড়নে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। আর এই বা কি কথা যে, এক বিপণী দ্রব্য উৎপত্তি স্থান হইতে ব্যবহারের স্থানে পৌঁছিতে ১ বার মাসুল দিবে।”

মালিকরাজ বলিল। “মাসুল তেঁা ধনের উপর দৌরাত্ম্য বই নহে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অত্যাচার দৌরাত্ম্য শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়। এখনও মহারাজ তেঁাকে তেঁমার রাজ্যে যদি পুনর্বার অভিযুক্ত করেন, তবে তাঁহার বহুল পাপের মধ্যে একের কথকিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কিন্তু আমার এসত বোধ হয় না যে, তিনি তেঁামারে অকারণে রাজ্য দেন।”

সুখকুমার বলিল। “তিনি আমার সহজে রাজ্য না দেন, তবে আমার এ স্থান হইতে পালাইতে হইবে। একবার দেশে গিয়া দেখিব, প্রজাবর্গের কি মত। কিন্তু সময়ের অভিশ্রাব বুঝিতে হইবে।”

মালিকরাজ বলিল। “সে দিকে নিশ্চিত থাক, সময় তোমারই হইয়াছে।”

সুখকুমার বলিল। “আমার রাজ্যদান করিলে মহারাজের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইল?”

মালিকরাজ বলিল। “সে বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে এস বস।” এই বলিয়া উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া এক আসনে বসিলেন।

সুখকুমার বলিল। “মালিকরাজ আমার গঞ্জালিসের বুদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। গঞ্জালিস ইন্দুমতীকে অপহরণ করিয়া তাহার সে মুখত্ৰী দান করিবে, ইহা আমার মত হইতেছে না। চল আমরা রায়গড়ে বাই।”

মালিকরাজ বলিল। “আমাদিগের সেখানে যাওয়া উচিত নহে। আমরা মহা-রাজের বিত্তভোগী। তিনি আমাদিগের সেখানে যাইতে বলিলেন, আমরা তাহে রোগক্ষুলে না যাইয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম না। আবার তাঁহারই ইচ্ছায়

বিপদ কাশ করা কি ভাল হইবে। এটি ধর্মসম্বন্ধ নহে। বিত্তভোগ্যের এ কি কর্তব্য ? তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাসবাতক হইতে হইবে।”

স্বর্ধাক্ষর বলিল। “আঃ বড় ধর্ম্যে কথা কহিলেন। একটি কষ্টকে তাহার হস্তাধার বিপরীতে বলপূর্বক হরণ করিতেছেন! আমরা তাহা জানিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিব।”

মালিকরাজ বলিল। “আমরা কিছু দেশের হাকিম নহি, রাজার কর্ণের বিতাহিত বিবেচনা পক্ষান্তর হইবে। কিন্তু মহারাজ আধিপতি। তাঁহার কর্ণের ভাল মন্দ বিচার করা ও ধর্ম্যধর্মের শাসনের অধিকার, আমাদের নাই।”

স্বর্ধাক্ষর বলিল। “কি আমাদের জ্ঞানসাধনে একের চিরকালের মত ধর্ম ও অর্থ মিলে হইবে ? আমরা তাহাকে সন্তর্ক পর্যাভ্যাস করিব না ? এ কি প্রকার ধর্ম ?

মালিকরাজ বলিল। “হাঁ ভূমি অপর এক জনার সুখের জন্য মহারাজের সুখ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইতেছে। ভূমি বাহার পালিত, তোমার কর্তব্য তাহারই সুখ বৃদ্ধি করা। তা না করিয়া কে একজন অপর জনের সুখের দিকে তোমার দৃষ্টি হইল।”

স্বর্ধাক্ষর বলিল। “ইহাতে মহারাজের কি সুখ হানি ? তাঁহার রাজমহিষী কিছু কুৎসিতা নহেন, কুৎসিতা হইলেও ধর্মপত্নী। আবার তার পর তাঁহার আর কত মহিলা আছে।”

মালিকরাজ বলিল। স্বর্ধাক্ষর ! সংসারে ত কত রূপসী স্ত্রী আছে, তাহাদিগের সকলকে ভোগ করিয়া ভূমি সরমার জন্য এত ব্যাকুল হইলে কেন ? মহারাজেরও সেইরূপ।”

স্বর্ধাক্ষর বলিল। “আমাদিগের প্রেম অদ্বিগাছে। মহারাজের তে প্রেম নহে, কেবল ইন্দ্রিয় পরিচর্য করা।”

মালিকরাজ বলিল। “নে বাহা হটক, আমাদিগের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বিধে নহে। আমরা যখন সে কর্ণে মহারাজের সহায় হই নাই, তখন আবার তাঁহার বিপদে হস্তোত্তোলন করা নিত্যন্ত কুফর্ম। এস এখন ক্ষান্ত হও, বিশ্রাম কর, অন্য যে পরিচর্য হইয়াছে তাহাতে আমি ত আর বসিতে পারি না।”

স্বর্ধাক্ষর মালিকরাজের হস্ত ধরিয়া বলিল, “ভরু, চতুর! আমি তোমার সঙ্গে প্রত্যাগমনের মত ভুলিব না। উঠ চল আমরা একত্রেই রায়গড়ে বাই। বিলম্ব হইলে কি আমি সরমার জালিস কি করিব। আমার মন হির হইতেছে না। আবার বামচক্ষু-স্পন্দন হইতেছে। আর আমার এক দণ্ডও এখানে অবস্থান করিতে

মন বাইতেছে না। আমার বোধ হইতেছে যেন গঞ্জালিসের হস্তে আমার বিবর বিপদ আছে।”

মালিকরাজ হাসিল। আবার কয়েক পরেই তাহার চক্ষুর অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। তাহিল “অবিজ্ঞাভেহপি বকৌ হি বলাদকৃত্যন্তে মনঃ।” এটি আখ্যাত্তামের পরিচয়। একটি দীর্ঘ নিবাস ছাড়িয়া বলিল। “বধাতার ভবিতব্যতা অবশ্যই হইবে। প্রতাপাদিত্যের প্রাগ্‌লব্ধ বৈরুপ। আমি কি বলিব। সেইটি ঈশ্বরের নিবন্ধন। আপনাত্ম পাত্রকে খুঁজিয়া ধর ও আকর্ষণ করে। স্বর্ধকুমার, তোমার মতেই আমার মত; চল বাইতে হয় ত শীঘ্র চল, কিন্তু আমার একবার মালতীকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। পিতার সঙ্গেও একবার দেখা করিতে মন বাইতেছে। হয় ত আমাদিগের আর এ শিবিরে আসিতে হইবে না। চল বাই। বাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে, আর কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না। তাহাতে মায়া বাড়িবে।” বলিয়া একলক্ষ্যে আসন ত্যাগ করিল ও অতি শীঘ্র পদে অপর ঘরে গিয়া বস্ত্র পরিতে লাগিল। স্বর্ধকুমার মালিকরাজের কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। মৌন রহিল। আপনাত্ম ঘরে গিয়া বস্ত্র পরিয়া শীঘ্র সমস্ত হইয়া বাহির হইল। উভয়ে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপন আপন অবে আরোহণ করিল। ক্রমে ছাউনি দিয়া মাঠাভিমুখে চলিল। রাত্রি তখন ৩০ নং হইয়াছে, ছাউনিতে প্রহরীরা পাহারা দিতেছে, স্বর্ধকুমার ও মালিকরাজকে এই দেশে রাত্রিতে বাহির হইতে দেখিয়া বলিল “মহাশয়েরা কোথায় বাইতেছেন?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “প্রয়োজন আছে এখনি আসিব।”

সপ্তম অধ্যায়।

“কাত্যং স্তপ্তে সতি পরিজনে বীতনিজামুশেরাঃ।”

এ দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, স্বর্ধকুমার ও মালিকরাজকে বিদায় দিয়া আপন ক্ষেত্রে গেলেন। কখনাধ মহারাজকে আপন ঘরে বসিতে দেখিয়া বিদায় লইল। বিজয়কৃষ্ণ বিদায় চাহিলে মহারাজ বলিলেন, “বিজয়কৃষ্ণ! কিছু কথা আছে, অপেক্ষা কর।” বিজয়কৃষ্ণ আদেশ মত বসিল। অন্যত্র সভাসদ নকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, মহারাজ বলিলেন, “বিজয়কৃষ্ণ! এক্ষণে গঞ্জালিস ত গেল, তোমার বোধ হয় কি, কৃতকার্য হইবে?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! কৃতকার্য হইতে বাধা ত কিছুই দেখি না, তবে ভবিতব্যতা।”

রাজা বলিলেন । “হজুরমল এক জন প্রকৃত বোদ্ধা, অবশ্যই আমার কার্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “পঞ্জালিসের চতুরতা ও হজুরমলের বল একত্র হইলে কোন কর্মই অসিদ্ধ থাকে না । কিন্তু সতর্ক কর্ত্ত করিলেই সকল হইবার সম্ভাবনা । রায়-পড় বড় কঠিন স্থান । অনঙ্গপাল অত্যন্ত বহনশীল ।”

রাজা বলিলেন । “উড়িয়া হইতে এখনও আমার পত্রের উত্তর আসিল না কেন ? বহু দিন হইল আমার লোক উড়িয়ার গৈছে । উত্তর না পাইলে আমি কোন দিকে তরুণ দিতে পারিতেছি না ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “আমার বোধ হয়, উত্তর আজ কালের মধ্যে আসিয়া পৌঁছবে । দেখুন, কল্য প্রাতে রায়পড় হইতে কি সমাচার আইসে ।”

রাজা বলিলেন । “এখন সূর্য্যকুমারকে কি করা যায় ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “তাহাকে বড় শীঘ্র এ স্থান হইতে অপসার করুন, ততই ভাল ।”

রাজা বলিলেন । “এত তাড়াতাড়িতে প্রয়োজন কি ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ আপনি জানেন যে, সূর্য্যকুমার এখানে থাকিলে কত বিপদ ঘটতে পারে । সে বেরূপ বোদ্ধা ও অস্থিরবুদ্ধি ।”

রাজা বলিলেন । “অস্থিরবুদ্ধি হইয়া আমার কি কতি করিতে পারে ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ, সূর্য্যকুমারকে সহজে বিদায় না দিলে সে অতি শীঘ্রই আপনার সভা ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে যাইবে । তাহার বেরূপ রাজ্য লাভে উৎসাহ জন্মিয়াছে, সে আর মহারাজের অধীন থাকিতে সন্তুষ্ট নহে, বিশেষতঃ অনুট প্রবাদ যে অরুণা রাজ্যে বিপ্র হ বার সম্ভাবনা ও সূর্য্যকুমার সে সুবিধার কথা শুনিতে সন্ত হইবেক ।”

রাজা বলিলেন । “কই আমিও তাহার অসন্তোষের চিহ্ন দেখি না ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ আরও এক সম্বোধ আছে । এমনতুলনামশালী ও শ্রেষ্ঠের যুবা পুত্রকে আপনার অন্তঃপুরে সর্ব্বদা গমন করিতে দেওয়া বিধিবিহিত কর্ম হইতেছে না, ইতর যুবা হইলেও অবস্থার ভারতম্যে অনেক দমন থাকে ।”

রাজা বলিলেন । “কেম, কিসে অবৈধ ? সূর্য্যকুমার বালককাল অবধি আমার বাটতে পালিত হইয়াছে, তাতে আমার মহিষী তাহাকে পুত্রবৎসল্যে বহু করেন ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ আপনার সরমা একশে আর বাসিকা নাই । আমি প্রায় বৎসরাবধি উত্তরের মনের তাব লক্ষ্য করিতেছি । কিছু বাল্যকালের স্মরণ শ্রীতির বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি । আপনি লক্ষ্য করেন নাই ?”

রাজা বলিলেন । “সূর্য্যকুমারের সে ভাবোদরে তাহার স্বভাব আচরণের ব্যত্যয় হয় নাই । যদিচ তাহার সময়ের প্রতি অনিনীতবের কিছু চাকল্য হইয়া থাকে, তথাপি বিমল প্রেম ব্যতীত আরও কিছুই আমার চক্ষে লাগে না ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ, সরমা দেবীরও মনচাকল্য লক্ষ্য হয় ।”

রাজা বলিলেন । “সরমা বলিকা, শৈশবাবধি সূর্য্যকুমারের সঙ্গে প্রায় চিরকাল একত্রে বাস করিয়াছে ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “সে বাহা হউক, সরমা দেবী বিবাহোপযোগী হইয়াছেন । তাঁহার পরিণয়ের কিছু চিন্তা করিয়াছেন ?”

রাজা বলিলেন । “তুমি কি কোন পাত্র স্থির করিয়াছ ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ বর্জ্জমানাধিপের বয়স অল্প । তাঁহাকে কি বলেন ?”

রাজা বলিলেন । “বর্জ্জমানরাজ অল্পবয়স বটে, কিন্তু তাহার বিবাহও হইয়াছে । সরমাকে আমি সপত্নীর কোলে সমর্পণ করিব না ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “তবে আমি ছত্রধারী পাত্রও দেখি না ।”

রাজা বলিলেন । “আমার বর্জ্জমানরাজকে আমার কস্তাদানে আর একটি বিশেষ বাধা আছে ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “আপনি কি আপনার পুত্র হইবে না ভাবিতেছেন ?”

রাজা বলিলেন । “সে কি সামান্য ভাবনা ? বর্জ্জমানরাজ বশোরকে আপনার অস্ত্রান্ত সামান্য প্রানের নত ব্যবহার করিবে, তাহা হইলেই আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মান লোপ পাইবে ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “তাহা নিঃসন্দেহ হইবে । কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া আপনি আর কোথায় উপযুক্ত পাত্র পাইবেন ?”

রাজা বলিলেন । “সূর্য্যকুমার কিছু অপাত্র নহে ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ ! আজও যে সূর্য্যকুমারের উপর আপনার পূর্ব্ব-কার টাল আছে । কিন্তু যদি সূর্য্যকুমার সকল জানিতে পারে, তবে কি আপনার দান গ্রহণ করিবে ?”

রাজা বলিলেন । “তাহা জানিবার কি উপায় আছে ? আর পূর্ব্বকার স্নেহই বা কেন ? সূর্য্যকুমার স্থপাত্র ত বটে ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ, এ বিবেচনাটি ভাল হইয়াছে । কিন্তু বাহাতে অতি শীঘ্র উত্তরের মিলন হয়, তাহার আশাদিগের বহুবাস্ হওয়া উচিত । আপনি উদ্ভিয়ার রঙনা হইলে, আসিতে কত বিলম্ব হইবে, তাহার স্থির নাই, অতএব আমার অভিপ্রায় উত্তরের মিলনান্তে আপনি উদ্ভিয়া যাত্রা করেন ।”

রাজা বলিলেন। “কিন্তু আমার মনে মনে এক পণ আছে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “কি পণ?”

রাজা বলিলেন। “আমি ছত্রহীন পুরুষকে কস্তানাল করিব না। হৃদ্যকুমার একপে ছত্রহীন। আমার ইচ্ছা, তাহাকে অশ্রো ছত্র ও দশ দিয়া অরণ্যতীর সিংহালস দিব, পরে তাহাকে কস্তা দিব। ইহাতেই বিলম্ব হইতেছে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “সেত আপনায় উড়িয়া গমনের পূর্বে হইতে পারে না। আপনায় এ বিষয়ে মহারানীর সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। দেখুন তিনিই বা মনে কাহাকে জামাতা স্থির করিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন। “ওবে তাই চল, তুমিও আপনি তদ্বিষে, দেখ তাঁহার কি মত হয়।”

রাজা এই বলিয়া গাত্রোথান করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আপনিই যান।” রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে সরমা আপন গৃহে মালতীকে ক্রিয়া তাহার স্বহস্তচিত্রিত একটা চিত্রলিপি দেখাইতেছেন, এমন সময় রাণী সরমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণী প্রবেশ করিতেই সরমা কিছু বাস্তব হইয়া কাগজটি লুকাইলেন। রাণী বলিলেন। “সরমা! উটি কি? ছবি নাকি।”

মালতী বলিল। “ওটি আমাদের হৃদ্যকুমারের প্রতিমূর্তি।”

রাণী বলিলেন। “লেখি। কে আঁকিল?”

সরমা লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে কাগজটি লইয়া রাণীর হস্তে দিয়া বর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। অবনতমুখী সরমা লজ্জার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রথম ভাপে জ্বিন্নমাণা বৃদ্ধিদানীর সত হইলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ ঈষদ্ আরক্ত হইল। অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্রদ্বয় নীচে চাপ্তি নিক্ষেপ করিল। মুখটি বুলিয়া পড়িল। হাত দুটি শরীরের ছই পার্শ্বে বুলিল ওঠবার কিন্তু ঈষদ্ হাতের আভা দিল।

রাণী চিত্রপটটি হাতে লইয়া বলিলেন। “মালতি! সরমার বনকামনা সিদ্ধ হইবে। এ যুগলমূর্তি বড়ই শোভা পাইতেছে। সরমা বীরপত্নী বটেন। ব্যাভ্রটি পরিষ্কার হইয়াছে। আহা! হৃদ্যকুমার কেমন ভঙ্গি করিয়া ব্যাভ্রের মস্তকে পা দিয়াছেন। আমার সরমা যেন কুসুমিত মাধবী লতার মত নীৰ্ববপু হৃদ্যকুমারের বিশাল স্বকণ্ঠে আশ্রয় করিয়া কেমন ভাবে দাঁড়াইয়াছেন, সরমার কজনটি বেশ। আমি মহারাজকে অন্যাই দেখাইব ও হৃদ্যকুমার আহার করিতে আসিলে তাঁহাকেও দেখাইব। আমার ইচ্ছা হয় যেন, এই চিত্রের প্রকৃত আদর্শকে এই ভাবে দাঁড়াইতে দেখি।” কলে সরমা যে চিত্রটি রাণীর হস্তে দিয়া বর

বাহিরে গেলেন, সেটি হৃদয়কুমারের প্রতিমূর্তি। বীরপুরুষ হৃদয়কুমার যুদ্ধক্ষেপে দক্ষিণ পদটি নতশির খাত্তের মতকে দিয়া প্রকাণ্ড ধ্বজের নীচে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বামকটিতে রত্নমণ্ডিত সর্কোষ তলবারী। সমুখের কটিবন্ধে পেরকমত। মতকে তত্ত্ব উকীষ। উকীষের উপর স্থলনিত হোমার পর, হীরক অঙ্কিত দীর্ঘ শিরশেচ কলকার উপর স্থলিতেছে। কর্ণধরে কুণ্ডল। কর্ণে বড় বড় সূতার কণ্ঠী। দক্ষিণ হস্তে কিকিং উর্দ্ধ করিয়া দীর্ঘশেল ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পদের নীচে একটি প্রকাণ্ড ব্যান্স সমুখের পাণ্ডিত হস্তধরের উপর আপন মতক রাখিয়াছে। হৃদয়কুমারের বাম হস্তে ভর দিয়া সরম। শরীর বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। হৃদয়কুমার বামহস্তে আলমিষা সরমার কটিদেশ ধারণ করিয়াছেন। সরমার উন্নত কোমল বক হৃদয়কুমারের প্রথম কঠিল বস্মাচ্ছাদিত ঝঙ্ক বাম দিকে ঠেকিয়া কি শোভা সম্পাদন করিতেছে। রাণী এই মূর্তি দেখিয়া এককালে ঝোঁকিত। হইলেন ও তুর তুর ভিন্ন জ্বি আলোকে সেই চিত্রপটটি ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন। “মালতি! এ পটটি বড় মনোহর।”

মালতী বলিল। “মমের ভাব লোকের সকল কৰ্ম্মকে স্পর্শ করে। সরমার প্রেম সরমাকে আচ্ছন্ন করিয়া এই অনির্কচনীর হৃদয় মূর্তি তুলী হইতে নিঃসৃত করিয়াছে। সরমা অস্ত্র কোন পদার্থ ইহার অর্ধেক শোভার সহিত লিখিতে পারিবেন না।”

রাণী বলিলেন। “সত্য বলিয়াছ, কিন্তু চিত্রকরেরা এমন লিখিতে পারে না। ভাল হইল, হৃদয়কুমারকে সরমার সহিত এই পটটি দিব। আর মহারাজ জয়ভারাজের করমান দিবেন। তবেই হৃদয়কুমারের অদ্যকার বীরত্বের বধেট পুরস্কার হইবে।”

একজন দাসী আসিয়া বলিল। “আহার প্রস্তুত হইয়াছে, আজ হইলে মহারাজকে সংবাদ দি।”

রাণী বলিলেন। “অমনি হৃদয়কুমারকে ডাকিতে পাঠাও।”

দাসী আজ। লইয়া চলিয়া গেল। রাণী সরমার স্বর হইতে চিত্রটি লইয়া বাহিরে আসিলেন। সহচরী মহারাজকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া বলিল। “মহারাজ! আহার প্রস্তুত হইয়াছে। রাণী আপনায় প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি হৃদয়কুমারকে ডাকিতে বলিতে চলিলাম।”

রাজা বলিলেন। “হৃদয়কুমার অন্য অস্থানে আছেন, আহ্বান করিবেন না।”

সহচরী রাজার বাক্যে নিবৃত্ত হইল ও মহারাজের পঁচাত্তর হইল। মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রাণী অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন। “মহারাজ! কে হৃদয়কুমার আসিলেন না।”

রাজা বলিলেন । “তোমার সহচরীকে আমি নিবৃত্ত করিলাম, স্বর্গ্যকুমার অস্থূল
আছেন, আহার করিবেন না ।”

রাণী বলিলেন । “তাহার কি হইয়াছে ?”

রাজা বলিলেন । “সে অদ্যকার পরিভ্রমে প্রান্ত হইয়াছে । আপন শিবিরে বিশ্রাম
করিতেছে ।”

রাণী বলিলেন । “মহারাজ ! দেখদেখি এ চিত্রপটে কাহার মুক্তি ?” রাজা
চিত্রপটটি হাতে লইয়া অর্ধন শিহরিলেন । ক্রমে একদৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন,
“এটি কাহার কণ্ঠ ?”

রাণী বলিলেন । “কাহার কণ্ঠ হউক, কেমন শোভিয়াছে বল ।”

রাজা বলিলেন । “এ শিল্পী আপন কণ্ঠে বিশেষ পট, দিব্য ভাবগুরু পট
লিখিয়াছে ।”

রাণী বলিলেন । “এ যুগল মুক্তি দর্শনে তোমার অভিলାষ হয় না ?”

রাজা বলিলেন । “আমি তোমাকে অদ্য এই কথাই জিজ্ঞাসা করিব মনে
করিয়াছি ।”

রাণী বলিলেন । “মহারাজ ! আগে এ পটের কথাটি মার্জ করুন ।”

রাজা বলিলেন । “আমি ঐ পটেরই কথা বলিতেছি শুন । সরমা বিবাহের
উপযুক্ত হইয়াছেন । এক্ষণে তাহার যোগ্য বর অঙ্গুসন্ধান আবশ্যক ।”

রাণী বলিলেন । “মহারাজ ! চিত্রপটটি দেখুন, ইহাশিক্ষা যোগ্য যোগ্য মিলন
আর কোথা সম্ভবে ?”

রাজা বলিলেন । “বর্জমানাধিপের সহিত সরমার বিবাহ হইতে তোমার কি মত ?
বর্জমানাধিপ অল্পবয়স্ক, সঙ্গশক্ত ও মান্য রাজা ।”

রাণী বলিলেন । “মহারাজ ! স্বর্গ্যকুমার কি অঙ্গদংশজাত ?”

রাজা শিহরিয়া বলিলেন । “স্বর্গ্যকুমারও সঙ্গশক্ত বটন, কিন্তু স্বর্গ্যকুমার
ছত্রধারী নহেন ।”

রাণী বলিলেন । “কেন তাহাকেও তাহার পৈতৃক রাজ্য দিতে স্বীকার করিয়াছ ।
এক্ষণে তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত কর ও আপন প্রিয়তমা কন্যা সরমাকে বামে বসাত ।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন । “ওবে দেখিতে পাই তোমার স্বর্গ্যকুমারের প্রতি সম্পূর্ণ
ইচ্ছা ।”

রাণী কিছু লজ্জিত হইয়া বলিলেন । “শুধু আমার কেন সরমারও ঐ চিত্রপটই
তাহার প্রমাণ ।”

রাজা বলিলেন । “ওবে এ পটটি কি সরমার লেখা ?

রানী বলিলেন । “হাঁ, সরমা নিৰ্জনে বসিয়া স্বকমনায় এ চিত্রটি লিখিয়াছেন ।”

মহারাজ বলিলেন । “তবে তাহাই হউক ।”

রানী বলিলেন । “কাল উত্তরকে সুখে রাখুন ।”

মালতী স্বস্তি বলিয়া হলু দিল পার্শ্ব সহচরীঃ হলু প্রতিধ্বনি করিল । ঘোড়া মহিলাগণ শব্দ বাজাইল । রাজবাটী মঙ্গল শব্দে ফুলিয়া উঠিল । লোকপদস্রাব শব্দ ও সমাচার ছাউনিতে গেল ; ক্রমে পরেই ছাউনিতে ‘জয়কানৌ’ শব্দে কুমুল হইল । নহোবত বাজিল । বিজয়কুম্ব অকাল-নহোবত ও শব্দধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন যে, অন্তঃপুরে মহারাজের মতের সহিত রানীর মত একা হইয়াছে, সরমা ও সূর্য্যকুমারের মিলন ধাৰ্য্য হইল ।

স্বস্তিবাচনানি শব্দ ধামিলে রানী মালতীকে বলিলেন । “মালতি ! দেখ, সূর্য্যকুমার কিরূপ আছেন, যদ্যপি একান্ত অসুস্থ না থাকেন তবে বলিবে যেন যুদ্ধবেশে অন্তঃপুরে একগেই আইসেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে । মালিকরাজকেও সঙ্গে আসিতে বলিবে । আর মহারাজের সেনানী কুম্বনাথ রণবীর-বাহাদুরকে আমার আশীৰ্ব্বাদ দিবে । আর বলিবে ব্যাঘ্রটি ও একটি প্রকাণ্ড ধ্বজা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের ভিতর পাঠাইয়া দেন, বিন্দু করিতে নিষেধ করিবে । বিজয়কুম্ব ও অস্ত্রাস্ত্র প্রধাম প্রধাম অমাত্যগণ স্ব স্ব সভ্য বেশে অন্তঃপুরে একগেই আইসে ।”

মালতী রানীর আজ্ঞা লইয়া দ্রুতপদে চলিল ।

রানী অপর এক সহচরীকে ডাকিয়া বলিলেন । “দেখ, সরমাকে উত্তম বেশভূষা করিতে বল ও মালতী প্রত্যাগমন করিলে তাহাকেও ভাল করিয়া বেশভূষা করিতে কহিবে । অন্তঃপুরের দাসীদলকে বল, অন্য প্রাঙ্গণে উৎসব হইবে, ভাল করিয়া সাজায় ও আলোক দের । সূর্য্যকুমারকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে বল ।”

ধিচুক্ৰম মধ্যেই মালতী সিঁড়িয়া আইলে, রানী ভিজাসা ব’হুতেন, “ভূমিঃ ত্বম্ নীত্ৰা যে কিয়লো ।” মালতী বলিল । “সূর্য্যকুমারের শিবিরে প্রথমে গিয়া দেখিলাম যে, সূর্য্যকুমার শিবিরে নাই । তাঁহার দাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে বলিল, ‘সূর্য্যকুমার ও মালিক-রাজ উভয়ে যুদ্ধবেশে অবারোহণ করিয়া কোথায় গেলেন, বলিয়া গেলেন যে, আমরা বোধ করি অন্য আসিতে পারিব না । কল্য সাধংবাল অবধি আমাদের অপেক্ষা করিবা । না আস ত চিন্তিত হইও না । পদ্য দিবস তবশ্চ অবশ্য আসিব ।’ অতএব আপনার আজ্ঞা না পাইয়া কুম্বনাথ ও বিজয়কুমার নিকট বাইতে পারি না ।”

রানী বলিলেন । “ভাল করিয়াছ । সূর্য্যকুমার অন্তঃপুরে কাহারও প্রয়োজন নাই । তবে তুমি সহচরী ও সপকারকে আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়া আমার নিকট অতি নীত্ৰা আইস ।”

মাগতী চলিয়া গেলে রাণী সরমার ঘরে গিয়া বলিলেন। “ওমা! সরমা! তুমি কি জান, স্বর্ধকুমার কোথায় গিয়াছেন?”

সরমা বলিলেন। “না, তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। তিনি কি আপনি শিবিরে নাই?”

রাণী বলিলেন। “না, মাগতী শিবিরে হইতে এই আনিয়া।”

সরমা বলিলেন। “তাহার স্থবরনবা মালিকরাজ কোথায়? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে জানিতে পারিবে। স্বর্ধকুমার মালিকরাজকে না বলিয়া কেন কর্তব্য করেন না।”

রাণী বলিলেন। “সে মালিক-ঘোড় কখন পরস্পরের কৃবে থাকে না। স্বর্ধকুমার ও মালিকরাজ উভয়েই অন্য সময়কালের পর যুদ্ধবেশে অগ্ন্যোহী হইয়া কোথায় গিয়াছে, কেহই জানে না। তাহার সূত্রে বলিয়াছে যে, পরঃ অবশ্য অবশ্য আসিবে। এ কি বিপদ! দেখ কোথায় হইলেন পেল। কোথায় বা যুদ্ধ উপস্থিত। আর এমন কি সহসা বিপদ হইল যে, তাহার মহারাজকে না বলিয়া চলিয়া গেল।”

সরমা বলিলেন। “মহারাজ কি জানেন না?”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ এখন বাটার ভিতর আহ্বারের অস্ত্র আসিয়াছিলেন, তখন বলিলেন ‘স্বর্ধকুমার অস্থির আছেন, আহ্বার করিবেন না।’ হাঁ মা তুমি আজ রাজার আহ্বারের সময় কেন বাণ্ড নাই? রাজা কত জিজ্ঞাসা করেন। খেদ করে বলেন, সরমা কি আমাদিগের ত্যাগ করিতে না করিতে তুলিল।”

সরমা অমনি ফুলকাখুঁই হইয়া রাণীর পল্লদেশে বাহু দিয়া বেরিলেন ও রাণীর মুখের দিকে ঝড় তুলিয়া বলিলেন। “মা ওমা।” সরমা ওঠবার ঐক্য উলটিয়া পড়িল, চক্ষুধর জলে পূর্ণ হইল। আধ হুং, আধ অভিমানে মাতার নরনে নরন মলাইলেন। রাণী অমনি করতলধরে সরমার মুখপদ্ম ধরিয়। সরমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন ও তাহার নিকলক ললাটে চুম্বিলেন। সরমার বাক্যবহিত কৃষ্টিতে পাষণ জব হয়, তা মায়ের মন। একেবারে গলিয়া গেল। রাণী আর থাকিতে না পারিয়া অশ্রু পাত করিলেন। এই-রূপ জনকাল স্নেহপাশে উভয়েই বদ্ধ হইয়া রহিলেন। ক্রমে সরমাকে অলসাকী দেখিয়া রাণী ক্রমে খাটের দিকে গিয়া বলিলেন। সরমা মাতার বক্ষস্থলে মস্তক দিয়া থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বালিকা সরমা মাতার বক্ষে স্তম্ভ হইয়া পড়িলেন। রাণী কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অতি অল্পে অল্পে স্তম্ভপণে সরমার মস্তক হইতে আপনি সরিয়া তাহার মস্তকে বালিস দিলেন ও ময়ূরপুঙ্খের পাখা দিয়া অল্পে অল্পে সকালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সরমা গাঢ় নিদ্রাভিত্ত হইলে রাণীও খাটের এক পার্শ্বে শুইলেন। দাসীরা বাতাস করিতে লাগিল। জনকালের পরে সরমা নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ হু শিয়া কাদিয়া উঠিলেন।

রাণী চমকিয়া সরমার বক্ষস্থলে করতল চাপিয়া দিয়া বলিলেন । “কি মা, ভয় কি ? সরমে ! এই যে আমি আছি ।” সরমা আবার নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । যন যন স্ননিশ্বাস বহিতে লাগিল । রাণী সরমাকে নিদ্রিত দেখিয়া আবার শয়ন করিলেন । মালতী সরমার আলুলায়িত কেশপাশে হস্ত দিয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল । কতক্ষণে বোধ হইল যেন সরমার স্তব্ধনিদ্রা হইতেছে । এই রূপে প্রায় এক গ্রহর কাল অতীত হইলে রাণীও চিন্তাশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন । মালতী আস্তে আস্তে স্বর হইতে বাহিরে গিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল । মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিয়া রাজচিকিৎসক হরিশ্চন্দ্র স্বায়কে লইয়া অস্তঃপুরে গেলেন । দেখেন সরমা আলুলায়িতকেশে আপনার পর্ষ্যকে শয়ান আছেন, তাঁহার পার্শ্বে রাণী সরমার বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া নিদ্রিতা । দাসীরা চামর ব্যজন করিতেছে । রাজা অতি মন্দপদবিক্ষেপে সতর্ক পর্ষ্যকের নিকট গেলেন । সহচরী একটি ওড়না লইয়া সরমার গাত্রে ঢাকা দিল । পরে চিকিৎসক গভীর হইয়া পর্ষ্যকের পার্শ্বে দাঁড়াইল । কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সরমার মুখে রোগের লক্ষণ সকল দেখিতে লাগিল ; কিন্তু মনে মনে মুখশ্রী প্রশংসা করিতে ভুলিল না । অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া হস্ত ধরিয়া নাড়া দেখিল । সরমা হস্ত ধারণে জাগ্রত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন ও আপনার অঞ্চল লইয়া মুখে আবরণ দিলেন ।

কবিরাজ প্রায় এক দণ্ডের পর বলিল । “নাড়ীর অত্যন্ত বেগ । কিন্তু সেটি জ্বরর বেগ নহে ; বোধ হয় মনে কোন চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে অমাদিগের এস্থলে থাকা উচিত নহে । গাত্রে বস্ত্র খুলিয়া ইহাকে বায়ু সেবন করান বিধেয় । অলক্ষণেই স্ননিদ্রা হইবে । বোধ করি নিদ্রা হইলেই আরোগ্য হইবেন ।”

রাণী এই কথাগুলি শুনিয়া জাগ্রত হইলেন ও উঠিয়া বসিলেন । কবিরাজ ও বিজয়কৃষ্ণ গৃহের বাহিরে গেলেন ।

রাণী মহারাজের নিকট যাইয়া বলিলেন । “স্বর্গকুমার কোথায় ? মালতী তাহার শিবিরে গিয়াছিল ; দেখা পায় নাই ; শুনিল যে মালিকরাজ ও স্বর্গকুমার উভয়ে বন্ধাত্ত হইয়া কোথা গেছেন । তোমার কি রাজ্যের কোন অংশে উপদ্রব সত্তাবনা আছে ?”

রাজা বলিলেন । “আমিও মালতীর প্রমুখ্যে শুনিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না । দেখি বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করি । তুমি সরমাকে বাতাস করিতে বল ।”

রাজা সত্যর আসিয়া চিকিৎসককে বিদায় দিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন । বিজয়কৃষ্ণ, শুমিচাঁদ, তোমার পুত্র ও স্বর্গকুমার কোথায় গিয়াছে ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন । “না, আমি তাহা জানি না । তাহারা ত এই আপনার নিকট বিদায় লইয়া বিভ্রাম করিতে গেল । ইহার মধ্যে আবার কি হাজামা উপস্থিত । ওহুটির

যত খেজুরারী বালক আর আমি কুম্ভাশি দেখি নাই। কি মনের ভাব হইল, তাহারাই জানে। সূর্য্যকুম্ভারের স্বভাবই ঐ মত ; দেখিতে অতি শিষ্ট ও ধীরস্বভাব। কলে অন্য বিষয়ে সন্ধানী ধীর। কোন কথ্যেই আগ্রহ নাই। আবার মন এমন অস্থির যে, অল্পেই অগ্নিয়া উঠে আবার অল্পেই নিব্বিয়া যায়।”

রাজা বলিলেন। “হাঁ পুত্রবার তাহাকে রায়গড়ে যাইতে কত বলিলাম, কোন মতেই স্বীকার পাইল না। আবার সহসা আপনি গেল। আমার বোধ হয় সে অন্যত্র সেইখানে গিয়াছে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “সূর্য্যকুম্ভার যদি সেখানে গিয়া থাকে তবে ভাল হয় নাই। সে গঙ্গালিসকে লক্ষ্য জানিলে আপনার কথ্যে ব্যাঘাত ঘনাইবে। কোন ক্রমে তাহাকে সাহায্য দিবে না, বরং বাহাতে গঙ্গালিস নিষ্কল হয় তাহার চেষ্টা পাইবে।”

রাজা বলিলেন। “তাঁহা জানিবার তাহার কোন উপায় নাই।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মালিকরাজ কোন বিষয়ে অজ্ঞাত নাই। মালিকরাজ অবশ্যই বলিবে। কি বিপদ হইল! মহারাজ আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, রায়গড়ের ব্যাপারে হতক্ষেপ করায় আপনার লাভ নাই। আপনি তাহা ভুলিলেন না, আমার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।”

রাজা বলিলেন। “আমার কি বালককে স্তম্ভ করিয়া চলিতে হইবে? একি পাপ! সে বালককর হইতে কি বাটতে পারে। তাহাদিগকে ত আবার আমার নিকটে আসিতে হইবে। তাহাদিগের কি মনে ভয় নাই?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, সে বালক ভয়ে লব্ধ হয় না। যত বিপদ উপস্থিত হয় সে ততই আনন্দিত হয়।”

রাজা বলিলেন। “এক্ষণে তাবিলে আর কি হইবে, কাল প্রাতে উপায় দেখা যাইবে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, বোধ করি তাহার কল্য প্রাতে আসিবে। এক্ষণে বিদায় হই।”

রাজা বলিলেন। “আচ্ছা।”

বিজয়কৃষ্ণ রাজগৃহ হইতে যেমন বহির্গত হইলেন, অমনি দেখেম, ঘারে একজন আবারোহী আসিয়া পৌঁছিল। তাহার অশ্বটি বশ্যে স্নাত হইয়াছে। অতি বন বন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে ও নিশ্বাস প্রবাহের ধমকে তাহার সমস্ত শরীর হুলিড়েছে। আবারোহী পুরুষটি অতি কষ্টে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তাহারও শরীর বশ্ম-প্রাণিত ও জ্বাত হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়া শির নোয়াইল। আপনার অঙ্গ-প্রাণের ভিতর হইতে একখানি পত্র লইয়া বিজয়কৃষ্ণের হস্তে দিল ও বলিল। “মহা-শয়, অনেক সমাচার আছে, কিছু বাস পাইয়া বলিতেছি।”

বিজয়কৃষ্ণ তাকে বিজ্ঞাপ্য করিতে বলিলে সে বসিয়া জলপান করিল। পরে তামাক খাইয়া বলিল, “মহারাজ! শুনুন।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “চল রাজসম্মুখে বলিবে।” পত্রবাহক বিজয়কৃষ্ণের অনুমত্য-নুসারে বিজয়কৃষ্ণের পশ্চাতে রাজসভায় চলিল। রাজা সভাভ্যাগ করিয়া অভ্যন্তরে ঘাইতেছিলেন, বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়া কিরিয়া সভায় বসিয়া বলিলেন, “বিজয়কৃষ্ণ! আবার কি, সকল কুশল ত?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনার যশ দিন দিন বৃদ্ধি হউক। বর্ধমান হইতে আমাদিগের পত্রবাহক পত্র আনিয়াছে, মৌখিক সমাচারও আনিয়াছে, আজ হয় ত শুনাই।”

রাজা বলিলেন। “পত্র অবগত হইয়া আমার মন্থ বল।”

বিজয়কৃষ্ণ পত্রটির আন্যোপান্ত পড়িল, পড়িয়া ক্রমেক মৌন হইয়া রহিল। আবার পত্রটি আনৌ আরম্ভ করিয়া বহুপূর্বক সমস্ত পড়িল, পড়িয়া কিছু বিষম হইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! কি সমাচার, কাহার পত্র?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! পত্রটি মেহের-উলমিসার জ্বানি, বিজ্ঞ কোন মুন্সীর হস্তালিপি। নীচে মুরাজহানের পর মেহের-উলমিসার স্বাক্ষর দেখিতেছি।”

রাজা বলিলেন। “কেমন, সের-আফগানের কি সমাচার?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! সেরআফগান আর নাই। কুতবউদ্দিন-কোকল-ডাসও পরলোক গিয়াছে।”

রাজা বলিলেন “সে কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল “মহারাজ! মেহের-উলমিসা লিখিতেছেন যে, তাঁহার পূর্ব-স্বামী সের-আফগানের কাল হওয়াতে দিল্লীধরই তাঁহার স্বাভাবিক স্বামী হইয়াছেন; অন্তঃকরণ দিল্লীধরের বিপক্ষে কোন মজনা তিনি আপনার সঙ্গে করিতে ইচ্ছা করেন না।

রাজা বলিলেন। “ইহার অর্থ কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! ইহার অর্থ, আপনি যে রাজবিজ্ঞোহ পরাজয় করিয়া সের-আফগানকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সের-আফগানের মৃত্যুর পর বর্ধমানে উপস্থিত হয়। তৎকালে বর্ধমানে মেহের-উলমিসা না থাকিলে, তথাকার লোকে সে পত্র দিল্লীতে পাঠায়। দিল্লীতে মেহের-উলমিসা বর্ধমান বাদসাহ জিহাজির সাহের প্রধান বেগম মুরজিহান হইলেন। তাঁহার নিকট আপনার পত্র পৌঁছিলে তিনি এই বই আর কি উত্তর দিবেন।”

রাজা বলিলেন। “কি সর্বনাশ! তবে আমার পত্র দিল্লীধরের চক্ষে পড়িয়াছিল।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “নিঃসন্দেহ জিহাজির সাহ আপনার পত্র পাঠ করিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন। “এই জন্তই আমার উত্তরের এত বিলম্ব হইল। ভাল, সের-আফগান ও কুতুবুদ্দিন-কোকলভান কিরূপে পক্ষত্ব পাইল?”

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ, সেখানে শুনিলাম যে, এক দিন সামান্ত হাফাতে উত্তরেরই কাল হইয়াছে।”

রাজা বলিল। “ভাল, এক্ষণে বর্জমানের আর কি সমাচার আছে?”

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ, আমার ভাগ্যমন্দের ছয়দিন পূর্বে মহারাজ মানসিংহ সৈন্য বর্জমানে আদিয়া পৌঁছিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে অনেক লস্কর। শুনিতেছি, তিনি আপনি পূর্বরাজ্যের কোন রাজাকে বন্ধ করিয়া লইতে আসিয়াছেন। সে রাজা বন্ধ হইলে, তথা হইতে উড়িষ্যার আফগানদিগকে দমন করিয়া, দক্ষিণ রাজ্যের ফিরঙ্গি নির্মূল করিবেন; অবশেষে একবার আরাধাও বাইবেন।”

রাজা বলিলেন। “ভাল তাঁহার লস্কর কত, তাহার কিছু তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিয়াছে?”

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ! তাঁহার লস্করের শেষ নাই। আমি যে বয়েক দিন তথায় ছিলাম, সে বয়েক দি ই তাঁহার লস্করের আন্দানি হইতেছিল। আমার আগমনের পরও শুনিলাম, আরও লস্কর আসিবে। এক্ষণে স্থির নাই, মহারাজ মানসিংহ কোথায় অগ্রে যান ও কোন্ দিকেই বা স্বয়ং বাইবেন। শুনিতেছি, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ এক দিকে ও তাঁহার কচুরায় নামক এক জন সেনানী অপর দিকে বাইবেন। সকলেই বোধ করিতেছে, তিনি স্বয়ং উড়িষ্যায় বাইবেন।”

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এ কচুরায় কি আমাদের কচুরায়?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “বলিতে পারি না। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বসন্ত-রায়-পুত্র কচুরায় যদি হন, তবে বোধ করি তিনিই পূর্বে রাজ্য আসিবেন।”

রাজা বলিলেন। “তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই রাজ্য করিব, আমাদের সহিত সন্মুখযুদ্ধ দিতে সে বালকের সাহস হইবে না।”

বিজয়কৃষ্ণ পত্রবাহককে বলিল। “ভাল তুমি কি কচুরায়কে দেখিয়াছ।”

পত্রবাহক বলিল। “না, যে বয়েক দিন আমি বর্জমানে ছিলাম, তাহার মধ্যে কচুরায়কে একদিনও দেখি নাই। আমি প্রত্যহই অপরাহ্নে হৃৎ বিজয়রাজ্যে মহারাজ মানসিংহের ছাউনিতে বাইতাম, কিন্তু একদিনও কচুরায়, মানসিংহ, কি অপর কোন কর্তৃপক্ষকে দেখি নাই! শুনিলাম, কচুরায় অর্হানিশি রাজা মানসিংহের সঙ্গেই থাকেন। তাঁহারই পরামর্শে রাজা মানসিংহ সকল কর্ম করেন।”

রাজা বলিলেন। “তুমি কি কাহার মধ্যে শোন নাই যে, কচুরায় কোন্ দেশীয় লোক?”

পদ্মবাহক বলিল। “মহারাজ তাহাও তত্ত্বাবধারণ করিতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু কেহই তাহার বিষয় কিছু বলিতে পারে না। সকলেই বলে, কচুরায় মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণ হস্ত। মহারাজ মানসিংহ কচুরায়কে জগৎসিংহের অপেক্ষা অধিক শত্রু করেন, এমন কি কচুরায়ের সয়ল ধীর স্বভাবে তাহাকে মাত্রও করেন। সকলে বলে, কচুরায় রাজপুতনার কোন উচ্চবংশীয় রাজপুত্র, কোন দেশের রাজা হইবেন।”

রাজা বলিলেন। “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর; বলায় প্রাতে আমার সভায় উপস্থিত থাকিও। তুমি কি উড়িষ্যার কোন সমাচার পাইয়াছ?”

পদ্মবাহক বলিল। “মহারাজ, আমি উড়িষ্যার কোন সমাচার জানি না। কেবল এই লম্বুরপুরে শুনিয়া আসিলাম যে, পথের মধ্যে উড়িষ্যা হইতে আগত এক অবা-রোহীকে দস্যুরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। পাশ্চ একজন ভাণ্ডা দেখিয়া কাঁড়িতে সমাচার দিল, কিন্তু তাহার অগ্রাহ্য করিল।”

রাজা বলিলেন। “তুমি শুনিবে না যে, সে লোকটি কে, কাহার সমাচার লইয়া লোথায় যাইতেছে?”

পদ্মবাহক বলিল। “মহারাজ, আমি ভাণ্ডা শুনি নাই।”

রাজা বলিলেন। “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর।”

পদ্মবাহক শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এ সমাচার ত অত্যন্ত বিপদসূচক হইল।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এ ত স্বয়ং আপন স্বক্ষে আনিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন। “আমি কিসে স্বয়ং আনিলাম? সের-আকগানের বিপক্ষে জিহাঙ্গির বৈরুপ বন্ধে ছিলেন, তাহাতে কেন ভদ্র রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া পদ্বিদগ্ধকেন্দ্র হস্ত থাকিতে পারে?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! দিল্লীশ্বর ত আপনার অধীন রাজা নন যে, আপনি তাঁহার রীতি নীতির বৈধাৰ্ঘ্য বিচার করিবেন ও কষ্টের মত ফল দিবেন।”

রাজা বলিলেন। “কেন, রাজমণ্ডলীর নিয়মই এই। একের দোষপ্রত্যক্ষ অপরের দৃষ্টি থাকিলে, কেহ কাহার রাজ্যে অস্ত্রাভ্যুত্থান করিতে পারেন না।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, গোষ্ঠাকি মাপ করিবেন। আপনি রায়গড়ের যে ব্যাপারটি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দিল্লীশ্বর শুনিবে, কি করিবেন বোধ হয়?”

রাজা বলিলেন। “আমি ও একের পরিলীতা স্ত্রীর উপর দৃষ্টি করি নাই। আর তাহার স্বামীস্বত্বা পৃথক লক্ষ্য করি নাই। অবিবাহিতা ইন্দুমতী লাভে সকলেই

সমান অধিকার আছে। জিহাদির বাহসাহ একশকার নুরজিহান লাভেচ্ছায় কি কি কুকর্ম না করিয়াছেন? সের-আফগানকে হস্তিপদে পাঠাইয়াছেন। একাকী নিরস্ত্র করিয়া বিকট ব্যাঘ্রের সম্মুখে পাঠাইয়াছেন। আবার নির্জনে স্তম্ভ সের-আফগানকে নষ্ট করিবার অস্ত্র ছয় জন অস্ত্রধরী লোককে তাহার গৃহে পাঠাইয়াছেন। দৈববলে দলহু হৃদয়ের শব্দে সের-আফগান জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে আপনার বলে ও বীর্যে নষ্ট করিয়া আপনার গ্রাণ রক্ষা করিয়াছে। আমিও এ সব করি নাই। বাহা হউক এক্ষণে সমুহ বিপদ উপস্থিত।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, আমার পরামর্শ শুদ্য রাত্রিতেই কৃকনাথকে ডাকাইয়া বর্ধমান অঞ্চল হইতে যমুনা পর্যন্ত স্থানে স্থানে প্রহরী রাখা কর্তব্য ও বর্ধমানে চারি পাঁচ জনা চরও পঠান উচিত। মানসিংহের চলন সব লক্ষ্য করিলেই আমরা সতর্ক হইতে পারিব।”

রাজা বলিলেন। “ভাল বলিয়াছ। আর যশোরে সমাচার পাঠাও যে, বড় সৈন্ত থাকি আছে, তাহা সব এই স্থানে অতিশীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “যশোর এককালে সেনাপলহীন করা বড় বুদ্ধিবিহিত হইতেছে না। কি জন্যি, বদ্যপি অস্ত্র কোন দিক্ হইতে শত্রু আইসে। দিল্লীখরের অধিকার সর্বত্রই আছে। তাহার সৈন্ত সব স্থানেই আছে অল্পমতি ও সুযোগ পাইলেই যশোর আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যাহারা যশোরে আছে তাহাদিগের সেই স্থানেই থাকা উচিত। বরং এ স্থান হইতে যশোর রক্ষার্থে মালিকরাজকে পাঠান যাপ।”

রাজা বলিলেন। “তবে তাই হউক; কিন্তু বীর্যমন্ত এবাই যশোর রক্ষায় দক্ষ, সে তাহার মৃত পিতা কালীসেনানী তুলা যুদ্ধকোশলে পারগ। উড়িষ্যার সমাচার না পাইলে আমার করবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আমার বোধ হয় উড়িষ্যার পাঠানরা আপনার দলভুক্ত থাকিবে। কিন্তু তাহাদিগের হইতে আপনার কি উপকার সম্ভাবনা?”

রাজা বলিলেন। “কেস তাহারা বদ্যপি এক্ষণে মানসিংহের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া অগ্রসর হয় তাহা হইলে আমিও সাহস করিয়া মানসিংহের সেনার পশ্চাভাগে আক্রমণ করিতে পারি। মানসিংহ দুইদিক্ হইতে আক্রান্ত হইলে আমাদিগের বেগ কোন ক্রমে সফল করিতে পারিবে না। তাহা হইলেই আমরা জয়ী হইব।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! ঢাকার বে দিল্লীখরের সৈন্ত আছে তাহার উপায় কি করিলেন? মানসিংহ কিছু তাহাদিগের জুগিয়া যান নাই। তিনি অবশ্য তাহা-
দিককে কোল আদেশ দিয়া থাকিবেন। পত্রবাহকপ্রমুখাং বাহা শুনিলাম ও মেহের-

উল্লসিসার পত্র লিখিবার ভাবে যাহা দেখিলাম, তাহার সমুহ বিপদ বুঝিতে হইবে ।
মানসিংহ আপনাকে “কহার না নাড়া দিয়া ক্ষান্ত হইবেন না ।”

রাজা বলিলেন । “বর্দ্ধমানরাজ কি করিবেন ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “আপনি যেমত শোবেন ! বর্দ্ধমানরাজ স্পষ্ট আপনার দলভুক্ত হইতে পারিবেন না । তিনি চতুর ; মনে মনে যদিচ দিল্লীরের বিপক্ষ হইতে ইচ্ছা আছে তথাপি স্পষ্ট তাঁহার বিপক্ষে অত্যাচার করিতে সাহস করেন না । তিনি বোধ করি গোপনে মানসিংহের নিকট লোক পাঠাইয়া থাকিবেন ।”

রাজা বলিলেন । “যাহা হউক, আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে । কখনাথকে ডাকিতে বল ।”

বিজয়কৃষ্ণ উপস্থিত প্রহরীকে কখনাথ রণবীর-বাহাহরকে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন ।

রাজা বলিলেন । “এক্ষণে সূর্য্যকুমার থাকিলে অনেক কন্ম দেখিত ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “তাঁহা হইতে আপনার কি উপকার হইত ?”

রাজা বলিলেন । “কেন যুদ্ধকালে সে এক দিক্ ও হজুরমল অপর পার্শ্ব রক্ষা করিত । সে যুদ্ধকৌশলে প্রায় কখনাথের মত নিপুণ, বরং কোন কোন স্থানে অধিক বুদ্ধিভাবীর মত কন্ম করে ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “আপনার হজুরমল বোধ করি কল্যাণপ্রভাবে আঁরা উপস্থিত হইবে ।”

রাজা বলিলেন । “তাঁহাকে ও এইরূপ বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু সূর্য্যকুমার ও মালিক-রাণের অশ্রু আমার চিত্তা হইতেছে ।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “মহারাজ, তাঁহারা আসিবার হয় পরশ দিবস আসিবে । কিন্তু এই সময় গঞ্জালিসের কিছু ফৌজ আনিলে, অনেক উপকার দশিতে পারে । ফিরকীরা যুদ্ধকৌশলে অত্যন্ত দক্ষ, তাঁহাদিগের অধিক পুরস্কারের লোভ দেখাইতে হইবে ।”

রাজা বলিলেন । “শুদ্ধ পুরস্কার কেন তাঁহারা আমার দলভুক্ত হইলে তাঁহাদিগের স্বার্থলাভও হইবে । উভয় সৈন্য একত্র হইয়া সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিব । দিল্লীর আমার ও গঞ্জালিসের সমান বৈরা ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল । “তাঁহা সত্য বটে, তথাপি গঞ্জালিসের লোক সব দল্লী ; তাঁহাদিগের সাধারণের স্বার্থাপেক্ষা, তাঁহারা স্ব স্ব লাভ কিছু ভাল বোধে । মহারাজ, কু-লোকের প্রেম ক্ষণস্থায়ী, ধনের ডোর চিরস্থায়ী নহে, কেবল ধর্ম্মই লোককে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পারে ।”

রাজা বলিলেন । “তাঁহাদিগকে ধন দিয়া আপন কোষ এক্ষণে শূন্য করাওত যুক্তি-বিহিত হইতেছে না ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, এক উপায় আছে। রায়গড়ের ভাণ্ডারে অনেক ধন আছে। সে ধন বঙ্গাধিপ আপনার প্রাপ্য বটে কিন্তু এক্ষণে আপনার নহে; তাহা হইতে কিয়দংশ গঙ্গালিসের লোকদিগকে দিতে স্বীকার করিলে, তাহারা প্রাণপণে আপনার কর্ণে নিযুক্ত হইবে।”

রাজা বলিলেন। “সে ধন আমার দিতে মায়া হইতেছে বটে, কিন্তু সে বৃথা মায়া। তাহাই ফিরিঙ্গি-সৈন্তে বিতরণ করিব।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “কৃষ্ণনাথ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে কি কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন?”

রাজা বলিলেন। “কৃষ্ণনাথ! আমার জ্ঞান হইতেছে, দিল্লীখবর আমার চতুর্দিক্ ঘিরিয়াছে। বর্দ্ধমানে মানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুলিলাম, তাঁহার পূর্বরাজ্য শাসন করা উদ্দেশ্য। ঢাকাতে দিল্লীখবরের যথেষ্ট লঙ্ঘন আছে, অনুমতি পাইলেই তাহারা যশোর আক্রমণ করিবে। এক্ষণে আমি মনন করিয়াছি যে বর্দ্ধমান হইতে এ মোকাম পর্যন্ত, স্থানে স্থানে প্রহরী বসাই। তাহারা বঙ্গ-মানসিংহের গতি লক্ষ্য করিবে ও সর্ব্বদা আমাকে সমাচার দিবে। জি বর্দ্ধমানেও চার পাঁচ জন চর পাঠাইয়া দেও। যশোরে হজুরমল বা মাসিকরাজকে বাইতে বল। তুমি আপন সৈন্তে ইতিমধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ কর। এ বড় আশঙ্কা যুদ্ধ নহে। দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। ভাণ্ডারে রসত কত আছে তাহা ওস্ত লও। যথেষ্ট না থাকে, সরকারে সমাচার দিলে, রাজপুরুষেরা সংগ্রহ করিবে। গঙ্গালিসের ফিরিঙ্গি-সৈন্তের সাহায্য আশা করিতেছ। তাহারা উপস্থিত হইলে কোন ফৌজভুক্ত হইবে, তাহা বলিয়া দিব। ইতিমধ্যে যাপি উড়িয়া হইতে সমাচার আইসে, তবে আমরা দুরায় পশ্চিম অঞ্চলে রওয়ানা হইব ও মানসিংহের পশ্চাত্তাগ আক্রমণ করিব।”

জিহ্নকৃষ্ণ বলিল। “লঙ্ঘনপুরে একজন চর পাঠাইয়া বর্দ্ধমানাধিপের মানস বোঝা উচিত বোধ হইতেছে।”

কৃষ্ণনাথ বলিল। “আমারও সেই মত অতএব মহারাজার অনুমতি পাইলেই সে বর্ষেও লোক নিযুক্ত করি।”

রাজা বলিলেন। “আমার তাহাতে অমত নাই।”

কৃষ্ণনাথ বলিল। “মহারাজ, রায়গড় হইতে কিছু রত্ন আনাহিলে ভাল হয়।”

রাজা বলিলেন। “তাহাও আমি মনন করিয়াছি, কিন্তু হজুরমল না আসিলে সে কর্ণে মভামত স্থির করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহা যাহা বলিলাম, তাহার নিযুক্ত হও।”

কৃষ্ণনাথ বলিল। “মহারাজ আমি অন্যই স্থানে স্থানে উপযুক্ত লোক রাখিব।
কল্যাণেতে ভাণ্ডারে তত্ত্ব লইব।”

মহারাজ সমস্ত দিবসের ব্যাপারে শ্রান্ত হইয়াছিলেন, বলিলেন। “তবে এক্ষণে তোমরা উভয়েই বিদায় হও, আমি একটু বিশ্রাম করি। কল্যাণেতে আবার পরামর্শ হইবে।”

বিজয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাথ উভয়ে বিদায় হইলে মহারাজ একাকী আপন পর্ষাকে শয়ন করিলেন। শয়নে ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল। ক্রমে উপস্থিত বিষয় একে একে মন হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে মন প্রায় নিশ্চিন্ত হইল। মহারাজের নৈত্র ক্রমে মুদিত হইতে লাগিল। মহারাজ তখন নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। অচেতন হন, এমন সময় বৈতালিকেরা শেষ গান ধরিল। দূরস্থ নহোবতে বংশী বাজিতে লাগিল। নহোবতে ও বৈতালিকে একতান হইল। দূরস্থ লোকেরা বুঝিতে পারিল না যে, যন্ত্রে কি স্বরে, শব্দ হইতেছে। মহারাজের কর্ণকুহরে প্রাণী শব্দ বেশ দিব্যস্বরে স্পর্শ করিতে লাগিল। নির্জন নিশীথে সুমিষ্ট দূরতেনী তানলয়-যিশুদ্ধ ভাবপূর্ণবিরহগান মহারাজকে মোহিত করিল। মহারাজ রাজকর্ষ বিস্মৃত হইলেন। উপস্থিত বিপদমালা তাঁহার মন হইতে অপসৃত হইল। আপনার প্রেমোদয় হইল। ইন্দুমতীর মুখচন্দ্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল। এককালে অধীর হইলেন। কতক্ষণ তাহাই চিন্তা করিলেন। দেখে রায়গড়ে কি ব্যাপার হইতেছে তাহাও মনে মনে কল্পনা করিলেন। কিন্তু এক দণ্ডের ভরে ইন্দুমতীর মনের ভাব ভাবিলেন না। কেবল আপনি কৃতকার্য হইবেন, ইন্দুমতী লাভ করিবেন, কল্যাণেতেই ইন্দুমতী তাঁহার হইবে, তাঁহার মহিলাগণ মধ্যে গণ্য হইবে, তাহাকে লইয়া মহারাজ দিব্যাত্রি আমোদে রত থাকিবেন, এই সকল সামান্য ইন্দ্রিয়সুখস্বপ্নে রাত্রি কাটাইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

“জগন্নিঃ শোকাগ্নিন চ মহতি সন্তাপয়তি চ।”

যে দিবস যমুনা পল্লইয়ে এই ব্যাপার সমস্ত উপস্থিত হয়, সেই দিন প্রত্যয়ে, সনদীপে পূর্ণাঙ্গিক রক্তিমাবর্ণ হইয়াছে। পক্ষিগুলি কেহ আপন বাসা ছাড়িয়া নিকটস্থ উচ্চ শাখায় বসিয়া, কেহ বা বাসায় থাকিয়াই, চকু খুঁট-দ্বারা পক্ষগুলি আঁচ-ডাইতেছে ও স্ব স্ব স্থানে পরিপাটি করিয়া বসাইতেছে, কখন বা পক্ষের ভিতর মাথাটি দিয়া নীচের পালকগুলি পরিষ্কার করিতেছে ও হয়ত একটি অসামান্যপক্ষীটিকে চকুরয়ে ধরিয়া জমনি উল্লসিত করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার দূরস্থ পক্ষীর স্তম্ভুর ডকে উত্তর দিতেছে ও প্রতিক্ষেপে চতুর্দিকে সত্যম্ব নখনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ঈষৎ দক্ষিণ বায়ু সন্ধারে পত্রাগ্রস্থ আলম্বিত মৃত্তার মত জলবিন্দুগুলি পড়িতেছে। দূরস্থ তরু গুল্মাদির অস্পষ্ট অবয়ব সূক্ষ্ম বাষ্পরাশিতে আরও জড়ীভূত করিয়াছে। কোপের ভিতর হইতে একটি গুংকোবিল, বারুই বৃহৎ দিয়া, কর ফর করিয়া উড়িয়া উচ্চ শাখা আশ্রয় করিল। বোধ হয় কোন হতভাগ্য নিদ্রাহীন পুরুষ অসময়ে সে দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সনদীপ বঙ্গোপসাগরের উত্তর, মেঘনা নদীর মোহনার দক্ষিণ ও পূর্বে। এটি প্রায় বার ক্রোশ দীর্ঘ, পাঁচ ক্রোশ প্রশস্ত। দ্বীপটি কেবল ছোট ছোট বোপে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে দুই একটা আগ্র বা অশ্বখন ছাড়া। দ্বীপে নারিকেল গাছ অনেক, এমন কি দ্বীপের প্রধান ফসলই নারিকেল ও বাঁশ। সনদীপে ফিরিজি বাসিন্দাই অনেক। এটি ফিরিজি গিরজা আছে; গিরজার অধীন একটি মঠও আছে। সনদীপ যদিচ দিল্লীখরের অধীন বটে; কিন্তু শাসন নাই; ফিরিজি-রাই বলবান। অধিক ধৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, বাকি ইতর জাতির বাস। দ্বীপের মধ্যে এক বার মাত্র কায়াছ আছে। গৃংবর্ত্তার নাম বৈল্যনাথ। সে কায়াছটী অত্যন্ত ধনা। নিকটস্থ দ্বীপ সকলে ও পার্শ্বস্থ গ্রামে তাহার বহুল জমিদারী থাকতে ও আরাকান, বর্ম্মা ও মাল্লাজ প্রভৃতি দেশে ব্যবসা থাকতে, তাহার ভৃত্যবল অত্যন্ত অধিক; এমন কি তখন তাহার সহস্র অশ্বারোহী প্রহরী ছিল। দ্বীপের দক্ষিণ অংশে সমুদ্র হইতে প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে তাহার ভদ্রাসন। ভদ্রাসনটী দক্ষিণ-দ্বারী। দ্বারের সম্মুখেই একটি পরিষ্কার তৃণচয়ে পূর্ণ প্রায় বিশ বিঘা মাঠ। মাঠের মধ্যে একটিও বন নাই, কেবল দীর্ঘ প্রায়-কৃষ্ণবর্ণ দূর্কী। মাঠের পরেই একটি প্রায় বার হাত প্রস্থ সরকারী রাস্তা। রাস্তা হইতে তাহার ভদ্রাসনের দ্বার পর্যন্ত বাটাতে বাইবার একটি পরিষ্কার প্রায় ছয় হাত চৌড়া রাস্তা। রাস্তার দুই

পার্সে দুই সাব ছোট ছোট বকুল ও চাঁপা গাছ। গাছগুলি বড় করিয়া কোণের মত করা, উর্দ্ধে প্রায় সাত হাত, অধিক ডাল; বোধ হয় প্রথম ডাল কাটিয়া দেওয়ায় গাছগুলি গোল হইয়াছে। বাটীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাস্তা-পার একটা প্রকাণ্ড অখণ্ডগাছ। গাছটি ভূপের উপর আছে। গাছটি বহুকালের পুরাতন। গাছের নীচে কতকগুলি ছোট ছোট কোপ হইয়াছে। গাছের ডালগুলি ভ্রাসনের সামনের মাঠের উপর পড়িয়াছে। তাহার একটি প্রকাণ্ড মাধবীলতা আশ্রয় করিয়া সুগন্ধ পুষ্পভারে গাছের শোভা সম্পাদন করিতেছে। গাছের নিকট হইতে রাস্তাটি ক্রমে নীচ হইয়া পশ্চিমবাহিনী চলিয়াছে। ভ্রাসনের চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর। ঘরসম্মুখে প্রায় দুই হাত উচ্চ বক। বকটি প্রায় তিন হাত প্রশস্ত ও ভ্রাসনের সামনের দোঁড় বরাবর লম্বা। বাটীর ঘাটটি উচ্চ ও প্রশস্ত। প্রাঙ্গণটি অত্যন্ত প্রশস্ত। জামেই প্রকাণ্ড পাকা বলাগেছে বাড়িখানায়ুক্ত দালান। গৃহকর্তা আপনার প্রাঙ্গণে ঝাঁড়াইয়া ‘গোবিন্দ’ বলিয়া ডাকিলে, পার্সের ঘর হইতে এক জন বৃষ্টি হাতে বাহিরে আসিল।

বৈদ্যনাথ বলিল। “গোবিন্দ, তোমার পাল সব বাহির হইয়াছে?”

গোবিন্দ বলিল। “আজ্ঞে, চাঁদা পাল লইয়া গেছে। আমি একবার গ্রামে বাইব। কাল সরকার মহাশয় আমাকে টাকা সাধিতে কএক খানা দাখিলা দিয়াছেন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “একবার পক্ষুকে ডাকিয়া দিও, তার ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিও, কতগাঁট কাভা জাহাজে তোলা হইল।”

গোবিন্দ “যে আজ্ঞে” বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ক্রমে অঙ্গে অঙ্গে ঘরের নিকট আসিলেন। একবার চতুর্দিক্ নজর করিয়া দেখিলেন। আপনার প্রশস্ত রাস্তায় পদচালন করিতে লাগিলেন। বাটী হইতে একজন চাকর আসিয়া একটা হাঁকা হাতে দিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ হাঁকার তামাক খাইতে খাইতে অখণ্ড গাছের মূলে আসিলেন। মাঠের পূর্বা ও পশ্চিম প্রান্তে কতকগুলি ছোট ছোট কোপ ছিল। দেখেন যে, পশ্চিম দিগের কোপের ভিতর হইতে কোকিল একটা উড়িয়া গেল, অমনি একটি ক্রীলোক সেই ঘান হইতে বাহির হইল।

বৈদ্যনাথ বলিল। “কে ও অরক্ষণী নাকি? এত প্রত্যাখ্যে কোথা হইতে? বনে কি করিতে গিয়াছিল?”

অরক্ষণীর তখন চাবিশ বৎসর বয়স। অরক্ষণী আবারে ঈষদ্ হুল। অতি দীর্ঘ লম্বা। তাহার মুখটি প্রায় গোল বিড় ক্রমে সর হইয়াছে। নাশার মূল কিছু

টেপা। নাসার অগ্রভাগ ছোট, রক্তবর্ণ ও ছোট, ওঠে ঘর ধনুর মত। অধরাট ওলু-
টান। চক্ষু কর্ণ পর্যন্ত বটে, কিন্তু কিছু গোল। পশ্চাদেণ স্থূল কিন্তু কোমল।
অরুণভীর সর্বাঙ্গ ললিত ও গঠ-টি ভাবসুন্দর। তাহার চক্ষুর কোণ হইতে যেন
চক্ষুরতা দেখা বাইতেছে। মুখটি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে শরীর-পরিমাণ হইতে
কিছু ছোট বোধ হয়। মস্তকে কেশভার ঘন ও সূক্ষ্ম কণী বদ্ধ না থাকিলে বোধ
হয়, ললাটদেশ কেশপাশে প্রশস্ত ও উচ্চ দেখাইত। অরুণভীর গলদেশ অত্যন্ত
ভাবসুন্দর ও কি ভঙ্গি। বকঃস্থল উচ্চ ও কুণ্ডল কঠিন। স্বক্কেশ গলা হইতে ক্রমে
চলিয়া পড়িয়াছে। বাহুমূল স্থূল ও গোল, ক্রমে সরু হইয়াছে। মণিবন্ধ অত্যন্ত
সূক্ষ্ম ও ললিত। অঙ্গুলাগ্র দীর্ঘাধার হ্রাস ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়াছে ও নখগুলি আরম্ভ।
শরীর অত্যন্ত প্রশস্ত, কিন্তু কটদেশে ক্রমে সরু। নিতম্ব স্থূল। জাহ্নবী স্থূল।
ফলে অরুণভীর সর্বাঙ্গে যেন প্রেম মাখা। অরুণভী অঙ্গে অঙ্গে কোণ হইতে
বাহির হইল ও নিত্যন্ত মনভাবে ভূত্বিতে বলিল। “বৈদ্যনাথ! আমার একপকার
উপায় চিন্তা কর। তোমার আবাসে ও সাহায্যে এক প্রকার বিপদ হইতে পরিত্রাণ
পাইয়াছি। আমি আর বনে বনে একাকী অনাথ হ্রাস বেড়াইতে পারি না। আমি
গতরাত্রি এ কোপের ভিতর শয়ান ছিলাম। তোমার গোলা হইতে কিছু বিচালি
আনিয়া লব্ধ্য করিয়াছি। সমস্ত রাত্রেই আমি আমার সর্বাঙ্গ ভাবি হইয়াছে।
আমি পদবিক্ষেপে অপহৃত।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “তোমার এটি অস্ত্র হইয়াছে। তুমি কেন আমার নিকট
আসিলে না? আমি কি তোমাকে দান দিতাম না? আমি তোমার অবস্থাকে গোবিন্দকে
পাঠাইয়াছিলাম। গোবিন্দ তোমার দেখা পাইল না। কেমনেই বা পাইবে; তুমি যে
স্থানে ছিলে, সেখানে তে মাছুষে থাকে না।”

অরুণভী বলিল। “কি করি, নিত্যন্ত নিরুপায় হইয়াছিলাম, তখন মনুষ্যের
নেত্রাভীত হওয়া শুভকর জ্ঞান করিলাম। তখন ভাবিলাম, তোমার বাটতে বাই, কিন্তু
তোমার দ্বারে এত লোকে রোগা ছিল যে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলাম না।
তোমার গোলায় গিয়া রাত্রি কাটাইব মন করিলাম। কিন্তু সেখানে সুবিধা বুঝিলাম
না। ঘরে প্রভ্যাগমন করিতে ভয় হইল, আর বিবাহ করিলাম না। কোপের মধ্যে
আসিয়া বিচালি পাতিয়া বসিলাম। তোমার দ্বারের দিকে সতৃষ্ণ নগ্ননে দেখিতে লাগি-
লাম; কিন্তু লোকসমাগম করিল না। ক্রমে চিন্তা ও অমে প্রভ হইয়া সেই
খানেই গুপ্ত হইয়া পাড়লাম। রাত্রি প্রভাতে কোপের ভিতর হইতে তোমাকে দেখিয়া
বাহির হইলাম।”

• বৈদ্যনাথ বলিল। “কাল তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা হইয়াছিল?”

অরুন্ধতী বলিল। “না, সে পাপ কল্য প্রভেই বিবাহ করিয়া, ক্ষেমাৎ আপন স্বরে রাখিয়া কোথায় গিয়াছে। এক্ষণে ক্ষেমা যদিও কোন গোলযোগ না করে, তবেই আমি রক্ষা পাইব।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “তাহার গোলযোগের কারণ ত কিছুই দেখি নাই। তাহার ইহাতে ত অলাভ কিছু বোধ হয় না।”

অরুন্ধতী বলিল। “অলাভ কোথা, তাহার স্বপ্নের অধিক সৌভাগ্য হইয়াছে; ইহাতে একটি মাত্র সন্দেহ।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “হাঁ! যদি জন ব’লে দেয়। কিন্তু জন আমার জমীদারীতে থাকিতে তাহা পারিবে না। তাতে আবার জন শুনিতেছি অতি নীচ্র মাস্তাজে গিয়া বাস করিবে; ওখার তাহার কোন আশ্রয়ের কাল হওয়াতে সে অতুল্য বিষয়ের অধিকারী হইয়াছে।”

অরুন্ধতী বলিল। “সে কবে বাইবে তাহার কিছু সমাচার জান?”

বৈদ্যনাথ বলিল। “শুনিয়াছি অদ্যই জাহাজে চড়িবে। আমার দুইখানা জাহাজ আজকে হয়ত ছাড়িবে। সে আমারই জাহাজে যাইবে।”

অরুন্ধতী বলিল। “এক প্রবাস নিশ্চেষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমার উপায় কি? আমি আর অনাথার স্থায় বেড়ইতে পারি না। আমার কপালে কি এই ছিল। কোথা আরাকানের রাজবাটী, আর কোথা সনদ্বীপের বন। কোথা দাসদাসী সেবা, আর কোথা বহু মশক কীটের দংশন। কোথা কেশীরের সাল, আর কোথা তুষার দোপাটা। কোথা হুঙ্কাফেননিভ কোহল পর্য্যক, আর কোথা বিচালির আঁটী। কোথা দেশের আমিরেরা আমার মুখাবলোকনে অক্ষম, আর কোথা মনুষ্যের নিকট মুখলুকান। যে বালা শত সহস্র দীনকে প্রত্যহ প্রাতে সহচরী দ্বারা কত শত মুদ্রা বিতরণ করিয়াছে, এখন সে আজ দুই দিন আহারাভাবে বায়ু সেবন করে। হায়! আমার অষ্টে আর কি আছে তাহা সেই দুষ্ট বিধাতাই জানেন! পূর্বে জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, এখন তাহার ভোগ হইতেছে। অল্প বয়সেই মাতৃহীনা। আবার দুর্ভাগ্য বশত পিতৃহীনাও হইলাম। বুঝি করিলাম, জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাহে দেশত্যাগ করিলাম। তা আমিই বা কি করে জালিবে যে, অল্প আমার বিক্রম করিবে? ভ্রাতার ত এ কাজই নয়। যখন আরাকান হইতে আমার আনে, তখন কতই যত্ন করেছিল, কতই বলেছিল। হা বিধাতা! আমি কি এই দুঃবুদ্ধির হস্ত এককালে নিপতিত হইলাম! ধর্ম্য ধর্ম্য, জাত ধর্ম্য, আবার আহারাভাবে প্রাণও ধর্ম্য। বৈদ্যনাথ! দয়া কর। তেমার ত সংসার আছে। তুমিই জান যে আমার মনে কি ভাব উঠিতেছে। এক্ষণে আমার একটি উপায় বলিয়া দাও।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “অরুণ্ধতী! আমি তোমার অর্থ দিয়া আরাধ্যে পৌছিয়া দিতে পারি। ইতিমধ্যে তোমাকে আমার ঘরে থাকিতে হইবে। আমি তোমাকে স্পষ্ট রাখিতে পারিব না। তুমি আমার গোশালায় যেন গোসেবার নিযুক্ত থাকিয়া, যত কাজ কর, বা না কর, অস্ত্রে জানিবে যে তুমি গোয়ালের পাটের অগ্র আছি। যত দিন না আমার আরাধ্যের অগ্র আহাজ প্রাপ্ত হয়, ততদিন এই অবস্থায় থাকিতে হইবে। ইহাতে কি বল?”

অরুণ্ধতী বলিল। “আমি তাহা বই আর কি ইচ্ছা! করিতে পারি। আরাধ্যের বাইরা কোন মঠ আশ্রয় করিব। কিন্তু এক্ষণে একটিমাত্র আমার শঙ্কা আছে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “শঙ্কা কি? তুমি গোশালা হতে কখন বাহির হইও না। তাহা হইলেই তুমি নিকটকে থাকিবে। গোশালার অপর কেহ বাহিতে পায় না।”

অরুণ্ধতী বলিল। “আমি তাহার শঙ্কা ত করিতেছি না। আমার আরাধ্যের যাইতেই ভয় হইতেছে। আরাধ্যের গিয়া আমি কোথায় দাঁড়াইব। রাজা কখন আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। আর দিলেও আমি সেখানে বাহিতে পারিব না। বরং এই বনে শৃগালদিগের দ্বারা চর্ষিত হইব, সে রাজবাটী আর প্রবেশ করিতে পারিব না।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “তবে আর কি উপায় আছে?”

অরুণ্ধতী নিতান্ত অস্থির হইল ও কোন উত্তর না করিয়া একান্তে চিন্তিত হইল। বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল রাখিয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশগানে চাহিল। বৈদ্যনাথ একবার অরুণ্ধতীর দিকে দেখিয়া অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অরুণ্ধতী কিছুক্ষণ এই ভাবে স্থির হইয়া রহিলে, তাহার চক্ষুর দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। পরে বৈদ্যনাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল। “বৈদ্যনাথ! তোমার দয়ায় আমি নিতান্ত বাধ্য আছি! তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব। লেখ, এ বিদেশে আমার কেহই আশ্রয় নাই। তোমার সঙ্গে অতি অল্পদিনের আলাপে তুমি আমাকে যথেষ্ট রূপা করিয়াছ ও উদ্ধার করিয়াছ। এক্ষণে আমার একমাত্র ভিক্ষাদান কর, ইহাতে ভয় করিও না, আমি নিতান্ত অনাথ।”

বৈদ্যনাথ, অরুণ্ধতীর হস্ত চালন ও বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া কিছু মোহিত হইল। তাহার স্বভাবত কোমল মনে দয়ার উদ্রেক হইল; বলিল। “অরুণ্ধতী! তোমার কি ইচ্ছা আছে বল।”

অরুণ্ধতী বলিল। “আমাকে তোমার গোশালা আমার ইচ্ছায় থাকিতে দাও, আমি তোমার গাভী সকলের সেবা করিব। আমাকে তোমার স্বয়ং হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিও না। আমাকে আরাধ্যের আর পাঠাইও না; আমি সে দেশে মুখ

সেখাইব না। বড় কাল বাঁচি তোমার আশ্রয়ে গোসেবার নিযুক্ত থাকিব। পরে সুবিধা পাই, পুরুষোত্তমে যাইয়া সেই কনকবাণিতে শরীর ত্যাগিব, আমার এই ভিক্ষাটি দাও।”

এ কথাটি বলিয়া অরুণ্ডী দুই হাঁটু ভূমে গাড়িল ও আপনার অকল পূলে লাগাইয়া করপুটে বৈদ্যনাথের পা ধরিতে বাহু প্রসারিল। আহা রসাল ওলটান ওঠেয় কি যত্নে ল কাঁপিতে লাগিল। চক্ষে কি দয়া বরিণ। উর্দ্ধমুখ হওয়ার গ্রীবা বক্র হইলে কণ্ঠের লাবণ্য দেখা দিল। পূর্ণগুণেশ কি কোমল! বৈদ্যনাথ অমনি সিংহাসন পশ্চাতে গেল ও কহিল। “অরুণ্ডী! উঠ, আমার অমঙ্গল কারও না। তুমি রাজকন্যা, তোমার একরূপ সম্ভবে না। তোমার বাহা অভিরুচি হয় করিও। আমি তোমার সুখবর্ধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। উঠ, কেহ দেখিবে, আমাকে নিন্দা করিবে। চল আমার গোশালায় চল। তোমাকে আমি সেখানে রাখিয়া আসি, পরে তোমার গৃহকর্মের দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিব।”

অরুণ্ডী বস্ত্রের মত পাত্রোখান করিয়া গোশালাভিমুখে চলিল বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাৎ দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ স্বভাবত দয়ালীল। কিন্তু অত্যন্ত বিষয়কর্মে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতে তাহার এই প্রবৃত্তিটি নিত্যন্ত মলিন হইয়াছিল। অন্য প্রভাৎকালেই অরুণ্ডীর সহিত কথোপকথনে তাহার গুপ্ত প্রকৃতি আগ্রত হইল। আবার কয়েক দিন অরুণ্ডীর হীনদশা দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অত্যন্ত রূপসম্পন্ন ও পূর্ণ-যৌবনা, তাহাতে আবার রাজহুঁহুতা ও স্বজাতি। মনে মনে তাহাকে পূজ্যবশুৎ ব্যৱহাছিল, সেই স্বার্থ উদ্দেশ্যে আরও শ্রীতি জন্মিয়াছিল। যাইতে যাইতে অরুণ্ডীর অবস্থা মনে মনে আন্দোলন করতে লাগিল ও তাহাল ‘বিধাতার কি অশ্রুটি নিবন্ধন। কাহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কে বলিতে পারে যে আমারও এক দিন এই অবস্থা হইবে না।” মনে মনে প্রমোদিতা করিল। যে, বাহাতে অরুণ্ডী আবার ভয়সমাজ গ্রাস হন ও পুরুষের হন তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার ভদ্রা মনের পশ্চিমধার দিয়া উত্তরমুখে চলিল ক্রমে ভয়সমাজের এলাকা পার হইয়া খিড়কি পুষ্করিণীর পাড়ে গেলে, দেখে যে পুষ্করিণীর দক্ষিণের প্রধান ষাটে তাহার স্ত্রী স্নান করিতেছেন। ক্রমে পুষ্করিণী পার হইয়া পুষ্করের উত্তর পাড়ে গেল চতুর্দিক নির্জন, কেবল ভাল ভাল কলের গাছ ও ফুলের ছোট ছোট বোপ। তরুণের নুতন গল্পে টুনটুন, দয়ল ও ধ্বনি নাচিতেছে। পূর্বাধিক অরুণোদয়ে উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রজাপতিগুলি বেন এ ফুল অগ্রাহ করিয়া অপর ফুলে গিয়া বসিতেছে। আবার মনোনিবৃত্ত হইল না বলিয়া কেস

আর একটির কাছে গেল। বেন ভাংবার নিকটস্থ হইয়া পালাকাইয়া উঠে উঠিল ও আর একটিতে গিয়া বসিল। সে ফুলটি বেন অমনি দুই চারিটি কথা কহিয়া প্রজাপতিটিকে বিনায় দিল। আবার হুঁজুগা প্রজাপতি আর একটির উপাসনা করিতে নিযুক্ত হইল। হরত উভয়ের মিলন হওয়ার প্রজাপতি জুখে বসিয়া মধুপান করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ সে স্থানটি ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভদ্রাসনের বাগানের উত্তর সীমায় পৌঁছিল। সেবার বাগানের উপর দিয়া একটি কাঠের পোল আছে। সেই পোলটি দিয়া অপর এক বন্দ জমীতে পৌঁছিল। এ জমীতে প্রায় গাছ নাই, কেবল বনের মাঠ। কদাচ হুই একটা অভ্যস্ত পুরাতন তাল গাছ। কোম স্থানে চার পাঁচটি গাভী হেঁটমুণ্ড হইয়া দুই এক খাবল খাস খাইতেছে, আবার লে স্থান হইতে অপর স্থানে ঘাইতেছে। অন্নবয়স্ক বৎসগুলি মুখে আমন্দে লক্ষ্য দিতেছে। একবার বাপুজী উজ্জ করিয়া চারিপদ বিক্ষেপে বেগে এক রসি পথ চলিয়া গেল, আবার এক বিষজমী ঘুরিয়া গাভীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। জমীবন্ধী ন্যূন সংখ্যা চারিপদ বিষ। চতুর্পার্শ্বেই দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেল গাছ। নৃতন দক্ষিণে হাওয়ার অধিকাংশ গাছে ফুল ফুটিয়াছে ও শুষ্ক নিপতিত মোটা মোটা পাতাভুক্ত নীচের ভূমি আচ্ছাদন করিয়াছে। কোম জেঠ গাছে বা ছোট ছোট মুচি ধরিয়াছে। হরত ইন্দুরে ভাংবার মধ্য হইতে হুইটি কোমল নিষ্টোল মুচি কাটিয়া ফেলিয়াছে। মাঠের পূর্ব দিকে একতলা একসার লম্বা ঘর। ঘরের সামনে একটি প্রাঙ্গণ, বোধ হয় মাগে তিন বিঘা জমী হইবে। চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের পশ্চিম দিকে একটি দ্বার। রাজি হইলে গুরুগুলি সেই প্রাঙ্গণে থাকে। দিবাভাগে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘরগুলির ভিতর দিঘ্য পরিষ্কার। ঘরগুলির পোতা উচ্চ প্রায় চার হাত। একটি বড় ঘরে রাশীকৃত বিচালি গাদা দেওয়া রহিয়াছে। ঘরের দাওয়ার চার পাঁচ খানা বড় বড় খড়কাটা বঁট পড়ে আছে, আর আটটা বড় ওড়া। প্রাঙ্গণের তিন দিক্ প্রাচীরের ধারে প্রায় এক হাত উচ্চকরা মাটির ভিপি, সেটি প্রায় আড়াই হাত চোড়া। তাতে সারবন্দি বড় বড় মাটির গামলা বসান আছে। সকল গামলাতেই বিচালির আবনা। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পাঁচ হাত উচ্চ আল দেওয়া কূপ। তাহার দুই পার্শ্বে দুই মোটা খুঁট পোতা। তাহার একটা কাঠের চাকার উপর দিয়া দড়িতে গাঁথা একসার তরুন জুয়লাউ। তাহার ভিতর মাটি দিয়া ভরি করা। লাউগুলি ধরে টানিগেই ক্রমে অপর দিকের লাউগুলি কূপের জলে পড়ে, তার পর সামনে দিয়া হাতের কাছে জল ভরে উঠে। সেই খানে একটি নারিকেলের ডোঙ্গার পড়িয়া নিকটস্থ চৌবাচ্ছায় পড়ে। গোণালার অস্ত্র অস্ত্র গৃহে কৃষিকর্মের যন্ত্র, বীজাদি থাকে। এক ঘরে বৈদ্যনাথের ঠুতুতোর শয়ন করে। আর অপর তিনটি ঘর খালি ছিল।

• অরুণ্ডী গোশালা প্রবেশ করিলে বৈদ্যনাথ বলিল। “অরুণ্ডী! ঐ উত্তর পার্শ্বে তিনটি ঘর আছে। উহার মধ্যের ঘর তোমার শরনের জন্ত রাখ। দক্ষিণের ঘরে রন্ধন করিবে ও রন্ধনজব্য সব রাখিবে। উত্তরের ঘরে দিব্যভাগে বসিও। তোমার কোন দ্রব্যের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না; আমি গোবিন্দকে একপেই পাঠাইয়া দিতেছি; সে আসিয়া তোমার সকল আয়োজন করিয়া দিবে। তোমার গোষ্ঠের কোন কর্ম করিতে হইবে না। গোপলেশ্বর ও আমার অস্ত্রাজ্ঞ কুবীরা তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। একপে ঐ রকে বসিয়া তিলেক বিশ্রাম কর। আমি গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিই। প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে আমি আসিয়া দেখিরা যাইব। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন হয়, এইখানকার ভূত দিয়া বলিয়া পাঠাইও, দেখ যেন কোন বিষয়ের অভাব হইলে দ্রুত চূপ করিয়া থাকিও না। এ ঘর তোমার ও এ সকল দাসদাসী তোমারই সেবাইত। ঈশ্বর তোমার সুখে রাখুন।”

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল, অরুণ্ডী স্বপ্নকাল চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। এবার বৈদ্যনাথের পশ্চাত্তানে দৃষ্টিপাত করিলেন, পরে বৈদ্যনাথ দৃষ্টির অন্তরে হইলে একটি দীর্ঘনিদ্রা ত্যাগ করে ভূমির উপর নিরাসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গোবিন্দ আর দশটি লোক সংসারের সমস্ত দ্রব্যাদি আনিয়া ও একজন তিনটি ঘর পরিষ্কার করিয়া গৃহকর্মের দ্রব্যাদি সব স্থানে স্থানে রাখিতে লাগিল। অরুণ্ডী চিত্রপুঙ্খলিকার মত স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে মকরের প্রথর রবি চন্ডি গোষ্ঠের প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একে একে সকল গাভীগুলি গোষ্ঠের মাঠ পার হইয়া অস্তরে গেল। এক জন রাখাল একটি নারিবেল গাছের উচ্চ শুলে বসিয়া পাট কাটিতে লাগিল।

এ দিকে বৈদ্যনাথের প্রধান ভৃত্য গোবিন্দ দুই তিন দণ্ডের মধ্যে তিনটি ঘর সুসজ্জিত করিয়া অরুণ্ডীকে বলিল “মাতা, গাত্রোথান করুন, আপনার ঘরগুলি দেখুন, আর কি প্রয়োজন হয় বলুন।”

অরুণ্ডী গোবিন্দের কথায় গাত্রোথান করিলেন ও একবার তিনটি ঘরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন। “বর্ষেই হইয়াছে, বৈদ্যনাথকে আমার শত শত প্রণাম জানাইও, তোমাকেও আমি নমস্কার করিতেছি, আমি তোমাদিগের দ্বায় ক্রীত হইলাম। আমার অনুগ্রহ করিও। আমি তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। আমি দীনা অনাথা।”

গোবিন্দ বলিল। “মাতা আমি আপনার আজ্ঞাবহ, আমাকে একপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, একপে বিশ্রাম করুন।”

অরুণভী কানিতে কানিতে মথোর বরের পর্যাঙ্কে গিয়া শয়ন করিলেন ও আপনার অকলে সেই কমলমুখ আবৃত করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন । গোবিন্দ বর হইতে বাহিরে গিয়া ভৃত্যদিগকে লইয়া চলিয়া গেল । অরুণভী এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া ক্রমে অশ্রু মুছিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন । “বিধাতঃ ! তোমায় অসাধ্য কিছুই নাই ।” বলিয়া আবার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন ; তাঁহার মন খেদে পরিপূর্ণ হইল । থাকিয়া থাকিয়া যেন নিশ্বাসবোধ হইতে লাগিল, এক একবার অত্যন্ত কষ্টে বক্ষ উচ্চ করিয়া মুখ খুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । এরূপ কিছুক্ষণ ফুঁপিয়া ক্রন্দনে মনের যেন অনেক ভার দূরীভূত হইলে তিনি নিতান্ত ভ্রাতৃ হইয়া অকলটি মুখে দিয়া সুপ্ত হইয়া পড়িলেন । তাহা সেই রূপরশি অরুণভী যেন গৃহ উজ্জ্বল করিতে লাগিল । ক্রমে সিদ্ধান্তভূত, বরষতী ওজস্বত আপনায় মুখের আবরণ খুলিয়া দিলেন । দুঃখিনী অরুণভীর সুন্দর বদন কি শোভিল ? ঈষৎ চম্পকদলের প্রায় মুখমাপুরীর উপর কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ শোভিল ।

গোবিন্দ অরুণভীকে এই অবস্থায় রাখিয়া গোবিন্দ মঠ দিয়া যাইতেছে, পথে বৈদ্যনাথের পুত্র বরদাকর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল । বরদাকর্ণ গোবিন্দকে দেখিয়া বলিলেন । “গোবিন্দ এত লোক লইয়া কোথায় গিয়াছিলে ?”

গোবিন্দ বলিল । “মহাশয় আমি গোলবাটাতে গিয়া ছলাম, অরুণভী মাতার গৃহসানগ্রী সব রাখিয়া আসিলাম ।”

বরদাকর্ণ কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন । “কি অনু রামের অরুণভী ?”

গোবিন্দ বলিল । “হঁ। তিনিই ।”

বরদাকর্ণ বলিলেন । “তাঁহার আনবাব এখানে কেন ?”

গোবিন্দ বলিল । “কর্ত্তা মহাশয় তাহাকে থাকিতে গোশালায় তিনটা বর দিয়া ছেন । তাঁহার বর সাজাইতে দ্রব্য আমাদিগের বাটী হইতে আনিয়া দিলাম ।”

বরদা বলিলেন । “তবে অরুণভী কি এইখানেই বাস করিবেন ?”

গোবিন্দ বলিল । “কর্ত্তা মহাশয় তাহাইত আজ্ঞা দিয়াছেন ।”

বরদা বলিলেন । “কেন আমাদিগের বরে স্থান দিলে ও ভাল হইত ।”

গোবিন্দ বলিল । “বরে রাখিতে সাহস করেন না, লোকাপবাদ ভয় করিয়া চলিতে হয় ।”

বরদা বলিলেন । “কতদিন এরূপ থাকিবেন ?”

গোবিন্দ বলিল । “আমি তাহা স্থির জানি না, বোধ করি দুই এক মাসের মধ্যে বাবস্থা লইয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইলে বরে গিয়া থাকিবেন ।”

বরদা বলিলেন । “ভাল তিনি ও ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্ত কিসের ?”

গোবিন্দ বলিল। “সংস্পর্শ সন্দেহ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।”

বরদা বলিলেন। “গোবিন্দ! অরুণতী একপে কোথায়?”

গোবিন্দ বলিল। “অরুণতী গাতা ঐ ঘরেই আছেন।”

বরদা বলিলেন। “ভাল তুমি একপে আপন কর্ণে বাও, একবার অবকাশ মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও, কোন বিশেষ কথা আছে। নূতন বাগানে বেশ নির্জন স্থান, আমি সেই স্থানের পূর্ণাণ্ডে স্নান করিতে যাইব। তুমিও সেই খানে স্নানে যাইও। ভুলিও না।”

গোবিন্দ বলিল। “না মহাশয় ভুলিব না, অবশ্য অবশ্য যাইব। একপে একবার গ্রাম হইতে আসি।”

গোবিন্দ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বরদা অস্বে অস্বে গোশালায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অরুণতীকে দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে অগ্রসর হইয়া উত্তরের ঘরে গেলেন। বসন্ত দিব্য সাজান কিন্তু কেহই নাই। সেখা হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার দক্ষিণের ঘরে আসিয়া দেখেন যে, অরুণতী পর্ধ্যঙ্কে সুপ্তা আছেন। নিজাবশে তাঁহার মুখ হইতে বসন্ত ধসিয়া পড়িয়াছে। কি সুন্দর মুখচন্দ্র দেখা দিচ্ছে। তাহার মনোবর্ণ কেশে বদনের উজ্জ্বল লাবণ্য কি বৃদ্ধি করিয়াছে! নন্দন মুদ্রিত, কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় কিছু খোলা। বোধ হয় বেন তিনি কি ভাবিতেছেন। মুখটি মনের ও শরীরের কষ্টে কিছু মলিন হইয়াছে। বরদা অরুণতীর প্রতি কণকাল এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত মোহিত হইলেন। তাঁহার বন বন শিখাস বহিতে লাগিল। পর্ধ্যঙ্কের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে পর্ধ্যঙ্কের উপর হস্তটি দিলেন। ক্রমে হস্তে তার দিয়া পর্ধ্যঙ্কের উপর শির নাগাইলেন। তাঁহার নয়ন অনিহিবে হুণ্ড অরুণতীর মুখপত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে অসিচ্ছায় তাহার মুখ নীচ হইতে লাগিল। একপে বরদার বন বন শিখাস অরুণতীর নিকলক রসপূর্ণ গুণমেষে লাগিতে লাগিল। ক্রমে এক এই অবস্থায় থাকিয়া বরদা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে কিছু ভাবিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। ঘরের বক হইতে গোশালায় প্রাঙ্গণে নামিলেন। হুচার পা করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে গিয়া আবার দাঁড়াইলেন। একবার অরুণতীর গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; আবার ফিরিয়া আস্তে আস্তে অরুণতীর ঘরে প্রবেশ করিয়া হস্ত দ্বারা অরুণতীর পদধারণ করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হুই তিনবার ডাকিলে অরুণতীর চমক হইল। অরুণতী গাত্রোথান করিলেন। চক্ষু মেণিলেই বরদার মতক-নয়নে মিলিল; অমনি বলিলেন, “বরদা, তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ? আমার বোধ হয় অনেক অপেক্ষা করিতে হয় নাই।”

বরদা বলিল। “না আমি একবার তোমার ঘরে আসিয়াছিলাম, তোমাকে শয়নে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম ; আবার ডাবিলাম, দিশিড্রায় শরীর অনুস্থ হইতে পারে, তাই তোমার ডাকিলাম। এখনকার সমস্যা কি ? তুমি এখানে কেন ? পাপী গল্পালিস কোথায় ? তোমার ভাতার কিছু সম্বাদ পাইয়াছ ?”

অরুন্ধতী বলিল। “বরদা বস, অনেক কথা আছে।”

বরদা পর্ধ্যঙ্কের এক দেশে বসিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার নিঃশব্দে সম্মুখীন হইয়া বাসলেন।

অরুন্ধতী বলিল। “আমি এক্ষণে বেগম তোমার চিন্তায় চিন্তিত। আমি সবল সহ্য করিতে পারি। তোমার পিতা কোথায় ?”

বরদা বলিল। “তিনি এক্ষণে বোধ হয় সদর বাটীতে আছেন। বিষয় কর্ত্ত করিতেছেন। তোমার সঙ্গে কি তাঁহার দেখা হইয়াছে, তিনি তোমাকে কোথা দেখিলেন। তুমি কাল কোথায় গিয়াছিলে, আমি বস্ত অবেক্ষণ করিলাম, তোমার কিছুই সম্বাদ পাইলাম না। ডাবিলাম, আমার বুঝা মৃত্যু উপস্থিত, নতুবা অরুন্ধতী অদৃশ্য হইলেন কেন ?”

অরুন্ধতী বলিল। “আমি সেই নগরমের ভগ্নে বনে বনে বোঁপে বোঁপে লুকাইয়া ছিলাম, কল্য সমস্ত রাত্রি তোমার ভদ্রামনের পাশ্চাত্যের বোঁপে কাটাইয়াছি।”

বরদা বলিল। “অরুন্ধতী ! তোমার এ কথায় আমার মনে দুঃখ হইতেছে। তুমি আমাকে কি এত হ্রাস্তা স্থির করিয়াছ। না আমাকে বাহাল করিলে না।” এই কথা বলিতে বলিতে বরদার গুষ্ঠ কপিতে লাগিল ও পবিত্র অভিমান ও বেদে মুখ এক প্রকার বিচিত্র ভাব ধারণ করিল। চতুরা অরুন্ধতী তাহা দেখিয়াই বুঝিল ও আপনার অসাবধান বাক্যে আপনাকে মনে মনে তিরস্কার করিয়া বরদার হস্তটী ধরিল ও বরদার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল। “বরদা, তুমি রাগ করও না, আমি দুঃখে কেমন অন্ধ হইয়াছিলাম। আমার তখন তোমাকে মনে পড়ে নাই, তাই আমি বনে রাত্রি কাটাইলাম।”

বরদা অরুন্ধতীর বাক্যে আরও চকল হইলেন। তাঁহার এবার মুখত্রীতে দুঃখ স্পর্শ করিল। মনে মনে আপনার মনের ভাব রাখিলেন বুঝিলেন যে নারায় প্রেম তাঁহার বুদ্ধির মত চপলা। তথাচ প্রেমে বরদাকে দূর হইতে অতি অপরিহার্য আশা দিল। ভাবিলেন বুঝি আমি অরুন্ধতীর ভাব বুঝিতে পারি নাই। আবার মনে করিলেন ‘বঙ্গ অরুন্ধতীই প্রেমে প্রেমিক না হন, তথাপি আমার বাক্যকোশলে মনের ভাব বুঝিলে অবশ্যই প্রেমের প্রেমিক হইবেন।’ আবার মনে উঠিল যে, তাও যদি একান্ত না হন তবু বুঝেও ত চক্ষুজ্ঞার বলে বলিবেন। আহা! অথো

বরদাকর্ষ এমনি অজ্ঞান যে, ভাল বিষয়ের মিথ্যা প্রবাদও ভ্রমিতে ভালবাসেন। একা বরদাকর্ষের কেন সম্বন্ধেই সে দোষ আছে। আপনাকে আপনি কীকি দিতে অনেকেই ভাগবাসে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও যদি কেহ একবার কথার কথা বলে, তাতেও মন যেন অমোদ হয়।

বরদাকর্ষ এইকপি ছু চিত্তা করিয়া বলিল, “অরুন্ধতি! তোমার কথার আমার আরও কষ্ট হইল। আমি নিতান্ত অবাধ তাই তোমাকে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার এতদিনে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন চৈতন্য হইল। যদি অশ্রে জানিতাম, তবে কি আমার এ দশা! ভাল এখনও জানিলাম, যথেষ্ট হইল। এখনও আমার সাবধান হইবার সময় আছে। আমার প্রাণলব্ধ নিতান্ত মন্দ নহে।”

অরুন্ধতি বলিল, “বরদা, আমাকে অকারণ দর্শিত না। আমার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তখন আমি আত্মবিশ্বাস হইয়া গিয়াছিলাম। আমরা বাণী, তাতে চিরকাল সুখ-সন্তোষে বাসন করিয়াছি। স্বপ্নেও পদাশ্রয় না যে, আমার এরূপ দশা হইবে। তোমাকে মনে পড়িল না, কেনই বা পড়িবে? মন কি জানে না যে, আমি তোমাকে স্বপ্নে কি বলিয়াও দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে বুঝিলাম, ভাল করি নাই, যেহেতুক তুমি কিছু আমার দুঃখে দুঃখিত হইতে না। আমরা অবাধ বাল্য, সহজেই মোহিত হই। এত দিন আমি কেন ইস্ত্রজালে বদ্ধ ছিলাম, এক্ষণে আমার চক্ষু হইতে যেন আবরণটা অপসৃত হইল। আমার চক্ষুর আচ্ছন্ন খসিল। হা বিধাতা! আমি সর্বদাই বঞ্চিত হই। বরদাকর্ষ, স্ত্রী বঞ্চনা করা অতি সহজ। সে কাপুরুষের বশু। তুমি আমাকে স্পষ্ট বল। আমি নিরাশ হই, দুখ কেন তার ছাড়া আশ্রয় বরিয়া মনকে বষ্ট দিই, আর এত যত্নপাই বা পাই। আমাকে বল, আমি তাহা হইলে এ সংসারের মায়াও ত্যাগ করি। মনকে প্রেমো দিই। আমার মনস্ব প্রতিমাকেই প্রকৃত জ্ঞান করে আরাধনা করি। ইহ জন্ম ও দুখা গেল, দেখি জন্মান্তরেও যদি তোমাকে তুষ্ট করিতে পারি। তুমি কি আমার হনবে। ভাল দশ জন্ম তোমার উপাসনা করিলে দয়াও ত করিবে। দয়া হইলেই যথেষ্ট। আমার আর প্রেম কাজ নাই। এ দুখিনী অরুন্ধতার অদৃষ্টে বিধাতা তাহাই দিন। তোমার পাদপদ্ম যেন হৃদে ধরি।” অরুন্ধতির কথা শুনিতে বরদাকর্ষের মনে সুখ ও দুঃখ উভয়ই উপজিল। এরূপ প্রেম-গর্ভ বাক্য শুনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু নবীন প্রেম পাছে অত্যন্ত কষ্টে নষ্ট হয় এই ভয়ে অরুন্ধতির কথার উপর বলিলেন, “অরুন্ধতি! যথেষ্ট হইয়াছে। আমি ভয় করিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। আবার আপনার বীরত্বজ্ঞানও ছিল। কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম যে, মহতের প্রেম নীচানীচ বিবেচনা করে না, অতি অধমকে প্রেম-জ্যোতিতে

উত্তম করিয়া লয়। আমার এতক্ষেণে সাহস হইতেছে। অরুদ্রতি! এখন সংসার আমার পক্ষে গোলোক ধাম।”

অরুদ্রতী বরদাকর্ণের হস্তটী নিষ্পীড়ন করিলেন। বরদাও নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার উত্তর দিলেন। যেন উভয়ের প্রেমের শক্তি সেই হস্তনিষ্পীড়নে প্রকাশ হইল। ক্রমে পরস্পরের হস্ত নিষ্পীড়নে অধিক সময় নিয়োজিত হইল। উভয়েই মনে করিলেন যেন অপরের হস্তে কষ্ট হইল, কিন্তু সে নিষ্পীড়নে উভয়েরই সুখবৃদ্ধি বই আর কষ্ট জন্মিল না। প্রেমে এমতি অন্ধ করে। তখন জ্ঞান থাকে না যে, যত শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন সে কেবল আপনার শিরা পর্যন্তই বদ্ধ আছে। সে যে আপনার হস্ত অতি-ক্রম করে নাই, সে অপরের করে স্পর্শস্থ ব্যতীত অধিক বলে লাগে নাই। ক্ষণেক এইরূপ বিমল সুখভূতব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নীরব মুখে কত সম্ভাব বক্তৃতা হইল তাহা প্রেমিকযুগলই বুঝিল।

বরদা বলিল “অরুদ্রতি ভাল হইল। তুমি এইখানে থাক। এতদিনের পর বিধি বুলি আমাদেরকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিলেন। বিমল প্রেম এমতি বলবান্ যে কষ্টের মধ্যেও সুখ বাছিরা লয়।”

অরুদ্রতী বলিল। “আমার এখন সকল কষ্ট মন হইতে অপসৃত হইয়াছে। আমি আর আপনাকে দুঃখিনী অন্যখিনী মনে করি না। যখন হৃদয়বল্লভের সহিত দিবারাত্রি মিলন সম্ভাবনা, তখন আর আমার মনের কোন প্ররক্তি চরিতার্থ হইতে থাকি ‘রহিল না। আমি এই স্বপ্নলীলাকে ক্রমে ভাল করিয়া সাজাইব, বাহাতে তুমি দেখিয়া সমস্তই হও ভাং করিব। প্রত্যহ তোমার উদ্যান হইতে সদ্যঃ প্রস্তুত কুসুম সব সংগ্রহ করিব। সে সব পল্লবের সঙ্গে মিলাইয়া এই দ্বারটী ঘেরিব। কিন্তু বরদা, একবার জনের উপর নজর রাখিও। দেখিও যেন সে কোন কথা প্রকাশ না করে। আমার এক্ষণে তাহাকে মাত্র ভয় আছে। সে যদি এদেশ ত্যাগ করে, তবেই বরদা তুমি জানিবে যে, অবিবাহে আমি তোমার।”

বরদা বলিল। “কেও এত শঙ্কা করিতেছ। তাহার কি ক্ষমতা আছে যে তোমার অনিষ্ট করে। আমি বর্ত্তমানে তোমার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অনর্থক কল্পিত ভয়ে মনকে কষ্ট দিও না।”

অরুদ্রতী বলিল। “বরদা, আমার ভয়টি কিছু অমূলক নহে। তোমার পিতার লনদীপে যথেষ্ট অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সে নারকিছর একত্র হইলে বৈদ্যনাথ কদাচ বন্ধ করিতে পারিবেন না। সে কিরিস্টিানের বলাধিক্য আছে; তাতে আবার সে রাজবংশের কুলাঙ্গার মিলিলে তোমার পিতাকে এককালে পেষিয়া ফেলিবে। অতএব আমি বাহাতে গোপনে থাকি ও জন ঘে প্রকারে হউক দেশান্তর হয়, সে

উপায়ে বহুবান্ধা থাকা তোমার কর্তব্য। তবেই কেবল আমাদের নিকটকে থাকা সম্ভব। নতুবা আমি ভাবিতে ভয় করি, আমার জন্য কি বিষম দুঃখ প্রস্তুত আছে।”

বরদা বলিল। “ভাল সে ভার আমার উপর রহিল। এক্ষণে আমি বিদায় হই। তুমি আহার কর, দুই দিনের উপবাসী তোমার মুখ শুক হইয়াছে। তুমি ক্লান্ত হইয়াছ। আমি আবার অতি শীঘ্র তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছি।”

অরুণকতী বলিল। “ওবে এস” বরদা অরুণকতীর হস্তটি আর একবার নিস্পীড়ন করিয়া উঠিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন হয় না যে, সে পদচন্দ্র হইতে নয়ন অপর দিকে দেখে। নিরুপায়ে আশ্রয় সে বর ত্যাগ করিলেন। চকু হইতে নাম্বার সময় একবার করিয়া দেখিলেন। দেখেন, অরুণকতী তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া আছেন। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া উত্তরে পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। পরে অঙ্গে অঙ্গে প্রাঙ্গণটি পায় হইয়া মাঠ পড়িয়া চলিয়া গেলেন। অরুণকতী নিভাস্ত অবসন্ন হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; পরে পর্য্যাক হইতে উঠিয়া আহারের উদ্যোগ কি হইল, দেখিও গেলেন।”

এদিকে বরদা মাঠ পার হইয়া, আপন ভদ্রাসনে গোবিন্দকে না দেখিয়া আপনায় নতুন উদ্যানে গেলেন। সেথা পুস্করিণীর ঘাটে বসিয়া মোহিনীর প্রভীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ প্রভীক্ষা করিতে হইল না। গোবিন্দ শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোবিন্দকে দেখিয়া বরদা বলিল। “তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?”

গোবিন্দ বলিল। “অনেক দূরে গিয়াছিলাম; আজ আবার জনকে জাহাজে পাঠাইলাম। আমাদের দুই বান জাহাজ অন্য মস্ত্রাজে ভাসাইলাম।”

বরদা বলিল। “অবশ্যই কি আজ কাল কোন জাহাজ বাইবে?”

গোবিন্দ বলিল। “এখন শু কিছুই উদ্যোগ নাই। এক মাসের মধ্যে বোধ হয় বাইতে পারে।”

বরদা বলিল। “গোবিন্দ অরুণকতীর সঙ্গে পিতার কোথা দেখা হইল?”

গোবিন্দ বলিল। “অন্য প্রান্তে ভদ্রাসনে। তিনি আমাকে কাল তিন চার বার অরুণকতীর অনুদয়ন করিতে বলিয়াছিলেন, আমি অরুণকতীর কোথাও দেখা পাই নাই। আমি অনুপত্রামের বাসায় গিয়া সেই বৃদ্ধটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কিছুই বলিতে পারিল না। অনেক জিজ্ঞাসার বলিল ‘যে দিন অনুপত্রাম সন্ধ্যা হইতে চলিয়া গিয়াছে সেই দিন অবধি অরুণকতীর দেখা পাওয়া যায় নাই।’ আমি সেই অবধি আরে পাড়িয়াছি, বাটীর বাহির হইতে পারি নাই, কোন সমাচারও পাই নাই। অথেষ্টও হয় নাই। বাটীতে আর কেহ নাই; সকলে বংশেরে গিয়াছে। তথা হইতে ঢাকা

ধাইবে। অল্পস্বর্য অতি শীঘ্র করিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন। এখানে ছুই তিন দিনের মধ্যে আমাকে লইয়া আরাণ্যে যাঁইবেন।”

বরদা বলিল। “তবে সে রকমও অসম্ভবতার কিছু সমাচার জানে না।”

গোবিন্দ বলিল। “তাহার কথাই শু এমত বোধ হইল।”

বরদা বলিল। “ভাল, ফেমার সঙ্গে তোমার অন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নৈ কি বলিল?”

গোবিন্দ বলিল। “মে তাহার বর্তমান অবস্থায় সুখী হইয়াছে। পঞ্জাবিসের সমস্ত গৃহকন্দের অধিপত্নী হইয়াছে। দাম্পত্যসেবা তাহার সেবা করিতেছে।”

বরল। বাবল। “সে তোমার কিছু অক্লান্ততার কথা বলিল?”

গোবিন্দ বলিল। “হাঁ সে কত অরুণ্ডতার প্রমাণ! বলিল, তাহাকে বলিও এ দীনার সমস্ত সৌভাগ্য কেবল সে অরুণ্ডতার অনুগ্রহ হইতে। তাহাকে বলিও যেমা জন্মভেদে ভোয়ার এটি শোষণে পারিবে না।”

বরুণা বলিল। ‘গোবিন্দ, তবে এদিকে আমি নিশ্চিত হইলাম, এক্ষণে আমার বিষয় কি চিন্তা করিলে?’

গোবিন্দ বলিল। “তোমার কিছু উপায় স্থির করিতে পারি নাই। কণ্ঠকে সাহস করিয়া স্পষ্ট কিছু বলিতে পারি নাই, কোশলে জিম্মাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহার যেরূপ মন্ত দেখিতে পাই, নিত্যন্ত নিরাস হইতে হয়।”

বরদা বলিল। “কেন তিন কি অরুণ্ডাকে বরে নইবেন না? অরুণ্ডার কি দোষ?”

গোবিন্দ বলিল। “যহ্নে লইলেই বা তোমার মনস্থায়না কিসে সিক্ত হয়? তুমি জ্যেষ্ঠ, তোমাতে তাঁহার কুলরক্ষা হইবে, অতএব প্রজাতুল শীলের সঙ্গে তোমার কিরণে সম্বন্ধ হইতে পারে?”

বরদা বলিল। “অজ্ঞাত-কুলশীল কিসে? অরুণ তীকে কে না আসে?”

গোবিন্দ বলিল। “হঁ। সকলেই জানে বটে, কিন্তু তোমার পথায় মিল খায় না।
তাতে আবার যে কলক অকল্পিত্যকে স্পর্শ করিয়াছে।”

বরষা বলিল। “গোবিন্দ, তুমি দুই ডিন বার কলকের কথা কহিলে।
কলঙ্কটা কি?”

গোবিন্দ বলিল। “সকালিমেব সন্ধে সহবাস।”

বরদা বলিল। “তোমার সেটি ভ্রম। অরুণ্ডীর সঙ্গে গঙ্গালিসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় নাই। তুমি বুঝিতেছ না যে, গঙ্গালিসের সঙ্গে দেখা হইলে সে কি কখন কেমাকে বিবাহ করিত। সে হুসান্দ্রা জানে যে, কেমাই অনুরূপায়ের সহোদরা।”

গোবিন্দ বলিল। “বরদা, এ বিষয় তুমি জান, গ্রামস্থ সকলে ত জনে না। বোধ করি কৰ্ত্তা মহাশয়ও ইহা অবগত নহেন। তাঁহার যেন জ্ঞান আছে, অরুণতী গঞ্জালিসের স্বয়ং হইতে প্ৰসন্ন করিয়াছেন।”

বরদা বলিল। “কি! অরুণতী গঞ্জালিসের দ্বারেও পদাৰ্পণ করে নাই।”

গোবিন্দ বলিল। “ইহা যদি সত্য হয়, তবে নির্দোষ অরুণতীকে কষ্ট দেওয়া কর্তব্য হইতেছে না। আমি এক্ষণেই কৰ্ত্তামহাশয়কে গিয়া জানাইব। বোধ করি তাহা হইলেই তিনি অরুণতীকে আপনার ঘরে লইয়া যাইবেন। ভুঝি কি বল? আমি কি তাহাকে গিয়া তোমার নাম করিয়া জানাইব?”

বরদা বলিল। “তবে তাই জানাও কিন্তু আমার কথা কোন সুযোগ পাইলে বলিতে ছুলিও না। তোমাকেই আমি আমার পরিজ্ঞাত লক্ষ্য করিয়াছি। আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, জ্যোত্স্ন হইতেই আমি কৃতকার্য হইব।”

গোবিন্দ বলিল। “আমি বিধিমতে চেষ্টা পাইব, কিন্তু দেখ কি হয়। আমার সঙ্গে কৰ্ত্তা মহাশয়ের এক্ষণেই দেখা হইবে, দেখি সুবিধা পাই ত অদ্যই বলিব।”

গোবিন্দ এই বলিয়া পুষ্করিণীর স্বচ্ছজলে শরীর নিমজ্জন করিল। ঈশ্বর হিমোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল। অবগাহনান্তে কটদেশ পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতে লাগিল। বরদা নিম্নল জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। তাহার বেগসত্ত্বরে প্রশস্ত বক্ষে তেজে জালোষ্মি (১) লাগিল, যেন সূর্য সাগরোষ্মি কঠিন প্রস্তরে নিপতিত হইতেছে। প্রতিক্ষণেই বাহু প্রসারিয়া জলে ভর দিয়া প্রায় কটদেশ পর্যন্ত জাগাইতেছে, আবার তাহার পরেই তরঙ্গের নিম্নভাগে পাড়িয়া ফেনে শুভ্রীকৃত জলরাশি তাহার বিশাল পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিতেছে। যেন জলের উপর নৃত্য করিতেছে। ক্রমে বাটের নিকট হইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে জলের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঈষৎ বন্ধ রেখায় পুষ্করিণীর বামকূল হইতে দক্ষিণকূল ব্যাপিয়া মালা-বদ্ধ হইয়া অগ্নয়ন হইতে লাগিল। অপরকূলে ঘন ঘন তরঙ্গে তরঙ্গ রক্ততনিত বালুকাময় মৃদিকা খসিয়া জলে মিশ্রিত হইতে লাগিল। চতুর্দিকের জল তরঙ্গ হইল। সোপানচয়ের অগ্ন জলে তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইয়া, তালে তালে উর্ধ্বরশি ভাঙিতে লাগিল। তাহার উভয় বাহুমূল হইতে আরম্ভ হইয়া উর্ধ্বমালা একাঙ পক্ষধয়ের ত্রায় ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত জলকে ব্যাপিল। জোতে উপকূলে নবীন সূর্য কমল পত্রে জলবিন্দুগুলি তেজস্বী মুক্তাফলের ত্রায় নৃত্য করিতে লাগিল। কোকনদের চিকণ দলগুলি উন্টাইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধ সূর্য

কুম্ভচয় ললিত সরল নিকটকমণালে হুলিতে লাগিল। ধৃত ভ্রমরচয় কোক-
নদের বর্ণদাদৃশ্যে লুকায়িত হইয়া নীরবে মধুশান করিতেছিল পুষ্পের হিন্দোলে
পক্ষে ভর দিয়া পুষ্পের চতুর্দিকে উড়িয়া উঠিল। প্রতিবার হিন্দোল-
বিশ্রামে পুষ্প বসিতে উপক্রম করিতে না করিতে আবার একটি ভরকে ফুগটি
কাশিয়া উঠিল, অমনি ভ্রমর নক্ষত্রবেগে প্রায় একহাত উর্দ্ধে উঠিল। আবার
স্রোতটি কমিয়া গেলেই কোকনদের নিকট হইল। এইরূপ পুষ্প হইতে
একবার দূর, একবার নিকট হইতে লাগিল। ও িকে গোবিন্দের হুতান
গঙ্গাস্রোত ে বেদোচ্চারণ শব্দে নির্জন উদ্যান ব্যাপিল। সোণানে স্রোতোভঙ্গশব্দ ও
বেদোচ্চারণশব্দে তড়গকূল কি মনেরম হইল। পুষ্করিণীর পূর্বভাগের ঘাটটি
প্রশস্ত। ঘাটের মধ্যে একটা প্রস্তরের মূর্তি। পুষ্করিণীর চতুর্কোণে চার বাড় দোলন
চাপা। ঘাটের দুইপার্শ্বে দুটা নাগেশ্বর চাপার গাছ। গাছদ্বয় নবকুম্বিত হইয়া
সমস্ত পুষ্করিণীকূল সঙ্গক্ষে আঘোদিত করিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই দুটা নীলচম্পকের
গাছ। তাহার পার্শ্বে পুষ্করিণীর কোণে দোলন চাপার পশ্চাতে চারটা চম্পকের গাছ।
পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে ইহার প্রতিরূপ। পূর্ব পাড়ের মধ্যে একটা কনক চম্পার
গাছ। পশ্চিমপাড়ে তাহার সমুখেই একটা পুষ্কচাপা। পরে উত্তর পার্শ্বে একটা
করিয়া জহরে চাপা, আর একটা করিয়া কদলীচাপা। মাঝে রামধন চাপার স্বর্ণ-
বর্ণাভ কুম্বরশি। কূলের চতুর্দিকে এক সার ভূমিচম্পকের গাছ। ঘাটের দুই
পার্শ্বে দুটা ওঁকী চাপা। চাদালের অনতিদূরে একটি পরিমিত শাখা-সমন্বিত স্নানিদ্ধ
ছায়াদ প্রকাণ্ড সরল দীর্ঘাকৃতি চালতার গাছ। পুষ্করিণীর জলে কোকনদ, অপর কোণে
কুম্ভের খেত কুম্ভ। অপর কোণে রক্ত পদ্মের মৃদন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটা পাতা
দেখা যায়। জলের চতুর্পার্শ্বে পানিশৈফালিকার ছোট ছোট শুভ্র পুষ্পচয়। ঘাটের
উপরটি মধুক্ষরের শামলপর্ণের কুটীর আবৃত।

স্নানবিহিত পূজা সমাপনে গোবিন্দ নিকটস্থ প্রস্তুতিত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল।
এ দিকে বরদাকর্ষ স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিল। শুভ্রবর্ণ পট বস্ত্র পরিধান করিল।
পট বস্ত্রের উত্তরীয় বাম স্বঙ্গে রাখিল। বরদাকর্ষ কি অনির্বচনীয় মৌম্য মূর্তি ধারণ
করিল। দীর্ঘাকার, মাংসল, আজ্ঞাসুলবিত, বলিষ্ঠ, আলম্বমান বৃহৎ। প্রশস্ত
ললাট। বিশাল উন্নত বক্ষ ক্রমে কটিনেশ হইতে প্রশস্ত হইয়াছে। উচ্চ ললাটের
নীচের পটলাকৃত নেত্রদ্বয় কমলকর্ণিকার হ্রায় গোল কণোলদেশ হইতে ঈষৎ বহির্গত
হইয়াছে। তাহা মধ্যস্থ-বিম্বরূপী স্থ্যের প্রচণ্ড আলোকহইতে উপরের পত্রদ্বয় অর্ধ
মুদ্রিত হইয়া অবরণ করিতেছে। পুত মুখের উজ্জ্বলশ্যাম বর্ণের মধ্যে অকীর্ণ আরক্ত-
বর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের আভা বঙ্কিত হইয়াছে। বরদাকর্ষের মূর্তি দেখিলে সত্যকালের ঐষি

বোধ হয়। ফুল বামস্তক হইতে খেতবর্ণের বজ্রোপবীত দক্ষিণ জাহ্নুমুল পর্যন্ত লম্বিত আছে। কাহ্ন-ফুলভিলক বরদাকর্ষ যেন জনকরাজর্ধির মত প্রভা বিতরণ করিতেছে। দেখিলেই এককালে প্রছার উদয় হয়। ক্ষণে ক্ষণে বেগোচ্চারণ করিতে করিতে উদ্যানস্থ রম্যহর্ষ্যে প্রবেশ করিল। সেটি উচ্চ পোতার একতলা ঘর। উদ্যানের প্রায় মধ্যভাগে থাকায় বিস্তৃত সোপান গিরির উপর যেন কৈলাসালয় শোভিয়াছে। অভ্যুচ্চ, ফুল, কুর্শপৃষ্ঠাকার স্বস্তম্ভে প্রস্তরের চতুর্কোণ বেদির উপর হইতে তুঙ্গ, সরল, সাহকার দানবোপম ভীমাকার স্তম্ভ। প্রত্যেকের মস্তকোপরি বিংশতিটি সহস্রদল কমল। তাহাদিগের শিরোনেশে লম্বমান বিশাল প্রস্তরের আশ্রয়। তাহাতে ভাস্কর আশনার শিমতার একশেষ চিহ্ন রাখিয়াছে। উদ্যানটী চমৎকার, মনোরম, অতি বিচিত্র প্রাণালিতে স্থাপিত; অটালিকার দাঁড়াইয়া দক্ষিণে দেখিলে, বাটীর নিকটস্থ কতকগুলি উচ্চ তরুর মেঘাকার বনশাখার ভিতর দিয়া সমুখস্থ বিস্তৃত মাঠ দেখা যায়। তাহার পর, দূরে বনীবর্ণ সমুদ্র দল ও কূলে খেতবর্ণ সঞ্জন উদ্ভি। মাঠে কেবল ছোট ছোট ঝোপ। সকলই প্রায় উচ্চ সমান। কাহার পর্ণগুলি চিত্রিত কাহার পর্ণ উজ্জ্বল রক্তিমাবর্ণ, ঝোপটী যেন অগ্নিময় দেখাইতেছে। কাহার দীর্ঘ দীর্ঘ পত্রগুলি আপনার ভর দহ করিতে না পারিয়া নস্ত হইয়া দীচমুখী হইয়াছে। কেহ বা দস্তে কঠিন পত্রগুলিকে উর্দ্ধমুখে রাখিয়াছে। সমীরণে সমস্ত পত্রটী হুল-ভেছে, তথাপি তাহার এক বেশ লম্ব হইতেছে না। কাহার পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার। কাহার পত্র হরিত বর্ণ। কেহ বা পুষ্পগুলিকে সুসাইয়া রাখিয়াছে। কাহার পুষ্প খেতবর্ণ, কাহার নীলবর্ণ, কাহার হরিতবর্ণ, কাহার ধূসর, কাহার পিঙ্গল, কাহার মসীবর্ণ, কাহার রক্তবর্ণ। কেহ উল্লসকাক্ষপ্রভ, কেহ ময়ূরকণ্ঠাভ, কেহ কাকপঙ্কজমিত, কেহ চন্দ্রশ্যোভি, কেহ পাংশুবর্ণের রক্ত বিন্দুতে বিচিত্রিত, কেহ বা অর্দ্ধ খেতবর্ণ ও অর্দ্ধেক হরিত বর্ণ। কাহার বৃন্ত হরিত বর্ণ, কাহার অগ্রভাগ সরস্ত, কাহার মধ্য নীল, কাহার আকার গোল, কাহার ষটাকার দল, কেহ তুরুর মত, কেহ বা, মৃৎকলিকা মত। কেহ বহুদল। কেহ সঙ্কটক, কেহ সলোম, কেহ ফুলদল। কেহ হৃৎস্বরূপ। কাহার পুষ্প সঙ্গাঙ্গ যুক্ত। কাহার দুর্গন্ধ, কাহার মধুপূর্ণ, কেহ বা শুকরস। কংবীর বেত্রাকার দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাকে হৃৎস্রাগ্র, দীর্ঘ কঠিন, শ্রামল পর্ণ মালায় বেষ্টিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে হরিত তিনটি স্বর্ণবর্ণ ত্রিকোণ বৃন্ত উঠিয়া ক্রমে বহুমুখী হইয়া উপরে বিস্তৃত হইয়াছে; তাহার শুভ্রবর্ণ কুহুমচর মধ্যে মধ্যে ঐষদ্ ক্ষুদ্র, অর্দ্ধ পত্র, ঐষদ্ প্রক্ষুটিত কলিকাসমূহ অল্প সমীরণে হুলিতেছে ও কখন কখন হুই একটি পরিণত পুষ্প ফেলিতেছে; কোথাও বা ময়ূরকণ্ঠি পুষ্প, কোথাও বা একদল পুষ্পরাশি মধ্য হইতে শূন্যের মত এক এক একটি শুভি উঠিয়াছে। অদূরে গোলাকার ঝাটির বাড়ানামা,

রত্নের পুষ্পে সুশ্ৰুতি ও তরুণুলে পরিণত পুষ্পসমাকীর্ণ, কোথাও বা কনকবর্ণ পিউলি উন্নত ষট্টাকার পুষ্পের সুদীর্ঘ ক্রীণাখা আরুত করিয়াছে, পঞ্চাং হইতে চিকণ মেঘাকার পত্রগুলি শ্বেদাবদ্ধ হইয়া শাখা আচ্ছাদন করিয়াছে। এদিকে নবমলিকার শুভ্রবর্ণ কুমুদচরে দেশের মণ্ডকরকে মোহিত করিয়াছে। নবপ্রসূত মধুর গোলা শাখা শিরে সঙ্কটক নিকটক, খেত, রক্ত, ঐষদ্ উজ্জ্বল, মানাবর্ণের চারি দল, দশ দল, বিংশতি দল, শতদল, বহুদলে সুগন্ধ, নির্গন্ধ কুহুম; কেহ বা সকল দল নিপাতিত করিয়া কেবল বোলাকার ক্ষুদ্র ফল শিরে ধরিয়াছে। কোথাও বা যুধিকার নবীন শাখাও ঐষদ্ হরিবর্ণ পর্ণচয়। কোথাও বা ধর্ম্মাকার শেফালিকার সগোমত-সুন্দরিত পর্ণরাশি। কোথাও বা পঞ্চমুখী রক্তবর্ণ জবা। এ দিকে অশোকগুচ্ছ। এ পার্শ্বে মলিকা। একটি চৌকায় কেবল জাতি তরুচর ও পার্শ্বে তরু তরুর বেত পুষ্প, তাহার অব্যবহিত পরেই ভদ্র-জগর চতুর্দল রক্তপুষ্প। মধ্যে গন্ধরাজের বোপ। পূর্বে কামিনীর কমনীর পর্ণ-শোভিত তরু। কোথাও বা রাধাপত্রের বনের মধ্যে রত্নপত্রের গুচ্ছ। কোথাও বা কৃষ্ণ-কেলির বাড়ি। কোন স্থানে কুন্দদল। কোথাও বা কৃষ্ণচূড়া। প্রভিশুশ্পের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন আকার। নানাজাতি পুষ্পের ঘন। তাহার মধ্য দিয়া বক্র, প্রশস্ত, প্রশস্ত পথ। কোন পথে কেবল কঙ্কর দেওয়া, কোথাও বা কেবল হর্ম্মির চট, কাহার পার্শ্বে রজনীগন্ধার সারী, কোথাও বা রান্ধাটি পরিচার, চিকণ প্রস্তরখণ্ডে জড়িত। মাঠের কোন ভাগ উচ্চ, কোন ভাগ নীচ। কোথাও বা একটি সরল খালের দুই ধারে বড় বড় আম্র, অশোক, তামল, চম্পক প্রভৃতি ঘন তরুতে আরুত। কিছুদূর এইরূপে সরল বাগিয়া নিলটি এককালে বাকিয়াছে। সেই বাকের কাছে বোধ হয় নিলটির শেষ, কিন্তু নিকটে গেলেই বন্ধক ঝিলের প্রবাহ প্রবাহ কেবল খাত্তজের মধ্য দিয়া কিছু দূর গিয়া এককালে আবার নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়াছে। ঝিলে নৌঘানে বাইরে বোধ হয় যেন তরুশাখাগুলি মাথায় লাগবে। কোথাও বা ঝিলের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে জড়িত একটি সুত্র গিরিশৃঙ্গ প্রবাহকে ধিধা করিয়াছে। কোথাও বা ঝিলের উপর দিয়া একটি প্রকাণ্ড খিলেন। খিলেন হইতে এক একটা প্রস্তর নীচে, পার্শ্বে বাহির হইয়া গিয়াছে; বোধ হয় যেন সেটি গিরিশৃঙ্গ। তাহার উপর স্বাতি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ। সেই খিলেনের মধ্য দিয়া স্রোত অতি বলে নির্গত হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব বাহিয়া এককালে অতি গভীর স্থানে পড়িয়াছে। সে স্থানে দিবা-রাত্রি জলকল্লোল একটি অদিকর্ষনীয় বারণার বাক্য শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। দিবা-রাত্রি স্রোতগভীর জলপাতে কেনরাশি জমিয়াছে। সে স্থান হইতে জল অতিবেগে বাহিয়া চলিয়াছে। ক্রমে শর ও হোগলা ও নল বনে বিস্তৃত হইয়া কিছুকণ এক কালে ময়নের অগোচর হইয়াছে। সেখানে ছোট ছোট নানাবর্ণের সালুক ফুটিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে দোলায় মোটা শাখা সব দেখা যাইতেছে। এই বিগটি অতিক্রম করিলেই, বোলের জল সব একত্রিত হইয়া একটি খাল দিয়া বাহির হইয়া সমুদ্রতীরে শতখা বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপে সাগরে মিশাইয়াছে। অট্টালিকার অনাওদূরে দক্ষিণে প্রকাণ্ড বাউ, অখণ্ড, বট, চাম্পা, কদম্ব, দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ, বিশাল শাখা সমন্বিত উল্লবর। বাটীর উত্তরে কেবল পুষ্পোদ্যান। পূর্বে ও পশ্চিমে সেইরূপ! বাটী হইতে বহুদূরে পূর্বে ও পশ্চিমে দিকে অস্পষ্ট ক'লর বড় বড় গাছ দেখা যায়। কোথাও নানাবিধ বাঁশঝাড়ও আছে। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে মানো মানো গাছের ছায়া দিয়া বাইবার নানাবিধ পথ। কোথাও বা কেবল মাধবীপতীর গুচ্ছ, তলা দিয়া যাইতে বিন্দু বিন্দু মধু বর্ষণ হইতেছে, তাহার পর সমীরণে পুষ্প-রেণুতে শরীর ধূসরিত হইতেছে। বকুল উল্লসল পুষ্পপাতে আকীর্ণ। গন্ধে চতুর্দিক্ মত্ত! কোথাও বা শালবন, হিদেশহ ভূমিতে জমিয়াছে বলিয়া থকাকৃত; গন্ধ পুষ্পে মধুর গুঞ্জ ধ্বনি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মুচকুন্দের শুক পুষ্পে তরুণ আবৃত ও গন্ধে দশদিক্ পূর্ণ। কোথাও বা নাগকেশর। এদিকে অশোক নবপল্লব আরম্ভবর্ণ পুষ্পে সুতরুচয় শোভি-
 য়াছে। তরুতলে দিব্য মনোরম পথ। পথের ধারে আহা এক এমটি প্রস্তরের মূর্তি যেন বিধকর্ম্মার গঠন; কি ভাবগুচ্ছ! কোথাও বা দশবাটিকার (১) বন রোপিত গাছের মধ্যে এক প্রস্তরের সরস্বতী। কোথাও বা এক খাঁর কুটীর মধ্যে যোগাসনে আসীন কাঠের ঋষিমূর্তি। হয়ত কোন কুরঙ্গিনী নৃত্য করিতে করিতে সেই আশ্রমের মালতী লতার নব পত্রগুলি চর্কণ করিতেছে। হয়ত একটী ঋষিরূপের উচ্চ শাখা হইতে দীর্ঘ পৃচ্ছবিশিষ্ট ময়ূর কেঁকরব করিয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করিল। এক দিকে একটী ভূপোবনের অশুকল। অনুকল্পই বা কেন? সেই দিব্য পর্ণশালা, সেই মত্ত লতা গুল্মাদি দ্বারা আবৃত, সম্মুখে দুইটী ছোট ছোট নেবুর গাছ। তাহাদ্বয়ের মধ্যে বিভিন্ন জলযন্ত্র মন্দির, তাহার পার্শ্বে ছোট আশ্রয় বৃক্ষ, তাহার ব'মে এমটি রত্নপেয় গাছ। কুটীরের পশ্চাৎ ভাগে একটী খাঁর গাছ। তাহার দক্ষিণে এমটি অর্ক ওরু ও বিছু দূরে একটী বৃহৎ শলী বৃক্ষ। তাহার কিঞ্চিং অন্তরে একটী পলাশ। পলাশ বক্ষর মূল দিয়া একটী হৃদয় পথ বহিয়া অভিদূরে বিব বৃক্ষচয়ে লুক্কায়িত একটী অতি ক্ষুদ্র শিবমন্দির। মন্দিরের দুই পার্শ্বে কনক ধূতুরা নান্যমুখী পুষ্পচয় ধরিয়া আছে। দেউলের সম্মুখে একটী বহুকালের পুরাতন অর্ক বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে চিত্রিত মৃগ সব চরিতেছে। শিবালয়ের পশ্চাতে বহু প্রকাণ্ড বরচয়ের নীচে দিয়া গেলেই একটী প্রকাণ্ড মাঠে পড়িতে হয়। তাহার চতুর্দিকে আর কিছুই দেখা যায় না কেবল বন

বৃক্ষ বল । মার্চের চতুঃদীয় দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেলের গাছ ও গাছঘরের মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রান্তরের মূর্তি । মাঠটি অতিবহ্নে কেবল দুর্কীচয়ে আবৃত । শ্রামল প্রান্তা দেখিলে নয়ন এককালে স্নিগ্ধ হয় ।

বরদাকর্ষ অটালিকায় উপস্থিত হইয়া এককালে আহারের স্বরে গিয়া আহারে বসিলেন । আহারান্তে বিধিপূরক হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্রপরিবর্তন করিলে এক জন দাস অসিয়া অতি কোমল স্নিগ্ধ জলপূর্ণ নারিকেল অসিয়া ঐহাকে দিল । তিনি নারিকেলের স্নিগ্ধকর স্রুতার বারিপানের পর হস্তমৌ ঘাঘা মুখ শুদ্ধ করিলেন । পরে অপর এক স্বরে প্রবেশ করিলেন । সেটী তাঁহার পাঠের স্বর, সমস্ত স্বরটী জোড় কোমল উর্গর আসন বিস্তৃত । চতুষ্পার্শ্বে আছাদপর্ধ্যস্ত পুস্তক পূর্ণ তাক । তাহার কেবল বস্ত্র বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বস্ত্রাবৃত পৃথি । বরদাকর্ষ সেই স্বরে গিয়া দক্ষিণ দিকের থাকের নিকট দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন ; পরে একখানি পৃথি লইয়া আনে বসিলেন । কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া পুস্তক হাতে লইয়া উদ্যানে নামিলেন । অটলিকার নিকটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পচয়, নানা রঙ্গের পুষ্প ভূমি আশ্রিত কিছুক্ষণে পূর্ণায় হইয়া পুষ্পবন দিয়া ক্রমে পুষ্পোদ্যানের প্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । দেখেন একটী নির্জন স্থানে গাছের নীচে প্রায় পঁচিশটী ছাত্তরে পুচ্ছ নাড়িয়া কিচ বিচ করে ডাকিতেছে ও থপ থপ করে লাফাইতেছে । বরদাকর্ষকে অগম্য হইতে দেখিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দূরে গেল, ক্রমে বরদাকর্ষ ছায়া দিয়া যাইতে লাগিল । বৃহৎ আত্মভালে বসিয়া একটী ঘূষ গম্বীর স্বরে ডাকিতেছে । অপর দিকে শাখাবনের মধ্যে বসে একটী বুল বুল ডাকিয়া নীরব হইল । দূরে চম্পাতীরে দোলনের কোপে বসে কুবো পাখি বিকট গম্বীর স্বরে বুব বুব করিতেছে । একটী নারিকেলের গাছে দীর্ঘচকু কঠোরাকরা সূতীক্ষু দীর্ঘ ডাক ডাকিয়া ঘূষিয়া গাছের অপর দিকে গেল । একটী ময়ূর গাছের শাখায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে চক্ষুঘর কাক করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে । তাহার দীর্ঘপুচ্ছ শাখার নীচে নামিয়াছে তাহা প্ৰজাত্যন্তর দিয়া রবিরশ্মি প্রভাতে সুন্দর হইয়াছে । গাছের উপর পরগাছা । কেহ অপ্রশস্ত দীর্ঘ পত্রধারণ করিয়াছে, তাহার উর্দ্ধস্থ স্থধাকিরণ তাহার স্বরশ্রাব্য পর্ব দিয়া দেখা যাইতেছে, শোথ হয় যেন ঐবদ্ হরিৎ বর্ণ কাচের পত্র । গাছের ক্ষুদ্র উপশাখায় একটী বসন্তবিহারি প্রতি পলে চমৎকার স্বরে ডাকিতেছে । সে তরুণল কি রমণীয় । বরদাকর্ষ তাহার মধ্য দিয়া বুটীরে গিয়া বসিলেন । আপনায় হস্তস্থ পৃথি ধালি খুলিলেন কিন্তু মনের চাকল্য বশত তাহা পার্শ্বে গনোনিবেশে অক্ষম হইলেন । একমনে কেবল অরুণকীর বিষয় ভাবিতে লাগিলেন । এই অবস্থায় কতক্ষণ রহিলেন, সময় আর অতিবাহিত হয় না । নিতান্ত অস্থির হইয়া থা হইতে উঠিলেন

ও উদ্যানরক্ষকের ঘরে বাইয়া একটি নিড়ান লইয়া কুটারের দ্বারস্থ তৃণচর পত্নিকার করিতে নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বরদাকর্ষ গোবিন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। “গোবিন্দ কুশল সমাচার বল। পিতার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার কথা কি উত্থাপন করিয়াছিল। তিনি কি তাহাতে মত দিলেন। অরুন্ধতীর কি হইল। আমি আহার করিয়া সুস্থ হইতে পারি নাই। আমার কেমন চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। আমি একবার অরুন্ধতীর নিকট বাইব মনে করিতেছিলাম আবার ভাবিলাম, বুঝি তাহার এখনও আহার হয় নাই।”

গোবিন্দ বলিল। “আমি কর্ত্তা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার কথায় বোধ হইল, অরুন্ধতীর প্রতি তাঁহার দয়া হইয়াছে। কিন্তু লোকাপবাদ ভয় করিয়া তাহাকে আপন ঘরে আনিতে পারিতেছেন না। একবার সাহাবাগপুরে লোক পাঠাইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ও সেখাকার কুটুম্বদিগের মত জানিতে মানস করিতে-ছেন। আবার অরুন্ধতীর অজ্ঞাতবাস পাছে প্রকাশ পায় তাহাও ভাবিতেছেন।”

বরদাকর্ষ বলিল। “আমার আর একটি চিন্তা আছে।”

গোবিন্দ বলিল। “কিসের চিন্তা?”

বরদা বলিল। “আমি অরুন্ধতীকে নীড় না পাইলে বোধ হয় ক্ষিপ্ত হইব। আমার কেন বিষয়ে মন বাইতেছে না। আমি দিব্যরাত্রি কেবল অরুন্ধতীরূপী চিন্তা করিতেছি আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।”

গোবিন্দ বলিল। “তোমার এত ব্যাকুল হওয়া অস্বাভাবিক। অমুপরাধের আরাধন হইতে আসা অবধি তোমার অরুন্ধতীর সঙ্গে আলাপ। এত অল্প সময়ে যে অধিক প্রেম জন্মান অতি অসম্ভব।”

বরদা বলিল। “গোবিন্দ তুমি বিজ্ঞ হইয়া কেন অবোধের মত বলিলে। লোকের একদিনের মিলনে প্রেম জন্মিতে পারে, আমার সঙ্গে অরুন্ধতীর আলাপ আজ প্রায় এক বৎসর।”

গোবিন্দ বলিল। “এক বৎসর কিছু অধিক কাল নহে।”

বরদা বলিল। “আমার চক্ষে এক দণ্ড বড় দিন বোধ হইতেছে। ভাল পিতার সঙ্গে তোমার কি কথা হইল?”

গোবিন্দ বলিল। “আমি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলাম, মহাশয়! অরুন্ধতীর নৃহৎ দ্রব্যাদি সমস্ত পৌঁছিয়া গিয়া গ্রামে গিয়াছিল। এতকণে বোধ হয় তাঁহার আহার হইয়া থাকিবে। তাহাতে তিনি বলিলেন। ‘গোবিন্দ! আমি অরুন্ধতীর নৃহৎ আর দেখিতে পারি না। সে রাজকন্যা যে অপাকে আহার করিবে, তাহা আমার

সব হয় না।’ তাহাতে আমি বলিলাম, ‘মহাশয়! কলম করিলেই তাহাকে কষ্ট হইতে পশ্চিভ্রাণ করিতে পারেন।’ তিনি উত্তর করিলেন ‘আমার কি অধিকার আছে?’ আমি বলিলাম। ‘কেল আপনি তাহাকে আপন ঘরে আনিতে পারেন।’ তিনি আমার কথাই শিহরিলেন ও বলিলেন। ‘গোবিন্দ তুমি অবিবেচকের মত কেন বলিলে, আমি কি অরুদ্ধতীকে আপন ঘৃহে আনার দিয়া আপনায় জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইব? আমি হইতে তাহা হইবেক না।’

বরদাকর্ষ তাহার এই কথাটি শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, ‘কেল তুমি আমার কথা বলিতে পারিলে না।’

গোবিন্দ বলিল। ‘আমি বলিয়াছিলাম।’

বরদা বলিল। ‘তাহাতে পিতা মহাশয় কি উত্তর করিলেন?’

গোবিন্দ বলিল। ‘তিনি প্রথমে আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না; কেবল বলিতে লাগিলেন, ‘আমি হইতে তাহা হইবেক না। আমি কখন কুটুম্ব মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারিব না।’ আমি আমার বলাতে বলিলেন। ‘বরদাকর্ষকে ইহা কে বলিল? সে কিমতে জানিল?’

বরদাকর্ষ বলিল। ‘তুমি তাহাতে কি উত্তর দিলে?’

গোবিন্দ বলিল। ‘আমি বলিলাম। বোধ করি অরুদ্ধতী তাহাকে বলিয়া থাকিবেন, সতুবা তিনি কি মতে অবগত হইলেন।’

বরদা বলিল। ‘তুমি বলিলে না কেন যে, আমি তাহার সকল সমাচার রাখি। আমার অজানত অরুদ্ধতী কোন কর্মই করেন না।’

গোবিন্দ বলিল। ‘আমি অত স্পষ্ট বলিতে সাহস করিলাম না। আমি বলিলাম, বরদাকর্ষ বিশেষ স্ত্রী না হইয়া কখনই এরূপ বলিতে পারে না। এমন সময় দেওয়ানজি মহাশয় আসিলে কর্ত্তামহাশয় বলিলেন ‘ভাল, কেশব! তুমি অরুদ্ধতীর বিষয়ে কি পরামর্শ দাও?’ কেশব উত্তর দিলেন। ‘মহাশয় আমার মতে এ বিষয়ে সাহাবাজহু আপনায় আত্মীয় কুটুম্বদিগের মত আনান উচিত ও ভদ্র হইবেক। ইতিমধ্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে।’ কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন। ‘তবে তাহাই ভাল। এক্ষণেই পত্র পাঠাও।’ দেওয়ানজি বলিলেন। ‘হুই ঘটায় মধ্যে সেনেবার পত্র পৌছিবে। পরে তাহার সকল একত্রিত হইয়া সদয় মতে উত্তর পাঠাইবেন।’ কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন। ‘আমার পরস্পর-শ্রদ্ধা গৃহিণী অন্য অরুদ্ধতীকে আমার সঙ্গে দেখিয়া আমার অরুদ্ধতীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও কতই ভৎসিলেন। আমার অরুদ্ধতীকে যঃস আনাও দার।’

বরদা বলিল। “তবে কি সাহাবাজে পত্র পাঠান হইয়াছে?”

গোবিন্দ বলিল। “হাঁ। ভজহরি পত্র লইয়া গিয়াছে।”

বরদা বলিল। “পত্রে কি লেখা আছে তাহা জান?”

গোবিন্দ বলিল। “পত্রে সংসর্গসন্দেহের প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হইয়াছে।”

বরদা বলিল। তবে ত “অরুন্ধতী আমার হইবে না। কৃতপ্রায়শ্চিত্ত কন্যা গ্রহণ ধর্ম্মত অবৈধ নহে বটে, কিন্তু লৌকিক অপবাদে হয় ত পিতা মহাশয় কখনই সম্মত হইবেন না।”

গোবিন্দ বলিল। “আমার তাহাতে সমূহ সন্দেহ আছে।”

বরদা বলিল। “আমার কথা কি তাঁহার বিশ্বাস হইল না।”

গোবিন্দ বলিল। “তিনি তাহাও লিখিয়াছেন যে, একের বাক্যে কথাটি অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর দ্বার পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই।”

বরদা বলিল। “ইহার উত্তর কতদিনে আসিবার সম্ভাবনা?”

গোবিন্দ বলিল। “যোধ করি তিন চার দিনের মধ্যে আসিবে।”

বরদা বলিল। “ভাল ভূমি তবে এক্ষণে যাও, সাংকালে আমার সঙ্গে এই স্থানেই সাক্ষাৎ করিও।” গোবিন্দ স্বীকার পাইয়া চলিয়া গেল। বরদা কিছুক্ষণ ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন ও পদে পদে চন্দ্রব্রেক্ষা কুঞ্জ পার হইলেন। রাজমার্গ দিয়া আপনার গোশালাভিমুখে চলিলেন।

নবম অধ্যায়।

“ক ঈদ্রিস্তথস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পরশ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।”

এদিকে অরুন্ধতী বরদার গমনের পর অঙ্গে অঙ্গে আপন-পর্য্যন্ত হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া পাকাদি সমাপন করিলেন ও আহা হাতে আপন বসিবার বরে গিয়া একান্ত চিন্তে আপনার ভূত সুখ ও বর্তমান দাসীবৃত্তি ও নিরাশ ভাবী চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পপরিমিত নৃশংসচরিত্রকে কতই দূষিলেন। গজালিসের ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথের দ্বায় কৃতজ্ঞতাভ্রুতে বক্সহল আশ্রয়িত করিলেন ও বরদা-কর্ত্তের নিরীহ পবিত্র প্রেমের লোচনের সাহস্বারে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শূন্য মন বরদাকর্ত্তকে সর্ব্বোৎকর্ষিত জ্ঞান করিয়া সংসারমায়ার আবদ্ধ হইল। আত্মীয় কুটুম্বের অভাব ভয় হইতে অপনত হইল। ক্ষণকালের জন্ত তিনি সকলই বিস্মৃত

হইলেন। কেবল বরদাকর্ষের মুখশ্রী, অনুশম বহু, তাঁহার আপহৃদ্যরণে অশ্রু-
অধাবসার ও ভীম বল, শত্রুদ্বারে কঠিন পণ, অনিবার প্রেমবারিবর্ষণে অসহ শোকানল
নাশ ও সিক্তিত স্থাভূতের বিগুণ উন্নতি, তাঁহার মনকে ব্যাপিল। আবার ক্রণেকে
অনুপমার চাতুরী ও গঙ্গালিসের ভুবনবিখ্যাত নিষ্ঠুরতা, য়েচ্ছধর্মের খাদ্যাখাদ্য
অধিচার, জাভিলোপ, বিবাহে পিঙাবাধ, ফিরিজির বিপরীত অত্যাগ, অবৈধ আচার
ও দৃঢ়বদ্ধ সঙ্কুচিতবেশ অরুদ্বীতির মনকে এককালে অবসন্ন করিল। যদিচ অরুদ্বীতির
একশ্রেণে সংসারে বরদাকর্ষ ভিন্ন স্নেহপাত্র আর কেহ ছিলই না ও তিনি আপনিও
বরদাকর্ষ ব্যতীত আর কাহারও স্নেহাস্পদ ছিলেন না; তথাপি এই সকল ভাব তাঁহার
মনে উদ্ভিত হইলে তিনি বোধ করিতেন যে, গঙ্গালিসের অধীনা হইলে যেন এ সংসার
হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, কেহই তাঁহাকে আর বহু করিবে না, সকলেই তাঁহাকে
অপকৃষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিবে।

দুঃখিনী অরুদ্বীতি কত ব্যবসিত হয়ে সম্ভাবিত দুঃখ সব কল্পনা করিলেন ও কি
আগ্রহাভিশরে ইচ্ছা করিলেন যেন সে সব ঘটনা না উপস্থিত হয়। মনে মনে পণ
করিলেন, কাত্যবদ্ধ হইব, প্রাণ পর্যন্ত দিব, তথাপি স্বধম ত্যাগ করিব না ও মনোনীত
বরদাকর্ষ ত্যাগে অগ্র কাহাকেও প্রেমাস্পদ করিব না। একবার তাঁহার তাক্ত দেশের
কথা মনে পড়িল। অমনি তাঁহার হৃৎ চক্ষু দিয়া বারিধারা পড়িল। তিনি
বিষয় হইয়া একবার ‘হা বিধাতঃ!’ বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অমনি তাঁহার
কোমল মন আর সহ্য করিতে পারিল না। তাঁহার বক্ষঃস্থলে যেন বিষস্তর ঐস্তর চাপিল।
তাঁহার খাস রোধ হইল। অমনি তাঁহার ন্নান মুখটি বক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িল।
যেন ছিন্নমূল সন্তপ্ত পদ্মের মত বিষয় হইল। তাঁহার নিতম্বতার তাঁহাকে আর স্থির
রাখিতে পারিল না। তিনি অমনি টলিয়া পড়িলেন। একাকিনী অনাখিনী প্রায়
হুর্ভাগা অরুদ্বীতি কতক্ষণ এরূপ পড়িয়াছিলেন, তাহা কেহই জানে না। মুচ্ছাবিহা
হইতে ক্ষেমে প্রতিভা হইলে তিনি একবার নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখেন যে, জ্বলন্ত-
বলন্ত বরদাকর্ষ তাঁহার মুখে স্থলীতল বারি সিকিয়া চামর লইয়া স্বয়ং অঙ্গে অঙ্গে
হুলাইতেছেন। চক্ষু চাহিতে বরদাকর্ষ অমনি বলিয়া উঠিল। “অরুদ্বীতি! এ
আমি তোমার বরদাকর্ষ” কিন্তু অরুদ্বীতি উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় আবার
মুক্ত হইল। আবার চেতনাবিহীন হইলেন। বরদাকর্ষ বাপ্পাকুলিত নয়নে তাঁহার
মুখের দিকে অধীর হইয়া দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার মুখে স্থলীতল
বারি সেচিলেন ও চামর ঢুলাইলেন। অরুদ্বীতির স্থির মলিন মুখ যেন বিন্দু বিন্দু
জ্বারসিক্ত বিকশিতোমুখ কমলের দ্যায় দেখাইল। কতক্ষণে অরুদ্বীতি আবার চক্ষু
চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু পুনরায় অচেতন হইলেন। আচ্ছা বরদাকর্ষের কি বিষয়

কষ্ট হইতে লাগিল। প্রতিবার নয়নোন্মীলনে তাঁহার মন আশাতে পুরিয়া উঠিল। আবার অব্যবহিত পরেই বেন উন্মূলিত হইল। কতক্ষণের ক্ষণস্থায় পর অরুণভী আবার ক্রমে ক্রমে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন। বরদাকর্ণের হৃদয় হইতে বেন বন অন্ধকার বালার দৃষ্টিতে অপহৃত হইল। বেন এত ক্ষণের পর বরদাকর্ণের নয়নে দিবার আলোক লাগিল। বরদাকর্ণ বেন এতক্ষণ পরে সংসারে পশিলেন। অরুণভী সঙ্গে হস্ত বিস্তারিলেন। বাকুশক্তি নাই, ইঙ্গিত করিলেন। বরদাকর্ণ আপনার হস্তে অরুণভীর মুহু মুহু করতলটি ধরিলে সুখস্পর্শে তাঁহার শরীর লোমাক্রান্ত হইল। অরুণভী বহুক্ষণ মৌন দৃষ্টি করিয়া বলিলেন “বরদা! তুমি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছ।”

বরদাকর্ণ বলিল। “প্রায় দশের অধিক আসিয়া তোমাকে অচেতন দেখিলাম। তুমি ছিন্নমূল তরুর স্থায় ভূমিশস্যার পতিতা আছ। তোমার কণ ধরিয়া তোমাকে তাকিলাম, উত্তর পাইলাম না। তোমার সর্কাস্ত শিথিল দেখিলাম। গুরু বন বন নিখাসে বুঝিলাম, তোমার মন স্থির নাই, হৃৎখে অচেতন হইয়াছে। ক্রতপদে অপর গৃহ হইতে জল আনিলাম। তোমার নৈত্রে ও ললাটে সেচিলাম। চান্দর লইয়া ব্যজন করিলাম। তাহাতেও তোমাকে স্পন্দরহিত দেখিয়া অজ্ঞাত ভীত হইলাম। অপর স্বর হইতে শব্দা আসিয়া তোমাকে মন্দে শকার শয়ান করিলাম। তোমার মুখে আবার জল দিলাম, তুমি তখনও অচেতন। কতক্ষণ ব্যয় সেকন্দের পর তুমি একবার নয়নোন্মীলন করিলে। আনন্দে আমার মন ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু বিধাতা কি নির্ভর, নিমেষে তুমি আবার অভিভূত হইলে। এইরূপ হুই ভিলবারে তোমায় ইন্দির সকল ক্রমে অবল প্রাপ্ত হইলে তুমি এবার চাহিয়াছ। আর মরল বুজাইও না। আমি তোমাকে সে অবস্থার আর দেখিতে পারিব না। পুনর্ব্যায় সেরূপ হইলে আমিও সংজ্ঞাহীন হইব। অরুণভী অস্থির হইও না।”

অরুণভী ক্রমে গাত্রোখান করিয়া বলিল। “বরদা আমার উপায় কি চিন্তিলে। আমার আবার একটি আশঙ্কা হইতেছে। বখন অহুপারাম ও গঙ্গালিস সনসীপে একত্রে মিলিবে, তখন গঙ্গালিসের স্বরে আমাকে দেখিবে না। কেমাকে দেখিয়া গঙ্গালিসকে আমার সমাচার জিজ্ঞাসা করিবে। তবেই ও গঙ্গালিসের জন্ম দূর হইবে। তবেই ও তাহার চক্ষু ফুটিবে। কেমাকে পীড়ন করিলেই সরলা কেমা সব বলিয়া দিবে।”

বরদা বলিল। “আমার এ চিন্তাটি হয় নাই। এক্ষণে আমি বুঝিতেছি যথেষ্ট বিপদ উপস্থিত, কি করা কর্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি চতুর্দিক শূন্য দেখিতেছি।”

অরুন্ধতী বলিল। “বৈদ্যনাথ কি আমাকে অগ্রহ দিবেন না।”

বরদাকর্ষ বলিল। “তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। এক্ষণে কিছু ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আর আমিও প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িব না।”

অরুন্ধতী বলিল। “অনুপ তোমাদিগের নিকট থাকিতে দিবে না। গঙ্গালিসও পারভপক্ষে ক্ষেমায়া সম্ভট হইবে না।”

বরদা বলিল। “চিন্তিত হইও না। আমি তোমায় ত্যাগ করিব না। আমি এক্ষণেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও তাঁহার চরণ ধরিব।”

অরুন্ধতী বলিল। “বরদা আমি তোমারই। তোমায় আর কি বলিব, আমাকে রক্ষা কর।” অরুন্ধতীর করুণ বাক্যে বরদা এককালে দ্রবীভূত হইলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন; ‘এখন পিতাকে গিয়া সব বলিব ও ধেরূপে হয় অরুন্ধতীরক্ষণে তাঁহার মত করাইব। তিনি একান্ত অমৃত করেন, আমি নিজেই সাধ্যমতে ত্রুটি করিব না।’ বরদাকর্ষ স্বভাবত অত্যন্ত পিতৃহস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অরুন্ধতীর প্রেম এত বলবান হইল যে, তাঁহার কর্তব্য কর্মেও অযত্ন হইতে লাগিল।”

বরদা বলিল। “সে চিন্তায় তোমার প্রয়োজন নাই। অনুপরামের এমত অগ্রাহ্য-চরণে সাহস হইবে না। এক্ষণে আমি যাই, দেখি পিতার কি মত।”

বরদাকর্ষ গাত্রোত্থান করিলে অরুন্ধতী তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি ধরিয়া যত্নে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে নীরব দৃষ্টি বত কথাই বলিল, কত বুঝাইল। বরদাকর্ষ দুই চক্ষে তাহা তুলিলেন ও চক্ষেই তাহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সাহস পানে প্রতিজ্ঞা করিলেন। চক্ষে চক্ষেই কথা হইল, তাহা সেই প্রেমিকযুগলই বুঝিল। কিছুক্ষণ পরে বরদাকর্ষ অরুন্ধতীর গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন ও চিন্তা করিতে করতে প্রাঙ্গণ পার হইয়া মাঠে পড়িলেন, দেখেন তাঁহার পিতা সেই দিকে আসিতেছেন। বরদাকর্ষ বৈদ্যনাথকে দেখিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। বৈদ্যনাথ নিকটস্থ হইয়া বলিলেন। “বরদা কি গোশালা হইতে আসিতেছ, অরুন্ধতীকে দেখিয়াছ? তিনি কোথায়?”

বরদা বলিল। “আমি অরুন্ধতীকে তাহার ঘরে রাখিয়া আসিতেছি, মহাশয় কি সেইখানে ঘাইবেন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “হাঁ আমি একবার অরুন্ধতী কেমন আছেন দেখিয়া আসি।”

বৈদ্যনাথ অগ্রসর হইলে বরদাকর্ষ তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়া বলিলেন। “অরুন্ধতী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। মুচ্ছিত হইয়া ছিলেন। আপনি কি কিছু স্থির করিয়াছেন। অরুন্ধতীকে আমাদিগের ঘরে লইয়া গেলেন হয় না?”

বৈদ্যনাথ এতক্ষণ বরদাকর্ণের কথা নিরুত্তরে শুনিতেছিলেন যেরে লইয়া বাইবার কথায় এক কালে জলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “যেরে লইয়া গেলে আপনাদিগকে যের ছাড়িয়া স্থানান্তরে ঝাইতে হয়। ফিরিঙ্গীর স্ত্রীকে কিরূপে যেরে লইয়া বাই। আমি অরুদ্ধতীর প্রশ্ন কি আত্মীয় কুটুম্বসকলকে ত্যাগ করিব?”

বরদাকর্ণ বলিল। “অরুদ্ধতী ফিরিঙ্গীর স্ত্রী কিসে? আর আমাদিগকেই বা জ্ঞাতি কুটুম্বের ত্যাগ করিবে কেন? আমরা অনাথা রাজকন্তাকে দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিলে কোন ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করা হইল না।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “সেটি তোমার কথাশ্রম্যাপ কিন্তু গ্রামের কেন জানে যে অরুদ্ধতী পতিভা হইয়াছে।”

বরদা বলিল। “মহাশয় নির্দোষীর অপবাদ ক্ষণস্থায়ী। অনুপরাম ও গঙ্গালিস আসিলেই তাহাদিগের মুখেই প্রকাশ পাইবে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “ভাল সেই সময়েই বিবেচনা করা যাইবে।”

বরদাকর্ণ মনে মনে কত কথাই বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না। পিতাকে গোষ্ঠবরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনি প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। ফিরিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোবিন্দ বলিল। ‘তুমি কি আবার অরুদ্ধতীর নিকটে গিয়াছিলে?’

বরদা বলিল। “আমি তাহার সঙ্গে ছাড়িলেই আমার মন কেমন করিয়া উঠে। পিতামহাশয়ের সঙ্গে গোষ্ঠবরে সাক্ষাৎ হইল। তাহার কিছু বিরক্তি দেখিলাম। আমি ও আর এ অবস্থায় থাকিতে পারি না। আর একবার দেখিব, পিতার কি মত হয়, পরে আপনার চেষ্টায় নিযুক্ত হইব।”

গোবিন্দ বলিল। “তোমার চেষ্টা কি?”

বরদা বলিল। “যদি পিতা আশ্রয় দিতে অনিচ্ছা করেন, তবে অরুদ্ধতীকে লইয়া দিল্লীখবের আশ্রয় লইব। শুনিতেছি মানসিংহ এক্ষণে বর্ধমানে আছেন, আমি তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিব। হিন্দু-শ্রেষ্ঠ মানসিংহ কখন যেক্ষণে বলপূর্বক অরুদ্ধতী হরণে দিবেন না।”

গোবিন্দ বলিল। “তাহা হইলে কর্তা মহাশয় আপনার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন।”

বরদা বলিল। “অকারণ ক্রুদ্ধ হইলে আমি কি করিতে পারি? আমি ও কোন কুর্কর্ম করিতেছি না। অসৎ কর্ম করিতাম তবে তাহার বিরক্তির ভয় করি।”

গোবিন্দ বলিল। “এমত কর্ম করিও না। তাহা হইলে তুমি আপনাকে ভাঙ্গ করিবেন, আর কখন গৃহে লইবেন না।”

বরদা বলিল। “আমি তাঁহার মনের কষ্ট যত ভয় করি তাহার শতাংশও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতে ভয় করি না।”

গোবিন্দ বলিল। “তিনি এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।”

বরদা বলিল। “আমি তাহা জানি কিন্তু কি করি, আমার উত্তরই বিপদ। আগ্রিত অরুণতীর কষ্ট সহ হয় না।”

গোবিন্দ বলিল। ভাল এখন ত কোন বিপদই নাই, কেন অকারণ ক্লান্ত বিপদে বাধা পাও।”

বরদা বলিল। “এ কি প্রকার বিচার! অবশ্যস্ত্রাবী বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে অছেই প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য।”

গোবিন্দ বলিল। “তুমি এখনও জান না যে কি বিপদ ঘটবে। আদৌ আপন মাংত্রই নাই, এখন ছায়ায় ভীত হইয়া একটা গুরু কর্ম করা বিবেচকের কাৰ্য নহে।”

গোবিন্দ যদিচ বৈদ্যনাথের এবজন সরকার ছিল কিন্তু বহু কালের ভৃত্য, এমন কি বৈদ্যনাথের পিতার আমলে তাহার আট বৎসর বয়সে ঐ সংসারে নিযুক্ত হয়। বরদাকর্ণের আভ্যন্তর্য্য তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। বৈদ্যনাথও তাহাকে বর্ধেষ্ঠ যত্ন করিতেন; দেওয়ানকে ছাড়িয়াও গোবিন্দের সঙ্গে বিষয় কর্মে পরামর্শ করিতেন, বৈদ্যনাথের এক প্রকার সত্যান্দ ছিল। সর্বদা বৈদ্যনাথের সঙ্গে অবকাশ হইলেই সায়াংকালে একত্রে বসিত ও পাঁচরকম কথা কহিত। গোবিন্দ বরদাকর্ণকে বিশেষ স্নেহ করিত ও বরদাকর্ণের একমাত্র পরামর্শক ছিল। বরদাকর্ণও তাহার নিকট কোন কথাই গোপ্ত রাখিতেন না। বরদাকর্ণ তাহাকে সর্বদা মান্য করিতেন ও সময়ে সময়ে সমবয়স্কের মত ব্যবহার করিতেন।

বরদাকর্ণ গোবিন্দের কথায় বলিল। “তবে যতক্ষণ না বিপদ আসিয়া বাড়ে চাপিবে ও উদ্ধারোপায় এককালে অসম্ভব হইবে, ততক্ষণ জড়পদার্থের মত বসিয়া থাকিব। সেটি আমা হইতে হইবে না, সে সব তোমার মত অলস, নিরুদ্যম লোকের কর্ম।”

গোবিন্দ বলিল। “তুমি বালক তোমার বয়ঃস্বভাবচাঞ্চল্যে এত ব্যস্ত হইয়াছ। আমার বোধ হয় যে বিস্তৃত দূর্য্য তোমার এরূপ চিন্তার একমাত্র মূল নহে। ভিতরে আরও কিছু আছে।”

বরদা বলিল। “আর কি থাকিতে পারে? আর যদিচ থাকে তাহাও কিছু কুনিমিত্ত নহে।”

গোবিন্দ বলিল। “তবে কেন শুদ্ধ দণ্ডার উপর এত ভর দিয়া প্রতিভাস (১) করি-
তেছ। ‘স্পষ্টই বল না যে তোমার অরুদ্ধতী লাভ করিতে বিলম্ব সহে না।’”

বরদাকর্ষ কিছু লজ্জিত হইয়া ঈশ্বদ্ হালিয়া বলিল। “যদি তাহা বলিলেই তোমার
মনঃপুত হয় তবে তাহাই।”

গোবিন্দ বলিল। অরুদ্ধতীর ফলে, তত ভয়ের কারণ নাই। এক্ষণে সাহাবাজ
হইতে পত্র প্রতীক্ষা কর।”

বরদা বলিল। “সে পত্রোত্তরের বিলম্ব আমার সহে না।”

গোবিন্দ বলিল। “দেখ, যখন উভয়পক্ষেই সমান সম্ভাবনা আছে, তখন ভাড়া-
ভাড়ি করিয়া কেবল দোষের ভাগী হইবার লাভ কি। যদি সাহাবাজের পত্রে
অরুদ্ধতীকে স্বরে লইতে ব্যবস্থা দেয়, তবে অনর্থক কর্ত্তামহাশয়ের কষ্টের কারণ হওয়া
কি মনোনীত? হত পত্র সাপেক্ষতার উপর আমরা অভ্যস্ত গৌরব করিলে তোমা-
দিগের মিলনে তাঁহার মতও হইতে পারে।”

বরদা বলিল। “এটি ত ভাল বলিলে কিন্তু তুমি ভাবিলে না যে আমার কত
দিক হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। অনুপরাম যখন এখানে আসিবে তখন ত সব
প্রকাশ পাইবে। তখন কি কর্ত্তা মহাশয় অরুদ্ধতীকে রক্ষা করিতে পারিবেন?”

গোবিন্দ বলিল। “সে উপস্থিতমতে বিবেচনা হইবেক। আর কর্ত্তা মহাশয়
বেনই বা না পারিবেন। অনুপরাম রাজ্যহীন, ধনহীন ও বলহীন, কখন কর্ত্তার সঙ্গে
সমকক্ষ হইবে না।”

বরদা বলিল। “না, অনুপরাম একক তাহার বিপক্ষ হইতে অসমর্থ বটে কিন্তু
গঞ্জালিসের লোকবল অনেক।”

গোবিন্দ বলিল। “ঐ দেখ কর্ত্তা অরুদ্ধতীর নিকট হইতে আসিতেছেন। এত
দীর্ঘ যে কিরিলেন। আমার বোধ হয় অরুদ্ধতীর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয় নাই।”

বরদা বলিল। “আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি একবার কর্ত্তাকে আমার কথাগুলি
জানাত।”

গোবিন্দ বলিল। “আমি কি জানাইব; আমি তাঁহাকে এসব কথা বলিতে
পারিব না।”

বরদা বলিল। “ভাল তুমি থাক আমিই যাই।”

বরদা এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল।
হৃদয় দপ্ দপ্ কারতে লাগিল। গুঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। তলু শুষ্ক হইল। মন

উচ্চাটিত হইল। পিতার রোষের তরঙ্গ, অরুণভীর কষ্ট, পিতার অসন্তুষ্টি, আপনার মনঃশীড়া চিত্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিল। মনে মনে প্রশ্ন ও উত্তর বিবেচনা করিলেন। পিতার সম্ভাবিত উত্তর সব বিহ্বলের মত তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল; আবার স্বপ্ন-বুদ্ধিসমূহ তাহার প্রত্যুত্তরগুলি ততোধিক সত্ত্বরে উঠিয়া তাহা কাটাইল। লজ্জাও তাহার চক্ষু-বরকে নীচ দৃষ্টি করিল। অঙ্গে অঙ্গে পিতার নিকট পৌঁছিলেন। বৈদ্যনাথ বরদাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রাক্ষণে দাঁড়াইলেন। বৈদ্যনাথের বরদাকর্ষ এতমাত্র পুত্র থাকাতো তিনি নিতান্ত তাহাকে ভাল বাসিতেন। তাতে আবার বরদাকর্ষ অধিতীর পণ্ডিত। গ্রামস্থ সকলেই বরদার সরলজ্ঞানীর মত স্বভাবকে প্রশংসা করিত, তাহাতেও বরদাকর্ষ তাঁহার পিতার চক্ষে অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। বরদাকর্ষ জ্ঞানোন্নয়নবিধি পিতার নিকট কোন আবেদন করেন নাই, কখন কখনে কথাতো দিগন্ত হন নাই। যাবজ্জীবন কেবল আপনার গৃহে পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্মভীর। সংসারের মধ্যে সত্যই একমাত্র অবলম্বন জানিতেন। বহু পাঠে তাঁহার মনটি বিচার-শীল হইয়াছিল। যখন আপনার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতেন অত্যাচারণ বা অবিচার কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন ও আপনার উন্নত চিত্ত্রে তাহাকে সংপরাশ্রয় দিতেন ও তিরস্কারও করিতেন। বিচারে প্রচুর অধিকার ছিল ও সুশিচারসমূহ জানই তাঁহার স্থির জ্ঞান ছিল। বিচারাসমুদয় বাক্য বর্ণে শুনিতে ন। আর কাহাকেও অবিচার করিতে দেখিতে পারিতেন না। তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলে ‘অবিচারক’ বলিয়া তিরস্কার করিয়া আপনার রোষ প্রকাশ করিতেন। তিনি জানিতেন, সত্য, জ্ঞানের একমাত্র পথ। অবিচার্যপেক্ষা মানুষের উৎকর্ষতার মূল তাঁহার চক্ষে কেবল বিচার। অত্যাচার স্বভাব থাকায় তিনি স্বার্থসাধনে কণামাত্রও যত্ন করিতে লাজ্জিত হইতেন। কিন্তু দয়ার সমূহ। অপরের জন্ত আপনার স্বার্থসর্পস্ব অব্যাহত দিতে প্রস্তুত। অন্য নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এ দিকে প্রবল পিতৃভক্তি, স্বার্থযাত্ৰায় অতীব লজ্জা, এদিকে সমস্তীর অরুণভীর প্রেম ও মহতী দয়ার বন্ধন তাঁহার মনকে উজ্জ্বলিত করিল। কতই চিন্তা করিলেন। ক্রমে তাঁহার পদ চালন শিখিল হইয়া আসিল। ভাবিলেন, তখন আর প্রত্যাগমন অসম্ভব। পিতার সম্মুখীন হইলেন। বরদাকর্ষের মন হইতে অরুণভী চিত্তা সব অপসৃত হইল। ভক্তি বলবান হইল। বরদাকর্ষ সকল পরামর্শ বিস্মৃত হইলেন। ভক্তিতে তাঁহার মন গগন হইল। কেবল পিতার দিকে একবার চাহিয়া নীরবে ভূমি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথ বরদার ভাবে বুঝিলেন যে বরদা কোন বিষয় বলিতে আসিয়াছে কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারে না। পুত্রস্নেহ বৈদ্যনাথকে অধিকার করিল। বৈদ্যনাথ কোমল

বাক্য শক্তিও মনো পুত্রের বৈরুদ্য (১) দূরশয়ে বলিলেন। “বরদাকর্ষ কি বলিতে চাহ, বল।”

বরদাকর্ষ পিতার প্রসন্ন বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন ও দৃষ্টিতে বুঝিলেন যে একপ্রকার ভাব ভাল। স্থির-মন হইলেন। অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার বিচারগুলি ক্রমে ক্রমে বিহ্যুতের মত পর্যায় পরস্পরায় প্রণালীবদ্ধ হইয়া মনে পুনরুদ্ভাবিত হইল। কিন্তু এবারকার শৃঙ্খলের গ্রন্থিগুলি অস্ত্র প্রকর। বলিলেন “আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে। বলিতে লজ্জা পাই, সাহসও করি না। কিন্তু আপনাকে না বলিলেও কর্ম সিদ্ধ হয় না। যখন রোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর গুপ্ত রাখায় লাভ নাই, বরং রোগের বৃদ্ধি হইবে। এক্ষণে আপনাকে অবগত করা আমার স্বার্থকর ও শ্রেয়স্করও বটে। আমার নিত্যন্ত অভিলাষও বটে। আজ প্রায় বৎসরাধি এ ভাবটী আমার মনকে আশ্রয় করিয়াছে। আমি ইতিপূর্বে সংসারের অস্ত্র কোন চিন্তা জানিতাম না, কেবল আপনার পুস্তক পাঠেই রত ছিলাম; এক্ষণে তাহাতে দেখিতে পাই ক্রমে যাত্রারূপ হইতেছে। বোধ করি এ পরিমাণে আর কিছু দিন হাস পাইলে, অবশেষে একান্ত যত্ন-বাহিত হইব, সেও কিছু শ্রেয়স্কর নহে।”

বরদাকর্ষ একটু খামিলেন। একবার পিতৃময়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। বৈদ্যনাথ বরদাকর্ষের ভূমিকা দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, কিন্তু স্থির হইয়া আদ্যোপাত্ত ভাবিতে ইচ্ছার কোন উত্তর দিলেন না। প্রথমে যত পরিমাণ অনুগ্রহ সহকরে ভাবিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দ্বিগুণপরিমাণে কমিল, কিন্তু তাহাতে মুখের ভাবের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র হইল না।

বরদা আরম্ভ করিলেন। “শারীরিক রোগের লক্ষণ সকল বাহিরে প্রতীয়মান হয় ও বহির্ব্যাপারে তাহার কারণ একপ্রকার ধার্য হয়; কিন্তু মনের কষ্টের শারীরিক লক্ষণ যথেষ্ট ধাকাতোও তাহার কারণ অবগত না হইলে, কল্পনা বা বিদ্যার সাধ্য নহে। মনে একটিনাত্র বিব্রতি (২) বর্তমানে শারীরিক শত ব্যাধিভুল্য বাহ্যিক লক্ষণ উৎপাদন করে। যখন সে আন্তরিক রোগ আপনার একমাত্র বাক্যে দূর হয়, তখন কেনই বা আমি আপনার নিকট হইতে গুপ্ত রাখিব, আর আপনিই বা কেন সে রোগকে বাবু মাত্রেয় দ্বারা দূর করিবেন না? ইহাতে ক্ষতিই বা কি? আপনার মতজ্ঞানে আপনার অযোগ্য কোন কর্মে মত দেওয়া হইবে না। বরং তাহার আমাদিগের বংশের গৌরব

(১) কোভ।

(২) হৃদয়, মনঃপীড়া।

বুদ্ধি হইবে। কাহার না ইচ্ছা যে আপনার গৌরব বুদ্ধি করে। তাতে আবার যখন সে গৌরব লাভে পারত্রিক পৰ্য্যন্ত লাভ হইতেছে।”

বরদা থামিলেন। আবার তাঁহার পিতার দিকে চাহিলেন। বৈদ্যনাথের অতুঃশ্লিষ্ট-সন্দেহ দৃঢ়মূলীভূত হইল, কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না। তিনি নিরুত্তরে রহিলেন।

বরদাকর্ষ আবার আরম্ভ করিলেন। “মনের বৈকল্য নিতান্ত অনুপম নীয়। তাহা কিছুতেই দমন হয় না। তাহা অপর উপায়ে দমন চেষ্টা করিলে দ্বিগুণ বলে বুদ্ধি পায়। মন নিতান্ত অজ্ঞেয়। কেবল তাহার গতির অনুসরণ করিলে তাহা সাধ্যরোগ। যখন একান্ত কোন বিষয়ে মন নত হয়, তখন কোন বিপরীত বিচার তাহাকে প্রতিনিরুদ্ধ করিতে পারে না, তখন বিচার প্রতিবন্ধক কি সামান্য।”

গোবিন্দ পিতাপুত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছিল। বরদার ভূমিকা শুনিতে শুনিতে তাহাকে মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিল। ভাবিল, লোকে মনোনিষ্ঠ কৰ্ম্ম সাধনে ষেৰূপ যত্নবান্ হয়, তাহার কোন অভাবই বাধে না। বরদাকর্ষের স্বভাব ভাল জানিত। কখন তাহার বিবাস ছিল না যে বরদাকর্ষ একপে আপনার নিবেদন পিতার নিকটে প্রকাশ করিবে। কিন্তু অন্যকার ব্যাপারে এককালে বুঝিল যে স্বার্থচিত্তায় সকলই পবিত্রীভূত হয়। ভাবিল প্রেমের কি অদৃশ্য বল!

বরদাকর্ষ বলিলেন। “সে রত্ন লাভে যে মন কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া তত্ক্ষণে কায়মন পৰ্ব্বস্ত পণ করে, তাহার বিধির ক্ষমতা নাই যে তাহাকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত করেন। যখন কোন কৰ্ম্মের বল অসহ্য হয় তখন তাহার মতানুসারী হইলেই শ্রেয়ঃ নতুবা আপনার বর্তমান অবস্থা হইতে অকারণ হীন হইতে হয়। যখন আমার মন একান্ত উল্লাসে যত্নশীল হইয়াছে, তখন ভল্লাভব্যতীত আর কিছুতেই স্থির হইবে না। আপনি ইহাতে মত প্রকাশ করুন, আমি একান্ত তপস্বী হইয়াছি। আরাকানের রাজকন্যা আমাকে মোহিত করিয়াছে।”

বৈদ্যনাথ এতক্ষণ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন। যদিচ বরদাকর্ষের শাক্যে তাঁহার ক্রমে রাগ বৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু অন্ত পৰ্ব্বস্ত না শুনিয়া কোন ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। একপে বরদাকর্ষের মুখে আরাকানের নমোচ্চারণ এককালে অস্থির হইলেন। কোপে তাঁহার অধর কাপিতে লাগিল। বলিলেন, “বরদাকর্ষ, যথেষ্ট হইয়াছে বিদ্যায় তোমার জ্ঞানোদয় না হইয়া সামান্য বিষয়-বুদ্ধি পৰ্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। তুমি কি কৃতঘ্ন! আমার এত কালের পরিশ্রম বিফল হইল! আমার সুখাশা উন্মূলিত হইল। তোমার ধিক্! তুমি অন্ধ হইয়াছ; কি প্রকারে লজ্জার মাথা খাইয়া এ

কথা আমাকে জানাইলে? তুমি অমুরাগবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ভ্রম করিলে না? অনা-
চারী পতিতা স্ত্রীর চাকুরীতে মুগ্ধ হইলে।”

য়েবে বৈদ্যনাথের জ্ঞান লোপ পাইল। এক্ষণে অরুণ্ডতী তাঁহার চক্রে শিশাচীর
ভায় বোধ হইতে লাগিল। বলিলেন, “সে বিশ্বাসঘাতিনী হুঁশ্কার ডাকিনী অবাধ
বালাকর্য্য নারকী করণাশয়ে কত ছলনাই করিয়াছে। আমার নিকট কেমন হুঁশীলার
মত কথাগুলি বলিল। কিন্তু অন্তরে পরল। তোমার সর্ব্বনাশ চেষ্টা পাইতেছে। তুমি
হুঁশ্কার, তাহার মায়াজালে বদ্ধ হইলে। আবার এমন নির্লজ্জ হইয়াছ যে, তাহার অস্ত্র
আমাকে বলিতে আসিয়াছে! যাও। তোমার দোষ নহে, অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ। আমি
অজ্ঞাত-কুলশীলাকে আশ্রয় দিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইলাম। গোবিন্দ! বরদার
কথা ভুলিলে?” গোবিন্দ কোন উত্তর করিল না।

বরদা বলিল। “মহাশয়! আরাধ্যের রাজকন্যা যদ্যপি অস্ত্রাত-কুলশীলা হয়,
তবে অজ্ঞাত-কুলশীলা কে?”

বৈদ্যনাথ বলিল। “কে জানে, ঐ কুলটা আরাধ্যরাজকন্যা, তাহাতে আবার গজা-
লিঙ্গের সহিত সহবাস করিয়াছিল; তুমি তাহার নাম আমার কাছে করিও না। আমি
অদ্যই তাহাকে আমার গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিব। গোবিন্দ, তুমি সেই হুঁকারে বল,
যে, সে অদ্য আমার গৃহ ত্যাগ করুক, তাহাকে থাকিতে দেওয়া আমার লাভ নাই;
সে কি মায়াতে বরদাকে মুগ্ধ করিয়াছে।”

বরদা বলিল। “মহাশয়। তাহার যদি মায়ায় মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে তবে
তাহাকে নয়নের অন্তর করিলেও তাহার অধিকারের বহির্ভূত হইলেন না। কেন নিরপরাধে
আশ্রিতাকে শাস্তি দিবেন? আপনার মত পরিবর্তন করুন। দয়ামুখিতে আমার প্রতি
দেখুন ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া হির বিবেচনা মত আজ্ঞা দিন। অরুণ্ডতী নিত্যই অসাধা
তাহাকে আশ্রয় দিয়া যত পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, কেন অকস্মাৎ হুঁকারে ভূলা-
পুঞ্জের মত বিকীর্ণ করিবেন ও হয় ও ইহাওই কীর্ণভোয়িত অরুণ্ডতীর জীবনের নীপটা
এককালে নির্বাণ করিয়া পাপসমূহ পৃষ্ঠে ধারণ করিবেন। আপনি অরুণ্ডতীকে বহি-
স্কৃত করিলে, কেহই তাহাকে স্থান দিবে না; সে তরলস্বভাবতঃ শাসন
বুদ্বীর মত মরিবে, অমুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন। অরুণ্ডতীকে প্রাণ
দান করুন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমি সে কালসপিনীকে আর গৃহে পুঁথিব না। গোবিন্দ!
তুমি এই ক্ষণেই তাহাকে দূর করিয়া আমার সমাচার দাও।”

বরদাকর্ষ বলিল। “মহাশয়! আমায় দয়া করুন। নতুবা আমি এককালে জয়ের
মত নষ্ট হইব।”

বৈদ্যনাথ বরদাকর্ঠের বাক্যে কর্ণপাতমাত্র না করিয়া গোবিন্দকে অরুণতার বহিষ্করণে আদেশ দিলেন। গোবিন্দ প্রভু-আজ্ঞা হই তিনবার না শুনিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার বৈদ্যনাথকে নিতান্ত উগ্র দেখিয়া বলিল। “মহাশয়! আপনার আদেশ এই ক্ষণেই পালিত হইবে, কিন্তু একটা পরামর্শ দিতে আজ্ঞা চাহি।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “কি পরামর্শ? দেখি আবার তুমি কি বল।”

গোবিন্দ বলিল। “মহাশয়! আপনি যাহাকে একবার আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাকে কি বলিয়া সমুদ্রে নিপাতিত করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। এক্ষণে মহাশয়ের রাগ হইয়াছে, বোধ করি ক্রান্ত হইলে আবার তাহাকে আনিতে অসুমতি করিবেন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমি যখন তাহাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার পাইয়াছিলাম, তখন অবগত ছিলাম না যে, সে বিষবারী কালসাপ।”

গোবিন্দ বলিল। “যদি বরদাকর্ঠকে মোহিত করায় তাহার কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে সেটি তাহার কর্ম নহে। বরদাকর্ঠ তাহাকে ভূতোধিক মোহিত করিয়াছেন। অতএব যখন উভয়েরই মন একতান হইয়াছে, সে স্থলে তাহাদিগের মিলনে আপনার বাধা দেওয়া আমার মতে বড় শ্রেয়স্কর নহে। আপনার পুত্রের পক্ষেও কিছু শুভকর হইবে না। এক্ষণে আমি স্থানান্তরে যাই। কল্য প্রাতে আপনার নিকট আলিব, অবশ্য হির বুদ্ধিতে যেরূপ অসুমতি করিবেন, সম্পাদন করিব।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “যদ্যপি ভোমা হইতে আমার কর্ম এক্ষণে সম্পন্ন না হয়, তবে আমি যে ব্যক্তি সে ধর্ম্যে লক্ষ হইবে, তাহাকেই পাঠাইব।”

গোবিন্দ কোন উত্তর না করিতে বৈদ্যনাথের ক্রোধামল আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন, “গোবিন্দ, এখনও আমার কথা শুন, বৃথা বক্তৃতাওয়ার কালব্যয় করিও না।”

বরদাকর্ঠ পিতাকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া গলগল কৃতবাস হইয়া বহির্বৎ ভূমোপভিলেন ও কৃতাজলিপুটে বলিলেন। “মহাশয়, আমি ভিক্ষা চাহিওঁছি আমার অসুমতি দিল।”

বৈদ্যনাথ পুত্রকে এ অবস্থায় দেখিয়া দয়াদ্রবিস্ত হইলেন বটে। কিন্তু লোকলজ্জা-ভয়ে বরদাকর্ঠের বাক্যের অসুযোগদনে অনিচ্ছায় মুখ ফিরাইয়া সে স্থান হইতে অতীত চলিয়া গেলেন। বরদাকর্ঠ তাঁহার পিতাকে অত্যন্ত পুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অজে অজে গাত্রোখান করিলেন ও নিতান্ত বিষমবদনে প্রাঙ্গণ হইতে বাহির্দ্বারে গমন করিলেন। গোবিন্দও বিসংজ্ঞে (১) তাঁহার অসুসরণ করিতে লাগিল। বরদাকর্ঠ অজে

অল্পে সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অচেতনে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কত চিন্তাই উপস্থিত হইল। কিন্তু কি ভাবিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নিভাস্ত মনোবেদনায় অধীর হইলেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে গোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। পদদ্বয় অজ্ঞানত গোষ্ঠের প্রাঙ্গণ পার হইল। ক্রমে অরুক্ষতীর ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে অরুক্ষতীকে দেখাথতে তাঁহার যেন চমক হইল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি দেখিলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অরুক্ষতী বরদাকর্ষণের মুখের ভাব দেখিয়া নিভাস্ত উচ্চাটিত হইলেন। আগ্রহাভিনয়ে তাঁহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু নিভাস্ত ব্যাকুল বরদাকর্ষণ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তাঁহার সংজ্ঞাহীন দৃষ্টিতে অরুক্ষতী ভীত হইলেন। বুঝিলেন না যে কেন বরদার এরূপ ভাব। ভাবিলেন বুঝি অনুপরাম আনিয়াছে। অমনি সিংহরিলেন ও অচেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর শ্রায় ভূমে-পতিত হইলেন। বরদাকর্ষণ কাষ্ঠপুস্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষের নিমেষ পড়িল না। পশ্চাৎ গোবিন্দ ক্রুত পদে আগ্রসর হইয়া অরুক্ষতীর মুখে জল সেচিতে লাগিল ও বরদাকর্ষণকে চামর লইয়া ঢুলাইতে বলিল। বরদাকর্ষণ যন্ত্রের মত চামর লইলেন ও যেন যন্ত্র স্বরূপ ঢুলাইতে লাগিলেন। কণ্ঠধ্বনির পর অরুক্ষতীর চেতনা হইলে তিনি কাতর আর্তনাদে বলিলেন। “আমায় রক্ষা কর মারিও না। না না আমি হইতে উঠা হইবে না। আমি কখনই জাতি ত্যাগ করিব না। নরাদম গঞ্জালিস দূর হও। আমি স্নেহ ধর্ম অবলম্বন করিব না।”

অরুক্ষতীকে উদ্ভাস্ত প্রায় দেখিয়া গোবিন্দ নিভাস্ত কাতর স্বরে বলিল। “হা বিধাতঃ, এ দুর্ধবিনীর মন এক কালে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে। দিব্যরাত্রি কেবল সেই দুষ্টাচার অনুপরামকে ভয় করিতেছে। অরুক্ষতি! কেন অকারণ ভীত হও। অনুপরাম এখানে নাই। এ আমি তোমার পুত্র গোবিন্দ, আর ঐ দেখ তোমারই বরদাকর্ষণ।”

বরদার প্রতি। “বরদাকর্ষণ অরুক্ষতীকে শাস্ত কর। কথা কও।”

এতক্ষণে যেন বরদার চমক ভাঙ্গিল। ব্যস্ত হইয়া অরুক্ষতীর পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিলেন ও তাঁহার বাম বাহুতে হাত দিয়া বলিলেন। “অরুক্ষতি, চিন্তিত হইও না, এ আমি তোমারই বন্দা, চাহিয়া দেখ, কোন চিন্তা নাই। দেখ বরদা তোমার সেবা করিতেছে। উঠ একবার চাহিয়া আমার চিন্তা দূর কর, আমি নিভাস্ত অস্থির হইতেছি।” কত ডাকের পর অরুক্ষতী একবার অতি কষ্টে অতুল্য উদ্যমে চাহিলেন। অমনি বরদাকর্ষণের প্রেমময় নেত্র মিলিল। আহা যেন মস্তপুত পুনর্জীবিতের শ্রায় ব্যস্তে গাত্রোখান করিলেন ও ব্যগ্র হইয়া বলিলেন। “কেও বরদাকর্ষণ! আমারই বরদাকর্ষণ।

আমার স্থলবল্লভ। আমার রক্ষক। আমার ভ্রাতা। আহা বিপদের ছাড়া, আমার সম্পদের জ্যোতিঃ। আমার নেত্রের তারা, শরীরের প্রাণ। মনের ভাব। আমার মস্তকের কেশ। এস আমার কলনাকে প্রকৃতার্থ সিদ্ধ কর।”

উন্মত্তা অরুণ্ণতা এইরূপে কতই বলিল, আহা তাহার পেণ্ডিত মন অনুপায়ের চিন্তা হইতে এককালে পরিত্রাণ পাইয়া কতই আশ্রয় হস্তগত ধনকে লইয়া অনুমোদন করিতে লাগিল। বরদাকর্ত্তের মনের ভাব ভিন্ন প্রকার ছিল। তিনি কেমন অশ্র-মনস্ত হইয়া এক একবার হস্ত নিস্পাডন করিয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ উভয়ের বলাবিক্য প্রেমের গতি নিস্তন্ধে লক্ষ্য করিতে লাগিল ও মনে মনে ঈশ্বর নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন ইহাদের মিলন হয়। আহা সে যুগল দেখিলে শত্রুর পর্য্যন্ত মন গলিয়া যাইত, তা গোবিন্দের কি। গৃহস্থ ব্যব্য সামগ্রী যেন সায় দিয়া উভয়কে উৎসাহ দিতে লাগিল। অরুণ্ণতা প্রতিবার নিস্পাডনে অধিকার উগ্র হইয়া প্রেমভাবে নিযুক্ত হইলেন। অশ্রমনস্ত বরদাও ক্রমে প্রেমের অসহ্য বলকে স্বীকার করিলেন ও মন হইতে কিছুক্ষণের ভ্রান্ত সকল চিন্তা বহিষ্কৃত করিলেন। যেন চিত্তাশুনি ভয়ে ও লজ্জার তাঁহার চক্ষের কোণে লুকাইল। একটু বস শিথিল হইলেই অমনি আপনাদিগের স্বাভাবিক বেগে উদ্ভিত হইয়া বরদাক মথিতে লাগিল। অতীত বেদনার বরদা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইতস্তত সকালন করিতে লাগিলেন। যেন এক অঙ্গে নিমেষ মাত্রও সে তীব্র যন্ত্রণা লক্ষ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় অপর অঙ্গ সে যন্ত্রণার অধীন করিলেন। আবার ক্ষণেক মোটো প্রাপ্ত হইলে অপর একটিতে তাহার বলের সমুদান করিলেন। কিন্তু কতকক্ষণ এরূপে চলেন বেদনার তীব্রতায় অতি অল্পকালের মধ্যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যথিত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল। আবার সে অবস্থা হইতে স্বভাব পাইবার পূর্বেই আবার বেদনার বলে নিগোজিত হওয়াতে বরদা এককালে অস্থির হইলেন, কিন্তু সে মানসিক যাতনা কি অঙ্গে দা হয়! আহা! অঙ্গের রোগের ঔষধ আছে। অশ্র-মনস্ত হইলে আর কষ্টে দৃঢ়নিবেশে নিযুক্ত হইলে, লোকে বিস্মৃত (১) হয়; অচে-তন হইলেও যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু হয়! এ কঠিন অসহ্য মনের যাতনার শেষ নাই। ইহা হইতে ত্রাণ নাই। গুপ্ত হইলেও ইহা মনকে ছাড়ে না। ইহা যেন দুষ্ট আপালি (২) মত ধরিয়া থাকে। যত কেন চেষ্টা পাও না, যত কেন বলে টান না, সে আপন মনে উদর পূর্ত্তি করিতেছে। শুনে না, কিছুই মানে না, কেবল

(১) বিস্মৃত—স্মরণ রহিত।

(২) আপালি—এটিলি ইতি ভাষা।

শোণিত শুভিচ্ছে; আকর্ষণে বরং বেদনার বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম-পাতকীরও
 ঘেন সে কষ্ট না হয়; যে ইহার স্বাদ পাইয়াছে, সেই ইহা কিছু পরিমাণে
 জানে। এ বাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে জনমের মত নষ্ট হইয়াছে।
 তাহার মুখে একটা অলোপী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বাহাকে একবারমাত্র স্পর্শ
 করিয়াছে, তাহার পরমায়ুর অর্ধেক গ্রাস করিয়াছে। আহা! তাঁহাকে মৃত্যুর পথে
 অনেক অগ্রসর করিয়াছে। তাহাকে ইহলোক হইতে শীঘ্র যাত্রা করিতে হইয়াছে।
 বিকট রোগে মনুষ্যের শরীর জর্জরিত হর বটে, কিন্তু রোগ শাস্তি হইলেই আবার
 ক্রমে সে স্বভাবকে পায়। কিন্তু মনের বেদনা! আঃ, চিন্তা করিতে ভয় হয়।
 মনের চিন্তা বলীকে ক্রীণবল করে। জন্মের মত তাহার বল তাহাকে ত্যাগ করে।
 রূপ যায়, আর আসে না, শরীর স্নান হয়। শ্রুদ্ধি, আচাভুত্বা হয়। পণ্ডিত,
 অকর্ণশ্যজড়পনার্থ হয়। হয় যে তাহার বাবজীবনের উপার্জিত জ্ঞান লোপ পায় ও
 কেবল জ্ঞানহীন বাতুল হইয়া জনসমাজে দয়াস্পদ হইয়া থাকে। কে জানে যে,
 এইখানেই তাহার শেষ। সে পাপ-চিন্তাই জানে, কবে তাহার চিহ্নিত বলীকে ত্যাগ
 করিবে? পরলোকে কি চিন্তা নিরুপায় বলীকে ছাড়িবে না? একবার বরদাকর্ষণ
 শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, বজ্রকীটের মত তাহার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে চর্ষণ
 করিতেছে। আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াও বিষবোধ হইতেছে। আমোদ
 মত্ততার মত হইয়াছে। ক্রণমাত্র অভিতুত রাখে, পরন্তু চেতনা অবকাশ পাইলেই
 উলিত হয়। আহা! রাহব্রন্ত হইয়াই উলিত হয়। অরুহতীর প্রেম-জোৎস্নার
 থাকিয়াও বরদার মন কাঁদিল। তাহার পঠিত বিদ্যার কোন ফল দেখিল না।
 কখন কখন একবার বিদ্যান্তের মত স্বাভাবিক ভেজে দেখা দিতেছে, মনকে শান্ত হইতে
 বলিতেছে, কিন্তু অব্যবহিত পরেই আবার বনমেঘাবৃত গগনের স্থায় ভ্রমে আচ্ছন্ন
 করিতেছে। শুদ্ধিভের অসমছোয়াতিতে কেবল নিকটস্থ অগতপ্রায় ষোড়শ অগাধ
 অন্ধকার হবিয়া ভীষণ বিভাবিকা স্তম্ভিতলি দেখাইতেছে। আহা! সে চপলা
 জ্ঞানালোকের অপেক্ষা চিরকাল অন্ধকারে থাকা ভাল, তাতে বিচ্ছেদের পরিবর্তিত কষ্ট
 সহ করিতে হয় না। যে অরুহতীর নরনের কটাক্ষে বরদাকর্ষণ বৈকুণ্ঠমুখ বোধ করি-
 তেন, এবে আর তাঁহার সে ভাব নাই। অরুহতীর প্রীতিবাক্যে তাঁহার মনের কষ্ট
 আরও অগিয়া উঠিতেছে। কি তাবিত্তেছেন, কেনই বা তাবিত্তেছেন, কিছুই বুঝিতে
 পারিলেন না। কতই ভেটাই পাইতেছেন যে, জানে চিন্তা দূর করুন, কিন্তু কার সাধ্য?
 গোবিন্দ বরদার কল্পিত কণ্ঠ, বন নিবাস, অক্ষতাবিত নেত্র দেখিয়াই বুঝিল। বরদা-
 কণ্ঠে বিশেষ জানিত। তাঁহার সকল বিষয়ে ব্যগ্রতা জানিত। তাঁহার পিতার
 সহিত কথোপকথনও সব স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। কিছুক্ষণ অবধি আপনায় পথে

বাইতে দিল। অরুণভীকেও ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিবেদন করিল। বরদা প্রায় এক দণ্ড নিশ্চন্দ হইয়া অরুণভীর হস্তে প্রাণহীন হস্ত রাখিয়া উন্মীলিত নয়নে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ বুঝিল চিত্তা এক্ষণকার মত বধাসাধ্য কষ্ট দিয়াছে। আর সহিষ্ণু পাত্ৰাভাবে কণেকের জন্ত ছাড়িয়াছে। আবার পুনর্জীবিত মন পাইগেই আশ্রয়, হায়! যদি না ছাড়িত, তবে হয়ত দুর্ভাগ্য বরদাকর্ষ আশ্রয়প্রাপদানে পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্তু চিত্তা কি নিষ্ঠুর! মনকে পুনর্বীর বলসংগ্রহ করিতে দিল। আবার বিগুণ বলে আক্রমণ করিবে। গোবিন্দ সময় বুঝিয়া বরদার বাহু ধরিয়া বলিল “বরদাকর্ষ চিত্তায় অভিভূত থাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কিছু সিদ্ধ হইবে না। বুধা কেন সময় নষ্ট কর। এক্ষণকার উপায় দেখ। আর স্ত্রী-লোকের মত অচেতন হইয়া থাকিও না, মনের ভাব প্রকাশ কর। দেখি যদি উপায় থাকে ত চেষ্টা পাই। তুমি পণ্ডিত, সর্কদা বলিতে যে বিপদে স্থিরবুদ্ধি থাকাই বিদ্যাভ্যাসের একমাত্র লাভ। বীর হইয়া কেন কাপুরুষের মত আচরণ কর ?

বরদা বলিল। “গোবিন্দ আমি সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার পিতার জন্ত চিত্তা হইতেছে। অরুণভীর জন্তও চিত্তা হইতেছে। আমি অরুণভীর প্রেমে বদ্ধ হই-
য়াছি। আমার পিতার নিকটও বদ্ধ আছি। আমি অরুণভীকে ছাড়িতে পারিব না। আমি পিতাকে ছাড়িতে পারিব না। আমি অরুণভী ত্যাগে সংজ্ঞাহীন হইব। আমি পিতৃবিচ্ছেদে অজ্ঞান হইব। আমি পিতার আজ্ঞার অমত কর্ম্ম কহিতে কষ্ট পাই-
তেছি। আমি পিতার আদেশ পালনে কষ্ট পাইব। আমার এ দিকে ধর্ম্মলোপ ভয়, আহা! যিনি আমার বালককাল অবধি পালন করিয়াছেন। আমার জড় মাংসপিণ্ডাবস্থা হইতে সচেতন জ্ঞানী করিয়াছেন। আমি প্রতিরূপেই তাঁহার দয়ার ছায়ায় পোষিত হইয়াছি। তিনি আমার সুখসম্পাদনাশয় কত কষ্ট করিয়াছেন ও এক্ষণে সেই উদ্দেশ্যেই এক প্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত। কি অসৌম্যেহ, কি অনির্ভরনীয় প্রেম! আঃ কি বিষয় ময়া, কি অনুপম দয়া! আমার জন্তই তাঁহার এত ব্যয়। কিন্তু আমি কি মুঢ়! কি উন্মত্ত, আমার চেতন হইতেছে না। যে আমার মঙ্গলোচ্ছায় এতদূর পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছে, সেই শ্রেষ্ঠ গুরুর বাক্য অবহেলন করিতেছি। আমি কি নরাধম! গোবিন্দ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু অরুণভীকেই বা কি বলিয়া ত্যাগ করি। সে অনাথ হৃৎখনি আমাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়াছে। অমাকে তাহার মন সমর্পণ করিয়াছে। এক দণ্ড না দেখিলে সে মুচ্ছিত হয়। রাজ্যভ্রষ্ট, দেশবহিস্কৃত, কুটুম্বভ্যক্ত, ভ্রাতৃবিকৃত, ধর্ম্মলোপভীত, নির্দয়চরণ-কাম্পিত, প্রেমকবলিত, সর্কায়ণে বর্জিত। তাহার আমি একমাত্র জীবনোপায়, কি করিয়া ত্যাগ করি। সে যে নিতান্ত আমা বই আর

জানে না। তাহার আর কেহ নাই যে অগম্যে মুখে জল দেয়, আহা ঐ লেখ বিষয় মুখ। অরুণ্ধতী আমি তোমারই।”

অরুণ্ধতী অমনি কাতর হইয়া বরদাকর্ণের কর্ণ হস্ত দ্বারা ধেরিল, আর বাষ্পাকুলিত লোচনে গদ গদ স্বরে বলিল। “বরদাকর্ণ, আমি তোমারই। কিন্তু আমার জ্ঞাত তোমার পিতাকে রুষ্ট করিও না। আমি সকল সহিত পারি সহিব।”

অরুণ্ধতীর খেদে কর্তরোধ হইল, তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল। কিছুই শোনা গেল না, কেবল গলার অক্ষুট বাক্যোচ্চারণ আয়াসের স্বর মাত্র। আহা! নিঃশব্দ বন্ধ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অরুণ্ধতীর উর্দ্ধদৃষ্টি মুখকমল যেন আপ্লাবিত হইল। বরদা নীরবে তাহা দেখিলেন। তাঁহার প্রেম প্রবাহ বহিল। ওরস্তে সকল চিন্তা দূরীকৃত হইল। তখন বরদার মনে আর কিছুই নাই, কেবল অরুণ্ধতীর প্রেম! প্রেমের বন্ধীকৃত হইলেন। অমনি লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন “গোবিন্দ চল তুমি যদি আমার প্রেমে প্রেমিক হও, চল অরুণ্ধতীকে লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করি। আর আমি এখানে থাকিব না। এক্ষণেই এ স্থান ত্যাগ করিব।”

গোবিন্দ বলিল। “আমি তোমার যে রূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহে এক্ষণেই এ স্থান ত্যাগ করা শ্রেয়। আর চিন্তায় হয়োজন নাই।”

বরদাকর্ণ অরুণ্ধতীর হস্ত ধরিয়া গাতোখান করিলেন। গোবিন্দ তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্তী হইল। তিন জনে গোষ্ঠ হইতে বাহিরে আইলেন। কেহই দেখিল না। মাঠ পার হইলেন। কাহাবেই লক্ষ্য হইল না। মাঠ পার হইলে গোবিন্দ বলিল। “এখন কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ, সমুখ সমুখ কোন স্থানে আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। নিভৃত স্থান সকল অপেক্ষা ভাল। কর্তামহাশয় না জানিতে পারেন।”

বরদা বলিল। “গোবিন্দ, আমিও নিভৃত অচেতন হইয়াছি, আমার সংজ্ঞামাত্র নাই, আমি কিছুই জানি না কোথায় যাইব। কি রূপে রাত্রি কাটাইব। তুমি কোন উপায় স্থির কর। কিন্তু এ স্থান হইতে অন্তিমীকৃত পলাইতে হইবে। মহারাজ মানসিংহের নিবট হতদিন না পৌঁছিতেছি, তত দিন নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। পথে কেহ দেখিলে, কি জানি কাহার মনে কি আছে। অনুপরাম ও গঞ্জালিসের লোকবল যথেষ্ট। তুমি বাধা করিবার হয় কর।”

গোবিন্দ বলিল। “চল মেঘনার পশ্চিম মোহনার তীরে বনের ধারে দ্বারিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আজ রাত্রি কাটাইব, পরে কল্য প্রাতে পার হইয়া পলায়নের উপায় দেখিব।”

অরুণ্ধতী বলিল। “সে নির্জন স্থান বটে, সে দিকে কেহ যায় না। আমিও সেখান পাঁচ রাত্রি কাটাইয়াছি, সেখানে দিবাভাগেও কেহ যায় না। কিন্তু

সেখানে বাইতে হইলে একটু ক্ষুধাবেগে বাইতে হইবে। সন্ধ্যার পূর্বে বন পার হওয়া উচিত।”

বরদা বলিল। “তবে বেগে চল, আমি প্রস্তুত আছি। তুমি বাইতে পারিবে ত ?

সকলে চলিল, অরুন্ধতী বলিল। “কেনইবা পারিব না, না পারিলেই বা রক্ষা কৈ ?”

গোবিন্দ বলিল। “সন্ধ্যার পর বন দিয়া যাওয়া বড় যুক্তিযুক্ত নহে। তাতে আবার ত্রীলোক সঙ্গে। বনে কিরিন্দ্রদিগের যে দৌরাস্রয় !”

বরদা বলিল। “এ বনে দস্যুরা থাকিয়া কি লাভ পায়। এখানে ত জনসমাগম কদাচ হয় না।”

গোবিন্দ বলিল। “তাহারা এই বনের মধ্যে ছোট ছোট দিব্য গুপ্ত ঘর করিয়া বাস করিতেছে। সমুদ্র নিকট ও মোহনার তীরে তাহাদিগের ডিঙ্গি চালনের সুবিধা হয়। তাহারা কিছু ঠান্ডাইবার আশে বনে বেড়ায় না, ডাঙ্গা তাহাদিগের একলা নহে। কিন্তু যদি পরায়াতে পথে দেখে, তবে অগ্নি ছাড়িবে না।”

বরদা বলিল। “অরুন্ধতী তুমি এই দস্যু সমাকীর্ণ বনে কিরূপে যাতায়াত করিতে ও বলিতেছ কএক দিন দেবালয়ে বাস করিয়াছিলে। তোমার কি কিছু ভয় হয় নাই ?”

অরুন্ধতী বলিল। “আমি বেলা এক প্রহরের পূর্বে অগম্য বন দিয়া লুকাইয়া সতর্ককৈ বাইতাম। কোন লোক শব্দ পাইলেই অমনি ঝোপের ভিতর নিশ্বাস ধরিয়া লুকাইবা যত ক্ষণ না চতুর্দিকে নিশেধ হইত, ততক্ষণ আমি বনের গম্বীর মত বাসে পড়িয়া থাকিতাম। কিন্তু একদিন বড়ই বিপদ হইয়াছিল।”

বরদা বলিল। “কি কোন দস্যুর হস্তে পড়িয়াছিল ?”

অরুন্ধতী বলিল। “না তাহারা আমাকে দেখে নাই, কিন্তু আমি তাহাদের নিকটে দেখিলাম, অমনি একটি গাছের অভয়ালে দাঁড়াইলাম। হুত্যাগ্যাপেরা সেই গাছের নিকটে বসিল। আমি একেবারে কাঠবৎ হইলাম। প্রতি মুহূর্তেই ভাবিলাম, বুঝি তাহারা আমার দেখিয়া ধরে। কতক্ষণ এই মতে কাটাইলাম। তাহাদিগের কথা বার্তার বুঝিলাম তাহারা সেই খানে কাহার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছে, আমি অনেকক্ষণ সেখানে সেভাবে দাঁড়াইতে তয় পাইলাম। ভাবিলাম কিরূপে পরিব্রাজ্য পাই। কিছুই উপায় দেখিলাম না। পলাইবার ও সুবিধা বুঝিলাম না। অনেক চিন্তিয়া হই-স্তম্ভ দেখিলাম। কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দৈবের কৰ্ম। নিকটে রানীকৃত পাশ দেখিলাম। আপনায় অকল করিয়া পাশ গুলি উঠাইলাম। নিকট হইতে কতক গুলি বড় বড় কাঁকর উঠাইলাম। এই সব লইয়া অতি সাবধানে গাছে উঠিলাম। ডাল বাহিয়া যে ডালের নীচে তাহারা বসিয়াছিল তাহার উপর বাইয়া কিছু পাশ ফেলিলাম, ও তাহারই অব্যবহিত পরে কতকগুলি কাঁকর ছড়াইয়া দিলাম। গাছের

ডালটিতে দাঁড়াইয়া উপরের ডালটি ধরিয়া সজোরে নাড়িলাম। নীচের লোকগুলির মাথার পাঁশ ও কঁকর পড়ায় তাহারা ভীত হইয়া উঠিল, উর্দ্ধ দৃষ্টি করিল। পাঁশে চক্ষু অন্ধ হইল। নির্বড় জনশূন্য বনে সায়ংকালের পূর্বে এরূপ অনসুতবনীয় ব্যাপারে তাহারা অভিভূত হইল। কঙ্কর পাতে তাহাদিগের ভয় দ্বিগুণ হইল। আবার গাছের ডাল নাড়ায় আরও আক্রান্ত হইয়া কে কোন্ দিকে পলাইল, তাহার হিসাব নাই। কেহ সাহস করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হইল না। তাহাদিগকে পলায়নতৎপর দেখিয়া আমার উৎসাহ হইল। আমি আরও পাঁশ বিক্ষেপ করিলাম। কঙ্করে চতুর্দিক্ ছাইয়া ফেলিলাম, আর বিকট ভরে শাখাটি ছুলাইতে লাগিলাম। দুর্ভাগ্য বশত তাহাদিগের পলায়ন অব্যবহিত পরে সেই স্থানে আবার দুটি লোক আসিল। তাহারা পূর্বে আগত লোকদিগকে পলায়নতৎপর দেখিয়া উচ্চতরে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু পলায়িতদিগের নিকট কিছু স্পষ্ট উত্তর পাইল না। ‘গাছের উপর কি’ এই শুনিয়া উপরে দৃষ্টি করতে, যেমন মুখ উঠাইবে আমার অন্তরাস্ত্র শুকাইল, আমি একবার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলাম। আমার বিগ্রহবেগে মনে উদয় হইল অমনি অঞ্চলের পাঁশ ছড়াইলাম। চতুর্দিকে পাঁশে অন্ধকার। তাহাদিগের উর্দ্ধ মুখে পাঁশ পড়ায় তাহারা ব্যস্তে চক্ষুঃকদ্ধ করিল, চক্ষু-যান্ত্রিক নিত্য কাতর হইল। আমি অমনি কঁকর ছড়াইলাম। আর অতি বিষম বলে শাখা ছুলাইতে লাগিলাম।”

একজন বলিল। “গাছে মানুষের মত দেখিলাম, বোধ হয় কোন দুষ্ট বুদ্ধির কৰ্ম্ম।”

অপরটী বলিল। “না আমি তাহার কেবল পা দেখিয়াছি, সেটা প্রায় সাড়েন্ডের হাত লম্বা। চল পালাই।”

প্রথম বক্তা বলিল। “না আমার বোধ হয় কোন গ্রাম্য দুষ্ট বালকের কৰ্ম্ম।”

আমি আত্মরক্ষা ভয়ে আরও পাঁশ ফেলিলাম ও কঙ্কর ছড়াইতে লাগিলাম। গাছের ডালটি জোরে নাড়িলাম। তাহাদিগের গায়ে কঁকর লাগিল। প্রথম লোকটি বলিল। “ভূতের ডিল তো গায়ে লাগে না, এ মানুষের কৰ্ম্ম।”

আমি ভয়ে আরও পাঁশ ছড়াইলাম। ও অতি বেগে গাছ নাড়িলাম। আমার বলে ডালটী ভাঙিল। আমি ভয়ানক শব্দে সেই শাখা সহিত ভূমে পড়িলাম। নীচের লোক দুটি অচেতন হইয়া পলাইল। একবারও পশ্চাতে তত্ত্বাবধারণে চাহিল না। আমি তাহাদিগের চমৎকৃতি সুযোগে আপন রক্ষা পাইয়া দৈব প্রশংসা করিলাম।”

বরুণা বলিল। “এ সব বিপদ পূর্ণ স্থানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।”

গোবিন্দ বলিল। “না যাইয়াই বা কি করেন।”

ইহাদিগের কথোপকথনে পরিশ্রম বোধ হইল না। দারিকেশ্বর মহাদেবের মন্দির নিকটবর্তী নিবিড় বনে পৌছিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। চতুর্দিকের পক্ষী কল্লোল বুদ্ধি হইতে লাগিল। সমুদ্রকূলবাসী বকচয় উচ্চতর শাখা আশ্রয় করিয়া বসিল। অন্ধকার বুদ্ধি হইল। আর স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।

দশম অধ্যায় ।

“বনে রণে শত্রুজলাগ্নিমধ্যে মহাবীরে পরিতমস্ককে বা ।”

এদিকে বৈদ্যনাথ অস্ত্রপুর বহিতে প্রত্যাগমন করিয়া, বাহিরে বরলাকর্ষকে না দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। অল্পে অল্পে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া কাহার দেখা না পাওয়ায় পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা দুই তিন দণ্ড কাল আছে। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া অস্থখ গাছের তল মাহুরের উপর বসিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ‘বুঝি গোবিন্দ অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল সে অনাথা বালা কোথায়ই বা আশ্রয় লইল। হয়ত গজাশিসের দাসদলে তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। বৈদ্যনাথের মনে অরুন্ধতীর প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল। কেবল লোকাপবাদ ভয়ে তিনি প্রকাশে বৈরাগ্য দেখাইতেন। ভাবিলেন, ‘বরলা বোধ হয় রণভরে আপনার স্বরে গিয়াছে। অরুন্ধতীকে বিলাস করিয়া দিলে তাহার কিছু দিন কষ্ট থাকিবে, পরে নয়নের অতীত হইলেই, ভাবিলেন ‘স্মৃতিপথ অতিক্রম করিবে,’ আবার ভাবিলেন, ‘বোধ হয় গোবিন্দ একাগ্র সন্ধ্যার সময় কখনই অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিবে না। কল্যাণ প্রাতেই অরুন্ধতী স্থানান্তরিত হইবে। গোবিন্দ কিছু নিতান্ত অবিবেচক নহে, এ অসময়ে কখনই একাকিনী তাহাকে লহ্যহস্তে অর্পণ করিবে না। সাহাবাজ হইতে বা কি সমাচার আসিবে। বোধ হয় পণ্ডিতেরা অবশ্য অরুন্ধতীকে আশ্রয় দিতে বলিবে। কেনই বা তাহাকে ত্যাগ করিব। সে অনাথার কি দোষ?’ আবার তাঁহার মনে বরলাকর্ষ ও অরুন্ধতী প্রতি দৃঢ়তর প্রেমের কথা উঠিল। তিনি অরুন্ধতীর সচরিত্রে সন্দেহ করিলেন। ভাবিলেন ‘সে কুটিলার অথ আমার সাহাবাজে লোক পাঠান অস্ত্রায় হইয়াছে। সে চাতুরী জনে। বরলাকে ছান্য করিয়া বশীভূত করিয়াছে। বরলা কখনই আমার সমক্ষে একপ উত্তর করে নাই। অন্য নিতান্ত হুঁষ্টবুদ্ধির মত ব্যবহার করিয়াছে। অরুন্ধতীর সঙ্গে তাহার মিলনে তাহার সুখোদয় সম্ভব নহে। আমি কখনই উভয়কে মিলিতে দিব না। অরুন্ধতীকে স্থানান্তর করিব, বরলাকে সর্বদা

শাসনে রাখিব। দুই তিন দিনেক মধ্যে আপনি সাহাবাজে যাইয়া বরদার জন্ত একটি পাত্রী স্থির করিয়া আনিব। শীঘ্র বরদার বিবাহ দিব।’ আবার ভাবিলেন, ‘যদি বল-পূৰ্ব্বক বরদার ইচ্ছার বিপক্ষে তাহার বিবাহ দিই, তবে ত বরদা জন্মের মত দুঃখী হইবে।’ বৈদ্যনাথ একবার স্বভাবনিবন্ধন পুত্রবাৎসল্যে কাতর হইলেন, আবার অরুন্ধতীর দুঃখে নিতান্ত অস্থির হইলেন। পরক্ষণেই আবার সাহস্বরে বরদার অসহ্য বাক্যগুলি তাঁহার মনে উঠিল। তিনি রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দাস আসিয়া তাঁহাকে একটি হুঁকা দিতে তিনি তাহাকে গোবিন্দকে ডাকিতে বলিলেন। সেটি “যে আচ্ছা” বলিয়া বিদায় হইল। বৈদ্যনাথ তমাক খাইতে খাইতে একবার বহির্দার দেশে ও একবার অগ্ন্যবস্কের তলায় পদচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন নিতান্ত চিন্তায় আকুলিত হইল। চিন্তায় নিমগ্ন বৈদ্যনাথ পদচালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে স্বর্ধ্যদেব অন্তর্গত হইলেন। সন্ধ্যাদেবী দর্শন দিলেন। বৈদ্যনাথ কিছুই লক্ষ্য করিলেন না। মাঠ হইতে গোপাল স্বরে রাখিয়া রাখিলেন। তাঁহার বাটীতে দমাচার দিতে আসিল। বৈদ্যনাথকে কুশল সমাচার দিল। বৈদ্যনাথ অচেতনে ‘আচ্ছা’ বলিয়া বিদায় দিলেন। সায়াংদীপ জ্বালা হইল। অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি হইল। একজন মহিলা একটি দীপ লইয়া অগ্ন্যবস্কের তলায় রাখিয়া নমস্কার করিল ও সায়াং-শঙ্খ বাজাইয়া গেল। বৈদ্যনাথ এ সকল চক্ষে দেখিলেন, কিন্তু মনে ইহা স্পর্শও করিল না। দিনান্তরে তিনি পাল ফিরবার সম্বাদ পাইলে স্বয়ং মোটে যাইতে ও গাভী-দিগকে প্রণাম করিয়া আসিতেন। একবার অগ্ন্যবস্কের তলায় প্রণাম করিতেন; অন্য সে সকল নিত্যক্রিয়া কিছুই হইল না। কিছুক্ষণ পরে একজন লোক আসিয়া বলিল “মহাশয় সন্ধ্যার উদ্যোগ হইয়াছে, চলুন, আহ্নিক করুন।” বৈদ্যনাথ যেন কাষ্ঠ পুস্তলিকার মত তাহার অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার বরে প্রবেশ করিলেন। আসনে বসিলেন। আচমনও করিলেন। কিন্তু মার্জ্জনার সময় তাঁহার মন স্থির হইল না। তিনি চিরপরিচিত মন্ত্র সব বিস্মৃত হইলেন। পুনর্বার আচমন করিলেন। আবার আসন পরিবর্তন করিয়া সংযত হইয়া বসিলেন, কিন্তু চিন্তাশ্রাব্য বশত সকল মন্ত্র স্মৃতিপথে আসিল না। অমনি যথাগাথ্য গায়ত্রী ধপ করিলেন। যত সত্ত্বর সন্ধ্যা কার্য সমাপন করিতে মানস করিয়াছিলেন, মনের বিকার বশত প্রাত্যহিক সময়ের তিনগুণ অধিক কাল অতীত হইল, তথাপি সুশৃঙ্খলে সন্ধ্যাকার্য সম্পন্ন হইল না। পরে পুরষপরম্পরাগত নিয়ম মতে অন্তঃশাস্ত্রাদির আরতি করিয়া আপনায় বসিবার স্বরে গিয়া বসিলেন। একজন দাসকে ডাকিয়া গোবিন্দের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, “মহাশয় সনাতন গোবিন্দেব দেখা-পার নাই। গোয়াল ও নূতন বাগান খুঁজিয়া অসিয়াছে। গ্রামে তত্ত্ব লইতে গিয়াছে।”

পরেই দেওয়ানজি কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিলে তাহাকে “অন্য কিছু দেখা হইবে না” বলিয়া বিদায় দিলেন ।

অনেক পরেই ভজহরি আসিল । বৈদ্যনাথ বলিল “ভজহরি, তোমার কি সমাচার ?”

ভজহরি বলিল : “মহাশয় অন্য কেবল দুই প্রহরের সময় ‘সুপর্ণা’ কুপক ছাড়িয়া পটভরে মাস্ত্রাজে যাত্রা করিল । চারি হাজার গাট ঢাকাই কাপড় ও একশত গাট রেশম আর দশ সিঙ্কু আফিম আপনার এই নৌকার পাঠাইলাম । গঙ্গালিনের ডাক্তার দুইশত গাট সালফুরাম এই জাহাজে গেল । চড়নদার বাহান্ন জন । পাঁচ জনা মাস্ত্রাজে যাইবে, বার জন বালেশ্বর, চার জন মহিশুর, এগার জন পুরী, বার জন কলিঙ্গ-পাটন, আর আট জন নীলাচলে যাইবে । ইহাতে জনও গেল ।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন । “তবে তুমি একবার গোষ্ঠে গিয়া অরুণভট্টকে এ সমাচারটি দিয়া যাও ও গোবিন্দকে আমার নিকট পাঠাইও । যদি পথে দেখা হয় ত বলিয়া দিও যে, আমি যাহা করিতে আচ্ছা দিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে যেন না করে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দ্বিতীয় অনুমতির অপেক্ষা করে ।”

ভজহরি “যে আচ্ছা” বলিয়া বিদায় হয়, এমন সময় বৈদ্যনাথ বলিল । “রহস্য” ফিরিয়াছে ?”

ভজহরি বলিল । “আচ্ছা এই এক বটা মাত্র বাটে আসিয়াছে । এখনও তাহা হইতে কেহ নামে নাই । আমি দুইজন চোপদার ও বার জনা পাইক তাহার রক্ষার্থে রাখিয়াছি । গোবিন্দের অবর্তমানে কাহাকেও নামিতে দিতে আপনার আদেশ নাই । কাল প্রাতে আপনার অবকাশ হয় ত একবার গোবিন্দের সঙ্গে যাইবেন ।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন । “তাই ভাল ।”

ভজহরি বিদায় হইলে জনেক লোক আসিয়া বলিল, “মহাশয় গোবিন্দের সাক্ষাৎ পাইলাম না । তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না । বোধ হয় গ্রামে তহসিলে গিয়াছেন । নতুন বাগানে বলিয়া আসিয়াছি, আসিলেই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব ।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন । “তবে একবার বরদাকে ডাকিয়া আন ।”

লোকটি “যে আচ্ছা” বলিয়া চলিয়া গেল । বৈদ্যনাথ গাত্রোথান করিয়া বহির্দ্বার পার হইয়া গোষ্ঠের দিকে চলিলেন । ক্রমে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন । অরুণভট্টের ঘরে প্রবেশ করিয়া অরুণভট্টকে না দেখিয়া গোষ্ঠস্থ কৰ্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন । “অরুণভট্ট কোথায় গেলেন ?”

তাহারা বলিল । “মহাশয় আমরা বলিতে পারি না । মাঠ হইতে আসা অবধি তাঁহাকে দেখি নাই ।”

বৈদ্যনাথ কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিলেন। প্রায় এক দশ কাল অল্পক্ষতীয় প্রতীক্যর থাকিয়া অবশেষে গাত্ৰোত্থান করিলেন। ও তত্রত্য দাসগণকে বলিলেন, যেন অল্পক্ষতী প্রত্যাগমন করিলেই তঁহাকে সমাচার দেয়।

রজনীর অন্ধকারে একা মাঠ পার হইয়া আসিতেছিলেন। ঈষদ্ দক্ষিণ বায়ুসঞ্চরণে শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ হইতে লাগিল। তাহা বহু কাল উত্তর বায়ুর পর ঈষদ্ দক্ষিণ বায়ু কি সুখকর! পক্ষিগুলি অন্ধ হইয়া নিস্তন্ধে রক্ষাধায় লুকাইয়া নিভ্রা দিতেছে। কদাচিত্ একটায় পাখা নাড়ায় ঝটপট শব্দমাত্র বিজন মাঠের রম্য তপোবনোপম বিশ্রাম নষ্ট করিতেছে। কখন কখন বিল্লীর তীক্ষ্ণ, সময়পরিমিত সুরধ্বজগৎ ব্যাপিতেছে, প্রতি-ধ্বনিতে শব্দবহুর বিশ্রাম পূরিতেছে। বৈদ্যনাথের একতান মনকে শব্দ আক্রমণ করিল। তাঁহার কর্ণকুহর শব্দ, প্রতিশব্দে পুরিল। বৈদ্যনাথ আপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া কোন দিকে না দেখিয়া গোষ্ঠের মাঠ পার হইলেন। উদ্বিগ্নমানস থাকায় বরাবর মাঠ দিয়াই চলিলেন, গোষ্ঠ হইতে তাঁহার সম্মুখ বাড়ি ঘাইবার পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমান্বয়ে পশ্চিম মুখে মাঠ বাহিয়া চলিলেন। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। অন্ধোদিত চন্দ্রকিরণে মাঠ শোভিল। দিব্য সমীরণে তাঁহার সমস্ত শিরা স্নিগ্ধ হইতে লাগিল। প্রায় দুই ক্রোশ পার হইয়া, ক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন। বন দেখায় বৈদ্যনাথের চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলেন কোথায় আসিলাম। পদচালন বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রেই বুঝিলেন যে, তাঁহার আবাস হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশের অধিক পশ্চিম দিকে আসিয়াছেন। বন পার হইলেই মেঘনার মোহানা। একবার করতল দিয়া আপনার ললাট চাপিলেন। চন্দ্রুর্দয় মুদ্রিত করিলেন। আবার ক্ষণেক পরেই চাহিয়া দেখিলেন যে, সত্যই বনের মধ্যে আসিয়াছেন। প্রত্যাগমন চর্যট, পথভ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। বনের পথ অবগত ছিলেন না। চন্দ্র লক্ষ্য করিয়া পূর্বদিকে গেলেই মাঠে পড়িবেন, পরে আপনার আবাসে ঘাইতে পারি-বেন। এই স্থির করিয়া ফিরিলেন এবং কেবল চন্দ্রের দিকে চলিতে লাগিলেন। বনমধ্যস্থ পথ দেখিতে না পাওয়ার এক অতি বৃষ্টি কটকাবর্ণ বস্ত্রে পণিলেন, চতুর্দিকের কটকরাশিতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। দুই চারিবার পাদচালনের পর অগম্য কটকাবরোধ তাঁহার গতিরোধ করিল। অগত্যা সে দিক্ ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া পার্শ্বে ঘাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই আর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ক্রমে এক স্থান ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গমন করিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হওনের আশ্রমে কেবল দক্ষিণ দ্রোণে ঘাইতে লাগিলেন। ক্রমে পথভ্রমে নিতান্ত খাসরাহিত হওয়ার ব্যাকুল হইলেন। মনঃসীতার উপর শরীরকট একান্ত অসহ্য হইল। বহি-

কৃত হওনের পথ লক্ষ্য হইল না। বৈদ্যনাথ ভাবিলেন, ‘একি বিপদ, এক্ষণে কিরূপে বদ হইতে নিষ্করণ করি। একাকী এ নির্জন বনে রাত্রি বাস করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অনিয়মি এ বন বরাহ ও বৃকচের পূর্ণ। রাত্রিকালে নিরাশ্রমে কি প্রকারেই বা থাকিব। হয় ত অন্যই কোন হিংস্রক জন্তুর নৃসংশ দংশনে চর্কিত হইব বা সর্পের লীডল আজ পক্ষিল পাশে বদ্ধ হইয়া নিম্পোড়িত হইব। আমি কি অন্যকার কষ্ট সহ্যের জন্তই জীবিত ছিলাম। হা বিধাতঃ! কেন আমাকে কুপথে আনিয়া সঙ্কটে ফেলিলে। জন মাভররও শব্দ পাইতেছি না। এখানেই বা এ সময়ে কাহার প্রেরণা?’ দূরের একটি পুরাতন অস্থ বৃক্ষের কোটর হইতে একটি তরুণক বিকট শব্দে উত্তর দিল। শব্দমাত্রেই বৈদ্যনাথের হৃৎকম্প হইল। আবার তাহারই অব্যবহিত পরে একটি পুরাতন মাচালের ভীষণ গর্জন বঙ্কমায় বন পুরিল। বৈদ্যনাথের শরীর লোমাক্রান্ত হইল। বৈদ্যনাথ সিংহরিয়া বসিয়া পড়িলেন। বন বন নিঃশব্দ বহিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একান্ত কাণ্ডর হইলেন। ক্রমে ক্রমেই উর্জ্জ্বল আশ্রয় করিলেন। কত ক্রমের পর বৈদ্যনাথ পূর্বদিক্ দিয়া নিষ্করণে হস্তাশ হইয়া গাঢ় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ত্র্যোৎসায় পথ লক্ষ্য করিয়া ক্রমে বনের পথ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখেন একটি কাঠের নগরী কুটীর। তাহার অব্যবহিত দূরে একটি অতি প্রকাণ্ড বটগাছ। কুটীরের চতুর্দিকে কাঠের বেড়া। বেড়ার ঘরটি ছোট। বেড়ার উপর মানাধি লতা আশ্রয় করিয়া শাখা-প্রশাখায় প্রায় সমস্ত বেড়াটি আচ্ছাদন করিয়াছে। দূর হইতে কুটীর দৃশ্য হয় না। কুটীর দর্শনে বৈদ্যনাথের মন জনমিলন আবার প্রকৃত হইল। কুটীরে গিয়া আশ্রয় লওয়া স্থির করিয়া তাহার ঘরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঘরটি লোহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। শৃঙ্খলগ্রাহ্য মোচন করিয়া দ্বার ‘দয়া কুটিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। অভ্যন্তর হইতে অগণা দিয়া ঘরটি রুদ্ধ করিলেন। ক্রমে কুটীর ঘরে প্রবেশ করিয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন একটি দীপ জলিতেছে, ঘরের মধ্যে তিন খানি কাঠের প্রায় দুই হাত উর্জ্জ্বল পাদপীঠ (১)। মধ্যে চতুর্কোণ একটি কাঠের ত্রিপদী (২)। ঘরের অপর দিকে দুইটি পর্দা, কাঠের প্রাচীরে দুইটা বনুক ঝোলায় রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে বারুদ ও তুলির ভোবড়া দশটা। অপর পার্শ্বে পাঁচটা ধনু, বোল সতেরটা ভূণ হুতীক শরপূর্ণ। দুইটা তলবারি, একখানা চন্দ্র, একটা কুপাণী। অপর দিকে ছিপ, বরসা, ভীষণ ধ্বংস। দীপ্তমান চন্দ্রহাস-ঘর। ঘরের পূর্বদিকে আর দুইটা ছোট ছোট ঘর। একটীর জব্যাদি দেখিয়া

রক্তমাখা বোধ হইল। অপরটী কেবল দ্রব্যচরে পূর্ণ। বড় বড় সিন্ধুক, পেটীয়া, বাত্রা, প্রায় সরের চালপৰ্য্যন্ত সাজান আছে। সবে দ্রব্যাদি লক্ষ্য করিয়া বৈদ্যনাথ বিশ্রাম লাভেচ্ছায় কুটীরের অন্তর্দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দীপটী উজ্জল করিয়া এক পর্ধ্যক্ষে শয়ন করিলেন। পথপ্রমে নিজে শীত্রই আনিয়া কিন্তু স্থানান্তরিত হওয়ার অর্জনগেহের মধ্যে স্থখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। পর্ধ্যক্ষে শয়ন করিয়া আপনার বিপদ বিপদ, দুর্গার কুপায় বিজন অরণ্যে আশ্রয় লাভ। আব'র অরুদ্ধতীর কথা শ্রবণে, তাহার উপায় চিন্তা, বরদাকণ্ঠের মনে চাকলা, তাহার মনে পর্ধ্যায়ক্রমে উঠিতে লাগিল। একের পর অপর অপরের পর আর একটি চিন্তায় বৈদ্যনাথের মন ডাডিত হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ পর্ধ্যক্ষে কেবল পার্শ্ব ফিরিতে লাগিলেন। কিছুতেই স্থখবোধ হইল না। শয্যাকটক হওয়ার নিত্যন্ত অস্থির হইয়া একবার এপাশ, একবার ওপাশ করিতেছেন, এমন সময় দ্বারে লোকের শব্দ হইল। বৈদ্যনাথ ব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, ভাবিলেন, ভাল হইল গৃহকর্তা আনিতেছে একা বনমধ্যকুটীরে থাকাপেক্ষা দুই জনে সংকথায় কালবাণন করা সুখকর।' শয্যা হইতে উঠিয়া কুটীরদ্বারে যাইতে, শুনে বাহিরে চার পাঁচ জন দ্বার খুলিতে ক্রুরধ্বনিতে আদেশ করিতেছে। বাহির হইতে বলিল। “কে আমাদিগের আবাসে আছ। শীত্র দ্বার খুলিয়া দাও, নতুবা আমরা দ্বার ভাঙ্গিয়া তোমাকে হামাগুর পঠাইব। কে দুরাচার আমাদিগের নির্জনে কুটীরে পলবিক্ষেপে আপনার মুণ্ডকে শাস্ত্যর্হ করিল। কে নরাধম দহ্য আমাদিগের কুটীরের নির্জনে নষ্ট করিতেছে। কে আমাদিগের ক্রেশোপার্জিত ধনচয় অপহরণার্থে এ জনশূন্য বনে আসিয়াছে।” বাহিরের এইরূপ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথের মন হইতে আশা কণা অপহৃত হইল। বৈদ্যনাথ ভীত হইলেন। এত ক্ষণে বুঝিলেন যে, এ বাসটী-কোন ভদ্রলোকের নহে। আর ভদ্রের বাস এ জনশূন্য বনেই বা কেন হইবে। ব্যাধেরও স্রন নহে। ব্যাধের স্রনে এত দ্রব্যাদি থাকা অসম্ভব। বৈদ্যনাথের কণ্ঠ শুক হইল। বৈদ্যনাথ আর পলচালনে অশক্ত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, বহুজন্তু অপেক্ষা পাষণ্ড মানুষ অধিকতর হিংস্রক ও ভয়ানক। বৈদ্যনাথ পরিভ্রাণের কোন উপায় চিন্তা করিতে পারিলেন না। দ্বার রুদ্ধ রাখায় পরিভ্রাণের আশা নাই আনিয়া, কুটীরের দ্বার খুলিলেন। প্রাঙ্গণে দেখেন, কতকগুলি ছোট ছোট বোপ আছে। ব্যস্তে সবে পুনর্বার প্রবেশ করিয়া দীপটী নির্বাণ করিলেন। অন্ধকারে স্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অতি সস্তর্পণে বহির্দ্বারটী খুলিলেন, অমনি একখানি চৌকী আনিয়া, তাহার উপর বসাইয়া আপনি ব্যস্তে বোপের মধ্যে অন্ধকারে লুকাইলেন। বাহিরের লোকেরা বন বন দ্বারোক্তাটনের অস্ত্র চীৎকার করিতে লাগিল। কাহারও উত্তর না পাইয়া, ভূয়োভূয়ঃ শাসাইয়া গালি শাপ প্রভৃতি দিয়া, বলে দ্বারে পদাঘাত করিল। দুই তিন পদাঘাতে

চৌকিটা উলটাইয়া পড়িল। অমনি দ্বারটী খুলিয়া গেল। রোষ বশে তাহার পাঁচজন বেগে প্রাণ দিয়া স্বরে প্রবেশ করিল। অমনি সেই অবকাশে বৈদ্যনাথ বহির্দ্বার দিয়া বাহিরে গেলেন। চারজন কুঠীতে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে চলা অভ্যাস থাকায় শীঘ্র অগ্নি আনিয়া দীপটী জালিল। দীপালোকে একেবারে স্বরের চতুর্দিক্ দেখিয়া একজন বলিল। “আনখনি স্বরে কে ছিল, সে কোথায় গেল?”

আনখনি উত্তর করিল। “স্বরে আবার কে থাকিবে?”

প্রথম বস্তা বলিল। “কেন আমি যাইবার সময় স্বরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম। আসিয়া দেখিলাম, বাহিরের শিকলি খোলা। তারপর, আবার ভিতর হইতে দ্বারের উপর চৌকীই থাকে রাখিল। এই দেখ এ শয্যা এখন গরম আছে ও যে শুইয়াছিল তাহার শরীরের তরে বালিশ ও গদি মধ্যে বসিয়া গেছে। রুড এ বড় সহজ কথা নহে। চল দেখিয়া আসি। আনখনি ত গ্রাহ্য করিল না।”

রুড বলিল। “আনখনি য় বলে ফ্রান্সিস্কো শুন। ভিতর হইতে চৌকী দ্বারের উপর কে চাপিয়া দিল।”

রুড গোমিস তমাক খাইতে খাইতে বলিল। “এখন তাহার বিচারে আর কি প্রয়োজন, বস আপন আপন আহার করিয়া বিশ্রাম লও। কেহ আসিয়া থাকে আনিয়াছে, তাহাতে আমাদিগের কি ক্ষতি। সে সদর দ্বার দিয়া পলাইয়াছে। নতুবা আর পলাইবার পথ নাই। এখন স্বরের ভিতর দেখিয়া দ্বারবন্ধ করিয়া বিশ্রাম কর। আর অনর্থক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমায় কিছু খাইতে দাও।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “গোমিসের কথা শুনিলাম। যে দিক যাও, গোমিস আপনার খাইবার কথা ভুলে না। গোমিস তোমার খাইয়া কি আশ মেটে না?”

গোমিস মুখ নামাইয়া রোষে গভীর স্বরে বলিল। “কি খাইলাম যে আশ মিটিবে? তোমরা সকলেই আমাকে অধিক খাইতে দেখ কিন্তু যখন খাইতে বস। স্বয়ং তখন দুর্ভাগা গোমিসের অন্তঃকরণে কখনই আর সমান অশন মিলিল না।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “সে দোষ আমাদিগের নহে, তোমার দাঁত নাই, তুমি অতি মন্দে খাও কাজেই সকলের শেষ হয়।”

গোমিস বলিল। “আমিও ত তাই বলিতেছি। আমার কৃত্যংশ কেহই ছাড় না। তোমরা নীচ খাইয়া অধিক আশ্রয় কহ, আমি চিরকাল অর্জননে জীবন কাটাই।”

রুড বলিল। “আমি যদি তোমায় খাইতে দিই, তবে কি হইবে?”

গোমিস বলিল। “তবে পূর্ব্বকার দোষ সব ভুলিবা।”

আনখনি বলিল। “ফ্রান্সিস্কো কিছু খাদ্য আন, আমরা সকলেই প্রাস্ত হইয়াছি।”

ফ্রান্সিস্কে গৃহান্তর হইতে কিছু খাদ্য আনিয়া তেপারায় উপর রাখিল। আর একটা মাটির অগ্নি কঠোর একজন মদ একটা পিপে হইতেও আনিল। আনখনি ও রুড তেপারা-টাকে ধরিয়া গোসিস বে পর্ধ্যকে বসিয়াছিল, তাহার নিকটে আনিল। আনখনি ও রুড মাটির অগ্নী লইয়া অভিক্রমি পর্ধ্যন্ত মদ পান করিল। ক্রমে অপর তিনজনে অগ্নী তৃষ্ণ করিল। গোসিস পানান্ত্র একটা দীর্ঘ বাস ছাড়িয়া বলিল। “গঙ্গাধিপ আলিলে আনখনিগকে অবশ্য পুরস্কার দিবে, অন্যকার মত কস্ম অনেক দিন হয় নাই।”

আনখনি বলিল। “সে ছুঁড়িটা ন্যূন সংখ্যা হুই শত ধাম মোহরে বিক্রয় হবে।”

রুড বলিল। “ছোঁকাটা কি গোয়ার। গারে জোরই কত। গোসিসকে যে কিলটি মেরেছিল, আমার বোধ হ'ল বুঝি সেই খানেই গোসিসের কবর হইল।”

আনখনি বলিল। “তোমরা তাদের দেখা পেলে কোথা।”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “জামরা বৈদ্যনাথের ‘হুর্গনখা’ মেরে বেঙ্গামিনের ঘর থেকে আদিত্তে দেখা পাই।”

আনখনি বলিল। “তবে তোমরা আমার আনিবার অভি অল্প পূর্বেই গোল আরম্ভ করিয়াছিলে।”

রুড বলিল। “ছুঁড়িটাকে ধরিবার পরই জুনি এসে উপস্থিত হইলে। জুনি আজ কয়েক দিন কোথায় ছিলে।”

অনখনি বলিল। “আমি আজ যক্ষপুর হইতে আসিতেছি।”

রুড বলিল। “যক্ষপুরের কিছু নূতন সমাচার আছে?”

আনখনি বলিল। “সেখানকার আমীরেরা সকলেই প্রস্তুত আছে, বলিল অনু-পরাম আসিয়া পৌঁছিলেই তাহারা সকলে ধস্তাধস্ত হইবে। একজন অনুপরামের ভয়কে এক পত্র দিয়াছে, আমি সেটি দিতে প্রথমে অনুপরামের বাসায় বাই।”

গোসিস বলিল। “কেন তুমি কি জাননা যে অনুপরামের ভয়ী গঙ্গাধিপের প্রেরণী হইয়াছে।”

আনখনি বলিল। “না আমিও ভাবিয়াছিলাম যে হুই তিন দিনের মধ্যে তাহা-দিগের বিবাহ হবে কিন্তু মনে করিলাম, বুঝি অল্পকালী অনুপরামের বাটীতেই আছে।”

রুড বলিল। “তার পর জুনি কোথায় তার দেখা পেলে?”

আনখনি বলিল। “আমার এখন একটি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “জুনি যে যক্ষপুরে গিয়াছিল, আমি তাহা কিছুই জানিতাম না।”

আনখনি বলিল। “জানিবে কি করে। আমাকে হঠাৎ প্রস্তুত হইতে হইল।”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “কেন, তোমাকে কি জন্ত এত ভাড়াভাড়ি বাইতে হইল?”

আনখনি বলিল। গঙ্গালিঙ্গ যশোরাদিপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যে দিন যাত্রা করিবে তাহার পূর্ব দিন সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিল। “আনখনি আমার অনুপরামের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে না। আমার বোধ হয় অনুপরামের সমস্ত প্রবন্ধনা। বাহা হউক, কল্য আমাকে এখন হইতে যাত্রা করিতে হইবে। সনদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া স্থির হইতে পারিব না। হস্ত বরাবর যক্ষপুরে যাত্রা করিতে হইবে। যক্ষপুরে সৈন্ত সামন্ত কত ও অনুপরামের দলভূত কে কে তাহা বিশেষ জানা আবশ্যক হইতেছে। অতএব তুমি এই ক্ষণেই যক্ষপুরে যাত্রা কর, সমাচার আনিয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হইবে। সনদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বড় জোর দুই দিন আমার প্রতীক্ষা করিবে। আমার দেখা না পাও সৈন্ত সব একত্র করিয়া ফ্রান্সিস্কে সঙ্গে লইয়া লেম্পোর মোহনার গুপ্তভাবে আমার প্রতীক্ষা করিবে। আমি সনদ্বীপে না যাই ত সেই স্থানে নীজ পৌছিবা।”

রুড বলিল। “তবে যক্ষপুরে কি দেখিলে?”

আনখনি বলিল। “যক্ষপুরে যাহা দেখিলাম তাহা বড় সুবিধার কথা নহে। যক্ষরাজ অত্যন্ত প্রজ্ঞাপ্রিয়। কেবল আমীরেরা তাহার উপর অসন্তুষ্ট। তাহারাই অনুপরামের প্রতীক্ষা করিতেছে। একজন বোধ হয় অরুদ্ধতীর প্রেমাস্পদ। আমাকে অনেক করিয়া অরুদ্ধতীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি অরুদ্ধতীকে কখন দেখি নাই। কি করি বত পারিলাম, কলিত উত্তর দিলাম। অবশেষে সে আমাকে চারধান মোহর ও দুইটা বড় হস্তদস্ত দিল ও বলিল, তুমি এই পত্র খানি লইয়া অরুদ্ধতীকে দিও।”

গোমিস বলিল। “গঙ্গালিঙ্গের ঘরে পত্র দিতে গিয়াছিল, ভাল, মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে কি আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল?”

আনখনি বলিল। “মেরি তোমার নামও উল্লেখ করে নাই।”

রুড বলিল। “কেন এতলোক থাকিতে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে?”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “অরুদ্ধতী পত্র দিলে, কি বলিলেন?”

গোমিস বলিল। “এখন সে আর অরুদ্ধতী নাই, এখন তাহাকে জুলিয়ান বলিতে হয়।”

আনখনি বলিল। “জুলিয়ানর অবেশে আমি অনুপরামের ঘরে গোলাম। আমি জানিতাম না যে অরুদ্ধতী সেখান নাই। সেখান অরুদ্ধতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব বলায় একটি বৃদ্ধা দাসী মাত্র ছিল, কাতর স্বরে কাঁদিল। বলিল ‘অরুদ্ধতী কোথায় তাহা আমি জানি না। অনুপরাম আসিলে আমি কি বলিব। অরুদ্ধতী অনুপরামের গমনের পর দিন অবধি কোথায় নিয়াছেন। কেহই জানে না।’ বৃদ্ধাটি অবিচ্ছেদে

কঁদেতে লাগিল। আমি কিছু ক্ষণ অবস্থান করিয়া গম্ভীৰ্ণভাবে বলিলাম, “বাবা আমার রক্ষা কর, তুমি এখন যাইও না। অনেক দূর হতে এসেছ। বস, বিশ্রাম করে কিছু জলযোগ কর।” কি করি মগ্ধ্যা সম্মত হইতে হইল। বুদ্ধাটিকে কিছুক্ষণ মধ্যে আমার জলযোগের উদ্যোগ করাতে আমি হাত পা ধৌত করিয়া জলযোগ করিলাম। বুদ্ধাটিকে বলিলাম, “মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যদি অরুদ্ধতীর কোন সমাচার আনিয়া দেন তবে আমি এখানে থাকিতে পারি, নতুবা আমাকে স্থানান্তরে পলাইতে হইবে। কোথায় বা বাই; সে দুর্দান্ত অনুপরাম আমাকে নিশ্চয় মারিয়া কেলিবে। আমার মরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু অপব্যত মৃত্যু ভয় করি। মহাশয়ের কি মরিবার ভয় হয় না? আমার পুত্রটী বড় পণ্ডিত হইয়াছিল। নামতা তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। সেটির বিবাহ দিবার পরামর্শ করিয়াছিলাম। বৌটী নিতান্ত সুন্দরী। আমার মত বর্ণ। চুল আমার অপেক্ষা ছোট ছোট ছিল বটে কিন্তু বড় লক্ষ্যমস্ত। আমার বাপের ঘরে মহাশয়ের মত কত লোক ছিল। কৃষ্ণদাস আমার বালককালের আত্মীয়। সে আমার বড় ভাল বাসিত। সে দিন কি আর হবে? আমার কৃষ্ণদাসও মরিয়াছে। যম কি নিষ্ঠুর। কৃষ্ণদাস ছুতারের কাজ করিত।” বুদ্ধাটী এই মত কত অসঙ্গত কথা বলিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। আমি যত বিদায় হবার জন্ত ব্যস্ত হইলাম, বুদ্ধাটী ততই আমাকে জেদ করিয়া বসাইল। প্রায় দুই ঘণ্টার পর সেখা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাহির হইলাম। পথে ভিক্টোরের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সেই আমাকে বলিল যে, “অনুপরামের ভদ্রী অরুদ্ধতীকে গঞ্জালিস বিবাহ করিয়াছে। এক্ষণে গঞ্জালিসের বাসায় আছে জুলিয়ানা বলিলে সকলেই বলিয়া দিবে।” তাহার পর জুলিয়ানাকে পত্র দিয়া আসিতেছিলাম।”

গোমিস বলিল। “জানি, সে বুদ্ধাটী বাতুল। দিবারাত্রি সবলকেই এইরূপ করিয়া বলে।”

রুড বলিল। “অনুপরামের ভদ্রার সহিত গঞ্জালিসের বিবাহ হওয়ায়, হিন্দুরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধাটী তাহাতেই উদ্ভাসপ্রায়।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “তবে আনথনি, তুমি এখন আজ কোথায় যাইতেছিলে?”

আনথনি বলিল। “আমি তোমাদের অভ্যাস দেখা করিতে আসিতেছিলাম।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “তবে চল একবার গেডিজ যাই, দেখি আমাদের বন্দীরা কি করিতেছেন, গোমিস তুমি এইখানে শয়ন কর।”

গোমিস বলিল। “যাও, আমি ঘর রুদ্ধ করি।” আনথনি, ফ্রান্সিস্কা ও রুড একত্র হইয়া কুটারের বহির্দেশে গেল। গোমিস ঘর রুদ্ধ করিল।

বৈদ্যনাথ বর হইতে বহির হইয়া কুটীরের পশ্চাভাগে গিয়া ইহাদিগের সমস্ত কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের বহির্গমনে পরামর্শ শুনিয়া কিছু দূরে বাইয়া এক গাছের পশ্চাতে লুকাইয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা অনেক দূর চলিয়া গেলে আপনাদের আদৃষ্টকে প্রার্থনা করিয়া দ্রুতপদে বনমধ্যে বাইতে লাগিলেন। তাহিলেন “এ দস্যুরা আমার ‘স্বর্ণবাণ’ মারিয়া লইয়াছে। ইহারা গজালিনের লোক। কি অস্বাভাবিক! ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে কাহারও রক্ষা নাই। অন্য আমাকে পাশ্চাত্য মারিয়া ফেল, এখন লুকাইয়া থাকা কর্তব্য। কল্যাণে লোক দল লইয়া বেজামিনের ঘরে গেলেই সব মামা পাইব। আমি প্রাতে দেখিব ইহাদিগের কত লোকবল। ‘স্বর্ণবাণ’ অনেক মাল ছিল। হায়! ক’ত নষ্ট হইল। হস্ত জাহাজটিও নষ্ট করিয়াছে। আমার আহায়েও প্রায় ত্রিশ জন সৈন্য ছিল। ছুটা তোপও ছিল। এ সব কি ইহাদিগের হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।” কিছু দূর গিয়াই চমকিয়া স্থির হইলেন। নিকটে মনুষ্যের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন; বোধ হইল যেন পাদবিক্ষেপশব্দে লোকটি নিশ্চল হইল। বৈদ্যনাথ কতক্ষণ স্থির হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর লোমাকীর্ণ হইল। তিনি দুর্গামায় জপ করিয়া আবার আপন পথে চলিতে লাগিলেন। প্রাতি পান্ধলে চতুর্দিকে সমস্তে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তত নিশীথকালে বিভ্রমবনে মনুষ্য-শব্দ পাইলেন বলিয়া তাঁহার মনটি এককালে আকুলিত হইয়াছিল। সম্মুখে একটি প্রায় তিন হাত উচ্চ কুম্ভবর্ণ প্রাচীর দেখিয়া বুঝিলেন, কোন লোকের আবাস হইবে। আর সেই স্থান হইতেই শব্দ আসিয়াছিল, ইহা স্থির করিলেন। ক্রমে নিকটস্থ হইলে দেখেন সেটা কাল হাঁড়ির প্রাচীর। দীর্ঘে প্রায় দশহাত। কেবল উচ্চিষ্ট হাঁড়িচয়; একের উপর আর একটা করিয়া সাজান। বরের প্রাচীর ভ্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে হাঁড়িরাশি দেখিয়া তাহা বম পার্শ্বে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখেন, সে দিকেও সেইমত হাঁড়ির প্রাচীর। ক্রমে অপর হুই দিকেও তাহাই দেখিয়া কিছু চমৎকৃত হইলেন। তাহিলেন, একি! একরূপ অসাধারণ ব্যাপার ত কখনই দেখি নাই। এটা যে হাঁড়ির বর দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার আচ্ছাদন নাই। বহুক্ষণ তথায় থাকিয়া চারিদিক্ বেটন করিয়া তাহার দ্বার খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে তাহার ভিতরে বাইয়া নিশ্চিন্তে স্নাত্তি বাপনের স্থির করিয়া একে একে কঁতকগুলি হাঁড়ি নামাইয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আরও চমৎকৃত হইলেন। দেখেন একটা অতি শীর্ণ, শুষ্কমাংস, কুম্ভবর্ণ বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহার কটীদেশে অতি সুললিত বস্ত্রখণ্ড মাত্র। সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রহীন। মস্তকে শুভ্রবর্ণ কেশরাশি। তাহার মুখটা ক্রীণ। বদনের অস্থিগুলি কেবল শুষ্ক সঙ্কুচিত চক্ষারূপ। নাকটা দীর্ঘ। হস্তদ্বয়

উক্ত। পশ্চিমদেশে মাংসভাব বশত মুখের মধ্যে টাল খাইয়াছে। তাহার একটি মাত্রও দন্ত নাই। চিবুক ঝুলিয়া পড়িয়া মুখের ফাঁকটাকে অনির্বচনীয় ভীষণ করিয়াছে। ঠোঁট নাই বলিলেই হয়। মুখের ভিতরের সাদা মেড়ে দেখা বাইতেছে। চন্দ্রবর ব্রহ্মবর্ষ গোং, মুদ্রাকার ও গহ্বরগত। ভ্রুর কুটিল। ললাট প্রশস্ত ও চর্মখরখারত। সমস্ত শরীর ক্ষীণ। মাংসহীন। কণ্ঠের অস্থিষয় বন্ধ হইয়া বাহ্যমূলে মিলিয়াছে। কণ্ঠা ও স্বর মধ্য দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড স্ফেটিকরূপ টোল। তাহার লোল চর্ম নিম্নস্থ হৃদয়বেগে হুলিতেছে। বক্ষের পঙ্করগুলি পর্যায়পরস্পরা উরোস্থিতে মিলিয়াছে। উত্তর পার্শ্বের বাহ্যমূলে অস্থির গ্রন্থিষয় দেখা বাইতেছে। লোল শুক চর্মখারত পঙ্করগুলির উক্ত নীচ গাভি স্পষ্ট দেখা বাইতেছে। অগ্রশস্ত শীর্ণ বক্ষস্থল হইতে সমুচিত, ক্ষীণ, দীর্ঘাকার, অগোকা প্রায় স্তনযয় লক্ষ্যমান। কুক্ষির অন্তগুলি অনাগর ও অগ্নাহারে শুক হইয়াছে, বোধ হয় উদরের চর্ম একাশে পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড স্পর্শ করিতেছে। অস্ত্রের লেশ মাত্রও নাই। কক্ষের নিকট শরীরটি অপ্রশস্ত। পঙ্করগুলি উদরের নিকট তলপেকা কিছু প্রশস্ত। পদযয় যেন শুক শাখামাত্র। বহু চলনে শরীরগুলি উঠিয়াছে। বুদ্ধাটি আটটি নরকপালের উপর বসিয়া হুলিতেছে। পার্শ্বে বসন্তগুলি হৃদয়বস্তুরাশি। দক্ষিণ পার্শ্বে একটি নরকপালের পায়ে অনুভবে বোধ হয় জ্বালাছে। বৈদ্যনাথকে তাহার হৃগের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বুদ্ধাটি স্থির হইল। এরূপ ভয়ানক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল যে, বৈদ্যনাথ স্পন্দরহিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বুদ্ধাটি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া অকস্মাৎ এরূপ অনৈসর্গিক স্বরে হাসিল, যে, অট্টমাসের বিকট শব্দ ও বুদ্ধাটির ভিত্তিতে বৈদ্যনাথের হৃৎকম্প হইল। কি কঠিন পক্ষময়! কি পলদেশ বাঁকাইবার ভক্তি! কি চক্ষের বিভীষিকা! যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। হাস্তের হীঃ হীঃ শব্দে চতুর্দিক পুরিল। নিকটস্থ তরুশাখাযুক্ত সুপ্ত পক্ষিচর চমকিয়া ফর ফর করিয়া পক্ষ লাড়িয়া উড়িয়া উঠিল। বুদ্ধার নরকপালাসন তাহার শরীরহিম্মোলে মড় মড় করিল। বোধ হইল যেন তাহারও হাসিল ব্রতলয়না, ভীষণবদনা বুদ্ধা হাস্যভবে বলিল। “বৈদ্যনাথ, বয়সের পিতা, সনদীপের জমীদার ও মহাজন” একথা শুনি এত নীচ বলিল যে, বৈদ্যনাথ কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার আরম্ভ করিল। “অমুপরাধের ভগ্নী অক্ষতী!—তোমার পুত্র বরদাকর্ষ!—ও তোমার সরকার গোবিন্দ!—বাও সনদীপের আধকারী বাও। আমি হুংখনী, অলাধা, হুঁতাপা, কুংসিতা, বুদ্ধা। বাও বরদাকর্ষের পিতা বাও। আমার রূপ নাই, বোঁবল নাই, ধন নাই। বৈদ্যনাথ বাও হুং হও। এককালে আমার রূপও ছিল, ধনও ছিল, বোঁবলও ছিল। বাও এখন আমার সেবা কেন করিবে। হুং হও। দূর হুং, দূর, পাপ, নরাধম, পিশাচ, পাবণ, পক্ষমপাতকা,

মৃৎ । মৃৎ, মৃৎ, মৃৎ:—হীঃ হীঃ হীঃ হীঃ” বুদ্ধাটী আবার হাসিল ; সেটী হাস্য নহে; সে যে ডাকিনীর হস্মার । বৈদ্যনাথ নিজীব শুভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন । “ভাবিলেন এ আমাকে কি প্রকারে জানিল । এ অরুন্ধতীকে জানে । বরদাকণ্ঠকেও জানে ।” বুদ্ধাটী বলিল । “বরদার বাপ, অরুন্ধতীর স্বভাব, গোবিন্দের প্রোতপালক, হুঁ হও । আমি এখন অনাথা, আমাকে কেন স্থান দিবে ? কচুরায় থাকিও ত তাহার রেবতীকে চিনিও । পাপ প্রোতপাদিত্য । পামাণহৃদয় বসন্তরায় জানে রেবতী কেমন রূপসী । এই কশালে সিল্পুর দিলে কি শোভা; পায় ?” রেবতী উঠিল । বৈদ্যনাথ, রেবতী উঠিয়া তাহার দিকে আসা উপক্রম দেখিয়া সিংহরিলেন ও অঙ্গে অঙ্গে পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন । রেবতী বৈদ্যনাথের দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না । আপন মনে ছিন্ন বস্ত্রগুলির মধ্যে শুক, দীর্ঘনখ বিশিষ্ট দীর্ঘকাঠকলকের মত হাতটি দিয়া বস্ত্রগুলি উলটাইতে লাগিল । ক্ষণেক এইরূপ করিয়া ক্রমে বস্ত্র এক একটি করিয়া হস্তে তুলিয়া তাহার প্রতিবেশে দেখিতে লাগিল । ছিন্ন, মলিন, বস্ত্র খণ্ডগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র । তাহার প্রত্যেককে উঠাইয়া দেখিতে লাগিল । দশ বার থানা টুকুরা ভাঁটাইয়া একবার লফাইয়া উঠিল । উর্দ্ধে করতালিত্রয় দিয়া আপনটী তিনবার প্রদাক্ষণ করিয়া আসনে আসিয়া বসিল । ধোয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুঃস্বয় মুগ্ধত করিয়া করে জপ-সংখ্যা রাখিতে লাগিল । বৈদ্যনাথ এক দৃষ্টে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিলেন । এক মুহূর্ত্ত মধ্যে রেবতী আবার চাহিল । বৈদ্যনাথের চক্ষে তাহার চক্ষু মিলিল । সে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল । “তুই কে, কেন এখানে আসিয়াছিস্ ? দূরহ, দূরহ, দূরহ ।” বৈদ্যনাথ এতক্ষণে বুঝলেন এটা উদ্ভ্রান্ত । এত রাজ্যে সেস্থান হইতে কোথায় যাই ভাবিয়া সেই স্থানে বাসিলেন । বৈদ্যনাথকে বসিতে দোষিয়া রেবতী বলিল “বৈদ্যনাথ, আমার শ্রিয়, আশ্রয়, বল, তোমাকে মস্ত দিব । আমার শিষ্য হও ।” বৈদ্যনাথ কোন উত্তর করিলেন না । রেবতী বলিল । “ভয় করিও না । আমি তোমাকে শিষ্য করিলাম । তোমার পুত্র বরদাকণ্ঠ, অনুপমায়ের ভগ্নী অরুন্ধতী, তোমার সরকার গোবিন্দ, এংজ হইয়া তোমার মাথা ধাইতেছে । কড় কড় করিয়া চিবাইতেছে । আমি দোষিয়া আসিলাম । তুমি নিতান্ত মূর্থ । কোন কিছুই বোঝ না । আহাঃ উঃ কি দাঁতের জোয় । বাপরে বাপ । আঁ, আঁ, আঁ, আঁ ।” রেবতী এমনত কাতর স্বরে আর্জনাৎ করিল ও এমনত মুখের ভঙ্গী করিল যে, বৈদ্যনাথ ভাবিল, বুঝি তাহার কোন উৎকট যাতনা উপাস্থত হইয়াছে । রেবতী অতি বিকটে চক্ষুঃস্বয় মুগ্ধত করিয়া নাসিকাগ্র সলুচত করিয়া কুটিল জ্বলয় আরও কুটিল করিল । কাণ শরীর বেল বাহনায় বজ্র হইল । শুক কুঁকি আরও ব্যাবৃত্ত হইল । রেবতীর ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লাগিল । অবশেষে একবার অঙ্গটি ব্যাবৃত্ত করিয়া উলিল ।

অমনি বৈদ্যনাথ সন্তে অগ্রসর হইয়া হস্ত বিস্তারিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন। হৃদ্যটি সিহরিয়া বলিল “দেখিস্ আমাকে ছুস্‌নি, দূর দূর।” বৈদ্যনাথ অমনি ভয়ে জলৌকার মত হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন। রেবতী বলিল “অল্পকৃতীকে স্থান দিবে বই কি, সে যে যুবতী, রূপসী, রাজকন্যা।। তোমার পুত্র তাহাকে প্রেয়সী করিয়াছে, আমাকে কেহই জিজ্ঞাসা করে না। আমার যখন বয়স ছিল, তখন একদিন যজ্ঞের াজাও আগ্রহে কটাক্ষ করিয়াছিল। তখন আমি সাড়ী পরিডাম। সে দিন কোথা গেল? আমার হাতে সোণার কঙ্কণ ছিল। আহা! যে দিন বসন্তরায় আমাকে কচুবস হইতে বাহির করিল। আমার কতই মান করিল। সে দিন আর আসিবে না, আসিবে না, বা যায় আর আসে না, পোড়া মন কিন্তু ভোলে না। ভোলে না, ভোলে না, কি মজা ভোলে না, তাই বলি বৈদ্যনাথ ভুলে না। এ বুড়ি রেবতীকে ভুলে না। এই স্তনদ্বয়। আহা যখন কচুবনে ছিলাম, এই স্তনদ্বয়। বসন্তরায়ের কুমারকে জীবন দিয়াছে। আমার বক্ষের রক্ত দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছি। সে এখন কোথায়! আমি কোথায়, আমি কোথায়! আমি কোথায়!” ক্রমে রেবতীর চক্ষুর্দ্বয় ঘুরিতে লাগিল ও ক্রমে উঠে:স্বরে বলিল। “আমি কোথায়!” বনে সে ভীষণতঃ ঘোষিল ‘আমি কোথায়!’ রোষপরবশ হইয়া রেবতী দক্ষিণ করতল বিস্তারিয়া বৈদ্যনাথের মুখের কাছে নাড়িতে নাড়িতে বলিল “আমি কোথায়। আমি কোথায়। বল না আমি কোথায়। স্তনুতে কি পাও না? কেন শুনিবে। এ যে দুঃখিনীর ডাক। তুই শুনিস্‌ না। কিন্তু সে” বলিয়া অঙ্গুলিঘারা উর্দ্ধে দেখাইয়া “শুনিতেছে। ঐ দেখ্‌ দেখা দিল।” বলিয়া করপুটে প্রণাম করিল। বৈদ্যনাথ চমৎকৃত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না রেবতী বলিল। “তোরা ধনী, তোরা বিষয়ী, তোরা কি ওকে দেখিতে পাবি?” বৈদ্যনাথ এতক্ষণ পরে মুখ খুলিয়া বলিলেন। “কাকে দেখিতে পাইব। তুমি কাহাকে দেখিতেছ?” রেবতী বলিল। “ওরে এ যে কথা কহিতে জানে। তুই এখানে কেন এসেছিস? তোর ছেলেকে খুঁজিতে এসেছিস? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।” করিয়া হাসিল। বলিল “আমারও ছেলেকে আমি কত খুঁজিছিলাম। সে কোথায় গেল, কেবা জানে। সকলে বলে সে স্বর্গে গেছে, আমি তাই স্বর্গে এসেছি কিন্তু সে বেটাকে দেখি না। তোর ছেলে কিন্তু নরকে গেছে। গেডিজ গেছে। ষ্ঠান হবে। তুই বুড়ো হই বয়ে বসে থাকুবি। তখন আমার মত হবি। কলসায় স্র করবি। ষোলটা মাতায় বসবি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।” রেবতী আবার হাসিল। খল খল শব্দে জগৎ পুরিল। বৈদ্যনাথ সিহরিয়া। ভাবিল, এত বড় সহজ উদ্ভাদ নহে। কিন্তু এ বাহা বলে তাহা নিতান্ত প্রলাপ নহে। অবশ্যই ইহার কোন মূল থাকিবে। এ আবার অল্পকৃতীর সকল সমাচারই জানে, বরদাও

জানেন। ভাল ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক। দেখি এ অরুণতীর ধর্মের বিষয়ে কি বলে।” বলিলেন “রেবতী আমাকে তুমি কি মতে চিনিলে?” রেবতী বলিল। “হাঁ হ্যাঁ তুমি আমাকে চেন না। তোমরা ধনী, বড় লোক। কেনই বা চিনিবে? তোমাদের কাছে কত লোক যায়, আসে। তাতে আমার আমার রূপ নাই। কেনই বা মনে রাখিবে। আমি অরুণতীর মত রূপসী হইতাম, আমার কটাক্ষ থাকিত, আমার স্তনদ্বয় উচ্চ থাকিত, আঃ ইহারা শুক হইয়াছে। আমার কিন্তু দিব্য চামরের মত বেশ আছে। এখনও মনে করিলে তোমার মন হরণ করিতে পারি। বৃষ্টি তোমার মোহিত করিয়াছি। নতুন তুমি কেন আমার জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি আমার ভালবাস? আমি তোমাকে বিবাহ করিব।” বৈদ্যনাথ সিংহিল। রেবতী তাহা লক্ষ্য করিল না। বলিল “আমি মরিলে তুমি সহমরণ যাইবে। আহা এ কেমন মজা। সত্যি সত্যি লোকে দেখে। এ যে সত্যি স্বামী দেখিবে। হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ।” বলিল “আমি হাতে শাখা পরিব, কপালে সিন্দূর দিব।” বলিয়া নূকপালখণ্ডস্থিত ভ্রূলের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল “বা সিন্দূর দিলে এ ললাট কি শোভাবে! এস সিন্দূর পর” বলিয়া উঠিল ও আবার বস্ত্র সব খুঁজিতে লাগিল। সিন্দূর পাইল না। রোষে বলিল। “দূর হ সিন্দূর, নাই, তবে মাটির টিপ পরিব” বলিয়া নূকপাল হইতে একটি জল লইয়া ভূমে বসিয়া একটা মাটির টিপ পরিল। বৈদ্যনাথ বলিলেন। “রেবতী! তুমি আমাকে কি মতে চিনিলে? আমাকে কোথায় দেখিয়াছ? বল আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।”

রেবতী বলিল। “সত্য বল দেখি তোমার কি কেবল ইহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, না আর কিছু মতলব আছে মিথ্যা বলিও না। আমি সব জানিতে পারি।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “আমার আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা আছে, ভাল বল দেখি অরুণতী এখন কোথায়?”

রেবতী বলিল। “নরকে, ঋষ্টানদের সঙ্গে।” বৈদ্যনাথ দেখিলেন যে, রেবতী স্পষ্ট কোন কথা উত্তর দিবে না। বলিলেন, “গোবিন্দ কোথায়?”

রেবতী বলিল। “গোবিন্দ বড় ভদ্রলোক। তোমার পুত্র বরদায় সঙ্গে আছে, অরুণতীর রূপে তোমার পুত্র মোহিত হয়েছে। তাহার অমূল্যরূপ করে নরকের নিকট গিয়াছে। না না। এখন সেও নরকে, গেড়িজে। গেড়িজে বড় ভয়ানক কেলা। ফিরিঙ্গি বোলা। নবম নরক। যমের দ্বারের পাশে। বড় পবিত্র স্থান। মেলাই ফুল আছে। সঙ্গত মিষ্ট। আমি যাইব। আমাকে পাপেরা বন্ধ করিতে পারিবে না। আমি কাছাকাছি ভয় করি না। কিসের ভয়? আমি মনে করিলে সংসার জালাইতে পারি। আমার মুখে আগুন জ্বলে। হু হু হু। জ্বলে গেলে? আমার বুক জ্বলচে। বাপের বাপ।” বৈদ্যনাথ কেবল স্বার্থ সাধন আশয়ে মাঝে মাঝে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিলেন ও রেবতীর প্রণাম মিশ্রিত কথা হইতে কিছু কিছু সমাচার পাইলেন। সে সব একত্রিত করিলে এইরূপ শুনায। ‘রেবতী ব্রাহ্মণকন্যা। পূর্বে মহারাজ বসন্ত-রায়ের আশ্রয়ে ছিল। তাঁহার নবকুমারকে অত্যন্ত যত্ন করিত। আপনি তাহাকে স্তন দিয়া প্রতিপালন করিত। মহারাজ বসন্তরায় যখন যশোরের রাজা ছিলেন, একবার বিষয়কর্মের অনুরোধে গ্রামান্তে প্রায় দুই মাস থাকিতে হয়। প্রতাপাদিত্যের তখন বয়ঃক্রম প্রায় পঁচিশ বৎসর। তাহার পিতার পরলোকাবধি তাহার খুঁড়ে মহারাজ বসন্তরায় রাজ্য করেন। প্রতাপাদিত্য তখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন। খুঁড়ার অবর্ত্তমানে এক দিন কতকগুলি দস্যু লইয়া মহারাজ বসন্তরায়ের অন্তঃপুরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করেন ও রাজ্যলাভার্থে মহারাজ বসন্তরায়ের একমাত্র দুগ্ধপোষ্য বালককে নষ্ট করিতে উদ্যোগ পান। তাঁহার মডলব বুঝিয়া কমলা দেবী রেবতীর ক্রোড়ে নবকুমারকে দিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বলেন। প্রতাপাদিত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সকল লহিলাগণকে বদ্ধ করিল ও বসন্তরায়ের নবকুমারের অধেষণে প্রত্যেক দর ফিরিল; কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইল না। অবশেষে কতক অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে আসিয়া কোন দৃষ্ট লোক হইতে জানিল যে, রেবতী নবকুমারকে লইয়া অন্তঃপুরের উদ্যানে লুকাইয়াছে। প্রতাপাদিত্য পরদিন ধনুর্কোণ হস্তে উদ্যানে নবকুমার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত উপবন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। কিন্তু কোথাও রেবতীর দেখা পাইল না, রেবতী দূর হইতে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া প্রতাপাদিত্যকে উদ্যানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটি অন্তর্দ্বার দিয়া অতি শুশ্রুতাবে নবকুমারকে লইয়া বনে পলাইল। সেখানে নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া একটী অপরিষ্কার পগারের ভিতর, কচুনাছের বনে ক্রমাগত তিন দিন নবকুমারকে লইয়া রহিল। তিন দিন আহার নিদ্রা নাই, কেবল প্রতাপাদিত্যের ভয়। স্তম্ভদুগ্ধে কুমারটি পালন করিল। আপনার অঞ্চল দিয়া তাহাকে দৃষ্ট মশক ও মক্ষিকা হইতে রক্ষা করিল। রাত্রি হইলে নব-কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া শিশির ও শীত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। কোন ক্রমে নব-কুমারের কষ্ট হইল না! তৃতীয় দিন বেলা দেড় প্রহরের সময় দূর হইতে কমলাদেবীর জন্মনধবনি ও বসন্তরায়ের ‘রেবতী রেবতী’ বলিয়া ডাক শুনিয়া রেবতী উত্তর দিল, কিন্তু আহারাভাবে কৌণস্বর হওয়ায় তাহার ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিতে পাইলেন না। সে দিনের প্রায় সন্ধ্যার সময় লম্বা বন তন্ন তন্ন করিয়া চার পাঁচ শত লোকের দ্বারা অবেষণ করায়, অবশেষে একজন রাজপুত্রের দ্বন্দ্ব পড়িলেন, সে লক্ষ দিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া হাতমুখে নবকুমারকে কোলে করিয়া বলিল, পাইয়াছি পাইয়াছি। সকলে শব্দমাত্র সেই দিকে আসিল। কমলাদেবী ক্রতপদে আসিয়া নবকুমারকে ক্রোড়ে

লইয়া ঘন ঘন মুখচুশন করিতে লাগিলেন। বসন্তরায় রেবতীকে স্বয়ং হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষার পর প্রশংসা করিলেন ও আপনায় রূপে আরোহণ করাইয়া স্বরে গেলেন। প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের প্রত্যাগমন শুনিয়া যশোর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। বসন্তরায় পরে আপন স্বরে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের অবস্থানে লোক পঠাইলেন। সকলকে বলিলেন দেখ, যেন তাহাকে কষ্ট দিও না। তাহাকে বল, 'সে যেন অনর্থক রাজ্য-লাভাশয়ে এত বিকট পাপে হস্ত লিপ্ত না করে। আসিয়া আপনায় পিতার আগনে বসুক, আমি বংশপরম্পরাগত নিয়মের অবদান হইতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না।' প্রতাপাদিত্য তিন বৎসর পরে যশোরে আসিয়া দেখা দিলেন, বসন্তরায় তাঁহাকে যশোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া আপনি দুঃস্বপ্ন গিয়া আপন পুত্র সহিত স্নেহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার নবকুমার বচুসে রক্ষা পাওয়ায় তাহার নাম বচুয়া রাখিলেন। রেবতী বসন্তরায়ের জীবদ্দশায় স্নেহে রাগগড়ে বাস করিল। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর এক দিবস শ্রেণেখা কুঞ্জে পুষ্পচয়নে গিয়াছিল, সেই দিন তথায় প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই কুঞ্জে একাকী রেবতীকে পাইয়া তাহার ধর্ম্য নষ্ট করে। পরে তাহাকে বলপূর্ব্বক রাগগড় হইতে ধরিয়া লইয়া সনদ্বীপে ছাড়িয়া দেয়। একাকিনী দুঃখিনী রেবতী সনদ্বীপে ইতস্তত বেড়াইয়া মনের দুঃখে উদ্ভাদ হয়। আহাভাব ও নানা মানসিক ও শারীরিক কষ্টে অকালমৃত্যু হইয়া জীর্ণা জীর্ণা শ্রীভ্রষ্টা হয়। রেবতী তাহার পুরাতন বৃত্তান্তটি বলিতে আরম্ভ করিয়া শেষ করিল। বলবতী বলবলে পুর্ব্বের সকল অবস্থা হস্ত পদাদি চালনে বৈদ্যনাথের প্রত্যক্ষ প্রায় করিয়া দিল। ১৭ নাবও তাহার কারুণিক বৃত্তান্তে নিতান্ত আর্দ্র হইলেন। বৃত্তান্ত বর্ণনে কত কষ্ট কথাই রেবতী কহিল, তাহা বৈদ্যনাথের মনেও রহিল না। তিনি কেবল প্রতাপাদিত্যের অকারণ জাতক্রোধ ও অমাকুষী আচরণ ভাবিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, অভাগিনী রেবতীর উদ্বাস্ততার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাকে আপনায় স্বরে লইয়া যাইতে কত চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু অবোধ রেবতী তাহার বর্ণপাতও করিল না। আপন মনে প্রলাপ করিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে এক একবার বৈদ্যনাথকে শাপ দিতে লাগিল। দোষের মধ্যে রেবতী একদিন বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে যাইয়া আহার করিতে চাহায়, বৈদ্যনাথ তাহাকে অজ্ঞাত-জাতিকুল জানিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া আহার করিতে বলিয়া দিলেন। রেবতী ব্রাহ্মণকন্যা জ্ঞানে সেটি অপমান বোধ করেন ও অভিমান করিয়া অলাহায়ে বৈদ্যনাথের গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। বৈদ্যনাথ কত সাধ্য সাধনা করেন, রেবতী কিছুতেই প্রত্যাগমন করিল না। রেবতীর প্রলাপবাক্য হইতে অল্পকাল

বরদাকর্ষ গেডিজ কারাগারে ফিরিঙ্গি দস্যু দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও সকলিত হইল। রাত্রি অতি অল্প অবশিষ্ট ছিল বলিয়া কথোপকথনে রেবতীর বিচিত্র দুর্গে বলিয়া রহিলেন। আগমনের সময় রেবতীকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন, তাহাতে রেবতী তাহাকে ভূরি ভিরস্কার করিল। অরুণোদয়ে বৈদ্যনাথ বিচিত্র হাঁড়ির স্বর হইতে নিশ্চিন্ত হইলেন, রেবতীও ক্রমে ক্রমে আপনার হাঁড়িগুলি লইয়া বনের এপর প্রান্তে গিয়া সাজাইতে লাগিল। তাহার নিত্যকর্ম্মই এই। প্রত্যহ প্রাতঃকাল অবধি বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত আপনার হাঁড়িগুলি বহিয়া স্থানান্তরে স্বর করিত। দুই রাত্রি এক স্থানে কদাচ বাস ছিল না। বাসস্থান অতি নিম্নত জনশূণ্য দুর্গম বনে হইত। বেলা দুই প্রহরের পর গ্রামে গিয়া কাহার গৃহে অজে মিলিত ও উদয় পূর্ণ করিত। বৈকালে বনে বনে পর্যটন করিত, পরে রাত্রি দেড় প্রহরের পর আপন বিচিত্র দুর্গে আসিয়া নৃকপালাসনে বসিয়া রাত্রি বাপন করিত, আহার প্রাতে হাঁড়ি স্থানান্তরে নাড়া হইত। বৈদ্যনাথ রেবতীর আবাস ত্যাগ করিলেন। পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। মনে মনে বরদার কষ্ট সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে স্বকর্ণে ফ্রান্সিকো-প্রভৃতির ‘স্বর্ণপথা’ পরাজয় শুনিয়াছিলেন, আবার তাহাদিগের মুখেই একজন রূপসী স্ত্রী ও দুই জন পুরুষ গেডিজে কারারুদ্ধ হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছিলেন। আবার রেবতীর মুখে শুনিলেন যে, অরুণভৌ, বরদা, ও গোবিন্দ গেডিজে কারারুদ্ধ হইয়াছে। এই সকল চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, “একবার গেডিজে বাই। দেখি সত্য যদি বরদা কারারুদ্ধ হইয়া থাকে ত তাহাকে মুক্ত করি” আবার ভাবিলেন, “না, আগে বেঞ্জামিনের স্বরে যাইয়া স্বর্ণপথার মালামালা সব স্বচক্ষে দেখিয়া আসি। ভাবিলেন, আমাকে দেখিলে তাহার ভীত হইয়া অবশ্য দ্রব্যাদি কিয়দংশ দিবে।” এই চিন্তায় বেঞ্জামিনের গৃহান্তিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাহার ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখেন বেঞ্জামিন স্বয়ং ঘরে দাঁড়াইয়া আছে।

বৈদ্যনাথ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন। “বেঞ্জামিন! এত প্রত্যুবে যে ঘরে দাঁড়াইয়া?”

বেঞ্জামিন বলিল। “বৈদ্যনাথ! কুশল ত? তুমি যে এত প্রত্যুবে? তুমি কি কাল এখানে ছিলে?”

বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে এই কথাগুলি বলিতে, যেন কিছু চকল দেখিলেন। বেঞ্জামিন বলত বৈদ্যনাথকে এত প্রত্যুবে সেখানে দেখিয়া কিছু ভীত হইল। ভাবিল, বুঝি বৈদ্যনাথ সকল সমাচার পাইয়াছে ও লোকবল লইয়া বলপূর্বক স্বর্ণপথার দ্রব্যাদি ফিরিয়া লইতে আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “না আমি অন্যই আসিয়াছি, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আহাজের কোন খবর আছে?”

বৈদ্যনাথ বলিল। “হাঁ, অন্য রস্তা হইতে দ্রব্যাদি স্বয়ং থাকিয়া নামাইব বলিয়া আসিয়াছি। রস্তাতে গঞ্জালিসের ভাতার কি কিছু মাল আছে?”

বেঞ্জামিন বলিল। “রস্তা কবে ষাটে আসিয়াছে। আমি ত কোন সমাচারই পাই নাই। আমার নিজের তাহাতে অনেক মাল আছে ও গঞ্জালিসের ভাতারও অনেক মাল আছে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। রস্তা কাল বৈকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বেঞ্জামিন বলিল। “রস্তাতে কে কে চড়নদার আসিয়াছে, তাহার কোন সমাচার পাইয়াছ?”

বৈদ্যনাথ বলিল। “না আমি এখন সে সমাচার কিছু পাই নাই।”

বেঞ্জামিন বলিল। “চল না দেখা যাগ। আমার ক্রী ও দ্বিতীয় পুত্রের অতি শীঘ্র আসিবার কথা ছি। তোমার ‘বিত্যং-দ্যুতিতে’ কেহই আইসে নাই। তাই বোধ হইতেছে অবশ্য আসিবে।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “চল যাই।” বেঞ্জামিন অগ্রসর হইল। বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন “বেঞ্জামিন, আমি পশ্চাতে নিত্য ক্রান্ত হইয়াছি, তোমার বাটীতে একটু বিশ্রাম করিতে চাহি। চল একটু বিশ্রামে যাইব।”

বেঞ্জামিন বলিল। “ভাল, তবে স্বরে চল।” বেঞ্জামিন ফিরিল। অগ্রসর হইয়া বৈদ্যনাথের হাত ধরিয়া সম্মানপূর্বক আপন বাটীতে লইয়া গেল। এক স্বরের পর্ধ্যঙ্কে বসিতে বলিল। বেঞ্জামিন বৈদ্যনাথকে স্বরে আনিব বটে, কিন্তু তাহার কিছু সন্দেহ জন্মিল। ভাবিল, ‘যদি বৈদ্যনাথ রাত্রের ব্যাপার জানিয়াছে’ আবার ভাবিল, ‘জানিয়া থাকে জানিয়াছে? আমার স্বরে দ্রব্যাদি আসিয়াছে, তাহাই বা কি মতে জানিবে? বৈদ্যনাথ পর্ধ্যঙ্কে বসিয়া একবার স্বরের চতুর্দিকে পর্ধ্যবেক্ষণ করিলেন। বেঞ্জামিনের বক্ষোবেশন বৃদ্ধি পাইল। ভাবিল, ‘যদি বৈদ্যনাথ জানিয়াছে’ আবার তাহা কি রূপে জানিবে। ভাবিয়া মনকে স্থির করিল। বৈদ্যনাথ স্বরের চতুর্দিক পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া পর্ধ্যঙ্কে শয়ান হইলেন। পর্ধ্যঙ্কের পার্শ্বে একখানি পাদশীঠে বেঞ্জামিন বসিল। পশ্চাতে, সমস্ত রাত্রি আগ্রহে আর মনের চিন্তায় বৈদ্যনাথের শরীর নিত্য অবসন্ন হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ শয়ান হইলে, সুখ বোধ হইল, ক্রমে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল, ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইল, ক্রমে বৈদ্যনাথ অকাতরে নিদ্রিত হইলেন। বেঞ্জামিন বৈদ্যনাথকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া অল্পে অল্পে আপন আসন ত্যাগ করিল। একবার স্বরের দ্বারের দিকে দেখিল, আবার গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়াই আবার উঠিল, উঠিয়া স্বরের বাহিরে গেল। কতক্ষণ পরে আর একবার দ্বারের নিকট

হইতে হৃদয় নিরীক্ৰম করিয়া দেখিল, বৈদ্যনাথ সুখনিদ্রায় সুগত আছে। বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গেল, পথে ভিক্রুসের সঙ্গে দেখা হইল।

ভিক্রুস অত ক্রতপদে বেঞ্জামিনের পার্শ্বে আসিয়া বলিল। “বেঞ্জামিন! সমূহ বিপদ! গতকল্যকার ব্যাপার অন্য বৈদ্যনাথের কুঠীতে খবর হইয়াছে স্বর্ণপথার সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া বড় যুক্তিসিদ্ধ কথ্য হয় নাহ। আমি কত নিষেধ করিলাম, কেহই তখন শুনিলে না।”

বেঞ্জামিন বলিল। “তোমার যেমত বিদ্যা? তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিয়া কি করি? ঐ ফ্রান্সিস্কে অমনি তিনটেকে ধরে এনে মিছে গোজড়ে পুরিয়াছে। শুদ্ধ যদি ছুঁড়াটাকে এনে ক্ষান্ত হত ত ভাল ছিল, এ ছোড়া হ’তে কি হবে?”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ, ছোড়া হ’তে আশু উপকার হবে। সেটা বৈদ্যনাথের ছেলে। এখনি বৈদ্যনাথ সমাচার পেলে, বহু ধন দিয়া উদ্ধার ক’রে লয়ে যাবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “বৈদ্যনাথ যে আমার বরে শুয়ে আছে, সে বুঝি এ সমাচার জানে না।”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ, সে আবার জানে না, সেই ত বিপদ উপস্থিত করেছে?”

বেঞ্জামিন বলিল। “কি বিপদ?”

ভিক্রুস বলিল। “স্বর্ণপথার চড়নদারেরা এখন সব বৈদ্যনাথের গদিতে এসে খবর দিচ্ছে। বড় জন অত্যন্ত চটেছে। সে বলে, ‘আমায় যদি সময়ে মাস্তাজে না পৌঁছে দেও ত আমি খেদারত ধরে লব। স্বর্ণপথার আধকারী রামময় গদিতে বালিয়াছে যে, আমি ফ্রান্সিস্কা ও বেঞ্জামিনকে চানিয়াছ, আর বেঞ্জামিনের পিঠের উপর এক বা কুঠার মারিয়াছ, তাহার ঝুঁ চোট লাগিয়াছে; তাহাকে ধরতে পার ত আমি সে চোট দেখাইয়া দি।’ গোমস্তা ভজহারি কাল রাতে বৈদ্যনাথের বরে গিয়াছে, এখন আসে নাই, তাই বৈদ্যনাথের চোপদার কিছু করিতেছে না। দুজন সওয়ারকে ক্রত বৈদ্যনাথের নিকট পাঠাইয়াছে, আর ছয় জন সওয়ারকে তোমার উপর নজর রাখতে বলিয়াছে, তোমাকে কোথাও যাইতে দিবে না; এখন লোক ফিরিলেই একটা ব্যাপার উপস্থিত হবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “সে লোক কখন গিয়াছে? আমার বোধ হয় বৈদ্যনাথ কোন সমাচার পায় নাই, তাহার কথা-বাতায় কোন চিহ্ন ত পাইলাম না?”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ, সে বৈদ্যনাথ, সে কি এখন রাগ প্রকাশ ক’রে প্রাণটি হারাবে? সে আমাদের মত মূর্থ্য নহে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমাদের দোষ কি? মূল দোষ তোমার, তুমিই ত স্বর্ণপথার আক্ৰমণ করিতে বলিয়াছিলে?”

ভিক্রম বলিল। “স্বপ্নাধা আক্রমণে আমাদিগের কি দোষ?”

বেঞ্জামিন বলিল। “তবে কি অকারণ সবকটিকে মার ই বিধেয় ছিল?”

ভিক্রম বলিল। “মারা আবার অকারণ কোথা থেকে? রামময় যখন কোপটি নাড়িলে তখন আবার অকারণ?”

বেঞ্জামিন বলিল। তোমার যেমন জ্ঞান? তুমি তাহার জাহাজ নেবে, তাকে মারবে সে তার কিছু বলবে না? তাতে আবার তোমরা যে ব্যাণ্ডারটি ক’রেছিলে, নেকাম ক’রে মাছ বেচেতে গেলো।”

ভিক্রম বলিল। “মাছ না বেচলে, জাহাজের মুখে যেতে যে কেন তোপ বসান ছিল? জানান দিয়ে কি অল্পে স্বপ্নাধা মারতে পারতে?”

বেঞ্জামিন বলিল। “ফলে কতটুকু বড় ভাল হয় নাই।”

ভিক্রম বলিল। “এখন উপায় কি? গঙ্গালিস এখানে নাই, পরিত্রাণের উপায় দেখ।”

বেঞ্জামিন বলিল। “পরিত্রাণের ভয় কি? সব জিনিষগুলি ফিরিয়ে দিলেই এখন আপস হ’তে পারে।”

ভিক্রম বলিল। “এতক্ষণে তোমার মত পরামর্শটি দিলে। তোমার মস্ত হওয়া কর্তব্য। যাও, তুমি আমাদিগের দল ছাড়, এ কস্ম তোমার নহে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “ভাল, তোমার কি মত।”

ভিক্রম বলিল। “চল গেডিলে যাই, সে স্থানে সকলেই আছে পরামর্শ হবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমার ঘরে যে বৈদ্যনাথ একা সুপ্ত রহিল, তাকে ছাড়িয়া যাওয়া কি আতিথ্যের উচিত কর্ম?”

ভিক্রম বলিল “তোমার পুত্রকে তাহার নিকটে বসিতে বল, সেই তোমার বন্ধুর মেধা করিবে।”

বেঞ্জামিন ‘জন’, বলিয়া ডাকিয়া, তাহার পুত্রকে বলিল। “জন! আমার ঘরে বৈদ্যনাথ সুপ্ত আছে। দেখ তাহার কষ্ট না হয়, সে জাগ্রত হইলে আমার জন্ত অপেক্ষা করিতে বলিবে, আমি আ সচা তাকে বিদায় দিব।”

জন বলিল। “আচ্ছা।” ভিক্রম ও বেঞ্জামিন চালাইয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়।

“উত্তীর্ণং নরব্যাহ্নঃ সজ্জীভবত মা চিরম্।”

স্বর্ধকুমার ও মালিকরাজে সসজ্জ হইয়া অশ্ব রাত্রিযোগে রায়গড়াভিমুখে চলিলেন।
ক্রমে রাজপথ পার হইয়া মাঠে পড়িলেন, মাঠদিয়া কতক দূর অন্ধকারে যাইয়া
মালিকরাজ বলিল “স্বর্ধকুমার তুমি কি রায়গড়ে যাইতে মাঠের পথ জান, আমিও
তাহা কিছুই জানি না।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “আমি মাঠের পথ জানি না, কিন্তু এই মাত্র জানি,
বরাবর দক্ষিণ বহিয়া গেলে দ্বারির জঙ্গলে পড়িব, রায়গড় দ্বারির জঙ্গলের

মালিকরাজ বলিল। “রাত্রি যে অন্ধকার, ইহাতে ত কিছুমাত্র দিক্‌জ্ঞান হয় না।
বরং এখন একটু আশ্রয় যাই, পরে চন্দ্রোদয় হইলে সব পরিষ্কার দেখা যাইবে, তখন
দেখিয়া শুনিয়া সীত্র যাইতে পারিব। তুমিও এ পথে হজুরমলের সঙ্গে রাত্রিযোগে
গিয়াছিলে, তোমার কি কিছুমাত্র স্মরণ নাই?”

স্বর্ধকুমার বলিল। “সে অন্ধকারে আমরা রায়গড় পার হইয়া অনেক পশ্চিমে গিয়া
পড়িয়াছিলাম। আমি বলি বরং একটু বামদিকে চাপিয়া যাওয়া যাক্।”

মালিকরাজ বলিল। “তাহা হইলেই ত ভাল হয়, কিন্তু বামদিকে কাপা ও জল।
পূর্বদিক্‌টা অত্যন্ত নাবাল জমী, বরং একটু ঘুরে যাওয়া ভাল, কিন্তু এ রাত্রে হজুরমলের
মত কাপায় যাওয়া ভাল নহে।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “সে দিনকার পরামর্শ কর। চল অশ্বের রশ্মি (১) ছাড়িয়া দিই।
অশ্ব আপন ইচ্ছায় যাইতে পাইলে ভাল পথ দিয়াই যাইবে।

স্বর্ধকুমার আপন হস্ত হইতে বল্গা ফেলিয়া দিল। মালিকরাজও আপনার অশ্বের
বল্গা ফেলিয়া দিল। উভয়ে পার্শ্বপার্শ্বী হইয়া চলিল। উভয়ের অশ্বচয় ও রত্ন-মূহের
চাক্‌চক্যে যেন গগনস্থ অশ্বিনীকুমারদ্বয় শোভিল। প্রভুভক্ত ষোটকদ্বয় প্রভুর মন বুনায়া
সান্নিধ্যে সুখ জ্ঞান করিয়া এত নিকট হইল যে, মালিকরাজ ও স্বর্ধকুমারের পাদে পাদে
মিলিল। অশ্বদ্বয়ের শরীরে মিলিল। অশ্বদ্বয় বল্গা শিথিল পাইয়া আপন মনে চলিল।
ক্রমে পশ্চিম দিকে ভর দিয়া অন্ধকারে যাইতে লাগিল।

মালিকরাজ বলিল। “স্বর্ধকুমার! এখন ত আমরা রায়গড়ে পৌঁছিব, তাহার পর
কি করা যায়?”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “রায়গড়ে গিয়া প্রথমে ইন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, পরে তাঁহাকে প্রতাপাদিত্যের পরামর্শ সব অবগত করাইয়া অনন্তপাল দেবকে সমাচার পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইব ও সৈন্তসামন্ত প্রস্তুত করাইয়া দুর্গ রক্ষা করিব ।”

মালিকরাজ বলিল । “আর যদি আমাদিগের পৌছিবাব পূর্বকই তাহার গড়ে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কি করিবে ?”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “তবে যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ইন্দুমতীর উদ্ধার করিতে হইবে । মালিকরাজ ! তুমি আমার আগমনকালে বলিলে যে, প্রতাপাদিত্যের প্রায়-শিস্ত হইবে ! কি পাপের প্রায়শিস্ত, তাহা তুমি আমার ভাবিয়া বলিলে না ; আমার আগমনকালে তোমাকে অশ্রুপাত করিতেও দেখিলাম । তখন তোমাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম না, কিন্তু সমস্ত পথটি চিন্তায় কিছু ভাল লাগিল না । মালিকরাজ, এখন আমাকে এই সব ভাবিয়া বলিতে হইবে । তোমাকে সজজনয়ন দেখিয়া আমার মনটি কানিয়া উঠিল । আমি মনে বিশেষ স্পীড়িত হইয়াছি, এখন আমাকে স্পষ্ট করিয়া তোমার মনঃস্পীড়ার কারণ বল, দেখি আমি হইতে বাহা হয়, তাহা করিতে ত্রুটি করিব না ।

মালিকরাজ স্বর্ধাকুমারের কথায় নিতান্ত ব্যাকুল হইল । তাহার ইচ্ছা নহে যে স্বর্ধাকুমারকে তাহার অশ্রুপাতের কারণ বলে । বলিল, “সখে ! মালতীকে ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া আমি অশ্রুপাত করিয়াছিলাম । আমরা যে কর্ষে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহার মালতী পুনর্লভের আর কোন সম্ভাবনা নাই ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “কেন আমাদিগের রায়গড়ে যাওয়ার সঙ্গে তোমার মালতীর প্রেমের কি হানি হইল ?”

মালিকরাজ বলিল । “তুমি বুঝিলে না ? আমরা রায়গড়ের ব্যাপারের পর আর প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইতে পারিব না । মালতীরও সে মুখপদ্ম আর দেখিতে পাইব না ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “যদি তোমার মনঃস্পীড়ার কারণ এত সহজ হয়, তবে চল আমি এক্ষণেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি ।” স্বর্ধাকুমার আপন অশ্রের বল্গা লইয়া তাহাকে উত্তর মুখে ফিরাইল । মালিকরাজ স্বর্ধাকুমারকে অশ্র ফিরাইতে দেখিয়া বলিল “স্বর্ধাকুমার, এত দূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া ভাল হয় না । চল রায়চুর্গেই বাই ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । মালিকরাজ, যে কর্ষে তোমার কষ্ট জন্মে, তাহার আমি আজম-কাল হস্তক্ষেপ করি নাই, করিবও না । আমার রায়গড়ে যাওয়া তত আবশ্যক হইতেছে না, তোমার স্বচ্ছন্দ বুদ্ধি করা আমার একান্ত ইচ্ছা । আমি ইন্দুমতীর জ্ঞা কিছু হৃৎপিণ্ড হইতেছি বটে, কিন্তু সে কে ? সে কিছু তোমাপেক্ষা আমার প্রিয় নহে । তোমার কষ্ট দিয়া তাহার মুখ বুদ্ধি করা আমার মনোনিষ্ঠ হইতেছে না ; তাতে আমার তুমি আমার

প্রাণতুল্য সখা, আমার হৃদয়বল্লভ। আগে তোমার স্বচ্ছন্দ লাভ করিয়া পরে অন্তের স্বচ্ছন্দে দৃষ্টি করা আমার উচিত।”

মালিকরাজ স্বর্ধাকুমারের এই কথাতে কিছু আর্জ হইল। তাবিত্তে লাগিল, ‘একপে কি করি? স্পষ্ট স্বর্ধাকুমারকে বলিতে পারিতেছি না, আবার না বলিলেও একপে আর কি রূপে কাটাই। তাবিল যদি একপে স্বর্ধাকুমারের মতে মত দিয়া ফিরাই, তবে আমার বেতনের জন্য স্নানের বিশেষ অনুপকার করা হয়। হয় ও ইন্দুমতী গঞ্জালিমের হস্তে এতক্ষণে বন্দী হইয়াছে। ঈশ্বর জানেন, পাপ গঞ্জালিস তাহাকে কি আচারে রাখিয়াছে, আবার প্রতাপাদিত্যের কর-কবলে নিপতিতা হইলে, কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবে। তাবিলেন, আমি কি বিপদেই পড়িলাম। বিধাতা কেন আমাকে এ সকল জানিতে দিয়া আমার কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছেন? পিতাই বা কি মনে করিবেন? তাবিলেন, এ আয়োধ বালক রহস্য গোপনে অশক্ত। গোপন করিলেও যমুহ বিপদ। এমত পাষণ্ড ত কখনই দেখি নাই! এ যে উষা ও ব্রহ্মার বৃদ্ধান্তের মত। এমত অনৈসর্গিক ব্যাপার কেহ কখন শুনে নাই। এ যে, হয় ও চক্ষুই দেখিতে পাইব। কিন্তু আমি সকল অবগত থাকিয়া না বলিলে, এক ভয়ানক মহাপাতকের অংশী হইব। আমার কর্তব্য ছিল, প্রতাপাদিত্যকে সকল প্রকাশ করিয়া বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করা। পিতা এ সকল অবগত হইয়া কেন এরূপ আবেধের মত কার্য করিলেন? অনেক চিন্তিয়া তাবিল, ‘আমার ভাঙ্গিয়া বলায় প্রয়োজন কি? এখন জেদ করিয়া স্বর্ধাকুমারকে রায়গড়ে লইয়া গাই ও স্বেপন করিয়া ইন্দুমতীকে বাঁচাই, তাহা হইলেই ধর্মরক্ষা হইবে ও ইন্দুমতী রক্ষা পাইবে। মালিকরাজ বলিল। ‘স্বর্ধাকুমার! এখন সে তাবিয়া ফিরিল ভাল হইবে না।

সু, আমরা রায়গড়ে গিয়া দেখি যে কি হয়। যদ্যপি একান্ত আমাদেরই অস্ত্র ধারণ করা আবশ্যক হয়, তবে অস্ত্র ধরিব, নতুবা গুলুভাবে দূর হইতে যুদ্ধ দেখিব।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিকরাজ! তুমি যাহার সন্তুষ্ট হও, আমরা তাহাই করিতে হইবে, কিন্তু তোমার মুখের ভাবে আমি দেখিতেছি, মনে মনে নিতান্ত আকুল হইয়াছ। ভাল মালিকরাজ! তোমারই কথা বাহাল রাখিলাম।” বলিয়া অশ্ব পুনর্বার দক্ষিণ দিকে ফিরাইল। অশ্বদ্বয় আপন স্বেচ্ছাগমনের অনুমতি পাইয়া পশ্চিম দিক্ দিয়া চলিল। কিছু দূরের পর দারির আঙ্গলের উত্তর দিকের খালের উত্তর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বর্ধাকুমার দেখেন, সম্মুখে খাল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সম্মুখস্থ খালে বারো তেরো খানা আঁত দীর্ঘ অপ্রশস্ত ছীপ দেখিতে পাইল। এক একটি প্রায় দুই শত হাত দীর্ঘ তিন হাত মাত্র প্রস্থে। গঠনে বোধ হয়, অত্যন্ত অল্প ভর, ক্রান্তগামী। এক একটিতে প্রায় চল্লিশটি ক্ষেপণি। প্রতিনৌকায় অগ্র ও অন্তস্থলে এক একটি করিয়া প্রায় ছয় হাত উচ্চ ধ্বজা। তাহার একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চতুর্দিকে প্রায় বেড় হাত পশ্চি-

মাণের পতাকা। নৌকান্তলি খালের দক্ষিণ তীরে দাঁড়ির জাজালে ছোট ছোট দণ্ডে^{*} বাধা। নৌকার কেহই নাই। কেবল শেষে দুইটা নৌকার দুই জন বসিয়া তামাক খাইতেছে। সূর্য্যকুমার বলিল “মালিকরাজ, এই লণ্ড তোমার গঞ্জালিসের দল। ইহারা বোধ হয় অনেকক্ষণ আসিয়াছে। এতক্ষণে গোধ হয় ইহারা রায়গড় ঘুরিয়া লইল।”

মালিকরাজ চুপি চুপি বলিল। “একট কাস্ত হও, আমি অগ্রসর হইয়া সন্ধান লই।” মালিকরাজ অগ্র হইয়া নৌকাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল “গঞ্জালিসের সঙ্গে তোমাদের দেখা হইয়াছে।”

নৌকারক্ষক দাঁড়াইয়া বলিল। “আজ্ঞা হাঁ।” মালিকরাজ বলিল “অনুপরাম আসিয়াছিল।” সে বলিল “মহাশয় তিনি, আর একটি অখারোহী। গঞ্জালিসের সঙ্গে আসিয়াছেন।”

মালিকরাজ বলিল। “তাহারা কখন আসিয়া পৌঁছিল।”

কাণ্ডারী উত্তর করিল। “মহাশয়, তাহারা প্রায় দুই দণ্ড পূর্বে আসিয়াছিলেন।”

মালিকরাজ বলিল। “তাঁহারা এ স্থান হইতে কখন সৈন্ত লইয়া গেলেন।”

কাণ্ডারী বলিল। “প্রায় আড়াই দণ্ড হইল।”

মালিকরাজ বলিল। “তোমরা নশখানা নৌকায় আসিয়াছ।”

কাণ্ডারী বলিল। “আমাদিগের নশখানা ছাপ আছে।”

মালিকরাজ বলিল। “তবে তোমরা অনেকে আসিয়াছ। কে কে আসিয়াছে, ফ্রান্সিস্কো কোথায়?”

কাণ্ডারী বলিল। “মহাশয়, ফ্রান্সিস্কো আসেন নাই, ড্যাকট্টা আসিয়াছেন, আর আমরা দুইশত পকাশ জন লোক আছি।”

মালিকরাজ সিহরিল। বলিল “এত অল্প লোকে নশখানা নৌকা কি করিয়া চালাইবে।”

কাণ্ডারী বলিল। মহাশয় গঞ্জালিসের আদেশ আছে। নশখানাতে দ্রব্যাদি যাইবে। কেবল এক খানায় একশত আশী জন ফেপলী ধরিবে ও যে কয়েকজন বন্দী আসিবে, তাহাদের সেই ছীপে বসাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।”

মালিকরাজ বলিল “কেন বন্দীর নৌকায় এত তরুণ দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?”

কাণ্ডারী বলিল। “মহাশয় কি তাহা জানেন না?”

মালিকরাজ বলিল। “আমি আজ একমাস প্রায় সনদীপ ছাড়া, কাজেই সকল সমাচার জানি না। কেবল গঞ্জালিসের সঙ্গে অন্য দেখা হওয়ার সে আমাদিগকে আসিতে বলিয়াছিল।”

কাণ্ডারী বলিল। “মহাশয়, বন্দীর মধ্যে কোন স্ত্রীলোক থাকিবার কথা আছে। তাহাকে লইয়া চার পাঁচ প্রহরের মধ্যে সনদীপে পৌঁছিতে হইবে। একশত আশী তরগুধারী না হইলে কি মতে বাওয়া যায়?”

স্বর্ধাকুমার অগ্রসর হইয়া বলিল। “এ ছীপে কর জন তরগুধারী বসিতে পারে?”

কাণ্ডারী বলিল। “চলুন ছীপটি দেখাই।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “তবে তুমি সে ছীপটি এপারে আন।”

কাণ্ডারী আপনার ছীপ হইতে সেই ছীপে যাইয়া সেটিকে ধ্বজি ঠেলিয়া খালের উত্তর কূলে আনিল। ছীপটির আকার দেখিয়া স্বর্ধাকুমার চমৎকৃত হইল। সেটি অতি দীর্ঘ অপ্রশস্ত। দীর্ঘ প্রায় চার শত হাত। তাহাতে আড়াই শত ক্লেপনী লাগান আছে। নৌকার মধ্যে প্রায় তিন হাত উচ্চ স্থল ধ্বজা।

কাণ্ডারী বলিল। “তাহার বন্দোদ্দিগকে বাঁধা যায়।” নৌকাটি অতি সুগঠন।

মালিকরাজ বলিল। “এ ছীপ কতক্ষণে সনদীপে পৌঁছে।”

কাণ্ডারী বলিল। “মহাশয়, যদি সুবিধার প্রশস্ত গাং পাই, আর আড়াই শত ক্লেপনীধারী হয়, তবে দুই চার দণ্ডের মধ্যে সনদীপে পৌঁছিতে পারি। কিন্তু আমাদেরকে অনেক ছোট ছোট খাল বহিয়া যাইতে হইবে। আর আমাদের লোক অধিক আনা হয় নাই, তাই তিন চার প্রহর পৌঁছিতে লাগিবে।”

মালিকরাজ বলিল। “ইহারা কি কি অস্ত্র আনিয়াছে।”

কাণ্ডারী বলিল। “মহাশয় অস্ত্র বড় অধিক নাই। জন কতক ধানুকী, কুড়িজন তরবালধারী, আর বাকী বরসাধারী।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কেন বন্দুক আনা হয় নাই?”

কাণ্ডারী বলিল। “জলপথে আসিতে হইয়াছে, তাতে আবার নৌকার ছত্রি নাই বলিয়া বন্দুক আনা হয় নাই। আবার পূর্বেকার মত সনদীপে এখন আর তত বন্দুকও নাই। যাহা পূর্বে সংগ্রহ হইয়াছে ত্রমে ক্ষয় পাইয়াছে। আজকাল আমাদের লাভের কিছু হানি হইয়াছে। লোক জন প্রায় সতর্ক থাকে, আর মোগল বাহিনীর প্রহরী প্রায় সর্বত্রই বেড়ায়।”

মালিকরাজ বলিল। “তোমার নাম কি?”

কাণ্ডারী করপুটে অতি সম্মানপূরঃসর বলিল। “মহাশয়, আমরা অতি ছোটলোক, আপনারা মহৎ। বড়লোকের এমনি দয়াই বটে, মহাশয়, আমরা আপনাদের এক কথায় কেনা গোলাম হই। আমাদের পঞ্জালি বড় তুর। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আজ্ঞা, আমরা নাম সোয়ারিস।”

মালিকরাজ তাহার হাতে একটি মোহর দিল ও বলিল। “সোয়ারিস, এইটি লও। জল খাইও।”

সোয়ারিস কখন মোহর দেখে নাই। মোহরটি পাইয়া একেবারে অত্যন্তে গলিয়া গেল, দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল। “পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন। যা হুগা ও মেরী তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। সেন্ট ডোমিস্কো তোমাকে আশ্রয়ে রাখুন।”

মালিকরাজ বলিল। “এখান হইতে রায়গড় কতদূর?”

সোয়ারিস বলিল। “মহাশয়, প্রায় তিন পোয়া পথ হইবে। ঐ পোল দিয়া গেলে কিছু ধোর হইবে। নতুবা বলেন তো এই নৌকায় আপনাকে পার করিয়া দিই।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “আমাদিগের ষোড়া আছে, অতি শীঘ্রই বাইব।”

সোয়ারিস আশীর্বাদ করিল, “মহাশয়েরা জয়ী হউন।”

স্বর্ধকুমার ও মালিকরাজ অথ চালাইয়া খালের তীর বহিয়া পোলের উপর উঠিলেন।

পোল পার হইলে মালিকরাজ বলিল। “স্বর্ধকুমার, এখন রায়গড়ে বরাবর না যাইয়া একটা যুক্তি করা বিধেয়।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “তোমার কি যুক্তি শুনি।”

মালিকরাজ বলিল। “চল এ দস্যুদের পলায়নের পথ বন্ধ করি।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “কি করিয়া তাহা বন্ধ করিবে।”

মালিকরাজ বলিল। “তুমি এইখানে দাঁড়াও আমি দ্রুত গিয়া সোয়ারিসকে নৌকা-গুলি ওখান হইতে বহিয়া লইয়া রায়গড়ের পূর্বে এক নিহৃত স্থানে লুকাইতে বলি।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “তুমি মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাও যেমতে হয় শত্রু দমন করা বিধেয়।”

মালিকরাজ অথ কিরাইয়া অভিযোগে নৌকার নিকট হইয়া বলিল। “সোয়ারিস, পোলের নীচে আইস, আমি নৌকা রাখিবার স্থান দেখাইয়া দিব। এ বড় ভাল স্থান নহে।”

সোয়ারিস মালিকরাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। মালিকরাজ তাহাকে লইয়া ঘারির জাহাজ দিয়া বরাবর উত্তর পূর্বে প্রায় এক পোয়া অন্তরে গিয়া বলিল। “দেখ ঐ ঝোপের ভিতর সব নৌকা আনিয়া রাখ। কণ্ঠ সাজ হইলে আমি কিয় গজালিস ‘ষোড়া ষোড়া’ করিয়া চৌকর করিলে উত্তর দিবা। তোমার বা তোমার সঙ্গীর নাম করিলে উত্তর দিও না।” সোয়ারিস ‘বে আচ্ছা’ বলিয়া নৌকা সব আনুতে গেল। মালিকরাজ ও স্বর্ধকুমার দুই জনে ঘারির জাহাজ বহিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর পরে রায়গড়ের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গড়ের দ্বার বন্ধ হইতেছিল।

‘দ্বারী তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিল। “মহাশয়রা কে, কোথায় বাইবেন, আর কোথা হইতে আসিলেন?”

মালিকরাজ বলিল। “আমরা বর্দ্ধমান হইতে আসিতেছি, দক্ষিণ বাইব। বিদেশী, রাত্রি অধিক হইয়াছে, কোথাও আশ্রয় পাই নাই। এক্ষণে অতিথি হইতে তোমার দ্বারে আসিয়াছি।”

দ্বারী বলিল। “আজ যে অতিথির শেষ নাই। প্রায়স্থ লোক অপেক্ষা অতিথি অধিক। আজ এখানে স্থান হবে না। তোমরা স্থানান্তরে বাও” বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করায় মালিকরাজ বেগে আপন অৰ্থ দ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইল। অৰ্থের অর্ধেক শরীর গড় মধ্যে ও অর্ধেক গড়-বাহিরে রহিল।

দ্বারী রুষ্ট হইয়া বলিল। “এ যে বলপূর্ব্বক অতিথি হয়! কে তুমি? তোমার ত প্রকৃত অতিথির হার আচরণ দেখি! যে হও দ্বার মুক্ত কর, নতুবা বম্বদ্বারে পাঠাইব।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আপনিও প্রকৃত আতিথ্যার্থ রক্ষা করিতেছেন। ভাল সংকার পাইলাম। এক্ষণে আমি কোন ক্রমে স্থানান্তরে বাইতে পারিব না। একান্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে হয়, আমাকে নষ্ট কর। আমরা দুই জন বিদেশী, সমস্ত দিন পথভ্রমে নিত্য কাতর হইয়াছি। এক্ষণে আমরা আমাদের গমন মার্গ ত্যাগ করিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ আশ্রয় লাভাশয়ে মহাশয়ের দ্বারে আসিয়াছি।”

দ্বারী বলিল। “তুমি কি লোক? বোধ হয় ব্রাহ্মণ হইবে, নতুবা অতিথি হইতে আসিয়া এত বল প্রকাশ করিতেছ কেন?”

মালিকরাজ বলিল। “অনুমান সত্য। আমি সম্বংশজাত ব্রাহ্মণ।”

দ্বারী বলিল। “ব্রাহ্মণ, এত অস্ত্র শস্ত্রে আবৃত কেন?”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় পথভ্রমণে আশ্রয়লাভ প্রয়োজন। পথে অত্যন্ত দস্থ্যভয়।”

দ্বারী বলিল। “ব্রাহ্মণের মত সকল আচরণই দেখিতেছি, ইনি দস্থ্যভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পথে ভ্রমণ করিতেছেন, আবার গড় না হলে রাত্রি বাপন হবে না, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় সন্দেহ করিবেন না, আমি ব্রাহ্মণ বটি। ব্রাহ্মণ বলিয়া ধর্ম্মজ্ঞানে আশ্রয় দিন, আমরা দুই জন কিছু আহার করিব না, আপনায় মন্দুরায় (১) আমাদের দুটি অৰ্থ রাখিতে স্থান দিন, আমরা মন্দুরাতেই বা বাহিরে পড়িয়া থাকিব। মহাশয়কে অস্ত্র কোন বিষয়ের জন্ত কষ্ট পাইতে হইবে না।”

দ্বারী বলিল। “কেম অকারণ বিরক্ত করিতেছ, রাগগড়ে স্থান পাইবে না?”

মালিকরাজ বলিল। “কি রাগগড়ে হইলন নিরাশ্রয় অতিথির স্থান নাই!”

দ্বারী বলিল। “আজ তোমার মত চার শত লোককে স্থান দেওয়া হইয়াছে।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় রাগগড়ে দশসহস্র লোকে এককালে আশ্রয় পায়।

তিন চারি শত লোকের কথা কি বলিতেছেন?”

দ্বারী বলিল। “আমি তোমাকে হিসাব দিতে চাহি না। মোটা কথা বলিলাম এস্থান হইতে যাও, এস্থানে অন্য রাত্রিযাপন অসম্ভব।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় দেখিতেছি ধর্ম্মশীল বটেন, কি করিয়া এত নির্দয়। বাক্য প্রয়োগ করি নন। আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া কি মহাশয়ের দয়া জন্মিল না?”

দ্বারী বলিল। “তোমাদিগের দেখিয়া দয়া দূরে থাকুক, আমার রাগ হইতেছে। তোমাদিগের যেকণ সান্নিধ্য, তাহে তোমরা মনে করিলে অক্লেশে নির্ভয়ে রাত্রিতে আপন গ্রামে ঘাইতে পার।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! আমাদিগের পথ জানা নাই, তাতে আবার আমরা পথপ্রদর্শন নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি, আমরা মহাশয়ের আশ্রয় লইলাম, স্থান দিন।”

দ্বারী বলিল। “তবে তোমাদিগের প্রার্থনায় (১) থাকিতে হইবে অত্র কোথাও স্থান পাইবে না।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! আমরা আপনার দয়ায় নিতান্ত আপ্যায়িত হইলাম। মন্দুরাই আমাদিগের প্রার্থনীয় স্থান।”

দ্বারী বলিল। “তবে একটু অপেক্ষা কর, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আনিতেছি।”

মালিকরাজ বলিল। “কি তবে আপনি এ দুর্গাধিপ নছেন?”

দ্বারী বলিল। “আমি এক প্রকার এ স্থানের অধিকারী বটি, যে হেতুক আমারই যোগক্ষেমে (২) এই দ্বারটি আছে।”

মালিকরাজ বলিল। “তোমার দুর্গে কি রাজ্য নাই যে, তুমি রাণীর অনুমতি লইতে যাইতেছ।”

দ্বারী বলিল। “না, রাণীদয় এই দুর্গের অধিকারিণী। কিন্তু ইন্দুমতী দেবী এই সকল বিষয়ে অধ্যাক্ষতা করেন।”

মালিকরাজ বলিল। “তবে যাও শীঘ্র আসিবে। বলিও বিদেশ হইতে হইট অধারোহী বোদ্ধা অদ্য রাতে এ দুর্গে থাকিতে প্রার্থনা করে।”

‘ঘারী চলিয়া গেল । স্বর্ধ্যকুমার ও মালিকরাজ ষারে প্রবেশ করিয়া অব হইতে অবতীর্ণ হইলেন । কিছুক্ষণ পরে ঘারী একটি লোক সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিল “মহাশয় ! আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, এই লোকটি অশ্বঘ্ন লইয়া মন্দুরার রাখিয়া আসিবে ।”

স্বর্ধ্যকুমার ও মালিকরাজ ঘারীর অনুসরণ করিলেন । ক্রমে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি আসনে এক জন নিচোলিনী বসিয়া আছেন । তাঁহার কিছু দূরে এক লৌহবন্দ্যাত বোদ্ধা অপর একটি আসনে উপবিষ্ট । স্বর্ধ্যকুমার ও মালিক-রাজকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্ত্রীটি বলিল, “স্বাগত ? এ দুর্গে বাহ্য আপনা-দিগের সুখবর্ধন হয়, তাহা এ দীন প্রস্তুত করিতে ত্রুটি করিবে না । ঐ আসনে উপবিষ্ট হউন ।”

স্বর্ধ্যকুমার ধল ধল দৃষ্টিতে বন্দ্যাত পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল । “অন্য এ দুর্গে আশ্রয় লাভে আমরা যত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনার সম্মুখীন হওয়ায় আমরা ততোধিক দশগুণ আপায়িত হইলাম । আপনি স্বয়ং যখন আমাদের সম্ভাষণ করিলেন, আমরা তাহাতেই ক্রৌণ্ড হইলাম ও আমাদের পথপ্রম সব দূর হইল ।”

মালিকরাজ উপবিষ্ট কৃষ্ণ ও বন্দ্যাত পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল । “আমি ভ্রাস্রণ ! আশীর্বাদ করি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক ।”

স্ত্রীটি সমস্ত্রমে প্রণাম করিলেন । পরে একজন ভৃত্য আনিয়া ঘোড় করে বলিল । “মহাশয় ! পাদপ্রক্ষালন করুন ।” মালিকরাজ ও স্বর্ধ্যকুমার গাত্রোখান করিয়া গৃহের দক্ষিণস্থ ইন্দ্রকোষে পাদ ধৌত করিলেন, আসনে আসিয়া পুনর্বার অধিষ্ঠিত হইলেন । স্বর্ধ্যকুমার একটু মূহ হাসিলেন ।

গৃহকত্রী বলিলেন । “মহাশয়দিগের আগমনে নিতান্ত আফ্লাণিত হইয়াছি ; এক্ষণে কি আহার করিবেন, আজ্ঞা করিলেই প্রস্তুত হয় ।”

স্বর্ধ্যকুমার বলিল । “আমরা অন্য আর কিছু আহার করিব না । অপরাহ্নে আহার করার অনুহু আছে । আপনার অনুমতি পাইলে বিভ্রামে বাই ।”

কত্রী বলিলেন । “মহাশয়েরা নিরাহারে থাকিবেন, তাহা আমি সহ করিতে পারি না । আপনাদিগকে আহার আজ্ঞা করিতে হইবে । আপনারা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই ।”

স্বর্ধ্যকুমার বলিল । “বারম্বার আপনার অনুরোধের বিপরীত আচরণ করা আমা-দিগের কর্তব্য নহে, আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা বাহা হয় আহার করিব ?”

কত্রী বলিলেন । “মহাশয় কোন কুলের উজ্জ্বল ভিলক ?”

স্বর্ঘকুমার বলিল। “আমার কল্লির বংশে জন্ম। ইনি আমার শ্বশুর, ব্রাহ্মণ-
কুলোদ্ভব।”

কর্ত্তী মালিকরাজকে বলিলেন। “আমরাও কল্লিয়। আমাদিগের বরে ঘৃতপক
দ্রব্যাদি আহারে আপনার কোন বাধা নাই বোধ করি। ব্রাহ্মণপরিচারক প্রস্তুত।”

মালিকরাজ বলিল। “আমি কল্লিয়ার প্রস্তুত অন্ন পর্য্যন্ত ভোজন করিতে পারি, তা
ঘৃতপক কি, কিন্তু আমার আহারে এক্ষণে যথেষ্ট স্পৃহা নাই।”

চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের স্থান করিল, তিনখানি রোপ্যপাত্রে ঘৃতপক
দ্রব্যাদি দিল।

কর্ত্তী বলিলেন। “মহাশয়েরা গাত্রোথান করুন।” পূৰ্ব্ব উপবিষ্ট বর্ষাবৃত পুরুষ,
স্বর্ঘকুমার ও মালিকরাজ আসন হইতে উঠিয়া আহারে বসিলেন।

কর্ত্তী বলিলেন। “মহাশয়েরা অনুমতি দেন ও আমি একবার আমার অত্যাশ্র অগ-
স্তক আত্মীয়দিগের ওস্থ লইয়া আসি।” স্বর্ঘকুমার ও বর্ষাবৃত লোকটি এককালে
বসিলেন। “আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাদিগের ওস্থ যান।” কর্ত্তী গৃহ হইতে চলিয়া
গেলেন।

মালিকরাজ বলিল। “আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, গৃহ করুন।” স্বর্ঘকুমার গৃহ
করিলেন।

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়েরা আরম্ভ করুন, আমার কিছু বিলম্ব আছে।”

স্বর্ঘকুমার বলিল। “মহাশয়ের বিলম্বের কারণ?”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমার সায়ংকৃত্য হয় নাই।” সম্মুখে দণ্ডায়মান
ব্রাহ্মণ এক জন দ্রুতপদে বাইয়া একটি রোপ্য কোষা আনিয়া দিল। বর্ষাবৃত পুরুষ
উত্তরাশ্র হইয়া বসিলেন। ক্রমে শিরস্ত্রাণ মোচন করিলেন। হস্ত হইতেও ত্রকবচ
বহিষ্কৃত করিয়া সায়ংকৃত্যে নিযুক্ত হইলেন। স্বর্ঘকুমার ও মালিকরাজ তাঁহার প্রতী-
ক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সায়ংকৃত্য সমাপনে তিনি বলিলেন। “আমি মহাশয়-
দিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিলাম, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন।”

স্বর্ঘকুমার বলিল। “মহাশয়! আপনার শিষ্টতায় আমরা চিরজীত হইলাম।”
বর্ষাবৃত পুরুষ গৃহ করিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। স্বর্ঘকুমার ও মালিকরাজ
আহার করিতে লাগিলেন। স্বর্ঘকুমার ও মালিকরাজ জাতীয়স্বভাব বশত বাগ্ম্য হইয়া
আহার করিলেন। বর্ষাবৃত পুরুষটি অলাপ করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না।
তিনি অসে হেঁটমুণ্ডে ক্রমে ক্রমে আহারান্তে গৃহ করিয়া গাত্রোথান করিলেন। উপস্থিত
পরিচারকেরা হস্তপদাদি ধোতের জল দিল। শুচি হইয়া তিনি জনে কর্পূরবাসিত তাম্বুল
চর্কণ করিতে করিতে ন্তন আসনে বসিলেন।

গৃহকর্ত্তী পুনর্বার আসিয়া আপন আসনে বসিয়া বলিলেন । “আমার আপনাদিগের আহারকালে এ স্থানে অনুপস্থিতির দোষ ক্রমা করিবেন । অপর আড়াই শত ভক্তলোক অসুগ্রহ করিয়া অন্য রাত্রেই প্রভু এ গড় পবিত্র করিয়াছেন । আমি তাঁহাদিগের আহার প্রস্তুত করাইতে গিয়াছিলাম । তাহাতেই এত বিলম্ব হইল ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “তাঁহারও আপনার দ্রষ্টব্য ।”

কর্ত্তী বলিলেন । “এক্ষণে আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি বিদায় হই ।”

একজন লোক আসিয়া বলিল । “মহাশয়েরা কি এক ঘরে থাকিবেন, না আপনাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ঘর আবশ্যক হইবে ?”

স্বর্ধাকুমার কোন উত্তর দিল না । মালিকরাজ বলিল । “আমরা একত্র থাকিলেই সুখী হইব । বর্ষাবৃত্তকে লক্ষ্য করিয়া “মহাশয়ের কি মত ?”

তিনি বলিলেন । “একত্র থাকাই সুখকর ।”

মালিকরাজ বলিল । “তবে তুমি দুইটি শয্যা প্রস্তুত কর । আমরা দুইজনে একত্রে শয়ন করিয়া থাকি । দাসটী যে আত্মা বলিয়া চলিয়া গেল ”

মালিকরাজ বলিল । “এ গড়ে অতিবিসংকারের প্রণালী বড় উদ্ভ্রম ।”

বর্ষাবৃত্ত পুরুষটি বলিলেন । “এরূপ সুপ্রণালী আমি কুতাপি দেখি নাই । আবার গৃহকর্ত্তীটির অসাধারণ গুণ ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “মহাশয় এ কর্ত্তীটা ছাড়া এখানে ত আরও কর্ত্তী আছেন ?”

বর্ষাবৃত্ত পুরুষ বলিলেন । “মহাশয় এ স্থানে তিনটি কর্ত্তী আছেন । আপনারা কি রায়গড়ে পূর্বের কথন আসেন নাই ?”

মালিকরাজ বলিল । “মহাশয় আমাদিগের বিনোদেই সর্বদা থাকা, কাজেই যদিচ রায়গড়ের নিকট বাস, তথাপি রায়গড়ের কোন সমাচার বিশেষ জ্ঞাত নহি ।”

কর্ম্মচারী একজন আসিয়া বলিল । “মহাশয়েরা গর্ত্তোষন করুন, আপনাদিগের শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে ।” তাঁহারা সকলে গর্ত্তোষান করিলেন ও কর্ম্মচারীটির সঙ্গে শয়নাগারে গেলেন । একটি একতলা সুপ্রশস্ত ঘর । দুইটি দীপ জলিতেছে । দুইটি প্রশস্ত পর্য্যঙ্ক । তাহার পার্শ্বে একটি প্রশস্ত আসন আছে, তাহার তাম্বুলচয়ের পাত্র । একটি রূপার বড় পাত্রে পানীয় জল ও তিনটি রূপার পানামৃত । স্বর্ধাকুমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিলেন ও বর্ষাবৃত্ত পুরুষকেও বসিতে সত্ৰাষণ করিলেন । বর্ষাবৃত্ত পুরুষটি বসিলেন । মালিকরাজও স্বর্ধাকুমারের পার্শ্বে বসিলেন ।

কর্ম্মচারী বলিল । “মহাশয়দিগের আর কোন আবশ্যক না থাকে ও আমি বিদায় হই ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “আমাদিগের আর কোন আবশ্যক নাই, আপনি বিদায় হউন ।” কর্ম্মচারী চলিয়া গেল ।

স্বর্ধাকুমার বর্ষাবৃত্তকে বলিল। “মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার কিছু সন্দেহ হইতেছে।

বর্ষাবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়কে আমি স্থানান্তরে দেখিয়াছি।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় আমার সন্দেহ তবে সমূলক বোধ হইতেছে।”

বর্ষাবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “আমি আপনার বন্ধকেও স্থানান্তরে দেখিয়াছি।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “অন্য আপনি বোধ হয় লঙ্করপুর হইয়া আসিতেছেন।”

তিনি হস্ত বিস্তারিয়া বলিলেন। “আমি কি লঙ্করপুরের রণাভিনয়ের বীরের সম্মুখীন আছি?”

স্বর্ধাকুমার ব্যথ হইয়া বিস্তারিত হস্ত আপন হস্তে লইয়া বলিল। “মহাশয়কে আমি তখন প্রণাম করিতে পাই নাই, এক্ষণে প্রণাম করি। অন্যকার জর কেবল আপনার সাহায্যেই হইয়াছে।”

মালিকরাজ স্বর্ধাকুমারের প্রতি বলিল। “তুমি লক্ষ্য কর নাই, যখন কুকনাথের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন হজুরমল পশ্চাৎ হইতে তোমাকে ছেননাশয়ে আসিয়াছিল। কুঠারও উঠাইয়াছিল, আমি অগ্রসর হইয়াছিলাম। কেবল এই বীরের বলে আমার উভয়ে পরাজিত হইলাম ও তোমার প্রাণ রক্ষা হইল।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় আপনার সঙ্গে আসাপ হওয়ার আমি যৎপরোনাস্তি অপ্যাখিত হইলাম, ভাল হইল। এতক্ষণে আমার মনের একটি ভার দূর হইল।”

বর্ষাবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “আমি কোন্ বীরের প্রেমাঙ্গণ হইলাম?”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় তবে আপনার নিকট আর আমাদিগের পরিচয় সূকাইয়া রাখার প্রয়োজন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সুযোগ হইল।”

বর্ষাবৃত্ত বলিলেন। “মহাশয়, আমাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আমি আপনাদিগের কণ্ঠ করিতে অত্যন্ত আনন্দ পাই। বিশেষত আমার এই বন্ধুর (স্বর্ধাকুমারকে লক্ষ্য করিয়া) যে বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছি, তাহার আমি চিরক্ৰীত হইয়াছি। আমি নিশ্চয় ভাবি, আপনাদিগের উদ্দেশ্য অবশ্য উৎকৃষ্ট হইবে, আমি প্রাণপণে তাহা সাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলাম।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! ইনি জয়তীরাজপুত্র স্বর্ধাকুমার।”

বর্ষাবৃত্ত পুরুষটি সিংহিলেন। স্বর্ধাকুমারের হস্তটি ধাঁহার হস্ত হইতে বলিল। কিছুক্ষণ সে পুরুষটি একদৃষ্টে স্বর্ধাকুমারের প্রতি চাহিলেন। স্বর্ধাকুমার কিছু চমৎকৃত হইল। মালিকরাজ কিছু চমকিল। ভাবিল, “ইহার অর্থ কি?” পরক্ষণেই

বন্দ্যাবৃত পুরুষটি স্বভাবস্থ হইয়া বলিলেন, “মহাশয় আমার অসভ্য আচরণ ক্ষমা করিবেন। আমার কিছু রোগ আছে। তাহা কখন কখন আমাকে আক্রমণ করিলে আমি সংজ্ঞাহীন হই।”

মালিকরাজ বলিল। “আপনার পরিচয় পাইতে সাহস করি না।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষটি বলিলেন। “আমি দিল্লীর একজন কর্মচারী। আমার প্রকৃত নাম কোন কারণ বশত আপনাদিগকে এক্ষণে বলিব না। আমার ক্ষমা করুন। এক্ষণে আমাকে ষথা ইচ্ছা নামে ডাকুন।” মালিকরাজ ভাবিল, ‘বুঝি এ লোকটি মানসিংহের চর, তাহার নাম গোপনে রাখা বিধিবিহিত’ জানিয়া নাম জানিতে কাত্ত হইল।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় বোধ করি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে আসিয়াছেন?”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আজ্ঞা, আপনাদিগের নিকট সকল বিষয় শুণ্ড রাখা অন্যায়। আমি তাহারই সঙ্গে আসিয়াছি। আপনি কি এখানে ভ্রমণে আসিয়াছেন?”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়, আমাদের অত্রাগনের উদ্দেশ্য বলিলেই সকল অবগত হইবেন।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয় আপনার কর্ম আজ্ঞা করুন।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আমার বোধ হয় আপনি রাঙ্গগড়ের অবস্থা ভাল জ্ঞাত আছেন।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয় আমি অন্য সব অবগত হই লাম। আপনাকে বলিতেছিলাম যে, এ স্থানে তিনটি স্ত্রীলোক অধিকারিনী।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “আর শুণ্ডভাবে প্রয়োজন নাই, আমরা অত্রত্য সকল সমাচার অবগত আছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে স্ত্রীলোকটি অবশুর্জনবতী হইয়া আমাদের সংস্কার করিলেন, তিনিই কি ইন্দুমতী?”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হঁ, তিনিই ইন্দুমতী। আমি সংস্কার সময় এখানে আসিয়াছি। কোন সমাচার লইয়া আনয় ইন্দুমতীর সহিত আলাপ করিতে হয়।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় তবে ইন্দুমতীর একজন মঙ্গলকাজ্ঞী বটেন, তাহার বিপদ হইলে অবশুই পবিত্রাণের উপায় দেখিবেন।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “অবশু আমি তাহার প্রতিজ্ঞা করিতেছি। বিশেষতঃ মহারাজ মানসিংহের নিকট ইহার একটি আশ্রয় আছেন, আমার তাহার অনুরোধে জীবন পর্যন্ত দিতে হইবে। অন্য ইন্দুমতীর সঙ্গে আমার তাহারই কথা হইতেছিল, আপনারা বচুরায়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন?”

মালিকরাজ ও স্বর্ধাকুমার একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, যেন শব্দে তাঁহাদিগকে মোহিত করিল। তাঁহারা এককালে একখানে বলিলেন। “মহারাজ কচুরায় কি জীবিত আছেন?”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “ঈশ্বর তাঁহার নিরাপদে রাখুন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয়। যদিও তাঁহার সঙ্গে আমার কখন চাক্ষুষ হয় নাই, কিন্তু লোকমুখে তাঁহার গুণ শুনিয়া আমি তাঁহাকে যেন ভ্রাতার আদরে ভাল বাসি। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের ইচ্ছায় বিমলা মাতার জন্ত আমাকে ঔষধ আনিতে হয়, সে সময়ে বলন্তরায়ের সঙ্গে দেখা হয়। আহা, তিনি কচুরায়ের জন্ত কতই আক্ষেপ করেন, সে সময় আমি লোকমুখে কচুরায়ের প্রণয়সা ও গুণবাণ্য শুনিয়াছিলাম।”

বর্ধারূত পুরুষ কিছু চকল হইলেন, বলিলেন। “ইন্দুমতীর সঙ্গে কচুরায়ের কুশল সমাচার বলিতেছিলাম।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহারাজ কচুরায় কি এক্ষণে মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে আছেন?”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “হাঁ, তিনি এক্ষণে মানসিংহের সঙ্গে বর্ত্তমানে আসিয়াছেন।”

মালিকরাজ বলিলেন। “তিনি কি এখানে আসিবেন না? তিনি থাকিতেন ও অন্য বড়ই কুশল হইত।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “তিনি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে দৈন্ত লইয়া অতি শীঘ্র এ অঞ্চলে আসিবেন।”

মালিকরাজ বলিল। “তিনি থাকিতেন ও ইন্দুমতীর কোন চিন্তাই থাকিত না।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “এমত ত বোধ হয় না যে, তাঁহার বিদ্যমানে তাঁহার আশ্রিত কাহার কোন বিপদ ঘটে।”

মালিকরাজ বলিল। “কেবল আশ্রিত কেন? তাঁহার প্রেমাস্পদের।”

বর্ধারূত বলিলেন। “ইন্দুমতী কি কচুরায়ের প্রেমাস্পদ।”

মালিকরাজ বলিল। “ইন্দুমতী কচুরায়ের প্রেমাস্পদ হউন বা না হউন, লোকে ইহা খ্যাত আছে যে, ইন্দুমতীর প্রেমাস্পদ কচুরায়। ইন্দুমতী কচুরায়ের অবর্ত্তমান কষ্টে মলিন হইতেছেন।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “ঠিক বলিয়াছেন, কচুরায়ের সমাচার পাইবার ইন্দুমতীকে সোৎসুক দেখিলাম।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয়। ইন্দুমতী অনেক রাজকণ্ঠ হইতে সরল-স্বভাব, অবশ্য কোন সৎসংজ্ঞা হইবেন।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমারও ইহা সন্দেহ হইয়াছে, কিন্তু মহারাজ কচুরায়ের মুখে শুনিয়াছি ৮ মহারাজ বসন্তরায় ইন্দুমতীকে কোথায় কুড়াইয়া পান।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কিন্তু তিনি ও ইন্দুমতীকে কোন অদ্ভুতকুলনীলতার মত ব্যবহার করেন নাই? ইন্দুমতী কোন বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “এনি কত্ৰিয়া হইবেন, নতুবা বিরূপে কচুরায়ের প্রেম জমিল?”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়ের সঙ্গে কি মহারাজ কচুরায়ের ইন্দুমতীর জাতি-বিষয়ক কোন কথা হইয়াছিল?”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “যাহা কথাবার্তা হয়, তাহার ইন্দুমতী কত্ৰিয়া বলিয়া আমার বোধ হয়, কিন্তু কচুরায়ের কথাবার্তায় আমার এমন জ্ঞান হইয়াছিল যে, ৮ মহারাজ বসন্তরায় তাহার কুল ও জাতি অবগত ছিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর কথার ভাবভঙ্গিতে তাহা কিছু প্রকাশ পায় না, বরং এমন বোধ হয় যে, ইন্দুমতী আপনার পিতামাতার নাম ধাম অনবগত থাকায় সন্দেহ যেন দুঃখিতা থাকেন ও যেন কচুরায়ের প্রেমলাভে সন্তুষ্ট হন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয়! আমি আপনাকে ইন্দুমতীর বিপদের কথা বলিতেছিলাম।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হাঁ, তাহার কি বিপদ উপস্থিত।”

স্বর্ধাকুমার বলিল “মহাশয়! আপনি অবগত আছেন যে, অদ্য এই গড়ে দুই শত পকাশ জন অতিথি আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হাঁ, তাহা শুনিয়াছি।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “আপনি মহারাজ মানসিংহের নিকট থাকেন, অবশ্য সিংহাসিন গঞ্জালিসের নাম শুনিয়াছেন?”

মালিকরাজ বলিল। “কিরাজি-দস্যাদলের অধ্যক্ষ, যাহার দৌরাত্ম্যে দক্ষিণ রাজ্য জনশূন্য হইয়াছে ও দুষ্ট জন্তুর আবাস হইতেছে।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “গঞ্জালিসের নাম আমরা যথেষ্ট অবগত আছি, মহারাজ মানসিংহের বঙ্গাগমনের প্রধান এক উদ্দেশ্যই গঞ্জালিসের সঙ্গে আলোচনা করা।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “গঞ্জালিস অদ্য এই গড়ে আগমন করিয়াছে। তাহার সঙ্গে দুই শত পকাশজন দস্যও আসিয়াছে। আমরা তাহাঙ্গিনের ছীপও দেখিয়া আইলাম।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তাহাঙ্গিনের অত্রাগমনের উদ্দেশ্য কি?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “তাহাই আপনাকে বলিতেছি।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় হজুরমলেরও নাম শুনিয়া থাকিবেন।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ এই নামটি শুনার চক্ষুর্ধর বিশেষ উত্তেজিত করিলেন ও বলিলেন।

“হাঁ। হজুরমলকে আমরা ভাল করিয়া জানি, যে হজুরমল পূর্বে দিল্লীখবরের অধীনে একজন সেনানী ছিল। যে সম্প্রতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বেতনে আছে?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “হাঁ তিনিই।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তিনিও না অন্য অভিনয়ে ছিলেন?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “হাঁ তিনিও ছিলেন। মহাশয়! আমাকে তাঁহার ধরশাল আসি হইতে বাচাইয়াছেন।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ হস্ত বিস্তারিয়া স্বর্ধাকুমারের হস্ত ধরিলেন ও হৃদয়ে তাহা পীড়িয়া বলিলেন। “আপনি তাহা বিশ্বস্ত হউন। আমি উহা শুনিতে কিছু লজ্জিত হই।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয়ের চিহ্নই এই।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তিনিও কি এখানে আছেন?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “হাঁ তিনিও আছেন।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তবে ত মহারাজ মানসিংহের ছাউনিতে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বুঝি সত্য হইল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তবে গজালিসের পোষক। হজুরমল কি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতসারে আসিয়াছেন?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “তিনি তাঁহার আদেশমত আসিয়াছেন?”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “প্রতাপাদিত্যের আদেশমতে বসে গজালিস ও এখানে আসিয়াছে?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় শুনুন। প্রতাপাদিত্য গজালিস ও হজুরমলকে পাঠাইয়াছেন। ইহারায় অন্য রায়গড়ে লস্কায় মত আক্রমণ করিবে দ্রব্যাদি যত লউক বা না লউক, প্রতাপাদিত্যের অনুমতি ইন্সুমতীকে হরণ করিবে। বলপূর্বক লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দিবে, তিনি ইন্সুমতীকে বিবাহ করিবেন।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ এই কথাটি শুনিয়া সিহরিলেন, বলিলেন। “যথেষ্ট যথেষ্ট, আর আমি শুনিতে চাহি না। হা বিধাতঃ! পাপীর পাপের শেষ নাই। নারকী এক পাপ হইতে কেবল পাপাতুরে হস্তক্ষেপ করিয়া ক্রমে অধম নরকোপযুক্ত হয়। আঃ একি অসম্ভব ব্যাপার। এমনত অনৈসর্গিক প্রবৃত্তি ত কখন দেখি নাই।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ উঠিলেন। আপন তলবারাতে হস্তক্ষেপ করিয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, এমন কি প্রায় একদণ্ড কাল গৃহমধ্যে পালচালন করিয়া অবশেষে আপন ললাট হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আপনা আপনি বলিলেন। “আরও কি ঘটে। পাষণ্ড নরাধম পামর। ইহার আর কখনই ক্ষমতি হইল না।”

আগনে আসিয়া বসিলেন। একবার স্বর্ধাকুমারের হস্তটি বলপূর্বক ধরিলেন। তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কণ্ঠকণ এরূপ ধাক্কা বলিলেন। “স্বর্ধাকুমার!

মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন আমি নিতান্ত অপরাধী। কি করি, আবার সেই রোগ আমাকে আক্রমণ করিয় ছি। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয়! ইহার সঙ্গে অনুপরামও আছেন।”

বর্ধাকুমার পুরুষ বলিলেন। “কি স্বর্ধাকুমারের রাজার ভ্রাতা?”

মালিকরাজ বলিল। “হাঁ।”

বর্ধাকুমার পুরুষ বলিলেন। “তিনি ইহার সঙ্গে কেন?”

মালিকরাজ বলিল। “তিনি আপন রাজ্য লাভাশয়ে গজালিসের আশ্রয় লইয়াছেন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “প্রতাপাদিত্যেরও আশ্রয় লইয়াছেন।”

বর্ধাকুমার পুরুষ বলিলেন। “এ যে সকল নারকীর একত্রে মিলন দেখিতে পাই? এ নরাদম প্রতাপাদিত্য বঙ্গরাজ্য শূণ্য করিয়াছে। বঙ্গের একাদশ রাজার রাজত্ব কোথাও বলপূর্বক, কোথাও বা কৌশলে, কোথাও বা অতি অকথা ভয়ানক পাপ পরামর্শে লইয়াছে। বঙ্গ সেই একমাত্র ছত্রধারী। তাহার রাজত্বশাসনে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আবার হিন্দুরাজা বলিয়া অহঙ্কারও আছে। বঙ্গ অধিতীয়। বর্ধাকুমার অতি নিকৃষ্ট, রাজনামের অযোগ্য পাত্রের মত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য সে সব গুণ যথেষ্ট! অত্যন্ত তেজস্বীও বটে, কিন্তু এমত পাপবুদ্ধি আর ছুটি দেখিতে পাই না। যদ্যপি ধর্মপথে থাকিত, অন্য কাহার সাধ্য বঙ্গ মুসলমান-বলের অধীন করে। রাজ্যকোশলে স্ননিপুণ, রণক্ষেত্রে একটা প্রকৃত বীরও বটে, কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়গোষেই সব নষ্ট করিয়াছে। অদম্য বিষয়লাভাশয় তাহার সঙ্গে অসম্ভব উৎসাহ ও ব্রাহ্মতা একত্রিত হইয়া সে কত পাপে লিপ্ত হইয়াছে। সে যদি সংপথে থাকিত, তবে বঙ্গের আর এক অবস্থা হইত। এতকালের পর পুণ্ড্রন বঙ্গরাজ্য নষ্ট হইল।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! প্রতাপাদিত্য যদি পরামর্শ শুনিতেন, তবে কি তাহার এমত পাপে মন হয়? বঙ্গের এককালে স্বর্ধাকুমার হইতেছে। প্রতাপাদিত্যের বলে বঙ্গ উজ্জ্বল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পাপেও কলুষিত হইল।”

বর্ধাকুমার পুরুষ বলিলেন। “প্রতাপাদিত্যের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। তাহার বলে দিল্লীরকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। যে সকল সমাচার দিল্লিসম্রাটের কর্ণে উঠিয়াছে, তাহা বড় সহজ কথা নহে। শুনিতেছি উড়িষ্যার পাঠানদিগের সঙ্গেও তাহার সন্ধি হইবার কথা। চরে বলিল যে, পাঠানরাজ, অনুপরাম ও গজালিস প্রতাপাদিত্যের বশতাপন্ন হইয়াছে। বর্ধাকুমার অস্তঃশীলা বহিতেছেন; তিনি আত্মরিকে জয়ী পক্ষ। ইহারা একত্র হইয়া প্রথমে অনুপরামকে স্বর্ধাকুমার অভিধিক্ত করিবে?”

মালিকরাজ বলিল। “এইমত পরামর্শ হইয়াছে ; সেই উদ্দেশ্যেই মহারাজ পুরুষোত্তম বর্ননচ্ছলে উড়িষ্যার পাঠানদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যাইবেন।”

ধর্ম্মাবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “আমি এ সকল মানসিংহের সভায় শুনিয়াছি অনুপরাম বক্ষপুত্রের হইলেই, বক্ষপুত্রের সমস্ত বল একত্র করিয়া প্রতাপাদিত্যের অধীন করিবে ; বশোদ্বপতি তাহা হইলে পাঠান-সৈন্য, বক্ষপুত্র-সৈন্য, গঞ্জালিসের দল্যবল ও মনে মনে করিতেছেন, বর্জমানের সৈন্য লইয়া দিল্লি আক্রমণ করিবেন, পরামর্শ টা নিতান্ত বুদ্ধিমত হয় নাই ! অনুপরাম রাজ্যভিত্তিক হইলে কি প্রতাপাদিত্যের জন্ত আপন সৈন্য জয় করিবে ? দিল্লীখরের সঙ্গে তাহার কোন বাদ নাই।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় ! মহারাজ নিতান্ত ভালক নহেন। তিনি বর্জমান-ধিপের সৈন্য আপন সৈন্য ও গঞ্জালিসের সৈন্য লইয়া স্বয়ং উড়িষ্যা হইতে আসিবার সময় আপনি বক্ষপুত্র যাইবেন। ইতোমধ্যে গঞ্জালিস কিছু সৈন্য লইয়া বক্ষপুত্র আক্রমণ করিবে। বক্ষপুত্রের প্রধান আমীরেরা অনুপরামের পক্ষ আছেন। মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনুপরামকে আপনার একজন সেনানীপদ দিয়া বক্ষপুত্রের ধন ও সেনা সংগ্রহ করিবেন। অনুপরাম হীনবল, নবাভিষিক্ত, তখন কিছুমাত্র আপত্তি করিতে সমর্থ হইবে না।”

বর্জাবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “হাঁ, আপনারা এই মতই জানেন, কিন্তু উহা প্রকৃত নহে। বক্ষপুত্রের প্রধান প্রধান আমীরেরা বর্তমান রাজ্যের পক্ষ, কেবল তিন চারি জন পাপাত্মারা বর্তমান রাজ্যের শাসনে অসন্তুষ্ট, কিন্তু দেশস্থ সকলে অনুপরামের উপর রুষ্ট আছে। অনুপরামের ভদ্রীর সহিত গঞ্জালিসের বিবাহ হইবে, শুনিয়া তাহারা এক কালে খড়্গাহস্ত হইয়াছে। রাজ্যের জন্ত ধর্ম্মবর্জিত কর্ম্ম করা অভ্যস্ত গর্হিত।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় ! প্রতাপাদিত্যের উপর দিল্লীখরের কি ভাব ?

বর্জাবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “তিনি প্রতাপাদিত্যকে সামান্য জ্ঞানে নিশ্চিত নহেন। যদিচ দিল্লী আক্রমণ পরামর্শে তত ভীত নহেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা বিশেষ জ্ঞাত আছেন। যদি বশোদ্বপতি পরামর্শ মত সঙ্গী পান, তবে একান্ত দিল্লীখর হইয়া রাজ্য শাসন করিতে না পারুন, দিল্লীখরকে কল্পিত করিতে পারেন ; তাতে আবার হিন্দু রাজারা যদিচ আকবর বাদসাহের শাসনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন না, তথাপি কেমন একটু জাভাতিমান যশত যদি কোথাও কোন হিন্দুরাজা বিদ্রোহ উপস্থিত করিত, তবেই সমস্ত হিন্দুরাজারা তাহার পক্ষ হইয়া সম্রাটের সহিত বিচার করিতেন। এক্ষণে তাঁহার কাল হইয়াছে। কে জানে সেলিম জিহাদির কিরূপ লোকপ্রিয় হন। তাহাতে আবার আকবর সাহের খস্রু সিংহাসনারূঢ় হইবার কথা শুনিতেছি। মহারাজ মানসিংহ তাহাতে আকবর সাহের জীবদ্দশায় বধেষ্ট বড়শীল ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার

কি অভিপ্রায় কিছুই বোঝা যায় না। রাজ্যনাশের চক্রান্তগত চক্রাদির গতি অনুমান করা কঠিন।”

হৃদয়কুমার বলিল। “মহাশয়! অদ্যকার পরামর্শ তুলিলেন, এক্ষণে কি করা উচিত?”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “মহারা অনেক এক্ষণে গড়ে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু বোধ হয় গড়ে বধেই সেনা সর্বদা বর্তমান থাকে।”

মালিকরাজ বলিল। “ইহানীং বোধ হয় গড়ে বধেই সৈন্তবল নাই।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়েরা অথৈ আসিয়াছেন?”

হৃদয়কুমার বলিল। “হাঁ, আমরা অথৈ আসিয়াছি। আপনিও বোধ হয় অথৈ।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “আপনাদিগের সমূহ অস্ত্র আছে দেখিতেছি, এক্ষণে আপন আপন অস্ত্রগুলি এখানে আনিয়া রাখা বিধেয়। আমি একটু বিশ্রাম করি, ইত্যবসরে আপনাদিগের ও আমার অস্ত্র এইখানে আনান।”

মালিকরাজ “ভাই ভাল” বলিয়া ঘরের বাহিরে গেল। দূরের একটি ঘরের ভিতর দেখে, হুই জন চাঙ্গা বসিয়া আছে, তাহাদিগকে অস্ত্রের কথা বলায়, তাহারা কিছু ভাল উত্তর দিল না, আপনিও গড়ের মন্দুরা কোথায় জানিতেন না, অগত্যা কৃতকর্ম্ম না হইয়া কিরিয়া আসিতে হইল। বর্ধারূত পুরুষ আহাঙ্গের পর শিরস্ত্রাণ ও করকবচ পরিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল মোচন করিয়া শয়ান ছিলেন। মালিকের কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও শিরস্ত্রাণ, করকবচ, বাহুবন্ধ, উরোরক্ষ প্রভৃতি অস্ত্র প্রত্যঙ্গের বস্ত্র অঙ্গে লাগাইলেন ও গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। মালিকরাজ সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সেই ঘরে গিয়া বর্ধারূত পুরুষ দেখিলেন যে, আমাদিগের পুত্রাভিন আত্মীয় নসিরাম বসিয়া আছেন। তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া অন্তরে লইয়া কিছু বলিলে সে সিহরিলা, বলিল “আমি দ্বন্দ্ব সকল আনিয়া দিয়া অনন্তদেব পালকে সমাচার দিই ও মুরচায় অগ্নি জ্বালাই।” তৎপরে বর্ধারূত পুরুষ নিবেদন করিয়া বলিলেন “যদি তাহাদিগেরও পরামর্শ থাকে ও অকারণ ভীষণপ্রকৃতি প্রকাশ করিয়া অনেককে কষ্ট দিতে হইবে।” পরে সে বর্ধারূত পুরুষ, হৃদয়কুমার ও মালিকরাজের অস্ত্রত্রয় আনিয়া দিল।

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়দিগের অস্ত্রত্রাণ কিছু থাকিলে ভাল হয়, বোধ করি আপনাদিগের দুর্গরক্ষার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন।”

মালিকরাজ বলিল। “সেই মানসেই আমাদিগের আগমন। অস্ত্রত্রাণ হইলে কিছু ভাল হয়।”

বর্ধারূত পুরুষ নসিরামকে ভাল হুটি অস্ত্রত্রাণ আনিতে বলায় নসিরাম শীঘ্র হুইটী উৎকৃষ্ট অস্ত্র লৌহ বস্ত্র আনিয়া দিল। মালিকরাজ ও বর্ধারূত পুরুষ আপনাদিগের উক্ত বাসে উপহিত হইলেন। হৃদয়কুমার বস্ত্রবস্ত্র দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

নসিরাবকে বন্দীকৃত পুরুষ কিছু কহিয়া দিলে নসিরাম চলিয়া গেল। মালিকরাজ ও হৃদ্যকুমার বর্ষে শত্রুর আক্রমণ করিলেন। হৃদ্যকুমার যেন দ্বিতীয় অর্কের ভায় শোভা সম্পাদন করিলেন, মালিকরাজও দিব্য সাধিল। বীরবরে পরস্পরে পরস্পরের দিকে অহঙ্করে লক্ষ্য করিলেন। যেন পরস্পরের সাহস উজ্জ্বলিত হইল। অবশেষে আনিয়া শবের এক পার্শ্বে রাখিয়া তিনজনে আসনে সাজ হইয়া বসিলেন। তখন হৃদ্যকুমারের মূর্তি পরিবর্তন হইল। আর কেহ দেখিলে বলিতে পারে না যে, এটি হৃদ্যকুমার। মালিকরাজ বক্রপটে উঠাইয়া বসিল। “মহাশয় তিনজনে কি তিনশত লোকের সমুখীন হইয়া কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিব ?”

হৃদ্যকুমার ও বন্দীকৃত পুরুষ এককালে বলিলেন। “মালিকরাজ ! এ তিনজনে একত্র হইলে, অক্লেশে তিন শতলোক পরাজয় করিতে পারা যায়, কিন্তু পরিষ্কার স্থান আবশ্যক।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় ! উহাদ্বয়ের অন্য ভাল নাই, তথাপি আমার মতে একপেই গড়ে সমাচার দেওয়া কর্তব্য।”

বন্দীকৃত পুরুষ বলিলেন। “সেটী নিতান্ত ভীত লোকের মত কর্ষ হইবে। আমরা যদি নিশ্চয় জানি যে, ইহারা অদ্যই আক্রমণ করিবে, তথাপি কি জানি, যদি তাহারা গড়ের রকম লোথিয়া মত পরিবর্তন করে। আর সম্ভবমাত্র আতিথির উপর দৌরাস্ত্র করণে কিছু অশ্রয়। কিন্তু আমি তাহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে ইহিলাম। ইতিমধ্যে মহাশয়েরা কিছু বিশ্রাম করুন, বিপদ উপস্থিত হইলেই সমাচার দিব।”

হৃদ্যকুমার বলিল। “আমরা নিশ্চিত হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিব না, তবে সন্তর্ক হইয়া শয়ন করা যাক।”

বন্দীকৃত পুরুষ বলিলেন। “সে ভাল, বরং অশপৃষ্ঠে পর্ধ্যাণ দিয়া শয়ন করুন।”

হৃদ্যকুমার উঠিল। বন্দীকৃত পুরুষ গৃহ হইতে বাহ্যগমন করিলেন। হৃদ্যকুমার পর্ধ্যাণ লইয়া অশপৃষ্ঠে গিল, কাকীতে (১) অশকটী চূড় বন্ধন করিল। খলৌন লইয়া অশবক্ষে দিয়া বন্দনা (২) ঘোজন করিল। পর্ধ্যাণ উত্তরে পানবলয়-পরিমিত (৩) করিয়া বন্ধ করিল। বন্দীকৃত পুরুষের অশও সেইরূপে সজ্জ করিল। অবশেষে মালিকরাজের অশকেও সেইরূপে সজ্জ করিল, কেবল খলৌন পরিবর্তে তাহার বন্ধে কথিকা দিল। তিনটী অশ প্রস্তুত করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে রাখিয়া পর্ধ্যাণে শয়ন হইল। মালিকরাজও তাহার পার্শ্বে সম্বন্ধে বিশ্রাম করিল। উত্তরে পর্ধ্যাণে বিশ্রাম লইল বটে, কিন্তু কেহই চক্ষু মুদ্রিত করিল না, এই রূপে কিছুক্ষণ অতীত হইবার পর, বন্দীকৃত পুরুষ গৃহে আসিল।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় সবাচার কি?”

তিনি বলিলেন। “তাহারা যে দিকে আশ্রয় লইয়াছে, আমি সেই দিকে তাহা-
দিগের ভেত্রে গিয়াছিলাম। দেখলাম তাহারা সকলেই শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছে।
ও ফুস ফুস করিয়া কথাবার্তা কহিতেছে। বোধ হয় অতি শীঘ্র প্রস্থত হইবে।
আমার শেল কোথায় রাখিয়াছেন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয়! ঐ অথ যে কোণে আছে, সে দিকের প্রাচীরে
আছে।” বন্দীভূত পুরুষ তথায় গিয়া আপন শেল লইয়া বাহিরে গেলেন, ক্রমে রায়পড়
নিকট হইল। পতায়াত শেষ হইল। ক্রমে চুই জন প্রহরী দীর্ঘ শেলকরে যে গৃহে
স্বর্ধাকুমার ছিল, তাহার দ্বারে আসিয়া বলিল। “অভিধি মহাশয়দিগের কিছু প্রয়োজন
থাকে ত অনুমতি করুন, পরে আর কিছু পাইবেন না।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “আমাদিগের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাইয়াছি, আমাদিগের
কিছু আবশ্যক নাই।”

প্রহরীরা চলিয়া গেল। কিছু পরেই রায়পড়স্থ অটালিকাচয়ের দ্বারদ্বারা শব্দ
নির্জন ভূগে বৈষ্ণবো প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিছু পরেই তাহা ক্ষান্ত হইলে,
হুগটী যেন জনশূন্য হইল।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিকরাজ! আর আমাদিগের শয়নে প্রয়োজন নাই,
উঠ আপন অশ্বে উঠিয়া একবার গড় দেখিয়া আসি। পরিজনেরা শয়ন করিয়াছে।”

মালিকরাজ গাত্রোধান করিল। স্বর্ধাকুমার শয্যা হইতে উঠিয়া আপন অশ্বে আরুঢ়
হইল ও আপন অন্ত্রাদি লইল, মালিকরাজও অশ্বারুঢ় হইল। উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উপ-
বিষ্ট হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হয়, এমন সময় বন্দীভূত পুরুষ গৃহদ্বারে আসিয়া বলিলেন।
“আমি অশ্বারুঢ় হই।” তিনিও অশ্বারুঢ় হইয়া তিন জনে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিকরাজ! তুমি এ চূর্ণের পথ অবগত আছ। চল অগ্র-
সর হও। আমরা গড়টী ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করি।”

বন্দীভূত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! আমি এ চূর্ণের সকল পথ জানি, চলুন এ
হুগটী দেখাইয়া আনি।”

বন্দীভূত পুরুষ অগ্রসর হইলেন, স্বর্ধাকুমার ও মালিকরাজ তাঁহার অনুসরণ করিতে
লাগিলেন। পথে একজন প্রহরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল। “মহাশয়েরা কে,
এত রাত্রে কি কারণে ভ্রমণ করিতেছেন?”

বন্দীভূত পুরুষ বলিলেন। “আমরা অভিধি, এই স্থানে আশ্রয় পাইয়াছি। গড়টী
কেমন দেখিব বলিয়া বেড়াইতেছি, যদি তোমার ইচ্ছাতে কোন আপত্তি থাকে ত বল,
আমরা আপন ঘরে বাই।”

প্রহরী কিছু লজ্জিত হইয়া বলিল। “আপনাদিগের যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করুন, এ আপনাদিগের আবাস।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! প্রহরী পর্য্যন্ত তত্ত্ব। আহা! একদণ্ড হুশানন কোথাও দেখি নাই।”

তিন জনে প্রধান পথ দিয়া যাইতে যাইতে এক পরিবার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার উপর যে নে একটি ছিল, রাত্রি শত সেটি উঠাইয়া দ্বারস্বরূপ হইয়াছে; নিকটে একজন প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে, ইত্যাদিকে দেখিয়া বলিল। “তোমরা কে, এত রাত্রে কি কারণ দ্বারকট হইয়া ভ্রমণ করিতেছ?”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “আমরা অতিথি, দুর্গপারবেক্ষণ করিতেছি; অনুমতি কর ত চতুর্দিকে ভ্রমণ করি, নতুবা তোমাদিগের দণ্ড আবাদে যাই।”

প্রহরী বলিল। “মহাশয়েরা সুখে ভ্রমণ করুন।”

তিন জনে প্রভোদী (১) প্রাঙ্গণ দিয়া ক্রমশঃ প্রধান দ্বার পার হইলেন। পরে মধ্যস্থ রাজবাটীর সম্মিধান হইলেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণ দীর্ঘতর পরিষ্কার জল ও চমৎকার ষাটের প্রাঙ্গণ করা করিলেন। জ্যোৎস্নার স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, বাটির দ্বারে একজনমাত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে, ইহারা তিন জনে ক্রমশঃ দ্বারের নিকট হইতে লাগিলেন। প্রহরী ইহাদিককে দেখিয়া দাঁড়াইল। পরে পরিচয় লইয়া আপন কন্ঠে নিবৃত্ত হইল। ইহারা দ্বারদেশ ত্যাগ করিয়া যে ঘরে ফিরিয়া আসিবার দ্বার ছিল, তথায় আসিয়া দেখেন, তাহারা কেহই ঘরে নাই, বস্তু শূন্য।

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষাটী বলিলেন। “স্বর্ধকুমার! বোধ হয় ইহারা আক্রমণশয়ে বাহির হইয়াছে, কিন্তু কোথায় গেল, আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না; এ বন্দ্যে পাপেরা বিশেষ লক্ষ দেখিতেছে। এক্ষণ আর নিশ্চিত হওয়া কঠিন নহে। চল ত্রুত রাজ-দ্বারে যাওয়া যাক; তাহারা অবশ্যই দেখানে গিয়া থাকিবে।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! আমার জ্ঞান হয় তাহার অপরাধ প্রামাণ্যে প্রমাণিত। যেখানে ইন্দুমতী দেবী আছেন, তাহারা সেই খানেই প্রথমে যাইবে। তাঁহাকে হরণ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। এখন রাজদ্বারে যাইয়া কি করবে? আপাততঃ পরে গোল উপস্থিত হইলে, কোষ আক্রমণ করিবে।”

স্বর্ধকুমার বলিল। “আমরাও তাহাই বোধ হইতেছে। আমার পরামর্শে একদণ্ড ইন্দুমতীর আবাস দেখিয়া আসা কঠিন। পরে রাজদ্বারে অবস্থান উচিত।”

বন্দীকৃত পুরুষ বলিলেন। “মালিকরাজ! তুমি কি অবসন্ন আছ যে, ইন্দুমতী দেবী রাজবাটিতে অবস্থান করেন না?”

মালিকরাজ বলিল। “হামিও এইরূপ পূর্বে শুনিয়াছিলাম।”

বন্দীকৃত পুরুষ বলিলেন। “ওবে বোধ হয়, তাহারা নেইখানেই গিয়াছে, ইহাদিগের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করা যাক্।”

মালিকরাজ বলিল। “তবে তাই চলুন” তিন জনে অশ্রু ক্রমে প্রশস্ত মার্গ দিয়া যাইতে যাইতে দূরে লোক-কোলাহল শুনিতে পাইলেন। মালিকরাজ অশ্রুবেগ সংযত করিয়া বলিল। “মহাশয়! ঐ লন, শব্দ হইতেছে।” বন্দীকৃত পুরুষ অমনি সাহসিকারে সরল হইয়া অশ্রু বসিলেন। একবার অশ্রুবেগ ধারণ করিলেন। চতুর্দিকে সত্যজনকে দেখিলেন। দক্ষিণ হস্তের শেণী ভাল করিয়া ধরিলেন। বাম হস্তে তুরী লইলেন। সূচ্য-কুমারও আপন অশ্রু সরল হইয়া বাসলেন ও আপন তুরী বাম হস্তে ধরিলেন। মালিকরাজও আপন তুরী লইলেন। লোক-কোলাহল শ্রবণ তিন জনের চক্ষু নকল অগ্নিস্কুলিত নিক্ষেপিতে লাগিল। উৎসাহে তাঁহাদিগের আশ্রয় মসীবর্ণ হইল। কুটি-কুটি আর-কুটি হইল। এক দৃষ্টে উন্নতগলো। বন্দীকৃত-বন্ধে তাঁহারা চারি দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ঐক্য উত্তোষে বহুমূল্য ইহাদিগের সুপ্রশস্ত বন্ধকে আরও প্রশস্ত করিল। যোদ্ধা-প্রপন্নতা ও পালচালনের উপর ভর দিয়া ও দ উন্নত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পক্ষ কামূল্য প্রভোদকটক অস্ত্রের পাশে কাটিতে তাহারা উন্নতবর্ণ, বক্রক্রৌর, বিস্তৃতপুঙ্খ হইয়া পলচালনে মগ্নন করিতে লাগিল। সূচ্যকুমার ও বন্দীকৃত পুরুষের অশ্রুধ্ব উদ্যত খলানের আশ্রয় মূল চক্রে ফেন বিক্ষেপ করিতেছে। এক একবার অশ্রুর সবধে ক্রৌর বা মুখাঙ্কোলে ফেনরাশি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মালিকরাজের অশ্রু মুহুমুহ, ওখাচ তাহার কাঁকা-চক্ক-ফেনে আপন বক্র অপ্রাবিত করিতে লাগিল। তিন বীরে আপন আপন তুরী লইয়া এমত বলে ধ্বনি করিলেন যে, তুরীধ্বনিতে বোধ হয় দুই ক্রোশের পর্যন্ত লোকে চমকিয়া উঠিল। তুরীধ্বনিতে দূরস্থ কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। তাহারই অব্যবহিত পরে একরূপ আলোক ধবকু করিয়া অলগা উঠিল, পলাই হইল বেশ তুরীধ্বনি হিলোনে ছত্ৰাঘি জ্বলিল। উক্ত বীরত্রয় অমনি নক্ষত্রবেগে একটী গভীরামগ্ননাগ করিয়া নক্ষত্রবেগে অশ্রু চালন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

“অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ পরধনায রতিঃ পরমোষিতি ।

সুজনবন্ধুজনেষসহিযুতা প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি হৃদাস্বনাম্ ॥”

বেঞ্জামিন, বৈদ্যনাথকে আপন গৃহে রাখিয়া ভিক্টরসের সঙ্গে গেডিঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আনর্থনি ফ্রান্সিস্কে ও ক্রুডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বেঞ্জামিনকে দোখিয়া, বলিল “এই যে কর্তাই আসিতেছেন।”

ভিক্টর বলিল। “সত্য একজনকার কর্তাই বটেন, ইহাঁর হস্তে সকল ক্ষমতা আছে, মনে করিলে এইক্ষণেই আমাদেরকে জখের মত বাঁচাইতে পারেন।”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “কি হে ব্যাপারখানা কি? তোমার হাতে কি এমন জিনিস আছে যে, আমাদের উদ্ধার করবে।”

ক্রুড বলিল। “বেঞ্জামিন, ভিক্টরসের নিকট সকল তুমিরা থাকিবে। এখন কি করা কর্তব্য। বৈদ্যনাথের লোকেরা খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অচুমতি পাইলে আমাদেরকে আক্রমণ করিবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “এক্ষণে একমাত্র উপায় আছে। কিন্তু তোমরা ও আমার কথা শুন না। শুনিতে ত, এরূপ বটনা হইত না। আপনা আপনি এমত করা উচিত নহে। তাতে আবার এত নিকটে এ সকল দৌরাস্ত্রা সহ পার না। আবার কতকগুলি লোককে বন্দী করার ফল কি?”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “তা এখন আর বলিলে কি হবে। যা হবার তা ত হয়েছে। আগে তখন যদি এত আগ্রহ প্রকাশ করে নিষেধ করিতে ত আমরা অবশ্যই তনিতাম।”

বেঞ্জামিন বলিল। “কি! আমি তা বলি নাই? যত নিষেধ করিলাম তোমরা তাতে কর্ণপাতও করিলে না। তা আমি কি করিব। এখন আপন কর্মের ফলভোগ কর। মাঝে থেকে আমি ত যাই।”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “তাতে আমার বড় ভয় নাই। সত্য কিছু আমরা এত কাপুরুষ নহি, যে ভয়ে জড় সড় হব। তবে, কি জান, বৈদ্যনাথ হল এ দেশের লোক, তাতে আবার অত্যন্ত ধনী। তার লোকবলও যথেষ্ট। এখন আবার গজালিস নাই। সে থাকিত ও যা হউক একটা হাঙ্গাম উপস্থিত কর যেত, হয়ত সনদ্বীপ আমাদেরই হইত। বৈদ্যনাথ ও গজালিস এক স্থানে বাস করিতে পারে না। কিন্তু এখন আবার আমাদের সৈতসব আত্মকাণে পাঠাইতে হবে। আবার সব লোকও এখানে নাই। কঁতক গজালিসের সঙ্গে পেল। কতক হত্যা আছে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “তুমি কি সত্য সত্য সকল লোক একত্র পাইলে বৈদ্যনাথের সঙ্গে বাণ করে সমরীপে বাস করিতে পারিবে? তা মনেও করো না! বৈদ্যনাথ বড় নিতান্ত হীনবল নহে।”

ক্রান্তিস্থে বলিল। “আপনাআপনি মধ্যে বলিতে কি, বৈদ্যনাথ যদ্যপি প্রকৃত প্রভাবে বিবাদ উপস্থিত করে, তবে বলা যায় না। আমাদিগের কি হয়। তবে আমরাও কিছু নিতান্ত অকর্ণণ্য নহি। অঙ্গে কখনও বৈদ্যনাথকে ছাড়িব না।”

বেঞ্জামিন বলিল। “কি করিবে? শুনিতেছি আনধনি পোক লইয়া বক্ষপূরে বাইবে। তবে সেই সময় যদি বৈদ্যনাথ আপন সৈন্ত লইয়া তোমাদিগের গেড়িজে আক্রমণ করে।”

ক্রান্তিস্থে বলিল। “আমরা সেই পরামর্শ করিবার জন্ত একত্র মিলিয়াছি। এখন আনধনিকে দেনা লইয়া বাইতে দেওয়া উচিত কি না।”

রুড বলিল। “এক্ষণে একমাত্র উপায় আছে।”

ক্রান্তিস্থে বলিল। “তোমার কি পরামর্শ।”

রুড বলিল। “আমি জানি এক্ষণে বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের বাণিতে আছে তাহাকে ধরিয়া গেড়িজে বন্ধ করিলে মনিব না থাকায় তাহার লোকজন অবশ্য স্থির হইয়া থাকিবে? পরে এ সংবাদ প্রচার হইতে না হইতে গজালিস আসিয়া পৌঁছিতে পারে ও আনধনিও আরাধণ হইতে আসিতে পারে।”

ভিক্রুস বলিল। “বড় ভাল পরামর্শ। আমার ইহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। এমন কি আমার জ্ঞানে এই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। এ সুযোগ ত্যাগ করিলে আমরা নিতান্তই প্রাণ হারািব, না হয় বন্দী হইব। আমি বেঞ্জামিনকে ইহা বলিয়াছি, বেঞ্জামিন তাহায় কোনমতে মত দিতেছে না।”

ক্রান্তিস্থে বলিল। বেঞ্জামিন পাগল নহে। ইহাতে কি জন্ত আপত্তি করিবে। এমন সুবিধা কোন ভদ্রলোক ছাড়ে? যখন শত্রু আপন ইচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে, তখন অরু কিসের ভাবনা? অপর সকলের ইহাতে কি মত? গেড়িজের প্রধান প্রধান লোকেরা এই পরামর্শে মত দিন।”

সকলেই বলিল “ইহায় মতবৈধ নাই।”

বেঞ্জামিন বলিল। “ভদ্র, আমার কথা একবার শুন। তোমরা যখন সকলে একমত হইলে, তখন আমার অমতে কোন কর্ম্মই আটক থাকিবে না। আর আমার অমত প্রকাশ করিতে হইলে আমাদিগের আপন প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি তোমাদিগের নিকট ভিক্ষাচ্ছলে কিছু প্রার্থনা করি তবে তোমরা আমার পূর্বকর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া আগাকে এ দান করিতে অসম্মত হইবে না।

আমি বহুকাল অবধি তোমাদিগের দলভুক্ত । এমন কি, আমি সনদীপের আদ্যম বাসিন্দা । গঞ্জালিসের সঙ্গে আসিয়া আমি বাস করি । এমন কি এখানকার লোক-দিগকে আমি আপনি পরাজিত করিয়া দূর করি । কে'ল বৈদ্যনাথের পিতা আমা-দিগকে আশ্রয় দেয় । তাহারই বলে ও সহায়তার আশ্রয় এ ধোপে স্থাপিত হই । আমরা সেই অবধি এত দিন পর্য্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যনাথের রূপায় বাস করিতেছি । বৈদ্যনাথের পিতা আমাদিগকে ব্যবসায়ী জানিয়া স্থান দেয় । পরে যখন আমরা স্বরক্তি সাধনে নিযুক্ত হই, তখন বৈদ্যনাথকে পিতার সঙ্গে এই গে'ড়ের সামনের মাঠে ঐ দেখ অখণ্ড গাছ আছে, উহার তলায় বসিয়া এক সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, তাহাতে এমত সন্ত থাকে যে, আমরা যখন বৈদ্যনাথের পিতার উপর দোষাশ্রয় করিব না ও সেও আমাদিগের বিপক্ষ হইবে না । বঙ্গবাল হইল এই সন্ধিপত্রের অনুরোধে গঞ্জালিস কখন ওদিকে কটাক্ষ করে নাই । আমিও তোমাদিগের একজন প্রকৃত আত্মীয় । আমার দেশীয় লোক জ্ঞানে যখন তোমাদিগের বিপক্ষে নিশ্চিত হইয়াছিলাম না । সর্বদা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া য' গতে তোমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহ করিয়াছি । এক্ষণে সেই সন্ধিপত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে তোমাদিগকে বলিতেছি । আর আমিও ভিক্ষা চাহি যে, আমাকে এ দূরহ পাপে নিপু করিও না । বিশ্বাসঘাতকতাপেক্ষা আর পাপ নাই । বৈদ্যনাথ আমার ঘরে নিশ্চিত হইয়া শয়ন করিতেছে । সে মনেও জানে না । তোমরা নিতান্ত অবোধ নহ । বোধ হয় তোমরা আমাক বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ উপহাস করিতেছ, তোমরাও কিছু সত্য এত প'ষণ্ড নহ ।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল । "বেঞ্জামিন যথেষ্ট । আমরা তোমাকে যথেষ্ট মাগ করি ও তোমার পরামর্শ সকল বুঝিতেছি । কিন্তু কি বলি, অন্যথা এরূপ আচরণে নিযুক্ত হইতেছি । আমাদিগের উপায়ান্তর নাই । যদি বৈদ্যনাথকে এ সুযোগ পাইয়া ছাড়িয়া দিই, তবে সে এক্ষণে আপন মৈত্রবল লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে । সে আক্রমণ করিলেই সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে । এ সময় তোমার জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পরামর্শ দাও । সকল প্রকারে গল্পরক্ষা করা কঠব্য । অতএব আত্মরক্ষার্থে সকল কস্মাৎ ধরা যায় ইহাতে কিছু দোষস্পর্শ করিতেছে না । তুমি কেন অকারণ ভয় করিতেছ । পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে ভিন'ক বলেন ।"

বেঞ্জামিন বলিল । "তোমাদের পাদ্রিক আমার ধমুজ্ঞান কি?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল । "কেন পাদ্রির ইহাতে কি মত ।"

পাদ্রি উত্তর করিলেন । "স্বপ্নকষ্ট ধম্মাবলম্বীদিগকে বিধিমতে নষ্ট করিবে । তাহার সয়তানের বংশ । ঈশ্বর তোমাদিগের সহায়, আমি জননী মেরীর মূর্তির নিকট তোমাদিগের সঙ্গলোদ্যে প্রার্থনা করি । ঐনি রূপ করিয়া তোমাদিগের শত্রুকে

তোমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলে ঈশ্বরের বিপরীতচরণ করা হয় ও সেন্টডোমিন্গোর অপমান করা হয়। ধবরদার এমন পাপীর দ্বারা আচরণ করিও না।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমি আর বিচার প্রার্থনা করি না। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই ভিক্ষাটি দাও।”

ভিক্রুস বলিল। “তবে আর বিলম্বে কি প্রয়োজন। চল আমরা যাইয়া বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনি।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “এখন স্পষ্ট ধরিয়া আনিলে অনেক গোল উপস্থিত হইবে। চাই কি বৈদ্যনাথের লোকেরা আমাদের আক্রমণ করিতে পারে। অতএব আর এক পরামর্শ কর।”

রুড বলিল। “আমার কি হেঁকমত চালাইবে। আর হনুরে কাঁচ নাই, সাদা কাজে বড় ফের লাগে না। হেঁকমতের একটু ফ্রটি হলে উল্টা বিপদ ঘটে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আমার এ পরামর্শে কোনই বিপদ সম্ভাবনা নাই। একখানা শিবিকায় করিয়া তাহার হাত পা ও মুখবন্ধ করিয়া আনায় তোমাদিগের কি মত।”

রুড ও ভিক্রুস এককালে বলিল। “মন্দ নয়, এও এক ভাল পরামর্শ বটে। তবে চল তাই করা যাক। আমরা দুই জন ও ফ্রান্সিস্কো আর আট জন হইলেই যথেষ্ট।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন সাই। আট জন লোক ডাকিয়া একটা শিবিকা লও।” ভিক্রুস আর রুড লাফাইয়া উঠিয়া গেল। বাকি প্রায় পঁচিশ জন সভ্য এই পরামর্শে মত দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তবে চল।”

বেঞ্জামিন বলিল। “তাহা কোন ক্রমেই হইবে না। আমাদের তোমরা অন্য কোন দণ্ড দাও, আমি তাহা স্বীকার করিতেছি। আমার কিন্তু এ ভয়ানক পাপে হস্ত নিপুণ করিও না, আমার রক্ষা—ক্ষমা কর। আমি জীবন পর্যন্ত তোমাদিগের হস্তে অর্পণ করিতেছি। পান্ড্রি সাহেব, একবার ধর্মের দিকে চাও। তোমার পালকে ফিরাও। ক্ষান্ত হইতে বল। আমি তোমাদিগের একজন দলস্থ ও আত্মীয়। আমার অমঙ্গল সাধন কি তোমাদিগের ইচ্ছা। তোমরা আমার দহন করিতেছ। আমি কিন্তু একান্ত ভীত হইয়াছি। ভিক্রুস ভাই, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমা-দেয়ই। রুড, তুমি কি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইলে?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন, তুমি কি নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়াছ? তোমার ভীষণতা হইয়াছে। অকারণ কতকগুলি বাতুলের মত বকিতেছ কেন? তোমার

ইহাতে কি বিপদ হইল? আমার জ্ঞানাবহির্ভেও তোমার উপর দৌরাঙ্গ্য চিন্তা করি না।”

বেঞ্জামিন কিছু স্থির হইয়া বলিল। “তাই বল। আমিও তাই ভাবিতেছিলাম এ কেমন হল। এমন কি কখন হইতে পারে? ফ্রান্সিস্কো রহস্ত করিতেছে। আমি এখন নিশ্চিত হইলাম।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন আমি তোমায় রহস্ত করি নাই। আমরা সত্যই বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব, কিন্তু তোমার তাহে কি ক্ষতি হইবে যে, তুমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “ফ্রান্সিস্কো সেটি কখনই হইবে না। সে ভুল্ললোক বিশ্বাস করিয়া আমার ঘরে অতিথি হইয়াছে। আমি ভিক্রুসকে বলিয়া কি কুকর্মই করিয়াছিলাম। হায়! যদি না বলিতাম তো তোমরা কিছুই জানিতে না।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “হাঁ তবে আমরা সকলেই ধরা পড়িতাম আর তুমি নিশ্চিত হইয়া দেখিতে। কেমন এই তোমার ইচ্ছা?”

বেঞ্জামিন বলিল। “ফ্রান্সিস্কো, তুমি কি আমাকে নীচপ্রকৃতি স্থির করিলে? আমি কি তোমাদিগের ছাড়িয়া আপন প্রাণ বাঁচাইতে এত যত্নশীল হইয়াছি! আমি আপন চিন্তা অণুমান করি নাই। আমাকে যে তোমরা শাস্তি দিতে চাহ, হাও। আমি কেবল একমাত্র ভিক্ষা চাহি। আমাকে ক্ষমা কর। বৈদ্যনাথ অন্য আমার অতিথি, অন্য তাহাকে কিছু বলিও না।”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ দিব্য ক্ষমা চাহিলে! বৈদ্যনাথকে ছাড়িয়া দিলে আর তোমায় ক্ষমা করিবার লোক থাকিবে না! বেঞ্জামিন, তোমার জ্ঞানবিদ্যা এখানে খাটিবে না।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরা কি অবস্থায় বৈদ্যনাথকে বদ্ধ করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। ভাবিয়া দেখ। আমরা নিত্য নিরুপায় না হইলে কখন তোমার প্রতিকূলচরণে প্ররুষ্ট হইতে পারিতাম না। যখন তোমার মতের বিপরীত কর্মে ইচ্ছা, তখনই তোমার বোকা কর্তব্য যে আমাদের কত সমুদ্র বিপদ উপস্থিত। আর ইহাতেই বা তোমার কি ক্ষতি? সে তোমার অতিথি হইয়াছে সত্য। কিন্তু সে হিন্দু, আমাদের বিরুদ্ধ। শত্রু নষ্ট করিতে কোন উপায় ছাড়িবে না। কৌশলে শত্রু ক্ষয় কিছু অশাস্ত কথ্য নহে। তাহাকে অন্য বদ্ধ করিলে আমরা তাহার হস্তে নিপাতিত না হইয়া বরং তাহাকে আমাদের দশবর্তী করিলাম। তাহাকে মারিব না; তবে যত দিন গজালিস না আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন তাহাকে গেঁড়জে থাকিতে হইবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “শুদ্ধ যদি উপস্থিত বিপদ হইতে জ্ঞান ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে আমার কথা শুন। তাহাকে বন্ধ করিও না। চল তুমি আমার সঙ্গে, যাইয়া তাহার সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করি। তাহাকে বলি যে, ভ্রম বশত তাহার জাহাজ আক্রমণ করা হইয়াছে। সকল দ্রব্য ফিরাইয়া দিতেছি। তাহা হইলে সে আর অস্বীকার করিবে না।”

ভিক্টর বলিল। “আঃ কি পরামর্শই দিলেন, আমাদিগের সোলেমান। মাথা কাটা হইয়া কি মতে বাঁচিব?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ইহাতে বোধ হয় আমরা নিরুদ্বেগ হইতে পারিব না। বৈদ্যনাথের পুত্রকে আমরা কারাবদ্ধ করিয়াছি, বৈদ্যনাথ সংবাদ পাইলে সেউজ আক্রমণ করিতে ছাড়িবে না। তোমার পরামর্শে আমাদিগের উভয় কূলই বাইবে।”

ভিক্টর বলিল। “বেঞ্জামিনের উভয় কূল রক্ষা হইল।”

বেঞ্জামিন বলিল। “যদি বৈদ্যনাথ ধর্মসাক্ষ্য করিয়া প্রতিক্ষা করে, তবে বোধ হয় সে কখনই তাহার ব্যতিক্রম করতে পারিবে না।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন, তোমার সেটি ভ্রম, তোমার মত সরলচিত্ত লোক অতি বিরল। তুমি বুঝিতেছ না, অবশেষে দুইই পরিতাপ করিবে। বেঞ্জামিন ক্ষান্ত হও। ইহাতে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিবে না। তোমার অন্তরে আমার তাহাকে বন্ধ করিতেছি।”

বেঞ্জামিন বলিল। “কেবল মৌখিক অমত হইলে কি হইবে। আমি পারতপক্ষে বৈদ্যনাথকে বন্দী করিতে দিব না।”

ভিক্টর বলিল। “আমরা বলপূর্ব্বক বন্দী করিবা।”

বেঞ্জামিন বলিল। “কি আমার বাটীতে তাহার সাধ্য আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে।”

ভিক্টর আপন বক্ষে হস্ত দিয়া বলিল। “এই বীর তোমার বাটীতে গিয়া বলপূর্ব্বক বৈদ্যনাথকে বন্দী করিয়া আনিবেই আনিবে।”

বেঞ্জামিন উগ্র হইয়া বলিল। “তাহা কখনই হইবে না, আমি তোমাকে বাইতে দিব না।”

ভিক্টর বলিল। “এই লও আমি চলিলাম।”

বেঞ্জামিন ক্রতপদে ভিক্টরের অগ্রসর হইলে ভিক্টর বলপূর্ব্বক বেঞ্জামিনের হস্ত ধরিল। বেঞ্জামিন রুষ্ট হইয়া আরক্ত নয়নে বলিল। “ছাড়িয়া দাও। ভিক্টর ছাড়িয়া দেও।”

ভিক্টর বেঞ্জামিনের হাত ধরিয়া বলিল। “আমি তোমাকে ছাড়িব না। চল

তোমাকেও বরে বন্দী করি।” বেঞ্জামিন এই কথা শুনিবামাত্র অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল। বলিল। “নরাদম ছাড়।” অমনি হ্রমত বলে হাত টানিল যে ভিক্রুসের হাত ছাড়াইয়া আপনি দূরে দাঁড়াইল। ভিক্রুস অমনি পলায়ে টানিয়া পড়িয়া গেল। ভিক্রুস নীচ উঠিয়া রোষে দন্তপেষণ করিয়া বলে বেঞ্জামিনের পলায়ন মুষ্টি বাত করিল। বেঞ্জামিন বিদ্যাবাগে তাহার হৃদ সহিত পক্ষশোভন। ভিক্রুস দ্বার মুষ্টিবাততে উত্তর দিল, ক্রমে বেঞ্জামিনও পুনঃ মুষ্টি বাত করিতে লাগিল। মুষ্টির উপর মুষ্টি, কিলের উপর কিল। বলসহরে উত্তর বদন রক্তবর্ণ হইল। সে বনের সম্মুখীন হওয়া দুর্ঘট। এক একবার দুই চারি পা পড়তে দিয়া বেগে হানিয়া উত্তরে ঠাঁঠাঁ শব্দে কিল চালাইতে লাগিল। প্রতি কিলে মুখের চন্দ্র হ্রিৎগ শব্দ। ক্রমে উত্তরের মুখ কেবল রক্তে পূর্ণ হইল। ফ্রান্সিস্কা প্রভূত দাঁড়াইয়া দাঁখতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যখন বেঞ্জামিনের ভীষণ মুষ্টিবাততে ভিক্রুস অস্থির হইয়া লম্ব দাঁড়াইল, তখন বেঞ্জামিন বলিল। “পাপ নরাদম উপদ্রুত দণ্ড পাইলে।” ভিক্রুস উত্তর না করিয়া পুনর্বার বেগে আসিয়া বেঞ্জামিনের দণ্ড কেশ্যর্থপূর্ণ তাহার ভ্রমে পাড়িল। যেন ষটো-কচপডনে যেদিনো লাগিল। বেঞ্জামিন জড়িং বেগে উঠিয়া ভিক্রুসের বর্ধ পার্শ্ব দ্বারা এরূপ দৃঢ় মুষ্টিতে ধলিল যে, ভিক্রুসের চক্ষুর উল্লসিইয়া পড়িল। ভিক্রুস মুখ ব্যাদান করিয়া অস্থির হইল। বেঞ্জামিন ভিক্রুসকে নিত্য বস্ত্র দেখিয়া ছাড়িয়া দিল ও একটি বলে পলাবাত করিয়া বাদিল। “নরাদম পলাও এখানে আর থাকিও না। আমি তোমাকে একান্ত মারিব।”

ভিক্রুস দূর হইতে বলিল। “ফ্রান্সিস্কা, বেঞ্জামিনের কথা শুনিলে? সভাকু টমে যে আমাকে অপমান করিল, দৈহার বিচার প্রবনা করি।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “অকারণ অস্বাভিচ্ছন্দ বরাহ ড মুষ্টিবাত্ত নহে, তাহাতে আবার এ বিপদের সময়। দ্রাস্ত হও।”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ, সকলে বলিতে পারে, আমাকে যখন তোমাদিগের সম্মুখে বেঞ্জামিন অপমান করিল, তোমরা তাহা দেখিয়া যখন কথাটীও বলিলে না তখন আর তোমাদিগের নিকট বিচার প্রার্থনা আমার অসার। ভালই হইল। আমি কিছু বেঞ্জামিনের সঙ্গে আপনকার কণ্ঠের জন্ত বিবাদ করি নাই।”

ভিক্রুস যন যন নিখাস ত্যাগে আর বলিতে না পারিয়া একখান পাদপীঠে বসিয়া পড়িল।

ফ্রান্সিস্কা বেঞ্জামিনের দিকে চাহিয়া বলিল। “তোমার এখানে এরূপ আচরণ করা বড় ভাল হয় নাই।”

বেঞ্জামিন বলিল। “তোমাদিগের কি চক্ষু নাই? তোমাদিগের সম্পূর্ণ মতিভ্রম

লেখিতে পাই। পাপাত্মা ভিত্তিস্বরূপ অগ্নি আমায় স্পর্শ করিয়াছিল, আমাকে অগ্নিস্বরূপ হইতে দিল না।”

ক্লড বলিল। “তাহাতে তাহার কি অশ্রায়? আমিও তোমায় অগ্নিদগ্ন হইতে দিব না, তোমাকে গেভিজে থাকিতে হইবে। আমরা বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব।”

বেঞ্জামিন বলিল। “যদি অর্থশূন্য মন দাও, তবে আমি কি করিতে পারি? কি, আমিও বালক নহি। আমাকে তোমরা কি কারণে কারারুদ্ধ করিতে চাহ? আমি তোমাদিগের কোন অনুপকার করি নাই যে, আমার উপর এরূপ অশ্রায়চরণ করিতেছ।”

ক্লড বলিল। “বেঞ্জামিন! তোমার যথেষ্ট ভয়ভীতি হইয়াছে। আর রহস্য ভাল লাগে না, কেন বক। আমরা একান্তই বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব। ইহাতে তোমার আপত্তি থাকিবে না।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমিও জীবন সম্বন্ধে তোমাদিগকে তাহা করিতে দিব না।”

ফ্রান্সিস্কা কিছু দৃষ্ট হইয়া বলিল। “বেঞ্জামিন এখনও সময় আছে বিবেচনা কর। এ বড় সামান্য কথা নহে। অকারণ বন্ধু-বিচ্ছেদ ভাল নহে। আমরা যখন কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, তখন তোমার আমাদিগের মতের বিপক্ষ হওয়া অত্যন্ত গহিত।”

বেঞ্জামিন বলিল। “একি অত্যাচার! তোমরা আমার স্বপ্নে কি বলিয়া বলপূর্বক প্রবেশ করিবে?”

ক্লড বলিল। “আমাদিগের বন্দীকে তুমি আপন স্বপ্নে আশ্রয় দিয়াছ। তন্নিমিত্ত আমাদিগের নিয়ম মতে আমি তোমাকে বদ্ধ করি।” ক্লড অগ্নিস্বরূপ হইয়া হস্তদ্বারা বেঞ্জামিনের দক্ষিণ হৃদয় দেশ ধারণ করিল।

বেঞ্জামিন বলিল। “কোথা পর-স্থানা দেখাও, বিনা কবচকারিতে আমার শরীর স্পর্শ করিলে আমি তোমাকে আমাদিগের নিয়মানুসারে দণ্ডিত করিব।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “ক্লড চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনি।” ক্লড ফ্রান্সিস্কার কথায় তাহার পশ্চাৎগমন করিল। বেঞ্জামিন ক্ষতপথে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল।

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “বেঞ্জামিন তুমি এখানে থাক। আমাদিগের সঙ্গে যাওয়ার তোমার লাভ কি?”

বেঞ্জামিন বলিল। “তোমাদিগের সঙ্গে যাইয়া বৈদ্যনাথ যাহাতে না বন্দী হয়, তাহার চেষ্টায় থাকিব।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “বেঞ্জামিন তোমা হইতে তাহা কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইবে না। যাও গেভিজে আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কর। আসিয়া একত্রে আহার করিব।”

বেঞ্জামিন বলিল : “আমাকে কি গমিস পাইলে ? যে, আহােরের লোভে তোমার এখানে বসিয়া থাকিব ? আমি তোমার সঙ্গে যাইব ।”

রুড বলিল । “ফ্রান্সিস্কা ! এ বুদ্ধ কুহুরকে শ্রদ্ধা না বাবিলে, আমাদিগের কণ ছিন্ন হইবে না ।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল । “বেঞ্জামিন ! আমার কথা রাখ, এইখানে আমাদিগের প্রত্যা-গমন প্রতীক্ষা কর ”

বেঞ্জামিন বলিল । “ফ্রান্সিস্কা ! তুমি কি আমাকে মান না ? যে এরূপ স্বপ্ন স্বপ্ন নিবারণ করিতেছ, আমি কি ব্যঙ্গ করিতেছি ? আমি কখনই এখানে থাকিব না ।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল । “রুড ! বেঞ্জামিনকে ছোট একটা কামরায় বদ্ধ করিয়া আইস ।”

রুড ক্ষুণ্ণবেদে বেঞ্জামিনের নিকট যাইয়া তাহার হাত ধরিল । বেঞ্জামিন বলে তাহা ছাড়াইল । ফ্রান্সিস্কা বেঞ্জামিনের ব্যবহার দেখিয়া অলিয়া উঠিল । অশ্রুযুক্তি হইয়া আপনি বলে বেঞ্জামিনকে ধরিল । বেঞ্জামিন উভয়ের গ্রাসে পড়িয়া যেন দীপের কীটের জায় ক্ষণেকমাত্র ঝটপট করিল, কিন্তু কতক্ষণ সে ক্ষুণ্ণ থাকে ? রুডের নির্ভর আঘাতে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল ।

ফ্রান্সিস্কা ও রুড তাহাকে অক্লেশে উঠাইয়া লইয়া চলিল । ভিক্রুস বেঞ্জামিনের এই অবস্থা দেখিয়া ক্ষুণ্ণবেদে নিকটে আসিয়া বেঞ্জামিনের বক্ষে একটা সবলে কিল মারিল । নির্ভর ফ্রান্সিস্কা চমকিয়া উঠিয়া বলিল । “ভিক্রুস ! তোমার এটা অত্যন্ত অত্যাচার । এ কি দোরায়া ? অচেতন শরীরে মারা কি তোমার কর্তব্য ?”

ভিক্রুস কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল । “চল, ইহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, আমি ধরিব ।”

রুড রোবস্তরে বলিল ! “না, আর তোমায় ধরিতে হইবে না, তুমি আট জন বেহারা আন ।”

ভিক্রুস ইহাদিগের নিকট হইতে একপে স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ পাইবামাত্র “আমি এখনই বেহারা আনিতেছি ।” বলিয়া চলিয়া গেল । রুড ও ফ্রান্সিস্কা বেঞ্জামিনকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গিয়া একটা বেকের উপর তাহাকে ফেলিয়া দ্বর হইতে বাহিরে আসিল । দ্বার বদ্ধ বরণ সময় ফ্রান্সিস্কা বলিল । “রুড ! বেঞ্জামিনের অন্ত এক পাত্র মদ রাখিয়া গেল ভাল হয় । নিকোপ, অনেক প্রহার খাইয়াছে ।”

রুড বলিল । “চল, বাহিরে কাহাকে বলিয়া যাই ।”

দুই জনে দ্বারবদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিলে, দেখে ভিক্রুস একটা শিবিলা আর আট

জন বেহারা আনিয়া বদিয়া আছে। ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি। একজন ভৃত্যকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল। “লাকারষ্টিন! চাৰি লও। বেঞ্জামিন ছোট কুটুরিতে আছে, তাহার চৈতন্ত হইলে, একটু মদ দিও। আর যদি বাহিরে যাইতে চাহে ত এক ঘণ্টা পরে ছাড়িয়া দিও।”

লাকারষ্টিন “যে আশ্রয়” বলিয়া কুণ্ডি লইয়া চলিয়া গেল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “এস, আমার সঙ্গে চল।” রুড, ভিক্টর ও আট জন বেহারা শিবিকা লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ভিক্টর! তুমি কি করিয়া বেঞ্জামিনকে এরূপ মারটা মারিলে, আবার তাগকে অচেতন দেখিয়াই বা কেন বক্ষে সে ভয়ানক বিল মারিলে?”

ভিক্টর কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল। “বেঞ্জামিন অত্যন্ত মন্দ লোক।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিনের কেবল বৈদ্যনাথের জন্ত আমাদের সঙ্গে বিবাদ করা একমাত্র দোষ। তা আবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, সে দোষও বলিয়া বোধ হয় না।”

ভিক্টর বলিল। “দোষ নহে কেমনে? সে যখন আমাদের সঙ্গে আপন স্বরে আশ্রয় দিয়াছে, আবার তাহার দ্বারা আমাদের সঙ্গে বিবাদ বরে, তখন আমাদের নিয়ম মতে তাহাকে নষ্ট করাই বিচারনঙ্গত।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “অবশ্যক বশত এ দোষী আমরা অক্ষয় করিয়া তাহার স্বক্ষে ফেলিতেছি। বৈদ্যনাথের সঙ্গে আমাদের কোন বাধা নাই। বেঞ্জামিনের স্বরে গিয়া বলপূর্বক তাহার অস্ত্রটিকে অপহরণ করা আমাদের নিয়মের বিপরীত কাজ, কিন্তু আমরা একান্ত নিরুপায় বলিয়াই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। বাহা হউক, তোমার মারাটা ভাল হয় নাই।”

ভিক্টর বলিল। “সেও ত আমার মারিয়াছে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “উত্তম করিয়াছে। তুমি তাহাকে কি জন্ত মারিলে? আমাদের নিয়মে ইহার নিষেধ আছে। গঞ্জালনের নিকট ইহার বিচার, তুমি অবশ্য দণ্ডাই হইবে।”

ভিক্টর বলিল। “বেঞ্জামিনও দণ্ডাই বটে। আমরা উভয়ে সমান। ইহাতে কেবল আমিই কি জন্ত শাস্ত পাইব?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ভাল সেও যদি কুক্ষম করিয়া থাকে, তুমি কি জন্ত এমত করিলে?”

এমত সময়ে দূরে অশ্বপদের শব্দ পাইয়া রুড বলিল। “পশ্চাৎ হইতে অশ্বের শব্দ পাইতেছি, এখন এ দিকে অধিক লাইয়া গার?”

ভিক্রম বলিল। “বোধ হয় বৈদ্যনাথের লোক। তাহারা প্রাতঃকাল অবধি এই দিকে গভায়াত করিতেছে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “দেখ, হয়ত বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের স্বরে নাই, তুমি বেঞ্জামিনকে কষ্ট দেওয়া মাত্র হইল।”

ভিক্রম বলিল। “এস আমরা ঐ কোপে লুকাইয়া দেখি, বোহারা শিবিকা লইয়া আগে যাউক।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তাই চল।” ফ্রান্সিস্কো, কড ও ভিক্রম কোপের ভিতর ঢাড়াইল। বোহারারা শিবিকা লইয়া চলিয়া গেল। দরের পদশব্দ ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। ক্রমে নিকটস্থ হইলে, দুই জন অধরোহী দেখা গেল।

ভিক্রম বলিল। “ঐ লও, বৈদ্যনাথ আর তাহার এক জন লোক।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মস্ত কে আছে?” ভিক্রম বলিল। “চেনা যায় না।” অল্প বিলম্ব নিকটস্থ হওয়ায় ভিক্রম বলিল “ভজহরিকে দেখিতে পাই।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল “উহাদিগের হাতে কিছু অস্ত্র আছে?”

ভিক্রম বলিল। “অস্ত্রের মধ্যে প্রত্যেকদমাত্র।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “রও। বল ত এইখানেই ইহাদিগকে আক্রমণ করা যায়।”

কড আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস্কোকে কিছু বলিল। ফ্রান্সিস্কো ভিক্রমের কর্ণকে বলিল, অমনি ভিক্রম করুণস্বরে আহ্বান করিতে লাগিল। ফ্রান্সিস্কো হেঁটমুণ্ডে পথে ঘাইয়া দাড়াইল। কড ক্রতপদে শিবিকার নিকে দৌড়িল। বৈদ্যনাথ ও ভজহরি নিকটস্থ হইলে ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয়! যে কেহ ইউন আমার প্রতি রূপাটুটি করুন, আমি বিদেশী। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হঠাৎ রাস্তার পড়িয়া গিয়া পাটা ভাঙ্গিয়াছে, এখানে শিবিকা পাই এমন উপায় নাই। অথও পাওয়া দুর্বল, কিন্তু অর্থ বা অস্ত্রের না হইলে শিবিকায় তাহার যাওয়াও কষ্টকর। যেহেতুক পাথের যে অস্থিটি ভাঙ্গিয়াছে, তাহে অস্ত্র বসিয়া যাওয়াই সুখকর বোধ হইতেছে। আমি একক অছি, তাহাকে বন হইতে পরিস্কার স্থানেও লইতে অশক্ত হইতেছি। মহাশয়! অনুগ্রহ করুন। আমি আপনার জীবিত হইব।” বৈদ্যনাথ অশ্রুশি সংবত করিলেন। ভজহরি বলিল। “মহাশয় এখানে বিলম্ব করা বিধের নহে, বিলম্ব কর্মক্ষতি সম্ভাবনা।”

ফ্রান্সিস্কো কাতরস্বরে করপুটে বলিল। “মহাশয় দয়াময় এ দুর্ঘট বিপদ হইতে আমার পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, অবস্থ করিবেন না। ক্রমে রৌদ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। হয়ত রৌদ্রের উত্তাপে আমার ভাইটি মরিয়া যাইবে।”

• ফ্রান্সিস্কো হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষু আবরণ করিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে ভিক্রম কাদিয়া

কটিল। সে কাতর স্বরে প্রস্তর ডব হয়, তা বৈদ্যনাথের মন। বৈদ্যনাথ আর্তনাদে সিঁহরিলা।

ভজহরি বলিল। “মহাশয় পরের জন্ত আপনাত্ত কতি করা বিষয়ী লোকের কৰ্ত্তব্য নহে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “ভজহরি চল একবার অবস্থাটা দেখিয়া আসি। দৈবের ঘটনা অগ্রাহ্য করিতে নাই। কে জানে আমরা বাইতে যাইতে ঐ মত বিপদে পড়িব না।”

ফ্রান্সিস্কো বৈদ্যনাথকে হুলত জ্ঞানে দৌড়িয়া বৈদ্যনাথের দক্ষিণ পাশ ধরিল।

ভজহরি বলিল। “পাশ! আমাদিগের প্রয়োজন আছে, এক্ষণে বিলম্ব করিতে পারিবে না।”

ফ্রান্সিস্কো বৈদ্যনাথের চরণ ধরিয়া একবার বৈদ্যনাথের মুখের দিকে এমত বক্রণভাবে চাহিল যে, বৈদ্যনাথ অমনি পাশবলয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই আবার ভজহরির প্রতি চাহিলে, ভজহরি সে চক্ষুর অবাক বক্তৃতায় বশীভূত হইল বটে, কিন্তু বিলম্বে কতি হইবে জানে চক্ষুর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অপর দিকে দৃষ্টি করিল। ফ্রান্সিস্কো ভজহরির মনের ভাব বুঝিয়া বৈদ্যনাথের পা ছাড়িয়া ভজহরির চরণ ধরিল। ভজহরি আর সহ্য করিতে না পারিয়া অথ হইতে অবতীর্ণ হইল। পরে বৈদ্যনাথও অথ হইতে ছুমে নামিলেন। দুই অশ্বের বল্লগা লইয়া নিকটস্থ ছোট গাছের ডালে বাঁধিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয় আপনাত্তা দয়ায় সাগর। আমি আপনাদের ক্রৌত-লাস। আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, ঐশ্বর আপনাদিগকে পুরস্কার করিবেন। ধর্ম্মের চিরদিন বৃদ্ধি হয়। আহা! আমি আমার ভ্রাতার জন্ত নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার শরীরে শ্রাণ আসিল। এই দেখুন, এতক্ষণে আমার নিশ্বাস বহিতেছে।”

ভজহরি বলিল। “চল তেঁমার ভাইকে দেখিগে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয় সে নিতান্ত কাতর হইয়াছে, তাহার এমন শক্তি নাই যে উঠে, মহাশয়দের দেই খানে যাইতে হইবে।” ভজহরি বলিল “ভাই চল।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয়েরা একটু অগ্রসর হউন, আমার একটি লোক এই দিকে একটু জল আনিতে গিয়াছে, আমি তাহাকে দেখিয়া আসি, আপনাত্তা ঐ গাছডলার বাইয়া আমার অপেক্ষা করুন।”

বৈদ্যনাথ ও ভজহরি অগ্রসর হইলে ফ্রান্সিস্কো অল্ল অল্ল ভজহরির অশ্বের নিকট গিয়া একটি কণ্টক লইয়া তাহার কর্ণমূলে এমত বলে বিদ্ধ করিল যে অশ্বটা একটা বিকট চীৎকার করিয়া পুচ্ছ উচ্চ করিয়া বল্লগা ছিঁড়িয়া দৌড়িল।

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “মহাশয় আপনার একটা অর্থ পল হইল। দ্রুত আসিয়া অর্থ ধরুন।” ভক্তহরি ও বৈদ্যনাথ অর্থের শব্দ পাইয়া দ্রুত সেই দিকে আসিতেছিল। ফ্রান্সিস্কা কথান্তনিয়া ত্বর। করিয়া আসিল। দেখে ভক্তহরির অর্থ দৌড়িতেছে। ভক্তহরি দ্রুত পশ্চাৎগমন করিতে লাগিল।

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “মহাশয় আপনি এতবার অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাইটিকে দেখুন; বলিতে পারি না। অনুগ্রহ করিয়া তাঁকে ধরাবরি করিয়া আপনার অর্থ চড়াইয়া গ্রামে লইয়া যাই।” বৈদ্যনাথ অচমবশে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইতোমধ্যে রুড শিবিক। লইয়া উদ্ভিত হইল। অগনি ফ্রান্সিস্কা কিছু দৃষ্ট হইয়া বলিল। “মহাশয় ভয় হইল, আপনি এই শিবিকায় অরোহণ করুন, আমরা আপনার উদ্দেশ্য স্থানে লউয়া যাই। আর আপনার অর্থ আমার ভ্রাতাকে লইয়া গ্রামের কোন ভদ্র লোকের নিকট আশ্রয় লই।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমার শিবিকায় যাইবার অপেক্ষা তোমার ভ্রাতাকে তাহাতে লইয়া যাও, আমি বরং তোমাংগের সঙ্গে যাই।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “মহাশয় যদি অতুল্য করিয়া এত দর আসিয়াছেন, তবে কেন আর অর্থের জন্য আমাকে দ্রুত করেন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “মহাশয় আমি কিছু আমার অর্থ দিতে অমত প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু তোমার ভ্রাতার অর্থ যাওয়ার কষ্ট হইবে বলিয়া এমত বলিতেছি।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “মহাশয় আমার প্রতি দয়া করুন। কেন আমার ভ্রাতাটিকে মারিয়া ফেলিবেন। আমার উপায়ান্তর নাই।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “তুমি আমার পরামর্শ শুন। তোমার ভ্রাতাকে শিবিকায় লইয়া যাও। অর্থ যাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে।”

ফ্রান্সিস্কা হাটু গাড়িয়া বলিল ও দ্রুতপাশে বলিল। “মহাশয় আপনি যদি এত দয়া প্রকাশ করেন, তবে কেন আমার ভাইটিকে মারেন। শিবিকায় উঠাইলেই কষ্টে প্রাণত্যাগ করিবে। আমরা শিবিকায় কখন চাড় না, অগনিগের দেশে ওকপ থাকি নাই। ও রূপ সিন্ধুকে উদ্ধাকে উঠাইতে অসম্ভব আমার ভয় হইতেছে। তাহাতে আবার সে যে শ্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণেই স্বর্গান্ত হইয়া প্রাণ হারাইবে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “মহাশয় আপনি বিপদগ্রস্ত হইয়া নির্কোষের মত বলিতেছেন। রোগীকে শিবিকায় লইয়া যাইতে হয়, তাহায় অমত কি জ্ঞান করেন?”

রুড বলিল। আমরা “বুদ্ধিলাস এ ভদ্রশোভাটি আপন অর্থ ছাড়িবেন না। বৃথা চেষ্টা কর। দেখ কপালে যা থাকে, তাই হইবে। এই সিন্ধুক কেন কখনের তিতর

জেনার ভাইকে বন্ধ কর।” ক্রান্তিস্থে রুডের কথায় কোন উত্তর না দিয়া জেন্দন করিতে লাগিল।

বৈদ্যনাথ ফ্রান্সিস্কার জেন্দন দেখিয়া নিতান্ত আর্দ্রচিত্ত হইলেন। বলিলেন। “মহাশয় আপনার মতই আমার মত। কিন্তু এখনও আমি বলিতেছি শিবিকায় জেনার ভ্রাতাকে উঠাইয়া দাও। অথবা কষ্ট পাইবে।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “মহাশয় আমি কি পর্যন্ত আপনার নিকট বাধিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনি এক্ষণে কোথায় যাউবেন, এই শিবিকায় উঠুন। বেহারারা আপনাকে লইয়া যাইবে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “তোমার ভ্রাতাকে আগে পাঠাও আমি পরে যাইব।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “মহাশয় আমাদের বিলম্ব হইবে। ভাইটিকে একটু তৃষ্ণার জল দিব। আপনি অগ্রসর হউন, আপনার অশ্ব কোথায় পৌছিয়া দিব।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমার গদিতে।”

রুড বলিল। “আপনার নাম কি বৈদ্যনাথ?”

বৈদ্যনাথ বলিল “হাঁ।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “আমরা মহাশয়ের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনার গদিও জানি; গত রাত্রে সেই খানে অতিথি হইয়াছিলাম। আহা! কি সেবার পরিণাটী! আপনার গদিতে অদ্য বেলা ডিন প্রহরের সময় এই অশ্ব উপস্থিত হইবে। আপনি শিবিকায় আরোহণ করুন।”

বৈদ্যনাথ বিলম্ব হইয়াছে ভাবিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। অমনি রুড ও ফ্রান্সিস্কা উভয় পার্শ্ব হইতে দাবরুদ্ধ করিয়া বাহির হইতে চাৰি লাগাইল।

বৈদ্যনাথ বলিল “তোমরা দ্বার কি জন্ত বন্ধ করিলে?”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “মহাশয়! এখানে বড় দহুভয়। বিশেষতঃ ফিরিয়্যা আপনাকে মারিবার জন্ত ফিরিয়্যা বেড়াইতেছে, আপনাকে দেখিলেই নষ্ট করিবে; আপনি শিবিকায় গমন করুন। এক্ষণে কোথায় যাইবেন, অনুমতি করিলে বেহারারা সেইখানে লইয়া যাইবে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমি এক্ষণে আমার গদিতে যাইব। ভজহারি কোথায় গেল?”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “আপনাকে সেইখানেই লইয়া চললাম, আপনি নিস্তক্ক হইয়া থাকুন।” বাহকেরা শিবিকা উঠাইয়া দ্রুতপদে চলিল।

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “মহাশয়! অনুমতি করেন ত আমার ভ্রাতাকেও এক্ষণে আপনার গদিতে লইয়া যাই, পরে তাহার যোগের কিছু সমতা হইলে স্থানান্তরে যাইব।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “চল সেইখানে যথেষ্ট যত্ন পাইবে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ভবে বাহকেরা কিছু অপেক্ষা কর, আমার ভ্রাতাকে অথৈ বসাই।” বাহকেরা দাঁড়াইল। ফ্রান্সিস্কো অথ আন্দিয়ে ভিক্রুস রক্রেসে তাহার আরোহণ করি। কেব এক একবার আন্তনাদ করিল। কিছু পরেই ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয়! আমরাও চলিলাম। বাহকেরা চল।”

পরে বাহকেরা চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস্কোও রুড চলিল। ভিক্রুস হুখে অথৈ বাইতে লাগিল।

কিছু দূর বাইলে, বৈদ্যনাথ বলিল। “মহাশয়! আপনি কোথায়?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আমরা আপনার সঙ্গেই আছি, কি অনুমতি করেন?”

বৈদ্যনাথ বলি। “আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সমস্ত শরীর বন্দী হইয়াছে, এক বিন্দু ছিদ্র নাই যে, বায়ু কি আলোক আইসে; হার এবট খুলিয়া দাও।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আমি কি আপনার শত্রু যে দ্বার খুলিয়া দিয়া আপনাকে বিপদে ফেলিব? এক্ষণে অম কষ্ট সহ্য করুন। কি করিবেন, আপনার সঙ্গে কেহ লোক নাই যে ক্রিসিস্টিদের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করে। মহাশয় অতি ক্ষীণই আপনার রদিতে পৌছিবেন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “এতক্ষণে বেধ হর সদর রাস্তায় আসিয়াছি, এখানে ভয় নাই হার খুলিয়া দাও।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয় আর একটু অপেক্ষা করুন হার খুলিয়া দিব।”

বাহকের প্রাতি বলিল। “চল তোমরা এইটুকু দ্রুত চল।”

বৈদ্যনাথকে লক্ষ্য করিয়া বাস্তে বলিল। “মহাশয় একটু নারব হইবেন। দূরে কাহাকে দেখিতেছি।” বাহকেরা অত্যন্ত বেগে দৌড়িতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ভয়ে নিস্তব্ধ হইলেন। ফ্রান্সিস্কো ও রুড শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলিল। ক্রমে পেড্রের প্রাণ দ্বারে উপস্থিত হইল। শিবিকা দ্বার পার হইল। সমুখস্থ প্রকাণ্ড মাঠ দিয়া চলিল। শিবিকা দেখিয়া পেড্রসহ লোকেরা চতুর্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রান্সিস্কো সকলকে ইঙ্গিত করিয়া বাক্য কহিতে নিষেধ করিল, সক্ষণেই নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে বিকট কারাগারবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহকেরা শিবিকা নামাইল। কারাগারবারে প্রহরী ভয়ানক শব্দে ভীষণ হার খুলিল। ফ্রান্সিস্কোর ইঙ্গিতমাত্র দশ বারজন লোক আসিয়া চতুর্দিকে দাঁড়াইল। ফ্রান্সিস্কো শিবিকার দ্বার খুলিল। ভিক্রুস ব্যস্ত হইয়া অগ্রে দাঁড়াইল। বৈদ্যনাথ ভিক্রুসকে দেখিয়াই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। ভিক্রুস বলিল। “মহাশয়, আমরাই পা ভাঙ্গিয়াছিলাম। এক্ষণে বাহির হউন, আপনি পেড্রকের কারারুদ্ধ হইলেন। বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই লইয়া সনদ্বীপ ক্রিসিস্টি

শূন্য করিবেন। এখন কুকে শূন্য হইল! একখানা জাহাজ লইয়াছিলাম, তাহা সহ করিতে পারিলে না। এখন তোমার সকল বিষয় কাহার হইল ?”

বৈদ্যনাথ বিস্ময়বিস্তৃত মনে চাহিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। ভিক্রম অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া শিবিকা হইতে উঠাইয়া লইল। বৈদ্যনাথ জীবন-হীন পদার্থের ত ভিক্রমসেব বশবস্তী হইয়া রহিলেন। ক্রমে অন্ধকার কারাগার লইয়া গেল। সেখানে রাখিয়া তাহার ভীষ্ম দ্বারে প্রমাণ্ড অর্গলা ও কুকি বাহির হইতে লাগাইয়া দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়া বৈদ্যনাথ বসিলেন। চেতনাবিহীন বৈদ্যনাথ কতক্ষণ এ অস্থায়ী রহিলেন, তাহা কেহই জানে না। সায়ংকালে একজন লোক আসিয়া দ্বার খুলিল ও একটি দীপ বরের এক কোণে রাখিয়া গেল। দীপটি দেখিয়া স্বভাববশত বৈদ্যনাথ সন্ধ্যাবেলায় প্রণাম করিলেন। তখন চৈতন্য হইল যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে। বরটি কেবল অন্ধকারে পূর্ণ। একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র গবাঙ্ক স্বরের উচ্চকোণে থাকায় তাহার আলোকে বরে দিয়ারাত্রি জ্ঞান থাকে না। বৈদ্যনাথ ভাবিলেন, “এ কি বিপদ! এ পাপেরা আমার সংপন্নোন্মত্তি দণ্ড দিল। এরূপ অরাজক কখন দেখি নাই, আমার উপযুক্ত শাস্তি হইল। ধর্মের দিন আর নাই।” আমি শোখা উহা-দিগের উপকার করিতে গেলাম, তাহার এই প্রতিফল। ভজহরিই বা কোথায় গেল। সে কতই অবেষণ করিবে। পাষণ্ডেরা আমার পুত্রকে বন্দী করিয়াছে। আমাকেও বন্দী করিল। আবার জাহাজ লুটিল। আবার হয় ত আমার বর লুটবে। এই সকল বিষয় রক্ষার উপযুক্ত গোবিন্দ আবার লগ্নয় বশত বন্দী হইল। পাপ অরুদ্ধতায় যত নষ্টের মূল। তাহাকে লইয়াই ত আমার এ সব ঘটিল। সে না থাকিলে বরদাকর্ষ কখন আমার গৃহ ত্যাগ করিত না। গোবিন্দও তাহার সঙ্গ লইয়া বন্দী হইয়াছে, আবার আমিও হইলাম। বিধাতা! আমি কি এমনত উৎকট পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার এরূপ অবস্থা হইল। পাপেরা আমাকে কখনই ছাড়িবে না। বোধ করি, অন্য রাত্রেই আমার বরে গিয়া বখাস কর্ষণ লইবে। হয় ত স্ত্রীলোকদিগকেও বন্দী করিবে। গদিতে হঠাৎ যাইতে পারিবে না, কিন্তু তাহাও লইলে আপত্তি করিবার কেহই নাই। এখানের শ্রুতিতে পক্ষু একা কি করিতে পারিবে? সৈন্তেরা অধ্যক্ষ না থাকায় নিতান্ত নিবীৰ্য্য। যদি দেৱানজী মহাশয় স্বয়ংবান্ হন, তবেই একমাত্র উপায়। আমরা কারাক্ষ হইয়াছি, এ কথা দেৱানজীও জানে না। বিধাতা এককালে নির্যাস করিলেন ?”

বৈদ্যনাথের অশ্রুতে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। বৈদ্যনাথ অচেতন হইয়া ভূমে পড়িলেন। কতক্ষণ পরে চেতনা হইল। পিপাসা পাইল। ভাবিলেন এইবারেই ত প্রাণ যায়, ফিরিস্থির বরে কিরূপে জলপান করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

“সলোহজালৈদৃ চবন্ধদন্তৈঃ সুকলিতৈরুজ্জ্বিতপাদবটৈঃ।

প্রবীরযৌবৈশ্বমদুর্নিবারৈঃ।

ইন্দুমতীর আবাসঘরে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। গঞ্জালিস ভয়ানক বেগে অসি চালন করিতেছে। ফিরিজিরা বিকট শব্দে গর্জন করিতেছে। দীর্ঘ উজ্জ্বল সব চারি দিকে জ্বলিতেছে। ফিরিজিরা বলপূর্বক ঘারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। রায়গড়ের লোকেরা তাহা নিবারণ উদ্দেশে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। যুদ্ধানল প্রকৃত প্রস্তাবে জ্বলিতেছে। সকলেরই চেতনা নাই, উন্নত অন্তরী কবেল স্বকাষ সাধন-প্রবৃত্ত। বখারত পুরুষ, মালিকরাজ ও স্বর্ধাকুমার তুরীক্ষনি করিয়া দ্রুতবেগে রথক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে ফিরিজিরা দেখিবামাত্র ভীত হইল। জগমাত্র অস্ত্রচালনে নিরস্ত হইল। গঞ্জালিস অবিশ্রামে অসি চালন করিতেছে। ইহাদিগের আগমন লক্ষ্য করিল না। তাহার পার্শ্বস্থ ফিরিজি যোদ্ধাকে অস্ত্র চালনে নিরস্ত দেখিল, কিন্তু তাহার কারণ জ্ঞাত হইবার অবকাশ পাইল না। রায়গড়ের একজন সেনা অমনি এমত বেগে তাঁহু দীর্ঘ শেল ক্ষেপ করিল যে, শেলটি ফিরিজির শরীরটি ভেদ করিয়া প্রায় পশ্চাৎ হইতে দুই হাত বহির্গত হইল। গঞ্জালিস দ্রুতবেগে সেই সেনা লক্ষ্য করিয়া অসি চালন করিল। বীর সেনা আপন ভীষণ ধড়ো তাহা অবরোধ করিল। পরক্ষণে গঞ্জালিস আপনার পার্শ্বে কাহাকেই দেখিতে না পাইয়া যেমন পশ্চাৎদিকে চাহিল, দেখে যে তিন জন সুসজ্জ সর্কাস্ত্রসমবিত অখারোহী যোদ্ধা। তাহিল, ইহারা রায়গড়ের সেনানী, ইহাদিগের সেনারা আসিতেছে। গঞ্জালিস কিছু চলচ্চিত্ত হইল। অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন তাহাকে অসি দ্বারা ধিষা করণাশয়ে অসি উঠাইল। গঞ্জালিসের বিহুঃ মত চক্ষু যেমন তাহা লক্ষ্য করিল অমনি জলোকার মত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া (১) স্থানান্তরে গেল। আততায়ীর ভীমবলে উত্তোলিত অস্ত্র আঘাতপাত্র আত-যায়ী সমুখ অধীকৃত আশ্রয় করিয়া ভূমে পড়িল। গঞ্জালিস ফিরিয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে নিমেষ মাত্র পড়িল না। কিন্তু দক্ষ গঞ্জালিস পশ্চাত্ত্ব একজনের কঠিন ষষ্টির অচেতনী আঘাত যতীক্রম করিতে পারিল না। অখারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে আবর্তিত হইলেন কিন্তু হজুরমলকে দেখিতে না পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কৈ হজুরমল কোথায়, সে কি এত শীঘ্র অস্ত্রে বলিহ পাইয়াছে?”

মালিকরাজ বলিল। “আমার তাহা বোধ হয় না, বুঝি সে স্থানান্তরে আছে।”

বন্দ্যবৃত্ত বলিল। “এখন মে চিত্তার প্রয়োজন নাই, চল অগ্রসর হওয়া যাক্” অমনি পাদবলয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল ও দক্ষিণ হস্তে চক্রহীন লইয়া সন্মুখস্থ ফিরিজি সেনাকে একই আঘাতে দুই খণ্ড করিল। অমিতভেজা অর্থাৎ প্রথম রক্তস্রাব দেখিয়া একটি গভীর, দুর্গভেদী, শত্রুবিজয়ী ধ্বনি করিয়া দক্ষিণ পদদ্বারা বিধাতৃত্ত শোণিতা-প্লাবিত শব্দে আঘাত করিল। পরেই একটি দীর্ঘ লক্ষ্য দিয়া যেখানে ফিরিজিদের সৈন্তেরা অসহ্য বলে যুদ্ধভ্রাত প্রবাহিত করিতেছিল, তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল। দুই তিন জন ফিরিজিসেনার হস্ত পদাদি অস্থপাতাঘাতে নষ্ট হইল। রায়গড়ের সেনা ও ফিরিজি সেনা উভয়েই নিস্তব্ধ হইল। কেহই বুঝিল না যে, এ বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ কে। তাহাঙ্গিনের সন্দেহ দূর হইতে না হইতে অমনি সূর্য্যকুমার সেই স্থানে লক্ষ্য উপস্থিত হইল। মালিকরাজও তাহার পশ্চাৎ অনিমেঘ বিলম্বে উপস্থিত হইল। তিন জন অস্বা-রোহী সান্ন্যয়োদ্ধা বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইবামাত্র চতুর্দিক হইতে লোকেরা সরিয়া অন্তরে দাঁড়াইল। ক্রমেকের গুহা যুদ্ধপ্রবাহ রুদ্ধ হইল। বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই একটি সি হনাদ করিয়া বলিল। “রে দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ফিরিজী অগ্রসর হও, আমি তোমাদিগকে যমালয় দেখাইব” অমনি তীক্ষ্ণ খড়্গ এক জনার উপর চালাইল। সে লোৎটা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বামপার্শ্বে ভর দিয়া দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া যেন হস্তদ্বারা অন্ত্রাঘাত আচরণ করিবে বুঝাইল। তাহার বচিদেশ কিছু বক্র করিতে তাহার শরীরটি বামপার্শ্বে হেলিল, বামকর্ণ ভূমিদিকে করিয়া উর্ধ্বমুখে বন্দ্যবৃত্ত পুরুষের দিকে দৃষ্টি করিল। দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উঠাইয়া করতল বিস্তারিল। বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ খড়্গে তাহাকে আঘাত করিয়া যমালয় পাঠাইল। গজালিস এববার চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া ফিরিজী ভাষায় কি বলিল অমনি সৈন্তেরা বলপূর্ব্বক ‘সেটে ডেংমিজো’ বলিয়া চারাতিমুখে হুলা করিল। দ্বারের প্রহরীরা সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না। ফিরিজীরা মহা কোলা-হলে বেগে দ্বারে প্রবেশ করিল। বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাত করিতে অশক্ত হইলে উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিল। আপন দীর্ঘশেল তাহাদিগের উপর চালাইল, কিন্তু দ্রুতগামী সেনারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইল। একান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ স্থির হইলে, পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যকুমার অগ্রসর হইয়া আপন বন্দুক ফিরিজী সৈন্ত লক্ষ্য করিয়া মারিল। বন্দকের ভীষণ শব্দমাত্র সুশিক্ষিত ফিরিজী সেনা অমনি ভূমিশায়ী হইয়া আপন আপন অস্ত্রাঘাতে ভর দিয়া চলিল। কিন্তু অব্যর্থসন্ধান সূর্য্যকুমার পুনরায় বন্দুক ছাড়িয়া দুই জন ফিরিজি সেনাকে আঘাত করিল। তাহারা অমনি অচে-তন হইয়া ভূমিশায়ী হইল। সূর্য্যকুমারকে বন্দুক চালাইতে দেখিয়া বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ ও মালিকরাজ ক্রমশঃ বন্দুক চালাইতে লাগিল। সে ভয়ানক শব্দে রায়গড় কম্পিত হইল। বন্দকের উপর বন্দুক, গুলির উপর গুলিতে ফিরিজী সেনারা ছিন্ন ভিন্ন হইল।

বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষুণ্ণপদে অন্ধর বাটী প্রবেশ করিল। শুধির মন মন শব্দে কর্ণ-পাত তুলত হইল। ফিরিস্তার বাটীতে প্রবেশ করিলে বর্ষাবৃত পুরুষ চাহিয়া দেখেন বাহিরে আর জনমাত্র নাই। রায়গড়ের এ জনগণের বর্ষাবৃতের ছিল না। বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন, “স্বর্ষাবৃতের রায়গড়ের এ জনগণ আমি কোন দেখি নাই। এ কি! রায়গড়ি কি জনমাত্র বোকা নাই।”

শ্রীমদ্রাজ বসু। ‘চল ভিতর’ গানের সুরের কথা অল্পগুলি উল্লেখ করছি।
মাণিকরাজ বসু। “আজ রাতে প্রবেশন করেই

অমনি তিনজন অথরেহা যোগ দেয়ে অহংকারে
প্রাণে জনমাত্র নাট। সকল ছাড়াই হইল
তাহার। বিটীয় প্রাণাভিমুখে সহ্য হইল। অহংকার
ফিরিল। একটী অহংপুরে মনোহর। অহংকার
বর্ষায়ত পুরুষ দেখিবামাত্র দাখল হইল। অহংকার
অপরটি ক্ষতপদে জাইল। অহংকার অহংকার
পুরুষ ক্ষতপদে বিটীয় প্রাণে অহংকার
পশ্চাৎগমন করিল। অহংকার অহংকার
কে কাহার ভূমে পাড়িয়েছে। অহংকার
নিবেশিত হইয়াছে, বেগুন মালা অহংকার
হইতে লাগিল; অহংকার অহংকার
গুণি ও বাণের সনদস শঙ্কে অহংকার
বাহুহীন, কাহার বাহুভুলে অহংকার
কাহার অর্ধবিগত প্রাণে অহংকার
আলুল্যুত করিয়া হইতে অহংকার
করাল অমি অবিভ্রমে হইতে অহংকার
শবের উপর অচেতন হইল। অহংকার
পঞ্জালিস একটি ভীষণ নাটক। অহংকার
দিকে ছুটিল, তাহা লক্ষ্য হইল। অহংকার
পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অহংকার
জানিতে না জানিতে করিয়া তাহা হইল। অহংকার
হইয়া বমকবলে নিপত্ত হইল। অহংকার
স্বর্ঘ্যমায়ের নিকটে আসিয়া বলিল "স্বর্ঘ্যমায়ের, বুঝি কিরীসী জয়ী হইল। আমরা এখন

তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিলাম না । চল এ প্রাক্ষেণে আমাদিগের হইতে কোন উপকার সম্ভবে না । বাহিরে যাই আমাদিগের অবচালন স্থান না পাইলে স্নাত্ত পক্ষুর মত থাকিতে হইতেছে । মাঠে ইহাদিগকে দেখিব ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম । কিন্তু ইন্দুমতীর কি দশা হইল তাহাও জানি না ।”

মালিকরাজ বলিল । “তাহার গন্ধমাত্রও কোথায় পাইতেছি না । বোধ হয় তিনি কোথাও লুক্কায়িত হইয়াছেন । আমি রায়গড়ে যথেষ্ট সৈন্যবল দেখিতেছি না । এত অল্পলোকে ফিরঙ্গীদিগকে পরাজয় করা বড় সুবিধা নহে ।”

বর্ধাবৃত পুরুষ বলিল । “আমি হজুরমলকে দেখিতেছি না, সে কোথায় । তোমরা কি নিশ্চয় জান যে সে আসিয়াছে ?”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “আমরা তাহাকে পঞ্জালিসের সঙ্গে লক্ষরপুর হইতে বাত্ৰা করিতে দেখিয়াছি ।”

মালিকরাজ বলিল । “আমরা ফিরঙ্গীদিগের নৌবাহকের নিকট শুনিয়াছি, সে আসিয়াছে ।”

বর্ধাবৃত পুরুষ বলিল । “তবে সে নরাদম কোথায় গেল ? আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে । সে নরাদমকে চক্ষে না দেখিলে আমি নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না । চল বাহিরে যাই, সে পাপীকে অবশ্য ধরিতে হইবে । আমার বোধ হয় সে নরাদম পাষাণ কোন মন্দ পরামর্শে নিযুক্ত আছে । চল বাহিরে যাই, তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে হইবে ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “ইন্দুমতীর জন্ত আমার অত্যন্ত চিন্তা হইতেছে, এমন কি ইন্দুমতীর কুশল না পাইলে আমি হৃৎকলে যুক করিতে অপহি ।”

বর্ধাবৃত পুরুষ বলিল । “স্বর্ধাকুমার, আমারও চিন্তা হইতেছে ।” ক্রমে তাহারা বাহাদর পার হইল ।

মালিকরাজ বলিল । “মহাশয়, আর চিন্তা নাই, ঐ দেখুন চতুর্দিকের হুর্গমকে, উচ্চ বলভীতে (১) অগ্নি জ্বলিয়াছে । উচ্চ মুবচা (২) হইতে পটহ (৩) বাজিতেছে । এক দণ্ডের মধ্যে গ্রামস্থ সমস্ত সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে । এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কোনমতে ফিরঙ্গীদিগকে বিনাশ করিয়া আটক করা । তাহা হইলেই সমস্ত সেনা রায়গড়ে আসিয়া পৌঁছাবে ।”

বর্ধাবৃত পুরুষ বলিল । স্বর্ধাকুমার একটি বর্শা কর । ক্রত যাইয়া বাহির হইতে ফটক বন্ধ কর, তাহা হইলেই ফিরঙ্গীরা শীঘ্র বাহির হইতে পারিবে না । স্বর্ধা-

(১) হুর্গশিখরে । (২) হুর্গশিখরের বাতায়ন । (৩) দামামা, নাগাড়া বিশেষ ।

কুমার নক্ষত্রবেগে ইন্দুমতীর আবাস দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিলেন। ভীম দুর্ভেদ্য শৃংখল দিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। দুর্গ বলভী হইতে ঘন ঘন পটহ বাজিতে লাগিল ও চারি দিকে দাবানল সম অগ্নি জলিয়া উঠিল। বন্দ্যারূত পুরুষ, স্বর্ধাকুমার ও মালিকরাজ ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে আসি করে অপেক্ষা করিতে রহিলেন। কিছুকাল পরেই অন্তঃপুরের কলরব বৃদ্ধি হইল। তাহার অব্যবহিত পরেই চারিদিকের ইন্দুকোষের দ্বার খুলিয়া গেল। আবাসের প্রতি ঘরে অগ্নি দৃষ্ট হইল। অগ্নিশিখা গবাক্ষ দ্বার দিয়া অত্যন্ত বেগে নির্গত হইতে লাগিল। অগ্নর মধ্যে ফিরিঙ্গদিগের রক্তবর্ণ প্রতিবিম্ব লক্ষ্য হইতে লাগিল। ক্রমে চতুর্দিকের বাতায়ন (১) দিয়া ফিরিঙ্গরা লক্ষ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। স্বর্ধাকুমার, বন্দ্যারূত পুরুষ ও মালিকরাজ অমিতবেগে একবার এ বাতায়নে, একবার এ প্রাচীরে, একবার বা ইন্দুকোষের (২) নিয়ে আসিয়া অন্তঃপুরে তাহাদিগের অবতরণ রোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিন জনে কত স্থানে এককালে বর্তমান হইতে পারেন। দুই চারি জন ফিরিঙ্গী লক্ষকালে অন্তঃপুরে নিপতিত হইল বটে কিন্তু অধিকাংশ সুস্থ শরীরে ভূমে উঠিল। স্থানান্তরিত ফিরিঙ্গরা ভূমে নামিয়াই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অগ্রে ভীম শল অচমসাহসী সেনা দাঁড়াইল। তাহাদিগের পশ্চাতে লুপ্তভার লইয়া দাঁড়াইল। ঐতিবৃত্তদোক্তা তিন জন অশ্বারোহী মাত্র। কিন্তু অমিতভেজা বন্দ্যারূত পুরুষ ও স্বর্ধাকুমার কণামাত্রও ভীত হইল না। অসম বল দেখিয়া তাহাদিগের সহস্র দ্বিগুণ উত্তেজিত হইল। “কবীর কবীর” বলিয়া ভীম সিংহনাদে তিন জন পদবলয়ে দাঁড়াইয়া আসি লইয়া বহল বিপক্ষ ফিরিঙ্গী সেনা আক্রমণ করিল। ঘাইতে ঘাইতে বাম হস্তে তুরী লইয়া ধ্বনি করিল। ফিরিঙ্গী সেনারা সিংহনাদ ও তুরী ধ্বনিতে সিংহরল। কিন্তু সেনানী গজালিস ইহাদিগকে তুরী বাজাইতে দেখিয়া খল খল করিয়া একপা উঠিয়া হাসিল যে, মালিকরাজ বোধ করিল এটা ভুবনাত্তরের শব্দ। গজালিসের প্রকৃত যুদ্ধ করণ মন ছিল না। কোন মতে আপনারা অসম ভিত্তিতে পলায়ন করে, এই চিন্তাই তাহার বলবতী ছিল। তিনটি কালশমনমদৃশ বিরাটযোদ্ধার অন্তঃ আক্রমণ দেখিয়া একটি গভীর চীৎকার করিল। অমনি শ্রেণীবদ্ধ সেনারা একটি সমুদ (৩) শব্দ করিয়া দ্বিধা হইল। অশ্বারোহীদিগের সমুদ্র শূন্য হইল। অমন সেনারা পার্শ্ব ও পশ্চাৎ হইতে তিন জন যোদ্ধাকে আবরণ করিল। বন্দ্যারূত পুরুষ ও স্বর্ধাকুমার ইহাদিগের গতি দেখিয়া ফিরিয়া অস্ত্র উঠাইল। অশ্বারোহী মালিকরাজ কেগে অশ্ব ফিরাইয়া যুদ্ধাবর্ত্ত হইতে বাহিরে পৌছিল। ফিরিঙ্গী-সেনারা বাহবদ্ধ হইয়া অশ্বারোহীদিগের উপর অস্ত্র

চালাইতে লাগিল। আরোহিত্র সম্যসার্টা উত্তর হস্তেই অস্ত্র চালনে দক্ষ। অবিরত অস্ত্র চালনে ফিরিঙ্গিদের দিও অস্ত্র হইতে কেবল আপনাদিগের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। নানা নবো অব্যাহত পাইলেই দুই এক জনকে আঘাতও করিতে ছাড়িতেন না। ফিরিঙ্গিরা কেবল অধারোহিত্রের উপর লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র চালাইতেছিল; দেখে নাই যে, মালিকরাজ পশ্চাতে গিয়াছিল। মালিকরাজ শবট-বাহু-শিরহু এক জন লুপ্ততরুনকে লোককে অস্ত্রে ঘিণা করিলেন, অমনি তাহার পর আপন বন্ধু হস্তে আর এক জনকে আঘাত করিয়া অতি বেগে অস্ত্র চালন করত সেনা দল করিয়া বৃহৎ ভেদ করিতে লাগিলেন। বর্ষাবৃত পুরুষ ও স্ত্রীসকলের সম্মুখান যে দ্রাবিড় পশুতর যোদ্ধাগণের রণে ভঙ্গ দেখিল, রণপ্রবাহও ক্রমে অপর দিক হইতে পরিচলিত। ক্রমে ফিরিঙ্গিসেনারা বাহরফায় অগ্রসর হইল। গুজ্জাগিস কেবল দাঁড়ইয়া সেনাদিগকে এতক্ষণ উৎসাহ দিতেছিল। তিন জন অধারোহীর সেনা দল করিয়া স্বয়ং রণশ্রোতে মিশিল। আর উচ্চস্বরে বৃহৎ পরিবর্তন করিতে আদেশ দিল। বর্ষাবৃত পরিবর্তন করিতে না-করিতে দূর হইতে চারি জন অধারোহী বন্দন করিল। অমনি স্ত্রীসকল উৎসাহে ফিরিঙ্গিসেনা অগ্রসর করিলেন, ও কত লোককে আঘাত করিলেন, তাহা নিশ্চয় দেখা গেল না। ফিরিঙ্গি, শিবট সহট দুইজন আরও বিক্রমে চতুর্দিক হইতে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। মালিকরাজও ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেনা দল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। একবার বাহু পাইয়া একবার বাহু হস্তে সেনাতরঙ্গে, একবার বাহু পাইয়া পর্বে শরীরের মত চঞ্চল হইয়া সেনা দিগেতে ফিরিঙ্গিদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিলেন। দূরস্থ অধারোহীরা শিবট হইয়া অস্ত্র তরঙ্গে আসিয়া ক্ষণেক রণ-তরঙ্গে মিশাইয়া গেল। তাহার পরেও বর্ষাবৃত কেবল অসিচালনে যত্নকে পাইল, ছেলন করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গিরা অস্ত্র চালন মতে অগ্রসর যোদ্ধাচতুর্দিকের আঘাতে জলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ মধ্যে বর্ষাবৃত অধারোহীদিগকে পরাস্তের মত করিল, তাহার রণশ্রোতে পড়িয়া চতুর্দিক হইতে সার্বভূমি হইল। তাহাদিগের শরীরে বর্ষা ছিল না, অল্প ক্ষণেই অবসন্ন হইল। এমন সময় দূর হইতে অনঙ্গপাল দেবের গভীরশব্দ শোনা গেল। একখানি ওগাখানি মাত্র গভীর শব্দ অধরে হইলেন। শিবট হইয়া ব্যাপারটী সামান্য নহে জানে দাঁড়ইলেন। চারি জন অধারোহীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া একজনকে বলিয়া দিল, সে অগ্রসর হইতে অধারোহী হইল। অনঙ্গপাল অমনি এক লক্ষে, সেই অগ্রসর হইলেন। অনঙ্গপাল যদিও পকাশ বংশের অতিক্রম করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু অধারোহণ করিলে, তাহাকে অনেক যুবাঙ্গকা বলবান দেখাইল। অনঙ্গপাল অধরে আরোহণ করিয়া তিনজন অধারোহীকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা

দিলেন; তিনজন নকত্রবধি গিয়া রণশ্রোতে মিলিল। তৎক্ষণে পড়িয়া অস্ত্র চালন করিতে লাগিল; কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত দুইজনই মৃত্যুবরণ করিতে না পারায়, অতিশীঘ্র হতাবশ হইয়া অবসন্ন হইল। একজন অস্ত্রাঘাতে নিপতিত হইল। অপর দুইজন কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিতে, কিন্তু অবশেষে তাহারও ভূমিশায়ী হইল। অনঙ্গপাল যুদ্ধে আপনাব বলহীন দেখিয়া নিতান্ত ব্যাভুল হইলেন। কেনন তিনজন অশ্বারোহী বর্ষাবৃত বলিয়া প্রায় একশত সুশিক্ষিত সৈন্যের সম্মুখীন হইল। বহু পরিশ্রমে তাহারও ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল। কিশোরী অশ্বারোহীত্বের এই অবস্থা দেখিয়া অসম্মত করিয়া উঠিল। স্বর্ঘ্যবান ও বঙ্গবীর পুরুষ কিন্তু অত্যাগমনে নিরস্ত হইলেন না। মালিকরাজও অপর দিক হইতে পোষপোষ ক্রমশঃ করিতে লাগিল। ইহাদ্বয়কে একান্ত হীনবল হইতে দেখিয়া অনঙ্গপাল আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; স্রুতবেগে অশ্ব লইয়া যুদ্ধস্থলে দৌড়িল। এমত সময়ে তাহা হইতে কিছুজন অশ্বারোহী বানর বানর শব্দে আশ্রয় উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন অস্ত্রধর হইয়া তুরী বাজাইল; তাহার পরেই দ্রুত অস্ত্রধর বানর অস্ত্রধরী বহিরা বলিয়া। “মহাশয়! একটা অশ্বারোহী বানর বানর বানর করিতেছে না। আপনি থাকিলে রাগগড়ের মতস; পাড়াবিদ্যা আচ্ছা করুন। বানরবানর তাহার কথায় ক্ষান্ত হইয়া দূরে দাড়াইল। কিছু জন অশ্বারোহী অস্ত্রধর বানর অস্ত্র চালন করিতে লাগিল। এমত সময়ে বঙ্গবীর বানরবানর বানর বানর অস্ত্রধরী বানর বলিয়া। “মহাশয়! একটা অশ্ব আচ্ছা করুন।”

অনঙ্গপাল বলিল: “বরভ! বানরবানর অস্ত্রধর, আমি অস্ত্রধরে আরোহণ করিবা।”

বঙ্গবীর বলিল। “যে আচ্ছা।”

অনঙ্গপাল আপন অশ্ব হইতে শরশীল হইল, বরভ লক্ষ্যে অশ্ব বসিল। বরভ অশ্বারোহী হইয়া আপন বন্দুক লইয়া একজন ফিরিঙ্গিকে সন্ধান করিয়া মারিল। ফিরিঙ্গি গুলিকাঘাতে গণ্ডগণ্ডা করিল। পরক্ষণেই বন্দুক পুনরায় বারুদাদি দিয়া প্রস্তুত করিল; বন্দুক প্রস্তুত হইলেই আপন ধর্ম্মে শরধ্বংস করিয়া আকর্ষণ পশ্চাত সন্ধান করিল; “বরভ! সন্ধান শব্দে উঠিল। বরভ সে দূর হইতে নিক্ষেপমাাত্র তাহার পতন লক্ষ্য না করিয়া আবার তখন হইতে শর লইয়া গুলে যোড়িল; সেটীও নিক্ষেপ করিল। এইরূপে একের পর আর এক, আর একের পর আর এক করিয়া বন বন পরক্ষণে ভূমি আচ্ছন্ন করিল। শর বর্ষণে শূন্য মেঘাবৃত প্রায় হইল। বরভ শরবর্ষণে একরূপ দক্ষতা দেখাইল যে অনঙ্গপাল দূর হইতে তাহার যুদ্ধকৌশলে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই অনঙ্গপাল এক অশে আরোহণ

করিয়া একটা রৌপ্যময় বন্দুক লইয়া স্বয়ং স্বয়ং গুলিচাক্ষেপে ফিরিঙ্গিদিগকে অবসন্ন করিল। ফিরিঙ্গিরা সমুদ্র বিপদ জ্ঞানে আর স্থির-যুদ্ধ আশ্রয় বুঝিল। গঞ্জালিসের ইঙ্গিতমাত্র সকলে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। বর্ষ্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার বিধিমতে শান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শত্রুর শ্রেণীভঙ্গ দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনঙ্গপাল দেব, বল্লভ ও অগাধ্য রায়গড়ের রাজপুরুষ পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। ইত্যবসরে মালিকরাজ অত্যন্ত ক্ষুভিতে শত্রুর অগ্রসর হইয়া এক কালে বন্দুক ও শরে তাহাদিগের একাই গতি রোধ করিল, পরে শর ত্যাগ করিয়া অসিকরে যেখান দিয়া শত্রুয়া পলায়ন করিতে উদ্গমণী হইল, সেই খানেই অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে অনঙ্গপাল ধস্তা ধস্ত করিয়া প্রশংসা করিল। অমনি বল্লভ ও অনঙ্গপাল দ্রুত অগ্রসর হইয়া মালিকরাজের সহায় হইল। পশ্চাৎ হইতে বর্ষ্মাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও অপর তিন জনা অঝোরোহী ইহাদিগকে আক্রমণ করিল। ফিরিঙ্গিরা যুদ্ধ করিতে করিতে অঙ্গে অঙ্গে রণপ্রবাহ চালাইয়া প্রধান সিংহঘারের পিণ্ডে উপস্থিত হইল। বর্ষ্মাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ, বল্লভ ও অনঙ্গপাল ও অগাধ্য রায়গড় সাপেক্ষ লোকেরা এইবারই শেষ রক্ষা জানিয়া যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল; ফিরিঙ্গিরাও এইখান পায় হইতে পারিলেই নিরাপদ হইবে জ্ঞানে, অসম্ভব বেগে রণে নিযুক্ত হইল। অস্ত্রের চক্ৰম্বিতে যোদ্ধাদের প্রতি দৃষ্টি করা যায় না। বঙ্কনান্তেও কিছুমাত্র স্তন্য যায় না; ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিল। সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। কেবল ছেদনই সকলের উদ্দেশ্য। ফিরিঙ্গিদিগের বলাধিক্য বশত তাহারা ক্রমে জয়ী হইতে লাগিল। অনঙ্গপাল ক্রমে ভীত হইলেন। বর্ষ্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার ক্রমে হীনবল হইতে লাগিলেন। কতক্ষণ অসম সৈন্যের সহিত যুদ্ধ সম্ভব? ফিরিঙ্গিরা যুদ্ধ-গতিক দেখিয়া ভীষণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে অগাধ্য রায়গড়ের অঝোরোহীরা নিপাতিত হইল। ফিরিঙ্গিদিগের জয়ধ্বনির দ্বিগুণ চিৎকার গগন পূরিল। ফিরিঙ্গিরা এক্ষণে পলায়ন-পরামর্শ করিলে সহজেই কৃতকাৰ্য্য হইত, কিন্তু গঞ্জালিস অনুমতি দিল যে, বর্ষ্মাবৃত চারিজন অঝোরোহীকে নষ্ট করিয়া চল স্বরে বাওয়া যাক। ফিরিঙ্গিরা সিংহের মত উত্তেজিত হইয়া কেহ থড়াহস্ত, কেহ অসি করে, কাহার হস্তে কুপাশ, কেহ বা দৃঢ় লগুড় লইয়া, কেহ পরশধ, কেহ ভোমগদা, কেহ ভীষণ শেল লইয়া ইহাদিগকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিল। ইহারা চারিজনে শত বোদ্ধার মত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে এখানে ওখানে বিদ্যাতের মত ফিরিতে লাগিল ও যেখানে বাইল সেখানকার দুই একজনকে আঘাত করিল, কিন্তু বর্ষ্মাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার, মালিকরাজের অধিক পরিভ্রমে ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল। ইহারা কটকে অধিপার্শ্ব ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। নিতান্ত প্রায় অধ প্রাণপণে বোদ্ধার আত্মা বহন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে

তাহাদিগের প্রাণ সংশয় হইল। অনঙ্গপাল গতক বুঝিয়া নীরব হইয়া দেখিতে লাগিলেন। এমত সময়ে দূর হইতে ভীষণ ভূরীনিবাদ শ্রবণগোচর হইল। তুরীধ্বনিতে ফিরিসিয়া মুহূর্ত্তের জ্ঞান স্থির হইল। যে হস্ত উঠাইয়াছিল, তাহার হস্ত উঠানই রহিল। তুরীশব্দ শ্রবণ মাতে বন্দ্যাবৃত পুরুষ, স্বর্ধাকুমার ও মাজিকরাজ আপন আপন তুরীধ্বনি করিল। কিছুক্ষণ পরেই আবার তুরীধ্বনি শ্রবণগোচর হইল। আবার তুরীধ্বনি। ক্রমে তুরীধ্বনি নিকট হইতে লাগিল, ক্রমে বহু অশ্বের পদচলন শোনা গেল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ ও স্বর্ধাকুমার সাহস পাইলেন। অধিক বনে শত্রুক্ষেপে নিযুক্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পট্ট জন বন্দ্যাবৃত সর্ষঃস্বমধারিত সপ্ততাক অশ্বরোহী রণক্ষেত্রে আসিয়া মিলিল। তাহাদিগের অগ্রে জ্যোতির্ভূদ্রা প্রভাবতী। ক্ষণেকের জ্ঞাত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রায়গড়ের সেনাবল অধিক হইল। আবার তাগাই অবাধিত পরে অপর বিশ জন সেইরূপ অশ্বরোহী আসিয়া মিলিল। অশ্ব অশ্ব ফিরিসিদিগকে ঘেরিল। ফিরিসিয়া বন বন নিপাতিত হইতে লাগিল। ক্রমে অশ্বরোহীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ফিরিসিয়া পদে যুদ্ধ করিতেছিল। বহু অশ্বরোহী দেখিয়া ভীত হইল। এমত সময়ে এক দিক্ হইতে ভীষণ সিংহ নিনাদ করিয়া হজুরমল ও দেউশত সেনা দেখা দিল। তাহারা আসিয়া মিলিয়ামাত্র এককালে রণপ্রবাহ পরিষ্কর্ত্ত হইয়া গেল। ফিরিসিয়া বন বন জয়ধ্বনি করিল। পরন্তু খড়া চন্দ্রহাস বন্ধমে অশ্বরোহীর অশ্ব নষ্ট করিতে লাগিল। প্রথমেই স্বর্ধাকুমারের অশ্বের একপদ চন্দ্রহাসের সন্মুখ প্রহারে হজুরমল স্বয়ং ছেদন করিল। অশ্বট্ট এককালে ভূতলশায়ী হইল। একান্ত ভ্রাতৃ স্বর্ধাকুমারও অশ্বের সঙ্গে পড়িলেন। সাগম্যত চেষ্টা পাইলেন যে অশ্বতল হইতে আপন পদ বাহির করেন কিন্তু কোনমতেই তাহার সাধা হইল না। এমন সময় একজন ফিরিসি আসিয়া কাঠিন পরন্তু দ্বারা তাহার শিরদ্বাণে আঘাত করিল। পরন্তু শিরদ্বাণ ভেদ করিয়া স্বর্ধাকুমার মুণ্ডে লাগিল। স্বর্ধাকুমার বহু পরিশ্রমে ক্রান্ত হইয়াছিলেন, আঘাতে এককালে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন। বন্দ্যাবৃত পুরুষ দূর হইতে স্বর্ধাকুমারকে পড়িতে দেখিয়া “বধ রে বালক!” বলিয়া ভীম পরাক্রমে ফিরিসি আক্রমণ করিলেন। হজুরমল কেবল অশ্বক্ষেপে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া অগ্নানাশে সেনা নিয়োগন করিল। সমাপ্ত সেনারা অভাব উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। হজুরমল একটি ভীষণ শেল লইয়া বন্দ্যাবৃত পুরুষের বক্ষে লক্ষ্য করিল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ আপনায় খরশান তলবারী দ্বারা ক্রুত আসিয়া শেলটি ছেদ করিল। অমনি হজুরমল একখানি চন্দ্রহাস লইয়া বন্দ্যাবৃত পুরুষের অশ্বক্ষ সন্মুখ প্রহারে যেমন ছেদ করিল, অমনি বন্দ্যাবৃত পুরুষ অশ্ব হইতে লক্ষ্য দিয়া ভূমে দাঁড়াইল। অশ্বটি ছিন্নগ্রীব হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ধর ধর করিয়া কাণিয়া ভূমে পড়িল। হজুরমল

চল্লাহাস লইয়া বন্দীকৃত পুরুষকে অক্রমণ বলিল। বন্দীকৃত পুরুষ আপন তলবারি লইয়া হজুরমলের প্রতি আঘাত করিল। হজুরমল ভীষণ চল্লাহাস প্রহারে বন্দীকৃত পুরুষের তলবারী খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বন্দীকৃত পুরুষ নিরস্ত হইবামাত্র দ্রুত-বেগে হজুরমলের কটদেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভূমে পাড়িলেন। হজুরমল চল্লাহাস ভাগ করিয়া বন্দীকৃত পুরুষের হস্ত হইতে আপন কটদেশ ছাড়াইতে যত্নশীল হইল। এইরূপে উভয়ে মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হইল। এমত সময় প্রভাবতী দ্রুত আসিয়া হজুরমলকে বল্লমের দ্বারা যেমন দিল্লি পরিবেশন কর্মিন পশ্চাৎ হইতে একজন একটি গল্গাঘাতে প্রভাবতীর দক্ষিণ হস্তটি সম্পদ্বিগত করিল। প্রভাবতী চিত্তপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। পর অন্তে সেই কিংকি ভীষণ পরন্ত আঘাতে বন্দীকৃত পুরুষকে ভূমিশায়ী করিল। হজুরমল অমনি দাঁড়াইয়া অপর অগ্ন্যরোহীকে অক্রমণ করিল। একজন গল্গা প্রহারে অনঙ্গপালকে ভূমিশায়ী করিল। গঞ্জালিস দ্রুতপদে হজুরমলের পার্শ্বে আসিয়া বলিল। “অ ব যুদ্ধে প্রবেশন নাই চল বন্দী লইয়া যাই।”

হজুরমল বলিল। “ঐ কাটকে দইতে হইবে। আর ঐ অনঙ্গপালকেও লইতে হইবে। কি বল।” গঞ্জালিস বলিল। “যাহাও দইতে হয় লও, কিন্তু শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিতে ইবে। বিলম্ব হইলে ইন্দ্রদিগের আগ্রহ সেনা উপস্থিত হইবে।”

হজুরমল বলিল। “তবে চল। ইন্দ্রমতীকে চরিত্রন লষ্টা নৌকায গিয়াছে, আমরা যুদ্ধ করি, অপর অটকনে ঐ কাটকে আর অনঙ্গপালকে লইয়া যাক।”

গঞ্জালিস বলিল। “তবে আসি। মোক দিজেছি।” পরেই চার জন লোক আসিয়া কাঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান প্রভা ভীকে ধরিল। প্রভাবতী ক্ষমতা পর্যন্ত তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে বজ্রমুষ্টি হইতে তিলমাত্র অপ-সৃত হইতে পারিলেন না। অবশেষে দাঁপড়াবস্থায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভা-বতীর ক্রন্দন শুনিয়া অনঙ্গপাল ও বল্লভ দ্রুত সেই দিকে বাহমান হইতে গেলেন; অমনি হজুরমল ও গঞ্জালিস তাহাদিগের সাহায্য হইল। বল্লভ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল। হজুরমল আপন ভীষণ পরন্ত লইয়া তাহার অশ্বের শিরোদেশে আঘাত করিল; অমনি অশ্বটি ভয়ানক আতঁনাদ করিয়া পক্কত পাইল। বল্লভ নিরস্ত হইলে ভূমিতে পড়িলেন, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব বোধে আপন বল্লম লইয়া হজুরমলের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু গঞ্জালিস পার্শ্ব হইতে আসিয়া ভীষণ চল্লাহাসে তাহা ছেদ করিল। অমনি হজুরমল অগ্রসর হইয়া বল্লভকে বসে বাহ প্রহারিয়া ধরিল। বল্লভ নিতান্ত হীনবল ছিল না, হজুরমলের অক্রমণ ছাড়িয়া ভীষণ মুঠাঘাত করিতে লাগিল। হজুরমল কিন্তু আগ্রাণেও বল্লভকে ছাড়িল না। বল্লভ বহুকণ যুগ্মা অশ্বশেবে হজুরমলকে ভূমে পাড়িল। হজুরমল

বলপূৰ্ণ পুনৰ্কার উঠিল। উঠিয়াই এমত বলে বলভের মুখে মুষ্টিগাথা করিতে লাগিল, যে বলভের নাগিমা ও মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইল। বলভ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া মুচ্ছা গেল। এদিকে অনঙ্গপাল খতাবতীর পশ্চাৎ গমন করিল। গঞ্জালিস তাহাকে কিছুযাত্র ঘোষ না করিয়া তাহার পশ্চাতে দৌড়িল। ক্রমে গড় পার হইয়া খালে আসিল। ওদিকে হজুরহল বলভকে অচেতন দেখিয়া মৃতপ্রায় জ্ঞান করিয়া ছাড়িয়া দিল ও গঞ্জালিসের পশ্চাৎ চলিল। অত্যাচার ফিরিজি সেনারাও তাহার পশ্চাৎ জয়ধ্বনি করিয়া জব্বানি লইয়া চলিল। রায়গড়ে আর এমত লোক কেহই রহিল না যে, তাহা-
নিগের গতিরোধ করে। তাহারা খালেব তীরে যাইয়া বলপূৰ্ণক অনঙ্গপালদেবকে বন্দী করিয়া নৌকার আরোহণ করাইলে হজুরহল গঞ্জালিসের অনুমতি লইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া লক্ষ্যপূরাতিমুখে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস নৌকা লইয়া পশ্চিমাভিমুখে বাহিতে লাগিল।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

“কভা-বিল ত্রাণত ইতুদগঃ কত্রস্ত শকো ভুবনেশ্বরঃ”

এদিকে কিছুকাল পরেই রায়গড়ে অত্যাচার সেনা সব ত্যজ হইতে আগমন করিতে লাগিল। সকলে আসিয়া যুদ্ধ শেষ দেখিয়া আপনাদিগের বিনয়ের জন্ত কেহ কোন ওজর, কেহ বা আপশাকে নিন্দা, কেহ বা অত্যন্ত দূর বাস বলিয়া আসিতে পারে নাই বলিতে লাগিল। কিছুকাল পরেই স্বয়ং কমলাদেবী অন্তঃপুর হইতে বহির্দৈর্শে আগমন করিলেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়া সমাগত সেনারা সম্মুখীন হইয়া তাহাকে সম্মান করিল। তিনি বলিলেন, “তোমরা অনঙ্গপালদেবের অধেষণ কর। স্তবিত্তেছ, পাপেরা ইন্দ্রমতীকে লইয়া গিয়াছে। এক জন যাইয়া তাহার সমাচার আমার আনিয়া দাও ও অত্যাচার সকলে আকাঙক্ষা ও অত্যাচার সেনা সকলের সেবায় নিযুক্ত হও। সকল সেনা-
পনকে অতিথিশালায় ভাল ভাল শস্যায় শয়ন করাইয়া সেবা ও চিকিৎসা কর। আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে বাই। সমাচার যখনকার বেক্ষপ হয়, তাহা আমাকে দিও। তোমরা সময়ে আসিতে পার নাই বলিয়া চাঃখিত হইও না। আমি তোমাদিগকে ভাল জানি, তোমরা কেহ ইচ্ছাপূৰ্ণক বিলম্ব কর নাই।”

কমলা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সেনারাও একত্রিত হইয়া আপনাদিগের অধ্যক্ষ স্থির করিবার জন্ত চিন্তিত হইল। এমত সময় বণাসক হইতে শঙ্কর ও নসিয়াম উঠিয়া আসিল। শঙ্কর সঙ্কট বিপদ দেখিয়া প্রথমেই কিছু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে একই আঘাতে

ভূমে শয়ান হইয়াছিল। যদিচ তাহার উঠিবার যথেষ্ট শক্তি ছিল। তথাপি ইচ্ছাপূৰ্ব্বক আর ওঠে নাই। এক্ষণে চতুর্দিক্ নিরন্ত দেখিয়া অল্পে অল্পে উঠিয়া দাঁড়াইল। নসিরাম কিছু কাল যুদ্ধ করিয়াছিল। বর্ষারূত পুরুষের পতনের পর সেও বিনা আঘাতে তাহার পার্শ্বে অবের নিকট লুকাইয়াছিল। নসিরাম শব্দরকে উঠিতে দেখিয়া বলিল। “শব্দর আমিও জীবিত আছি, চল একত্রে যাই।”

শব্দর নসিরামের স্বর বুঝিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। নিকটে সেনা-সমাগম দেখিয়া দাঁড়াইল। সেনারা নসিরাম ও শব্দরকে দেখিয়া বলিল। “আইস এক্ষণে আমাদিগকে সমাচার দাও। কমলা রাণী যুদ্ধের সমাচার পাইবার জন্য অত্যন্ত কাতুল হইয়াছেন। আমরা কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি।”

নসিরাম বলিল। “তোমরা আগে বর্ষারূত যোদ্ধা কয়জনকে যতপূৰ্ব্বক উঠাইয়া লইয়া আইস। আমার বোধ হয় না যে, তাহারা কেহই জীবিত আছে। তাহাদিগের শরীরের বর্ষ সকল খুলিয়া দিয়া এক এক পর্শ্বকে এক এক জনকে শয়ান কর। আমি কমলা রাণীর নিকট গিয়া সকল সমাচার দিতেছি শব্দর তোমাদিগের সঙ্গে রহিল।”

নসিরাম এই কথা বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কমলাদেবীর নিকট চলিয়া গেল। কমলাদেবী আপন স্বরে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে একজন সহচরী দাঁড়াইয়া ফিরিঙ্গিদিগের দৌরাস্ত্রা বর্ণন করিতেছিল। নসিরাম স্বরে শ্রবেশ করিয়া শিরমোয়াইয়া শ্রবণ করিল। কমলাদেবী বলিলেন। “কেও নসিরাম? এস বাপু। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই। তুমিত ভাল আছ? আর বাপু আজ এই আমাদিগের সমূহ বিপদ গেল। এখনও জান না আমার কত দূর পর্যন্ত কপাল ফাটিয়াছে। বস, আজকের কোল সমাচার জান?”

সখীকে বলিলেন। “দীপটি উজ্জল করিয়া দাও।” নসিরাম স্বরের একপার্শ্বে বসিল। বলিল “মাঠাকুরাণী আজকার সমাচার আমি প্রায় আগাগোড়া সব জানি, আপনাকে বলি শুনুন।”

কমলাদেবী বলিলেন। “বাপু তুমি আগে ইন্দুমতীর কুশল বল। তুমি কি জান ইন্দুমতী আমার কি অবস্থায় আছে। আহা! সে বালিকা আমার গর্ভগ্রস্থত পুত্র-পেজা আমার স্নেহ করে। আমি পুত্র গর্ভে ধরিয়াছিলাম বটে। সে বত দিন অবোধ ছিল, ততদিন আমার বশীভূত রহিল। একটু মাথা বাড়া দিয়া উঠিয়াই অমনি সব মায়া কাটিয়া কোথায় গেল। আমাকে অন্ধ করিল। আহা! মহারাজ তারই শোকে হঠাৎ শরীর ত্যাগ করিলেন। আমি অনাথা হইলাম। প্রতাপ এখন অনাথা দেখে কত কথা বলে পাঠায়। আমার অন্ধের ভগ্নযষ্টি ইন্দুমতী এখন কুশলে থাকিলেই ভাল। কচুরায় বাছা যেখানে থাকুন জীবনে বাঁচিয়া থাকিলেই ভাল।” বলিতে বলিতে কমলা

দেবীর মনে জেহের উদ্বেগ হইল। কমলাদেবী কিছুক্ষণ মোনবতী হয়ে অশ্রুপরিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। “বাপু নসিরাম! তুমি মহারাজের সময়ের লোক। তুমি এখন আমার এক জন দুঃখের সাক্ষী। অনঙ্গপলও একবার এ বিপদে দেখা দিল না! বোধ হয় তাহার কোন রোগ হয়েছে, নতুবা সে কখন রায়গড়ের বিপদে নিশ্চিত থাকিবার লোক নহে। বাপু ইন্দুমতীর কি সমাচার জান বল।”

নসিরাম বলিল। “মা ঠাকুরানী আজ বৈকালে যখন মা হইতে পাল লইয়া আসিতেছিলাম, তখন খালে কএক থানা নৌকা আসিতে দেখিলাম। আমার প্রথমে বোধ হইল সে সব মহাজনের নৌকা, কিন্তু এখন বেশ বুঝলাম, ফিরিজিরা ঐ সকল নৌকায় করে এসেছিল। সন্ধ্যার পর রায়গড়ে প্রায় তিন শত লোক এসে অতিথি হইল। তখনই আমার সন্দেহ হইল। কিন্তু কি করি ইন্দুমতী দেবীর আজ্ঞায় তাহা-দিগের সবলকে বাসা দেওয়া গেল ও যত্নে সেবাও করা গেল। ইহাদিগের আসবার পূর্বে এক জন বর্ণ্যবৃত্ত সমাজ অথরোহী যোদ্ধা আসিয়া অতিথি হইয়াছিল। সেও তাহাদিগের বাসার পাশে রহিল। কিছু রাত্রি হইলে আর দুইজন অথরোহী আসিয়া অতিথি হইল। তাহাদিগের আহ্বান হইলে ইন্দুমতী দেবী আপন আবাসে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বর্ণ্যবৃত্ত অতিথি আমার ঘরে এসে আপন পরিচয় দিতে আমি জানিলাম সে আমার এক জন অত্যন্ত অস্বীয়। পরে তার অনুরোধে আমি আয়ুধাগার হতে দুইটা তাম্র ধৌহবর্ম্বা নিয়ে দিলুম ও অস্ত্রাশ্রয় যে যে অস্ত্র তাহাদিগের প্রয়োজন হইল, তাহাও আনিয়া দিলাম। আমার আশ্রয়টি আমার কেবল রাত্রিতে সস্ত্র হইয়া সতর্ক থাকিতে বলিল। কিছু ভাবিল না। সকলে সুপ্ত হইলে দেখি তিন শত অতিথি জাগিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহাদিগকে সেই অবস্থ দেখিয়া আপনি একখানি ওল-বারী ও একটি লাঠি লইয়া আমার আশ্রয়ের ঘরে গেলাম। দেখি আমার আশ্রয় ঘরে নাই। আর দুই জনা অথরোহীও নাই। আর অশ্রুও সেখানে নাই।”

কমলাদেবী বলিলেন। “বাপু! এটা তবে তোমার আশ্রয়ের কর্ম্ম। তোমার ইটী করা কি ভাল হয়েছে? না তোমারই বাকি দেখ, তুমি কেমনে জানিবে যে, তাহার মনে এই ছিল। তুমি বহুকালের পুরাতন লোক, তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দেওয়া ভাল হয় নাই, কিন্তু তুমি শোধ হয় বুঝিতে পার নাই। দয়াস্বভাব বশত চাহিবামাত্র দিয়াছ।”

নসিরাম বলিল। “মা ঠাকুরানী! আমি বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করি নাই, আমার আশ্রয়ও কিছু অস্ত্রায় করে নাই।”

কমলাদেবী বলিলেন। “হাঁ বাপু, ঠিক বলিয়াছ। তাহাদিগের জীবিকাই পরজন্ম লুট করা, ইহাতে তাহাদের সকল কৌশল চেষ্টা পাওয়াই কর্তব্য; তা তুমি

যাপু তাহার মনের ভিতর ত বাইতে পার :।? সরল মানুষ, যেমন সে চাহিয়াছে, অমনি অস্ত্র আনিয়া দিলে। আমার নিক অস্ত্র চাহিলে আমিও দিতাম। ভাল করিয়াছ, অস্ত্র না দিলে, অতিথি দেবার দোষ পড়িত। অতিথি যাহা চাহিবে, তোমাদিগের উপর আজ্ঞা আছে তাহা আনিয়া দিবে। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট আছি। কল্যাণপ্রাপ্তে আমি তোমাকে পুরস্কার দিব।”

কমলাদেবী যাহা বলিলেন, অন্তরালে হইলে তাহা ব্যঙ্গ বোধ করিয়া ভয় পাইত। নসিরাম কমলাদেবীকে বিশেষ জানিত। কমলাদেবী অত্যন্ত সরলা, এমন কি সংসারের কিছুমাত্র বোঝেন না। যে যাহা বলে, কমলাদেবী তাহাই মানিয়া লন। সকলকেই আপনার মত সরলস্বভাব জ্ঞান করেন : ভয়ে কখন কাহার কথাই অমত প্রকাশ করেন নাই। রোষের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার সারল্য এত অধিক ছিল যে, বালিশা দোষে লিপ্ত। নসিরাম বলিল। “মঠাবুরাণি, তার পর দেখি যে ইন্দুমতী আসবারে তাহারা দলবদ্ধ আসিয়া দাঁড়াইল। অপর প্রায় দেড়শত লোক দ্বারের কিছু অন্তরে দাঁড়াইল। আসবারে একজন মাত্র যাইয়া কবাটে আঘাত করিয়া বিকট আর্তনাদ করিতে লাগিল। আমি দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অস্ত্রসর হইতেছিলাম। এমন সময় দ্বার খুলিয়া একজন সহচরী সঙ্গে ইন্দুমতী দেবী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। যে ব্যক্তি আর্তনাদ করিতেছিল, সে ইন্দুমতী দেবাকে দেখিয়া তাহার পদধারণ করিয়া বলিল। “দেবী আপনার অনুগ্রহে আমরা এ গড়ে রাত্রিবাস করিতে পাইয়াছি ও যথোচিত সংকারলাভও করিয়াছি, কিন্তু আমাদের একজনের অত্যন্ত ব্যামোহ হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন চলুন।”

ইন্দুমতী অমনি বলিলেন। “চল যাইতেছি।” সহচরীকে বলিলেন। “তুমি আমার ওড়নাটা আনিয়া দাও।”

সহচরী যেমন ওড়না আনিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, অমনি সেই আট জনে ইন্দুমতীকে ধরিয়া আন্তরনে লইয়া গেল। ইন্দুমতী দেবী একবারমাত্র ‘মা’ বলিয়া ডাকিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মূখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি তাহাদিগের হঠিন হস্তে অচেতন হইলেন। তাহারই পরে বাকি দেড়শত লোক দৌড়িয়া দ্বারভিত্তিমুখে চলিল। সহচরী ওড়না আনিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ইহার দ্বার ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। এমন সময় দূর হইতে আমার আশ্রয় ও অপর দুই জন অসারোহী তুরী ধনি করিল। তাহারই পরে দীর্ঘ দীর্ঘ উল্লা জালিয়া দ্বার ভাঙ্গিল। দ্বারে অন্তঃপুরের প্রহরীরা সঙ্গে অনেকজন বুদ্ধ হইল, পশ্চাৎ হইতে ভিন অসারোহী গুলি চালাইতে লাগিল।”

কমলাদেবী বলিলেন । “তবে পাপেরা আমার ইন্দুমতী লইয়া গিয়াছে ।” কমলা দেবীর নির্মূল বদন অশ্রুবারিতে আশ্রাবিত হইল । ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন । “নসিরাম এতকালে আমি অবীরা হইলাম । এখন আমার মৃত্যু হইলেই ভাল । সে অঝোরোহী তিন জন কোথায় ?”

নসিরাম বলিল । “তাঁহারা তিনজনই যুদ্ধে পড়িয়াছে । আমি জানি না, জীবিত আছে কি মরিয়া গিয়াছে ।”

কমলাদেবী বলিলেন : “অনঙ্গপাল দেব সমাচার পাইয়াছেন ।”

নসিরাম বলিল । “তিনি সমাচার পাইবামাত্র অসি করে আসিয়াছিলেন । তাঁহার কণ্ঠা প্রভাবতী দেবীও আসিয়াছিলেন । উভয়ে অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বন্দী হইয়াছেন । পাপেরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ।”

কমলা বলিলেন । “তবে আমি নিরাশ্রয় হইলাম ।”

নসিরাম কমলাদেবীকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া নীরব হইল । কতক্ষণের পর কমলাদেবী বলিলেন । “নসিরাম বাপু তুমি স্বয়ং যাইয়া সে তিন জন অঝোরোহীর বিধিমতে সেবা কর ।”

নসিরাম বলিল । “ব্রহ্ম গুরুমহাশয়ও যুদ্ধে পড়িয়াছেন ।”

কমলাদেবী বলিলেন : “কল্যাণ প্রাতে আমি স্বয়ং যাইয়া সকলকে দেখিব । ইতোমধ্যে তোমায় সকল ভার দিলাম । তজ্জাবধারণ কর ।” নসিরাম শির নামাইয়া অভিবাदनপূর্বক বর হইতে বাহিরে গেল ।

নসিরাম বাহিরে আসিয়া অভিধিশালায় যাইয়া দেখে, যে শঙ্কর সকল বোদ্ধাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পর্ধ্যক্ষে শয়ন করিয়াছে । বর্ধ্যবৃত্ত পুরুষ, স্ত্রীকুমার ও মালিকরাজ একটি ভিন্ন ঘরে আপন আপন পর্ধ্যক্ষে বসিয়া আছেন । নসিরাম নিকটস্থ হইলে বর্ধ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন । “নসিরাম রাত্রি কত আছে ?”

নসিরাম বলিল . “মহাশয় বোধ হয় আর ছয় দণ্ড রাত্রি আছে । আপনারা বিশ্রাম করুন ।”

স্ত্রীকুমার বলিল । “মহাশয় ইন্দুমতীর কোন সমাচার বলিতে পারেন ?”

নসিরাম বলিল । “মহাশয় ইন্দুমতী দেবী, অনঙ্গপাল ও তাঁহার কণ্ঠা প্রভাবতী দেবী ফির্কিগিরের হস্তে বন্দী হইয়াছেন । দুই ফির্কিরী তাঁহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে ।”

মালিকরাজ বলিল । “আমার তাগাই বোধ হইয়াছিল ।”

বর্ধ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন । “তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । আমি তাহাদিগের তজ্জাবধারণে যাই । আপনারা কিছুদিন রায়গড়ে থাকিয়া সুস্থ হউন ।”

‘স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় আমি আপনার সঙ্গে যাইব। আমি বধেই নুহ হই-
রাছি। আমার অন্ত্রে তত আঘাত লাগে নাই। আমি নিতান্ত খাসহীন হইয়াছিলাম
বলিয়া অচেতন হইয়াছিলাম।”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়ের যাওয়া আবশ্যক হইতেছে না। বিশেষতঃ
আপনি এক্ষণে অসুস্থ আছেন। ব্যস্ত হইবেন না। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না আমাকে
অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলুন।”

মালিকরাজ বলিল। “স্বর্ধাকুমার তোমার এ অবস্থায় কোন মতেই যাওয়া হইতে
পারে না। তুমি সুস্থ না হইলে, কে তোমার এমত শত্রু আছে যে, তোমায় পুনর্দে-
শেরণ করে।” (বর্ষাবৃত পুরুষের প্রতি) “মহাশয়ইবা একা কি বলিয়া এখন
যাইতে চাহিতেছেন? প্রথমতঃ মহাশয় রাজা মানসিংহের বশীভূত, তিনি আপনাকে
যে কর্মে পাঠাইয়াছেন, মহাশয়ের তাহা সাধন করা উচিত। মহাশয় এখন কি তত্ত্ব
করিতে যাইবেন। আর একক যাইয়াই বা কি কর্ম সিদ্ধ করিবেন? আমার পরামর্শ
শুনুন। আপনি যে কর্মে আসিয়াছেন, তাহা প্রথমে সিদ্ধ করুন, পরে মহারাজ
মানসিংহের নিকট এ সকল সমাচার দিন। তিনি তাহাতে যেমত আজ্ঞা করেন,
তাহা করিবেন।”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মালিকরাজ তুমিত জান, আমার যে উদ্দেশ্যে এ তরুণে
আসা। এখন কেবল মহারাজ মানসিংহের সৈন্ত লাভাশয় আমার স্থানান্তরে যাওয়া -
কিন্তু বোধ করি তাহারা সন্মুখপে রওয়ানা হইবে। ফলে আমাকে একবার অন্য
রাষ্ট্রেই বজবজে গিয়া সমাচার লইতে হইবে। এখানে নৌকা পাওয়া যাইতে পারে।
নসিরাং আমার একখান শীতলামী নৌকা আনিয়া দিতে হইবে, শীঘ্র যাও।”

নসিরাং বলিল। “মহাশয় কি রাষ্ট্রেও রওয়ানা হইবেন?”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হঁ। আমি এক্ষণেই যাইব।”

নসিরাং বলিল। “যে আজ্ঞা। আমি শীঘ্র আনিতেছি।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় কখন একা যাইতে পারিবেন না। আমি একক
এখানে কোন ক্রমেই থাকিব না।”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। স্বর্ধাকুমার তুমি বালকের স্থায় ব্যবহার করিও না।
আপনার প্রাণে এক্ষণে অবত্ব করা কর্তব্য নহে। তুমি এখন উঠিতে পার না, কি
প্রকারে রাজ্যকট্ট সহ করিবে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না
করিয়া আমি মানসিংহের নিকট যাইব না।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “ভাল বলিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর উদ্ধারের কি উপায়

চিভিলেন? আমার অপেক্ষা ইন্দুমতীর কুশল আমার অধিক প্রিয়। মহাশয় আমাকে তাহার কিছু কহিয়া দিন।”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “স্বর্গ্যকুমার তোমার অপেক্ষা ইন্দুমতীর উদ্ধারে আমার অধিক বদ্ধ। আমি কেবল সেই চিন্তাতেই মগ্ন আছি, কিন্তু কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন ইন্দুমতীকে লইয়া তাহার কোথায় গেল, তাহা জানা আবশ্যক। নতুবা অন্ধকারে ঘুরিলে কি ফলোদয়। মালিকরাজ! তুমি কি বোধ কর?”

মালিকরাজ বলিল। “আগে লোকপরম্পরায় সমাচার লওয়া কষ্টব্য, কিন্তু সমাচার আনিবার লোক দেখিতে পাই না। তাহার। কল্য প্রাতে প্রতাপাদিত্যের নিকট পৌছিবেন। তবেইত আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ না করলে ইন্দুমতী পাণ্ডনের আর কোন উপায় দেখি না।”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “এখন তোমরা এই খানে আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি একবার বজ্রবজ্র হইতে ফিরিয়া আসি।”

৫. মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! আমাদের এখন এখানে অবস্থান করা বড় সুবিধার কথা নহে। আমরা জানি, মহারাজ প্রতাপাদিত্য কল্যই এখানে সসৈন্তে আসিবেন, তখন আমাদের এখানে দেখিলে আমরা কি বলিব! আমরা শুণ্ডভাবে এখানে আসিয়াছি।”

স্বর্গ্যকুমার বলিল। “তাহাতে আমার ভয় নাই। প্রতাপাদিত্যকে বলিব, আমি ইন্দুমতীকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম।”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “সেটা বড় ভাল কায হইতেছে না। এখন স্পষ্ট বিবাদ করলে কোন ক্রমেই মঙ্গল নহবে না; অতএব আমি বলি, তোমরা কল্য প্রাতেই অঙ্গে অঙ্গে লক্ষরপুরে রওয়ানা হও।”

৬. স্বর্গ্যকুমার বলিল। “আমি আর সে পাপের মুখাবলোকন করিব না। আমার বাহা অন্তরে আছে, তাহাই হইবে, ইহাতে চিন্তিত হওয়া মুর্থের কৰ্ম্ম।”

নসিরাম আসিয়া বলিল। “মহাশয়! নৌকা প্রস্তুত আছে; অনুমতি হয়, নৌকার অব্যাদি প্রয়োজন যত পাঠাইয়া দি।”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “নসিরাম! আমি তোমার প্রেমে বদ্ধ হইলাম। এত সীত্র কোথা হইতে নৌকা পাইলে?”

নসিরাম বলিল। “মহাশয়! ফিরিঙ্গিরা লোকভাববশত এ নৌকাখানি এখানে ফেলিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ভাল বোদ্ধা লগুনাহক পঁচিশ জন মহাশয়ের সঙ্গে নিব।”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন। “নসিরাম! নৌকার কত তরুণ (১) আছে?”

নসিরাম বলিল। “মহাশয়! নৌকার দুই শত ডব্বও আছে।”

বর্ধারত বলিলেন। “নসিরাম! তুমি আমাকে একশত আশি জন বাহক দিলে, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই।”

নসিরাম বলিল। “যে আজ্ঞা, আমি তাহাই আনিয়া দিতেছি। সম্প্রতি সকল সেনারা উপস্থিত হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে উপযুক্ত দেখিয়া বাহিয়া দিতেছি।”

নসিরাম বাহক অবশেষে চলিয়া গেলে বল্লভ অঙ্গে অঙ্গে যে ঘরে স্বর্ধাকুমারেরা ছিল তথায় আনিয়া উপস্থিত হইল। কিছুকণ ধারে দাঁড়াইয়া বলিল। “মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই বটে, কিন্তু রায়গড়ের প্রকৃত বন্ধু জ্ঞানে আমি মহাশয়দিগকে আত্মীয় বোধ করিলাম; আমি অন্য রাত্রে রায়গড়ের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম, বধাসাধ্য রকমে নিহত ছিলাম, কিন্তু কি করি, হীনবল।”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়কে আমি যুদ্ধকালীন দেখিয়াছিলাম। মহাশয় বীরের মত ব্যবহার করিয়াছেন।”

বল্লভ বলিল। “মহাশয়! আমার নাম বল্লভ, আমি রায়গড়ের প্রতাপানিত গুরু মহাশয়। গ্রামের বালকবৃন্দ আমার নিকট শিক্ষা পাইতে আসে; কিন্তু আমার কি সাধ্য, যে বিদ্যাদান করি, কোন মতে শিশুদিগকে আটক রাখা। শুনিলাম মহাশয়েরা ইন্দুমতীর উদ্ধার চেষ্টা পাইতেছেন। আমিও তাহার অত্যন্ত উৎসুক। সত্য বলিতে; কি, আমার আর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি প্রভাবতী ও তাঁহার পিতার বিশেষ আত্মীয়; তাঁহাদিগকে উদ্ধারও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; অমুমতি করেন ও সাহস করিতে পারি না, আপনাদিগের সঙ্গে বাই, উদ্ধার করিতে পারি না পারি, একবার সেই চেষ্টায় নিযুক্ত হই ও হয় ত ফিরিঙ্গিদের দ্বারে প্রাণ হারাই, তাহা হইলেই আমার স্বখে দুঃখ হইবে। মনে জানিব যে, সন্তুদ্দেশে প্রাণ হারাইলাম।”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! আমরা আপনার আশ্রয়দানে অত্যন্ত ঋণী হইলাম। ইহাপেকা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আপনি স্বাগত হউন, কিন্তু আমরা এক্ষণে উদ্ধারের কোন উপায় চিন্তায় কৃতকাৰ্য্য হই নাই। আমরা জানি, না যে, পাপেরা এক্ষণে কোথায় গিয়াছে।”

বল্লভ বলিল। “মহাশয়! এ দীনদাস তাহা স্বকর্ণে অবগত হইয়াছে। যুদ্ধের পর আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু অতি শীঘ্রই চেতনা পাইলাম। উঠিয়া খালের তীরে গেলাম, তখন পাপেরা সব নৌকার বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে। শুণ্ণ ভাবে দ্রাহাদিগের নৌকার নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহাদিগের কথাবার্তার বাহা শুনিলাম।” বল্লভ একবার স্বরের চতুর্দিকে চাহিয়া ধামিল

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! শকা করিয়েন না, এখানে সকলেই আত্মীয় ও সহস্ররক্ষার পট্ট।”

বলন্ত বলিল। “মহাশয়! বুঝিলাম যে, এ ব্যাপারটির মূল মহারাজ প্রতাপাদিত্য। বলন্ত একবার বর্ধারূত পুরুষের মুখের দিকে চাহিল। বলিল। “মহাশয়! আরও শুনুন, হজুরমল বলিয়া কে একজন প্রতাপাদিত্যের লোকও আসিয়াছিল।” বলন্ত ধামিল।

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! হাঁ তার পর?”

বলন্ত বলিল। “মহাশয়! গঞ্জালিস এ দস্যুদিগের অধ্যক্ষ। অমুপরাম ইহা-দিগের একজন কর্তৃপক্ষ।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! আমরা এ সমাচারের জন্ত আপনার নিকট নিভাত্ত বাধিত হইলাম। এরূপ সমাচারে দস্যু ধরার অনেক সুবিধা হয় কিন্তু আপন যদি বন্দীলব লইয়া তাহারা কোথায় গেল, জানিতে পারিবেন, তাহা হইলে আমরা আরও আপ্যায়িত হইতাম।”

বলন্ত বলিল। “মহাশয় এত ব্যস্ত হইবেন না। এ শুক্রমহাশয় নিভাত্ত মুখ্য মহে, আমি তাহাও তনিয়াছি। ইন্দুমতী ও প্রতাবতীকে নৌকার উঠাইলে হজুরমল, বলিল “গঞ্জালিস আমার পরামর্শ শুন। ইন্দুমতীকে আমার দাও, আমি তাহাকে লইয়া বাই। তুমি প্রতাবতী লইয়া সন্তুষ্ট হও।” গঞ্জালিস তাহাতে বলিল। “হজুরমল আমি প্রতাবতী পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। এটিও কিছু মন্দ নহে, কিন্তু এখন সকলকেই লইয়া সনদীপে বাই।” অমুপরাম বলিল। “তোমরা ত্রৈণ ক্রী লইয়া কলহ কর। কিন্তু ঐ লোকটি আমার। মন্ত্রী যথেষ্ট ধন আছে, আমি তাহাকে লইব।”

হজুরমল বলিল। “তবে আমি গিয়া রাজাকে কি বলিব।”

গঞ্জালিস বলিল। “বলিও যে মহারাজ ইন্দুমতীকে হরণকালে একজন রাক্ষসের লোক তাহাকে অন্ত্রাঘাতে ছেদ করিল। আমরা মৃত শরীর নৌকার আনিতেছিলাম; পরে তাহিলাম, মৃত শরীরে কি প্রয়োজন। জলে ফেলিয়া দিলাম।”

হজুরমল বলিল। “বেশ বলিয়াছ, আমি তাহাই বলিব। দুই দিন দিনের মধ্যে আমি সনদীপে বাইরা হাজির হইতেছি। আর রাজা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব?”

গঞ্জালিস বলিল। “বলিও গঞ্জালিস জীবিত ইন্দুমতীকে মহাশয়ের নিকট আনিতে পারিল না বলিয়া লজ্জার সনদীপে গেল। শীঘ্র আসিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।” বলন্ত নিভন্ত হইল। বর্ধারূত পুরুষ একমনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, বাক্য শেষ

হইলে হেঁটমুণ্ডে বসিলেন। স্বর্ধাকুমার পর্ধ্যক হইতে উঠিয়া বসিল। মালিকরাজ অধাক হইয়া রহিলেন।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় পাণ্ডিদিগের আত্মীয়তা এইরূপই হইয়া থাকে।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “হজুরমল অভ্যন্ত পাশাঙ্গা, মুহলমানদিগের কোন ধর্ম জ্ঞান নাই। এরূপ আচরণ ত কখন কর্ণেও শুনি নাই। এ মর্যাদামের তুল্য বিশ্বাস-বাতক আর সংসারে নাই। কিন্তু প্রভাপাদিত্যের উপযুক্ত শান্তি হইল।” (বলভের প্রেতি) “মহাশয় আপনার সমাচারে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হইলাম। চলুন এই আমরা নৌকার রওয়ানা হইব। আমি অগ্রে বজবজে বাইব, সেখানে মহারাজ মানসিংহের সৈন্ত আগমনের কথা আছে। আসিয়া থাকে ভাল নতুবা একদিন অপেক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া রাখিয়া বাইব। যেমন সৈন্ত আসিবে, অমনি লনঘোষে রওয়ানা হইবে। ইতোমধ্যে রাজগড়ের সেনা সংগ্রহ আবশ্যক। মহাশয় দেখিয়াছেন, কতগুলি সেনা এক্ষণে রাজগড়ে আসিয়াছে?”

বলভ বলিল। “আমার বোধ হয় তুই সহস্র অশ্বারোহী ও সহস্র পদাতি। কিন্তু আরও সেনা আসিবে। বড় বিলম্ব হইবে না।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “আর কত সেনা অন্য রাত্রে আসিবে বোধ করেন?”

বলভ বলিল। “মহাশয় বোধ হয় আরও ছয় সাত সহস্র পদাতি ও তিন চারি সহস্র অশ্বারোহী আসিবে।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “ভাল ইহাদিগের যাত্রার উপায় কি? এখানে ত অধিক নৌকা পাওয়া বাইবে না।”

এমত সময় নসিরাম আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল। “মহাশয় নৌকা বাহক তুই শত জন প্রেরিত আছে। তাহাদিগের সঙ্গে বথেষ্ট অস্ত্রও আছে। অনুমতি করেন আরও অস্ত্র দি।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “নসিরাম! এত লোকে আমার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। তুমি বলবান ও সোৎসুক দেখিয়া দেড় শত লোক আমার লাও। যত গোলা গুলি ও বারুদ তোপ ও বন্দুক নিতে পার নৌকার লাও। বাকি লোক লইয়া অন্য প্রত্যুবে বজবজ রওনা হইও। আমার সহস্র অশ্বারোহী ও ছয় হাজার পদাতি সেনা আবশ্যক। বজবজের গড়ে কল্য হুই প্রহরের মধ্যে পৌছিতে চাহ। যে বত অস্ত্র লইতে পারি দিবে। দেখ, যেন অস্ত্রাভাব না হয়। আমরা এক্ষণেই বজবজে যাত্রা করিলাম। (স্বর্ধাকুমারের প্রেতি) “মহাশয় তবে একান্ত বাইবেন ও চলুন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মহাশয় আমাকে আর ভিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি না বাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন । “মহাশয়! আমরাগিরের সঙ্গে বাইতে ইচ্ছা হয় ত প্রস্তুত হউন । আমরা এই ক্ষণেই রওয়ানা হইব :”

বলন্ত বলিল । “মহাশয় আমি প্রস্তুত আছি । অনুমতি হইলেই অগ্রসর হই ।”

স্বর্ধাকুমার আপন পর্ধ্যাক্ত হইতে গাত্রোথান করিলেন । মালিকরাজ অগ্রসর হইয়া তাঁহার বন্দ্যাদি তাঁহাকে দিল । স্বর্ধাকুমার বটে বন্দ্যবৃত্ত হইলেন । কেবল শিরে শিরস্ত্রাণ দিলেন না । শিরস্ত্রাণটি হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন । বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ দাঁড়াইয়া স্বর্ধাকুমারের হাত ধরিলেন । স্বর্ধাকুমার আপন দক্ষিণ হস্ত তাঁহাকে দিলেন । বামহস্ত মালিকরাজ ধরিল । তিনজনে পরস্পরের হস্ত ধরিয়া রায়গড়ের অভিমুখি শালা হইতে বহির্গত হইলেন । বলন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । ক্রমে রায়গড়ের সিংহদ্বার পার হইলেন । ক্রমে খালের তীরে উপস্থিত হইলেন । পরে নৌকায় আরোহণ করিলেন । অমল বিলম্বে নসিরাম দেড়শত লোক লইয়া তীরে উপস্থিত হইল । তাহারা সকলে যথাসাধ্য অস্ত্রাধির বোঝা লইয়া নৌকায় উঠিল । বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ সকলকে এক এক তোরণে নিযুক্ত করিলেন । বাকি প্রায় অর্ধেকের অধিক স্থানে অস্ত্রাদি রাখিয়া স্বয়ং নৌকায় যজ্ঞা উঠাইয়া অগ্রধ্বনি করিলেন । অমনি দেড়শত বাহকে এক কালে “জয় কালী” বলিয়া দণ্ডক্ষেপ করিল । তরলী বেগে যেন লম্প দিল । এক বার দণ্ডক্ষেপ প্রায় হই রশ্মি পথ বহিয়া গেল । আবার বাহকেরা এক কালে দ্বিতীয়বার দণ্ডক্ষেপ করিল । তরলী দমকে দমকে চলিতে লাগিল । কিছু দূর এইমত বাইয়া একভাবে তেজে চলিল । ক্রমে খাল বাহিয়া চড়েলের মোহনায় উপস্থিত হইল । সেখা হইতে নক্ষত্রবেগে কাটি গঙ্গায় পৌঁছিয়া নৌকা উত্তরবাহিনী হইল । ক্রমে বজ্রবজের দুর্গের নিম্নে আসিয়া পৌঁছিল । তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে । বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ দূর হইতে বজ্রবজের দুর্গের নিকট অনেক জাহাজাদির সমাগম দেখিয়া কিছু হত হইলেন । স্বর্ধাকুমারকে বলিলেন । “স্বর্ধাকুমার বোধ হয় আমরা কৃতকার্য হইব । এ সকল জাহাজ বোধ হয় দিল্লীরের । মহারাজা মানসিংহ আসিয়া থাকিবেন । তুমি একবার এই নৌকায় বস আমি অতি নীত্ৰই ফিরিয়া আসিতেছি ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “আপনার আসা আমি অপেক্ষা করি, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, একবার মহারাজ বচুরায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি । আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দিলে অত্যন্ত বাঞ্ছিত হই ।”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ বলিলেন । “স্বর্ধাকুমার ব্যস্ত হইও না । ক্রমে সকলের সঙ্গে আলাপ হইবে ।”

বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ নৌকা তীরে লাগাইতে বলিলেন । বাহকেরা নৌকা তীরে লাগাইল । বন্দ্যবৃত্ত পুরুষ নামিয়া চলিয়া গেলেন ।

মালিকরাজ বলিল । “স্বর্ধাকুমার তোমার বোধ করি কোন কষ্ট হয় নাই । মৌকার গমন অত্যন্ত সুখকর । মৌবাজায় রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “মালিকরাজ আমার রোগের অনেক শান্তি বোধ হইতেছে । বায়ু সেবনে আমার মস্তক শীতল হইয়াছে । ক্ষতের আর তত যন্ত্রণা নাই ।”

মালিকরাজ বলিল । “তোমার ইচ্ছা হয় ত শয়ন কর । কীণবল হইলে বিজ্ঞান প্রয়োজন ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “মালিকরাজ আমার এক্ষণে বিজ্ঞানের তত প্রয়োজন নাই । আমার মন অত্যন্ত সোৎসুক হইয়াছে । এখন কোন মতে ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলে আমার মনের একতা ভার দূর হয় ।”

মালিকরাজ বলিল । “যদি মহারাজ মানসিংহ আসিয়া পৌছিয়া থাকেন, তবেই আমাদিগের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন জানিবা ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “এই লোকটিও বলিল, বোধ হয় এ সকল দিল্লীধরের জাহাজ । এটি কড় উদ্ভলোক । এমন দয়াদ্রুচিত্ত আমি আর কাহাকেও দেখি নাই । পরের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত । এ বোদ্ধা বৈরূপ রূপে মাতিয়াছিল, আমার বোধ হয় উভয় পক্ষের বোদ্ধার মধ্যে কেহই সেরূপ একতানচিত্ত ছিল না ।”

মালিকরাজ বলিল । “আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার কণামাত্রও স্বার্থ-সিদ্ধ হইল না । এ লোকটিকে আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে । ইহার নাম ধাম না জানি ল সুস্থ হইতে পারিতেছি না ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “মালিকরাজ তুমি একরূপ বালকের মত কথা করিলে কেন । যখন এটি বলিল যে তাহার নাম গোপনের কোন পণ আছে, তখন আর তাহার নাম জানিতে কৌতূহলক্রান্ত কেন হও !”

মালিকরাজ বলিল । “আমার এটি নিত্য কৌতূহল নহে, আমার সন্দেহ হইতেছে । এ ব্যক্তি বৈরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিত্য সামান্ত লোকের কৰ্ম্ম নহে । এ অবশ্য কোন প্রধান রাজপুরুষ । আমার বোধ হয় মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগদসিংহ । তাহারই একরূপ রণলক্ষতা শুনিয়াছি ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “ইনি যে হউন, আমার স্থলয়ন্ত্রণ হইতেছেন । আমি তাঁহার নাম জানিতে ভিলেক উৎসুক মহি । আমার এখনকার একমাত্র অভিলষ যে, দিবারাত্রি এই বীরের সহবাস করি । একরূপ অসামান্ত বীর আমি কখন দেখি নাই । মালিকরাজ ! আমার এখনই তাঁহার অনর্শনে কষ্ট হইতেছে ।”

মালিকরাজ হাসিয়া বলিল । “স্বর্ধাকুমার তোমার কথার আমার হিংসা হইতেছে । এ আবার আমার প্রেমের অংশী হইতে আসিল ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিকরাজ, তুমি মূর্খ, তোমার প্রেমের অংশী কে হইতে পারে? সে তোমার প্রেমাস্পদ হইয়াছে। তোমারও তাহার অদর্শনে অবশ্য কষ্ট হইতেছে।”

মালিকরাজ বলিল। “আঃ বড়ই কষ্ট। কষ্টটা কিসের? তাহার সঙ্গে আমার কতকণের আশ্রয়তা? যে, তাহার অবর্তমানে আমার কষ্ট হইবে। লোকের সঙ্গে এত শীঘ্র আশ্রয়তা জন্মান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিক! সাধে তোমাকে মূর্খ বলি। বহুদিনের পরিচয় তোমার নিকট বস্তুতা জন্মাইবার প্রামাণ্য সময়। বিশ বৎসরে যে আত্মীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, অন্য তিন চার দশে তাহার সহস্র গুণ পরিচয় পাইলাম। ইহাতেও যদি প্রেম না জন্মে, তবে সে প্রেমরহস্য লোকে কণামাত্রও প্রেম নাই।”

মালিকরাজ বলিল। “ভালা প্রেম শিখিয়াছ। তোমার নিকট হুই দণ্ড নিশ্চিত হয়ে বসিবার যো নাই। একটু অবকাশ পাইলেই আইবড় বুড়া যেমন বিবাহের কথায় মত্ত হয়, তুমি তেমনি প্রেম প্রেম করিয়া ভ্যক্ত কর। তোমার ও প্রেম হইলোকের ঘোষণা নহে। সে বৈকুণ্ঠে পাঠাও। সেইখানেই ভাল শোভা পায়।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিকরাজ, তোমার সঙ্গে আমার এই কথা উপস্থিত হইলেই তুমি সঙ্গা এইরূপ অধঃ প্রকাশ করিয়া থাক। তোমার মন কখন ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিল না। আর বুঝিবার চেষ্টাও পাইবে না। বুঝাইলে আবার কর্ণপাতও করিবে না।”

মালিকরাজ বলিল। “ভাল এখন সে বুঝিবার সময় নাই, বারান্তরে সময় হইলে শুনা বাইবেক।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিকরাজ, তোমার এ কথা শুনিতে কখনই অবকাশ হয় না। তুমি সকলই বোঝ, তথাচ কেমন আপনার পণ, কখনই স্বীকার করিবে না। কিন্তু জান না যে প্রেমই আমাদের সকলকে একত্রে বাধিয়াছে। কেহই কাহার নহে, পিতা পুত্রে যেহেতু মূল প্রেম। পুত্র হইলেই কিছু পিতার প্রেমাস্পদ হয় না। স্ত্রী হইলেই পতির প্রেমাস্পদ হয় না। সেটি স্বতন্ত্র পদার্থ। এমন কি স্নেহ, ভক্তি, রক্তের টান, আশ্রয়তাকৃত স্মরণ সকলেই প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের আবির্ভূত হওয়ার রূপভেদে নামভেদ মাত্র।”

মালিকরাজ বলিল। “স্বর্ধাকুমার কাত্ত হও, তোমার আর বক্তৃতার কাজ নাই, বর্ষেই হইয়াছে। তুমি যে অল্প মাত্র অবকাশ পেলে তোমার একমাত্র বাণ ঝাড়িতে ছাড় না।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “সত্য আমি সুবিধা পাইলে আমার বাধি পদ ঝাড়িতে ছাড়ি না বটে, কিন্তু তুমিও ত আপনার ঝাড়ান মত জোল না। আমি কথাটি পাড়ি, তুমিও

অমনি ওড়াতে সংকল্প কর। এখন বল দেখি, কে সুযোগ ছাড়ে না। ভাল মনে কর আমিই যেন ভাল বস্তাব বশত হটক বা অকৃত্য বশত যেন ছিঁজ পাইলেই প্রকাশ পাই, কৈ তুমিও ত বিজ্ঞের মত এ বিষয়ে আমার একান্ত প্রীতি জানিয়া আপনি কখন ক্রান্ত হও না।”

মালিকরাজ বলিল। “স্বর্ধাকুমার তোমার ও সব পুরাতন কথা কি শুনিব? তোমার নিকট লক্ষ্যের শূনিয়াছি আর সকলের নিকটে শুনতে পাই।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিকরাজ তুমি কখন শুন নাই, শুনিলে এরূপ অবস্থ প্রকাশ করিতে না। সংসারে প্রেম ব্যতীত আর কি নিত্য আছে? প্রেমই সংসার বন্ধনের একমাত্র দৃঢ় শৃঙ্খল। প্রেমাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ সংসারে আমার চক্ষে আর কিছুই লগ্নে না।”

মালিকরাজ বলিল। “ঐ দেখ বর্ষাবৃত পুরুষটি দ্রুত আসিতেছেন। আমার বোধ হয় কোন কুশল সমাচার আছে।”

ক্রমে বর্ষাবৃত পুরুষ দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাবিকেরা নৌকা তীরে লাগাইল। বর্ষামৃত পুরুষ নৌকায় উঠিয়া বলিলেন, “নৌকা খুলিয়া দাও। বিলম্ব করিও না। চল আমরা সনদ্বীপে যাই।” সেনারা শীঘ্র ধ্বজ মারিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। বর্ষাবৃত পুরুষ আপনি এক দণ্ড লইয়া বাহিতে লাগিলেন। ক্রমে নৌকা/বহ বাহকের এককালে ভোরণক্ষেপ ও উত্তোলন ও দীর্ঘচ্ছন্দে ক্ষেপণ বশত নক্ষত্রবেগে চলিল। ক্রমে বজ্রবজ্রের দুর্গর প্রকাশ মুরচা দৃষ্টিগোচরের বহির্ভূত হইল। ক্রমে উভয়কূলের তরু গুহাদি বিপতীত নিকে তদনুযায়ী বেগে চলিতে লগিল ক্রমে কাটিনজাভাগ করিয়া ইহার চড়িয়ালের খালের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্রমে পূর্বাভিমুখে নৌকা বাহিতে লগিল। নৌকা এত অধিক বেগে চলিল যে তীরের রক্ষাদি আর কিছুমাত্র বোকা যায় না। অর্ধ দণ্ডের মধ্যে নৌকা চড়িয়ালের খল ভাগ করিয়া ঠাকুর পুতুর দিয়া অন্য গঙ্গায় পড়িল। নৌকা দক্ষিণ শাহিনী হইল। বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “স্বর্ধাকুমার, কুশল সমাচার তোমাকে এত কম বলি নাই। শুন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল “কি কুশল সমাচার আছে, আমায় বলুন।”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। মহারাজ মানসিংহ বজ্রবেগে ত আসিয়া পৌছিয়াছেন। পৌছিয়াই অন্য সাংসকালে একসহস্র অশ্বরোহী ও পাঁচসহস্র পদাতি সেনা সনদ্বীপে পাঠাইয়াছেন। তাহাদিগকে সনদ্বীপে দিয়া আমার অপেক্ষা করিতে করিয়া দিয়াছেন। আর চিন্তা নাই। আমরা অক্লেশে দম্নঃসিগকে পরাজয় করিব। আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, গীরগড় হইতে যে সকল সেনা আর্সিবেক তাহাদিগকেও সনদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। আমরা বোধ হয় বেলা এক দণ্ডের মধ্যে সনদ্বীপে পৌছিব।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “আমার এত দূর বন্ধ হইতে একটি ভার দূর হইল ।”

কর্ণধার বলিল । “মহাশয় এখন কোন্ দিকে যাইব ? আমি এ সকল পথ বিশেষ জ্ঞাত নহি ।” বর্ধারূত পুরুষ উঠিয়া দেখিলেন যে গঙ্গা এই স্থান হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন, অপর একটি শাখা পূর্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত । তাহিয়া বলিলেন । “চল পূর্বদিকেই যাও” কর্ণধার নৌকা ফিরাইল । নৌকা পূর্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া নক্ষত্র-বেগে চলিল । ক্রমে অপর একটি চতুষ্পদী গোড়ে আসিলে দক্ষিণবাহিনী শ্রোত দিয়া ক্রমে বাহিতে লাগিল । কিছুক্ষণ পরেই কাল সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল । বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন । “আমিও এ সকল পথ ভাল অবগত নহি । এইবার কিছু চিন্তা উপস্থিত হইল । ভাল তীর দিয়া পূর্বাভিমুখে চল ।” নৌকা ক্রমে পূর্বাভিমুখে বাহিতে বাহিতে অরুণোদয় হইল । স্বর্ধাকুমার পূর্বাভিমুখে হইয়া কুমারী ঋগ্বেদমূর্ত্তা কুশলতা ব্রাহ্মীমূর্ত্তা সাক্ষ্যাদেবীর উপাসনা করিতেছিলেন । দূরে কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ধ-ধান দেখিয়া বর্ধারূত পুরুষের দিকে চাহিলেন । তিনিও সেই সময় স্বর্ধাকুমারের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন । স্বর্ধাকুমারকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সমাচার ?” স্বর্ধাকুমার অসুখি দ্বারা পোতসমূহের দিকে লক্ষ্য করিল । বর্ধারূত পুরুষ কিছু দাঁড়াইয়া আপন প্রাতঃকৃত্য সাজ করিয়া বলিলেন । “আর ক্রত যাইবার প্রয়োজন নাই । ঐ দেখ সমুখে দিল্লীধরের পতাকা উড়িতেছে ।”

বাহকেরা বলিল । “মহাশয় অনুমতি করেন ত আমরা প্রাতঃকৃত্য করিয়া লই ।”

কর্ণধার বলিল । “সকলে এককালে তরুণ ত্যাগ করা ভাল নহে, কতকগুলি এখন সজ্জা কর, আবার তাহাদিগের সাজ হইলে অপরেরা আপন কৃত্য করিও ।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন । “আমাকে কর্ণ (১) দাঁও তুমি আপন প্রাতঃকৃত্য কর । কর্ণধার বর্ধারূত পুরুষকে কর্ণ দিয়া সজ্জার উপাসনায় নিযুক্ত হইল । ক্রমে নৌকা অর্ধবহানের সন্নিহিত হইল । ক্রমে সকল বাহকদিগেরও কৃত্য সমাপন হইল । নৌকা আবার পূর্ববেগে বাহিতে লাগিল । ক্রমশঃ পোতের পার্শ্বে আসিয়া যেমন মিসিল, অমনি বর্ধারূত পুরুষ আপন তুরী বাজাইলেন ও তাঁহারা পরেই “আল্লা হো আকবর, জিন্না জেলালেহ, ফতেঃ হো রোশনি দিল্লা কি’ প্রভৃতি কএক রকম দিল্লী সত্যার অভি-বাচন শব্দ করিলেন । অমনি পোতের উপর হইতে এক জন বারি হইল । বর্ধারূত পুরুষকে দেখিযামাত্র “আল্লা হো আকবর” বলিয়া অভিবাচন করিল । অমনি আর এক জন পোতের পার্শ্বে হইতে একটি শৃঙ্গালের অবতরণিকা নামাইয়া দিল । ডিঙ্গির লোকেরা পোতের পার্শ্বে লম্বমান কৌহ শৃঙ্গলে আপনাদিগের ডিঙ্গি বাঁধিল । বর্ধারূত

পুরুষ ক্রমশঃ শৃঙ্খল দিয়া পোতে উঠিলেন। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “সনদীপ কত দূর ? সেই লোকটি উত্তর দিল, “মহাশয় ঐ দেখা যাইতেছে, আর বড় অধিক দূর এক পোয়া মাত্র আছে।”

বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তুমি অপর দুই খান। জাহাজকে নীচ চলিতে বল। তোমরাও নীচ চল।” লোকটি উচ্চৈঃস্বরে কর্ণধারকে কি কহিল। অমনি পোতের প্রধান কুপকের (১) উপর হইতে একটা পতাকা উঠাইয়া দিল। অপর দুইখানার কুপক হইতেও সেইরূপ দুইটি পতাকা উঠাইল। অমনি পোত তিন খানি পার্শ্বপার্শ্বি মিলিয়া চলিতে লাগিল। ক্ষণেক সনদীপের তীরে আসিয়া মিলিল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তোমরা এখন দিল্লী ধরের পতাকা নামাইয়া উড়িয়ার পাঠানদিগের পতাকা উঠাও। অমনি তিন খানি পোতের কুপক হইতে দিল্লী ধরের চিহ্ন যুক্ত পতাকা নামান হইল ও উড়িয়ার পাঠানদিগের পতাকা উঠিল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ তীরে নামিলেন। তীরে নামিয়া বাজারে বাইরা সনদীপের সমস্ত সমাচার অবগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বৈদ্যনাথের গদিতে সনদীপের অবস্থা সকল অবগত হইলেন। ভজহারির সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল। সেও সকল সমাচার দিল ও বলিল “এক্ষণে বৈদ্যনাথের সেনারা একত্র হইয়াছে। অন্যই তাহারা গেডিজ আক্রমণ করিবে। বন্দ্যাবৃত পুরুষ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাকে কোন বিষয় ভাবিয়া বলিলেন না।” গদির গোমস্তার সঙ্গে দেখা করিয়া প্রায় একগুণ কাল পরামর্শ করিলেন, পরে আপনি অর্ধবপোতে আসিয়া সকল লোককে অবতীর্ণ হইতে কহিলেন। পেনার অবতীর্ণ হইয়া গদিতে উপস্থিত হইতে লাগিল, ক্রমে বেলা তিন চার ঘণ্টার পর সকল সেনা বাজারে পৌঁছিল। বাজারের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই উড়িয়া হইতে আগত বলিয়া সকলে পরিচয় দিল। গদির গোমস্তাও তাহার আপন সেনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকেও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে আজ্ঞা দিলেন। উত্তর সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে বাজারের বড়ই গোল হইল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ পরে পোত হইতে তোপ সকল নামাইতে লাগিলেন। ক্রমে সকল তোপ গদির সম্মুখে অধঃপৃষ্ঠে স্থাপিত হইল। হৃদয়কুমার প্রভৃতি ডিগির লোকেরাও ক্রমে অবতীর্ণ হইল, সকলে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সমাজ হইতে লাগিল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “দেখ এক্ষণে কোন মতেই আক্রমণ করা যাইতে পারে না। সকলে পথপ্রমে ক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে অস্ত্রত্যাগপূর্বক আহায়ের উপায় দেখা যাউক। প্রায় অর্দ্ধ রাজ্যে চন্দ্রোদয় হইবে। চন্দ্রোদয় হইলে গেডিজ আক্রমণ করা যাইবেক। ইত্যবসরে আমিও দুই এক জন লোক লইয়া গেডিজের অধিসন্ধি, দেবিয়া

আসি। সেনারা ছুট হইয়া আপন আপন অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। ক্ষণেক
জকলে আপন আপন আহরের উদ্যোগ পাইল। স্বর্ধাকুমার, বর্ধারত পুরুষ, মালিক-
রাজ ও বরভ বৈদ্যনাথের গোমস্তার নিকট আশ্রয় করিলেন। আহারাতে
বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “স্বর্ধাকুমার ভূমি একবার বিশ্বাস কর, আমি সকল
সমস্যার আনি।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমার অত্যন্ত কৌতুহল
হইতেছে।”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “তোমার এ অবস্থার বাওয়া প্রয়োজন নাই। ভূমি
বিশ্রাম কর, বরং রাত্রিতে আমাদিগের সঙ্গে যাইও।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না।”

বর্ধারত পুরুষ বলিল। “স্বর্ধাকুমার তোমার একা থাকা কিসে হইল? তোমার
নিকট মালিকরাজ থাকিবেন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “না আমি একান্তই তোমার সঙ্গে যাইব। আমার মন
নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “তবে চল কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে আমার বড়
চিন্তা হইতেছে। কি জানি কি ঘটে।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কোন চিন্তা করিও না। আমার কোন বিপদ হইবে না।
আমার জগৎ তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “আমি কি নিজ কষ্টে ভয় পাইতেছি। আমি তোমার
কষ্টে বড় ব্যথিত হই।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

বর্ধারত পুরুষ বলিল। “একান্ত যাইবে ত চল।” পরে বর্ধারত পুরুষ আপন
বর্ষ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেন। স্বর্ধাকুমার ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক
তাহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে গোমস্তার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। বর্ধারত
পুরুষ বদিত বর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা নামান্তর না দিয়া দেই নামে তাঁহাকে
ডাকিব। বর্ধারত পুরুষ তাহাকে মালিকরাজের সঙ্গে সেনা প্রস্তুত করণের পরামর্শ
করিতে আশ্রয় লিলেন। পরে উভয়ে গদি হইতে বহির্গত হইয়া বাজারে প্রবেশ
করিলেন। বাজারে গিয়া এ দোকান ও দোকান করিয়া বেড়াইতেছেন এমন সময়
আমাদিগের পুরাতন আত্মীয় বৃদ্ধা রেবতী এক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।
ইহাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইল। আদিয়া স্বর্ধাকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। স্বর্ধ-
কুমার বলিল। “মাতা এই টাকাটি লও আহা কি নিয়া পাইও।”

‘বৃদ্ধা রেবতী বলিল। “বাবা আমার টাকায় কি কাজ। তুমি টাকা তোমার কাছে রাখ, আমার কিছু খাবার বলিয়া দাও।”

হৃৎকুমার বলিল। “মাতা দোকানে তোমার যাহা প্রয়োজন হয় খাও, এ টাকাট লইয়া রাখ, প্রয়োজনমত ব্যয় করিও।”

রেবতী বলিল। “বাবা আমার সঙ্গে কাজ নাই। অদৃষ্ট মন্দ হইলে সঙ্কিত নষ্ট। কেন বাবা আমার কষ্ট বাড়াইবে। তুমি তোমার টাকা রাখ, আমি দোকানে এক পরসার জলপান খাই।”

বর্ধাবৃত পুরুষ দোকানীকে বলিল। “পরসারি ইনি যাহা চান, তাহা খাইতে দাও, আমরা মূল্য দিব।”

রেবতী বলিল। “বাবা আমি কিছুই খাব না। আমার এই লোকটির কথায় বড় শ্রীতি জন্মিল। আমার পেট পূর্ণ হইয়াছে। ঙঃ সংসারে কথার চেয়ে আর কি মিষ্ট আছে! বাবা আর একবার কথা কও!”

বর্ধাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মাতা তোমার কোথায় নিবাস?”

রেবতী বলিল। ‘বাপ, আমার নিবাস আবার কি? আমি হুংখিনী অনাথা আমার আবার বাস! আমি ত অরুদ্ধতী নই। আমার ত ঘোষন নাই। আমার ত রূপ নাই যে আমার নিবাস। অরুদ্ধতীর বাস না থাকিয়াও তাহার নিবাস আছে, এখন সে প্রাণসে প্রবেশ করিয়াছে। সে যেখানে যায় সেই তার বাস। সকলেই তার আশ্রয় করে। আবার আর হুটি তার চেয়েও রূপসী গেড়িজে এসেছে। তারা আবার সকলের মাথার মণি। আমি সকলের পায়েয় কাঁটা। আমি ধনহীন, রূপহীন।”

হৃৎকুমার বলিল। “মাতা তুমি হুংখ করিও না। তুমি আমাদের মস্তকের মণি। তোমার নাম কি?”

রেবতী বলিল। “আমাকে তুমি কেন চিনিবে? তোমরা বিদেশী মহাজন। আমি যদি অরুদ্ধতীর মত হইতাম, তবে সকলে আমায় না চিনিয়াও আমায় আলাপে পর্ব্ব করিত। সময়ে সব করে। এখন যে আমায় চেনে সেও আমায় ভুলিয়া যায়।”

বর্ধাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মাতা আমরা তোমার কখন দেখি নাই। কেমনে চিনিব?”

রেবতী বলিল। ‘বৈদ্যনাথ কি কখন অরুদ্ধতীকে পূর্বে দেখিয়াছিল, যে তাহাকে চিনিল। বাপু ও সব তোমাদের দোষ নয়। ও সব সময়ে করে। গ্রহণে করে। ঙঃ তোমরা ঙঃ। তোমাদিগের নিকট থাকিয়া আমার কি হইবে?

রেবতী মুখ ফিরাইয়া গমনোদ্ভোগ করিল বর্ধাবৃত পুরুষ তাহার সম্মুখে গিয়া

বলিলেন । “মাতা তুমি কোথায় যাও । আহার করিয়া যাও । তুমি আহার না করিলে আমার অত্যন্ত দুঃখিত হইব । আমাদিগের উপর ক্রুত হইও না ।”

রেবতী বলিল । “কেন বাপু দম্ভাও, বধেষ্ট আগ্রাস্তা হইয়াছে । আমি সকলের নিকট তোমাদিগের দান শক্তির প্রশংসা করিব । আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি স্থানান্তরে যাই ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “মাতা কিছু আহার করিয়া যথ। ইচ্ছা বাত্রা কর । আমরা নিতান্ত আপ্যায়িত হইব ।”

রেবতী বলিল । কি খাব ?

স্বর্ধাকুমার বলিল । “তোমার যাহা অভিক্রুচি হয় । এ দোকানের সকল দ্রব্য তোমারই ।”

রেবতী হা হা হা করিয়া হাসিল । বলিল । “মাগো । এ সকলই আমার । আমার । আমার । আমিই এ সংসারের প্রভু । আমারই সব । তুই আমার, ও আমার আমি তোকে ভালবাসি । ওকেও ভালবাসি । ভালবাসা বড় ভাল । তুই আমার সঙ্গে বাবি ?

স্বর্ধাকুমার বলিল । “আগে তুমি আহার কর, পরে এ সকল কথা হইবে ।”

রেবতী বলিল । “তবে দৈ কি দিবি ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল । “তোমার যাহা অভিক্রুচি হইবে, তাহাই দিব ।”

রেবতী বলিল । “আমি মুড়ি খাইব ।” স্বর্ধাকুমার দোকানীর নিকট হইতে মুড়ি লইয়া রেবতীকে দিল । রেবতী আপন মলিন অকলে তাহা লইল ।

স্বর্ধাকুমার বলিল । “আর কিছু দিবি ।”

রেবতী বলিল । “আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই ।” মুড়ি লইয়া দোকানের সম্মুখে ভূমে বসিল । বসিয়া মুড়ি খাইতে লাগিল । প্রায় অর্ধেক গুলি আহার হইলে এক জন বাজারের বালককে ডাকিয়া বাকি মুড়ি তাহাকে দিল । স্বর্ধাকুমার পসারীকে দাখ দিয়া, স্বর্ধাকুমার ও বর্ধাবৃত পুরুষ তাহাকে সেখানে রাখিয়া চলিয়া গেল । তাহার কিছু দূর গাইলে রেবতী উঠেঃ ধরে ডাকিয়া বলিল । “ওগো ! ও বাপু! একবার দাঁড়াও, আমার কিছু প্রয়োজন আছে ।”

স্বর্ধাকুমার বর্ধাবৃত পুরুষকে বলিল । “সেই রেবতী আমার ডাকিতেছে ।” বর্ধাবৃত পুরুষ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ।

রেবতী ক্রুত আসিয়া বলিল । “তোমরা কে, কোথায় বাইবে, কোথা হইতে আসিলে ?” স্বর্ধাকুমার বর্ধাবৃতপুরুষের প্রতি চাহিল । বর্ধাবৃত পুরুষ কি বলিলেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, বলিলেন । “মাতা আমরা বিদেশী । এখানে কোন কর্মের জন্ত আসিয়াছি । নেড়িজে বাইবার পথ জান ? আমরা এখন গেড়িজে বাইব ।”

রেবতী বলিল। “না বাবা! গেডিয়ে বাসনি। সে বড় কঠিন স্থান, দেখা যে যায়, সে আর কেহে না। আহা পাপেরা কার বউ বিকে কাল রেতে ধরে এনেছে। তারা বড় কঁদছে। ওঃ! ওঃ! আমার শুনে বুক কাটচে। হায়রে এই বুক কচুরায়কে রেখে-ছিলাম। এইখান থেকে সে ছুধ খেত। এঁহ হাতে তাকে ধরেছিলাম। এখন সে কোথায়, আর আমি কোথায়।” রেবতী অতীব ভীমবলে আপন বক্ষঃস্থলে চট চট করিয়া কয়বার চপেটাঘাত করিল। স্বর্ধাকুমার ও বর্ধারতপুরুষ তাহার আরক্ত নয়ন দেখিয়া স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। স্বর্ধাকুমার একটি শকমাত্রে মোহিত হইয়া গেল। “কচুরায়” এ কথাটি তাহার কর্ণে ঘোষিল। বর্ধারতপুরুষ একদৃষ্টে রেবতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রেবতী কতকণ অধিক হইয়া অবশেষে বলিল। “তোদের আমি ভাল বাসি, তোদের দেখে আমার বেমন হচ্ছে। না! না! দেখে নয়। ঐ তোর (বর্ধারত পুরুষ) কথা শুনিলে যেন আমার বোধ হয় আমি যমালয়ে আছি। যেন আমার ছেলে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বচুরায় আমার হৃদ খাচ্ছে। আমার ছেলেকে আমি হৃদ দিছি। না! ওঃ! কচুরায় কি যমালয়ে আছে? আহা বসন্তরায় কোথায় গেল! কোথায় বা রায়গড়!”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মাতা! তুমি যদি রায়গড় দেখিতে চাহ, ত আমি তোমাকে রায়গড়ে লইয়া বাইতে পারি! রায়গড় ভাল আছে। কচুরায়ও জীবিত আছেন। তিনি দিগ্বীথরের একজন প্রধান সেনানী। রাজা মানসিংহের প্রিয়পাত্র।”

রেবতী বলিল। “কি! কচুরায় বেঁচে আছে! না! না! না! তুই আমায় তামাসা করছিস্। কি! আমি কি তোর তামাসার যুগিয়া।” রেবতী চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। রেবতী ঘোষে কাঁপিতে লাগিল।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মাতা! আমি সত্য বলিতেছি, কচুরায় জীবিত আছেন। তুমি আমার সঙ্গে বাইলেই, রায়গড় দেখিতে পাইবে।”

বর্ধারতপুরুষ বলিলেন। “তোমার কচুরায়ের সঙ্গে কি প্রয়োজন?”

রেবতী বলিল। “সে মরিয়া গেছে। বাঁচিয়া থাকিলে আমাকে কখনই ভুলিত না। সেও প্রতাপাদিত্যের মত পাণ্ডী নয়। কমলা! বেমলা! আহা দুটি সতীন। আমার সতীনে কাজ নাই। সতীন বড় জালা! আমার হাতটা যখন পুড়ে গেছিলো তার চেয়েও সতীনের জালা। গঙ্গার সতীন হুগাঁ; আহা কি মজা! পণ্ডিতে বলে ‘মাতঃ শৈলহুতাশপত্নি! বম্বা—’ আমি গঙ্গা স্তব জানি। আমার যখন দীক্ষা হয়। সে গুরুদেব বড় রাণী। তোমার মত বেঁটে। আমার স্বামী বড় দুর্বল ছিল। শীঘ্র মরে গেল। উঃ! কি জালা! আমি বিধবা হলাম।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মাতা আমরা এখন বিদায় হই। তোমার স্বাস বল।
আমরা বাইবার সময়, তোমার নিকট দিয়া হইয়া বাইব। তোমার ইচ্ছা হয়ত রায়গড়ে
লইয়া বাইব। সেখা তোমার সকলের সঙ্গে দেখা হবে।”

য়েবতী বলিল। “শাও বাবা শাও। তোমার মনস্তামনা সিদ্ধ হউক।”

সূর্য্যকুমার ও বর্ষ্যাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধাটি তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন
করিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া একটা কুকুর দেখিয়া তাহাকে ধরিতে তাহার পশ্চাৎ
দৌড়িল। সূর্য্যকুমার ও বর্ষ্যাবৃত পুরুষ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া গেড়িঙ্গের দ্বারে বাইয়া
উপস্থিত হইলেন। ভিক্রুস সবেমাত্র বৈদ্যনাথকে কারাবদ্ধ করিয়া, আহারান্তে আসিয়া
দ্বারে দাঁড়াইল। বর্ষ্যাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিলেন। মহাশয় এইটা ফিরিস্তীওঁকা
গেড়িঙ্গ আছে ?”

ভিক্রুস বলিল। “তুমি কেহে ? তোমার গেড়িঙ্গে কি দরকার ?”

বর্ষ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “খোলাবন্দ হইঁই আমীর গঞ্জালিন হৈ।”

ভিক্রুস বলিল। “মর এ গঞ্জালিন আবার আমীর কবে হল ? তোমরা কারা ?
বেধতে পাই দিলী লোক নহ ?”

বর্ষ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “জিনাব ! মৈ উড়িয়ার মলুকসে আতাঁই।”

ভিক্রুস বলিল। “তোমার সঙ্গে গঞ্জালিনের কি দরকার ?”

বর্ষ্যাবৃত পুরুষ বলিল। “গরিবনবাজ ! গঞ্জালিন বাহাদুরসে কুছ পরজ নহি
হৈ। আপন মলুকমে উনকা নাম শুনা যা। এই গেড়িঙ্গ হৈ। ক্যা বোলনেকো
কুছ হয়জা হোগা।”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ এই গেড়িঙ্গ, তোমরা এদেশে কি করতে এনেছ ?”

বর্ষ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মৈ ই উড়িয়া বেশারী রোজকারকে লিয়ে পাঠান
ফৌজকে সাথ উরহু বাজার লেকর আছ। কিলে গেড়িঙ্গকে তারিক শুনা। দেখনেকো
খাইস হৈ।

ভিক্রুস পাঠান সেনার নাম শুনিয়া বলিল। “লৈ আমি লইয়া দেখাইব। এস
আমার সঙ্গে এস।”

বর্ষ্যাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার গেড়িঙ্গে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ভিক্রুস তাহা-
দিগকে গড়ের ভিতর লইয়া গিয়া সকল দেখাইতে লাগিল। পথে জিজ্ঞাসা করিল।
“তাল পাঠানেরা এখানে কি করিতে আসিয়াছে ?”

বর্ষ্যাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মুরো মালুম নহি। সুবাইহে আশীর গঞ্জালিনকে সাথ
বাকালো ড়াও হোগা।”

ভিক্রুস এই কথা শুনিবামাত্র বলিল। “তোমরা এইখানে দাঁড়াও ; আমি অতি

শীঘ্র আসিতেছি। এই রাত্তা ধরিয়া বেড়াও।” জিক্রুস্ চলিয়া গেল। বর্ষাবৃত্ত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গেডিঞ্জের চতুর্পার্শ্ব ভ্রমণ করিয়া তাহার গভঃস্থাত পথ, বিশেষতঃ চারিদিকের গড় খান ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। জিক্রুস্ ফিরিল না। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল বলিয়া তাঁহারা গেডিঞ্জ ত্যাগ করিয়া, বাজারে বৈদ্যনাথের গোমস্তার বাসায় আসিলেন। কিছু বিশ্রাম করিয়া সমস্ত সেনা একত্র করিয়া বধ্যবিধি আদেশ দিলেন। নসিরাম বেলা আড়াই প্রহরের সময় সসৈন্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনারা বিশ্রাম করিল। সেনারা অপরাহ্নে আপন আপন অস্ত্র শস্ত লইয়া সজ্জা করিল। বেলা একদণ্ড প্রায় আছে এমন সময় বর্ষাবৃত্ত পুরুষ সমজ্ঞ হইয়া সূর্য্যকুমারের হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। মালিকরাজ ও বজ্রত বর্ষাবৃত্ত হইয়া পশ্চাতে চলিল। নসিরাম, শঙ্কর ও অজ্ঞাত যরণড়ের প্রধান প্রধান সেনারা পশ্চাতে চলিল। বৈদ্যনাথের গোমস্তা, নায়ব, ভজহরি ও পঞ্চ, আর আর প্রধান প্রধান বৈদ্যনাথের কর্মচারীরা চলিল। তাহার পশ্চাৎ রায়গড়ের সেনা ও বৈদ্যনাথের সেনারা একত্র স্ত্রীবিদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। গোমস্তা কুদ্দাল প্রভৃতি বস্ত্র সকল আনিয়াছিল। লোক লাগাইয়া খাদে সেতুবন্ধ করিতে লাগিল। এক দণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র খাদ প্রায় বিশ হাত প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত হইল। সেনারা সেতুর উপর দিয়া গেডিঞ্জ প্রবেশ করিল। গেডিঞ্জে প্রবেশ করিয়া একটি দীর্ঘ নির্জন বাগানে গিয়া সকলে একত্রিত হইল। বর্ষাবৃত্ত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার একত্রিত হইয়া একবার অন্তর্গেডিঞ্জের নিকট গমন করিলেন। দেখেন, অন্তর্গেডিঞ্জের পূর্ব্ব দ্বারে পঞ্জালিসের আবাসে বড় ধুম। লোকসমাগম অত্যন্ত অধিক ও আলোকে চতুর্দিক উজ্জ্বল। বাটার ভিতর হস্তের কলবর। নৃত্য গীতাদি নানাবিধ আমোদ হইতেছে।

সূর্য্যকুমার বলিল। “ইহাদের আজ কোন উৎসব হইবে।”

বর্ষাবৃত্তপুরুষ বলিলেন। “বোধ হয় কাহার বিবাহ আছে। বাহা হউক ও দিকে আমাদিগের যাওয়া কোন মতে কর্তব্য নহে। চল আমরা অন্তর্গেডিঞ্জের চতুর্দিক দেখিগা আসি। আমাদিগের বন্দী উদ্ধার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর মহারাজ মানসিংহের অনুমতি সিদ্ধ করিব। ফিরিঙ্গি-দস্যু এককালে শিথিল করিব।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “ইন্দুমতীকে পাইলেই আমার স্বকাঁথ সিদ্ধ হয়।”

বর্ষাবৃত্তপুরুষ বলিলেন। “তুমি ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলে কি করিবে?”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমার আর কিছু ইচ্ছা নাই, কেবল তাহাকে সুখে বাঁধিতে দেখা আমার একমাত্র ইচ্ছা।”

বর্ষাবৃত্তপুরুষ বলিলেন। “হার অত্যন্ত কঠিন দেখিতে পাই। ইহা তেজ করিবার উপায় কি?”

স্বর্ঘ্যকুমার বলিল। “এক পরামর্শ আছে; অন্তর্গেডিজের আসিবার চতুর্দিকে, পথে ঘুরে অস্তরালে, সব লোক যোজনা করা যাক্, কাহাকেও ঘেন আসিতে না দেয়। বাছিয়া ভাল ভাল অব্যর্থ লোকান ধানুকী রাখিলে তাহারা যে কেহ আসিবে তাহাকে মারিতে পারিবে। প্রতি ধানুকীর সঙ্গে দশ জন করিয়া বলবান্ মল্লযোদ্ধা থাক্। এক এক স্থানে ছয় জন এমত দলবদ্ধ ধানুকী থাকুক। মল্লযোদ্ধারা সকলকে ধরিয়া এক কালে মুখবন্ধ করিবে। ইত্যবসরে আমরা ভোপ আনিয়া ধারে ভাল করিয়া সাজাই।”

বন্দ্যাবৃতপুরুষ বলিলেন। “সে মল্ল পরামর্শ নহে, তবে চল, সেই চেঁটারি বাওয়া যাক্।” বন্দ্যাবৃত পুরুষ ও স্বর্ঘ্যকুমার অন্তর্গেডিজের দ্বার হইতে ফিরিয়া গেলেন। রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার ছিল। কেহই দেখিতে পাইল না। আর সেখানে ভাল রকম প্রহরীও ছিল না। ফিরিঙ্গিদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে মৈত্ৰশৃঙ্খল ছিল না বলিয়াই, ইহারা এরূপ অলক্ষিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

“শা নক্রমাকর্ষতি কুলসংস্থং স্বানক মক্রঃ ললিতাত্মপেতম্।”

ফ্রান্সিস্কা বেদনানাথকে কারারুদ্ধ করিয়া সভাকুটিমের দিকে চলিয়া গেল। ভিক্টরুস্ ক্রুড তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। সভায় কেহই ছিল না। ফ্রান্সিস্কো লভায় গিয়া ত্য সংগ্রহ বচা বাজাইল। ক্রমে এক একজন করিয়া সভ্য আসিতে লাগিল। এমত সময় একজন লোক আসিয়া বলিল। “গঞ্জালিস মনসীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এতদূর আশ্রয় হইয়াছিল, তাহাতে আবার এখানকার সমাচার পাইয়া নৌকাতেই রাত্রি কাটাইয়াছে। বোধ হয় এইকণ্ঠেই এক একজন করিয়া গেডিজের আসিয়া পৌঁছিবে।”

ফ্রান্সিস্কা বলিল। “ভালই হইল। তবে একণ্ঠেই ষাটে লোক পাঠান যান।”

আনর্থনি আসিয়া বলিল। “গঞ্জালিস্ বোধ হয় ষাটে উঠে নাই। কোন আশাটার নাশিয়াছে। অতএব আমাদের ব্যস্ত হইতে হইবে না।”

একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল। “তিনি সভায় আসিতেছেন।”

ফ্রান্সিস্কো সভায় পতাকাধারীকে ডাকাইয়া, তাহাকে পতাকা লইয়া সভাঘারে বাইতে বলিল ও সভ্য সম্প্রদায় একত্র করিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া গঞ্জালিসকে অভ্যর্থনা করিতে সভায় প্রেরণ করিইয়া দাঁড়াইল। কিছুকণ পরেই গঞ্জালিস ও অনুপরাম পার্খাপার্কি হইয়া সভাঘারে আগমন মাত্র সবল সভ্যেরা সম্ভাষণ করিয়া বরণ করিল।

গঞ্জালিস সকলকে বখাষোগ্য সভাস্থানন্তর ফ্রান্সিস্কোর হাও ধরিয়। একখানা কেদারায় বাইরা বলিল। ফ্রান্সিস্কো অনুপরামকে বলিতে বলিয়া, আপনি আর এক কেদারায় (১) বলিল। পরে গিরজা (২) হইতে পাড়িকে (৩) ডাকান হইলে, পাড়ি আসিয়া বখানিয়র “মাস” (৪) আশীর্বাদ করিল। গঞ্জালিস বলিল। “ফ্রান্সিস্কা! এখানকার সমাচার বল। (রুডকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি বাইরা বন্দীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখিয়া আইন।”

রুড আপন কর্ণে চলিয়া গেল। ফ্রান্সিস্কো বলিল “এখানকার সমাচার এখন সব মঙ্গল। এক ষণ্ট। পূর্বে কিন্তু আমাদের জীবন সংশয় হইয়াছিল।” ক্রমে ফ্রান্সিস্কো গঞ্জালিসকে সমস্ত অবগত করাইল।

গঞ্জালিস বলিল। “বেঞ্জামিন কোথায়?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল, সে এখনও বন্দী আছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিবার অবকাশ পাই নাই, তাহারই জন্ত এই সভা আহ্বান করিয়াছি।”

গঞ্জালিস বলিল। “তবে এখন বেঞ্জামিনকে ডাকিয়া আন।” ভিক্টর আপন আসন ত্যাগ করিয়া গমনোদ্যত হইলে ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ভিক্টর, তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আনধনি যাইবেক।” আনধনি আপন আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অনেক বিলম্বে বেঞ্জামিনকে সঙ্গে লইয়া আনধনি সভাস্থানে প্রবেশ করিলে, গঞ্জালিস আপন আসন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া বেঞ্জামিনের সম্মানপূর্বক একখানি আসনে বসিতে বলিল। বেঞ্জামিন বখাষোগ্য সভাস্থানন্তর আসনে উপবিষ্ট হইলে, গঞ্জালিস বলিল। “বেঞ্জামিন, এখন ও বৈদ্যনাথকে বন্দী করা হইয়াছে। তোমার এক্ষণে কি অভিরূচি?”

বেঞ্জামিন বলিল। “কি বিষয়ে আমার অভিরূচি জানিতে চাহ?”

গঞ্জালিস বলিল। “এখনও কি তুমি আমাদের শত্রু থাকিবে?”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমি কবে তোমাদিগের শত্রু হইলাম যে, তুমি আমাকে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলে? আমি তোমাদিগের আত্মীয়তা ব্যতীত শত্রুতা কবে করি-
য়াছি। তবে যে বৈদ্যনাথের জন্ত এত বলিয়াছিলুম, তাহার কারণ সবোই জান।
তোমাদিগের অপেক্ষা, সে কিছু আমার অধিক আত্মীয় নহে। তবে আমার বাটীতে
যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া শ্রম করিতেছিল, তাহাকে অকারণ বন্দী করা কি ভাল

(১)। কেদারা—চৌকী।

(২)। ষ্টানদিগের উপাসনা-মন্দির।

(৩)। ষ্টানদিগের পূজক পুরোহিত।

(৪)। ষ্টানদিগের শাস্তি প্রয়োগ।

হইয়াছে। না, তাহাতে আমার নিশ্চয় থাক। কর্তব্য ছিল? যাহা হউক, এখন আর আমার কিছু কর্তব্য নাই। আমার যতদূর সাধ্য তাহার জন্ত চেষ্টা পাইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি ধর্মের বান্দী হই নাই। সেও কিছু আমার বাটীতে দ্রুত হয় নাই। এই আমার একমাত্র সন্তুষ্টির আশা।”

গঞ্জালিস বলিল। “বাক, গত বিষয়ের শোচনীয় আর প্রয়োজন নাই। আমরা সকলে তোমাকে কষ্ট দেওয়ার দোষী আছি, এক্ষণে আমরা সকলে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।”

সত্য সকলেই বলিয়া উঠিল। “ক্ষমা প্রার্থনা করি।”

হুইবুদ্ধি ভিক্রম অতি অঙ্গে অঙ্গে বলিল। “ক্ষমা প্রার্থনা করি।”

বেঞ্জামিন বলিল। “এক্ষণে গত বিষয় হওয়া বাক। তোমার কি সমাচার?”

গঞ্জালিস বলিল। “আমি এক প্রকার কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি। দুইটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ আমাদিগের বন্দী।”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “আর সনবী-পের বন্দী একটি স্ত্রী আর তিনটি পুরুষ।”

গঞ্জালিস বলিল। “হাঁ, আর এখানকারও চারজন বন্দী আছে। আর রায়গড় হইতে যথেষ্ট ধনও সংগ্রহ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের অহুপর্য্যমকে ইহার কিরূপ অংশ দেওয়া যায়, তাহাই অন্য সভায় বিচার্য্য। তোমাদিগের যাহা বিচারসম্মত বোধ হয়, তাহা বল।”

গঞ্জালিসের কথা সাক্ষ্য হইলে, অহুপর্য্যম আপন আসন ত্যাগ করিয়া বলিল। “মহাশয় সভাপণ। আমার একটি আবেদন প্রবণ করুন। আমি বিদেশী, সনবী-পে আসিয়া গঞ্জালিসের ও তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। আমার এখানে আসিবার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা তোমরা সকলে বিশেষ অবগত আছ। আমি গঞ্জালিসের সহায় পাইবার আশয়ে আপন ভগ্নী অরুন্ধতীকে গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছি। আমিই বশোরপতি প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় লইতে যাইয়া, তাঁহার সঙ্গে গঞ্জালিসের আলাপ করিয়া দিই ও যখন রায়গড়ে বাইবার কথা হয়, তখন মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে আমাকে পাঠান। আমি রায়গড়ে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বরাবর গঞ্জালিসের সঙ্গে যুক্ত বরিষ্ঠাছি। যথাসাধ্য গঞ্জালিসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার কষ্টের অংশও লইয়াছি। আমার আমার কুটুম্ব বলিয়া মেহপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরে রায়গড়ে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইল। তাহার কণামাত্রও বশোরপতিকে অংশ দিতে হইল না। আমার যত অর্থের প্রয়োজন, তত আর কাহারও নহে। এক্ষণে তোমরা বিবেচনা কর, যে লুপ্ত অর্থের অংশ তোমাদিগের লওয়া কর্তব্য কি না।”

অনুপরাম বলিল। ফ্রান্সিস্কা দাঁড়াইয়া বলিল। “অনুপরাম বাহা বলিল, তাহা আমরা সকলেই সমস্ত জ্ঞাত আছি। আমাদের কৰ্ত্তব্য, সকলই অনুপরামকে দেওয়া; কিন্তু আমরাও আহাৰ করিয়া থাকি, আমাদেরও অৰ্থের প্রয়োজন আছে। বিশেষত বৈদ্যনাথের ব্যাপারটি এখনও চোকে নাই। কে জানে, ইহাতে কত ধন ব্যয় হইবে। আমাদের অর্থোপার্জনের উপায়ান্তর নাই। বসে ধনোপার্জনই আমাদের একমাত্র উপজীবিকা। আর অনুপরাম একক হইলে এ সকল অর্থ কোন মতে উপার্জিত হইত না। এ সকল আমাদের স্বোপার্জিত ধন। অনুপরাম তাহার ভগ্নীকে গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ ব্যতীত আমাদের কি? অল্পকালী অন্ধকার হইতে আলোকে আসিল। ষষ্ঠধর্ম্মাবলম্বনে তাহার পরকালের কার্য্য হইল।” ফ্রান্সিস্কা বলিল। কতকগুলি সভ্য প্রশংসা করিয়া করতালি দিল।

আনর্থনি বলিল। “ফ্রান্সিস্কা বাহা বলিল, তাহা কিছু অসঙ্গত নহে; কিন্তু আমরা যখন অনুপরামকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছি, তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা কৰ্ত্তব্য নহে। অনুপরাম সেই আশ্রয়ে আমাদের সহিত মিলিয়াছে। বাহাতে অনুপরাম স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, সেটী আমাদের অবশ্য কৰ্ত্তব্য।”

রুড বলিল। “আমরা অনুপরামকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ সকল আমাদের উপার্জন। অনুপরাম সহচরের অংশ মাত্র পাইবেন।”

ভিক্টর বলিল। “অনুপরাম আমাদের নিকট বাধ্য আছে। তাহার ভগ্নীকে আমরা সভ্য ধর্ম্ম দান করিয়াছি। অতএব অনুপরাম সেটি না শোধিলে অনুপরামের কোন বিষয়েই কথা কথা উচিত নহে।” ভিক্টর বলিল। কিন্তু আর কেহই দাঁড়াইল না।

গঞ্জালিস বলিল। “তোমাদের এখন কাহার কি মত প্রকাশ কর। বেঞ্জামিন! তোমার কি অভিরূচি? তুমি কেন কোন কথা কহিতেছ না?”

বেঞ্জামিন উঠিয়া বলিল। “সভ্য সম্প্রদায়! আমার এ বিষয়ে বাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা আমি স্পষ্ট বলিব। আমি কিছু কোন পক্ষ হইয়া বলিব না। যদিচ আমি নিজে তোমাদের একজনও তোমাদের পক্ষে কথা বলিলে আমার স্বার্থসিদ্ধ হইবে, তথাচ আমি তাহা বলিব না। আমি অনুপরামের পক্ষও বলিব না। সে কিছু আমার অধিকতর আশ্রয় নহে। আমার মতে যাগ ছায় বোধ হইতেছে, তাহাই তোমাদেরকে জানাই, পরে তোমাদের বেরূপ অভিরূচি। অনুপরামের সঙ্গে তোমাদের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আমি তাহা বিশেষ অবগত আছি। সে স্বত্বমত কহিতে গেলে, তোমরা রাগগড়ে যে কিছু উপায় করিয়াছ, তাহা সকল অনুপরামের। তোমাদের আহাৰের উপযুক্ত ব্যয় পৰ্য্যন্ত তোমরা এক্ষণে পাইতে পারিবে না। বস দিন না, তোমরা অনুপরামকে সিংহাসনে বসাইবে, তত দিন পর্য্যন্ত তোমাদের অনুপরামের

উপর কোন দায় নাই। অনুপরাম সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে, আরাকাশে হাজার হাজার বৎসরে আর জমিদারী তোমাদিগকে দিবে। গঞ্জালিসকে কর্তৃত্বের জন্ত আপন ভগ্নী দিয়াছে ও স্বতন্ত্র একশত মুদ্রা বার্ষিক আয়ের জমিদারী দিবেক। প্রথমাবধি যত ব্যয় হইবে, অনুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অঙ্ক পাতিয়া তোমাদিগকে দিবে। এক্ষণে রায়গড়ে বাহা তোমরা পাইয়াছ, তাহার প্রতিক্রিয়াতে তোমাদিগের কোন অধিকার নাই। রায়গড়ের বন্দী ও ধন সকলই অনুপরামের। সভ্যগণ! একথা গুলি বড় তোমাদিগের প্রিয় হইতেছে না। একথা কাহার প্রিয় নহে। কিন্তু বিবেচনা কর, যদি তোমরা অনুপরামের আশ্রয় লইতে; আর অনুপরামের সঙ্গে বাঁহিয়া অনুপরামের বলে কোন দ্রব্যাদি সংগ্রহীত হইত, ওং কি তোমরা প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া অনুপরামকে দিতে সুখী হইতে? সভ্য! তোমরা কাহার বশীভূত নহ, সকলে স্বাধীন; আপন কৃত সম্প্রদায়-নিয়ম ব্যতীত তোমাদিগকে বন্দী করিবার আর কিছুই নাই। যখন গ্রায় কথা উদ্ভূত হয়, তখন গ্রায় বিচার করাই স্বাধীন লোকের কর্তব্য। স্বাধীনদিগের মনে স্বার্থপেক্ষায় অভিযাচরণ অত্যন্ত পহিত। তোমরা যাহাকে নষ্ট কর, একটা কারণ লক্ষাইয়া মারিয়া থাক। স্বাধীন লোকের দীতিই এই, স্পষ্ট বলপূর্বক অভিযাচরণে তোমরা কল্যাণ রত নহ। বল, অনুপরামের সকল প্রাণ্য কি না?”

অধিকাংশ সভ্যেরা বলিল। “অবশ্য প্রাণ্য” “সকলই প্রাণ্য” “অনুপরাম সকল পাইবে” “বেঞ্জামিন ঠিক বলিয়াছে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “সভ্য মহোদয়গণ! আমার বন্ধুরা! সমব্যবসায়ী! সহধর্মী! স্বজাতীয় ফিরঙ্গিগণ! তোমাদিগের একপ উদ্ধার চরিত্রে আমি একান্ত আপ্যায়িত হইলাম! কিন্তু আমার সঙ্কষ্টির অপেক্ষা তোমাদিগের সভ্যদের আরও গুরুতর কারণ আছে। তোমরা এই গ্রায় পরামর্শ স্বীকার জ্ঞাত, মাতা মেরায় (তাঁহার আস্রা মুখে থাকুক) প্রিয় হইলে। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার আপন ক্রোড়ে রাখিবেন। তাঁহার কোমল হস্ত তোমাদিগের বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়াছে। তোমাদিগের সংচরিত্রে আমি নমস্কার করি।”

সকলে বলিল। “নাথু বেঞ্জামিন! তদ বেঞ্জামিন।” সভ্য নীরব হইল। আর কাহার মুখে কোন কথাই নাই। ভিক্টর অঙ্গে অঙ্গে উঠিয়া গঞ্জালিসে, পার্বে গিয়া চুপ চুপ বলিল। “মহাশয় অহুমতি করেন ত এ সভা হইতে পাপ বেঞ্জামিনকে দূর করিয়া দি। কাপুরুষ যেন পত্রির মত বক্তৃতা করিতেছে, যেন আমাদিগের ধর্মের সভা বলিয়াছে।”

গঞ্জালিস বলিল। “ভিক্টর ক্ষান্ত হও, ব্যস্ত হইও না।”

গঞ্জালিস কিছু চিন্তিত হইল। দেখিল সকলেই বেঞ্জামিনের কথায় সায় দিয়াছে।

একপে বেঞ্জামিনের বিপক্ষে হওয়া নিতান্ত শ্রেয়স্কর নহে। আনধনি উঠিল। অস্ত্রাশ্রয় বাহারা ফুস ফুস করিয়া আতি সতর্ক কণা কহিতেছিল, আনধনি কি বলে, শুনিতে সোৎসুক হইয়া নিস্তব্ধ হইল। সকলেই একদৃষ্টে আনধনির প্রতি লক্ষ্য করিল।

আনধনি বলিল! “বন্ধুগণ! তোমাদিগের এ বিষয়ে এক প্রকার স্থির মত শুনিলাম। একপে তাহা পরিবর্তনশীল যে আমি উঠি নাই। দশ জনের যে মত, আমায়ও সেই মত। দশ জনের মতেই কর্ম্য করা হইবেক। তোমরা এক রকম এ বিষয় নির্দ্বাৰ্য্য করিয়াছ, আমি কিছু তোমাদিগের অনুমতির বিপক্ষে বহিতে উঠি নাই। তোমাদিগের ভিন্ন মত হইতে বলি নাই। তোমাদিগের নব প্রচারিত মতের বিপক্ষে বর্ষ্য করিতে উঠি নাই। আমি কেবল আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমি তোমাদিগের নিকট নূতন কোন আবেদন করিব না। আর কিছুই চাহি না। কেবল এই প্রার্থনা, যে মনোযোগপূর্ব্বক আমার কথাগুলি শুন। আমি যাহা বলিব তাহা জ্ঞানকৃত অস্ত্রাশ্রয়ে বলিব না। আমার যত দূর জ্ঞান, ততদূর বিচার করিয়া দেখিলাম, ইহাতে আমার স্থানে প্রেম ব্যতীত অস্ত্র কোন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় নাই। বেঞ্জামিন যাহা বলিলেন, তাহা শ্রাস্তময় বটে। তোমাদিগের কর্তব্য সকল লুপ্ত জব্যাদি, বন্দী পর্য্যন্ত, অনুপরামের হস্তে অর্পণ কর। যদি আমি একক হইতাম ত এতক্ষণে অনুপরামের সম্মুখে সকল আনিয়া দিতাম। যেহেতু অনুপরামই সমস্ত। অনুপরামই সমস্ত জব্যাদির অধিকারী। মাতা মেরী (মাহার আত্মা মুখে থাকুক) করুন অনুপরাম মুখে সে সকল জব্যাদি পূর্ণ করুন। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, গিরেল (চিরদিন তিনি জ্যোতির্ম্ময় থাকুন) তাহাকে রক্ষা করুন। আমরা সকলেই কাম্যমনোংকো অনুপরামের কার্য্যসিদ্ধি উদ্দেশে নিযুক্ত থাকিব। আমরা আত্মস্বার্থ ছাড়ি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া তাহার নিযুক্ত ছিলাম। আর এই মুহূর্ত্তে প্রয়োজন মত, প্রস্তুত আছি। যত দিন না অনুপরাম রাজ্যান্তিক হন, আমরা তাঁহার ক্রৌড়দাস। তাঁহার চিহ্নিত সেবাইত। তোমাদিগের সেবার ক্রটি হয় নাই। অনুপরাম স্বয়ংই বলুন যদি কখন তোমাদিগকে অবতর করিতে দেখিয়া থাকেন?”

অনুপরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল। “না, না, আমি তোমাদিগের নিকট প্রেমপাশে বদ্ধ আছি।”

আনধনি বলিল। “দেখ তোমাদিগের আচরণে অনুপরাম নিতান্ত শ্রীত আছেন। আমরা আপন ব্যয়ে সেনা সংগ্রহ করিয়াছি। আপন ব্যয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা আপন ব্যয়ে তোমাদিগের উৎকৃষ্ট সেনা লইয়া রায়গড়ে বধ্যাসনে উপস্থিত হইয়াছি। তোমাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া অনুপরামের কর্ম্য সকল করিয়াছি। আমরা কখন অনুপরামকে কোন কারণে বিরক্ত করি নাই। কখন কিছু দিতে অনুরোধ করি

নাই। আমরা যে অনুরোধ করি নাই, আমাদেরই ইটলতা কিছু তাহার কারণ নহে। তোমরা সকলেই জান যে, আমাদের রায়গড়ে যখন সেনা পাঠান হয়, তখন সাধারণ কোবে অর্থাভাব ছিল। যথেষ্ট অর্থাভাব ছিল। এমন কি আমরা আমাদের আত্মীয় মহাজন খেজামিনের নিকট হইতে অর্থ ধার করিয়া লইয়া উপযুক্ত অন্ত্রাদি ক্রয় করিয়াছি। আপনাদিগের পাথের পর্য্যন্ত ঋণ করিয়া লইয়াছি। আমাদের যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও আমরা অনুপরামকে একবারও তাক্ত করি নাই। এমন কি তাঁহার কর্ণগোচর পর্য্যন্ত করি নাই, কেন না জানি, যে তাহারও অভাব। তাহারও হস্তগত কিছুই ছিল না। অভাব জানাইলে তাহার উপশম হইবে না, অথচ অনুপরামকে নির্ক্ৰিয়তা (১) হইতে হইবে। আমরা আপনার কষ্ট, আপনারাই সহিলাম। এখন অনুপরামের যথেষ্ট ধন হইয়াছে। যেহেতু লুপ্ত দ্রব্য সকলই তাঁহার। এক্ষণে অনুপরামের কি কর্তব্য? আমি কিছু বলিতে চাহি না। কেবল অনুপরাম আপন কর্তব্য করিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। আমি বলিলাম, অনুপরাম আপন কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিয়া বলুন। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, ভাল করিয়া বিবেচনা করুন।”

আনখনি বলিল। সকলেই অনুপরামের দিকে চাহিল। অনুপরাম কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ লইয়া হেঁটমুণ্ডে রহিল। ভাবিতে লাগিল। বিবেচনা করিল, আনখনি যাহা বলিল তাহা কিছু অজ্ঞায় নহে। উত্তিবার উপক্রম করিতেছে কিন্তু আবার ভাবিল, দেখা যাক ইহারাই বা কি বটে; এমত সময় গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল। “অনুপরামের উত্তর দিবার পূর্বে আমার এ বিষয়ের কিছু বক্তব্য আছে। সকলের বিচারে যাহা নির্ধারণ হইয়াছে, তাহা আমার শিরোধার্য্য। অনুপরামের সঙ্গে আমাদের যে পণ হয়, তাহার সমস্ত অর্থ আমি মহাশয়দিগের নিকট ব্যক্ত করি। অনুপরাম আমাকে বলেন, যে তুমি বন্যপি আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে বৎসরে হাজার টাকা আয়ের বিষয় দিব, আর তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য একশত টাকা আয়ের বিষয় দিব। এক্ষণে আমার পরমাত্মনারী ভগ্নী অরুণতী তোমাকে বিলাম। আমি এই সমস্তগুলি তোমাদিগকে পূর্বে অবগত করাইয়াছি ও তোমাদিগের অনুমতি লইয়া পণে স্বীকৃত হইয়াছি। তোমরা সকলে বর্তমান থাকিয়া, পরমাত্মনারী ও বুদ্ধিমতী অরুণতীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াহ। যদিচ আমাকে কৰ্ম্মবশত বিবাহ দিলেই অরুণতীর সঙ্গস্থ হইতে অপস্থত হইতে হইয়াছে, তথাপি তিন চারি বৎসর যে স্থখ পাইয়াছি, তাহাতে আমি যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা আমি ইহজন্মে বিস্মৃত হইব না। ভয় করি পাছে

‘আমি অত্যন্ত প্রেমে বশীভূত হইয়া ফিরিঙ্গিবর্গের ক্ষতি করিয়া অনুপরামের পক্ষ হই। অনুপরামের জন্ত আমরা প্রাণ দিতে পারি, কেন না আমরা সেই মত প্রতীক্ষা করিয়াছি। তাহাতে আমরা বদ্ধ আছি, তাহা ত্যাগ করিতে কোন মতে ইচ্ছা করি না। স্লামিস্কা ‘স্বপ্নবশা’ মারিয়া যে সকল ধন পাইয়াছে ও যে সকল বন্দী পাইয়াছে, আমরা বোধ হয়, অনুপরাম লে সকল দ্রব্যের সংশ্লিষ্ট প্রার্থনা করেন না। তাহারও যদি অংশ চাহেন ও স্পষ্ট বসুন, আমরা তাহা বিচার করিয়া কৃতার্থ করি।’

অনুপরাম বলিল। “না, না আমি তাহার অংশের অধিকারী নহি।”

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম আপনি স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি এ সকলের অবিকারী নহেন। তোমরা বিবেচনা কর, অনুপরাম কি জন্ত ইহার অধিকারী নহেন। অনুপরাম ইহাতে আমাদেরকে বদ্ধ করেন নাই। আমরা এ সকল উপার্জন জন্ত তাঁহার নিকট কোন প্রতীক্ষায় বদ্ধ নহি। রায়গড়ের ব্যাপারও সেইরূপ। অনুপরাম যদি আমাদেরকে রায়গড়ের ব্যাপারের বিষয়ে কিছু অংশের কথা কহিয়া থাকেন, তবে আমরা অংশ দিতে প্রস্তুত আছি। নতুবা আমরা যদি রায়গড়ের লাভের অংশ দিই তবে সনদ্বীপের লাভের অংশ কি জন্ত দিব না? তাহাও দিতে হইবে।”

গঞ্জালিস বলিল। ভিক্টর উঠিয়া বলিল। “আমাদের একথা শুনাই অগ্রাহ্য হইয়াছে, ইহাতে অনুপরামের নাম উল্লেখও করা কর্তব্য নহে। অতএব আমরা সকলে একমত হইয়া বলিতেছি, এ বিষয়ে অনুপরামের কণামাত্রও নাই।”

বেঞ্জামিন বলিল। “ভিক্টর! সের কথা মতে আমার বোধ হইতেছে, সবলের মত অনুপরামকে কিছু যাত্রা না দেওয়া। আমার তাহার কোন আপত্তি নাই, সকলের মতই প্রামাণ্য, কিন্তু আমার হই তিনটি প্রশ্ন আছে, তাহা জিজ্ঞাসা না করিলে আমি নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না। অনুমতি করেন ও জিজ্ঞাসা করি।”

গঞ্জালিস বলিল। “বেঞ্জামিন! তোমার যে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা কর।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, যদি অনুপরামের এ বিষয়ে কোন সম্পর্কই নাই, তবে কেন তুমিই অনুপরামকে ‘কি অংশ দেওয়া যায়’ এমন প্রশ্ন করিলে? তোমার প্রস্তাবেই যে অনুপরামের অংশ আছে, প্রকাশ পাইল। তাহার যতটুকু অংশ থাকুক না কেন, তাহার এককালে অংশ দায়াদিকর না থাকিলে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া অংশ নির্ধারণে প্রস্তাব হইত না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনুপরামের সঙ্গে তোমার রায়গড় যাত্রা-বিষয়ক কোন কথা হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া থাকে ও সেটি কি? তুমি কিছু স্বয়ং রায়গড়ে যাও নাই। অনুপরাম তোমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। এখন লইয়া যায়, এখন রায়গড়ে প্রাপ্য ধনের কে কি লইবে তাহা নির্ধারণিত হইয়াছিল কি না? যদি তুমি নিজে প্রতাপাদিত্যের অনুমোদনে

স্মরণে পিরা থাক, তবে স্মরণে অসুপারামের গমনের কোন কারণ ছিল না। অসুপারাম আমাদিগকে এ সকল বিষয়ে অবগত করুন।”

অসুপারাম উঠিয়া বলিল। “মহাশয়েরা যত্নপূর্বক শ্রবণ করুন। আমি বখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে সনদ্বীপে আসিলাম, তখন গঙ্গালিসকে সমস্ত অবগত করাইলাম। গঙ্গালিসকে বলিলাম যে, এই উপায়ে আমার যথেষ্ট ধন লাভ হইবে। গঙ্গালিস বলিল। ইহাতে যে কিছু ধন পাওয়া যাইবে, তাহা সকলই তোমার সেবার দিব।’ এই সন্ধে আমি গঙ্গালিসকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমুদ্বীন করিলাম। স্বীয় গৃহ উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত মহারাজের ধনে তত লোভ ছিল না। তাহার নিকট আমার ধনসংগ্রহের কথা বলায় তিনি মোহ গ্রহিলেন। আমি তাহাতে বুঝিলাম, নিতান্ত অমত নহে। আমি আশায় হুটপুট হইয়া প্রাণপণে গঙ্গালিসের সঙ্গে যুঝিলাম। এখন আমি বধা সর্ব্বশ্রম লইতে ইচ্ছা করি না। যে বন্দী পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি অপকৃষ্টটিকে লইতে ইচ্ছা করি। বুদ্ধ অনঙ্গপাল আমার হইবে। আর যত ধন লইয়াছেন, তাহার কিছু অংশ আপনাদিগের জন্ত রাখিয়া বাকী আমাকে দিলে ভাল হয়। তোমাদিগের অত্র কোন ভাবেও যদি দিতে নাই ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে গুলিচুলে দাও, আমার ধনের বিশেষ প্রয়োজন।”

অসুপারাম খামিলে ভিক্রুস উঠিয়া বলিল। “ধনের প্রয়োজন! ধনে কাহার প্রয়োজন নাই? আমাদিগের প্রায় কোষ পূর্ণ আছে যে, অসুপারামকে ধার দিব? আমাদিগকে কে ধার দেয় তাহার ঠিকানা নাই। আমাদিগের ধার শোধ না করিলে বেঞ্জামিন সীড়ন করিবে। যদি অসুপারামের একান্ত অর্থের প্রয়োজন হয় ও তাহার জন্ত ধার করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে বেঞ্জামিনের নিকট লউক।”

ভিক্রুস বলিল। আনথনি বলিল। “আমার মতে আপস করাই বিধেয়। একপন সত্যদিগের বৈরূপ মত হয়, সেই মতই কর্তব্য, অন্যথ কালব্যয় করা উচিত নহে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আপস হইলেই সকল ভাল হয়। অসুপারামকে কিছু ছাড়িতে হইবে। আমাদিগকেও কিছু ছাড়িতে হইবে। এ ব্যাপারে যদি আমাদিগেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে ও আমাদিগের সমুহ আয়াসে এটি সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা এটির সমস্ত অসুপারামের প্রাপ্য। আমাদিগের যথার্থ ব্যয় দিয়া অসুপারাম বাকি সকল লউন। ইহাতে সত্যদিগের কি মত?”

সকলে বলিল। “উত্তম উত্তম।”

গঙ্গালিস বলিল। “সুদৃঢ় কর্তৃপূরণ করিলে আমাদিগের পরিচর্য্যমণি কথা যায়, তবে আমি এক কথা প্রস্তাব করি, তোমরা যত্ন করিয়া শুন ও বিবেচনা করিয়া অনুমতি দাও। আমি বলি যে অগ্রে আমাদিগের বস্ত্র ব্যয় হইয়াছে তাহা সমষ্টি হইতে লইয়া বাকি

যাহা থাকিবে, তাহার এক অংশ অনুপরামের প্রাপ্য। ইহার মধ্য হইতে অনুপরাম আমাকে শাহা হাত তুলিয়া দিবেন সেটি আমার আপনার।”

বেঞ্জামিন বলিল। “তাহা হইলে অনুপরাম সকল অপেক্ষা অল্প পাইল; আমি বলিতে পারি না, অনুপরাম ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে কি না।”

অনুপরাম বলিল। “আমি ইহাতে কি প্রকারে সন্তুষ্ট হইতে পারি? আমি এক্ষণ অংশ স্বীকার করি না। তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। তোমরা যদ্যপি একান্ত আমার উপর নির্ভর হও, তবে আমি নিতান্ত নিরুপায়। আমি অন্য এ বিষয় স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করি। কেবল বন্দীর বিষয়টি নির্দ্ধারিত হইলে, এক্ষণে নিশ্চিত হওয়া যায়। যে কয়েক জন বন্দী হইয়াছে, তাহার মধ্যে কে কাহার অধীন?”

গঞ্জালিস বলিল। “আমার তাহার কোন আপত্তি নাই। তুমি আপন কহতমত অনঙ্গপালকে লও। বাকী দুই জনার মধ্যে একজন আমার ও একজন হজুরমলের।”

অনুপরাম বলিল। “যাহার হউক, আমার কোন আপত্তি নাই।”

সকলে বলিল। “অনঙ্গপাল অনুপরামের অধীন।”

গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল। “তবে অন্য অনুপরামের ইচ্ছামত সভা বরখাস্ত হইল।” সকলে আপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া সভাকুট্টর হইতে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস বেঞ্জামিনের নিকট বিদায় লইয়া অনুপরামের হাত ধরিয়া আপনার বাটীর দিকে চলিল।

অনুপরাম বলিল। “গঞ্জালিস একবার আমি অনঙ্গপালের নিকট যাই, দেখি সে বক্ষ হইতে কি অর্থ পাওয়া যায়। আমার আহার সেই খানে পাঠাইয়া দাও।”

গঞ্জালিস বলিল। “আমিও একবার প্রভাবতী ও ইন্সুমতীকে দেখি, তাহারা কেমন আছে।”

ভিক্রুস পক্ষাৎ হইতে বলিল। “তবে আমরাও আপন আপন বন্দীর নিকট যাই।”

ক্রাসিস্কো বলিল। “যত নীচ্র তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা যায় ততই ভাল।”

ভিক্রুস বলিল। “আমি বৈদ্যনাথের বক্ষ হইতে আঠার শত আশি মোহর লইব।”

ক্রাসিস্কো বলিল। “আমার ধনে তত লোভ নাই, আমি যাই, সে দ্রষ্টব্য যদি সন্তুষ্ট করিতে পারি। সেটা গঞ্জালিসের অরুচ্যতা অপেক্ষা রূপসী।”

রুড বলিল। “তবে আমি একজন বন্দীর ঘরে যাইব।”

মর্টিন দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল। “তবে আমি অপরটীর ঘরে যাই।”

সকলে আপন আপন বন্দীর নিকট চলিল। অনুপরাম অনঙ্গপালের ঘরের দ্বারে গিয়া ডাবিল। “ইহারা বৈরুপ মনস্থ করিয়াছে, তাহাতে আমি ও একান্ত অকস্মাৎ হইব। অর্থ না থাকিলে এ সংসারযাত্রা কোনমতেই নির্দ্ধার হইবে না। আমার গঞ্জালিস যে পরামর্শ করিয়াছে তাহাতে হয় ত প্রতাপালিত্য রুট হইয়া আমাকে

আশ্রয় দিবেন না। ইন্দুমতীর জন্ত তাঁহার এত চেষ্টা, আর ইহারা অমানবদমে ইন্দুমতীকে লইয়া আসিল। ভাবিল। “আমার কথার কাজ কি।” আমার এক্ষণে এটি বস্ত্র গোপন রাখা কর্তব্য। নতুবা আমারই মন্দ। কিন্তু গঞ্জালিস এখন আমার ধন দিবে না। না দেন, তাহাভেই বা আমার ক্ষতি কি। আমি সুযোগ করিয়া আপন রাজ্যে বসিলেই হইল। পরে যাহাকে বাহা দিব, তাহা আমার মনেই আছে। গঞ্জালিসকে কারারুদ্ধ করিতে হইবে। তবেই ইহার উপযুক্ত দণ্ড। নরোধম আমার সঙ্গে এমনত আচরণ করিল। পাষণ্ড পারে না, এমনত কন্দই নাই। এখন আত্মীয়তা রাখিতে হইবে। কোনমতে স্বার্থ সাধন করা কর্তব্য। এখন রুট হইলে গঞ্জালিস আমাকে ভাগ করিতে পারে। বাহা হউক, চেষ্টা পাইতে ত্রুটি করিব না। অরুণ্ডী একবার গঞ্জালিসকে বন্দীভূত করিলে হয়। তবেই নরোধমের শিখা আমার হস্তগত হইবে। অরুণ্ডী চতুরা অবশ্যই কৃতকার্য হইবে।”

হারী কারাগারের দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইলে, অমুপরাম কারাগারে প্রবেশ করিল। অনঙ্গপাল এক পার্শ্বে বসিয়া হেঁটনুগে ভূমিদৃষ্টিতে ছিল। অমুপরামকে একবার মাথা তুলিয়া দেখিল। চিনিল, ইনিই গভরাজের একজন প্রধান। ইহার নামও নোকার আসিবার সময় শুনিয়াছিল। এক্ষণে অমুপরামকে দেখিয়া কিছু আশাব্যক্ত হইল। ভাবিল এ রাজপুত্র বন্দি দয়া করিয়া মুক্ত করিতে আসিয়াছে। অমুপরাম ক্রমে অগ্রসর হইলে অনঙ্গপাল উঠিয়া দাঁড়াইল। অমুপরাম নিকট হইলে অনঙ্গপাল বলিল। “অমুপরাম, বন্ধরাজ! আমার প্রভাবতী কেমন আছে? আমাকে একবার তাহাকে দেখিতে দাও। আমি প্রভাবতীকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তোমরা আমাদিগকে একবারে রাখিলে না কেন? আমার প্রভাবতী অভাবে কষ্ট বিস্ত্র হইতেছে।”

অমুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল, ব্যস্ত হইও না। প্রভাবতী জীবিত আছে, ভূমি মনে করিলেই তাহাকে দেখিতে পাইবে। এখন তোমার সঙ্গে কোন বিষয় কষ্টের কথা আসিয়াছে, যত করিয়া শুন। তোমার নিষ্কৃতি তোমার বুদ্ধির উপর খুলিতেছে। মনে করিলেই কারাব্যুক্ত হইতে পার।”

অনঙ্গপাল বলিল। “কি বিষয় কর্য আছে বল। আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাকে একবার প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।”

অমুপরাম বলিল। “অন পরেই সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, হির হইয়া অবগত হও। পরে তোমার কথা আমি শুনিব। ভূমি জান, যে আমরা তোমাকে বন্দী করিয়াছি। এখন তোমার জীবন বৃত্তা আমাদিগের অধিকার।”

অঙ্গপাল বলিল। “তাঁহার সঙ্গে কি! তোমাদের অধীন হইয়াছি। তোমরা

যাহা মনে করিবে, তাহাই সাধ্য হইবে। কিন্তু আমার প্রতি দয়া দৃষ্টি করিও। আমি ব্রাহ্মণ, বুদ্ধ, অন্ধব। আমার পুত্র নাই। আমার অশ্বালের একমাত্র-আশ্রয় প্রভাবতী, তাহাকে কষ্ট দিও না। সে বালিকা অযোধ্য, আহা! কখন কষ্ট সহ্য নাই। কষ্ট কাহাকে বলে সে যে জানে না, সে কদাচ অসম্ভব হয় নাই। আমি তাহাকে আমার বক্ষে রাখিতাম। তাহার কি বুদ্ধি হইল। কেন অযোধ্য, আপনি গৃহ ত্যাগ করিল। আহা! সে বালিকার কি ক্ষমতা যিহে রায়গড় রক্ষা করে। যুদ্ধ কাহাকে বলে, সে তাহা জানে না। তাহার মুখচন্দ্র আমার মনে উদ্ভিত হইলে আমার মন সিহরিয়া উঠে। আহা! সে কেমনে একা বসিয়া আছে! কতই চিন্তা করিতেছে। অনুগ্রহম তুমি আমার এক মাত্র সহায়। আমাকে একবার প্রভাবতীকে দেখিতে দাও। দূর হইতে দেখিব। আমি কাছে বাইব না। একবার চক্ষে দেখিব। আমার প্রভাবতী কেমনে আছে। দেখিলেও আমার মন জুড়াইবে। দেখিলে আমি চেতনা পাইব। আমার মন কেমন করিতেছে। আমি না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।” অনঙ্গপাল ক্রমে অধৈর্য হইল। ক্রমে তাহার বক্ষঃস্থল নেত্রবারিভে আশ্রাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া বোড় করে অনুগ্রহমের হাত ধরিল। সঙ্কমনয়নে তাহার দিকে চাহিল। আহা! বৈরূপ কমলাদৃষ্টি! পাৰ্শ্বাণ্ড জব হয়। কিন্তু পাপ অনুগ্রহমের নিমেষমাত্র পাড়িল না। প্রস্তর পুষ্ঠলিকার মত দৃড়াইয়া রহিল। কিছু পরে বলিল। “অনঙ্গপাল, এত ব্যস্ত হইলে কোন কর্ম হইবে না। কাত্ত হও, মচেন আমি চললাম।”

অনঙ্গপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল। “আমি কাত্ত হইলাম, অনুগ্রহম তুমি বাইও না।”

অনুগ্রহম বলিল। “শুন আমি তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। তুমি মনে করিলেই মুক্ত হইতে পার। আর তুমি আপনি মুক্ত হইলে, উপায়াভরে প্রভাবতীরও উদ্ধার চেষ্টা পাইতে পার। তোমার আশ্রমোচন না হইলে, তোমার প্রভাবতীর মোচনের কোন উপায় নাই। এক্ষণে বল দেখি তুমি প্রভাবতীর উদ্ধার প্রার্থনা কর কি না।”

অনঙ্গপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল। “করি! করি! আমার প্রভাবতী ছাড়িয়া আর রেহান্দ কেহই নাই। আমার প্রভাবতী কতই ভাবিতেছে! আহা! সে মুখপন্ন মলিন হইয়া থাকিবে। আমি দেখিতেছি আহা! ওষ্ঠ নীরস হইয়াছে। চক্ষু আশ্রুত হইয়াছে। কুলিরাছে। আহা! তাহার কেশবদ্ধ নাই। নরায়ণেরা নিকটক রাত্রে আশ্র দিল। আহা, আমার হৃদয়কমল বলসিয়া গেল। আমার অধঃমুখ হইলেই ভাল। আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। তোমার যদি ধর্ম চিন্তা থাকে ও আমার শিরশ্ছেদ কর। আমাকে এরূপ অসহ্য কষ্ট দিও না।”

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল। বিপদে পড়িয়া কি তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইল। অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগে তোমার কি লাভ। এখন প্রভাবতীর মুক্তির চেষ্টা পাও।”

অনঙ্গপাল বলিল “আমি হইতে তাহার কি উপায় হইতে পারে। আমিও কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমি নিজেই বন্দী, তা প্রভাবতীর বন্দি হইলে কি মতে করিব?”

অনুপরাম বলিল। “এক উপায় আছে, যদি তাহাতে সম্মত হও, তবে তোমা-
নিগের উভয়ের বন্দি হইতে পারি। এক কালেই হইতে পারে। অনঙ্গপাল, অবিশ্বাস করিও
না, অমন করিয়া ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলে কেন? আমার কথা শেষ পর্য্যন্ত শুন।
পরে বিশ্বাসের বোধ্য হয় বিশ্বাস করিও। অবিশ্বাস কর, আমার তাহাতে ক্ষতি কি?
তুমিই পিঞ্জরে জন্তবৎ জীবন কাটাইবা।”

অনঙ্গপাল বলিল। “কি বলিবে বল, আমার মন কেমন করিতেছে! আমি শে-
ষ না শুনিতে স্থির হইতে পারিতেছি না।”

অনুপরাম বলিল। “তুমি ধন দিয়া আপনানিগের দুই জনের উদ্ধার করিতে পার।
যদি ধন দিতে প্রস্তুত থাক, তবে বল, আমি তোমানিগের মোচনের উপায় দেখি।”

অনঙ্গপাল কিছু স্থূহ হইয়া বলিল। “কত ধন দিলে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া
দিবে। আমি দুঃখী আমার অধিক ধন নাই।”

অনুপরাম বলিল। “যদি আমাকে এক লক্ষ স্বর্ণ মোহর দাও, তবে আমি
তোমাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।”

অনঙ্গপাল দেব বলিল। “অনুপরাম! আমি তোমাপেকা বয়োজ্যেষ্ঠ, জাতিতে
ব্রাহ্মণ, আবার এক্ষণে অসীম মনস্তাপে আছি, আমার সঙ্গে তোমার ব্যঙ্গ করা উচিত
হয় না। রহস্তের সময় আছে। পাত্রও আছে। আমার সহিত রহস্ত করিলে
আমি বিশেষ মনস্তাপ পাই। আমি একমাত্র স্বরে বাঁসিয়া আপনার অদৃষ্টকে
দুঃখিতছিলাম। তাহার আমার এত কষ্ট বোধ হয় নাই, বরং তোমার ব্যঙ্গ হইল।”

অনুপরাম বলিল। “যদি আমার কথায় ব্যঙ্গ বোধ হয় ত শুনিও না। এই পিঞ্জরে
থাক। তোমার প্রভাবতীর এই পিঞ্জরেই মৃত্যু হইবে। হয়ত ফিরিজি গঞ্জালিসের
উপদ্রী হইবে। ব্রাহ্মণকন্যার উপযুক্ত সেবা হইল।”

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম, আমার প্রতি দৃষ্টি কর, কেন দীন ব্রাহ্মণকে মর্দ্দা-
ভিক কষ্ট দিতেছ। ইহাতে তোমানিগের কি লাভ?”

অনুপরাম বলিল। “তোমার কথা রূপসী বটে, গঞ্জালিসের ও আমার উপদ্রী
হইবার উপযুক্ত পাত্র। ইহাতে তোমার কি মত?” অনঙ্গপাল এই কথাটা শুনিবা মাত্র
অগ্নিপ্রায় অগ্নিয়া উঠিল। চক্ষুঃস্রব আয়ত্ত হইল। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। দন্তে

দস্তে বর্ষণ করিয়া বলিল। “পাপ নরাধম! আমার সমুখ হইতে দূর হ। নতুবা আমি তোকে এককালে মারিয়া ফেলিব।”

অনুপরাম অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া বলিল। “বিটল ব্রাহ্মণ! আপনার অবস্থা খুসিয়া কথা কও, এ স্থানে তুই একমাত্র নিরস্ত্র। আমাকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিস ও পলায়নে তোর বন্ধ ভাঙ্গিব। স্থির হইয়া গুরুজনের সেবা কর।”

অনঙ্গপাল বলিল। “কাপুরুষ নারকী। নিরাশ্রয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেন অকারুণ্য ত্যক্ত করিস্। আর অবোধ বালিকাকেই বা কি জন্তু কষ্ট দিস্। এখন তোর শেষ সাধ্য আমাকে নষ্ট করা। আমি তাহার ভিলেকও ভয় পাই না। আমার মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছি, আমি মরিব, কিন্তু তোমাকে জীবিত দেখিয়া মরিব না।”

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল, বৃথা আশ্বাসন করিও না। এখন তুমি আমাদিগের হস্তগত আছ। মনে করিলেই আমরা বিধিযুক্ত তোমার মৃত্যুকষ্ট বৃদ্ধি করিতে পারি। তোমার প্রভাবতীকে আনিয়া তোমার সমক্ষে কষ্ট দিব। তাহার অপমান করিব। তাহার ধর্ম নষ্ট করিব। তুমি জড়ের মত দেখিবে। কোন ক্রমেই তাহার কষ্টের উপশম করিতে পারিবে না। এখন যদি বুদ্ধিমান হও। আপনাদিগের প্রেরণা কর ও আমার কথার সম্মত হও। সকল কুশলে থাকিবে।”

অনঙ্গপাল কিছু চিন্তা করিয়া বলিল। “কিন্তু তোমার ও এ সকল চিন্তার কোন চিন্তাই দেখি না। তোমার যদ্যপি আমাদিগকে মৃত্ত কল্পা উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তুমি কখন আমাকে এরূপ অস্ত্রায় বলিতে না।”

অনুপরাম বলিল। “অস্ত্রায় কি বলিলাম?”

অনঙ্গপাল বলিল। “আমার কি লক্ষ মোহর দেওয়া সম্ভবে, যে তুমি আমাকে লক্ষ মোহর দিতে বলিলে।”

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল! আমি স্বচক্ষে রায়গড়ের অবস্থা না দেখিতাম ও তোমার চাতুরীতে ভুলিতাম। রায়গড়ের একমাত্র মন্ত্রী লক্ষ মোহর দেওয়া অসম্ভব নহে। তোমার যথেষ্ট ধন আছে। তুমি অর্থলোলুপ বলিয়া, আপনার মুক্তির জন্ত, তোমার জীবনাপেক্ষা প্রিয় প্রভাবতীর জন্ত, লক্ষ মোহর দিতে পারিতেছ না।”

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম, অনুগ্রহ করিয়া আমার ক্ষমা কর। আমি আপ-
নার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তোমাকে পঞ্চাশ মোহর দিব, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও।”

অনুপরাম বলিল। “পামর! তুমি যে এত অর্থলোলুপ, আমি তাহা জানিতাম না। তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্তব্য নহে, তোমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।”

অনঙ্গপাল বলি। “অনুপরাম, তোমার জয় হউক! আমাকে রক্ষা কর, আমি বাহা দিতে স্বীকার হইতেছি তাহার সম্বন্ধে হও। আর আমাকে কষ্ট দিও না। এ যখন

গৃহে আহাৰাদি সম্ভব নহে। আমি ক্ষুধার কাতর হইয়াছি, পিপাসার আমার বন্ধ বিদীর্ণ হইতেছে। আমি আর জীবনধারণে অক্ষম। আমার প্রিয় প্রভাবতী কি কারতেছে! আহা, কৃষ্ণার তাহার কষ্ট হইতেছে। তোমাদিগের হৃদয় কি পাষণময় যে, অন্তমাত্রণে জলপান করিতে পার, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ পিপাসার প্রাণত্যাগ করিব ?”

অনুপরাম বলিল। “আমাদিগের দোষ কি ? তোমাকে পান জল দিয়া গেল, তাহাত তুমি স্পর্শও করিলে না।”

অনঙ্গপাল বলিল। “কে আমাকে পানার্থ জল দিল ? যবনদত্ত জল আমি কিরূপে পান করি।”

অনুপরাম বলিল। “তবে আর আমাদিগকে দোষ কেন ? তুমি আপনি তত্ত্বাঙ্গ করিয়া জলপান করিলে না।”

অনঙ্গপাল বলিল। “তুমি কি হিন্দু না যবন ? তোমার বৈরুপ বধার প্রণালী, তাহাতে আমার সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, তুমি এ স্থান হইতে যাও। আমাকে স্থির হইতে দাও। আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না।”

অনুপরাম বলিল। “আমার গরজ নহে। আমি চলিলাম। তবে তুমি একান্ত মুক্ত হইতে চাহ না ?”

অনঙ্গপাল অনুপরামকে স্বরের ধারের দিকে যাইতে দেখিয়া বলিল। “দাঁড়াও, আমি তোমাকে আর দশ ধান মোহর দিব। আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আর না বলিও না। দয়া করিয়া ছাড়। অনুগ্রহ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।”

অনুপরাম বলিল। “বিটল! তুমি কি শাকের দর করিতেছ ? আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। আমার একবার প্রভাবতীর স্নেহে যাইতে হইবে।”

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম, আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে হাত দিব না, অকল্যাণ হইবে। তোমার হাত ধরি। আমাকে কমা বর, আর কষ্ট দিও না। লও আর দশ ধান দিব। ইহার অধিক আর আমার সঙ্গতি নাই। ইহাতে না সম্মত হও ত আমাকে কাটিয়া ফেল। এই সমস্ত ধান মোহর দিতে আমার বখাসকর্ম্ম বিক্রয় করিতে হইবে। আবার হস্ত ঋণও করিতে হইবে। আমাকে আর অধিক দিতে বলাপেক্ষা আমাকে এককালে বলা ভাল যে, আমি আর পরিত্রাণ পাইব না। অনুপরাম, ধর্ম্মের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।”

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল, তোমার অপেক্ষা অধিক অর্থান্ধাচ আর আমি কাহাকেও দেখি নাই। তুমি আপনাকে ও আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠের প্রভাবশ্রী ও অর্থের অল্প বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। মনে কর, তোমার মৃত্যু হইলে তোমার ধন কে ভোগ করিবে ? তোমার প্রভাবতী কারাবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তোমার অর্থের দর কে

করিবে? এক্ষণে তোমার পরিত্রাণ কেহই নাই। স্বীয় অর্থ দিয়া কারামোচন লাভ করহ, নতুবা তোমার অর্থ তোমার ভোগে লাগিবেক না।”

অনুপপাল বলিল। “আমার অর্থ কোথায়, যে ‘কে বদ্ধ করিবে’ আমার বৎ-
কিকিৎ বাহা আছে, তাহা সকল বিক্রয় করিলেও তোমাকে একশত মোহর দিতে পারিব না। ভাল তাহার যদি তোমার সন্তুষ্টি হয় ও আমি তাহাই স্বীকার করিলাম।”

অনুপপাল বলিল। “পাপী! তোমার এখনও ধনে লোভ আছে। থাক আমি চলিলাম।” অনুপপাল দ্বার খুলিয়া চলিয়া গেল। অনুপপাল দেব কত ডাকিল। আরও পকাশ মোহর অধিক স্বীকার করিল। অনুপপাল ওষাপি ফিরিল না। অনুপ-
পাল বখন দেখিল যে, অনুপপাল একান্ত ফিরিল না, তখন হতাশ হইয়া ভূমিতে বসিল। ভাবিল কি বিশদ! ইহাদিগকে লেড়শত মোহর দিতে চাহিলাম, ইহারা তাহাতেও স্বীকার পাইল না। আরও কিছু দিলে ভাল হইত। লক্ষ মুদ্রা অত্যন্ত অধিক। আমি তাহা কোনমতেই দিব না।” আবার ভাবিল, “না দিলেই বা কি প্রকারে রক্ষা পাই! কিন্তু ইহাদিগের বৈরাগ্য পতিক, তাহার নিতান্ত চুই তিন সহস্রে সন্তুষ্ট হইবে না।—ভাল যদি আর একবার আইসে তবে দশ সহস্র দিতে এককালে স্বীকার করিব। যদি তাহার না পরিত্রাণ পাই, তবে আমার পরিত্রাণ হইল না।”—এইরূপ কতই চিন্তা করিতে লাগিল। একবার প্রভাবতীর কথা মনে উদয় হইল, অমনি ভাবিল, “আমি চুই লক্ষ মোহর দিব, ইহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিবে।” আবার বখন চুই লক্ষ মোহর কত ভ্রমে! জন্মে, ভাবিল, তখন একান্ত বিহ্বল হইল। মনে করিল, “এবার অনুপপাল আসিলে এক প্রকার তাহার সম্মতি লইতে হইবে। নতুবা অসহ্যে কত দিন বাঁচিব।” ভাবিল ধন দেওয়াত আমার হাত। দিব্য সময় কিছু কমাইয়া দিলে ক্ষতি নাই। দণ্ড্যকে গ্রহণনা করাত কোন দোষ জন্মে না।” ভাবিল, “এবার বালি রায়গড়ে বাইরা বসিতে পাই, তবে একবার ফিরি কি কম, তাহা বুঝিব। ইহারা সমুখ ফুকে কলচ অগ্রসর হইবে না।” মনে মনে বলিল, “যদি অনুপপাল সমাচার পাইতাম, তবে কি ইহারা কিছু করিতে পারিত? প্রভাবতী কি অবোধ, সে বালিকা কি বুঝি। বন্যাসমুখে আলিয়া উপস্থিত হইল! তাহার এটি নিতান্ত অবিহিত কর্তব্য হইয়াছে। সে যদি গুণে না মাত্ত, তবে কি পাণেশা আমাকে ধরিতে পারিত?” এইরূপ নানা চিন্তার মগ্ন হইল। ক্রমেই মনের বসন্তে ও শারীরিক পরিভ্রমে নিতান্ত ত্রাত হওয়ার অচেতন হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

এদিকে অনুপপাল অনুপপালের কাছাগার হইতে বাহির হইয়া গজালিসের বাড়ীর দিকে বাইতে গথে আনবলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ভিজ্জায়া বড়ার আনবলি বলিল।

“গজালিস প্রভাবতীর কারাগারে গিয়াছে।” অনুপরাম আপন বিজ্ঞান আবশ্যক আছে আপন আবাসে বাত্মা করিল।

তদিকে গজালিস অনুপরামকে অনঙ্গপালের বরে রাখিয়া প্রথমে ইন্দুতীর বরে গিয়া ঈশ্বরিত হইল। ইন্দুমতী স্নান হইয়া করতলে গণ্ডেশ রাখিয়া শূভ দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। স্পন্দমাত্র নাই, চিত্র পুঙ্খলিকার মত নিমেষশূন্য আর। গজালিস বরে প্রবেশ করিয়া কিছু অন্তর হইতে “ইন্দুমতি! কি ভাবিতেছ?” বলিয়াই সজ্ঞাষণ করিল। কিন্তু দুঃখাবনত ইন্দুমতী মোন হইয়া রহিলেন। গজালিস অল অগ্রসর হইয়া বলিল। “ইন্দুমতি! এখন চিত্তা নিষ্কল। নবাগত দলকে স্ত্রী-সজ্ঞাষণে গ্রহণ কর। বিগত চিন্তায় প্রয়োজন নাই।” ইন্দুমতী কোন উত্তর দিলেন না। যে অবস্থার হেঁটমুণ্ডে বসিয়া ছিলেন, ভেমতই রহিলেন। গজালিস অগ্রসর হইয়া বলিল। “ইন্দুমতি! তুমি কি অচেতন আছ, আমার কথা কি শুনিতে পাইয়াছ। না, অভিমান করিয়া উত্তর দিতেছ না? আমি কি তোমার নিকট দোষী আছি। যদি মোহবশত কোন অপরাধ করিয়া থাকি ত আমার সে দোষ হইতে মুক্ত কর। বল, কি প্রায়শ্চিত্তে সে দোষের পরিত্রাণ হয়, আমি কিন্তু কোন অমৎ ভাবে তোমাকে আনি নাই। আমার কথা শুল, আমি তোমার মঙ্গলাভিলাষে তোমাকে আনিয়াছি।” ইন্দুমতী মোনাবনত হইয়া রহিলেন। কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না। গজালিস দাঁড়াইয়া ইন্দুমতীর মুখচন্দ্রে প্রতি কণেক দৃষ্টি করিয়া এককালে মোহিত হইল। বতক্ষণ এককূটে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক কণের পর ইন্দুমতীর সম্মুখে বসিলে ইন্দুমতী উঠিয়া দূরে বাসিলেন।

গজালিস বলিল। “ইন্দুমতি! পথপ্রমে তোমার মুখ শুক হইয়াছে, হস্তমুখাদি প্রকাশন করিয়া কিছু আহ্বার কর।” ইন্দুমতী কোন উত্তরই করিলেন না। গজালিস বহুক্ষণ নিকটে থাকিয়া তাঁর বল। “হহার শোক ও অহকারের সমতা হয় নাই। ক্রমে কালবশে সকলই কামিয়া যাইবেক। এক্ষণে কোন কথা শুনিবেক না।” এই চিন্তিয়া গজালিস আত্ম আত্ম ইন্দুমতীর কারাগার ত্যাগ করিল। বাহিরে আসিলে ফ্রান্সিস্কোর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তোমার সমাচার কি, তোমার বন্দী কি তোমার উপর দরজাটি করিয়াছেন?”

গজালিস বলিল। “আমি এই ইন্দুমতীর বর হইতে আসিতেছি, ইন্দুমতী আমার সঙ্গে থাক্যোগ্য করিল না। প্রভাবতীর নিকট এ বেগা আর বাওয়া হইল না, বৈকালে একবার উভয়ের নিকট বাইব। এখন তোমার কি সমাচার?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আমার এক প্রকার হুশল। যে স্ত্রীলোকটিকে বন্দী করিয়াছি,

সেটি বড় সুবোধ। অল্পে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিছা এক প্রকার আমাদিগের ধর্মপ্রাণ্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। পরে দেখা যুক, কি হয়। এখন আমি অধিক আশা করি না। অল্পে অল্পে ভাল।”

গঞ্জালিস বলিল। “চল আমার সঙ্গে আহার করিবে। বিবাহ অবধি অল্পকতীর সঙ্গে আমার আলাপ করা হয় নাই। অবকাশ কোথায়! এখন বাইরা আমার নুতন গৃহিণীর বন্দোবস্ত দেখাইব।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ভাল বলিয়াছ, চল একবার তাহাকে দেখা কর্তব্য। গঞ্জালিস ও ফ্রান্সিস্কো একত্রে চলিয়া গেল। বাইতে বাইতে ফ্রান্সিস্কো বলিল। “এ বন্দীদিগের শীত্র কোন বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এখানে যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যদিচ একপ্রকার মত বৈদ্যনাথকে ধরায় ক্ষান্ত হইয়াছে বটে, তথাপি রোগটি কোনমতে নিম্ন হইয়াছে নাই। বৈদ্যনাথের লোকেরা হঠাৎ কিছু যুদ্ধে প্রস্তুত হইবে না, কিন্তু তাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবে না।”

গঞ্জালিস বলিল। “এখন আর তাহার জন্ত যুদ্ধ করে, এমত লোক কে আছে?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তাহার পক্ষি গোমস্তা অত্যন্ত প্রভুভক্ত, সেই উদ্যোগী হইয়াছে, তিন চারি দিনের মধ্যে একখানা ব্যাপার উপস্থিত করিবে।”

গঞ্জালিস বলিল। “আমরাও এখানে আর অধিক দিন থাকা হইবে না। আমাকে শীত্রই যশোরপতির আদেশে সেনা লইয়া আরাকানে বাইতে হইবে। তোমরা এমত হান্সামার বন্ধ থাকিলে আমিই বা কি করিয়া তোমাদিগকে ফেলিয়া যাই, বাহাতে শীত্র এটি চোকে, তাহার চেষ্টা দেখ।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “রায়গড়ের বন্দীদিগের কি করিবে?”

গঞ্জালিস বলিল। “রায়গড়ের আর বন্দী কে রহিল? এক অনঙ্গপাল, তা অনুপরাম তাহার সঙ্গে চুকাইবে। প্রভাবতী আমার। ইন্দুমতীকে হজুরমল লইবে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ওবে রুড ও ভিক্রুসকে ডাকাইয়া অন্যই সন্ধ্যার সময় সকল মিটাইয়া দিব। তুমি অনুপরামকে কিছু সহায় হইতে বলিও। আর অধিক লোভে প্রয়োজন নাই। শীত্র যে কিছু পাওয়া যায়, তাহাওই সম্ভব হওয়া ভাল।”

গঞ্জালিস বলিল। “আমি অনুপরামকে পত্র লিখিব, অন্য বৈকালে আমার সঙ্গে আহার করিবে, পরে হুই জনে একত্রে আপন আপন বন্দীর ঘরে বাইব।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আমি একবার ঘুরিয়া আনিতেছি। ফ্রান্সিস্কো অপর দিকের চলিয়া গেল। গঞ্জালিস আপন আবাসে বাইরা আহারে নিযুক্ত হইল।

ষোড়শ অধ্যায় ।

“অন্তর্ভুক্ত জিহাংসতো বজ্রমিজ্রাভিলাসতো।

মঘবরাধ্যাত্ত বা দাসস্ত বা সনুতো যবরা বধম্।”

ক্রমে সায়ংকাল অতীত হইল। অনুপরাম গাঞ্জালিসের আবাসাভিমুখে চলিল। ক্রাসিন্‌কো, ভিক্রুস, রুড, আনথনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ফিরিকিদিগের গাঞ্জালিসের ঘরে নিমন্ত্রণ থাকায় সবলেই গাঞ্জালিসের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গাঞ্জালিসের আবাসঘরে বড় বড় দীপ জলিতেছে। চতুর্দিকে আলোক। অরের বাতাগন দিয়া আলোকের জ্যোতি অন্ধকার মাঠ হইতে দেখা বাইতেছে। আমোদের সম্মী নাই। সকলেই ছুট। হাস্য, পরিহাস, গান বাজ্য, প্রভৃতি বিবিধরূপ মুখর আমোদ হইতেছে। অনুপরাম গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ক্রাসিন্‌কো ও গাঞ্জালিস অঙ্গসর হইয়া সম্ভাবণ করিল। গাঞ্জালিস স্বয়ং অনুপরামের হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ক্রাসিন্‌কো বলিল। “তোমার এত বিলম্ব কেন?”

অনুপরাম বলিল। “আমি মনে করিলাম, তোমরা এত শীঘ্র আসিবে না। তোমরা যে পেট ধরে এসেছ, আমি ত তা জানি না।”

ভিক্রুস অন্তরে ছিল, অনুপরামকে দেখিয়া আনথনিকে চুপি চুপি বলিল। “দেখ, অনুপরামকে এ বেশে কেমন শোভিয়াছে? সত্য বলিতে কি, অনুপরাম সিংহাসনে বসিলে বড় ভাল দেখাইবে।”

আনথনি বলিল। “অনুপরামকে কেমন বলবান্ দেখাইতেছে, অনুপরাম দেখিতে অতি সুপুরুষ।”

ভিক্রুস বলিল। “ইহার ভরী কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী।”

আনথনি বলিল। “ইহার ভরীর কিন্তু মুখশ্রী আর এক গঠনের। অনুপরাম আসিয়া অবধি আপন ভরীর সহিত সাক্ষাৎ করে নাই।”

ভিক্রুস বলিল। “ওদের কি লেহ আছে? তা থাকিলে কি আপনার ভরীকে, আমাদের দিয়া রাজ্য লইতে আসিত?”

আনথনি বলিল। “গঠক বলিয়াছ, ইহাদিগের ধনই একমাত্র আশ্রয়।”

ক্রমে অনুপরাম নিকটস্থ হইলে ভিক্রুস ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া অনুপরামকে অভ্যর্থনা করিল।

অনুপরাম বলিল। “ভিক্রুস কতজন?”

ভিক্রুস বলিল। “আমরা অনেকজন আসিয়াছি, তুমি কতজন?”

অনুপরাম বলিল। “আমি এই আসিতেছি। আনথনি! কখন আসিয়াছ?”

আনখনি বলিল। “আমি ভিক্রুসের পূর্বে আসিয়াছি।”

অনুপরাম ক্রমে অঙ্গে অঙ্গে বাতায়নের নিকটবর্তী হইলে তথায় দণ্ডায়মান। অরুণ্ডী সন্নিহা স্থানান্তরে গেল। অনুপরাম অপর তিন জন ফিরিঙ্গি স্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিল। গঞ্জালিসের নিকট হইতে অনুপরাম ভিক্রুসের দিকে গেল। গঞ্জালিস অরুণ্ডীর জন্ত একবার ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পরে দূর হইতে অরুণ্ডীকে বাতায়নে দেখিয়া সেই দিকে আসিতেছিল, কিন্তু অরুণ্ডীকে সেখান ত্যাগ করিতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিল। অরুণ্ডী ক্রমে সে ঘর ত্যাগ করিয়া পৃথিব্যে গেল। গঞ্জালিস তাহাকে পৃথিব্যে ডাকিয়া বলিল। “অরুণ্ডী! কোথায় বাইতেছ? অনুপরাম আসিয়াছে চল দেখা করিবে।”

অরুণ্ডী মান হইয়া বলিল। “আমার অত্যন্ত অসুখ করিতেছে। আমি এত জন-সমাপনে বাইতে পারি না।”

গঞ্জালিস বলিল। “কি অসুখ হইয়াছে?”

অরুণ্ডী বলিল। “আমার অসহ শিরঃশীড়া হইয়াছে, আমি কথা কহিতে পারি না।”

গঞ্জালিস বলিল। “তবে আর এ গোলে থাকিও না। আপন ঘরে বাইয়া শয়ন কর, আমি অনুপরামকে লইয়া তোমার নিকটে আসিতেছি।”

অরুণ্ডী বলিল। “না আমার এত ব্যামোহ হয় নাই যে, তোমরা আমোদ ত্যাগ করিয়া আমাকে দেখিতে আসিবে। অনুপরামকে আমার নিকট আনিতে হইবে না। নশ জন আত্মীয় ভক্তলোক আসিয়াছে, তাহাদিগের আমোদে কণ্টক দেওয়া ভাল নহে।”

গঞ্জালিস বলিল “এও কি কথার কথা! যখন গৃহিণী অসুখ হইয়াছেন, এখন আর কি সে গৃহে আমোদ সম্ভবে? এখান সকলকে বিদায় দিয়া, আমি ও অনুপরাম তোমার-পূর্ব হইতেছি।”

অরুণ্ডী ব্যগ্র হইয়া বলিল। “আমি তোমায় বিনতি করি, তুমি অধিকক্ষণ ও যত্ন ত্যাগ করিয়া থাকিও না। উহার কি মনে করিবে! আমাকে ক্ষমা কর, আমি নতুবা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। এ কি লজ্জার কথা যে, আমার জন্ত এতগুলি লোক দুঃখন হইয়া বাইবে।”

গঞ্জালিস বলিল। “আমার ও আমোদে মন বাইবে না। অন্যকার লোকসমা-নয় তোমায়ই মাত্মার্থে, তোমার অবিদ্যামানে আর রোগাবস্থায় সে উৎসব বৃথা। আজ তোমায় সঙ্গে সকলেই আলাপ করিতে চাহিবে। আমি তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিব। তাহার। তোমাকে না দেখিতে পাইলে অপমান বোধ করিবে, অতএব তাহাদের। তাহাদিগকে স্পষ্ট বলা ভাল, অতঃ এক দিন আবার আমন্ত্রণ করা বাইবেক।”

অরুণ্ডতী বলিল। “আজ প্রায় সকলের সঙ্গেই ত আমার পরিচয় হইয়াছে।”

গঙ্গালিস বলিল। “বাকি সকলের সঙ্গে আলাপ না হইলে তাহারা হৃৎকথিত হইবে। আবার আহারের পূর্বে সকলেই তোমাকে দেখিতে চাহিবে। আর অগাধ ত্রী কুটুম্বের কে সমাদর করিবে? তুমি যেরে যাও, আমি ইহাদিগকে বলিয়া আসি।”

অরুণ্ডতী বলিল। “আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম।”

ভিক্রুস গঙ্গালিসকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল। “ব্যাপার খানা কি?”

গঙ্গালিস বলিল। “ভিক্রুসই আসিয়াছে, ভাল হইয়াছে। অরুণ্ডতীর অভ্যন্ত শিরঃশীড়া হইয়াছে। লোকের সমাগমে থাকিতে পারিলেন না। তাই তুমি যদি একবার সকলকে দিয়া বল।”

দূরে অনুপরাম দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, ভিক্রুস অনুলি দ্বারা ইঙ্গিত করিলে অনুপরাম দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুপরামকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অরুণ্ডতী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া টনিয়া পড়িল। অমনি গঙ্গালিস ও অনুপরাম হস্ত বিস্তারিয়া ধরিল। অরুণ্ডতীকে লইয়া নিকটস্থ ঘরের পর্ধ্যাঙ্কে শয়ান করিয়া দিলে অনুপরাম বলিল। “এ ত্রীলোকটি কে? ইহার কি হইয়াছে?”

গঙ্গালিস কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল। “এটি কে তা তুমি কি জান না? এখন কি তোমার ব্যঙ্গ করিবার সময়।” অনুপরাম কিছু খামিয়া ভিক্রুসকে জিজ্ঞাসা করিল। “এ ত্রীলোকটি কে, তুমি জান?”

ভিক্রুস বলিল। “আহা, ইনি পাঁচ ছয় দিনে সব ভুলিয়া গেলেন। ইটি যে তোমার ভগ্নী অরুণ্ডতী? তুমি কি এখনই আশ্রয় বিস্মৃত হইলে?”

অনুপরাম বলিল। “ভিক্রুস! আমি তোমার বিনতি করি। সত্য করিয়া বল, রহস্ত করিও না।”

গঙ্গালিস বলিল। “অনুপরাম! তুমি কি উদ্ভ্রান্ত হইয়াছ? তোমার আপনার সহোদরকে চিনিতে পারিতেছ না? না চিনিবার কারণ কিছু দেখি না।”

অনুপরাম কিছু অবাক হইয়া রহিল। ক্রমে সেই ঘরে সকল আগত আত্মীয়েরা সমাগত হইতে লাগিল। কিছু কাল পরে অনুপরাম গঙ্গালিসের হাত ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল। নির্জনে স্থানে গিয়া বলিল। “গঙ্গালিস আমি উদ্ভ্রান্ত নহি, আমার যথেষ্ট চেতনা আছে; আমি তোমাকে এ সময় এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতাম না। কিন্তু ইহাতে ত্রী ব্যাপার উপস্থিত হইতেছে। আমার ঘির হইয়া থাকাই বিধেয় ছিল, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইলে পাছে তুমি আমার হুপরাশ প্রয়োগ কর, এই ভয়ে আমি এখনই ইহার তৎকাব্যারণে উৎসুক হইতেছি। আরও আমার আপনার ভগ্নী কি হইল, তাহাও আমার বিশেষ অবগত হওয়া কর্তব্য। আমার তাহার প্রতি কিছু অত্যন্ত স্নেহ

বশত আমি অনুসন্ধান করিতেছি না, আমার আশ্রয়কাণ্ড আবশ্যক। তোমার বিবাহের সময় আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না। আমি বিশেষ আনিভাষ, তোমাকে বাসিন্দে বরণ করিতে অরুণ্ডীর অত্যন্ত অনিচ্ছা ছিল। বাহা হউক, এখন আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, ঐ ঘরে যে ব্যামোহ ছল করিয়া শয়নে আছে সে আমার ভগ্নী নহে। আমি তাহাকে পূর্বে কখনই দেখি নাই। তুমি ইহার তত্ত্বাবধারণ করে যে, এ ক্রীলোকটি কে, আর আমার ভগ্নীই বা কোথায় গেল ?”

গঞ্জালিস একমনে অনুপরামের কথা শুনিতেছিল। তাহার বলা শেষ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনুপরামের অর্থ ভাল বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে কণা-মাত্রও সন্দেহ হইল না যে, এ অরুণ্ডী নহে। কিন্তু অনুপরামেরই বা এরূপ আগ্রহ-ভিষয়ে বলিবার কারণ কি? ভাবিল, অনুপরামের বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টি পরীক্ষায়-করণাভিলাষে অনুপরামকে বলিল। “তুমি এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসিতেছি।”

যে ঘরে অরুণ্ডী শয়নে ছিল, তথায় গিয়া সকলকে বলিল “আপনারা এখানে ভিড় করিবেন না।” সকলে স্বয়ং ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, গঞ্জালিস অরুণ্ডীর শয্যায় বসিল। অরুণ্ডী লোক সব অন্তরিত হইল দেখিয়া কিছু স্তব্ধ হইল।

গঞ্জালিস বলিল। ‘অরুণ্ডী! তোমার ভাতা অনুপরাম তোমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। ইহার মর্ম্ম কি, তুমি অনুপরামকে বুঝাইয়া দাও। আমি তাহাকে তোমার এখানে আনিতেছি।’

অরুণ্ডী বলিল। “আমি এখন অত্যন্ত অসুস্থ আছি। এখন তাহাকে আমার নিকট আনিও না।”

গঞ্জালিস বলিল। “সে তোমার স হত না কথা কহিলে স্থির হইবে না।”

অরুণ্ডী বলিল। “কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না।”

গঞ্জালিস বলিল। “কেন? আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছ? তাহার সঙ্গে কেন পারিবে না?”

অরুণ্ডী বলিল। “তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে, আমার দেশের কথা সব মনে পড়িবে। কেন আমার সুখে কণ্টক দিবে। আমি এখন তোমাকে পাইয়া আপন ধর্ম্ম পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি। এখন সে সকল ভুলিয়া রাখিয়াছি। তাহাকে দেখিলেই আবার সে সকল চিন্তা উধালিবে!”

গঞ্জালিস বলিল। “তোমাকে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে।”

অরুণ্ডী বলিল। “আমি তোমাকে এই বিনয় করি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কোম-হানি করি নাই। তোমাকে পাইয়া অবশি তোমার সেবার ও সুখবর্ধনে

নিবৃত্ত আছি, তবে কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিবে।” এ বধাতে গঞ্জালিসের মন কিছু ভিজিল।

গঞ্জালিস বলিল। “যদি একান্তই তোমার কষ্ট হয় তবে প্রয়োজন নাই, কিন্তু কিসে তাহার বিবাহ হয়। অনুপরাম অগ্নে অগ্নে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া এ সকল শুনিতে-ছিল। অগ্রসর হইয়া বলিল। “গঞ্জালিস! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, এ আমার ভদ্রী নহে, অরুদ্ধতীর প্রতি “কি গো! তুমি অরুদ্ধতী বলিয়া এখানে আসিয়াছ, ভাল বল দেখি আমার জ্যেষ্ঠ বিনি এখনে আরাকানে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার নাম কি?”

অরুদ্ধতী কর ঘোড় করিয়া বলিল। “অনুপরাম কান্ত হও, আমাকে ক্ষমা কর, আর সে সকল কথা আমার মনে তুলিও না। তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধি ভ্রম না হইলেই বা কেনন করিয়া আপনায় ভদ্রীকে অর্থলোভে অস্ত্রধর্ম্মীকে দিয়ে বাও। তুমি আর আমার সম্মুখে আসিও না। আমার অদৃষ্টে বাহা ছিল, তাহা ঘটিল। এখন আমার বর্তমান অবস্থার সুখী হইয়া কাল কাটাই। আর আমার দক্ষ করিও না।”

অনুপরাম বলিল। “হা ধর্ম্ম! এ পাণ্ডুরসী বলে কি। এ ত প্রকৃত বেণ্ডা দেখিতে পাই। এমনত হুঁহু আর ত কুত্রাপি দেখি নাই। ও সকল চাতুরী ছাড়, এখন বল আমার ভদ্রী কোথায় গেল, নতুবা আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব।”

অরুদ্ধতী ঈষদ্ বিরক্ত হইয়া বলিল। “যাও তোমার ধতদূর সাধ্য ছিল, তাহা করিয়াছ, এখন আর আমি তোমাকে ভয় করি না।” গঞ্জালিস ইহাদিগের দুইজনের কথা বার্তায় কিছু আশ্চর্য্য হইল। একবার ভাবিল বুদ্ধি অনুপরাম সত্য বলিতেছে, আবার ভাবিল, সত্য না বলিবারই বা উদ্দেশ্য কি? ফলতঃ এ স্ত্রীলোক যে হউক আমার স্ত্রী ত বটে, ইহাকে এখন কোন ক্রমে ত্যক্ত বা অপমান করিতে দেওয়া হইবেক না।” অনুপরামকে বলিল। “অনুপরাম, তোমার এ অত্যন্ত অজ্ঞায়! আমার ঘরে থাকিয়া আমার স্ত্রীকে অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতেছ।”

অনুপরাম বলিল। “হাঁ, এ তোমার স্ত্রী হইত, বলাপি এ সতী থাকিত। এটা কোন ফলশ্রী কস্তা, চাতুরী করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ করিয়াছে। তুমি সন্তুষ্ট হইতে চাহ থাক, কিন্তু আমি ইহাকে আমার ভদ্রী বলিব না।”

গঞ্জালিস বলিল। “অরুদ্ধতী! ইহার একটা সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। তুমি সত্য করিয়া বল তুমি কে, আর অনুপরামের ভদ্রীই বা কোথায়?”

অরুদ্ধতী কাতরভাবে বলিল। “তুমিও কি পাষণ্ডের সঙ্গে পাষণ্ড হইলে! আমার মৃত্যু হইলেই আমি সুখী হই। আমার প্রতি তোমার অধিষ্ঠান হয়ত, আমাকে কাটিয়া ফেল, আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই, রাজ্য গেল, দেশ ত্যাগ করিলাম, ধর্ম্মও ছাড়িলাম, ইহাভেৎ যদি শান্তি নাই, তবে আমি মরিলেই ভাল।”

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম, তুমি কাত্ত হও।” অনুপরামের হস্ত ধরিয়া সে ষর হইতে বাহিরে আইল। অনুপরাম কিছু আপত্তি করিল না। তাহার মনে কেমন একটি অব্যক্ত চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাবিল “এক ঘটনা, ইহার কিছু তাব বুঝিতে পারিলাম না।” এটি যে অরুণতীর পরামর্শ, তাহা নিশ্চয় বুঝিল। কিন্তু একসে সে কোথায় আছে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে আমাত্ত লোকেরা গৃহকর্ত্তীর ব্যামোহ তনিয়া নিভান্ত ম্লান হইল। সকলেই আপন আপন ষরে বাইবার উন্মোগ পাইল। এমত সময় অরুণতী আসিয়া গঞ্জালিসকে বলিল, “আমার এখন রোগ শাস্তি হইয়াছে, সকলকে বহু কষ্টিয়া আহার করিতে বল।”

গঞ্জালিস হৃষ্টমনে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একত্রে মহা আনন্দে আহারে বসিল। আহাৰ্য্যে বহুকণ আমোদ প্রমোদ করিয়া অবশেষে রাত্রি নেড় প্রহরের সময় সকলে বিদায় লইয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল। কেবল ফ্রান্সিস্কা, অন্নদা, তিতুস ও রুড বসিয়া রহিল। সকলে বিদায় হইলে গঞ্জালিস বলিল। “চল একবার আমাদিগের বন্দীদিগকে দেখিয়া আসি, তাহারা কি করিতেছে।” সকলেই কারাগারে যাইতে প্রস্তুত হইলে অনুপরাম বলিল। “গঞ্জালিস, আমি এখন আপন ষরে চলিলাম।”

গঞ্জালিস বলিল। “কেন, চলিবে কেন, কারাগারে চল, বন্দীদিগের একটা বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক।”

অনুপরাম বলিল। “চল যাই। কিন্তু অনেক রাত্রি হইয়াছে, কাল প্রাতে হইলেই ভাল হইত।”

গঞ্জালিস বলিল। “আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।” অনুপরাম গঞ্জালিসের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে অন্তর্গেডিভের দ্বারে গিয়া পৌঁছিল। এক জন বৃদ্ধ দ্বারী ভিতরে অর্ধ উন্মীলিতদ্বারে বসিয়াছিল, ইহাদিগকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিকট হইতে গঞ্জালিস সকল দ্বারের চাবি লইয়া এক একটি এক এক জনকে বাঁটিয়া দিল। সকলে আপন আপন বন্দীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রবেশ করিল। বন্দীরা নিভান্ত ম্লানবদনে বসিয়াছিল, পাষাণদিগকে ষরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিল। হুর্ভাগা ইন্দুমতীর ষরে গঞ্জালিস প্রবেশ করিলে ইন্দুমতী মাথাটি তুলিয়া দেখিল। অনুপরাম অনঙ্গদেবের ষরে, ফ্রান্সিস্কা অরুণতীর ষরে, আনন্দি বৈদ্যনাথের নিকট, রুড গেলিগের ও তিতুস বরদাকর্ষের ষরে প্রবেশ করিল। অনুপরাম বহুকণের পর অনঙ্গপাল দেখকে এক লক্ষ মোহর দিতে স্বীকার করাইল। অনঙ্গপাল বলিল। “ভাল, এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রত্যাবর্ত্তীকে লইয়া যাই।”

অনুপরাম বলিল । “তা কি ক’রে হইতে পারে, আমি তোমাদিগকে এখান হইতে ঘাইতে দিতে পারি না । তুমি এইখান হইতে পত্র লিখিয়া দাও, আমাদিগের লোক মোহর লইয়া ফিরিয়া আসিলে তুমি মুক্ত হইবে ।”

অনঙ্গপাল বলিল । “আর মোহর লইয়া তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়া না দাও তবে ও আমার উভয় কুল নষ্ট হইবে । আমি ইহাতে কোন মতে সম্মত হইতে পারি না ।”

অনুপরাম বলিল । “ভাল, আর তুমি যদি আমাদিগের দেশ অতিক্রম করিয়া আর মোহর না দাও, তবে আমি তোমার কি করিব ?”

অনঙ্গপাল বলিল । “আমি ধর্ম্মত্যাগ করিতেছি, ইহাতেই তোমার বিশ্বাস করা কর্তব্য ।”

অনুপরাম বলিল । “ওবে আমার কথার তোমারও বিশ্বাস করা উচিত । আমি বলিতেছি, ধন পাইলেই তোমাকে ও তোমার কত্ৰা প্রভাবতীকে ছাড়িয়া দিব ।”

অনঙ্গপাল বলিল । “দস্যুর কথা বিশ্বাস কি ? যে অপর লোককে অকারণে বন্দী করিতে পারে, সে মনে করিলে আপনার পণ শতবার ত্যাগিতও পারে ।”

অনুপরাম বলিল । “অনঙ্গপাল ! তোমার একান্ত অবিশ্বাস হয়, তবে বাইও না, আমিও ধন চাহি না ।”

অনঙ্গপাল বলিল । “নরাদম ! কেন অকারণ আমাকে বন্দী করিয়াছ ? তুমি কি ভাবিতেছ না যে, পরকালে কি উৎসে দিবে ? তোমার যে কোন নরকে বাস হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না ।”

অনুপরাম হাসিয়া বলিল । “অনঙ্গপাল, বুদ্ধ হইয়া তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে, নতুবা একরূপ অনুপযুক্ত যথেষ্টা বাক্য আমাকে প্রয়োগ করিতে না । আমি এক্ষণে তোমার প্রভু, তুমি আমার ক্রৌড়দাস, তোমার মুখ হইতে এ সকল কথা বাহির হওয়া উচিত নহে । আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া কথা কহা ভাল ।”

অনঙ্গপাল বলিল । “পান্ধী চণ্ডাল ! তোর এত বড় সাধ্য যে আমাকে ক্রৌড়দাস বলিস ! জানিস না, আমি উৎকৃষ্ট সারস্বত ব্রাহ্মণ, আমার পাদস্পর্শে তোর অধিকার নাই । গুরুলোকের অবমাননায় সমুচিত দণ্ড পাইবে । দূর হ । আমার সমুখ ত্যাগ কর । তোর সঙ্গে বাক্যালপে আমাকে পাপ স্পর্শ করে । আমি গৃহে প্রাণগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিব ।”

অনুপরাম বলিল । “সেই ভাল, যখন গৃহে যাইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করিও, এখন বধের সুপ্ত্র হইয়া আমার সেবার নিযুক্ত থাক ।”

অনঙ্গপাল বলিল । “অনুপরাম জাতিভিমান নষ্ট করিও না । আমি সর্ব্বব্রাহ্মণ, আমাকে অবমাননা করার তোমার কি লাভ ?”

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল! আমি অগ্রে তোমার কোন অপমান বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তুমি আপনি অত্যাচারে আমাকে উত্তেজিত করিতেছ। পরন্তু আমাকে ধন ব্যয়পি না দিতে পার, তবে তোমাকে দানের কর্ত্তব্যে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে। ইহাতে আর বিলম্ব করিও না। মত স্থির কর, নতুবা এক্ষণেই তোমাকে কারাগার হইতে লইয়া আমার ঘরে যাইব। আর তোমার প্রভাবতী আমার সামান্ত দাসী হইবে। কত্রিয়বংশের এই নিয়ম, রূপে পরাজিত শত্রুকে দাসত্বে নিয়োজন।”

অনঙ্গপাল বলিল। “ভাল আমার কষ্টকে ছাড়িয়া দাও, সে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ধন আনিয়া তোমাকে দিবে। আমি তত দিন তোমার নিকট বন্দী রহিলাম।”

অনুপরাম বলিল। “ভায়া কোন ক্রমেই হইতে পারে না। তোমার মত হীনবল বৃদ্ধ লইয়া আমার কোন উপকার দর্শিবে না। তোমার কষ্ট থাকিলে আমার যথেষ্ট মুখ সম্পাদন করিবে।”

অনঙ্গপাল এই কথা শুনিষামাত্র জলিয়া উঠিল। কোপ তাহার বদন মণিবর্ণ হইল। নয়নবয় আরক্ত হইল। শরীর লোমাক্ষিত হইল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল, কিন্তু কোপ প্রকাশে আপনায় হানি জ্ঞানে মনের রোষ মনেই রহিল। ভাবিল, এখন কোন মতে পরিজ্ঞাপ পাওয়াই উদ্দেশ্য; কি করিয়া স্বার্থ সাধন হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। অত্যন্ত ধনপ্রিয়, এক কালে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। আবার যদি তাহাই দেয়, তথাপি আপনাদিগের উদ্ধারের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্ত্তমান রহিল। কি জানি, যদি পাপেরা অর্থ পাইয়া আবার অধিক অর্থ লোভে ছাড়িয়া না দেয়, তবেই ত ধন নষ্ট ও আশ্রয়ক্ষা দুর্লভ। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া নিতান্ত নিরাশ হইল। অনাহারে শরীর হীনবল হইয়াছিল, আবার ভাবী আহারাভাব-চিন্তায় বিগুণ ক্ষীণ করিল। ‘অনঙ্গ-পাল অবলম্ব হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। মধুসূদন নাম চিন্তা করিয়া আপনাকে তাহার অর্পণ করিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, “প্রাণ যায় যাক, তথাপি জাতি ত্যাগ কোন মতেই হইবে না। ক্রিষ্ণিসিদ্ধ অন্ন বা জল গ্রহণ করা হইতে পারে না।” কিন্তু প্রভাবতীর চিন্তায় অনঙ্গপাল জীর্ণ হইল। সে মন্য বাল্য, কি করিয়া এ হৃদয় অনাহারযন্ত্রণা সহ করিবে। আবার এ পাপদিগের তাড়নে কিরূপ ব্যবহার করিবে! অনঙ্গপালের চিন্তা অত্যন্ত হইল। সন্তানের প্রাণের অস্ত, ধর্ম্মের অস্ত পিতার যতদূর ভাবনা হয়, তাহার অধিক অনঙ্গপালের হইল। অনঙ্গপালকে সংসারে বদ্ধ করিবার একমাত্র গ্রন্থি প্রভাবতী। অনঙ্গপাল নিতান্ত কাণ্ড হইলেন, কিন্তু পাষাণহৃদয় অনুপরাম তাহা দেখিয়াও লক্ষ্য করিল না। মনে মনে তাহার আশঙ্ক হইতে লাগিল, ভাবিল, “এইবার এ মর্যাদা অবশ্য ধনলোভ ত্যাগ করিবে, আরও অধিক পূর্ণ আর্পনাদিগের স্বাধীনতা দ্রব করিবে।”

অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম! আমার পত্র লিখিবার পাত্র নাই। আমার ঘরে এমত কেহ নাই যে, আমার পত্র পাইয়া জবাবদি বিক্রয় করিয়া আমাকে ধন পাঠায়। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার সঙ্গে চাকুরী করিব না।” অনঙ্গপাল অস্তিত্বে ভর দিয়া গুললয়-কৃতবাস হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে বলিল। “অনুপরাম, ধর্ম্মার্থে দয়া করিয়া আমাদিগকে মুক্ত কর, আমরা ঘরে পৌছিয়াই তোমাকে ধন পাঠাইয়া দিব।”

অনুপরাম বলিল “সেটি কোন মতেই হইবে না, কেন আমাকে ত্যক্ত কর। শিষ্য! তোমার উপযুক্ত না হইলে তুমি সরল হইবে না। এখনও তোমার ধনে এত বহু।”

অনঙ্গপাল ভাবিল। “কি বিপদ! এ পাপকে আমি যেন পত্র দিলাম। কিন্তু পত্রের উত্তর আসিতে নয়নসংখ্যা দুই দিন লাগিবে। আমি দুই দিন বিদুমাত্র স্পর্শ না করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করি? আমারও যদি সম্ভব, প্রভাবতীর ত একান্তই অসাধ্য হইবে। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে অবশেষে এই লিখিয়াছিল। আমা অপেক্ষা বন্যজন্তুরাও সুখী।” অনঙ্গপাল কতই চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। যাকো অনুপরাম অনঙ্গপালকে চিন্তায় মগ্ন দেখিলে আপনার হস্তস্থ যষ্টির অগ্রভাগ দিয়া জাগ্রত করিতেছিল। ক্রমে অঙ্গ স্পর্শে অনঙ্গপালের ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে অনুপরামের দৌরাত্ম্য অসহ্য হওয়ায় অনঙ্গপাল চিন্তিল, কি করা যায়, এ দুইয়ের জালায় ত স্থির হওয়া দুর্লভ, আর এ কারাগার হইতে অব্যাহতি পাওয়াও একান্ত অসম্ভব। বহুক্ষণ ব্যর্থ বচসায় অনুপরামেরও ক্রোধ জন্মিল। ক্রমে হুই একবার কথার কথার অনুপরাম আপনার যষ্টির দ্বারা ঘণা প্রকাশ কালে হুই এক বা প্রহারও করিতে লাগিল; অনঙ্গপালকেবের লোমকূপে কূপে ক্রোধাঘি জলিতে লাগিল। কিন্তু কি করে, প্রভাবতীর কুশলাকাক্ষায় সকলি সহিতে হইল। অনুপরাম আপন উদ্দগ্ধ সাধনে অসমর্থ হওয়ার ক্রমে বিরক্ত হইয়া অনঙ্গপালের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। অপরিমিত অপমান ও শীড়নে অনঙ্গপাল জিল। “অনুপরাম, আর আমি তোমার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারি না। আইস, তোমাকে শরশুমার উগ্রসেনের নামে পত্র লিখিয়া দি।”

অনুপরাম বলিল। “লিখ, তবে কাগজ ও লেখনী আনি।”

অনঙ্গপাল বলিল। “যাও শীঘ্র আন।”

অনুপরাম কারাগার হইতে বাহিরে গেল।

এদিকে তিফুস বরদাকঠের গৃহে প্রবেশ করিযামাত্র বলিল “কি এত রাগে যে আবার জালাতে এলে? রাত্রিটায় নিদ্রা যেতে দাও, আবার প্রাতে যেকদম নিত্য নীতি আছে, তাহা করিও।”

ভিক্রুস বলিল। “আ মরণ! বন্দীর আবার মুখ কি? বন্দী তাহার প্রভুর মুখ লক্ষ্য করিবে। আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি, একটু বিশ্রাম করি” বলিয়া ভিক্রুস বরদাকর্ণের সম্মুখে বসিল। আপনাদের পাদদ্বয় অগ্রসর করিয়া বরদাকে বলিল, “আমার পদ সেবা কর” বরদা ভিক্রুসের কথায় কোন উত্তর করিল না। কোণে তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল।

ভিক্রুস বলিল। “কিহে বাপু! আমার কথাটা কি গ্রাহ্য হইল না?” হস্তহ আশ্রয় লইয়া বরদাকে একটি আশ্রয় করিল। বরদার শরীরে বেত স্পর্শমাত্র সে অঙ্গের চর্ম ছিড়িয়া গেল। বরদা অমনি উদ্বেজিত সিংহের স্থায়, অগ্নিকণা স্পর্শে বারুদপুঞ্জের স্থায় ধপ করিয়া উঠিল। একেবারে এক লক্ষ ভিক্রুসের স্বাক্ষর ধারণ করিয়া ভীষণ প্রস্তরাপেক্ষা কর্তন মুষ্টি ভিক্রুসের পৃষ্ঠে মারিল। ভিক্রুস প্রহারবলে পৃষ্ঠদেশ বাঁকাইল, আর একটি অব্যক্ত নাতিভীষণ নাতিক্রমণ শব্দ করিল। মুষ্টিাঘাত পরে বরদাকর্ণ বলিল। “কেমনে সেবা হইয়াছে, না আরও আবশ্যক?”

ভিক্রুস বলিল। “নরাধম! তোর এতদূর সাহস যে, তোর প্রভুর উপরে হাত চালায়?” ভিক্রুস বেত লইয়া আবার বরদাকর্ণের উপর চালাইল। বরদাকর্ণ দক্ষিণ হস্ত বিস্তারিয়া সে বেতটি ধরিল ও অমনি বলপূর্ব্বক ভিক্রুসের হস্ত হইতে লইয়া তাহার দ্বারা অসহ্য বলে ভিক্রুসের পৃষ্ঠে এক আঘাত করিল। ভিক্রুস প্রহারে অত্যন্ত কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু ক্রোধে তখন সেটিও তত অধিক বেধ হইল না। দাঁড়াইয়া দ্রুত বরদাকর্ণের গলদেশ ধরিল। বরদা ভিক্রুস অপেক্ষা অধিক বলবান ছিল, ভিক্রুসের হাত ছাড়াইয়া তাহাকে ধরিল। ভূমিসাৎ করিল। ভূমিসাৎ করিয়া তাহার বক্ষস্থলে চাপিয়া বসিল। ভীম মুষ্টিাঘাতে তাহার মুখ আরক্ত করিল। পরে আপনাদের উভয়দিক দিয়া অহোর মুখ বন্ধ করিয়া তাহার পা ধরিয়া টানিয়া গৃহের অপর দিকে লইয়া ফেলিল। অমনি দ্রুতপদে দ্বারভিমুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে শূন্য দিয়া কুঞ্জী বন্ধ করিল। বাহিরে আসিয়া একবার চতুর্দিক দেখিল। কেহ নাই, দেখিয়া বরাবর ফটকের দিকে চলিল। দূর হইতে দেখিল, ফটকে এক জন বৃদ্ধ দারবান বসিয়া আছে। তাহার নিকট পার হওনের চিন্তা মুহূর্ত্তমাত্র হইল না। দ্বারের কুঞ্জীটি লইয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ফটক পার হইল। বৃদ্ধ কুঞ্জীটি লইয়া দাঁড়াইল। বিস্তৃত বরদাকর্ণ কিরিয়াও দেখিল না।

গজালিস হিন্দুমতীর ঘরে প্রবেশ করিলে হিন্দুমতী বলিলেন। “আবার রাজ্যে দক্ষ করিতে বেন আলিলে? আমাকে নিরুদ্যম করিতে দাও?”

গজালিস বলিল। “হিন্দুমতী! তুমি এমন নির্ভর্য বাক্য প্রয়োগ করিও না। আমার জীবন থাকিতে তুমি কষ্ট পাইবে না। তুমি আমার অন্তরে, অস্থি, শরীরের শোণিত।

ইন্দুমতী বলিলেন। “আমি তোমার বাহা হই, আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না। আমার আর বাকশক্তি নাই। আমার কণ্ঠ তালু শুক হইয়াছে।”

গঞ্জালিস ব্যস্ত হইয়া বলিল। “আমি জল খা নিয়া দিব ?”

ইন্দুমতী হাসিয়া বলিলেন। “তোমার মত কথা জু্মি বলিলে, তাহার আমি সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আমার জলে প্রয়োজন নাই! তেমাগিপের এখানে জলস্পর্শ করা হইবে না।”

গঞ্জালিস বলিল। “কেন আমরা কি এত অপরূপ, যে আমরা জল স্পর্শ করিলে তাহা দূষিত হয় ?”

ইন্দুমতী বলিলেন। “আমি যদি কখন মুক্ত হই।”—

গঞ্জালিস বলিল। “তুমি বন্ধ কিসে ? তুমি এইকণ্ঠেই মুক্ত হইগে, চল আমার ঘরে চল। আমার প্রাধান গৃহী হইবে।”

ইন্দুমতী বলিলেন। “আর কেন মৃত শব্দে আশা কর।”

গঞ্জালিস বলিল। “আমি অস্ত্রানেও তোমাকে আশা করিতে পারি না। তুমি আমার সর্ব সর্বস্ব।” গঞ্জালিস মধ্যপানে চকলচিত হইয়াছিল। ইন্দুমতীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে একদৃষ্টে সেই মুখপদ্ম দেখিয়া এককালে মোহিত হইল, আশংসা (১) উত্তেজিত হইল। হৃদয়ী হৃদয়ে স্নান হইলে আরও চমৎকার গোড়া ধারণ করে। ইন্দুমতীর ললিত লাবণ্য হৃদয়ে আরও কোমল হইয়াছে। চক্রে কেমন একটি অনির্বচনীয় প্রেমগর্ভ ভাব দেখা দিল। ঈষৎ বক্রদৃষ্টি যেন দেবতার মনোহরী। ইন্দুমতী যদিচ আধিতে (২) এককালে অবসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট চৈতন্য ছিল। বক্রদৃষ্টিতে দিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, গঞ্জালিসের গতিক বড় ভাল নয়। কিন্তু কি করেন, মনে মনে হিমাত্রিসুতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবতী পার্শ্বতী তাঁহার মনে যেন উদিত হইলেন। আর সেই তপ্তকাকনবর্ণতা সুপ্রতিষ্ঠা হুলোচনা মুষ্টিতে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। যেন ইন্দুমতীকে জেঁড়ে করিয়া অন্তরধান করিলেন। পূর্ণমোহন ইন্দুমতী মনে মনে ইষ্টদেবীর আরাধনারসানে যেন হুহু হইলেন। গঞ্জালিস ক্রমে মনমগ্নে মত্ত হইয়া অন্ধ হইল। অসুগ্রহ লাভ বিবশে ইন্দুমতীর মন প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখিয়া অস্ত্রভাব বুঝিল। ক্রমে নিকট হইয়া বলিল। ইন্দুমতী গঞ্জালিসকে নিকটে বসিতে দেখিয়া নিহরিলেন। বলিয়াছিলেন গাত্রোখান করিলেন। গঞ্জালিস ইন্দুমতীকে উঠিতে দেখিয়া হস্ত বিভারিয়া তাঁহার বস্ত্র ধরিতে উপক্রম করিলেন ইন্দুমতী করিয়া দাঁড়াইলেন, আর এমন কঠিন দৃষ্টে গঞ্জালিসের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেন যে, গঞ্জালিস ভীত হইয়া অঙ্গে অঙ্গে সঙ্কুচিত হইল। ইন্দুমতী গৃহের কোণান্তরে যাইয়া বসিলেন।

গঞ্জালিস টলিতে টলিতে উঠিয়া বলিল। “ইন্দুমতি! আমার জীবনের অবলম্বন। আমার প্রতি রূপাঙ্গুষ্ঠি কর। আমি একান্ত তোমার প্রেমের বশবর্তী।”

ইন্দুমতী বলিলেন। “দেখিতেছি, তুমি অচেতন হইয়াছ, কেন এরূপ অসংযত বাক্য আমার কর্ণ দূষিত করিতেছ। যাও আমার এ নির্জন আবাস হইতে স্থানান্তরে যাও। হা বিধাতঃ! আমি কি কারাবদ্ধ হইয়াও নিশ্চিত্ত থাকিতে পারিব না? আমার কি ইহাতেও অব্যাহতি নাই?”

গঞ্জালিস বলিল। “ইন্দুমতি! আমি তোমার একান্ত ক্রীতদাস, আমাকে রক্ষা কর। আমি নিতান্ত তোমারই সেবাইত্ত।”

ইন্দুমতী বলিলেন। “মূঢ়! অকারণ কেন আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে কষ্ট দাও। তোমার কি চেতনা নাই?”

গঞ্জালিস বলিল। “আমার বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে, আমি আর চক্ষে কিছুই দেখিতেছি না। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাল দেখিতে পাই। আমার মনে তোমার প্রতিমূর্তি চিত্রিত হইয়াছে।” গঞ্জালিস অচেতন হইয়া আপন আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, ইন্দুমতীর দিকে হস্ত বিস্তারিয়া টলিতে টলিতে চলিল। ইন্দুমতী নিকট সঙ্কট বুঝিয়া একবার একপল মাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অমনি সেই অসহায়ের একমাত্র চিরসহায় অগন্ধাজী যেন তাঁহার জ্ঞানচক্ষে দেখা দিলেন। ইন্দুমতী অমনি চাহিয়া গঞ্জালিসের দিকে দেখিলেন ও আপনার হুললিত দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া বলিলেন। “যেথেষ্ট হইয়াছে, আর অগ্রসর হইও না। ঐ খানেই থাক। গঞ্জালিস ইন্দুমতীর ভঙ্গী দেখিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি মনে উদয় হইল, সাহস করিয়া আবার অগ্রসর হইল। ইন্দুমতী একান্ত তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিলেন। “নরাধম! যদি আর এক পদ অগ্রসর হও, তবে এই দেখ” বলিয়া আপনার বটিবস্ত্র হইতে একখানি, কুপাশ বাহির করিলেন ও বলিলেন; “একই আঘাতে তোমাকে বমালয়ে পাঠাইব ও আমিও মরিব।” ইন্দুমতীর বাক্য সাক্ষ হইতে না-হইতে কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল, অমনি ক্রান্তিসিক্ত ও ক্লান্ত ক্রম প্রবেশ, করিয়া উভয়েই এককালে গৃহের চতুর্দিকে ব্যস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল “ঠিক এখানেও ত—” ক্রান্তিসিক্ত বলিল “ঐ যে, ওঁর ও এই দশা দেখিতে পাই। এ ত্রাটা যে ইহাঁকেও বশীভূত করিয়াছে। গঞ্জালিস যে একটা ত্রায় অস্ত্রে চোরের মত ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর খেলার প্রয়োজন নাই, এস, সমূহ বিপদ উপস্থিত।” একটা তোপের শব্দ হইল। অমনি গঞ্জালিস ও ইন্দুমতী সিহরিল। গঞ্জালিস ইহাদ্বিগের সহসা কারাগারে আগমন ও

সমূহ বিপদ ভ্রমণ, আর ভোপের খনিতে এককালে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার আবার অধিক মন্যপানে বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়াছিল, ইহাদিগের কথায় কোন উত্তর করিল না, কেবল এক চুপে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। দাঁড়াইয়া আর দেখিতেছ কি? বৈদ্যনাথের লোকজন সব পেঁড়ি আক্রমণ করিয়াছে। বৈদ্যনাথের পুত্র বরদা পলায়ন করিয়াছে। পেঁড়ি-সঙ্গে অতীব প্রহারে হীনবল করিয়া তাহার হস্ত পদাদি মুণ্ড বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা গোলমাল ও প্রহারের শব্দ পাইয়া সে ঘরে আসিয়া দেখি যে শব্দমাত্রটী নাই, বাহিরে কুঞ্জা দেওয়া। দারবানের নিকট হইতে কুঞ্জা লইয়া দ্বার খুলিয়া দেখায় ভিক্রুনের স্বপ্নপোনান্ডি হৃদশা দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা। শুনিলাম, বরদাকর্ত পলাইয়াছে। অনুপায় অনন্তপালের পুত্র লিখিবার জন্ত কাগজ আনিতে গিয়াছিল। আর কিরিল না। পথে কাতরে চীৎকার করিতেছে। কে তাহাকে তীরে বিন্দু করিয়াছে। আমরা সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া ঘরের নিম্নে যাইয়া দেখি যে, ঘরের সম্মুখে বহল সৈন্যদল, আর নিজঘরের উপর ছটাতোপ নাজান। সেনারা ভোপে বারুদ গোলা দিতেছে। আমাদেরকে দেখিয়া অগ্রসর হইলে আমরা দ্রুত দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এখন ঘরের উপর ভোপের গোলা মাড়িতেছে।”

গঞ্জালিস বলিল। “চল আর এখানে প্রয়োজন নাই, বাহিরে পরামর্শ করা বাগ। (ইলুমতীর প্রতি) প্রিয়ে! আমাকে মনে রাখিও।” গঞ্জালিস, ফ্রান্সিস্কো ও ক্রুডের সহিত বাহিরে আসিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া গঞ্জালিস বলিল, “এক উপায় আছে, প্রধান মুরচ হইতে বড় ষটাটা বাজাও, আর আমি আলিয়া দাও। খড়কি দিয়া কাহাকে পাঠাও, আমাদের দেনালমুহ একত্র করে। বাহির হইতে ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই ভাল! গেভিলের উপর বহুক্ষণ ভোপ চালাইলে আমরা পরাজিত হইব।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আমি সোয়ানিসকে পাঠাইয়াছি ও মুচরায় আমিও আলিয়াছি। একবার উপরে চল, ইহাদিগের সেনাদল দেখিতে পাইব।”

গঞ্জালিস বলিল। “তাই চল।” ফ্রান্সিস্কো, গঞ্জালিস আর ক্রুড উপরে বাইরা গবাক দিয়া দৃষ্টিপাত করাতে গেভিলের চতুর্দিক সেনাসমূহের পূর্ণ দেখিল।

গঞ্জালিস বলিল। ফ্রান্সিস্কো! এত বড় সহজ বাহিনী নহে, এত সেনা বৈদ্যনাথের নহে। সে এত সেনা কোথায় পাইল? আর এ সকল ভোপ কাহার? এ কোন ক্রমে বৈদ্যনাথের নহে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। কিন্তু ঐ দেখ বর্ণব্রিড পুরুষের সম্মুখে বরদাকর্ত দাঁড়াইয়া আছে।”

গঙ্গালিস বলিল। “বোধ হয় এ আর কাহারও সেনা। ঐ বন্দীকৃত লোকটিকে আমি আর কোথাও দেখিয়াছি, বোধ হয় গত রাত্রে রায়গড়ে, ইহার বর্ণের মত বর্ণ ও এইরূপ গঠন। আমার তুরীটি একবার দাও, আমি সেনা সংগ্রহ করি ও বুঝি এ লোক সর্ব কাহার?” ফ্রান্সিস্কে দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল। তাহার পুরেই আনধনি আসিয়া বলিল। “এ সব কি ব্যাপার?”

গঙ্গালিস বলিল। “সেখ, আমাদের প্রহরীরা কি শিখিল, এত সেনা আইল, কেহই লক্ষ্য করিল না। আর এত রাত্রেই বা সিংহদ্বার কি অশ্রু খেলা ছিল।”

আনধনি বলিল। “অনুপরামকে তীরে আশ্বাত করিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পদটি এককালে নষ্ট হইল। মার্টিন ও ডাকটায় তাহাকে খড়কি দিয়া তুলিয়া আনিয়াছে।”

গঙ্গালিস বলিল। “অনুপরাম কোথায়?”

আনধনি বলিল। “কেন, সে নীচের বরে বসিয়াছে।” ফ্রান্সিস্কে তুরী আনিয়া গঙ্গালিস তাহার হস্তে হইতে তুরী লইয়া ভীষণবলে তুরীধনি করিল। তুরীনিদান দূরের ন হইতে প্রতিধনিত হইল। দূরের গ্রামের তিতর হইতে অশ্রু তুরীর শব্দ উত্তরিল। কেহ বা উচ্চঃস্বরে “খাইতেছি” বলিয়া উত্তর দিল। গঙ্গালিসের তুরীনিদান দিড়গুণ হইতে অপস্থত হইতে না-হইতে বন্দীকৃত পুরুষ আপন তুরী লইয়া বাজাইলেন। সে ভীম শত্রুবিধ্বী শব্দে গঙ্গালিস সিহরিলা, তুরীনিদানে গগনমণ্ডল কম্পিত হইল। সে তুরীনিদান শেষ হইতে না-হইতে শূর্য্যবুমার স্বত্বরী বাজাইলেন। মালিকরাজও আপন তুরী ধনি করিলেন। ক্রমে একে একে সকলেই আপন আপন তুরী ধনি করিল, তুরী-নিদানে ভূমণ্ডল পূরিল। অসহ শব্দে কর্ণবৃহর ভীর্ণ হইল। গঙ্গালিসের মস্তক কম্পিত করিল। গঙ্গালিস তুরীশব্দে বুঝিল যে, এ রায়গড়ের সেনাসমূহ। গঙ্গালিস বলিল। “ফ্রান্সিস্কে! নীচে চল।” সকলে উপর হইতে নীচে দ্রুতপদে আসিলে সমুখে অনুপরামকে দেখিল। দেখিবামাত্র ফ্রান্সিস্কে বলিল। “অনুপরাম, তোমার অরুক্ষতী এখানে বন্দী আছে।”

গঙ্গালিস বলিল। “কে? অনুপরামের প্রকৃত ভগ্নী?”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “হাঁ তাঁহার প্রকৃত ভগ্নী অরুক্ষতী।”

অনুপরাম বলিল। “ফ্রান্সিস্কে! একবার তাহাকে আমার নিকট আন, আমি দেখি সেই প্রকৃত অরুক্ষতী কি না?”

ফ্রান্সিস্কে বলিল। “আমি এখন তাহাকে আনিতেছি।” ফ্রান্সিস্কে চলিয়া গেল।

অনুপরাম বলিল। “গঙ্গালিস! তখনত তুমি আমার উপর রুষ্ট হইয়াছিলে। এখন এ যদি প্রকৃত অরুক্ষতী হয়ত তোমার ও বুলটো দুটো দ্রুত কি হইবে? তাহার চাতুরী অসীম।”

গঞ্জালিস বলিল। “এ যদি তোমার প্রকৃত ভগ্নী হয়, তবে আমার অত হৃষ্টাসঙ্গে একত্রে বাস অসম্ভব। আমি এইক্ষণেই সেটাকে ত্যাগ করিব। নষ্ট ত্রীর কি কুটিল বুদ্ধি!”

অনুপরাম বলিল। “গঞ্জালিস, ইহাতে কোন ভয়ানক মন্তব্য আছে। নতুবা এত চাতুরী কেবল ক্রীলোকের সম্ভব নহে।” ফ্রান্সিস্কা অরুন্ধতীকে অগ্রে লইয়া আসিল। অরুন্ধতী সরল মুখে সাহকারে পানবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে। নিকটে অনুপরামকে ক্ষতপদ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া পরিভ্রাণে নিরাশ হইয়া বলিল, “কিণো! আবার কি মনে করিয়া আমার ডাকিয়াছ? আরও কিছু মন্তব্য আছে? একজনকে কতবার কত স্থানে বলি দিবে? তোমার গঞ্জালিসের সঙ্গে একবারও বিবাহ হইল, এখন আর কার সঙ্গে থাকিতে বল? আহা! এমন দয়ালু ভ্রাতা আর কোথায় পাইব!” অনুপরাম অরুন্ধতীর অস্বাভাবিক সাহস ও সাহকার বচনে কিছু লাজ্জিত হইল। কোন উত্তর করিতে পারিল না। হেঁট মুখে বসিয়া রহিল।

গঞ্জালিস বলিল। “তোমার নাম কি? তুমিই কি আমাদেগের আত্মীয় অনুপরামের ভগ্নী?”

অরুন্ধতী বলিল। “হাঁ আমিই অনুপরামের ভগ্নী, তোমার প্রপিতা ত্রী। আমাকে তোমরা কি অশ্রু কারাবদ্ধ করিয়াছ ও কি কারণেই আবার এখানে আনিলে?”

গঞ্জালিস বলিল। “আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছে ও যে অরুন্ধতী নাম ধরিয়া আমার স্বরের গৃহিণী হইয়াছে, সে কে?”

অরুন্ধতী বলিল। “সে যে হউক, তাহাকে এক্ষণে তুমি ত্যাগ করিতে পার না। সে এক্ষণে তোমার ধর্মপত্নী; আর এক পত্নী সঙ্গে পত্নাত্তর গ্রহণ তোমাদিগের শাস্ত্রে নিষেধ।”

অনুপরাম অরুন্ধতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিল না। অপর দিকে চাহিয়া বলিল, “হুষ্টা! তুমি আমার কথা অস্বহেলা করিয়া খেচ্ছাচারিণী হইয়াছ? এখন তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। ফ্রান্সিস্কা! অরুন্ধতীকে আমি তোমার দান করিলাম, তুমি ইহাকে লইয়া সন্তোষ কর।”

অরুন্ধতী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল। “নরপুংস নির্লজ্জ পামর! তোর ভিলমাত্রও চৈতন্ত্য হইল না যে, তোর ভগ্নীকে সামান্য ত্রীর জার বাহাকে তাহাকে অর্পণ করিস। বক্ষ্যাজপুত্রের এরূপ দুর্বুদ্ধি হইবে, ইহা আমার স্বপ্নেও ছিল না। ধর্ম, আপনায় ভগ্নীর সঙ্গেও শঠতা কর। গঞ্জালিস তুমি জান না, এ চণ্ডাল আমাকে কি বলিয়া এদেশে আনে ও আমার অমতে তোমার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি এ পাশাঘার চাতুরীতে মুগ্ধ হইও না। আমার সঙ্গী হইজনা কোথায়? আমি দেখিতে চাহি! আমাকে এক্ষণে নিষ্কৃতি দাও।”

গঞ্জালিস বলিল। “ক্রাসিস্কো, এক্ষণে এরূপ অকারণ বাস্তব্যে প্রয়োজন নাই।

তুমি ঋণ্যকি দিয়া বাহিরে যাও। সৈন্ত সামন্ত লইয়া আগত শত্রুদের সহিত বাহির হইতে বৃদ্ধ কর। আমার অন্তর্গেডিজ এক্ষণে প্রায় চারি পাঁচ শত বোদ্ধা আছে। ইহারা অন্তর্গেডিজ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।”

ক্রাসিস্কো বলিল। “কর জন বন্দীকে এক ঘরে রাখিলে ভাল হয়? উহারা যে সকল ঘরে আছে, তাহা হইতে গেডিজ রক্ষার সুবিধা।”

গঞ্জালিস বলিল। “সকলকে এক ঘরে রাখাও বড় সদ্‌বৃত্তি নহে। আমি ইহাদিগের বন্দোবস্ত করিব। তুমি বাহিরের উপায় দেখ।” ক্রাসিস্কো চলিয়া গেল। গঞ্জালিস দ্রুত উপরের গবাক সকলে লোক নিয়োজন করিয়া দিল। তাহার গবাক দিয়া বন্দুক ও শর নিক্ষেপ করায় কণেকের অল্প আক্রমী সেনারা হটিয়া গেল।

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম! এখন তোমার ভগ্নীকে কি করিতে চাহ? এত আমাদিগের বন্দী হইয়াছে। যদি মুক্ত করিতে ইচ্ছা কর ত, তৎপরিবর্তে তোমাকে কিছু ক্ষতি পূরণার্থ নিতে হইবে।”

অনুপরাম বলিল। “আমার ভগ্নীকে বন্দী কে করিল? সেও বন্দী নহে। এরূপ বিষয় হইলে হয়ত কাল প্রাতে তোমার কোন নূতন লোক আমাকে ধরিয়া আনিয়া বলিবে, তুমি আমার বন্দী।”

গঞ্জালিস বলিল। “যে কেহ তোমার ধরিতে পারিবে, তুমি তাহার বন্দী। ইহাতে কোন গোল নাই। তুমি রায়গড়ের যে একজন বন্দী চাহিয়াছিলে, তাহার পরিবর্তে অরুদ্ধতা মোচন পাইল। এই আমাদিগের নিয়ম ও ধর্ম। ইহাতে সন্তুষ্ট হও ভাল, নতুবা অরুদ্ধতা আমাদিগের বন্দী রহিল।” অনুপরাম ভাবিল, অরুদ্ধতা বন্দী থাকিলে আমার কি ক্ষতি? “বলিল। তবে তাই থাকুক, আমার তাহার কোন আপত্তি নাই।”

গঞ্জালিস বলিল। “কিন্তু তুমি রায়গড়ের কোন বন্দী পাইবে না, আমাকে তোমার ভগ্নী দাও নাই, অতএব আমাদিগের সকল প্রযুক্তি কাটিয়া গেল।”

অনুপরাম বলিল। “স্বাধীন শর্ত আত্মবিচ্ছেদ স্বীকার করিয়াও স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ?”

গঞ্জালিস বলিল। “কেন তুমিইত সে পথ দেখাইয়াছ। তোমার আপনার ভগ্নীকে পণ দিতে প্রস্তুত ছিলে। এক্ষণে অরুদ্ধতা চল, তুমি আমার বন্দী হইয়াছ, সেবাদাসী পদে নিযুক্ত হইলে।”

অরুণ্ডী বলিল। “কি! আমি কাহার সেবাদাসী হইলাম? বঙ্গরাজ-কণা সামান্ত হীনবল পরিপন্থীর (১) সেবাদাসী! গঞ্জালিস! তুমি আশ্রয়িত হইতেছ। তোমার ভয় হইয়াছে। এরূপ অসম্ভব বাক্য বলিও না। রাজকণা তোমার সেবাদাসী! গঞ্জালিস! আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া বলা ভাল। আমার বোধ হয়, অধিক মন্যপানে তোমার বুদ্ধি অন্ধ হইয়াছে। যাও এক্ষণে আপনার কর্ণে যাও, সমসংসারে আসিয়া এ অসংলগ্ন কথার জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিও।”

মানিনী অরুণ্ডী সগর্বে এই কথা বলিয়া নিকটস্থ চৌকিতে বসিল। অনুপরাম ক্রমে নিরাসনে পতিত ছিল। গঞ্জালিস দাঁড়াইয়া কিছু ধৃতমত থাইয়া রহিল। অরুণ্ডীর সাহকার আচরণে গঞ্জালিস কিছু হীনসাহস হইল। মহৎবংশের পরিমাণ ও মাহাত্ম্য চিরকাল প্রকাশ পায়। উত্তরলোকের একটি বালক বহুবলযুক্ত যুবা বা প্রৌঢ় চাষকে বাক্যে বশীভূত করে। আধোরণ (২) যত কেন খর্ব ও হীনবল হউক না, মনমন্ত বারণকে আত্মবহ করিয়া রাখে। ক্ষণকালের জন্ত গঞ্জালিস যেন প্রকৃত স্বদেশের ডাকিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল। “অহঙ্কারিণি বুধা গর্বে কোল ফলোদয় হয় না। বঙ্গপুরে তুমি আপন দাস দাসীকে এ সকল কথা কহিয়া ভয় দেখাইও। সনদ্বীপের অধিপতি দক্ষিণ বঙ্গের দণ্ডস্বরূপ গঞ্জালিস ইহাতে বর্ণপাতক করে না। এক্ষণে তুমি আমার বন্দী। আমার কারাগারবদ্ধ। এমত কাহার সাধ্য নাই যে, তোমাকে আমার অনুমতির বিপক্ষে এক পাত্র জল পর্যন্ত দেয়। আর এমত কোন রাজাই বঙ্গ নাই যে, গঞ্জালিসের নামে নমস্কার না করে। আমার সাহায্য লাভার্থে বংশেরের দৌর্দণ্ডবল প্রতাপাদিত্য আগুন রাজ্য ত্যাগ করিয়া যমুনা পরাইরে আসিয়াছে। বঙ্গপুরের রাজা আমার বৃত্তিভোগী ও অগ্রাণ্ড আবসথিকের (৩) মধ্যে গণ্য! আমি বর্তমানে তাহার প্রতি প্রীতিচুষ্টি করিব, ততক্ষণে তাহার মনের ভার দূর হইবে। ঐ পড়িয়া আছে। অনুপরাম! বল, তুমি আমাকে মূল অবলম্বন জানে আমার আশ্রয় লইয়াছ কি না?”

অনুপরাম অপমান ও স্বার্থসাধন ভয়ে কোন কথাই কহিল না।

অরুণ্ডী বলিল। “গঞ্জালিস! তোমার এ সকল গুণ ও মহত্ত্ব বৃত্তিভাম, যদি তুমি সামান্ত চোর না হইতে। অন্যত্র দিল্লীর মনে করিলে তোমাকে ধরাইয়া উপযুক্ত দণ্ড দিবে। তোমার ও বড়াই জনান্তিকে বলিও, আমার আর কোন বিষয় অজ্ঞাত নাই। এক জমিদার বৈদ্যনাথের ভয়ে তোমার সমস্ত সেনানীরা নিভাত অবসন্ন হইয়াছে।”

(১)। পথের ডাকাইত—রাহাজান।

(২)। মাছত। (৩)। গৃহস্বর্গীর ভৃত্য।

গঞ্জালিস বলিল। “গর্বিণি! জাননা যে তোমার জাতি, ধর্ম ও প্রাণ আমার পদতলে আছে। আমি মনে করিলে তোমার পেরিয়া কেলিতে পারি। কেবল ত্রীলোক, তাহাতে আবার অহুপরাযের সহোদরা আবার আমার বাগদত্তা ত্রী বলিয়া অনুগ্রহ করি। কিন্তু দেখি তচ্ছি তুই সে অনুগ্রহের যোগ্য নস্।”

অরুন্ধতী বলিল। “আঃ কি বীরত্ব! রাত্রিযোগে বনে একজন অসহায় অবলা পাইয়া বলপূর্বক তাহাকে বন্দী করিয়াছ। এই ত তোমার বীরত্ব আর পুরুষত্ব! ইহার এত বড়াই! আহা কতই রাজ্য দখল করিলে, কতই রাজা মারিয়াছ, কতই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ যে, তাহার মাঝার বর্ণনা করিতেছ। রায়গড়ে ডাকাইতি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, এই ত তোমার সয়মালা! তাহার পর নিরস্ত্র হীনবল ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিবে, প্রাণে নষ্ট করিবে, তাহার এত আশ্বালন! ধন্ত ধন্ত! দেখ বেন তোমার বীরত্ব সংসারে প্রচার না হয়!”

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরায; তোমার এ ভয়ী উন্মত্তা হইয়াছে, যথেষ্টা বন্টিতেছে।”

অনুপরায বলিল। “গঞ্জালিস! ইহার উপযুক্ত দণ্ড দাও, ইহাকে তোমার ঘরে লইয়া যাও।”

অরুন্ধতী বলিল। “অরে নারকী নরাধম; তুই রাজবংশে কেন জন্মিয়াছিলি? তুই এককাল পরে বক্ররাজবংশে কলঙ্ক দিলি। চাষা লোকে কোন নিরাশ্রয় ত্রীলোকের উপর দৌরাত্ম্য দেখিলে আপনার প্রাণ পর্ধ্যন্ত দিয়া তাহাকে রক্ষা করে। তুই বীরবংশে জন্মিয়া আপনার ভয়ী এইরূপ অপমান দেখিতেছিস; আবার বাহাতে অপমান বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টায় আছিস্। থিক্! তোর রাজ্যে থিক্! তোর মানে থিক্! তোর এ শরীর ধারণে থিক্! তোর প্রতি আমার দৃষ্টি করিতে ঘৃণা হইতেছে। আমি কদর্য্য ভেককে হাতে করিতে পারি, টীকটীকিকে বক্ষে রাখিতে পারি। গৃহপোখার পাপ নাই, সে নিরীহ, তাহার স্বজাভীরের অপমান সহ করে না। সে তাহার ভয়ীকে বিক্রয় করে না। আমি শূকরকে ক্রোড়ে লইতে পারি। সে তোর অপেক্ষা লজ্জাপ্রাপ্ত বীর, প্রাণ পর্ধ্যন্ত দিয়া আপনার পরিবারকে রক্ষা করে। তুই মনুষ্যজাতির হেয়, বলহীন, অপকৃষ্ট কীটোপেক্ষা অকর্ষণ্য। তোর মুখ দর্শনে আমার ঘৃণা হয়। তোকে সহোদর বলিতে আমার লজ্জা হয়। তুই হীন জাতি যেরূপ বিধর্ম্মা নস্যুর আশ্রয় লয়েছিস্। কেন আমার আশ্রয় লও না? আমি শয়ং অস্ত্র লইয়, তোকে পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিব না। তুমি সিংহাসনের যোগ্য নহ। আমার সে ভ্রাতা তোমা অপেক্ষা—
না না, তাহার সঙ্গে তোর তুলনা হয় না। নরাধম!

গঞ্জালিস বলিল “এ ক্রীড়া যে অসহ্য হল। অরুণ্ধতি! তোমার উপহিত মৃত্যু, যদি বাঁচবে ত আমার সেবাদাসী হও।” গঞ্জালিস অরুণ্ধতীর দিকে অগ্রসর হইল। অরুণ্ধতী সন্দর্পে মস্তক উন্নত করিল। তাহার চক্ষুঃস্রব আরক্ত হইল। বঙ্গোল্লাপ বুদ্ধি পাইল। বামকটিদেশে বামহস্ত দিয়া বলিল। “অস্পর্শ ভূতপা! দূর, আর অগ্রসর হস্নি বখাষণ্য অন্তরে থাক।”

গঞ্জালিস কোন আহুই করিল না। অরুণ্ধতীর নিকট আসিয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া অরুণ্ধতীর যেমন স্বক্ৰমণ ধরিবে অমনি অরুণ্ধতী একটা চৌংকার করিয়া আপন চৌক পশ্চাদ্ভাগে ফেলিয়া অন্তরে দাঁড়াইল। অগ্র লোকে সকল মায়ী কাটাইতে পারে, কিন্তু গোত্রমায়ী কোন মতেই কাটাইতে পারে না। নরোধম অনুপরামকে সে মায়ী বদ্ধ করিল। অনুপরাম এ দৌরাণ্য সহ করিতে না পারিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল। গঞ্জালিস অরুণ্ধতীর পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অরুণ্ধতী উপায়ান্তর না পাইয়া ক্রতপদে ঘরের কোণে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল। গঞ্জালিস যেমন অগ্রসর হইবে, অমনি অরুণ্ধতী আপনার কটিদেশ হইতে একটা ছোট চন্দ্রহাস বাহির করিয়া “ধর্ম্ম লাকী, আমি আপনার রক্ষার জন্ত ব্যবহার করিভেঁছি। বলিয়া ভাষণ বলে চন্দ্রহাস ফুলিয়া গঞ্জালিসের দক্ষিণ হস্ত লক্ষ্য করিয়া মারিল। গঞ্জালিস নজরবেগে আপনি সরিয়া গিয়া পুনর্বার অগ্রসর হইয়া চন্দ্রহাসটি অরুণ্ধতীর হস্ত হইতে ব পূর্বক হরণ করিল! তাহারই অব্যবহিত পরে অরুণ্ধতীর কণ্ঠদেশ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বলিল। “কেমন এখন তোমার অহকার কোথায়? তোমার চন্দ্রহাস কোথায়?” অরুণ্ধতী কোন উত্তর করিল না। নৃশংস গঞ্জালিস অরুণ্ধতীর কণ্ঠ ত্যাগ করিয়া তাহার কেশ ধরিল ও কেশাকর্ষণপূর্বক তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। অনুপরাম চক্ষু মুজিত করিল। অরুণ্ধতী বহুদূরে অবিকাদেবীর স্মরণ করিতে লাগিল। এই ব্যর্থই ধর্ম্ম নষ্ট হইল, প্রাণও গেল, হাঁটী স্থির করিল। গঞ্জালিস চন্দ্রহাস লইয়া ভাবিল, ইহকে ছেদ করি, কি আমায় সেবার জন্ত রাখি। তাহার বিবেচনা করিতে নিমেষমাত্রও পড়িল না। চন্দ্রহাস বলপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধরিল। তাহার চক্ষুঃস্রব স্থিরান্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চক্ষুঃস্রব রোবে বিস্তারিত হওয়ায় যেন বিগুণ বুদ্ধি হইল। তাহার নানাক্রমঃ ফুলিয়া উঠিল। তাহার গুঠবয় কুটিল হইল। অরুণ্ধতী একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে চক্ষু মুজিত করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিল। অরুণ্ধতী অশ্বখংলের মত কাঁপিতে লাগিল। গঞ্জালিস রোবে ধর ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রহাস পাড়লেই অরুণ্ধতীর শরীর স্পন্দনরহিত হইবে। চন্দ্রহাস নামিল। অমনি ঘরের দিকে এককালে বিকট ভোপের শব্দ হইল। গঞ্জালিস নিহতিল। অবশ্যে চন্দ্রহাস নিক্ষেপ করিয়া অরুণ্ধতীকে ছাড়িয়া ক্রত দ্বারাভিমুখে যাত্রা করিল।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

“মার্গে চ দুর্গে বিনিবৃষ্টসৈন্যো বিধায় রক্ষাং বিধিবাদবিস্তঃ ।

এদিকে বর্ষাবৃত্তপুরুষ অধিকাংশ সেনা দূরের কোপ ও আম বাগানে রাখিয়া অতি
অল্প ধানুকী ও ছয় তোপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। স্থানে স্থানে কোপের ভিতর পাছের
অস্ত্রাঙ্গে কুটার পার্শ্ববানুকী ও বর্ম্মমী স্থাপিত হইল। তাহারা অতি গুপ্ত ভাবে
লুক্কায়িত রহিল। অল্প কোন লোককে অন্তর্গেভিজের দ্বারাভিমুখে যাইতে দিবে না।
বর্ষাবৃত্ত পুরুষ স্বয়ং দুইটী তোপ নিজ দ্বারের সম্মুখে প্রায় কুড়ি হাত অন্তরে রাখিলেন।
স্বর্ঘ্যকুমার অধিকাংশ সেনা লইয়া দূরে আম বাগানে রহিলেন। বর্ষাবৃত্তপুরুষ দুইটী তোপ
স্থাপন করিয়া আর দুইটী তোপ লইয়া গেভিজের অপর দিকে স্থাপন করিলেন। অন্তর্গে-
ভিজটী অতি সুকঠিন দুর্ভেদ্য দুজ্জ দুর্গ। ইহার পরিসর কিছু বড় অধিক নহে। ইহার
চারি দিকে গভীর খাদ। খানের উপর হইতেই অতি উচ্চ সুশ্রেণস্ত ভিত। ভিত্তিপার
একদার বর, তাহার মাঝে মাঝে এক একটা প্রহরীর অল্প উচ্চ উচ্চ মুরচা। তাহার
বহির্দিকে এক একটা অল্প চালাইবার গবাক্ষ। মুরচার উপর উন্নতগাত্ত কঠিন প্রাচীর;
তাহার ছাদ নাই। যোদ্ধারা তথায় দাঁড়াইলে তাহাদিগের বক্ষ পর্যন্ত প্রাচীরে রক্ষা
পায়। মুরচা শুনি প্রাচীর হইতে অগ্রসর হওয়ার সম্মুখ ও উভয় পার্শ্ব রক্ষা করি-
তেছে। মুরচার ভিতরে দাঁড়াইয়া যোদ্ধারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সম্মুখই শত্রু সেনা
নষ্ট হইবে, আর প্রাচীর আক্রমণেরও আশঙ্ক্য পাইবে। দ্বারের নিকট একটা জঙ্গম
(১) সেতু। তাহা উঠাইলেই দ্বারের অবরোধক কবাট হয়। সেতু পার হইলেই
একটা অত্যন্ত প্রকাণ্ড মুরচা, তাহার পর একটা খাদ, সে খানের উপরও আর একটা
জঙ্গম সেতু। তাহার পর প্রকৃত গেভিজের বর। এই দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী
প্রগ্রীব ভূমি হইতে উঠিয়া বরাবর গেভিজের অপেক্ষাও উচ্চ; উচ্চে মুরচাঘরে
পরিণত। প্রগ্রীব দুইটি তিন কোঠে বিভক্ত। প্রথম কোঠের প্রবাক্ষায় ভীম
লৌহ শলাকায় রক্ষিত, গবাক্ষ দিয়া নিজ দ্বারের চলনেতৃত্ব লোকসমূহকে
অস্ত্রে আশঙ্ক্য করা যায়। দ্বিতীয় কোঠও তদ্রূপ। তৃতীয় কোঠের ছাদ নাই।
তাহারও বক্ষ পর্যন্ত প্রাচীর। বর্ষাবৃত্ত পুরুষ গেভিজের অপর দিকে তোপ
নিয়োজন করিয়া বখন ফিরিয়া আসেন, সেই সময় অনুপরাম গেভিজ হইতে বহির্গত
হইয়া কাগজ আনিতে যাইতেছিল। কোপের ভিতর হইতে একটা ভীক্শন
সন্ সন্ করিয়া আসিয়া অনুপরামের দক্ষিণ পদে লাগিল, অমনি অনুপরাম

(১) চল সেতু—হুর্গদ্বারের সম্মুখই সেতু উঠাইয়া নিলে কবাট হয়।

চীৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িল। পড়িয়াই শরের আলায় দ্রুত উঠিয়া গেড়িজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার অব্যবহিত পরেই বরদাকর্ষ তিক্তসুকে পরাক্রান্ত করিয়া গেড়িজের বাহিরে গেল। বাহিরে যাইবামাত্র একজন কোপ হইতে শর সন্ধান বেদন করিলে, অমনি তাহার পার্শ্ব ভজহরি তাহার হাত ধরিল। বলিল “দেখিতেছ না এ কে? এ যে আমাদের বরদাকর্ষ, একজন বন্দী হইয়াছিল।” ভজহরি অশ্রুসর হইয়া দ্রুত বরদাকর্ষের হাত ধরিয়া কোপের ভিতর আনিয়া বন্দী করিয়া পুরুষ ও সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভজহরি তাহার সহিত বরদার পরিচয় করিয়া দিল। বন্দীকৃত পুরুষ তাহাকে অন্তর্গেড়িজের ভিতরের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া তোপ বোজন করিলেন। ক্রান্তি হইতে এই ব্যাপারটি দেখিয়া দ্রুত চল। সেতু তুলিয়া দ্বার বন্ধ করিল। অমনি তাহার উপর তোপের ভীম গোলা গিয়া লাগিল। কবচ অত্যন্ত কঠিন লৌহনির্মিত থাকায় দুই ডিন গোলায় কিছুই হইল না।

বন্দীকৃত পুরুষ বলিলেন। “ভজহরি! এরূপ অনিয়মে তোপ ছোড়ায় কোন কলো-দয় হইবে না। একবার নসিরাম ও শঙ্করকে এখানে ডাক।” ভজহরি অতঃপর চলিয়া গেল। কিছু পরেই নসিরাম ও শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। বরদাকর্ষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

বন্দীকৃত পুরুষ বলিলেন। “দেখ নসিরাম! তুমি স্বর্ধকুমারের নিকট যাইয়া সহস্র ধামুকী ও পঁচশত ঢালী পাঠাইতে বল। আর সাবল, খস্তা, মহি, সিঁড়ি প্রভৃতি দুর্গা-রোহিণী বস্ত্র সকল আন।” নসিরাম দ্রুত আপন বস্ত্রে চলিয়া গেল। বন্দীকৃতপুরুষ উপস্থিত ধামুকাদিগকে দুর্গের প্রত্যন্তী প্রাকারের প্রতি গবাক্ষধারে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তাহার আশ্রয় আপন আপন গুপ্ত স্থান হইতে নির্গত হইয়া দুই দুই জনে এক এক গবাক্ষ লক্ষ্য করিয়া শর চালাইতে লাগিল। এই শর সকল সন্ সন্ শব্দে ছুটিতে লাগিল। প্রতি শরই গবাক্ষ ভেদ করিয়া বরের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। এদিকে বন্দীকৃত পুরুষ তোপ চালাইলেন। তোপের বিকট শব্দে গজাগিস অরুণভীকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে গবাক্ষ সকলের নিকটস্থ বোদ্ধাদিগকে আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলিল। তাহার কেহ শর, কেহ বন্দুক লইয়া গবাক্ষধার হইতে বিপক্ষ সেনা লক্ষ্য করিয়া চালাইতে লাগিল। গজাগিস স্বয়ং অস্ত্র নিক্ষেপে কত সেনা নষ্ট করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এ গবাক্ষে, কিছুক্ষণ ও গবাক্ষে থাকিয়া প্রধান ঘরের মুরচার উপর যাইয়া দাঁড়াইল ও তথাকার সেনাদিগকে বিপক্ষ সেনাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলিল। তাহার পোলন্দাজ ও বন্দীকৃত পুরুষ ও অস্ত্রাধার ধামুকীর উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিল। আক্রমণ সেনা লক্ষ্যবস্তু হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। অব্যবহিত ক্রিয়াক্রিয়া কাহার

বঙ্গদেশ, কাহার চক্ষু, কাহার দক্ষিণ বাহু, কাহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া শর ও বন্দুক চালাইতেছে। গবাক্ষহার হইতে স্কন্ধাঘ্র লম্বুত ধূমরাশি নির্গত হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে ভীষণ অগ্নি মুক্তি বন্দুত লৌহশূলি সকল সন্ সন্ বেগে বর্ষারূতপুরুষের সেনাকে আঘাত করিতে লাগিল। সে ভয়ানক লৌহ ঋণ স্পর্শমাত্রে তাঁহার সেনারা পতিত হইতে লাগিল। লক্ষ ফিরিজিহেনা গবাক্ষ হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াই প্রাচীরান্তরালে লুকাইত হইল। বর্ষারূত পুরুষের সেনারা গবাক্ষ লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র চালাইল বটে, কিন্তু তাহার কোন ফলোদয় হইল না। ক্রমাগত সেনাক্ষর ও শত্রুর লোমও ক্ষতি হইতেছে না দেখিয়া বর্ষারূত পুরুষ বলিলেন। “ধাতু-কীরা অন্তর হও। কেবল বন্দুকীরা প্রতি গবাক্ষ লক্ষ্য করিয়া শত্রু নষ্ট কর।” ইত্যবসরে বর্ষারূত পুরুষ তোপ লইয়া ঘন ঘন দ্বারদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রতি তোপধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তোপের ভীষণ গোলা পূর্ণ চত্বরের ভায় জ্যোতিষ্মান তোপের মুখ হইতে নির্গত হইয়া শূন্য মার্গে উঠিল; পরেই বজ্রবেগে লৌহহারে আসিয়া লাগিল। দ্বার অভ্যন্তর কঠিন। গোলা দ্বারে লাগিয়াই কিছু হঠিয়া গেল। ভূমে পড়িল। এক গোলা ভূমে পড়িতে না-পড়িতেই তোপ হইতে আবার এক গোলা শূন্যমার্গে উঠিল। সেটিও সেইরূপ বেগে দ্বারে আঘাত করিল। প্রতি গোলা-ঘাতে দ্বারদেশ কাঁপিয়া উঠিল। এদিকে নসীরাম বৈজয়ন্তী (১) ও সাবল প্রভৃতি বহু আনিয়া উপস্থিত করিলে কণ্ঠকের অস্ত্র তোপ বন্ধ হইল। বৈজয়ন্তী দ্বারে লাগিয়া তাহার পার্শ্বে সাবলাঘাত করিতে লাগিল। প্রাচীরের সেনারা গুলি ছুড়িতে ক্রটি করিল না। কেহ গুলি খাইয়া বৈজয়ন্তী হইতে টলিয়া ভূমে পড়িল। বহুক্ষণের আশপাশ চেষ্টার পর দ্বারের পার্শ্বের ভিত্তিতে একটি গবাক্ষের মত ছিদ্র হইল। নসীরাম প্রভৃতি লোকেরা নানিরা আসিলে সেই ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া তোপ আরম্ভ হইতে লাগিল। ক্রমে ভিত্তি ভাঙিতে লাগিল। ক্রমে আক্রমী সেনাদিগের সাহস উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহার ভীম বলে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে বহু কষ্টের পর বহু সেনা মর্য হইলে বর্ষারূত পুরুষের সেনারা ভিত্তিতে একটি প্রকাণ্ড দ্বার করিল। কিন্তু চল সেতুর দ্বার কিছুমাত্র নষ্ট হইল না।

বর্ষারূত পুরুষ বলিলেন। “এখন এই পরিখার উপর দিয়া সেজু বাধ। ইত্যবসরে বন্দুকীরা লক্ষ্য করিয়া গবাক্ষ লোকদিগকে এত ঘন ঘন গুলিতে আচ্ছন্ন কর যে, তাহার কোন মতে আমাদের উপর শর বা গুলি চালাইতে অবকাশ না পায়। গবাক্ষদ্বারে কোন মতে না আইসে।” আক্রমী সেনারা ক্রমাগত প্রতি গবাক্ষে বন্দুক মারিতে লাগিল। বন্দুকের ধূমে গগনমার্গ আচ্ছন্ন হইল। ভীষণ বিনাদে চারি দিক পুঞ্জিল।

গৰ্ভাক্ষয় সেনারা আর লক্ষ্য করিতে অবকাশ পাইল না। কি করে, একবার গৰ্ভাক্ষে দাঁড়াইলে অমনি সন্ সন্ শব্দে গুলি আদিয়া হয়ত এককালে যমালয় পাঠায়। অর্কাটিন হই এক সেনা অহঙ্কারে গৰ্ভাক্ষে লক্ষ্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু অকর্তৃন্যদান রায়গড়ের সেনার গুলিতে নিপাতিত হইল। গঙ্গালিস এরূপ অবস্থায় দুর্গ রক্ষা নিতান্ত দুর্লভ জ্ঞানে কতকগুলি সেনা লইয়া নবরুত ভিত্তিবার রক্ষাশয়ে চলিল ; কিন্তু বন্দ্যাবৃত পুরুষের সেনার গুলির সম্মুখীন হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। তাহার ভিত্তির অন্তরালে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ গুলি বৃষ্টি করিলে বন্দ্যাবৃতপুরুষ, নসীরাম, শঙ্কর ও অস্ত্রান্ত প্রধান প্রধান বীর পুরুষদিগকে লইয়া বাসের মেতু দিয়া দুর্গের প্রবেশী প্রাকার আক্রমণ করিল। অমনি কিরিস্তি সেনারা অগ্রসর হইয়া তাঁর ও গুলি চালাইতে লাগিল। আক্রমণী সেনারাও আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পরাড্রুত হইল না। উভয়দলের সেনারা বন্দ্যকে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়েই হীনবল হইল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ দুইরার দ্বারা পশ্চাত্ত হ সেনাদিগকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে অনুবর্তি গিলেন। অমনি গুলি সেনাপ্রবাহ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সেতুর পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ ত্রিশ জন সেনা মষ্ট না হইলে এক বৎ ভূমি অধিকারে সমর্থ হইল না। এরূপে বহু সেনা ক্ষয় স্বীকার করিয়াও অমিতসাহসী প্রায় একশত জন, বন্দ্যাবৃত পুরুষের পশ্চাত্ত হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শত্রু নিকটস্থ হইলে বাণ ও বন্দুক ত্যাগ করিয়া কিরিস্তিরা অগ্নি, বল্লম, পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল লইয়া ভীমবলে বন্দ্যাবৃতপুরুষকে আক্রমণ করিল। নিযুদ্ধে বন্দ্যাবৃতপুরুষ অত্যন্ত দক্ষ ; খড়্গা চালনে তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ভয়ানক খড়্গের বাক্সা মধ্যভেদ করিতে লাগিল। নসীরাম পরশু লইয়া যাহাকে আঘাত করিল, সে আর পুনরায় চাহিল না, জীবনহীন হইয়া পড়িয়া গেল। সেতুর উপর যুদ্ধে আক্রমণীগের অন্তর্বিধা হইল বটে, কিন্তু তাহা-
দিগের অসমর্থ বিন্ধম ও সমূহ সৈন্তে তাহার অধিক ক্ষতি হইল না। এক এক বৎ করিয়া ক্রমে বন্দ্যাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতকগুলি সম্মুখের বোদ্ধারা সেতু পার হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। অস্ত্রান্ত বোদ্ধার তরঙ্গে সেতুটী ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি প্রায় ডেইশ জন সেনা এক কালে পরিবার গভীর জলে ডুবিয়া গেল। কেহ ডুবিয়া বলপূর্বক সত্তরণ দিয়া কূলে উঠিল। কেহ সত্তরণ দিয়া উঠিতে না-উঠিতে গৰ্ভাক্ষয় কিরিস্তিসেনার শরে কালগ্রাসে কবলিত হইল। কেহ তাঁরে উঠিয়াও কিরিস্তির অস্ত্রবেগ সহ করিতে না পারিয়া আবার জগে গিয়া অদৃশ্য হইল। সেতু ভঙ্গে সেনাবল জলে পড়িয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ ভিত্তি মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলোকাতরে কিছু অস্থির হইলেন। কিরিস্তিরা অককারে ছিল, তাহারা অবিলম্বে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। বন্দ্যাবৃত পুরুষ আলোক আনিতে আদেশ করিতে

অবকাশ পাইলেন না । নসীরাম অন্ধকারে যুদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব জানে পশ্চাতে ফিরিয়া আলোক আনিতে বলিবে, দেখে সেতু ভাঙ্গিয়া গেছে । চীৎকার করিয়া পায়ের সেনাদিগকে আলোক আনিতে আদেশিল । সেনারা শীঘ্র দীর্ঘ দীর্ঘ উক্সা জালিয়া অপর পারে দাঁড়াইল । কিন্তু বোদ্ধাদিগের নিকট আলোকাভাবে নসীরাম নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া জলে বাঁশ ছিল । নসীরামকে জলে পড়িতে দেখিয়া অপর পারের সেনারা উক্সা লইয়া জলে লম্ফ দিয়া পড়িল । এক হাতে উক্সা উচ্চ করিয়া সত্তরপ দিয়া পারে উঠিতে চেষ্টা পাইল । গবাক দ্বারের ফিরিজিয়া বন ঘন শর বর্ষণে তাহাদিগের অধিকাংশকেই নষ্ট করিল । অতি অল্প সেনা উক্সা লইয়া ভিত্তির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল । বর্ষারূত পুরুষ আলোক দেখিয়া বিগুণ বলে শত্রু আঘাত করিতে লাগিলেন । শত্রু ক্ষয়ে দক্ষ বোদ্ধারা বহুক্ষণ যুদ্ধিয়া ক্রমে হীমবল হইতে লাগিল । নসীরাম ইতোমধ্যে নতুন বাঁশ লইয়া আবার সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল । প্রায় একদণ্ডের মধ্যে আবার সেতু প্রস্তুত হইলে রায়গড়ের সেনারা অবিশ্রামে পার হইয়া আসিতে লাগিল । সেনাস্রোতে ফিরিজিয়া হটিয়া গেল । ইহা-দিগের বেগ সহ্য করিতে না পারায় ক্রত পলায়ন করিয়া দ্বিতীয় খাদ পার হইয়া অল্পম সেতু ভঁটাইয়া দ্বার বন্ধ করিল । আক্রমণী সেনারা প্রথম জঙ্গম দ্বার খুলিয়া দিলে এক কালে সকল সেনা প্রবেশ করিল । গবাকস্থ ফিরিজি সেনারা পলায়ন করিয়া অন্তরের গবাক রক্ষায় নিযুক্ত হইল । বর্ষারূত পুরুষ এক দ্বার পার হইলেন । আবার তদ্রূপ দ্বিতীয় দ্বার ভেদ করিতে হইবে, দেখিয়া ভোপ সব আনিতে আন্তা দিলেন ও নসীরামকে হৃদ্যকুমারের নিকট পাঠাইলেন । বলিলেন, “হৃদ্যকুমারকে এই গড়ের চতুর্দিক ঘেরিতে বল ।”

নসীরাম ভোপ আনিয়া উপস্থিত করিল । বলিল, “আর হৃদ্যকুমারের এদিকে আসিবার উপায় নাই । ফিরিজি সেনারা গড়ের বাহির হইতে তাঁহার হেনার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছে ।” বর্ষারূত পুরুষ বলিলেন । “তবে তুমি হৃদ্যকুমারের সাহায্যে যাও, আমি ইহাদিগকে পরাস্তব করিতেছি ।” নসীরাম বর্ষারূত পুরুষের আদেশানুসারে চলিয়া গেল । বর্ষারূত পুরুষ দূরের ঘন ঘন ভোপধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, বাহিরেও যোয় যুদ্ধ বাধিয়াছে । বর্ষারূত পুরুষ আবার ভোপ লইয়া একবার দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বারের পার্শ্বের প্রাচীরে আঘাত করিতে লাগিলেন । ক্রমকাল বিকট ভোপ দ্বারিবার পর এককালে ভিত্তিটি পড়িয়া গেল । অমনি বর্ষারূত পুরুষ সেই ভেদ দিয়া প্রবেশ হস্তে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ত্যান্ত প্রধান প্রধান বোদ্ধারা দৌড়িয়া চলিল । ভিতরে প্রবেশমাত্র গজালিস প্রভৃতি বৃদ্ধ জন ভীম বোদ্ধার সম্মুখীন হইলেন । অমনি বর্ষারূত পুরুষ দস্তে দস্তে বর্ষণ করিয়া ভীমবলে তাহাদের উপর পন্নত ঢালাইতে

লাগিলেন, ভূমিতল রক্তপ্রাণে বর্ধমান হইল। যন যন অন্ত্রে অন্ত্রে লাগার বর্ধন শব্দে চতুর্দিক্ পুরিয়া উঠিল। পঞ্জালিস ভয়ানক বলে যুঝিতে লাগিল। ভূমল যুদ্ধে সকলেই মাজিরাছে, সকলেই উন্মত্ত, ক্রমে একে একে সকল উদ্ধাবারী মত্ত হইল। বর্জাবৃত পুরুষ আর কিছুই দেখিতে পান না, কেবল অবিভ্রায়ে পরন্ত চালনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ধকারে শত্রুর আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করা দুর্ব্বট হইল। অন্ধকারে সন্ধান বা লক্ষ্য সম্ভবে না। বর্জাবৃত পুরুষ বামহস্তে আপনার কঠিন দীর্ঘ চর্ম্মধারা শিরো-দেশ আচ্ছাদনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে পরন্ত হইয়া বেগে আঘাত করিতে লাগিলেন। মাকে মাকে “রায়গড়ের সেনা আলোক আন, শীঘ্র যাও, তরু পাইও না, দস্য নষ্ট হইল, গেডির আমাদিগের” বলিয়া চীংকার করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইরূপে অন্ধকারে অন্তরে ধনি ও প্রবল গোলযোগ হইতে লাগিল। অন্ধকারে দীর্ঘ অপ্রশস্ত পথমানে কেবল লোকের যন্ত্রণাচীংকার ও বিবট মৃত্যুযন্ত্রণা শোনা গেল। বহুক্ষণের পর কতকগুলি লোক উদ্ধা লইয়া দূরে আসিতে লাগিল। ক্রমে বর্জাবৃত পুরুষ সে অন্ধকার পথ পার হইয়া প্রশস্ত প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। প্রান্তরে পদার্পণ মাত্রে সকল বিপক্ষ ফিরিঙ্গি বোদ্ধারা পলায়ন করিল। বর্জাবৃত পুরুষ প্রান্তরে কোন বিপক্ষ লোক না দেখিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। তাঁহার অনুসারকেরাও জয়ধ্বনি করিল। জয়ধ্বনিতে গেডিজের প্রতি প্রাচীর কাঁপিল। জয়ধ্বনির পর বর্জাবৃত পুরুষ সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন। “তোমরা যে বাহা অভিক্রুতি, দ্রব্যাদি লও। কিন্তু আমাদিগের আত্মীয় বন্দীদিগকে খুঁজিয়া আনিয়া প্রান্তরে রাখ। আমি বন্দীর অবেশে বাই।” ডাকিয়া বলিলেন। “বরদাকর্ষ কোথায়?” বরদাকর্ষ ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া বর্জাবৃত পুরুষের সম্মুখীন হইলে বর্জাবৃত পুরুষ বলিলেন। “চল আমাদের পথ দেখাও, আমি বন্দীদিগকে মুক্ত করি।”

বরদাকর্ষ অগ্রে চলিল। বর্জাবৃত পুরুষ তাহার পশ্চাতে চলিলেন। ক্রমে গেডিজের পশ্চিম পার্শ্বে বাইরা ঘরের সম্মুখ হইতে একটি অপ্রশস্ত গলির দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বরদা বলিল। “মহাশয় আমি এই ঘরে ছিলাম। এই খানেই জিফুস ছিল। অপরের সমাচার আমি বলিতে পারি না।” বর্জাবৃত পুরুষ তাহার পার্শ্বের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। দ্বারটিতে শৃংখল দেওয়া রুদ্ধ করা। বাহিরে তালক দেওয়া। কুড়ী না থাকায় তালক খুঁজিতে পারিলেন না। আপনার পরন্ত দিয়া অতি বেগে তালক আঘাতমাত্র তালক ভাঙ্গিয়া গেল। শৃংখল খুলিয়া ঘরের দ্বার খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, প্রত্যাবর্তী অতি অবলম্ব হইয়া বসিয়া আছেন। বর্জাবৃত পুরুষকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিল, “কি আবার একি বেশে আমাকে দৃঢ় করিতে আসিলে? আর কেন কষ্ট লাও, আমাকে ছেদ কর।”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “তোমার চিত্তা নাই, আমরা আত্মীয়। রায়গড় হইতে তোমাদিগের উদ্ধারে আসিয়াছি। কিরিন্দ্রি এ হুঁত ত্যাগ করিয়া নিরাহে, এখন বাহিরে আইস।”

প্রভাবতী একবার একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল। “আর ব্যপ্তে কাজ নাই, যথেষ্ট হইয়াছে।”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “আমি সত্য বলিতেছি, আমরা আত্মীয়, এখন যুঁহ হও।”
প্রভাবতী বলিল। “আত্মীয় হও ত আমাকে আমার পিতার নিকট লইয়া চল। আমি তাঁহাকে না দেখিলে আর থাকিতে পারি না। তাঁহার কি দশা হইল?”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “আইস তোমার পিতার নিকট লইয়া যাই। কিন্তু আমরা জানি না, তিনি কোথায় আছেন?”

বরদাকর্ষ বলিল। “বোধ হয় এই পার্শ্বের ঘরে আছেন।”

বর্ধারত পুরুষ পার্শ্বের ঘরের ভালা কাটিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্খল খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, ইন্দুমতী আত্ম বিব্রত হইয়া বসিয়া আছেন। আহা! সে কমল মুখচন্দ্র তত্ব হইয়াছে। অমনতমুখী ইন্দুমতীর কথনও বন্ধ নাই। কেশপাশ আলুসারিত। নিরাসনে ভূমে ভূমিস্থিতিতে বসিয়া আছেন। দক্ষিণ হস্তে খরসাম কুপাণ। কুপাণটীর অগ্রভাগ চিবুকে ঠেকিয়াছে। স্পর্শহানে চিবুকগাগ নষ্ট হইয়া একটি নীল বিন্দু, পেথনে তাহার চতুর্শাশ্ন রক্তহীন। বর্ধারত পুরুষের প্রবেশশব্দে ইন্দুমতী চাহিয়া দেখিলেন। বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “দেবি! গাজোখান কর, ছুট কিরিন্দ্রি পলাইয়াছে।”

;

বর্ধারত পুরুষের বল ভাবে পুরিল। বাক্যফুর্জি ভাল হইল না। অসহ বেগে শোণিতজোত ললাটে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গণ্ডাগ বর্ধিত হইল। ইন্দুমতী বলিলেন। “আমি কোন্ বীরকে আমার উদ্ধারের জন্ত প্রণাম করিব? আপন! হইতে আমার যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা আমি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। মহাশয়! এটি কোন্ বীরের পুরুষ?”

বর্ধারত পুরুষ বলিলেন। “দেবি! এহান অতি ধন্য, অনাহারে আপনায় কষ্ট হইয়াছে, একশে শীত এহান ত্যাগ করিয়া হিন্দুর আবাসে চলুন।”

বরদাকর্ষ ব্যগ্র হইয়া বলিল। “আমি লোক দিতেছি, আমার গদি আপনার জন্ত নিয়োজিত হইবে।”

বরদাকর্ষ ক্রমত ঘরের বাহিরে বাইরা তজহন্নকে ডাকিয়া আনিল ও তাহার নিকট ইন্দুমতীকে সমর্পণ করিল। প্রভাবতীকে লইয়া বর্ধারতপুরুষ অপর এক ঘর গুলিলেন। তাহার অনঙ্গপাল দেব ছিলেন। প্রভাবতী আপনার পিতাকে দেখিয়া ক্রমত বাইরা

করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথের সেনাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন ও রায়-
গড়ের সেনাকে রায়গড়ে বাত্মা করিতে অনুমতি দিলে, রায়গড়ের সেনা ও বাকী মহারাজার
সান্নিধ্যের সেনারা আপন আপন নৌকার ও তাহাজে উঠিল। কেবল একখান
নৌকায়াত্র তীরে রহিল। বন্দীদিগকে মানসি হের পোতে উঠাইয়া লইলেন। বন্দীরা
মধ্যে ক্রান্তিস্থ ও আশ্রয়বিহীন ছিল। স্বর্ঘ্যকুমারকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথের সহিত
উপস্থিত হইলেন। সেখানে বৈদ্যনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বৈদ্যনাথ ইহাদিগকে
তাহার ঘরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিল ও বহু বস্তু পাইল।

বর্ধ্বাতপুরুষ বলিলেন, “মহাশয়! আমাদিগের অত্যন্ত বিশেষ কৰ্ম্ম আছে,
ব্রাহ্মণেরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।”

বরদাকর্ষ বলিল। “মহাশয়! আমি আপনার সঙ্গে রায়গড়ে বাইব। আমার
এখানে নিজস্ব থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়।”

বৈদ্যনাথ অনেক নিবেদন করিল, কিন্তু বরদার ব্যগ্রতা দেখিয়া অবশেষে
অনুমতি দিল। অল্পকাল পরে রায়গড়ে বাইতে অভিল্যব প্রকাশ
করা, ইন্দুমতী ও প্রভাবতী বস্তু করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। অল্পকাল
পরে, বলভ, নসীরাম, স্বর্ঘ্যকুমার, মালিকরাজ, বর্ধ্বাতপুরুষ বরদাকর্ষ, ইন্দুমতী,
প্রভাবতী ও অল্পকালকে লইয়া নৌকারোহণ করিলেন। বৈদ্যনাথ নৌকা ধরিয়া
অনেককাল কথা কহিয়া অবশেষে স্বর্ঘ্যকুমার ও বর্ধ্বাতপুরুষের হস্তে
বরদাকে সমর্পণ করিলেন ও তাঁহাদিগকে পুনরায় সনদ্বীপে আসিতে প্রতিজ্ঞা
করাইয়া বিদায় দিলেন। বিদায়কালী বৈদ্যনাথের চক্ষে জল পড়িল। গোবিন্দ
বরদার সঙ্গী হইতে চাহিল, কিন্তু বরদা ও বৈদ্যনাথের ব্যগ্রতার সনদ্বীপে রহিল।
বেলা প্রায় একদণ্ড হইয়াছে, বর্ধ্বাতপুরুষ তুরী বাজাইলেন। স্বর্ঘ্যকুমার ও
মালিকরাজ তুরী বাজাইলেন। সকলে জয়ধ্বনি করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল।
বাহকেরা ধ্বজি ঠেলিয়া নৌকা তীর হইতে অন্তর করিয়া দণ্ডে ধারণ করিল। ঝগ
ঝগ শব্দে দণ্ড চালাইতে লাগিল। নৌকা ক্রমে সনদ্বীপ হইতে অন্তর হইতে লাগিল।
বৈদ্যনাথ তীরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বরদাকর্ষ নৌকার উঠিয়া
দূর হইতে আপনার পিতাকে নমস্কার করিল। গোবিন্দ আপন উত্তরীর লইয়া
দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া দূর হইতে উড় হইতে লাগিল। এ দিকে নৌকা হইতে বরদাকর্ষ
আপন উত্তরীর উঠাইল।

অল্পকালী বর্ধ্বাতপুরুষকে বলিল “মহাশয়! আমার ভ্রাতা অনুপমাকে কোথা
দেখিয়াছিলেন?”

বর্ধ্বাতপুরুষ বলিলেন। “না আমি তাহাকে জানি না।”

বয়স বলিল। “আমি, বোধ হয়, বেশ তাহার মত একজনকে পঞ্জালিসের দ্বারা ধরিয়া গোড়জের খড়্গ দিয়া পলাইতে দেখিয়াছি।”

সৌক্য যেনে বাহতে লাগিল ক্রমে সনদীপের লোক আর দেখা যায় না। গাছ-গুলি মিলিয়া একটি ঝোপরাণি হইল। ক্রমে সমুদ্রের অগ্রে সনদীপের কূল ডুবিল। ক্রমে বয়স আরও ডু'বল। ঝোপ তরুণ সমুদ্রের অগ্রে ডু'বল। এখন কেবল দুই একটা অত্যন্ত উচ্চ তরুণ শিখা ডাসিতেছে। ক্রমে সেও ডুবয়া গেল। পুঙ্খানুপুঙ্খ আর সনদীপের চিহ্নও নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

“হারো নারোপিতঃ কঠে ময়া বিচ্ছেদভীরুণা।”

যখন রায়গড় হইতে বর্জ্যবৃত্তপুরুষ ও অজ্ঞাত সেনারা সনদীপ যাত্রা করিয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইল, যখন সনদীপে বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের সহিত সাক্ষাৎ করিল ও তাহার ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল, সেই সময়ে যমুনাপুরুইয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আবাসঘরে বড় গোলযোগ। উদ্যানে বিজয়কৃষ্ণ বিব্রবদনে দাঁড়াইয়া আছে। ষাঁয়ের সোপানে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বয়ং। তাঁহার বিস্তৃত (১) কেশ স্বদেশ পৰ্যন্ত পাড়াইছে। আকর্ষণ পার্শ্ব (২) পৰ্যন্ত শ্লথ অঙ্গরক্ষ দীর্ঘ-বপুকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শিথিল কটিবন্ধের দশা ও রেশমের শ্রেণবদন সমুখে ঝুলিতেছে। সুপ্রশস্ত পিপ্পলের (৩) মধ্য হইতে বলবান্ নায়ুমান্ হস্ত দেখা বাইবেছে। মহারাজ বামহস্তে আপনার কেশপাশ ধরিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তটি কঙ্কালে আছে। মহারাজের পায়ে ৮পেটা পাতুকা। মহারাজ কিছুক্ষণ শূণ্ণ দৃষ্টি করিয়া উদ্যানে নামিলেন ও যেখানে বিজয়কৃষ্ণ এক মলে দাঁড়াইয়াছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণ মহারাজের দিকে চাহিয়া দেখিল কিন্তু কোন কথাই কহিল না। মহারাজও নিবটে গিয়া কিছুই বলিলেন না, উভয়ে কিছুক্ষণ মৌন-ভাবে থাকিলে, বিজয়কৃষ্ণ বলিল। ‘মহারাজ! এখন হজুরমল আসিলে সে সমাচার পাওয়া যায়। দেখুন রায়গড়েই বা কি হইল। শাস্ত্রে বলে যখন মন সমর উপস্থিত হয়, তখন সর্বত্রই প্রতিকূল ফলোদয় হয়।’

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! কিন্তু আমার ত এমন বোধ হয় না যে, আমার সৌভাগ্য এত নীচ্র অস্ত হইবে। আমার ত আশার এখন অর্ধেক কাৰ্য্য হয় নাই। আমার অদৃষ্টবর্ধের সমুচিত উদয়ই হয় নাই, তা তাহার অস্ত কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, সকলের ভাগ্যে সে ভাষকের উদয় পর্য্যন্তও হয় না। আপনার পক্ষে ও তিনি উদিত হইয়াছেন। অনেকে সেই রবির অরুণোদয়েই আত্মাকে কৃতার্থমগ্ন করে।”

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ, তোমার কথা সত্য বটে। অনেকের ভাগ্যে ভড়িডের ভ্রায়ও দৃশ্য হয় না। কিন্তু আমার ভাগ্য কি সাধারণের ভাগ্যের হাঁচে ঢালা যে, তুমি এত শীঘ্র আমাকে হতাশ হইতে বল! আমার আশার কণামাত্রও অকুরিত হয় নাই।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, আপনার তাহার পরিদেবনা (১) করা যোগ্য হই-
তেছে না। মহারাজ! আপনার তুল্য ভাগ্যবান্ পুরুষ সংসারে ক জন আছে? এ
হেন বঙ্গ একচ্ছত্রী হইলেন। বঙ্গের সকলেই আপনার শাসন স্বীকার করিয়াছে ও
অনেকে করণ দিতেছে। বঙ্গের ষাটশ সূর্যের মধ্যে আপনি একমাত্র সকলের সমষ্টি।
বর্ধমানরাজকে গণ্য করা যায় না। তাঁহার রাজচিহ্ন নাই। সামান্য ভূম্যধিকারীর সঙ্গে
ছত্রশুধারীর তুলনা হয় না। এ অপেক্ষা আর কি আশা করেন। এতদতিরিক্ত অতি-
লাষ ফলকরী নহে।”

মহারাজ বলিলেন। “তুমি আপনার মত কথা কহিলে। এক রাজ্যের মন্ডিতে ব্রত
হইয়াছিলে। একের শূণ্ণঅলম্ব রাজকর্ম প্রবাহিত হইলেই বখেট রাজকাধ্য হইল জ্ঞান
করিতে। এখন ষাটশমাত্র রাজত্বের চিন্তা করিতে হয়, বখেট জ্ঞান করিলে, কিন্তু
বিবেচনা করিলে না যে, প্রতাপাদিত্যের মন তারতবর্ষ এককালে গ্রাস করিতে সমর্থ।
এখন বলিতে পারি না, সে পল হইলে আবার মনের কত দূর গ্রাস-শক্তি বৃদ্ধ হইবে।
বিজয়কৃষ্ণ! আমার অন্মতে সন্তুষ্টি হয় না। আমি যত দূর পর্য্যন্ত মনপটে দেখিতে পাই,
তাহার মধ্যে অপর কাহার শাসন আমার যেন হৃদে শ্লেষমত লাগে। আমার তাহা সহ
হয় না। এ কি আমার রাজ্য! সামান্য ভূমিখণ্ডমাত্র! ইহাতে আমার হস্তপদাদি
বিস্তারের স্থান নাই। এই দেখ, যমুনাপত্রই পার হইলেই গঙ্গাতীরে বর্ধমানরাজ্য
আধিকার, আবার তাহার মধ্যে দিল্লীবরের অর্ধচন্দ্র চিহ্নও দেখা দেয়। বিজয়কৃষ্ণ!
আমার কেবল রাজ্যলাভেচ্ছাই বলবতী নহে। আমি লোভে মুগ্ধ হইতেছি না। পাপ
আবার আমার কঠোর পাণিগ্রহণ করিবে বলিয়া সমাচার পাঠাইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য!
একি কাহার সহ হয়? আমি ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে
যে বিদেহীর বদন বসিবে, ইহা আমার অসহ। পৃথুরাজ চৌহান যে ছত্র শিরে ধারণ
করিয়াছিলেন, সে ছত্র, অখণ্ডাঙ্গলোপ, বাসবীন, অসত্য, তাড়ারে অধিকার করে

এ কোন্‌ সংস্থার সঙ্গে যোগে যাব? আমাদিগের দেশ, আমাদিগের ধন, আমাদিগের অস্ত্রবল; আমাদিগের সেনা, আবার আমাদিগেরই সেনানী কি স্বেচ্ছা বশতের স্বত্ব চরিতার্থে নিযুক্ত থাকিবে। এ কেমন কথা? যে সমাচার পাইলাম, কালী বরুণ, মহারাজ মানসিংহ কৃতকার্য হউন, তবেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব, বাহা হউক, তাঁহাতেও হিন্দুশোণিত আছে। জিহাদিরকে সিংহাসন দেওয়া নিতান্ত অসহ। ভাল মুসলমানদিগের মতেও খুসরু কিছু অস্ত্র কেহ নহে, সেও বাদসাহজাদ। যোগপূরপতি গভর্ণর আমায় ধেরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একান্ত হিন্দুশক। জয়পুরওয়াল মহারাজ মানসিংহ তিনিও মনে মনে আমাদিগের পক্ষ, কিন্তু তীক্ষ্ণব্রতাবলম্বী স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি সেরূপ নহি। আমার ইহলোকে কাহাকেই ভয় হয় না। ভয় কাহাকেই বা করিব? বিজয়কৃষ্ণ! তুমিও জান, আর আমিও শুনি-
গাঁছি, আমি বাল্যকালেও কাহাকে ভয় করিতাম না। আর কাহাকেই বা ভয় করি, আমি অপেক্ষা অধিক বলবান, অধিক সাহসী, অধিক বুদ্ধিজীবী, অধিক জ্ঞানী, না হইলেও আমার ভয়ের পাত্র হইবে না?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! বাহা বলিলেন তাহা সত্য, কিন্তু দেখুন, মহারাজ মানসিংহ স্পষ্ট আপন মনের ভাব প্রকাশ করেন না। তিনি কিছু ভয় নহেন। তাঁহার বিবরণ্তাম আছে, মনে জানেন এখন আফগান নিতান্ত ফলহীন। তিনি এখন যে অবস্থায় থাকেন, তখন সেই মতই ব্যবহার করেন। দেশকাল পাত্রাদি বিবেচনা করিয়া কল্প করিবে। সময় পরিণত না হইলে আফগানে বিপ্লবিত ফল প্রসব করে। মনে করুন, এখন দিল্লীতে বর্তমান ছিলেন, তখন যদ্যপি মহারাজ এরূপ মত প্রকাশ করিতেন, তবে কি আপনি কিরিয় বশোরে আসিতেন, না রাজত্বই পাইতেন? তৎকালে দিল্লীর আপনাকে বেষ্ট্রাচরণ করিত। মনের ভাব মনেই রাখুন, সময় হয়, প্রকাশ করিবেন। মহারাজ মানসিংহ সদ্যুক্ত করিতেছেন। গুপ্তভাবে স্বার্থ সাধনে নিযুক্ত আছেন। ইহাতে উভয় কুণ্ডই রক্ষা পাইবে। কালী দয়াকরেন ত একদিন হিন্দুসম্রাটের ধ্বজা দিল্লীর মুরচার উপর হইতে উড়িবে।”

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! সকলই কালীর ইচ্ছা বটে, কিন্তু আমাদিগকেও বলাই হইতে হইবে। উদ্যোগ না করিলে কে কোথায় স্বার্থলাভ করে? মহারাজ মানসিংহ গুপ্তভাবে পরামর্শ করায়, সিংহের মত আচরণ করিতেছেন না। তিনি স্বত্বানি লোভপ্রিয়, আমার যদ্যপি তাহার অর্ধেক লোক বশীভূত হইত, তবে আমার আর হাড়ে আগরনের কারণ কি? বিজয়কৃষ্ণ! আমার এরূপ পরামর্শ শুন না। আমি অস্ত্রশীলা বহিতে পারি না। আমার বল স্বেচ্ছা তাড়ায় সঞ্চার করিতে পারে, ভাল, নতুবা একবার পৃথ্বীর আসনের জন্ত আমার স্বত্বান হইতে হইবে।”

বিজয়রুক্মক বলিল। “মহারাজ ! বাহ্যতে মজল হয়, তাহাই করা বিধেয়। রাজকীয় কৃপণতাই আমরা জীবিত থাকি। আমরা ছত্রচ্ছায়ার বুদ্ধি পাই। পত বিধের শোচনীয় প্রয়োজন নাই, একপকার বিবেচনা কি ? মানসিংহও বজবজে আগিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার সেনাপল অত্যন্ত অধিক।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিজয়রুক্মক ! বর্জমানাধিপ কি বলিলেন ? আমার দূত কি করিয়া আসিয়াছে, দেখ একবার তত্ত্ব লও। উড়িষ্যায় যে পাঠানেরা ভীত হইল, তাহার অর্থ কি ? আমার দূতকে যে মানসিংহের লোক বলপূর্ব্বক লইয়া গেল, তাহারই বা কি শাস্তি ? এ ত রাজন্যোত্তি নহে। দূতেরা তিনদিন সর্ব্বত্রই অবধ্য, যদি দূতের স্বাধীনতা না রক্ষা হইল, তবে আর রাজত্বই বা কি ? আমার এ অপমান কোন মতেই সহ্য হয় না। কৃকনাথের নুসন কিছু সমাচার পাইয়াছ ? সে যে প্রায় তিন দণ্ড স্বয়ং তত্ত্ব লইতে গেল, তাহারও কোন অমঙ্গল ঘটে নাই ?”

বিজয়রুক্মক বলিল। “মহারাজ, আমার ত এমত বোধ হয় না যে, রণবীরবাহাদুর সহসা কোন বিপদে পড়িবে। তবে বলা যায় না, আমাদিগের সময়ের গুণ। অন্তঃপুর হইতে যমুনা ক্রুত আসিতেছে, তাহার কি বার্তা ? আবার কি সরমার কোন নুতন উপসর্গ ঘটিল ? রোগে নিতান্ত আমাদিগকে জর্ণ করিতেছে।”

ক্রমে যমুনা মহারাজের সমুখীন হইয়া বলিল। “মহারাজ। সরমাদেবীর মোহ হইয়াছে। তিনি এখন কি বলিতেছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না ও বলপূর্ব্বক এক একবার শব্দ হইতে উঠিতেছেন। রানী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আপনাকে প্রমোদিত দিতে অনুমতি করিলেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিজয়রুক্মক ! কি বিশদ ! এসমস্ত রাত্রি আমাদিগকে কষ্ট দিল। আপনিও ব্যাধিচিত কষ্ট পাইতেছে। এমত রোগ ও কথন দেখি নাই। একবার বৈদ্যরাজ হরিশ্চন্দ্রকে ডাকাও।”

বিজয়রুক্মক দূর হইয়াই ইঙ্গিত করিতে সে অগ্রসর হইল। তাহাকে হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়কে ডাকিতে অনুমতি দিলেন।

বিজয়রুক্মক বলিল। “যমুনা ! তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও, আমরা তাহাকে লইয়া সীম্র বাহিতেছি।” যমুনা অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল।

মহারাজ বলিলেন। “এ রোগটা কি, তাহা এখন নিশ্চয় হইল না ? রোগ স্থির না হইলে তাহার ব্যবস্থা চলে না। রাজজি কি বলেন ?”

বিজয়রুক্মক বলিল। “মহারাজ এটি আমার মতে কোন শারীরিক রোগ বোধ হয় না। অত্যন্ত হর্ষে বিবাদ হওয়ার এটি পরিণাম। এক্ষণে বিকার প্রাপ্ত বলিতে হইবে। ইহার শাস্তি চিকিৎসাসাধ্যে কিছুই দেখি না।”

‘মহারাজ বলিলেন। “তবে সরমার কি পরিভ্রাণ নাই। হরিবে বিবাদেরই বা কারণ কি? সরমা কি সেই দুষ্টটার জন্য এত ব্যথা পাইবে?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! যে বাহার শ্রিয় হয়, তাহার চক্ষে সকল দোষ স্পষ্টরূপে পরিণত হয়। উত্তরের বালাবধি একত্রে বাস থা ফার এইরূপ ঘটনায়ে। তাহাতে আবার হৃদয়কুমার কিছু নিতান্ত অপাত্র নহে। তাহার স্ত্রণ আমানিককে স্বীকার করিতে হইবে, সে যে অবিত্যর বীর, অসামান্য সরলবৃত্তাব। বিশেষত সে ভুবন-মোহন রূপে সকলকেই বশীভূত করে।”

মহারাজ বলিলেন। “সত্য বটে, কিন্তু এখন ত তাহার কোন বিশদ ঘটনা নাই যে, সরমা বিষয় হইল। সে অল্প সময়ের জন্য কোথায় গিয়াছে, কিরিত্তা আসিলেই আবার উত্তরের মিলন সম্ভাবনা।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, বাহা বলিলেন, তাহা আমি বুঝিলাম, কিন্তু প্রেমিক-দিগের আর একরকম বিচার। তাহাদিগের বুদ্ধির গতি স্বতন্ত্র। তাহাদিগের তাৎপর্য। তাহারা সংসার ছাড়া। প্রেমিকের বিবেচনা নাই। যাহাকে ভাল বাসে, তাহাকে কখন অশুচক্ষে দেখে না। তাহাকে চক্ষের তারা করে। প্রাণের আগ্রহ জ্ঞান করে। হুই প্রেমিককে একত্রে ছাড়িয়া দাও, তাহারা আর কিছুই চাহে না। তাহাদিগের পক্ষে সংসারের অস্তিত্ব থাকে না। একই অপরের পক্ষে সংসার। সেই তার সকল ভাবের আধার। মহারাজ! আপনি ত এ সকল ভাল জ্ঞাত আছেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “আমি ত্রীলোকের প্রেমে এক কালে মত্ত হই না। আমার অস্ত চিন্তার মনকে নিবৃত্ত রাখা। বশিষ্ঠ ঋষির বচনটি আমি কখন ভুলিব না। বাহিরে আমি সকল বিষয়েই সংশ্লিষ্ট, কিন্তু হৃদয়ে আমার কিছুই নাই।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ যদি এমত হয়, তবে ইন্দুমতীর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইলেন কেন?”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! আমি তখন যেন চেতনাশূন্য হইলাম। এখনও ইন্দুমতীর কথাটি মনে পড়িলেই আর আমার কিছুই ভাল লাগে না। ভাল এখনও হৃদয়মল আসিল না কেন? তোমার কি বোধ হয়, সে কৃতকার্য হইয়াছে?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। ‘মহারাজ! কৃতকার্য না হইবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। তবে হৃদয়কুমার ও মালিকরাজ কোথায়, তাহা না জানিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। ঐ রায় মহাশয় আসিতেছেন।

মহারাজ বলিলেন। “ভাল, ইন্দুমতীর তুল্য আর কাহাকেও চক্ষে দেখিয়াছি। আমার চক্ষে ত আর কেহই তেমত ‘রূপসী’ লাগে না। সে যে আমাকে এককালে অস্তিত্ব করিত্তা কেলিয়াছে।” রায় মহাশয়কে নিকট হইতে দেখিয়া বলিলেন।

“সারজি, সরমার যোগের শক্তি হইতেছে না। আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। চল একবার দেখিবে।”

হরিশ্চন্দ্র বলিল। “মহারাজ ! দেবীর যে রোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাঙ্গ ত কোন চিকিৎসাই ধাটে না। আমি তাঁহার অস্ত্র নিত্য চিহ্নিত আছি।”

মহারাজ বলিলেন। “চল একবার দেখিয়া আসি।” মহারাজ অগ্রসর হইলেন, হরিশ্চন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। ক্রমে রাজবাটীর ভিতরেও গেলেন। পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সরমার ঘরে গেলেন। দেখেন, সরমা তাঁহার শয্যা বসিয়া আছেন, তাঁহার কক্ষস্থলে বস্ত্র না থাকিতে প্রশস্ত বস্ত্রকে আচ্ছাদন করিয়া তুঙ্গ স্তন্য সাহকারে উন্নত হইয়া আছে। কর্ণের হার পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে, চন্দ্রুর্দয় অত্যন্ত উন্মীলিত ও আরক্ত। কপোলরাগ অত্যন্ত বর্জিত। মহারাজ ঘরে প্রবেশ করিয়াই হঠাৎ বাহিরে আসিলেন। যমুনা ব্যস্তে সরমার গাত্রে ও মস্তকে ওড়ন ঢাকিয়া দিল। মহারাজ কিঞ্চিৎ বিশ্রম করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল। চিকিৎসক ঘরে প্রবেশ করিয়াই সরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। আমনি তাঁহার অচেতন অতীব বিস্ফারিত নেত্রভাঙ্গ দেখিয়া কিছু ভীত হইল। কিছু ক্ষণ এক দৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া অঙ্গে অঙ্গে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া বলিল। “মা সরমা ! একবার তোমার হাত দেখি ?”

সরমা কোন উত্তরই করিলেন না। একদৃষ্টে একনিমেষে চাহিয়া রহিলেন। চিকিৎসক দুই তিনবার বলিলেও সরমা কোন উত্তর করিলেন না ও কোন ভাবও তাঁহার চক্ষে দেখা দিল না। কেবল একদৃষ্টে যেমন চাহিয়াছিলেন, তেমতই চাহিয়া রহিলেন।

মহারাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন। “সরমা ! বৈদ্যরাজ আসিয়াছেন, একবার তোমার হাত দাও, তোমার হাত দেখিবেন।”

সরমা কোন উত্তর করিলেন না। মহারাজ দুই তিনবার বলিলে পর, চিকিৎসকের দিক্ হইতে কিরিয়া মহারাজের দিকে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া ক্রমে সরমার ওষ্ঠের কঁপিতে লাগিল। তাঁহার হস্তপদাদি কঠিন হইল। মুষ্টি বদ্ধ হইল, গলায় শিরা সবল উচ্চ হইয়া খোঁচিয়া ধরিল। ক্রমে সরমার নিশ্বাস বন বন বহিতে লাগিল। ক্রমে উদর ও বক্ষস্থল বায়ুপূর্ণ হইয়া উচ্চ হইল। ক্রমে তাঁহার বর্জিত কপোলরাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে সরমার নীরস চন্দ্রুৎ রস উপজিল। ক্রমে সরমা লাস্যপুট সজ্জিত করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণের পর তাঁহার মনের ভাব উৎখলিল, সরমা আর আশ্রমকে সাবধান করিতে পারিলেন না। সরমা আর স্থির রহিলেন না, সরমার উন্নত কুচাচ্ছাদন বস্ত্র ক্রমে বন বন ফুলিতে লাগিল, সরমা একটি “হা বিখাতঃ!” বলিয়া চীৎকার করিয়া রাগিণী গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাণী অমনি

বাক্য হাত সরমার কটিদেশে ও দক্ষিণ হাত সরমার গলদেশে বিরাটোহার কোথায়ই
বিপণ্ডিত লক্ষ্যধারা চূষন করিতে লাগিলেন। রাণীরও চক্ষের জল পড়িল। সে পক্ষি
জনহত্যার কেশিরা কঠিনতার চিকিৎসক আশ্রয় সে দিকে চাহিতে পারিলেন না। সরমার
চুখাবনত মুখচন্দ্র ও নিভাত ব্যাকুল আশ প্রস্তুতিত, আশ গদগদধ্বনিত মিশ্রিত বাক্য
সকলেরই মন গলিয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ আপন অক্ষসংঘর্ষে অক্ষম হওয়ার মুখ কিটাইরা
ভয়ের বাহিরে গেলেন। মহারাজও মুখে হস্ত দিয়া বাহিরে আসিলেন। কিছুকণ
পরে মহারাজ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরমার শয্যা বসিলেন, হস্তিচক্র বাহিরে আসিল।

মহারাজ সরমার নিকটে বসিয়া বলিলেন। “সরমা। মা। তোমার কিসের জন্ত
মনস্তাপ হইয়াছে, তাহা আমাকে বল, আমি এইকণে সে তাপের কারণ দূর করিতেছি।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! তোমার সরমার দুঃখের কারণ সূর্য্যকুমারের অপরাধ।
আপনি সূর্য্যকুমারকে কোথায় পাঠাইয়াছেন বলুন, এখন সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে
আনাহি। সূর্য্যকুমারকে এক্ষণে না দেখিলে আমার সরমা—” রাণীর ক্রমে বাক্য মনের
ভায়ে অক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল, তিনি আর এ কথাটির শেষ করিতে পারিলেন না। স্নেহে
অভিভূত হইয়া সরমার মুখদেশে একটি চূষন করিলেন।

রাজা বলিলেন। “সরমা, তুমি তাহার জন্ত এত চিন্তিত হইও না। সূর্য্যকুমার
কুশলে আছে, আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই, সে ও তাহার ছাত্র মলিকরাজ
গড়দ্বারে কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহই জানে না, অন্য এইকণেই কিরিয়া আসিবে।
তাহাতে তোমার ভয়ের কারণ নাই। সে কিছু বালক নহে, তাহার কোন বিপদ উপ-
স্থিত হয় নাই।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! সরমা ভয় করিতেছে, বুঝি আপনি অসম্মত হইয়া
তাহাকে কোথাও পাঠাইয়াছেন। নতুবা কেন, এই তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার কথা
পরই সে স্থানান্তরে নিরুদ্দেশ হইল। আর স্বর্গবার (১) হইতে বহুনা শুনিয়া আনি-
য়াছে যে, আপনার আজ্ঞা হজুরমল কোথায় গিয়াছে; আপনি সূর্য্যকুমারকে প্রথমে
বাইত বলিয়াছিলেন, সে বাইতে স্বীকার করে নাই। আবার শুনিতে পাই, মালতী
বলিতেছিল, কোথায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে আর শত্রু আসিয়াছে বলিয়া রণবীর-বাহাদুর
নাকি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পরিগমে (২) গিয়াছে। সরমার চিন্তা হইতেছে, বুঝি সূর্য্য-
কুমার আপনার কোল অন্তর্মতি লইয়া কোথাও গিয়া বিপদে পড়িয়াছে। আপনি এই
কণেই কাহাকেও পাঠান, সূর্য্যকুমারকে গিয়া আহুক। সরমার আর কোন স্নেহ নাই।
এইমাত্র এক চিন্তার তাহার লবাস্ত্রিত কোমল প্রেমকে এককালে অবসন্ন করিয়াছে।

বলিষ্ঠী আপনি সরমার হৃদয় দেখিয়া অধীরোদগে ভাষাধিনের অবশেষে গিয়াছে। সেও
আঁর হৃদয় এইর কাল হইল; এখনও আসিতেছে না।”

রাজা বলিলেন। “যদি এই সরমার রোগের কারণ হয়, তবে আমি নিশ্চিত
হইলাম। সরমা! তুমি কথামাত্রও ভাবিও না, স্বর্ঘ্যকুমার অভিশপ্তই আসিয়া
পৌছিবে। আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই।”

মহারাজ উঠিলেন ও দর হইতে বাহিরে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। “দেখ,
স্বর্ঘ্যকুমার কোথায় তাহার অনুসন্ধান লও। স্বর্ঘ্যকুমারের জন্তই সরমা নিভাত অধির
হইয়াছে।”

মহারাজ অন্তঃপুর হইতে বাহিরে চলিলেন, বিজয়কৃষ্ণ পশ্চাৎ হইতে বলিল। “মহা-
রাজ, তবে হরিশ্চন্দ্রের অনুমান সত্য হইল।”

চিকিৎসক বলিল। “মহারাজ, যখন রাত্রে আর হৃদয় তিনবার দেখিয়া গিয়াছিলাম,
তাহার একবারও কোন রোগের চিহ্নমাত্র দেখি নাই।”

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ, এ বালকদ্বয় কোথায় গেল?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আমি ত অনুমান করিতে পারিতেছি না। বোধ করি, উভয়েই
রায়গড়ে গিয়াছে। একজন সেনাকে রায়গড়ে পাঠাইয়া সমাচার লইলে হয়। কিন্তু
হস্তমল একবেই আসিবে, দেখি সে কি বলে?”

রাজা ক্রমে ক্রমে উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র অনুমতি লইয়া বিদায়
হইল। মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! দেখ, আবার স্বর্ঘ্যকুমারের জন্ত আমার
কত কষ্ট পাইতে হয়, এমন অব্যবহিত আর ছুটি নাই।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ কুহেলীর আপনার উপর দোষারোপ করা আমার
উচিত হইতেছে না। কিন্তু কি করি, এমন করিয়া সর্বদা আপনাকে না দেখাইয়া দিলে,
আপনার মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হই না।”

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ, বল আবার আমার কি দোষ হইল। তুমিও
আমার পদে পদে দোষ দেখিতেছ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করিবে। কিন্তু আপনি ত আমার
পরামর্শে কর্পণাৎ করেন না।”

মহারাজ বলিলেন। “তোমার কোন পরামর্শের বিপরীত আমি ব্যবহার করিয়াছি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনি স্বর্ঘ্যকুমারকে সরমা দান করিবে, তাহা
প্রকাশ করিলেন। একটু দ্বিধা হইয়া বিবেচনা করিলেন না। যদি অন্য ব্যক্তি হইয়া
তাই না বলিতেন, তবে সরমার এত চিন্তা হইবার কোন কারণ ছিল না। সরমা দেবী
বদ্বি মনে মনে তাহাকে ভাল বাসিতেন, ওখানি আপনার অনুমতি না পাইলে তাহার

তঁও হিরণ্মিত্র ছিলেন না। গুপ্ত কল্যা মহারাজের কথায় তিনি মনে মনে সূর্য্যকুমারকে পণ্ডিতের বরণ করিলেন, আবার গুপ্ত রাজ্রাই তাহার সঙ্গে মিলন হয়, এমনত আশাও করিলেন। অস্তঃপুরে মহা উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল, মহা উৎসাহে সরমাদেবী মিলনোপযোগী বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের সকল ভাব এককালে উদ্ভোজিত হইল। একদণ্ডও বাইবে না, সূর্য্যকুমার ও সরমা এ রাজ্র হইবেল, চিরদিনের আশা চিরকালের প্রেম, বাগ্যকালের একত্রে বাঁধে উদ্ভাবিত স্নেহ মিলন ফল ধরিবে। সরমার নবীন মনে আর উৎসাহ ধরিতে স্থান ছিল না। সরমার কেশপাশ বন্ধ করিতে বিলম্ব সহে না, আয়োজনের বিলম্ব সহে না। প্রেম উৎখলিল। সরমা হরিষে উৎসাহ হইলেন। সরমা স্বর্গের চন্দ্র হস্তের নিকট পাইলেন। শেষ সুখলাভাশয়ে হস্ত বিস্তারিলেন, ঐ দেখুন চন্দ্র পলাইল। সূর্য্যকুমার তাঁহার শবিরে নাই, কোথায় গেছেন, কেহই জানে না। সকল আয়োজন বুধা হইল, সরমার অর্ধবৃদ্ধ কবরী অমনি রহিল। সরমার এক নয়নে অশ্রু ন হইল না। সরমার একহস্তে অলঙ্কার হইল না। সরমা অমনি উঠিলেন, সরমার মনের আশা অমনি মাধা ভাসিয়া পড়িল। সরমার আর হৃৎকথের সীমা নাই, সরমা অবসর হইলেন। মহারাজ যদি এমনত করিয়া সরমাকে সপ্তম স্বর্গে না তুলিতে, তবে সরমার পতনে এত কষ্ট হইত না। সরমা অতীব উচ্চে উঠিয়াছিলেন, তাহাকে এককালে অগাধ পতন ফেলিলেন।”

বিজয়কৃষ্ণ ক্রান্ত হইলেন। মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না, অবাক হইয়া বিজয়কৃষ্ণের কথাগুলি শুনিলেন। মনে মনে আপনাকে দৃষ্টলেন, সরমার হৃৎকথ নিত্য হৃৎকথ হইলেন, মহারাজের ছন্দ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন। “আহা! কি কুজাই করিয়াছি। নবানুপ্রভ-প্রেমকে মথিয়াছি, আহা! তাহার কোমল অঙ্গ জীর্ণ করিলাম, আমি কি অর্কচাঁদ!” বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! সত্য বলিয়াছি, আমার সেটি বড় যুক্তিমত কর্ম্ম হয় নাই, আমি পবিত্র-প্রেমে কষ্টক দিয়াছি। আহা! নির্মূল প্রেম মলিন হইল। এ মলা নষ্ট হইতে কতদিন যাইবেক। আমার সরমা এক রাত্রের মধ্য ক্রীণা হইয়াছেন, চিত্তা এমতি ভয়ানক। রাজসৌ বাহাকে স্পর্শ করে, তাহার অস্ত্রায়া পর্য্যন্ত ম্লান হয়! এখন সদ্‌যুক্তি কি, কিসে সূর্য্যকুমারকে পীত্র আনা যায়?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল “মহারাজ! ঐ মালতী আসিতেছে, তাহার ভাবাবধারণের ফল শ্রবণ করুন; পরে উপাছত মতে বিচার হইবে।”

মালতী অতি দ্রুত আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। অশ্রু হইতে অবতীর্ণ হইলে বিজয়কৃষ্ণ উঠেঃস্বরে বলিলেন। “মালতি! মহারাজ তোমায় স্মরণ করিতেছেন, এ দিকে এস।”

মালতী মহারাজকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিল।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মালতী! তোমার কুশল বল।”

মালতী বলিল। “মহারাজ! আমি বাহা দেখিলাম ও শুনিয়া আসিলাম, তাহাতে বড় কুশল সমাচার নহে। আমি বোধ করি সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ রায়গড়ে গিয়াছিলেন।”

রাজা ও বিজয়কৃষ্ণ এক খাঙ্গে বসিলেন। “ইহারা কি রায়গড়ে গিয়াছিল? তুমি কেমনে জানিলে?”

মালতী বলিল। “মহারাজ! আমি প্রথমে সূর্য্যকুমারের তানুতে গিয়া সমাচার নিলাম; তাঁহার দাস বলিল, তিনি ও মালিকরাজ উভয়ে অন্তশত্রু লইয়া হুই অর্থে আরোহণ করিয়া গমনকালে বলিয়া গেলেন যে, অন্য বা কল্য অবশ্য আদিবেন, তাহাতে চিন্তিত হইতে নিষেধ করিও।” আমি তাঁহার ভৃত্যকে অনেক জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, “বোধ করি, তাঁহারা রায়গড়ে গিয়াছেন, কেন না তাঁহারা হুই জনে রায়গড়ের কথাবার্তা কহিতেছিলেন।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তার পর?” মহারাজ নিম্নতঃ শুনিতেছিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না।

মালতী বলিল। “আমি তাঁহার দাসের কথা সম্রামণ করিবার জন্য রণবীরের তানুতে গেলাম, সেখানকার দারোগাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে আমাকে গত রাজ্যের প্রথম প্রহরি-সকলের নাম কাগজ দেখিয়া বলিয়া দিল। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, ‘হাঁ, গত রাজ্যেতে সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ অর্থে দক্ষিণ দিকে রাজমার্গ বহিয়া চলিয়া গেলেন; জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন, ‘প্রয়োজন আছে,’ সে বলিল। ‘তাঁহাদিগের সঙ্গে অস্ত্রাদি ছিল’।”

মালতী বলিল। “তাঁহাদিগের রায়গড়ে যাওয়া স্থির জানিয়া আমি রায়গড়াভিমুখে অগ্ৰ চালাইলাম, পথে কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কিন্তু আসিবার সময় বরাবর পার্শ্বপাশ্বী হুই অশ্বের স্কুর চক্ৰ দেখিলাম। রায়গড়ে গিয়া বিষম বিপদ শুনিলাম।”

বিজয়কৃষ্ণ সতঃ রাজার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, মহারাজও সাক্ষতে (১) উত্তরিলেন। মালতী বলিল। “মহারাজ, রায়গড়ে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, গত রাজ্যে ফিরিঙ্গিরা অতিধিবশে রায়গড়ে আশ্রয় লয়, নরাদম বিখ্যাসঘাতকেরা রাজ্যে রায়গড়ে ডাকাতি করিয়াছে ও দেবী ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আর অনঙ্গপাল দেব ও প্রভাবতীকেও হরণিয়াছে।”

বিজয়কৃষ্ণ ইত্থিত করিল। মহারাজ অত্যন্তঃশিগতে উত্তরিলেন।

মালতী বলিল। “মহারাজ, সেখানে শুনিলাম, সন্ধ্যার পর একজন বর্ণাবৃত্ত অখারোহী পুরুষ অতিথি হইয়া, ও তাহার পর দুইজন সান্ত্র অখারোহীও অতিথি হইয়া, যে দুই জন পরে অতিথি হইয়াছিল, তাহাদিগের রূপ বর্ণনে আমার বেশ বিশ্বাস হইল যে, তাহারা বন্ধুদ্বয়। এই তিন জনেই রাগগড়কে অনেক রক্ষা করে। এমন কি, বদ্যাপি তাহাদিগের মত আর এক জন থাকিত, তবে কিরিজিয়া পরাজিত হইত ও অনেকে বন্দীও হইতে পারিত। তিন জনে প্রায় অর্ধেক কিরিজিকে নষ্ট করিয়াছে। মহারাজ, রাগগড়ের বিপক্ষে আমাদেরিগেরও সমুহ বিপদ শুনিলাম, দুইজন অখারোহী যুদ্ধে পতিত হইয়াছেন।”

বিজয়কৃষ্ণ স্তম্ভন নরনে মালতীর দিকে চাহিল।

মালতী বলিল। “মহারাজ! সে বর্ণাবৃত্ত অখারোহী পতিত হইয়াছিলেন। শুনিলাম, পরে তাঁহার চেতনা হইলে তিনি উঠিয়া রাগগড়ের সেমা সংগ্রহ করিয়া ইন্দুমতীকে মুক্ত ও ফিরিদি নষ্ট মানসে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ জানে না, সে কিরিজিয়া কোথা হইতে আসিয়াছিল।”

রাজা বলিলেন। “ভাল, অপর দুই জন অখারোহীর কি সমাচার?”

মালতী বলিল। “মহারাজ, সেখানে কেহই কিছু নিশ্চয় বলিতে পারে না। কেহ বলে ‘তাঁহারা উত্তরেই কালকবলে পড়িয়াছেন।’ কেহ বলে ‘না, তাঁহারা পরে চেতনা পাইয়া উঠিয়া সেই বর্ণাবৃত্ত পুরুষের সঙ্গে হইয়াছেন। মালতী নিস্তব্ধ হইল। বিজয়কৃষ্ণ অতীব বিব্রত হইল। মালিকরাজ তাহার একমাত্র সন্তান। মালিকরাজের অমঙ্গল সম্বাদ পাইয়া ব্যংগবোনাতি ভূষিত হইল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে মালতীর প্রতি চাহিয়া বিজয়কৃষ্ণ সহসা ক্রমে বসিল।”

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এত চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই; এখনও সমুহ সন্দেহ আছে। কে বলিতে পারে যে, মালিকরাজ ও সূর্য্যকুমার রাগগড়ে গিয়াছে, এ সমস্তই এখন অনুমানের উপর চলিতেছে।”

বিজয়কৃষ্ণ কাতর হইয়া বলিল। “মহারাজ! আমার একমাত্র পুত্র মালিকরাজ।” বিজয়কৃষ্ণ দুই তিনবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ পুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মালতীকে বলিল। ‘মালতি! যাও বিজ্ঞান কর, এ সমাচার সরমাকে দিও না।’ মালতী বিদায় হইল। বিজয়কৃষ্ণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মৌন রহিল। মহারাজও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। উত্তর পক্ষের সম্ভাবনা পরিমাণ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন “যদি সূর্য্যকুমার জীবিত আছে।” আবার ভাবিলেন। “বোধশূন্য সে সূর্য্যকুমার নহে, মালতীর অনুমানের জন্ম। বাহা হউক হজুরমল না আসিলে কোন মতেই ইহার সিদ্ধান্ত হইতেছে না। মালতীর অনুমান যদি সত্য হয়। আমি তাহা ভাবিতে পারি না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার সরমা ভবে কি হই থাকিবে?”

রাজা দূর হইতে হজুরমলকে অতি বেগে অথ চালাইতে দেখিয়া বলিলেন।
“বিজয়কৃষ্ণ! হজুরমল আসিতেছে, সমাচার পাইবে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, আমি নিভৃত
কাডর হইতেছি। আমার বৃদ্ধাবস্থার কালী কি আমাকে মর্শ্ববেদনা দিবেন। হা
বিষাডঃ! আমার কি এমন পাপ আছে যে, শেষ দশার পুত্রশোক পাইব। আহা
আমার মালিকরাজ অত্যন্ত বীর।”

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার যে বুদ্ধি ভ্রম হইল দেখিতেছি। তুমি
হুতাপোনয়ের পুর্কেই যে অবসন্ন হইলে। মালতীর কথায় এত দৃঢ় বিশ্বাস করা
উচিত হইতেছে না। সকলই অনুমান।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! সত্য বলিতেছেন, তথাপি মন তাহা বোঝে না।
আমার অন্তরে ছড়ি মালিকরাজ।” হজুরমল নিকটে আসিয়া মহারাজকে শির নোয়া-
ইয়া অভিবাদন করিয়া অথ হইতে উত্তীর্ণ হইল।

মহারাজ বলিলেন। “হজুরমল! তোমার কুশল বল।”

হজুরমল বলিল। “আপনার স্থির লক্ষী দিন দিন বৃদ্ধি হউক। এ দাসকে যে
বিষয়ে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমার সাধ্যমত আঞ্জাম করিয়াছি।”

মহারাজ বলিলেন। “তবে ইন্দুমতীকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?”

হজুরমল বলিল। “মহারাজ, আপনার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ধ্যার পর
রায়গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে গঞ্জালিসের লোকজন লইয়া রায়গড়ে অতিব
হইলাম। রায়গড়ের অতিথিসেবার বন্দোবস্তে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এরূপ ব্যবস্থা
ও আদর আর বৃত্তাপি দেখি নাই। সেখানে রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় স্নানের
হল করিয়া ইন্দুমতীকে তাহার গৃহ হইতে বাহিরে আনাইলাম, সেই অবকাশে আমি
তাহাকে লইয়া এক অত্রবনে গেলাম। পরে গঞ্জালিসের সেনারা ডাকাতি আরম্ভ
করিলে রায়গড় হইতে অগ্র অগ্র সেনাসামন্ত সব বাহির হইল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত
হইল, চতুর্দিক্ হইতে পক্ষপালের মত তাহাঙ্গিরের সেনা সব বাহির হইতে লাগিল।
চারিদিকের মূরচার উপর হইতে উচ্চ অগ্নি উঠিল। আর ঘন ঘন দামামা বাজিতে
লাগিল। ক্রমশঃ মধ্য নিকট গ্রাম সকলে মহাকল হল উঠিল। চারিদিকের গ্রামে
উচ্চ অগ্নি। গ্রামস্থ লোকেরা তুরী ভেরী তাসা দামামা প্রভৃতির শব্দ উত্থাপন।
হুর্গাক্রমে যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, ততোধিক সমারোহ হইল। কথেকল্প সত্য
প্রায় দশ বার সেনাদলে আমাদিগকে চারিদিক্ হইতে ঘেরিল। চক্রোদয় হইয়াছিল
বলিয়া আমার নিভৃত স্থানেও সেনাসব আসিয়া উপস্থিত হইল, যুদ্ধজোতে আমরা
নাড়িতে লাগিলাম। কিছুকাল যুদ্ধ করিলে ফিরিসি সেনারা তজ দিল। যুদ্ধ করা

‘আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কোন মতে মহারাজের আদেশ সাধন করা। ইন্সুমতীকে লইয়া পলায়ন করিলাম। কিন্তু রায়গড়ের সমুহ সেনা আমাকে আক্রমণ করিল। আমি তাহাদিগকে পরাস্তব করি, এমন সময় একজন নিষ্ঠুর ক্রুতবেগে আসিয়া ইন্সুমতীর শিরশ্ছেদ করিল। ইন্সুমতীর এই অবস্থা দেখিয়া আর বৃদ্ধ প্রয়োজন নাই, জ্ঞানে আমি রায়গড় ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কতক্ষণ পরে যুদ্ধাৰ্শিষ্ট হরজন ফিরিসি, অম্বুপরাম ও গঞ্জালিসের সঙ্গে ক্রুত পদে বাহিরে আসিল। আমার সহিত দেখা হওয়ার আপনাদিগের অন্তরের নিন্দা করিয়া আমরা প্রত্যাগমন করিলাম। পথে দেখি যে রায়গড়ের অধিরোহী সেনা সব আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। আমরা একটা সেতুর অন্তরালে লুকাইলাম। পরে বেলা হইলে বাহির হইয়া আমি এদিকে আসিলাম। তাহারা লজ্জার আপনাকে মুখ দেখাইবে না বলিয়া সনদ্বীপ চলিয়া গেল। মহারাজ, আমি কৃতকার্য হইতে পারি নাই বলিয়া হজুরের নিকট অপরাধী আছি। কিন্তু ধৰ্ম্ম জানেন, আমি কোন বিষয়ে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে পুরস্কারের পাত্র হই, আজ্ঞা করুন।’ হজুরমল ক্ষান্ত হইল। অন্তরে হেট মুণ্ডে দাঁড়াইল। মহারাজ একমনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, কথা সাক্ষ হইলে কোন উত্তর করিলেন না। মৌন হইয়া ভূমিহৃষ্টে রহিলেন।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “হজুরমল! তুমি কি রায়গড়ে স্বর্ধ্যকুমার ও মালিকরাজকে দেখিয়াছ?”

হজুরমল বলিল। “আমি তাহাদিগকে সেখানে দেখি নাই। তাহাদিগের ও সেখানে বাইবার কথা ছিল না। এ প্রশ্নের অর্থ কি? কিন্তু গতকল্য যুদ্ধাভিনয়ে যে কুমবর্ধারূত অজ্ঞাত অধিরোহী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে রায়গড়ে দেখিয়াছ। কিন্তু বোধ করি সে জীবিত নাই। সে আমারই পরন্তু আঘাতে পড়িয়াছে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “সেখানে বর্ধারূত অধিরোহী কয়জন ছিল?”

হজুরমল বলিল। “তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, বোধ হয় সহস্র বর্ধারূত পুরুষ ছিল।”

মহারাজ বলিলেন। “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর, পরে হাজির হইও।” বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। “হজুরমলকে একটি খেলাত দাও।” বিজয়কৃষ্ণ আপনার অঙ্গরূক হইতে একটু কাগজ বাহির করিল। একটি মস্তাধার ও লেখনী বাহির করিয়া একখানি ফরমান লিখিয়া দিল। মহারাজ আপনার অঙ্গুরীয়ক লইয়া পত্রে মুদ্রাঙ্কন করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সেই ফরমানটি লইয়া হজুরমলকে দিল। হজুরমল শির নোয়াইয়া বহুপূর্বক তাহা লইয়া চলিয়া গেল। হজুরমল দূরে গেলে মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এই

লও, আর তোমার চিন্তায় কি প্রয়োজন? মালতী প্রকৃত সমাচার আনিতে পারে নাই। কিন্তু ইন্দুমতীকে নষ্ট করণে তাহাদিগের কি ইষ্টলাভ হইল?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আমি এ ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মালতীর বর্ণনের সঙ্গে হজুরমলের বর্ণন কিছুই মিলিল না। কিন্তু ইন্দুমতীকে নষ্ট করা বেশ বোঝা যাইতেছে। তাহার ধর্ম্মনষ্ট ইন্দুমতী জীবিত থাকাপেক্ষা মৃত্যু হওয়া ভাল জানে তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকিবে।”

মহারাজ বলিলেন। “তবে এক্ষণে কি কর্তব্য? আমার মতে চল আমরা রায়গড়ে যাই, সেখানে গিয়া রায়গড় দখল করি।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ, রায়গড় যাইতে ইচ্ছা হয়, চলুন, কিন্তু হজুরমলের কথা যদি সত্য হয়, তবে সেখানে বড় দত্তক্ষুট সম্ভব নহে। তাহাদিগের সেনাবল অত্যন্ত অধিক।”

মহারাজ বলিলেন। “কি আমি সৈন্যাদিকো তত্ত্ব করিব? আর রায়গড়ে আমার বিপক্ষ কে হইবে? রায়গড়ের আমিই ধর্ম্মাধিকারী।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “যদি কৌশল করিয়া তাহাদিগকে স্বীকার করাটতে পারেন, তবে আমাদিগের পক্ষে শুভকর বটে। এক্ষণে ষে রূপ সমাচার পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমাদিগের যমুনাপর্যন্ত বড় দৃঢ়মজি (১) স্থান নহে। ইহার চতুর্দিকে প্রাকার নাই। রায়গড়ে গিয়া অনায়াসে মানসিংহের আক্রমণ সহ্য করিতে পারা যাইবেক।”

মহারাজ বলিলেন। “আমি কিছু রায়গড়ে গিয়া মানসিংহের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিব না। আমি মানসিংহকে আক্রমণ করিতে দিব না। আমিই তাহার সেনা আক্রমণ করিব।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তবে যদি যাইতে হয় ত অদ্যই য'ওয়া বিধেয়।”

মহারাজ বলিলেন। “তবে তুমি স্বজ্ঞাবারে সমাচার লাও। আমার এ গড়ে কেবল সহস্র পদাতি ও কুড়ি তোপ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। বর্ত্তমানপতি কি সমাচার পাঠান, তাহাও আমাকে জানাইও। তুমি এক্ষণে প্রস্তুত করহ, আমি দুই দণ্ডের মধ্যে নানাহার করিয়া প্রস্তুত হইব।”

বিজয়কৃষ্ণ রাজাজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। মহারাজ আবাসভিমুখে চলিলেন। তাহা-
লেন, “আমার প্রেমাম্পদ ইন্দুমতী আর নাই। কি করি দৈবেয় কর্ত্ত, ইহাতে আমার
কোন অধিকার নাই।” মহারাজ ইন্দুমতীর রূপ ধ্যান করিতে করিতে আপনার আবাস-
দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখেন সরমা অগ্রে অগ্রে, তাহার পশ্চাৎ মালতী ও যমুনা

আসিতেছে। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “সরমা কোথায় যাও ?” মালতী অগ্রসর হইয়া বলিল “মহারাজ, একবার দেবী বায়ুসেবনে উদ্যানে বেড়াইতে বাইতেছেন।” মহারাজ তন্নিয়া কিছু সন্দেহ হইলেন। বলিলেন। “তাল, বায়ুসেবনে শরীরে স্বাস্থ্য জন্মে।” মালতী অগ্রসর হইয়া সরমার হাত ধরিয়া বাহিরে গেল। বনুনা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মহারাজ আপন পুত্র মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মালতী সরমাকে লইয়া উদ্যান পার হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইল। পথ দিয়া রাজার স্বস্বাধারে প্রবেশ করিল, ক্রমে সকল ভাস্কর্য্য পার হইয়া অমাত্যের ভাস্কর্য্য পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে অশ্রুমালা দাঁড়াইয়া বামদিকে ফিরিয়া স্বর্গকুমারের ভাস্কর্য্যে গিয়া দাঁড়াইল। মালতী সরমাকে বলিল “চল ভিতরে চল।”

সরমা বলিল। ‘সখি! আমার এ ভাস্কর্য্য ভিতরে বাইতে ভয় করিতেছে। আমার এ ভাস্কর্য্য পর্য্যন্ত আসাতেই বধেষ্ঠ স্থখ সম্পাদন হইল। আমি লক্ষ ভাস্কর্য্য মধ্যে হইতে এটিকে চিহ্নিতা লইব।’

মালতী বলিল। “যদি ভাস্কর্য্য ভিতরেই যাইবে না, তবে কেন এদিকে আসিলে ? এককলম নূতন স্বকম তালবাসা।”

সরমা বলিল। “ভাস্কর্য্য ভিতরে যাওয়ার আমার কোন লাভ নাই।”

মালতী বলিল। “তবে ভাস্কর্য্য বাহিরে হইতে দেখাতে তোমার কি লাভ হইল ?”

সরমা বলিল। “সখি! তুমি বুঝিয়াও বোঝ না, স্বর্গকুমার যে স্থানে থাকেন, সে স্থানও আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রিয়। এখন চল, আর স্বস্বাধারে থাকা উচিত নহে। ক্রমে লোকসমাগম অধিক হইতেছে। চল এখন আপন ঘরে যাই।”

মালতী বলিল। “সখি! বাহাতে সন্দেহ থাক, তাহাই কর।”

সরমা ভাস্কর্য্য দ্বার হইতে আপন গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। কিছু দূর বাইয়া বলিল “মালতি, সখি! আমার আর একটীমাত্র ইচ্ছা আছে, সেটী তোমা হইতেই সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলেই আমি এ জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইলাম।” সরমার শাস্ত নীরস-মুখত্ব দেখিয়া মালতী অত্যন্ত দুঃখিতা ছিল। তাতে আবার স্বয়ং মালিকরাজের অমঙ্গল বার্তা শুনিয়া আসিয়াছে। মালতী মোখিক কিছু স্থির ছিল, থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন কাঁদিয়া উঠিতেছিল। পাছে তাহার ভাবান্তর দেখিয়া সরমার মনে কোন ব্যস্ততা হয়, বলিয়া মনের ভাব মনেই গোপন রাখিয়াছিল। সরমার এই কথাটি শুনিয়া মাত্র তাহার মন আর সহ করিতে পারিল না। মালতীর চক্ষু দিয়া অশ্রু বিগলিত হইল। মালতী মুখ ফিরাইয়া আপন অকল দিয়া অশ্রু পুঁছিতে লাগিল।

সরমা তাহা দেখিল, বলিল। “মালতি! তুমি আমার বলিলে না, কিন্তু মনের ভাব কিছু কেহ সখীর নিকট গোপন করিতে পারে ? আমি বুঝিয়াছি, আমার

সর্বদা হইরাছে। ভাল! এখন ঐ তাম্বুর তিওর বাণ্ড, শূর্য্যকুমারের ব্যবহারের কোন একটি জিনিস তাহার দানের নিকট হইতে আমার জন্য আন, আমি আর তোমার বিবস্ত্র করিব না।”

মালতী বলিল। “সরমা! তুমি কি আমাকে পর জ্ঞান কর যে, থাকিবা থাকিবা আমাকে এমন বলিতেছ। এখন তোমার আমার আর কে অধিক প্রিয় আছে?”

মালতীর শেষের কথাগুলি কিছু অপরিহার্য হইল, মালতীর চক্ষুর অশ্রুতে ভাসিতে লাগিল। মালতী অতীব আশ্রমে অশ্রু নমন করিল। সরমার কিন্তু চক্রে জলমাত্র নাই। সরমা সৌম্য মুক্তিতে চাহিয়া রহিল। মালতী তাম্বুর তিওর প্রবেশ করিয়া ক্রমেক বিলম্বে এক হাতে একটি উকীষ, অপর হাতে একটা রূপাণ আনিয়া সরমাকে দিল। বলিল “সরমা! এটি শূর্য্যকুমারের উকীষ, এ রূপাণটি আমার জন্য আনিয়াছি। এটি মালিকরাজের কটিনেপে সর্বদা রাখা থাকিত।”

সরমা উকীষটি লইল। সবচেয়ে তাহার চতুর্দিক্ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল। রূপাণটি ও একবার চাহিয়া লইল। বলিল। “আহা, এ রূপাণটি আমার শূর্য্যকুমারের আশ্রয়ের। মালতি! এ রূপাণটি তুমি রাখ।”

সরমা ছাউনি হইতে বাহিরে গেল। মালতী বলিল। “চল এখন ঘরে যাই, আর এখানে থাকার কি ফল?”

সরমা মালতীর দিকে এক হাত ঘুম্নার দিকে অপর একটি হাত দিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

উনবিংশ অধ্যায়।

“বাৎ চিত্তরামি সততং মরি সা বিরক্তা।”

বেলা আড়াই প্রহরের সময় মহারাজ প্রতাপাদিত্য লক্ষ্য লইয়া রায়গড়ে পৌঁছিলেন। কমলাদেবী মহারাজের আগমনবার্তা পাইবামাত্র ব্যস্তে লোক জন ডাকাইয়া অভ্যাগত সেনাসকূহর বাসস্থান দিতে অনুমতি দিলেন। তাহাদিগের আহ্বানদির জন্য অস্ত্র অস্ত্র লোক নিয়োজন করিলেন। কোন বিষয়ের ত্রুটি না হয়, তাহিয়া আপনি ঘন ঘন সবল সংবাদ লইতে লাগিলেন। বাটীর তিওর মহারাজের জন্য ঘর পদ্ধিকার করিতে অনুমতি দিলেন ও পরিপাটী করিয়া সাজাইতে বলিলেন। সরমা, রাণী ও রাজমহিলাদিগকে স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাপনার বাসগৃহে বলিতে দিলেন। এ দিকে মহারাজ রায়গড়ে পৌঁছিয়াই আপনার সেনা-নিবেশ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন

রাষ্ট্রমন্ডের লোকেরা পত্নী-রাজের যুদ্ধে মৃত-সেনার শব্দ তাহাদিগের আত্মীয় কুটুম্বকে সমাচার দিয়া উঠাইয়া পক্ষাভীয়ে রায়গড়ের ব্যয়ে সংকারজন্য পাঠাইয়াছে; কেবল যে সকল শরীর অত্যন্ত ব্যগচ্ছিন্ন হওয়ায়, শবগুলি চিনিতে পারে নাই, সেই গুলিই রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে, ক্রমে পরিষ্কার হইবে। ফিরঙ্গি-শব ডোমেয়া উঠাইয়া পক্ষাভীয়ে লইয়া গেছে। এ দিকে রণক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়ানক মূর্ত্ত ধারণ করিয়াছে। কোথাও একটা পাহুকা পড়িয়া, কোথাও উকীষ, কোথাও চর্ম্মের খণ্ডমাত্র, এ দিকে তলবারি একখানা, ও পার্শ্বে দীর্ঘ-শেলের তথ-খণ্ড, পার্শ্বে বৃক্ষের শাখায় একখানা তলবার গুলি-তেছে, অপর দিকে শাখায় কাহার কটিবন্ধ, কাহার উকীষ শোণিতে চিত্রিত। রণক্ষেত্রে স্থানে স্থানে শোণিতেের দাগ। ধূলিতে শোণিত মিশাইয়া ভয়ানক কর্দম হইয়াছে। তাহার কোটি কোটি মশক ও মক্ষিকা বসিয়া আছে, কাকোল বা কঙ্কের পক্ষবায়ুতে ভন্ম ভন্ম করিয়া উড়িয়া উঠিতেছে। প্রথর স্বর্ঘ্যতাপে ভূমিস্থ শোণিতপেণ্ডিত মস্তক হইতে অবর্ণনীয় জ্বলন্ত বাপ্প উঠিতেছে। চতুর্দিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। এ দিকে একটা ছিন্ন হাত, তাহার স্বর্ণের বলয়, ও পার্শ্বে উপানদৃগু-পানমাত্র, এ দিকে স্বক্কহীন, হয় ত একটা হস্তহীন-শরীর। কোথাও একটা ছিন্ন-মুণ্ড। কোথাও কতক মস্তকমাত্র। এ দিকে কাকোলচয় (১) ছিন্নাঙ্গ-সমাকীর্ণ-ক্ষেত্রে সজ্জাত (২) করিয়া বসিয়াছে ও উদর পুরিয়া শুক-শোণিত ও আধ-শুক আধ-পচা মাংস কাল-বঠিন স্ফন্দাচ্ছ চকু দ্বারা টানিতেছে। হয় ত তাহার আকর্ষণ-হিম্মোলে মক্ষিকান্তলি ভন্ম ভন্ম করিয়া উড়িল। এ দিকে শকুনসমূহ বক্ষে-বঠিন তীক্ষ্ণধার চকু দ্বারা অধ-শবের গর্ভরস্থ অস্ত্র, নাড়ী কোষ্ঠাদি আকর্ষণ করিতেছে; উদরস্থ আধ-শোণিত, আধ-রসে তাহাদিগের পক্ষহীন গোমল মলিন দীর্ঘ গলদেশ এককালে ভিজিয়া স্নেহপদার্থে আবৃত হইয়াছে। মুখ উচ্চ করায় গলদেশের অনেক অংশ হইতে সেই রসধারা পড়িতেছে। রস কিছু পাদ হওয়ায়, ধারাটা শীঘ্র ছিন্ন হইতেছে না। যে দিকে শকুনী মুখ ফিরাইতেছে, সেই দিকেই ধারাটা বাইতেছে। পার্শ্ব হইতে স্ফুর্ধ্বাৎ-কাক লতৃক-নয়নে চকুদ্বয় ব্যাধান, উর্দ্ধমুখ করিয়া সেই রস পান করিতেছে। হয় ত চুই তিনটা কাকে পক্ষ উচ্চ করিয়া চকু দ্বারা বলে শকুনীর ছিন্ন মাংসখণ্ড হরিতে যেমন অঙ্গুর হইতেছে, অমনি ভীষণ-চকু শকুনী গলদেশ বক্ষে করিয়া ঠোকরাইতে বাইতেছে; বৃক্ক-কাক অমনি উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। এদিকে পাঁচ ছয়টা কাকে একত্র হইয়া শকুনিকে ঘন ঘন চকু-দ্বারা ব্যস্ত করিতেছে। কেহ দূর হইতে গলদেশ লম্বা করিয়া, তাহার পুচ্ছের পালক ধরিয়া টানিতেছে। কেহ উড়িয়া চিলের নকল করিয়া, নখদ্বারা শকুনর মস্তকে আঘাত

করিতেছে। হুই তিন বার ত্যক্ত হইলে, শকুনিটা মুখ বাঁকাইয়া ভাড়া দিলে, কাক কা কা করিয়া উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। কোথাও গৃধিনী একটা, উল্লসপুষ্টির পর শুক্ল বিরটি পক্ষবয় বিস্তারিয়া পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া রৌদ্রে পক্ষ শুকাইতেছে। কোথাও একটা বহু কুকুর একপা কোন স্বচ্ছগীন শবের পেটে দিয়া অপর নখল পা ঘারা তাহার ছিন্নগলদেশ আঁচড়াইতেছে। হয়ত কিছু মাংস খসিলে ভীম দংশ্ত্রা ব্যাধান করিয়া, পার্শ্বের নস্তুর ঘারা শুক মাংস চর্ষণ করিতেছে। দূরের ঝোপের ভিতর শৃগালেরা লুক ইয়া আছে। দিবাশয়ত সাহস করিয়া বাহির হইতেছে না। একটা হয়ত অসমসাহনিকের মত ঝোপ হইতে বাহির হইয়া একবার হৈতুত দৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে একটা ছিন্ন পা বা হাত মুখে লইয়া ঝোপের ভিতর গেল। কাকেরা শৃগাল-গমে কা কা করিয়া উঠিল। শৃগালটি ঝোপে বাইয়া হাতটি চর্ষণ করিতেছে, এমন সময় অপর দুইটি শৃগাল আসিয়া বলপূর্বক তাহার মুখের আহার লইয়া গেল। চতুর্দিক্ দেখিতে অতি ভীষণ। কুকুরচয়ের বিকট ডাক, কাক ও শৃগালের ডাক, মাঝে মাঝে হুই তিনটা কুকুরের পরস্পরের সঙ্গে কলহ ও চীৎকার। বনের মধ্যে হইতে শৃগালের বিবাদের কঁয়াক্ কঁয়াক্ শব্দে চতুর্দিক্ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছে। ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে একটি মসীবর্ণ রক্তনেত্র বিড়াল মুখ কিরাইয়া বসিয়া একটি হাতের কিছু মাংস অঙ্গে অঙ্গে চর্ষণ করিতেছে। নিকটের গাছে শকুনি, গৃধিনী, কাক ও কাকোলপূর্ণ। কেহ উড়িয়া আসিয়া গাছে বসিল। কেহ গাছ হইতে উড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে এক আধটা চিল হুই একবার ক্ষেত্রের উপর ঘুরিয়া একটী মাংসখণ্ড লক্ষ্য করিয়া ছোঁ। ঘুরিয়া লইয়া গেল। ডোমেরা আসিয়া ঝোড়া করিয়া টুকরা মাংস সব উঠাইয়া লইতে লাগিল। ডোমের পৃষ্ঠদেশ বহিয়া রস ও গলতানি পড়িতে লাগিল। পথে রসঘারা পড়িল, মজ্জিকাচয় তাহার বাইয়া বসিল। কাকেরা মহা কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। শকুনী ও গৃধিনীরা পক্ষীরভাবে অন্তরে লাকাইয়া বসিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রণক্ষেত্র দেখিয়া নীত্ৰ পরিকার করিতে আদেশ দিলেন। ক্ষেত্রে তাহার সেনারা আপন আপন বাসস্থানে ভূগাকারে জব্যাদি আসিয়া উপস্থিত করিল। মহারাজ চতুর্দিক্ দেখিয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে কমলানদেবীর সম্মুখীন হইয়া বিধিপূর্বক নমস্কার করলেন। কমলানদেবী আশীর্বাদ করিলেন ও সকল কুশল সমাচার জিজ্ঞাসিলেন। পরে গত রাত্রের বিপদের কথা সংক্ষেপে প্রতাপাদিত্যের গোচর করিলেন।

মহারাজ বলিলেন। “আমি লোক-মুখে সমাচার পাইয়াই আসিয়াছি। এ কি দৌরাশ্য! এখানে ত বাস করা দায় দেখিতে পাই? আমি একটা বন্দোবস্ত না করিয়া এখান হইতে বাইব না।”

কমলাদেবী বলিলেন। “বাপু! এ তোমারই বিষয়। ইহাতে তোমার বড় না করার দোষ হইতেছে; আমি তোমাকে বশোর ত্যাগ করিয়া এখানে বাস করিতে বলিতে পারি না; কিন্তু তোমার এক একবার এ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।”

মহারাজ বলিলেন। “আমি সর্বদাই সমাচার লইয়া থাকি, তবে বিষয়কর্মে ব্যাপৃত থাকার, আসিয়া ত্রীচরণের ধূলি স্পর্শ করিতে পারি না। ছোট খড়ী কোথায়?”

কমলাদেবী বলিলেন। “তিনি তাঁহার ঘরে আছেন।”

প্রতাপাদিত্য কমলাদেবীর নিকট বিদায় লইয়া বিমলাদেবীর আবাসে গেলেন। বিমলাদেবী আপনার ঘরে বসিয়া আছেন, নিকটে প্রিয়-সহচরী একজনও বসিয়া আছে। মহারাজকে দেখিয়া লজ্জাৰণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য বিহিত সন্মানপূরঃসর আগমন বসিলেন। দাসী উঠিয়া তাড়ুল আনিতে চলিয়া গেল। বিমলাদেবী বলিলেন, “মহারাজ! কি মনে করে এখানে শুভাগমন হইল? কোথায় বাত্না হইতেছে? সঙ্গে লোক লঙ্ঘন অনেক আসিয়াছে।”

বিমলাদেবী মহারাজ প্রতাপাদিত্য হইতে বরসে ছোট। মহারাজ তাঁহা হইতে প্রায় তিন বৎসর অধিকবয়স্ক হইবেন। বিমলাদেবী ৮ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রধান অমাত্য জয়দেব লালার কন্যা। বাল্যকালাবধি মহারাজের সঙ্গে অভ্যস্ত সম্প্রীতি ছিল। ততে আবার মহারাজ বসন্তরায়ের সঙ্গে বিবাহে আরও প্রীতি জন্মিল। মহারাজ, লোক জন থাকিতে তাঁহাকে বধাযোগ্য সন্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেন, আর হুই জনে একক হইলে প্রায় তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন ও বালককালের প্রিয়সখীর মত ব্যবহার করিতেন। ইহাতে বিমলাদেবীর সন্তোষ ভঙ্গিত।

মহারাজ বলিলেন। “বিমলা! তোমাদের বিপদ ঘটয়াছে শুনিয়া এখানে আসিলাম, এখানে একটা বন্দোবস্ত করিব বলিয়া লঙ্ঘন আনিয়াছি।”

বিমলা বলিলেন। “কি বন্দোবস্ত করিবে? আর বন্দোবস্ত করিবার কি আছে? একে একে সকল বন্দোবস্তই ত হইয়াছে?”

মহারাজ বলিলেন। “কি বন্দোবস্ত করিগাছি? আমার ত মহারাজ বসন্তরায়ের কাল হইবার পর আর এখানে আলা হয় নাই?”

বিমলাদেবী বলিলেন। “আমার অদৃষ্ট অগ্রসর হইল। মহারাজের অকালে কাল হইল। কি হুঃখের বিষয়; রায়বংশে জলদানের আর কেহই রহিল না।”

বিমলাদেবীর চক্ষু জলে ছল ছল করিতে লাগিল। দেবী অকল লইয়া মুখ আবরণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য স্থির হইয়া বিমলাদেবীর শোক দেখিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। মৌনী হইয়া কিছুক্ষণ থাকিলে বিমলাদেবী বলিলেন। “মহারাজের বাসার ত কোন অস্থিবিধা হয় নাই? এখানে দেখিবার লোকমাত্র নাই। গড়দুর্গের

ম্যাণারে অনঙ্গপালনেব কন্ডার সহিত বন্দী হইয়াছেন । আমাদিগের প্রিয় ইন্দুমতীও আর এখানে নাই । পাপ বিশ্বাসঘাতকেরা তাহাকেও লইয়া গিয়াছে । আমরা অনাথা হই অবিরা সতিমী এই জনশূন্য স্থানে পড়িয়া আছি । আহা ! ইন্দুমতী আমাদিগের শোকাপনোদনের একমাত্র আশ্রয় ছিল । আমাদিগের একমাত্র প্রেমাস্পদ । আমরা কেবল তাহার প্রেমে ও শুশ্রূষায় সপত্নীবাদ সাধিতাম । কেবল ইন্দুমতীর স্নেহের সমর আমরা সপত্নীর মত হইতাম । এখন বিধাতা আমাদিগকে সে স্থখে বঞ্চিত করিল । মহারাজ ! আমরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি ।”

মহারাজ বলিলেন । “দেবি ! আমি যমুনাপরুইরে এই সমাচার পাওয়া অবধি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি । এখন বাহাতে পুনরায় সে ঘটনা না হয়, তাহার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি । কিছু লঙ্ঘন গড় রক্ষার্থে রাখিয়া বাইব । আর সন্ধান লইয়া তৃপ্তিদিগকে সমুচিত বণ্ড বিধান করিব । ইন্দুমতীর কি হইয়াছে ?”

বিমলাদেবী বলিলেন । “মহারাজ ! পাপেরা ইন্দুমতীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে ।” বিমলাদেবী রোদন করিতে লাগিলেন । ক্রন্দনে তাঁহার প্রায় শব্দস্রোথ হইল । মহারাজ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন । কিন্তু বিমলা কোন মতেই থৈ থৈ ধরিলেন না । বিমলাকে নিতান্ত অস্থির দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, “বিমলা ! ভূমি যে আমার জ্যেষ্ঠা খুড়ীর অপেক্ষা অধিক শোকার্ত হইলে । কাত হও, নিতান্ত অসহ্য রোদনে কোন ফলোদয় নাই ।”

বিমলা বলিলেন । “মহারাজ ! আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না । আমি কেমন আচাভূতের মত হইয়াছি ।”

মহারাজ বলিলেন । “বিমলা ! এটি তোমার নূতন ব্যাপার, তোমার স্বভাবত এমত নহে ।”

বিমলা বলিলেন । “মহারাজ ! কেন কিসে আমার স্বভাবের বিপরীত দেখিলেন । যখন সংসারের সকল লুপ্ত হইতে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হইলাম, তখন আর আমার জীবনে ফলোদয় কি ? আমার প্রেমাস্পদ ইন্দুমতীকে পর্য্যন্ত আপনি হরিলেন ।” বিমলা বাক্যাবসানেই সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন । মহারাজ বিমলার শেষ কথায় অত্যন্ত কষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ প্রকাশের পাত্র পাইলেন না বলিয়াই মনের রোষ মনেই বৃদ্ধিকে পাইল । বহুকাল পরে আপনি বলিলেন “ইহার অর্থ কি ? বিমলার এরূপ পরিবর্তনের কারণ কিছু বোধ হইতেছে না । কাহাকেই বা এ কথা বলি, কাহার নিকট এ বিষয়ের আন্দোলন করি । মনের কষ্ট আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করার অনেক ভ্রাস হয়, আবার হয় তাহার পরামর্শে কল্যাণটি সিদ্ধ হইতে পারে । এ বিষয় বিজয়কৃষ্ণকে জ্ঞাত করার কোন অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই । হজুরমলই আমার এ সকল শুণ্ড কথা জানে । তাহাকেই

ডাকাম কর্তব্য। আর সুন্দরী সহচরীও বলিতে পারে। সে আমার আয়োপান্ত সমস্ত অবগত আছে।” মহারাজ মনে মনে এই পরামর্শ স্থির করিয়া গাত্রোখান করিলেন। যেমন ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি বিমলা আসিয়া মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল। “মহারাজ! কিছু বলিবার অভিলাষ আছে, একবার নির্জনে আসিলে ভাল হয়।

মহারাজ বিমলাকে পুনর্বার সেই ঘরে আসিতে দেখিয়াই কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার নানা চিন্তায় ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। কেমত এক প্রকার ভয়ই হউক বা রাগই হউক বা অন্য কোন কারণে মহারাজের চিন্তচাকল্য হইল। মহারাজ বিমলার কথায় কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। জড়ের মত কণকাল মৌনী হইয়া রহিলেন। বিমলা মহারাজের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই তাঁহার মনের সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন। মহারাজের উত্তরের জন্য ক্রণমাাত্রও অপেক্ষা করিলেন না, অমনি মহারাজের হাত ধরিয়া গৃহান্তরে লইয়া গেলেন। সহচরী সুন্দরী বিমলার পশ্চাৎ দাঁড়াইয়াছিল, মহারাজের অবস্থা দেখিয়া ঈর্ষ্য হাসিল। মহারাজ ও বিমলা গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে সুন্দরী মন্দ পাদবিক্ষেপে তাঁহাদ্বিগকে অনুসরণ করিল। গৃহমধ্যে বিমলা প্রবেশমাত্র গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন। সুন্দরী গৃহের বাহিরেই রহিল। মহারাজকে আসনে বসিতে বলিল মহারাজ আসনে বসিলেন। বিমলা দেবীও সেই আসনের এক পার্শ্বে বসিলে মহারাজ বলিলেন। “বিমলা! ভাল হইল। নির্জনে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলিতে চাহি।”

বিমলা মহারাজকে আলাপারম্ভে উৎসুক দেখিয়া আনন্দে বলিলেন। “মহারাজ! আপনার বাহা মনোনীত হয়, তাহা বলুন; আমি যত্নে শুনিব।”

রাজা বলিলেন। “বিমলা! তোমার সঙ্গে আমার বাল্যকালাবধি আত্মীয়তা, মহারাজ বসন্তরায়ের সঙ্গে বিবাহ হইবার পূর্বেও তোমার সঙ্গে আমার বৎসরোপাধি প্রীতি। তোমার স্মরণ হয়, আমার সঙ্গে বাল্যকালে কি কথাবার্তা হয়? আমরা একাত্ম। একত্রেই জীবিত করিতাম।”

মহারাজ ধামিলেন। বিমলা বলিলেন “মহারাজ, বাল্যকালের কথা আর এক্ষণে কি লাভ, সে সকল সুখের দিন আর নাই, অন্ত্যনাবস্থায় এক প্রকার সুখে ছিলাম। তখন আর ভাল মন্দ জ্ঞান ছিল না, সকলই সুখের হইত। তখন রাত্রিকালে অবিরোধে নিদ্রা বাইতাম। তখন প্রাতে সূর্যোদয় পর প্রকৃত স্মৃতিতে গাত্রোখান করিতাম। তখন সমস্ত দিন মহারাজের উদ্যানে ফুল তুলিয়া বেড়াইতাম। সে সকল সুখ এখন স্বপ্নের মত হইল। মহারাজ, এখন রাত্রি নিদ্রা হয় না। প্রাতে বিজ্ঞানান্তে শরীর সুস্থ থাকে না। এখন ফল দেখিলে প্রকৃতির বিকার হয়।”

রাজা বলিলেন। ‘বিমলা! তোমার এ সকল মনঃসীড়ার কারণ কি? অতি অল্প সময়ে যে তোমার এত ভাবান্তর হইল, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। আমার প্রতিই বা প্রেমের হ্রাস কি অশ্রু হইল? আমার জ্ঞানকৃত কোন পাপ নাই। আমি কখন ইচ্ছিতেও তোমার বিপরীতাচরণ করি নাই। তবে বহুদিন বর্ষাবশত তোমার সমুখীন হইতে পারি নাই। কিন্তু সে কি আমার অপরাধ? আর তাহার কি এই শাস্তি সম্ভব? যুগান্তে মিলনে প্রেমোৎসাহের প্রেমবর্ষণ লাভ করে। কিন্তু আমার পক্ষে রোবাগ্নি অগ্নিতেছে।’

বিমলা বলিলেন। ‘মহারাজ! আপনি অকারণ আত্মতাপ দিবেন না। আপনার মনস্তাপ আত্মরিকও নহে। আমি স্ত্রীজাতি, স্বভাবত চঞ্চলবুদ্ধি, বাল্যকালের অজ্ঞান-বহুর যে সকল বর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া ছলাম, তাহার এক্ষণে আর বড় প্রীতি ভবে না। আর আমিও বয়স্কা হইয়াছি। বিরুদ্ধ সম্পর্কে বিপরীত আত্মীয়তা নিত্যন্ত দোষকর হয়। মহারাজ! ইন্দুমতী লাভের উপায় দেখুন। ইন্দুমতী নবীন বটেন, আর রূপের সমৃদ্ধিও বটেন। এক্ষণে যেমন কৌশলে হরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ কৌশলে তাহাকে ভোগ করিলেই আমরা সুখী হইব। কিন্তু আমাদের অনর্শন ক্রেশ কখনই বাইবেক না। ইন্দুমতী আমার গর্ভসন্তুতপেক্ষাও আমার প্রেরণী ছিলেন। মহারাজ আপনার সমুখে কোন আপত্তি স্থিঃ হয় না। পরন্তু আপনাকে ধন্যবাদ দি। আপনার অসীম ক্ষমতা! আমার কিন্তু আর পরিজ্ঞাপ নাই। আমার ইতোনবঃস্বতোভ্রষ্ট হইল। স্ত্রীলোক, সকল সহিলাম। না সহিলেই বা কি উপায় সম্ভব! মহারাজ! আমি এক্ষণে জীবিত থাকিতে আর অভিলাষে করি না। আপনি সুখে দীর্ঘায় হইয়া থাকুন।

বিমলা কাত্ত হইলেন। রোষে ও মনস্তপে তাঁহার জগৎকে মণিয়া ফেলিল। স্ত্রী-স্বভাবমূলক অশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু মাঝে মাঝে গুটঘর কাঁপিতেও লাগিল। অমিতরূপ: বিমলা কি শোভাই ধারণ করিলেন। নির্মূল কমলদলের উপর যেন হিম-বিন্দুপাতে স্তম্ভিত (১) শোভিল। এক একবার জগৎয়ের উদ্ভেজনার শোণিতপ্রোভ কপোলনেশকে আক্রমণ করিল; কপোলরাগ বর্জিত হইল। আগোলাব রঞ্জিত কপোলের পার্শ্বে নিয়লভার কর্ণমূল নীলবর্ণে সূর্য্যকান্ত-দুল্লভের জ্ঞান শোভিল। স্বচ্ছ চন্দ্রের মধ্য হইতে সূর্য্য শিরা সকল আকাশবর্ণে দেখা দিল। ক্রমে বিমলার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। মহারাজ সহজে বিমলার মুখত্রীর নিকে স্থির হইয়া দেখিতে পারিতেন না, তাহাতে এখন এই ভূখনমোহিনী রূপধারণ করিলে একান্ত চলচ্চিত্র হইলেন। কিন্তু এক একবার বিমলার রোবরাগ্নাত ঘূর্ণায়মান চন্দ্রবর্ণের দৃষ্টিতে ভীত হইতে

লাগিলেন। কিছুক্ষণ কটাকৃষ্টি করিয়া সাহসে ভর দিয়া বলিলেন, “বিমলা! আমার প্রতি কষ্ট হইও না। আমার কোন অপরাধ নাই। আমাকে বার বার ইন্দুমতীহরণের অপরাধ দিতেছ, কিন্তু আমি তাহার বাস্পও জানি না। কোথাকার বিবাসিনীতরঙ্গী ইন্দুমতীকে নষ্ট করিয়াছে, কি হরিয়াছে, তাহা আমি কণামাত্রও জ্ঞাত নহি। আর ইন্দুমতীর প্রতিই বা আমার কি জন্ত এত লজ্জা। আমি আজ প্রায় চারি বৎসর এদিকে আসি নাই। অন্য প্রাতে যেমত তোমাদিগের চূর্ণটনার সংবাদ পাইলাম, অমনি কি অবস্থার আছ, দেখিতে আসিলাম। তোমার জন্ত আমি নিভান্ত অধীর হইলাম। এখন দেখি, বাহার জন্ত আমি উদ্ভিন্ন, সেই আমার দোষ দেখে। এ কেবল বিকলমানাত্র।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আমার নিকট আর ছলনায় কি লাভ? আমি মহারাজের প্রায় সমস্ত পরামর্শ অবগত আছি। ইন্দুমতীর উপর যে মহারাজের অত্যন্ত অনুরাগ, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। গত রাত্রের ব্যাপার যে মহারাজকৃত, তাহাও আমি জানি। হৃন্দরী আসিয়া গত রাত্রে আমার বলিল যে, হকুমল ইন্দুমতীকে লইয়া ফিরিঙ্গির নৌকায় তুলিয়া গিল। মহারাজ! আপনার মনের কোন প্রবৃত্তিই আমার নিকট স্তূপ নাই।”

মহারাজের মুখের কিছু বৈলক্ষণ্য হইল। মহারাজ হেঁটমুণ্ড হইলেন।

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! ইহাতে লজ্জিত হইবেন না। আপনার জাতিই এই স্বভাব। আমার পূর্বেই বিবেচনা করা কর্তব্য ছিল। অপরিণত বুদ্ধি তখন বুকিল না। অন্ধকারে বাঁপ গিল। বিপদের নামে হাসিল। সংপরামর্শ অবহেলা করিল। এখন জটিল পক্ষে জড়ীভূত হইয়াছে, আর উদ্ধার পাওয়া দুঃসহ। কিন্তু আমি চেষ্টা পাইব। একান্ত অক্ষম হইও বন্ধাত্যাপ পর্যন্তও স্বীকার করিব। অন্ধের অপেক্ষার সমষ্টি নষ্ট করিব না। মহারাজ! যথেষ্ট হইয়াছে। আপনি আপনার মত ব্যবহার করিলেন।” বিমলার মুখে একেই অবগুষ্ঠন ছিল না, কোমল মন্তকমাত্র আচ্ছাদিত ছিল। বিমলার মস্তকের হিন্দোলে সে বসন শিরোদেশ হইতে খসিল। আঁহা কি খন কেশভার! কবরোবদ্ধ ছিল না বটে কিন্তু কেশপাশের শিখা মস্তকের পশ্বে একত্রে প্রস্থি দিগা জড়ান থাকার মস্তকটি বিগুণ বড় দেখাইতে লাগিল। কেশ-ভুলি কি পরিষ্কার! আর কেমন অসামান্য বন জলদের শ্রামবর্ণের জ্যোতি। আর কি সুন্দর! যেন মসীবর্ণের উর্ণাত্ত! গলদেশেরই বা কি তাব, আর কি অসামান্য অর্ধবর্ণের মাসুদী! কি নির্মল! মহারাজ কৃষ্টি করিয়া একান্ত অধীর হইলেন। মহারাজের ওষ্ঠ শুক হইল। মহারাজের শ্রেণীর বিমলার রূপলাবণ্যে মোহিত হইল। প্রজাপাকিত্য স্তম্ভিত হইলেন। হির হইয়া একতানে অসিহিব নরনে রূপ পাল

করিতে লাগিলেন। বন বন নিঃশব্দ বহিতে লাগিল। মন বিষম চিন্তায় মগ্ন হইল।
বিমলা কটাক্ষে তাহা লক্ষ্য করিলেন। মনে মনে ইষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, জানে-কিষ্ট হই-
লেন। কিন্তু স্ত্রীস্বভাবচলনভাষণত একবার মহারাজের নেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
য়াই বস্ত্র টানিয়া, মস্তকে আবরণ করিলেন। বিমলাও কপোললাপ বর্জিত হইল।
বিমলা বন কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির বিপক্ষে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব ?
বিমলার শরীর শিথিল হইল। বিমলা শীঘ্র শীঘ্র কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, আর
প্রতিবারের দৃষ্টি ক্রমে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে লাগিল। ক্রমে প্রতাপাদিত্যের মুখ
দৃষ্টে আর চক্ষু অপহৃত করিতে অসমর্থ হইলে চারি চক্ষু মিলিল, অমনি বিমলার
মস্তকের বসন আবরণ খসিল। কিন্তু অব্যবহিত পরেই ধারের শব্দ মাত্র, বিমলা
বেন সূচ্যতন হইয়া, বসন তুলিয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্যেরও চমক ভাগিল। ক্রান্ত
উত্তীর্ণা ধার খুলিলেন।

সুন্দরী সহচরী বলিল। “মহারাজ! হজুরমল বহির্দ্বারে আপনার জন্ত
অপেক্ষা করিতেছেন। কি বিশেষ সমাচার আছে! রণবীর বাহাহর ও বিজয়-
কৃষ্ণও সেইখানে আছেন।” মহারাজ সুন্দরীর কথাতেই, ব্যস্ত হইয়া বর হইতে
বহির্গত হইলেন। কিন্তু পুনরকালে মুখ ফিরাইয়া একবার বিমলার প্রতি লক্ষ্য করিতে
তুলিলেন না। বিমলার বস্ত্র শিথিল হইয়াছিল। ব্যস্ত কটির বসন সংগ্রহ করিতে-
ছেন, সেই অবকাশে একবার বক্ষ হইতে বস্ত্র খসিয়াছিল। মহারাজ সেটিও দেখিতে
পাইলেন। অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে হজুরমল ডাকিবে না জানে অবস্থান করিতে
পারিলেন না, অপর্যাপ্ত পৃথগ্যাপ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলা মহারাজের গমনে,
কিছু বিমর্ষা হইলেন। বহুদূরে যোপিত তরুর পরিণত ফল ভোগের জন্ত হস্তে
লইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাহা হরিল। একেবারে বিষণ্ণ হইলেন। অতীষ্ট সিদ্ধ
হইল না বলিয়া রোষ জন্মিল। পর ক্ষণেই আবার মহারাজের শীঘ্র প্রত্যাগমনাশয়ে
কিছু স্থির হইলেন। মনে মনে ইষ্ট ভাবী সুখের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কণ
মনের গতিই এইরূপ। প্রকৃত সাধনে অক্ষম হইলে, কল্পনায় মুখ সম্বোগ করে।
আহা, সেই একমাত্র সম্বোগের উপায় ছিল! বিমলা জাগ্রদবাস্থ্যেই স্বপ্ন দেখিতে
লাগিলেন। তাহার শরীর লোমাক্ত হইল। কল্পনা কি বলবতী! প্রকৃত বহি-
র্যাপারাপেক্ষাও ইন্দ্রিয় সকলকে আঘাত করে। বিমলা কিছুক্ষণ এই চিন্তায় মগ্ন
রহিলেন। সুন্দরী দৃষ্টিমাত্র সমস্ত বুঝিল। এরূপ প্রেষ্ঠ সুখের ধ্যানভঙ্গে
সমূহ কষ্ট জন্মিবে জানে, বিমলাকে কিছুই বলিতে পারিল না। কিন্তু না
বলিলেও যে বিমলা মায়ামোহে বদ্ধ হইয়া আশায় অভিভূত হইয়া যাবে, পরে
তাহা কথামাত্রও সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহে আবার এতদতিরিক্ত কষ্ট

জন্মিবে। কিছুই স্থির করিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে বিমলাকে নিতান্ত শূন্য দেখিয়া সুন্দরী বলিল। “দেবি! মহারাজের সমুহ বিপদ। আমাদিগেরও আর পরিত্রাণ নাই।”

বিমলা বলিলেন। “রাজার আবার বিপদ? রাজার ত এক্ষণে চারিদিকে সম্পদ উপস্থিত। বিপদ আমাদিগের বটে। কিন্তু সুন্দরি! এক্ষণে আর চলেবে না। তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই। অসময়ে কি জন্ত আমাকে ত্যক্ত করিলে? তুমিই ত মহারাজকে বিদায় করিয়া দিলে।”

সুন্দরী বলিল। “হঁ। আমিই এক প্রকার বিদায়ের মূল কারণ হইলাম বটে, ইহাতে কিন্তু আপনার ক্ষতি হইল না। রাজার গমনকালে আমি বিশেষ করিয়া তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়াছিলাম। তাহার ভাল বিশ্বাস হইল যে, এখনও তিনি আপনার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। হজুরমলের নিকট গাংনা শুনিলাম, তাহার স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। মহারাজ মানসিংহ সৈন্যে বজ্রবলে আসিয়া ছাউনি করিয়াছেন। শুনিলাম কচুয়ারও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। মহারাজ অদ্যই হটক বা কল্যাণীতে এ গড় অধিকার করিতে আসিবেন। কি বিপদ! আমাদিগের কি হইবে?”

বিমলা বলিলেন। “সুন্দরি! বোধ করি এ কথা সত্য না হইবে, মানসিংহ এখানে কি জন্ত আসিবেন? আর সেদিন যে সন্ধ্যাগড়ে কচুয়ারের প্রেতভুত হইল। অনঙ্গপালদেবেরও কদাচ সাধ্য হইতে পারে না যে, কচুয়ার বর্তমানে সেরূপ কাজ করে। আর অনঙ্গপালদেব কিছু কচুয়ারের বিপক্ষ নহে।”

সুন্দরী বলিল। “সে কথার উত্তর আমি দিতে পারি না। কিন্তু মানসিংহ আসিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা হজুরমল এত ব্যস্ত হইবে কেন? এখন আমরা কি করিব?”

বিমলা বলিলেন। “আমাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিবার কোন ভয় নাই। যে আশ্রুক, জীলোকের সঙ্গে কাহার বাদ নাই, তাতে আবার মহারাজ বসন্তরায়ের পরিত্রাণ।”

সুন্দরী বলিল। “তাহা না হইলেই ভাল। কেন না, আপনাদিগের কণামাত্র বিপদে আমাদিগের দুঃখের একশেষ হইবে। মহারাজ কি বলিলেন? আমি তাঁহার মুখের ভাবে বুঝিলাম, তিনি এখনও আপনার অধিকার স্বীকার করেন।”

বিমলা বলিলেন। “সুন্দরি! মহারাজের বড় যখন আমার প্রাণান্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন?”—

সুন্দরী বলিল। “কিন্তু তিনি এত অধীন ছিলেন না। তাঁহার কেমন একটু ক্রমতা ছিল, সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।”

বিমলা বলিলেন । “কিন্তু প্রতাপাদিত্যের আর এক রকম মোহিনী শক্তি আছে ।”

হুন্দরী বলিল । “তাই ত আপনি এক একবার আত্মবিস্মৃত হন ও প্রতাপাদিত্যের জন্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন । এখন উভয় পক্ষে সমান টান আছে ।”

বিমলা বলিলেন । “প্রতাপাদিত্য বড্‌জ্ঞান আমার সমুদীন থাকেন, তত্‌জ্ঞান তাঁহাকে আমি হুচ্যাগ্রে নাচাইতে পারি ! আমার অনাকাঙ্ক্ষাতে সে কিছু অবাধ্য হয় । আজ কিন্তু কিছু কালের মত পরাজয় করিয়াছি ।”

হুন্দরী বলিল । “তা হউক, কিন্তু ইন্সুমতীর উপর ইহার অত্যন্ত দৃষ্টি । তাহাকে লইয়া কোথায় গেল, কিছুই বলা যায় না । ইহাতে আপনার কিছু ধর্ম্মতা সম্ভাবনা ।”

ইন্সুমতীর নামে বিমলার কিছু চাকল্য জন্মিল ! আপনার অমঙ্গল চিন্তা, তাহার উপর আবার ঈর্ষা । ত্যক্ত হইয়া বলিলেন । “তা ইন্সুমতীই হউন, আর যে হউন, আমার স্বার্থসিদ্ধি কিছুতেই বাধিবে না । কিন্তু প্রতাপাদিত্য কি ভয়ানক মারকী । আমাকে অমূলক আশাদে বদ্ধ করিল । এখন অসময় জ্ঞানে আমাকে ত্যাগ করিল । ত্যাগ ত করে না, অথচ ইন্সুমতীর গুণও ব্যাকুল হয় ।”

হুন্দরী বলিল । “আমার বেধ হয় আপনাকে সামান্যতার দ্বারা জ্ঞান করেন ।”

বিমলা ক্রোধবশে আপন আসন ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন ।

হুন্দরী বলিল । “এখন আমার উপর রাগ করিলে কি হইবে ? প্রতাপাদিত্য আপনাকে ত অবতরই করেন ।”

বিমলা বলিলেন । “অবতর করে সত্য, কিন্তু আমাকে বারবার তাহা শুনানতে একজনকার কি লাভ ?”

হুন্দরী বলিল । “নিতান্ত কিছু অকারণ বলিতেছি না । আপনার লাভ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে । আমার পক্ষে স্পষ্ট তাহা বলা বিধেয় হইতেছে না, কিন্তু ইঙ্গিতে আপনাকে না বলিলে আমাকে দোষ স্পর্শ করে ।”

বিমলা বলিলেন । “আবার তোমার দোষ কি ? ভূমি কি এখন আমাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেই আসিলে নাকি ?”

হুন্দরী বলিল । “আমি নিতান্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতে আসি নাই, কিন্তু বাহ্যতে আপনার হিত সাধন হয়, তাহা আমার সর্ব্বভঃ কর্তব্য । আমার মতে এক্ষণে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠতা থাকা বড় ভ্রমের বোধ হইতেছে না । অত্যন্ত বিপরক চিন্তা ত্যাগ করিলেও স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে । গতরাত্রের ব্যাপারে ইন্সুমতীহরণ ব্যতীত, যথেষ্ট ধনসম্পদ হইয়াছে, তাহার আপনারই ভাগ্যের ক্ষতি হইয়াছে । আবার বধন মহারাজ বরণ আজ হলনা করিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ত রায়পুত্রের স্বাধীনতা এক

কালে নষ্ট হইবে। রাগগড়ে তাঁহার সেনা রাখিয়া গেল, আপনারা নজর বন্দীর মত রহিলেন। আর রাগগড় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত হইল।”

বিমলা উন্মীলিতনেত্রে হৃন্দরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

হৃন্দরী বলিল। “রাগগড়ের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইল, ক্রমে আপনাদিগকে প্রতাপাদিত্যের আজ্ঞাবর্তী হইতে হইবে। মহারাজ বসন্তরায়ের দ্বীর কিছুরে সকল বড় মনের কথা নহে। মানও ত্যাগ করিলে আপনাদিগের বিষয় ভোগেরও বধেষ্ট হানি হইবে।”

বিমলা বলিলেন। “যাহা হইবার তাহা হউক, আমার তাহার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞাবধীন হইতে পারে, তাহাকে কেন আজ্ঞাবর্তী না করি?”

হৃন্দরী বলিল। “হাঁ আপনার এখন এই মতই বুদ্ধি হইয়াছে বটে। মহারাজ বসন্তরায়ের দ্বীর মতই হইল। আপনার কি কণামাত্রও লজ্জা হইল না? আপনার কি বোধ নাই যে আপনি কে?”

বিমলা বলিলেন। “হৃন্দরী! বধেষ্ট হইয়াছে। আমার আর কষ্ট দিও না। এক্ষণে আমি নির্জন হইতে চাহি। ইতোমধ্যে মানসিংহের সমাচার ও প্রতাপাদিত্যের মনের ভাব অবগত হইতে চেষ্টা পাও। অন্য সায়ংকালে একবার আমার নিকট আসিও।”

বিংশ অধ্যায়।

“বিধায় বৈরং সামর্থে নরোহরৌ য উদাসতে।

প্রক্ষিপ্যোদার্ষিৎ কক্ষে শেরতে তেহতিমারুতম্ ॥”

মহারাজ প্রতাপাদিত্য হজুরমন্ডলের সহিত বিমলাদেবীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া আপনার বাসমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, বিজয়রুক, কৃষ্ণনাথ, রণবীর ও অভ্যন্ত প্রধান কর্মচারীরা সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহার সত্বাকৃষ্টিমে প্রবেশমাত্র সকলে ব্যস্ত হইয়া গাজোখান করিল। মহারাজ আপন আসনে উপবিষ্ট হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিল। মহারাজ কক্ষকাল বসিয়া খাস লইলে বিজয়রুক করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল। “মহারাজ! রণবীর বাহাদুরের চরিত্রা অভ্যন্ত অমঙ্গল সমাচার আনিয়াছে। আর নিশ্চিত থাকিবার সময় নাই। মহারাজ মানসিংহ সৈন্ত বজ্রবজ্রে আছেন, তিনি সনদ্বীপ হইতে তাঁহার সেনানীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই লোক আসিতেছে। সনদ্বীপ হইতে জাহাজ সব কত দূর, সন্ধান দিতেছে। তাঁহার সেনাবলে তুমুল আরোহণ। সকলে অস্তবদ্ধ।

উৎসাহে মত্ত। আজ্ঞার অঙ্কুরমাত্রেরই রাগগড়ে আপনাকে আক্রমণ করিতে আসিবে। তাঁহার চরেরা মহারাজের এখানে উপস্থিতির সমাচার তাঁহার কর্ণে বোজনা করিয়াছে। বর্জমানাধিপ ও তাঁহার সৈন্যদল রাগগড় আক্রমণে মহারাজ মানসিংহের পক্ষ হইবে বলিয়া রওয়ানা হইয়াছে, দূতের জ্ঞান হইতেছে, দুই দণ্ডের মধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। এ দিকে যশোর হইতেও তদ্রূপ কু-বার্তা আসিয়াছে। তথায় ঢাকার নবাবের সেনা যশোর দখলে অগ্রসর হইয়াছে। বিজোহে শুনিতে পাই সেনা চক্রবর্তী হইতে বেষ্টিত আছেন। মহারাজের বন্ধনা হইতে প্রেরিত সেনা এক্ষণে পথে মহারাজের আদেশ লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিতেছে। শুনিতে পাই, যশোরেখরী প্রস্তরময়ী দেবী বিমুখ হইয়াছেন। কেনই বা না হইবেন। যশোরে যখন যবনাবিকার হইল, তখন সকলই সম্ভবে। জয়ভীরাজসেনারা কতকগুলি ভদ্রেশীর আর্মিরের আজ্ঞাবর্তী হইয়া সম্প্রতি রাজকুমার সূর্য্যকুমারের অধেষণে লোক পাঠাইয়াছে। তাহারাও গত রাত্রে যমুনা পরাইয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তথায় সূর্য্যকুমারের অধেষণ না পাইয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট আবেদন করে। মহারাজ মানসিংহ তাহাদিগকে যত্নে বাসস্থান দিয়া সনদ্বীপ হইতে সেনা আগমনের আশে অপেক্ষা করিতেছেন। মহারাজ কচুগায় স্বয়ং ও সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ সনদ্বীপে গিয়াছেন। এ দিকে মহারাজ মানসিংহের কাজীটলু কুজ্জার দপ্তরে মহারাজার বিপক্ষে কএকখানা আবেদনপত্র পৌঁছিয়াছে। যিনি সেই সকল আবেদন পত্রের মর্ম্ম ও তাহার উপর ইসলামী ধর্ম্মসম্বন্ধ ফতোয়া (১) লিখিয়া মহারাজ মানসিংহের অবগতিতে পেশ করিয়াছেন। তাহার লোকমুখে শুনিতে পাই, অনেক অসঙ্গত ও অননুতবনীর দোষ আয়ত্থানের উপর নিযুক্ত হইয়াছে। একজন দূত বহু বয়ে তাহার এখানি অনুরূপ আনিয়াছে। ইহা মহারাজের অবলোকনার্থে দিই।”

বিজয়কৃষ্ণ আপনার অন্তরঙ্গের মধ্য হইতে একখানি ফারসিতে লেখা পত্র মহারাজার হস্তে দিল। মহারাজ তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। পাঠান্তে পত্রখানি অত্যন্ত অশ্রুতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার যে এরূপ বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, তাহা জানিভাম না। তুমি এরূপ গহিত পত্র কি করিয়া আমার অবগতিতে আনিলে? ইহার লেখককে এক্ষণেই আমার কর্ম্ম হইতে দূর কর। আর তুমি পুনরায় এরূপ অবাধের মত কর্ম্ম করিও না। আমার নিন্দাসূচক সংবাদ আমাকে অবগত করান তোমার উচিত হয় নাই। সে পাণিষ্ঠের কি অতীব সাহস! আমার জ্ঞান হয়, সে এখন উদ্ভাদ হইয়াছে।”

‘বিজয়কৃষ্ণ করবোড়ে বলিল। “মহারাজ! রোষ ত্যাগ করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুমতি হউক, কিন্তু পত্নের বিষয় গোপনে ধর্ম্মরাজের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা করি।”

রাজা বলিলেন। “ভাল, বাহা নির্জনে বলিতে চাহ, বল।” একবার সভাসনের প্রতি লক্ষ্য করিবামাত্র সকলে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এ পত্নের মর্মে আপনার রাগ করিবার কোন কারণ নাই। এখন সম্প্রতি কয়েক বৎসর দিল্লীরকে কর লেওয়া বন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্জনে তাঁহার অধিকারস্থ বলিয়া পীকার করিতে হইবে। আর তাঁহার অধিকারভূক্ত না হইলেও রাজগণমধ্যে প্রচলিত প্রবাসুসারেও আপনাকে এ পত্নে কিছু কুণ্ঠিত হইতে হইবে।”

রাজা রোষে বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! তুমিও যে আমার দোষী জ্ঞান কর।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আমার এত ক্ষমতা হয় না। পরন্তু মহারাজের অপবন হইলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয়। স্বক্কাবারে এ সমাচার রাষ্ট্র হইলে ও প্রধান প্রধান আমোরেয়া ইহা অবগত হইলে মহারাজের প্রতি যে প্রীতিটুকু আছে, তাহা লোপ পাইবে। সকল ললেই সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি লোক আছে। সভাই হউক বা মিথ্যা হউক, স্পষ্ট মহারাজের কলঙ্ক উঠিলে, বিপক্ষ লোক অনেক জন্মিবে।”

রাজা বলিলেন। “ভাল, তাহা তুমি কি প্রকারে নিবেশ করিতে পার?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! সম্প্রতি মহারাজ মানসিংহের নিকট লোক পাঠাইয়া গোপনে তাঁহার সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করিলে এ কথাটি রাষ্ট্র হইবে না। নতু। এই স্বর্গ্যকুমার ও মালিকরাজ সম্প্রতি বিপক্ষদল হইতে পারে।”

মহারাজ বলিলেন। “কি আমি ইহাদিগকে ভয় করিব! ইহারা আমার বিপক্ষ হইলে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি সম্ভবে না।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এক্ষণে আমার পরামর্শে মত প্রকাশ করুন। আমার জ্ঞানে উপারান্তরে রক্ষা নাই। আপনার অপবনের কারণ আমার অগোচর কিছু নাই। সে সকল কথা লোকে জানিলে আর আপনার সাধারণসম্মুখে বাহির হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে। পত্নে দেখিলেন, কতগুলি পাপ আপনার শিরে দিয়াছে।”

রাজা বলিলেন। “আমি কিন্তু সে সকল পাপের কথামাত্রেরও অংশী নহি।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আপনি অংশী হউন বা নাই হউন, সে সকলের সম্বলিত আপনার নাম উচ্চারণ সাত্রেই বধেট হইল।”

রাজা কিছু ত্যক্ত হইয়া বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার অসম্ভব বাক্য সম্ব হয়

না। তোমরা যথেষ্টা গমন কর। তোমার জায় অকর্ষণ্য হুজুদে আমার আবশ্যক নাই। মানসিংহকে ভয় হইয়া থাকে, তাহার পদাবনত হও। আমার তাহে কোন ক্রোভ নাই। বরং তাহে আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইব।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! রোষ-পরবশ হইয়া আত্মস্বার্থ ভুলিবেন না। আমার অবস্থামানে মহারাজের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মহারাজ বাহাতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সে বড় শুভকর নহে।”

রাজা বললেন। “বিজয়কৃষ্ণ! আমি তোমাকে দূর করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তোমার ভার পরামর্শেও মত দিব না। এক্ষণকার কর্তব্য কর্ণে আমার আত্মা-বর্তী হইতে চাহ। ভাল, নতুবা তুমি পুরাতন লোক, তোমাকে আমি কিছু জায়গীর দিই, দেশে যাইয়া সুখে কাটাও। রাজকীয় বিষয়ের জঞ্জাল তোমার অতি প্রবীণ বয়সে সম্ব হইবে না।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ একান্ত আমার যুক্তি অগ্রাহ করেন, আমি নিতান্ত হীনবল হইলাম। কিন্তু মহারাজ, বর্তমানে আমি আর কোথাও থাকিতে পারিব না। আপনার কুশল সঙ্গা গেলি। পরে কালীর অভিরুচি ও আমাদিগের পূণ্যবল। এক্ষণে যে মত আশ্রয় করেন, প্রস্তুত আছি।”

মহারাজ বললেন। “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার মতে আমার বেক্রম আপদ উপস্থিত, তাহে মানসিংহের বশবর্তী হইলেও ত্রাণ নাই। দিল্লীর একান্ত বঙ্গ রাজ্য তাঁহার অধীন করিবেন, মানস করিয়াছেন। এস্থলে আমার চেষ্টা বিফল। তথাচ স্বদেশ-গৌরব জাতভিম্নম ভ্যাগ করা কার্যব্যাংশে সম্ভবে বা। আমি ইচ্ছা করি যে, শেষ পর্যন্ত একবার দেখা যাক। আমা হইতে নীচের কর্ম হইবে না। আমি স্নেহ যবনকে প্রভু বলিয়া কথবই স্বীকার করিব না। বুঝিলাম, বঙ্গের শেষ উপস্থিত। ইহকালে বাঙ্গালির আর সুখোন্ময় হইবে না। আমার বংশেরও এই শেষ। কচুরায় একান্ত মতিভ্রষ্ট হইয়াছে। আত্মবিচ্ছেদে দেশ নষ্ট করিল। কিন্তু তাহার সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। গঞ্জালিস্ আমার পক্ষে আছে, আর যদি চারি পাঁচ দিন কোন ক্রমে বিলম্ব করিতে পারি, বোধ করি আমার সকল সেনা একত্রিত হইবে। গঞ্জালিস্ও আদিয়া উপস্থিত হইবে। পার্ঠানেয়াও কিছু এককালে অবসর হয় নাই। এ সকল সেনা একত্র করিলে বিজয়কৃষ্ণ! প্রতাপান্বিতা জয় করিতে পারে না, এমন শত্রুই নাই। যখন বঙ্গের একমাত্র ছত্রী হইয়াছি, তখন আমার চক্রে দিল্লীর বড় ভীষ্ম শত্রু নহেন। উড়িষ্যার সমাগার মাত্র আমার হিলেশ্বর কারণ। এখন রায়গড়ের বশবর্তী সেনাদিগের সমাচারও লও। আর উগ্রদেন কত অর্থ এক্ষণে দিতে পারে, তাহারও বার্তা পাওয়া আবশ্যক। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, তাগুারে যথেষ্ট রসদ

আছে। আমার সেনাবলও কিছু নিতান্ত হীন নহে। রাধগড় পরিপাটী করিয়া রক্ষণে সমর্থ। কিন্তু সেনাপতির অভাব জ্ঞান করিতেছি। তোমার সে বিষয়ে কি যুক্তি হয়? হজুরমল ও রণবীর বাহাদুর দুই পার্শ্ব রক্ষা করিবে। আমি একদিক রাখিতে পারিব। তোমাকে দক্ষিণ দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিব। কিন্তু মারো মারো গড় হইতে বাহির হইয়া মানসিংহের সেনাকে বিরক্ত করণে আবশ্যক। তাহা নিগড়ে গড় আক্রমণে নিযুক্ত করিলে, আমরা এক প্রকার সুবিধা পাইব। গড় বড় সমাজ্য নহে, আমি চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়াছি, কোন স্থানই আমার চক্ষে হীনবল বোধ হয় না। কিন্তু শত্রুসেনা গড় আক্রমণে থাকিলে সেই সময় বাহির হইতে আমার সেনা যদি তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে, তবে বোধ করি শত্রুবলের অনেক ভ্রাস হইবে। গড়ের বাহিরে কাহাকে পাঠাই। আমি স্বয়ং বাইতে পনি। তোমাদিগের ক্ষমতা আমি জ্ঞাত আছি। তোমরা অনায়াসে চূর্ণ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু আমার বোধ হয়, তোমরা আমাকে গড়ের বাহিরে বাইতে দিবে না।”

বিজয়রূক্ষ বলিল। “মহারাজ! তাহার অস্ত্র আপনি চিত্তিত হইবেন না। আমি কিছু এখনও এত হীন বল হই নাই যে, শত্রুসেনার সম্মুখে হটিয়া বাইব। আজ্ঞা হয় ত আমিই বাহিরে যাই। হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ চূর্ণ রক্ষায় যথেষ্ট পারগ। আপনার এসকল দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা বর্তমানে যদি আপনি কষ্ট পাইবেন, তবে আমাদিগের থাকায় লাভ কি?”

রাজা বলিলেন। “ভাল, তবে তাহার বন্দোবস্ত কর, আমি জানি, তোমরা সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। সম্প্রতি কৃষ্ণনাথকে ডাকিয়া যুক্তি কর। হজুরমলকে একবার আমার নিকট পাঠাও। আমি গজালিঙ্গের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাই।”

বিজয়রূক্ষ নেতান হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই হজুরমল আসিলে রাজা বলিলেন। “হজুরমল গজালিঙ্গের আগমনের বিলম্ব কি? সে এখনও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল না কেন? তাহার সেনাই বা কোথায়?”

হজুরমল বলিল। “মহারাজ! সে ইন্দুমতীর ব্যাপারে কৃতকাৰ্য্য হয় নাই বলিয়া, লজ্জার স্রোতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে নাই বোধ করি, তাহার সেনারা দুই একদিনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে।”

রাজা বলিলেন, “হজুরমল, তাহার আশ্রয়ে আমি আর থাকিতে পারি না। আমাকে অতি শীঘ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। যখন মানসিংহ এত নিকট, তখন আমি আর কোন স্তরে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। আমাকে যেক্রমে হটুক, এইকালেই প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি শত্রুসেনা গড় আক্রমণ করে, তবে আমরা আর আপন বল প্রকাশের উপায় পাইব না। আমার চতুরঙ্গ সেনা এককালে হানাতাবে হস্তবদ্ধ হইবে। অতএব

মানসিংহের এখানে আগমনের পূর্বেই আমার সতর্ক থাকা আবশ্যক। যদি সময় পাই, তবে একবার গড় ছাড়াও মানসিংহকে আক্রমণ করা উচিত বোধ হইতেছে। তাহার উপর তাহার বহানে আক্রমণ করিলে, চাহি তাহাকে পশু করিতে পারি। পরন্তু এ সকল পরামর্শ গঞ্জালিস সপেক্ষ। তোমাকে বোধ করি, অন্যাই গঞ্জালিসের নিকট সনদ্বীপ বাইতে হইবে।”

হজুরমল বলিল। “মহারাজ, আমি এই ক্ষণেই প্রস্তুত আছি, আজ্ঞা পাইলেই যাত্রা করি। পরন্তু শুনিতেছিলাম, আমাকে দুর্গ রক্ষা থাকিতে হইবে। আমার যদি যাত্রাও করি, আর গঞ্জালিস পধ্যস্তর দ্বারা সনদ্বীপ হইতে মহারাজের উদ্দেশে বাহির হইয়া থাকে, তবে অকারণ এখানকার কর্ত্ত্ব নষ্ট হয়। মহারাজেরও বৈরূপ অসুখতি। আমার নিবেদন যে গঞ্জালিসের প্রতীক্ষা করি, চার পাঁচ দিন পরে এখান হইতে যাত্রা করিলে ভাল হয়। হজুর মালিক, বৈরূপ অদেয় হয়।”

মহারাজ বলিলেন। “হজুরমল, তাহাই ভাল, কিন্তু সে অপেক্ষা কি সহিবে? বখশ শত্রু এত নিকট, তখন আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকা উচিত হইতেছে না।” বিজয় কৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বললেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এত শীঘ্র যে আসিলে, তুশল বল।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আয়য় নু! রাজলক্ষ্মী দিন দিন দুর্জি হইক। মহারাজ মানসিংহের স্বকাগারে বুদ্ধাযোগন হইতেছে। শুনিতে পাই, অন্য রাত্রিতে তাহার সেনা রায়গড়াত্তমুখে যাত্রা করিবে। হয়ত অন্যাই তাহার রা গড় আক্রমণ করিবে একান্ত অন্য রাত্রিতে না হয়, কল্যা প্রতু যে অবশ্য অবশ্য আক্রমণ হইবে। অতএব সেনাপণ একপক্ষের আদেশ অপেক্ষা করিতে ছ। আজ্ঞা হয়ত কৃষ্ণনাথকে সমুখে আনিতে কহি। এখান হইতে বাইরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। বদৌর-বাহাদুর সেনাপণ্ডার মধ্যে আছেন। এখন হজুরমলকে ক্ষণেকের জন্য সেখানে পাঠাও তাহাকে আকাশ নিতে পারে।”

রাজা বলিলেন। “হজুরমল! তবে তুমি বাইরা শীঘ্র কৃষ্ণনাথকে পাঠাইয়া দাও।”

হজুরমল শির নত করিয়া চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ গঞ্জালিসের বিলম্ব কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ হজুরমলের প্রমুখ্যৎ বাহা শুনিলাম, যদি সত্য হয়, তবে গঞ্জালিসের অশা ত্যাগ করুন, সে আর এখানে আসিবে না। দহাপতির কৃত সাহস সত্তবে। আরবি লোকমুখে যাহা শুনি, তাহার ত হজুরমলের কথা আদ্যন্ত মিথ্যা দাঁড়াইতেছে। তাহা হইলেও গঞ্জালিস আর এখানে আসিবে না। মহারাজ বখন পরামর্শ নিবেদন করি, তখন ত কর্পণাত করিতে “আজ্ঞা হয় না। গঞ্জালিস মহারাজের নিকট চাকুরী করিয়াছে, এই কথা ত বাজারে রাধি।”

রাজা বলিলেন। “তুমি কি তসিরাহ? তাল বলিরাহ। আমিও বাহা লোক-
পন্থার তসিলাহ, তাহার আমার হজুরমলের উপর অবিবাস হইতেছে। কিন্তু অনু-
লক বাক্য তর দিয়া বিবাসী লোকের উপর সন্দেহে বিপরীত ঘটে। পাছে হজুরমল
অবিবাসী হয়, তবে আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু তোমার কথার
আমার তাহার তত্ত্বাবধারণ করা উচিত হইতেছে। পতরাঞ্জের রায়গড়ের ব্যাপার
কি তসিরাহ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “ঐহান্দ! তাহা প্রথমে আপনায় প্রয়োজন নাই। ইহাতে
কেবল রোষ ব্যক্তি হইবে।”

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! ওতে আমার সন্দেহ সমূলক হইল। পাপ হজুর
মল গজালিসের সঙ্গে যোগ করিয়া, আমার বিবাস নষ্ট করিল। গজালিস লরাধম কি
আমি আমার নিকট কখন আসিবে না? অনুপ্রসন্ন কি ভাবিল, তাহাকে সাহায্য
দেওয়া হইবেক না। কিন্তু আমাদিগের পরামর্শের কি হয়! ইন্দুমতীকেই বা পুনর্জন্মের
সুযোগ কি? শত্রুবেল মথনের সহায় হ্রাস পাইল। ফিরাদিয়া বালিমোগলদিগের সঙ্গে
যোগ দেয়, কি তাহাদিগের বশবর্তী হয়, তবেই ত দিল্লীখবরের বলাধিক্য হইল। আরা-
কান হইতে কোম লাভ সম্ভাবনা রহিল না। বিজয়কৃষ্ণ! এক্ষণে আমার মন্ত্রণা বিফল
হইল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ! আমি তাহা ভীত নহি। দেবিব, শত্রুর বলাধিক্য হইয়াই
বা আমার কি কাজ হয়। আমি কদাচ তর করিব না। এইক্ষণেই হজুরমলকে স্বক্কা-
বায় হইতে আদালতে উপস্থিত হইতে বল। বিচারে যে দণ্ড বিধে হয়, অবিলম্বে
তাহা হজুরমলের উপর মিস্ত্রোগ করিব। আর গজালিসের সহিত যেরূপ আশ্রয়তা রাখা
উচিত বোধ হইবে, সেই মত পত্র তাহাকে লিখ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! ব্যস্ত হইয়া সকল বিষয় কতি কতিবেল না।
কাত হউন। অধীর হইলে উভয় কুল হারাইবার সম্ভাবনা। হজুরমল নিতান্ত গর্হিত
কর্ম করিয়াছে। আপনি বোধ হয় উহাদিগের পরামর্শ সকল অবগত সন্ধান। মহারাজের
ইন্দুমতী ও প্রত্যাবর্তীকে লইয়া গিয়াছে, হজুরমল ইন্দুমতীকে ও গজালিস প্রত্যাবর্তীকে
লইবে স্থির হইয়াছে। পাগের এক্ষণে উভয়কে সম্বোধনে লুকাইয়া রাখিবে। পরে
হজুরমল কোম ছিলে মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বাধীনতায় ইন্দুমতী লইয়া
যাণ করিবে।” মহারাজ রোষে জলিয়া উঠিলেন। তাহার ওষ্ঠের কাঁপিতে লাগিল।
চক্ষুর আরক্ত হইল। কপোল-রাগরাজিত মহারাজের মুখত্রী কি শোভিল। লক্ষ্যচিত-
মেতে উর্জ দৃষ্টি করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ ক্রুদ্ধ হইবার সময় নহে, এখন যদি হজুরমলকে সে
কথা লইয়া শ্রীকুল করেন তবে, অন্যবিচ্ছেদ সম্ভব। আমার মতে সে কথার উল্লেখ



না করেন। পরে মহারাজের যেমত আজ্ঞা হয়। পদ্মাজয়কেও এ অবস্থার পত্র লিখায় কোন প্রয়োজন নাই।”

রাজা কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া উঠিলেন। বলিলেন। “কৃষ্ণনাথ আসিলে, তাকে অত্রমণের আয়োজন করিতে বল। আমি বিমলাদেবার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল মহারাজের রাগ বৃদ্ধি হইবে।”

রাজা বলিলেন। “না আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব।” আপন আশাস হইতে বাহির হইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ভাবিল। “এ রাজার ত আর পরিজ্ঞান নাই। ইহার পাপ বশেষ্ট হই-
রাছে। শেষ উপাশ্রুত। এত পাপে কখন মঙ্গল ঘটে না। হজুরমল অজ্ঞেই ইহার কল
তাপ করিবে। আজ্ঞাচ্ছেদে আপনানিগের বলহীন হইতেছে। অ’বার এখন বিমলাদে
নিকটে গেলেন, কত হৃদিশা ইহার অশ্রুতে আছে, তাহা বলিতে পারি না।” কৃষ্ণনাথকে
দেখিয়া বলিলেন। “কৃষ্ণনাথ! তোমার কুশল বল। গড়ের কোন্ কোন্ স্থানে
কিরূপ লোক নিয়োজন করিলে? তোমার বীথ্য প্রকাশের সময় উপাশ্রুত। মহারাজ
তোমার শৌধ্যে ও কোশলে নিশ্চিন্ত আছেন। আমরাও উপাশ্রুত বিপ্লবে তোমার
বাহ্যর ছায়ায় নিরাপদ বোধ করিতেছি। কেমন, নূতন কোন সমাচার পাইয়াছ?”

রূপবীরাধারুয় বলিলেন। “এখন ত এক প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। গুরুত্বল
বোধ করি এ অবস্থার কোন ক্ষত্রই ভয় করি না। বত বড় সেনাপাত হউক না কেন,
আর বত সমুহ ক্ষত্র উপাশ্রুত হউক, এ গড়ে কাহারই দণ্ডদুট করা দুস্বহ। তবে যদি
বহুকাল আবদ্ধ থাকিলে দ্রব্যাদির অভাব ঘটে। সেই শঙ্কাই সমূলক। এখন অধি
কোণের কাটকের নীচে দিয়া হুড়ক খোলিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি। শীঘ্র সেইটি
সম্পন্ন হইলে নিশ্চিন্ত হইব।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। “কেন নূতন স্ত্রুড়কে প্রয়োজন কি? মহারাজ বসন্তরোগের
কৃত স্ত্রুড় চার পাঁচটা আছে। তাহার কি কর্ম সম্পন্ন হইতে পারে না?”

কৃষ্ণনাথ বলিলেন। “আমি তাহা অবগত নহি। কোথায় স্ত্রুড়েরী পথ আছে?
যদি ভাল অবস্থার থাকে, তবে আমি অনেক পরিভ্রম হইতে পরিজ্ঞান পাই।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। “আমি একপ্রকার অবস্থা অবগত নহি, তবে দেখাইয়া দিব
কিবেচনা করিও।”

কৃষ্ণনাথ বলিলেন। “এখন যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে চলুন দেখিয়া
আসি।”

মহারাজ বলিলেন। “সুন্দরি! কি সদগুহী বিস্তারিলে! আহা! এমন খট-
নায় বধেই লাভ আছে। পাত্রই পুষ্পচর এতকণে যেন জীবিত হইয়া আপনাদিগের
সৌরভ বশ চারিদিকে বিস্তারিল।”

মহারাজের এরূপ প্রেমগর্ভ-কথার সুন্দরী বেন সাহস পাইয়া বলিল। “মহারাজ!
কি কুর্কুহী করিলাম? আহা! এ পাত্রটি বহুমূল্য, মহারাজ বসন্তরায় চীনদেশ হইতে
আনিয়াছিলেন; দেবীকে আদর করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ! আমি অতিরিক্ত
ক্ষতি করিলাম; এ ক্ষতি আমা হইতে পূরিবে না।”

রাজা সুন্দরীকে হৃদিত দেখিয়া বলিলেন। “সুন্দরি! আমার চক্ষে তুমি কোন
ক্ষতি কর নাই। আহা! আমাকে কি অপ্যায়িত করিলে? পাত্র ক্ষণভঙ্গুর, ভাঙ্গি-
য়াছে, তাহার ক্ষতি নাই; উহার প্রকৃত ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু এ সুসুন্দর
এরূপে বিকর্ণ না হইলে, কলাচ আঙ্গুরসৌরভ প্রকাশে সমর্থ হইত না। আহা!
ইহাদিগের পূর্বের অবস্থা মনে করিলে, আমার বিশেষ কষ্ট হয়। বনের কুল বনে
থাকিলে, বেন অকাল-বিধবা অবীয়ার ছায় শুক হয়। তাহাকে আনিয়া পাত্রের রাখিয়া-
ছিলে, যেন কারাবদ্ধ ছিল। তাহার খেল করিতেছিল, এমনতরুই যে, যদি তাম্র-
বশত চয়ন করিয়া আনিয়া, কিন্তু আমাদিগের কতকগুলিকে একত্র করিয়া বদ্ধ করিয়া-
ছিল। তাহাও সুন্দরীর হস্তে পড়িয়াছিল, তাইতে রসজ্যোতী-পূর্ণবের ভোগে
লাগিলাম।” মহারাজ ঈষৎ হাসিলেন।

সুন্দরী বলিল। “মহারাজ! আর ব্যজ করিয়া কেন আবার কষ্ট বর্জন করেন।
এ সকল রসপূর্ণপ্রের পাত্রাহরে ভাল শোভে। আমার কর্ণে যেন বিষবৎ গোধ হয়।
আমরা অভাগিনী দুঃখিনী, আবার অকৃত্রিম বলে শোভিনী দেবীর হস্তে পড়িয়াছি। মহা-
রাজ! আমাদিগের আর ও সকল ভাব চিন্তিবার সময় নাই। চিরদিন স্মরণার্থ
অপ্রাণার ছায় কাটাইলাম। বিধি জামেন, আরও কত দিন এই মতে বাইবে।”
সুন্দরী ছলে এমনতরু পট্ট ছিল, যে এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া
অপ্রাণার বহিতে লাগিল। সুন্দরী কিছু দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না।
ওতে আবার পূর্ণ-বোবন। শরীরের গঠনটি অত্যন্ত মনোহর। এমন
কি যদি বর্ণটি আর একটু উজ্জ্বল হইত, তবে বিমলাদেবীর সঙ্গে একজো
দাঁড়াইলে কে সংসার মোহনে অধিক পারগ বলি হুঙ্কার হইত। লহরী-
বেশ থাকার প্রায় জাহুর অগ্রদেশ পর্যন্ত অনাবৃত ছিল। আহা! কি
কোমল ও অকণ জাহুর আরক্ত। কটিনেলে অকল বেষ্টিত থাকার কটীর
কোঁকড়া, নিতম্ব ও বকের স্নেহগোল গঠন অধিক শোভা পাইতেছে। কর্ণদেশের
কি বক্রতা! আর স্বকণেশের কি মাধুরী! মহারাজ, সুন্দরীর অকণাভিত বদন,

ঐক্যবিন্দুরিত অধর আর অর্ধমুদ্রিত নেত্রের দেখিয়া মহারাজ চিত্ত হইলেন। বলিলেন “আহা! এ বনমলিকা, বহুভাবে মলিন হইয়াছে।”

হুন্দরী বলিল। “মহারাজ! অসামিক পদার্থের জুসামীই অধিকারী। আমি মহারাজের অবতরণোদ্য। আপনায় কোমল নয়ন কথার আমি আশ্রয়িত হইলাম। মহারাজ দয়ার সমুদ্র। আপনায় নিকট অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই, বলিয়াই মহারাজের আশ্রয় একান্ত করিরাছি।”

মহারাজ হুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহার রূপ ও ভাবভঙ্গীতে মোহিত হইলেন। ঘন ঘন তাহার নিকে লক্ষ্য করিলেন। হৃষ্টের মন অন্তরেই দ্রবিত হয়। বলিলেন। “হুন্দরী! তুমি আমার আশ্রয় লইয়াছ, হৃৎখিত হইও না। আমি তোমাকে যত্ন রাখিব। চল আমার সঙ্গে থাকিবে।”

বিমলাদেবী গৃহে প্রবেশ করিয়া মহারাজের সঙ্গে হুন্দরীর এরূপ আশ্রয়তাব দেখিয়া, অন্তরে অন্তর বিরক্ত হইলেন। ঘোরে তাঁহার বদন আরক্ত হইল। সাহসে পান বিবেচন করিয়া, মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন। “মহারাজ! অন্তরে আমার গৃহে আসার মহারাজের কি প্রয়োজন?” রাজা সহসা বিমলাকে পতীর স্বরে এরূপ কথা কহিতে শুল্লয়া চমকিলেন। হুন্দরী ব্যস্তে অন্তরে দাঁড়াইল।

রাজা বলিলেন। “দেবি! আমি তোমার প্রতীক করিতেছিলাম। একক বলিয়া থাকাপেকা, হুন্দরীর সঙ্গে কথা-বার্তা কহিতেছিলাম। হুন্দরী অন্তর রসিকা।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! ভাল হইয়াছে। রসজ্ঞ পুরুষ সর্বত্র রসিকা লাভ করে। এখন আপনারা মিষ্টালাপ করুন। আমি হালাত্তরে বাই।”

বিমলা গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। মহারাজ পতিক দেখিয়া ব্যস্তে বিমলার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন। “দেবি বিমলা! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কোন কথা আছে। একবার আইস।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! কি কথা আছে, এইখানেই বলুন।”

রাজা বলিলেন। “বিমলা! বরে আসিতে অসিদ্ধা প্রকাশ করিতেছ কেন? একবার বরে বসিলে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে বলিব।”

বিমলা বেশ অগত্যা প্রত্যাগমন করিলেন। বলিলেন। “মহারাজ! কি প্রয়োজন আছে?”

রাজা বলিলেন। “বিমলা! গতরাত্রে ইন্দ্রদত্তের কি বশ হইয়াছে, তাহা আমি অবগত হইতে ইচ্ছা করি। তুমি অবশ্য সকল শুনিয়াছ।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আপনায় সকল যথার্থ পণ্ড হইয়াছে; আমি তাহা ভাল অবগত আছি। মহারাজ যে পঞ্জাব ও হজুরনকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও সারকট

রাষ্ট্র হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের কুমন্ত্রণার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছেন, আর শাস্তির বেধ করি এখনও শেষ হয় নাই।” বিমলা ধামিলেন। প্রতাপাদিত্যের অসহ্য দৌরাত্ম্য ও অতীব পাপাচরণ বিমলার মনে এক কালে উঠিল। তিনি সিংহরিলেন। আপনার অবস্থা ও বসন্তরাজের অকালমৃত্যু তাঁহার মলকে মথিল। মনস্তাপে ও শোকে এককালে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তাতে আবার অন্য স্বচক্ষে মহারাজের কুমন্ত্রণার প্রতি বৈরুপ ভাব দেখিলেন, তাহাতে নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। অন্য কিছু পূর্বে কুমন্ত্রণার সঙ্গে মহারাজবিষয়ক যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাও মনে উদয় হইল। ঈর্ষা, অপমান, অভিমান, অহঙ্কার, এক কালে লাট্রিয়া উঠিল। বলিলেন, “মহারাজ! আপনার মন্ত্রণা প্রকাশ পাইয়াছে। তনিতে পাই মহারাজ মানসিংহ সকল অবসন্ন হইয়াছেন। কচুয়ার! আহা যদি জীবিত থাকে, চীরজীবী হউক, আমি তাহার কৃত কৃতি করিয়াছি। যদি জীবিত থাকে ও মহারাজের শোণিতে তর্পণ করিবে। আমি দাঁড়াইয়া দেখিব। সেটি দেখিলেই আমার মমত্বামসা পূর্ণ হয়। আমাকে অঘোষ বালা পাইয়া কুমতি দিয়াছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। অগাধ নাগরে লক্ষ দিলাম। এখন ভয়নক পক্ষি লুপ্তে পড়িয়াছি। কিন্তু আমার এখনও পরিত্রাণের উপায় আছে, আমি জ্ঞান করিব। দেখি যদি সর্বত্র দিয়াও উদ্ধার পাইতে পারি। আপনার কিন্তু এখনও ভেতসা হইল না। ক্রমে হইবে, তখন বুঝিলেন যে, আপনার জন্ত কি লক্ষা প্রস্তুত আছে।” বিমলা স্থান লাভ্যশরে ধামিলেন। তাঁহার কণ্ঠ শুক হইয়াছিল। উন্নত বক বন বন হুলিতে লাগিল। আরক্ত চন্দ্রদ্বয় ঘুরিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন। “দেবি! তোমার বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে। ক্রান্ত হও, আমি তোমাকে কোম অবস্থ করি নাই। এত ছল রোবে প্রয়োজন নাই। অধিক রাগান্বিত হইলে আত্মকষ্ট ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় না।”

বিমলা বলিলেন। “হাঁ, মহারাজ। আমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছিল, নতুবা আপনার মত পারোত্তর কথার ভুলিষ কেন? কিন্তু এখন স্বভাবস্থ হইয়াছি। তাইত আমার আর মহারাজের বিষয়ক বাক্য সহ্য হইতেছে না। আমি ছলরোষ করিতেছি। মহারাজ যেমন সকল কষ্টেই ছিল আগ্রহ করেন। মহারাজ! আপনার ঐ মিষ্ট চাকুরাই ত আমার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি আর মহারাজের সুখের দিকে সহজে চাহিতে পারি না। মনুষ্য যদি মনুষ্যের ধান্যব্রব্য হইত, (বিমলা দস্তে দস্তে পেশিয়া বলিলেন) তবে আমি আপনাকে চর্কণ করিতাম, কিন্তু তাহা অসম্ভব! আমি কিন্তু অঙ্গ ক্রান্ত হইব না।”

রাজা বলিলেন। “বিমলা! আমার বরসে কাহার বাক্য আমি ভ্রম পাই নাই, তুমি ও ক্রীলোক অবধ্য ও নিবোধ, কিন্তু তুমি বৈরুপ উদ্যাদিনীর মত আচরণ করিতেছ,

তবে তোমাকে প্রকৃত প্রভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু তোমার পূর্ব প্রীতি স্মরণ করিয়া তোমার অবস্থা জানিয়া, আবার অবলম্বন-সম্পর্ক অনুরোধে কিছু বলিব না।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আপনি অত্যন্ত নিমজ্জ। পূর্ব প্রীতি স্মরণ করিতেছেন, কিন্তু তাহার লোবাট মনে লাগিতেছে না। আর সম্পর্ক-অনুরোধ যথেষ্ট স্বাধিরাঙ্কিলেন, যে এখন রাখিবেন। আপনার আর দয়ার প্রয়োজন নাই। আমি বলি- আপনার স্বখান্য শাস্তি দিন। আমি কিছু আপনাকে ভয় করিয়া চলিব না। এখন করুণায় এখানে উপস্থিত হইবে, তখন আপনার সমস্ত কর্ত্ত্বের হিসাব লইবে। মহারাজ! তখনকার চিন্তা করুন, বলন্ত এখনও জীবিত অ’হে; সে আমানিদের সাক্ষী, ধর্ম্ম ক্রমে সকল প্রকাশ করিবে। ভাল, বলি মহারাজ! আপনার কি বৃষ্টি চরিতার্থ হয় নাই? এখনও আপনার সমূহ কুপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। হৃদয়কে প্রীতিবাক্য বলিতেছিলেন। আপনাকে ধিক্! আপনার পাপ আর সংসারে ধরে না। মহারাজ! আপনার দৃষ্ট-বুদ্ধি আপনাকে কত শত ভয়ানক গর্হিত প্রায়শ্চিত্ত-বহীন পাপে লিপ্ত করিয়াছে, তাহা অবগত নহেন। ইন্দুমতীর উপর লক্ষ্য। হা ধর্ম্ম! কিন্তু ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। আপনাকেও শাস্তি দিয়াছে। আপনার লেকেই আপনাকে বন্ধন করিল। পাপের মিলন ক্ষণস্থায়ী। হজুরমল ও গঞ্জানিস কেমন আপনার অভিন্নচিহ্নিত স্বার্থসাধনে যোজিল। ভাল হইল। এখনও ধর্ম্ম আপনাকে এক প্রকারে রক্ষা করিল। মহারাজ! ইন্দুমতী আপনার পাপভোগের ফল! মহারাজ! বসন্তরায় তাহাকে বনে পান বটে, কিন্তু মহারাজ! আপনি জানেন তাহাকে কে বনে ছাড়িয়াছিল? মহারাজ! জয়ন্তরাজ-মহিষীর কি পতি হইয়াছে, তাহা অবগত আছেন? সে যে অবোধ হুঃখিনী বাল্য আপনার চাতুরীতে পড়িয়া এককালে নষ্ট হইল। প্রাণ পর্য্যন্ত দিল এখন আবার তাহারই কস্তার উপর দৌরাখ্য!” বিমলা ধামিলেন।

মহারাজ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ অবাক হইয়া বলিলেন “বিমলা! এটি তোমার উদ্ভূত কপোলকল্প ও ব্যাপার! একখনই সত্য নহে, কেন অকারণ আমাকে কষ্ট দ’ও। দেখ, আমি বালককালাবধি তোমার অনুগত। আমি ইন্দুমতীর হরণাবধরে কিছুই জানি না। আর যদিও আমি তাহার লিপ্ত থাকি, কিন্তু তোমার প্রকৃত মানহানির ভয় নাই। যত্নের পাত্র কখন অবত্রে থাকে না।” রাজা এটি বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত উত্ত্বিগ্ন হইল। মনমথী চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। সম্প্রতি বিমলার সত্যোষ উদ্দেশে রচিত কথা বলিলেন। কিন্তু মল এমনতর অবাধ্য যে, একবার সত্য জ্ঞান পাইলে তাহা শীঘ্র ছাড়িতে সাহস করে না। আবার বুঝিলেন যে, রচা কথা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। কি করিল, অগত্যা চাতুরী আশ্রয় করিতে হইল। কিন্তু অত পরিহার চাতুরী ব্যবহারেও লজিত হইলেন। বুঝিলেন যে

বিমলাদেবী তাহা সমস্ত ভেদ করিয়াছেন। কি করেন, উপায়ান্তর না থাকিতে অন্যথা।
এরূপ করিতে হইল।

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আপনার মধুমাখা গরলপূর্ণ কথাগুলিতে লক্ষ
বিমলা আর ভুলিবে না। আপনার বাহার সঙ্গে আলাপে প্রীতি ভ্রমে, তাহার সহিত
আলাপ করুন। আমাকে এখনও ছাড়িয়া দিন। মহারাজ! উৎকট পানের চিত্তা
ও মনস্তাপ আমাকে জীর্ণ করিয়াছে। নতুবা আমি আপনার যোগ্য উত্তর দিতাম।
আঃ! সে সকল পাপ তাবিলে সংসারে দাঁড়াইবার বল থাকে না।” বিমলার কণ্ঠলব্ধ
সিদ্ধ মূর্তি বিচলিত হইল। তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। বিপদ কাতর চিন্তায় জলিয়া
উঠিলেন। ঐতিহিংস মনকে আক্রমণ করিল। উগ্রতা বিমলা নক্ষত্রবেগে গৃহ হইতে
বাহিরে গেলেন, বেগমমেনে মস্তকের আবরণ খসিল। বিপলিতকেশা বিমলা ঘরের
বাহিরে গিয়া আরক্ত চন্দ্র দিয়া একবার প্রতাপাদিত্যকে দেখিলেন। কণমাাত্র দৃষ্টিতে
যেন পূর্বের আশ্রয়তা তাঁহার মনকে ক্রমে কোমল করিবার চেষ্টা পাইল, অমনি বেগে
অপর দিকে দৃষ্টিমাত্র যেন সে তাবটি মন হইতে অপসৃত করিলেন! আবার প্রতাপা-
দিত্যের দিকে চাহিলে বহুকালের সম্পর্ক যেন তাঁহাকে ক্রমে বন্ধীভূত করিল। তিনি
সৌম্য দৃষ্টিতে প্রতাপাদিত্যের চমৎকৃত মুখ অবলোকন করিলেন। মনে বিপরীত
ভাবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। উত্তর
দিকে সমান। আকৃষ্ট মন কোন দিকেই অগ্রসর হইলে সমর্থ হইল না। বিলম্বে বহু-
মূল ভাব জন্ম হয়। সহস্রাগত ভাব বল পায় না। বিমলার উগ্রমূর্তি পরিবর্তিত
হইতে লাগিল। ক্রমে নয়নের শিখা সকল শিথিল হইতে লাগিল। কুটিল ভ্রু ক্রমে
সরল হইল। জ্বলন্ত শোণিত কপোলদেশ হইতে ক্রমে জ্বলন্ত করিল। ওষ্ঠের শিখা
সকল কোমল হইল। সঙ্কুচিত ওষ্ঠ ক্রমে সরল হইল। স্বভাব পাইল। আহা! যেন
বিমলা শূণ্যোন্মিতার জ্বর লালনাক্ষী হইলেন। মুখে কি চক্রে কোন ভাবই নাই। যেন
নিজীব ক্রমে ওষ্ঠের মূলবর অতি অল্পে অল্পে বস্তু হইতে লাগিল। দৃষ্টি ক্রমে শ্রেণময়
হইল। বিমলা ঈষৎ হাস্যবদন হইলেন। অগ্রসর হইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকটে
আসিলেন। তাঁহার বামহস্তে দক্ষিণ হস্তটি অতি স্নেহের সহিত রাখিলেন। বলিলেন,
“প্রতাপাদিত্য! তুমি বিষময় হইলেও ভ্যাজ্য নও। আমি তোমার কণ্ঠে রাখিব। আমার
নীলকণ্ঠ অপবন হইলেও তোমাকে ছাড়িব না। তুমি আমার এ সংসারের আত্মীয়; এক
মাত্র প্রেমাস্পদ।” বিমলা থাকিলেন। বিমলার আবার যেন চেতনা হইল। বিমলা এক
দৃষ্টে প্রতাপাদিত্যের যেন অন্তরের লক্ষণ দেখিলেন। অল্পে অল্পে প্রতাপাদিত্যের স্বরূপ
হইতে তাঁহার কোমল হাত স্থলিত হইল। নানা চিন্তাময় প্রতাপাদিত্য স্মরণ্য ছিলেন।
সম্প্রতি বিমলার কোমল বাক্যে কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। আবার ক্রমে দেবীর হাত

কর হইতে অশ্রুত হইলে বুঝিলেন, নূতন প্রেমের সৃষ্টি হইতেছে। দেবী স্বীয় মূর্তিতে অতি অমে অমে এক একটি করিয়া কথা বলিলেন। “মহারাজ! আমার আসন্ন-কাল উপস্থিত হইতেছে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি দাঁড়াইয়া জনসমাজে অবমানিত হইতে পারিব না। আপনি আমার বহুকালের আশ্রয়। আপনাকেও সহজে অবমানিত হইতে দেখিতে পারিব না। আপনার উপর অনেক দোষাত্ম্য করিয়াছি। আপনিও তাহা চিরকাল মুখে সহ করিয়াছেন। আমি আপনার আশ্রয়তা ত্রাস-সম্পন্ন হউক বা না হউক, পরস্পরের সুখের জন্য ছিন্ন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন সে আশ্রয়তা কিরূপ তাহা অতি শীঘ্রই ধাৰ্য্য হইবে। প্রথম ও পশ্চিমের মধ্যে বাহ্য বলাধিক্য সে জয়ী হইয়াছে, এখন পরে উহাঙ্গের গুণাগুণানুসারে বেকুপ দাঁড়াইবে তাহা আমি চিন্তিতে সাহস করি না। প্রথম প্রাণবল পর্যন্ত স্বীকার করে। বলতের এখনও শাস্তি আবশ্যক। প্রতাপাদিত্য! তোমার হস্ত দাঁড়া।” প্রতাপাদিত্য ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া বিমলার বিস্তৃত হাত ধরিলেন। বিমলা প্রতাপাদিত্যের হাতটা আপনার কোমল হস্তে ধরিলেন। আহা! কেন চন্দ্র কুমুদিনী স্পর্শ করিল। প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিলেন। আহা! কি মধুর প্রেমদৃষ্টি! তাহাতে কোম রোগের চিহ্ন নহে। কেবল প্রেমময় দৃষ্টি। কিছুকণ পরেই বিমলার চক্ষু দিয়া অক্ষবাহ্য বহিতে লাগিল। বিমলা ধীর মূর্তিতে অকস্মাতে নিতকে অক্ষ ফেলিতে লাগিলেন। আহা! অক্ষবাহিতে করুণময় হাত হইল। কিছুকণ পরেই বিমলা সহসা প্রতাপাদিত্যের হাত হইতে আপনার করকমলটি অন্তর করিলেন। বাম হাতে চক্রে অক্ষ ঘুরে ফেলিলেন। দ্বারাতিমুখে চলিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিমলা! এত শীঘ্র নহে। এত সহসা কেন ত্যাগ কর? বাইও না।” বিমলার হাত ধরিলেন।

বিমলা গভীর স্বরে বলিলেন। “আমার হাত ছাড়!” বলে হাতটি ছাড়াইয়া বেগে গৃহ হইতে চলিল। গেলেন সুপিশিত বাহ্য প্রতাপাদিত্যের প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। প্রতাপাদিত্য নিতকে হইত মুখে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কঠিন প্রাণও গলিল। অক্ষ বহিতে লাগিল। সুন্দরী গৃহের বাহির হইতে সকল দেখিল। প্রতাপাদিত্য কতকণ এই অবস্থার নীচে অক্ষপাত করিলেন। পরে অক্ষ মুছিয়া অমে অমে স্বর হইতে বাহিরে আসিলেন। সুন্দরী সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রতাপাদিত্য তাহাকে কোন কথাই বলিলেন না। অন্তঃপুর হইতে বাহিরে গেলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

“হুয়া তং কুসুমহং হি পালকং ভোক্তব্যোক্ত্যে ক্রতমভিষিচ্য চার্যকং তম্ ।

তস্তাজ্ঞাং শিরসি নিধায় শেবভূগং যোক্ষ্যেহং ব্যলনগতক চারুদন্তম্ ॥”

বজবজের গড়ের সম্মুখে কাটাগঙ্গা পোতচরের উপর নানাবিধ, নানা বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। পোতের কূপকচরের মধ্যে পতাকামালা মন্দ বায়ুতে হুলিতেছে। অৰ্ধ-বানের পার্শ্বে ছোট ছোট ডিক্সি লাগান আছে। তাহে পিপীলিকার শ্রেণীর মত সেনারা অবতীর্ণ হইতেছে। এক এক ডিক্সি লোকে পূর্ণ হইলেই, ডিক্সিটি বাহিরা ভায়ে তাহা-দিগকে নামাইয়া আবার জাহাজের পার্শ্বে বাইরা লাগিতেছে। কুলে মহারাজ মানসিংহ প্রকাণ্ড ছত্দের নীচে দাঁড়িয়া দেখিতেছেন। জাহাজশ্রেণী ও তীরের মধ্যে একখান ডিক্সিতে বন্দীবৃত পুরুষ ও স্ত্রীকুমার দাঁড়াইয়া আছেন। মালিকরাজ একখান জাহাজের সম্মুখ-কূপকে ভয় দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ক্রমে একখানি জাহাজ খালি হইল। পোতকণ্ডার আদেশ মতে নাবিকেরা দূরের বধা ও তীরস্থ কূপক দণ্ডে রজ্জু ও শৃঙ্খলা-কৰ্ণণ করিয়া জাহাজটি অতি অঙ্গে অঙ্গে স্থানান্তরে লইয়া গেল। সেনারা তীরে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ক্রমে সেনাদল সকলেই নামিল। কূল ও উপকূল সেনাসকুলে আবৃত হইল। সকল সেনা জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলে, মালিক-রাজ জাহাজ হইতে কুলে নামিলেন। স্ত্রীকুমার ও বন্দীবৃত পুরুষও কুলে বেখানে মহা-রাজ মানসিংহ ছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মানসিংহ অগ্রসর হইয়া স্ত্রীকুমারের হাত ধরিয়া ছত্দের নীচে আনিলেন। স্ত্রীকুমার বামহস্তে বন্দীবৃতপুরুষের হাত ধরিয়া মানসিংহের সহিত ছত্দের নীচে দাঁড়াইলেন।

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। “জয়ন্তীরাজ! এখন বন্দীদিগকে এই গড়ে রাখিয়া চল রায়গড়ে বাওয়া বাক্। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সায়ংকালের পূর্বেই আমরা রায়গড়ে পৌছিব। অদ্য রাত্রিতেই রায়গড় অধিক্রমণ করিব। তোমার কি পরামর্শ?”

স্ত্রীকুমার বলিল। “মহারাজ! আমার ইহা মনে নীত হইতেছে। সত্য বলিতে কি, বিলম্বে সেনাদলের উৎসাহ হ্রাস হইবে। যেমত জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, অমনি হাত্তা করা ভাল। তবে যে অবতরণকষ্ট, তা সে অতি সামান্য। আর কুচ কিছু অধিক দূরও নয়। শিথিল কুচে রাত্রির পূর্বেই পৌছিব। তাহার পর প্রায় দশ এগার দণ্ড সমস্ত অবকাশ পাওয়া যাইবে। তখন হুখে বিজয় করিতে পারিবে।”

মানসিংহ বলিলেন। “তোমার মতেই আমার মত।” (বন্দীবৃত পুরুষের প্রতি।)
“তবে তুমি একবার দেখিয়া আইস।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহারাজ! আমার ইচ্ছা হয়, আমিও যাই। আপনার কি অনুমতি?”

মানসিংহ বলিলেন। “ভালই ত। কিন্তু আমি বলি, তুমি একটু বিজ্রাম কর। রৌদ্রের তাপ কমিলে আমরা দুইজনে হাতীতে করিয়া পশ্চাৎ যাইব।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহারাজ! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য। কিন্তু আমার বিজ্রাম করিবার আবশ্যক হইবেহে না। অনুমতি করেন ও আমি সেনার সঙ্গেই যাই। আপনার সঙ্গে একত্রে যাওয়ার আমার একান্ত মত বটে, কিন্তু বহুজন গুরুলোকের সহবাস বড় যুক্তিযুক্ত নহে।”

মানসিংহ হাসিয়া বলিলেন। “রাজার এই চিহ্নই বটে। কখন নিশ্চিত থাকিতে ভালবাসেন না। সেনাপর্যবেক্ষণে তোমার অত্যন্ত উৎসাহ। ভাল, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমি পশ্চাতে পৌঁছিব।”

সূর্যকুমার মহারাজের হাত ধরিয়া বিদায় হইলেন। বর্ষাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার উভয়ে পার্শ্বপার্শ্বী হইয়া সেনার নিকট চলিলেন। পথে দুই জন রাজপুরুষ হুটী অথ আনিয়া দিল, উভয়ে অবারুৎ হইলেন। মালিকরাজ কুলে অবতীর্ণ হইয়াই আপন অশ্বে বসিয়াছিলেন, ইহাদিগকে অশ্বে দেখিয়া নি কটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বর্ষাবৃতপুরুষ বলিলেন। “মালিকরাজ! এতজন কোথায় ছিলেন?”

মালিকরাজ বলিল। “আমি সেনাপর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ! এখন রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের সমাচার কি? সে কি কোন উদ্যোগে আছে?”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “প্রতাপাদিত্য আমাদের বজবজে আগমনবার্তা পাইয়াছেন। তিনি সেনাসংগ্রহ করিতেছেন।”

সূর্যকুমার বলিল। “প্রতাপাদিত্য কলে যুদ্ধকোশলে অত্যন্ত দক্ষ। সে যদি সমাচার পাইয়া থাকে, তবে রায়গড় আধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না।”

মালিকরাজ বলিল। “বধেষ্ট সেনা রক্ষিত হইলে রায়গড় কোন মতেই অধিকার করিতে পারিবে না। মহারাজ বসন্তরাত্রেই এমনই কোশল! কলে আমি ও উহার তুল্য গড় আর কুত্ৰাপি দেখি নাই।”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হাঁ গড়টী অত্যন্ত দুর্বল্য বটে, কিন্তু বলের সঙ্গে যদি কোশল যোজন্য করা যায়, কিছুই ভীতিতে পারে না।”

সূর্যকুমার বলিল। “প্রতাপাদিত্যের লবল সেনা গড়ে বর্তমান নাই। আমার জ্ঞান হয়, অন্য রাত্রেই গড় আমাদের পেরে হইবে। কিন্তু আমার একটী আবেদন আছে, সেটী মহারাজ মানসিংহকে বলিয়া তোমাকে সিদ্ধ করিতে হইবে।”

বর্ধারূতপুরুষ বলিলেন। “তোমার অভিমত অগ্রাহ্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। ইহাতে মানসিংহ কোন আপত্তি করিবেন না। তোমার ইচ্ছাট কি?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “রায়গড়ে রেবতীকে বাসস্থান দিতে হইবে, আর তাহার স্মরণার্থে একটি ঘর নিৰ্ম্মাণ করিতে হইবে। আম’র এইমাত্র অভিলষিতি।

বর্ধারূতপুরুষ বলিলেন। “সে বড় কঠিন ব্যাপার নহে। অগে গড় অধিকার হউক।”

মালিকরাজ বলিল। “রেবতী যাহা বলিতেছিল, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। তাহা হইতে অনেক সমাচার প’ওয়া যাইবেক।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “আহা। তাহার সম্বলয় বাক্য-বাল্যচরের মধ্যে হীরকখণ্ড আছে। সম্বোধে ইন্দুমতী পেরিজে বদ্ধ হওয়া ও অন্ধকর্তা প্রভৃতিরও সেই অবস্থার-প্রস্তাব বিষয় রেবতী যাহা বলিল, সমস্তই সত্য হইল। আমার রেবতীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে। আমার কচুরায়ের বাল্যবৃত্তান্ত যাহা বলিল, আমার সত্যজ্ঞান হইতেছে। উমাদেবীর কখন মিথ্যা বলে না। তাহাদিগের বিশ্বাস মনে শূন্য মিত্যার অঙ্গনোষ্ঠ্য থাকে না। সৃষ্টি, বহল নিয়ম ও প্রশালীর সমষ্টি; প্রশালী সৃষ্টি অসম্ভব। রেবতার সকল কথাই মূল আছে, কেবল বিকৃত মনে অঙ্গন দৃষ্টি দিয়াছে। তাহাতে সকল রূপান্তর হইয়াছে। বলভকে এইক্ষেণেই কার্যরূপ করা বিষয়। মহারাজ কচুরায় শুনিবে কখনই একপ নিশ্চয় হইয়া থাকিবে না।”

বর্ধারূত পুরুষ বলিলেন। “রেবতীর কথা কিছু নিতান্ত অমূলক নহে, তবে তাহাই দৃঢ় জ্ঞান করিয়া কোন উৎকট কর্ষে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।”

মালিকরাজ বলিল। “এখন ত কোন মতেই নহে। বলভকে এখন ধরাধরি করিলে সেনামধ্যে একটি নতুন ভাব উদ্ভাবিত হইবে। তাহে আমাদিগের পক্ষে বড় সুখকর ফল প্রসবাবে না।”

বর্ধারূতপুরুষ বলিলেন। “সেও একটি বিশেষ কারণ বটে। বলভ আমাদিগের সন্দেহ কণাকুরেও অবগত নহে। এখন সে আমাদিগকে কোন মতেই ত্যাগ করিতেছে না। পরে স্থির হইলে বিচার করিতে কোন আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “ঐ দেখ, বোধ করি তোমার দূত ফিরিয়া আসিতেছে, চল একটু দ্রুত বাইরা সেনামালার অগ্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাক।”

বর্ধারূতপুরুষ, স্বর্ধাকুমার ও মালিকরাজ একত্রে অগ্রে সেনার পার্শ্বে বাইতেছিলেন, এখন অগ্রে বেগে চালান করিয়া অঙ্গনক্ষেপে সেই সেনানল পার হইলেন। ক্রমে দ্রুতগত চরের সম্মুখীন হইলেন। চর বর্ধারূতপুরুষকে দেখিয়া অগ্রেবেগ সংযত করিল।

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কি হে তোমার সমাচার কি?”

চর বলিল। “মহাশয়! নিম্নীক্সের বশ বুদ্ধি হউক, সমস্ত মঙ্গল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেবামণ্ডল হইতে এই মাত্র আঁসিতেছি। আপনারা কি রায়গড় বাইতেছেন? ভাল সময়, এখন বাইতে অবাধে রাত্রিকালে আক্রমণ করিতে পারিবেন। তবে আমার আর বলবজ্ঞে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।”

চর আপন অব কিগ্রাইল বর্ষাবৃত পুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ অগ্রসর হইলেন। চর পার্শ্ব পার্শ্ব চলিল। কিছুদূর গমনের পর বর্ষাবৃতপুরুষ বলিলেন। “কেমন প্রতাপাদিত্যের সেবামণ্ডলীতে সমাচার কি? কত সেনা বোধ হয়? কে কেমন প্রভুত?”

চর বলিল। “মহাশয়, রায়গড়ে সেনাসমাগম অত্যন্ত অধিক। সকলেই যথোৎসুক। কিন্তু সেখানকার হুই জন প্রধান সেনাপতির অভাবে কিছু গোলাবোগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই হুই জন সেনানী অত্যন্ত সেনাগ্রিয়। সেনারা তাহাদিগের অবর্ত্তমান তথো-দ্য হইয়াছে। কিন্তু হুকুমল বলিয়া একজন অধ্যক্ষের সেনারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে। তাহাদিগের প্রধান সেনাপতি রুম্বীর বাহাদুরের সেনারাও প্রভুত আছে বটে, কিন্তু গড় রূপাভিনয়ে রুম্বীর বাহাদুরের পদান্তর হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের এক প্রকার মনে সন্তোষ জন্মিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের চর, এখানকার সমাচার সমস্ত ও যে আবেদনপত্র মহারাজ মামসিংহের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার নকল রায়গড়ে পাঠায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহা পাঠে অত্যন্ত ক্রোধাধিত হইয়াছেন। তুমিরাছি এখান হইতে একজন প্রতাপাদিত্যের চর কিরিয়া বাইবার সময় পথে বন্দী হইয়াছে।”

বর্ষাবৃতপুরুষ বলিলেন। “এখানে কি আবেদন আসিয়াছে?”

চর বলিল। “মহাশয়, তাহা অবগত নছেন? আপনি তখন সমরীপ হইতে কেহন নাই। সে বড় কল্যাণ আবেদনপত্র। তাহার কাহারও স্বাক্ষর নাই, কিন্তু তনিতে পাই, তাহা নাকি রায়গড় হইতে আসিয়াছে। তাহার প্রতাপাদিত্যের প্রতি অতি উৎকট পাপ ন্মশিয়াছে। আবেদনে লেখে যে, ‘মহারাজ বসন্তরায়ের অকাল মৃত্যুর মূল কারণ প্রতাপাদিত্য’।” বর্ষাবৃতপুরুষ শুনিবারাত্র সিহরিলেন। “তাহার লেখে যে, ‘জয়ন্তীরাজের অকাল মৃত্যুর মূল প্রতাপাদিত্য’।” সূর্য্যকুমার কপোলরাগ বদ্ধিত হইল। “তাহার লেখে যে, ‘জয়ন্তীরাজমহাবীর বর্ষমন্টে প্রতাপাদিত্য-কৃত, শিত্ত বলিকার মৃত্যুর কারণ প্রতাপাদিত্য’।” সূর্য্যকুমার একবার আরক্ত নয়নে চরের দিকে চাহিল। “সেবতী নামে একজন ব্রাহ্মণীর বিদেশে গমন ও মৃত্যুর কারণ প্রতাপাদিত্য। মহাশয়! তাহাতে বসন্ত বলিয়া যে শুক্ল মহাশয় আছে, তাহাকে বিষম পদুপ লিঙ করিয়াছে। আরও কত কথা আছে তাহা আপনারাঙ্গিগের অকণের বোধ্য নহে।”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “কেমন রেবতীর কথা সব লভ্য দাঁড়াইল ?”

বর্ধাকুমার পুরুষ কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শূণ্যদৃষ্টে কি ভাবিতে-
ছিলেন। স্বর্ধাকুমার কোন উত্তর না পাইয়া বর্ধাকুমারপুরুষের দিকে চাহিয়া
দেখেন যে, তিনি আর মোহে আচ্ছন্ন। অবের বল্লাদী তাহার হাত হইতে
খসিয়াছে। বাহ্যিক দুই পার্শ্বে ঝুলিতেছে। স্বর্ধাকুমার বর্ধাকুমার পুরুষের
এই অবস্থা দেখিয়া, কিছু ভাবিত হইলেন। তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া,
নিস্তব্ধ হইলেন। ক্রমে বহুক্ষণ এই ভাবে সকলে ব্যাক্যবিহীন হইয়া চলিলেন।
ক্রমে শিবরাম পুরের মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাঠটি অতি মনোরম।
চতুর্দিকে আর দুই ক্রোশ। তাহার চতুঃসীমায় বন তরুশ্রাদ্ধাদি। এমন কি, তাহা
ভেল করিয়া আর কিছুই দেখা যায় না। বারিষ জঙ্গল মাঠের আর দক্ষিণ সীমা
দিয়া গিয়াছে বর্ধাকুমারপুরুষ মাঠে উপস্থিত হইলে চেতনা পাইলেন। চতুর্দিকে
একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অববেগ ধারণ করিলেন। স্বর্ধাকুমারও সেইখানে স্থির হইয়া
দাঁড়াইল। কখনক পরেই বর্ধাকুমার পুরুষ বলিলেন। “স্বর্ধাকুমার! আমরা এইখানে
সেনা সংস্থাপন করি, কি বল ?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “হাঁ, এই স্থানটি স্বভাবাৱের (১) যোগ্য বটে। এখান হইতে
স্বাক্ষরপুত্র অধিক দূর নহে।” বর্ধাকুমারপুরুষ অথক বারিষ জঙ্গল হইতে উত্তর দিকের
খানেক দূরে নামাইলেন। স্বর্ধাকুমার, মালিকরাজ ও চরটি পতাৎ পক্ষ করিল।
খানেক কূলে বাইরা কি প্রকারে পার হইবেন চিন্তিতে লাগিলেন। সুহৃৎমাঝে অব-
স্থান করিয়া অথক অলে নামাইয়া দিলেন। বেলবান্ অব ভেলে পদদ্বারা অল ভেদিয়া
পারে উত্তরিল। খানেক জল অধিক ছিল না, অন্যায়সে মালিকরাজ, স্বর্ধাকুমার ও চর পার
হইল। পারে উত্তরিলে, কিছুক্ষণ পরে দূরে সেনাসমাগম বৃষ্ট হইল। বর্ধাকুমারপুরুষ
সেনা দেখিয়া তুরী লইয়া বাজাইলেন। কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি হইতে একটি
ধ্বজা উঠিল। তাহার কিছু পরেই সেনাপতি হইতে একটি তুরী বাজিল। ক্রমে
সেনারা বারিষ জঙ্গল ত্যাগ করিয়া উত্তরের খানেকদূর হইতে লাগিল। কখনক
অগ্ন্যগ্ন্যহীরা পার হইল, কেবল পদাতি সেনা ও তোপ অপর পারে রহিল। কিছুক্ষণ
মধ্যে কতকগুলি সেনা আসিয়া নিকটস্থ তাঁর মাটি কটিয়া বাঁশের খোটার মধ্যে সেতু
বন্ধনাশ্রে মাটি ফেলিতে লাগিল। একদণ্ড কাল অতীত হইল না, দিব্য আর
আট হাত প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত হইল। সেতু প্রস্তুত হইলে সেতু দিয়া সেনাদল
পার হইয়া মাঠে নামিল। ক্রমে অধ্যক্ষেরা আপন আপন দল ত্যাগ করিয়া

যেখানে বন্দ্যুতপুরুষ, হৃদ্যকুমার ও মালিকরাজ অথবা দাঁড়াইয়াছিলেন, আলিয়া উপস্থিত হইল।

ও দিকে নেমা। শিবির সংস্থানে নিযুক্ত। কে? বা স্তম্ভাবারের চতুর্দিকে পথিক। () খান আরম্ভ করিল। দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার মঠ হইতে নানা বর্ণ শব্দ পঠিত। চাবিনিক্ হইতে পতাকা, পঞ্জা, আশা, অভয় প্রভৃতি দলদলের চক্ষু দেখা গমন হইল। ক্রমেক পরে বন্দ্যুতপুরুষ আপনার শিবিরে চালাইল। হৃদ্যকুমার ও মালিকরাজ ঈশকে অসমর্থ করিল। চর বিদ্যায় লইয়া চলিয় গেল। আপন শিবিরে যাইয়া বন্দ্যুতপুরুষ অথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও হৃদ্যকুমার মালিকরাজকে বিশ্রাম করিতে কহিলেন। তাহারও অথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া একত্রে শিবির বিশ্রাম করিতে গেল। বন্দ্যুতপুরুষ আপনার বর্ম অঙ্গ হইতে অপহৃত। রিয়া চারপাইয়ে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর হৃদ্যকুমার বলিল “মালিকরাজ! এখনও আমরা দুই কক্ষের একপ্রকার নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু শেষ না রক্ষা করিতে পারিলে অপমানের আর সীমা নাই। যদি আবার প্রতাপদিত্তের—কিন্তু দুট বিবাস হইতেছে, এমত কখনই হইবে না। আমি ও জীবিত থাকিতে তাহার হস্তে নিপতিত হইব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চর বাহা বলিল, তাহার অর্থ কি?”

মালিকরাজ লিল। “হৃদ্যকুমার এখন আমাদিগকে কৃতজ্ঞের কক্ষ প্রবৃত্ত হইতে হইল। আমি মহারাজ প্রাপ্যপাণ্ডিত্যের ক্রৌড়লাস। আমার পাঁচ পুরুষ ঐ বংশের অগ্রে পালিত, এখনও আমি তাঁহার দানত্ব পৌর করিয়াছি। কিন্তু এখন দুই দিন শুষ্ক পালে লিপ্ত হইলাম কি রি? কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। একেই ত রাজার বিপক্ষে যন্ত্রণার মহা বিষয় পাশ, তাহে অবার স্বজাতী। রাজার বিপক্ষে যবনের দলভুক্ত। রাজা আবার তাহে প্রভু। আগার হয় ত যুদ্ধের সময় আমার পিতার উপরই অস্ত্র চালাইতে হইবে। এদিকে আমার প্রাণনয় বন্ধুর মনুষ্য-বোধ। অমরোচ্চই বা কেন? আমার একান্ত শেষ আলিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হৃদ্যকুমার! আমার যুদ্ধ করিতে কোন ক্রমে মন উঠিতেছে না। যুদ্ধে আমার ধর্ম-লাভও নাই, তবে এমতাত্রে প্রেমপাশে আমি বদ্ধ আছি। তাহা কাটাইতে পারি না; পারিলেও চাহি না। কিন্তু তোমার মনের ভাব কিরূপ?”

হৃদ্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ! সত্য বলিতে কি, ইতিপূর্বে আমার এক একবার এটি কৃতজ্ঞের কক্ষ বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু ইন্দুমতীর উপর অস্ত্রার দোষাত্মক দেখিয়া আমার সে জ্ঞানটি টলিল। পরে রেবতীর কথায় আমার প্রতাপ-

দ্বিত্যের উপর আত্মক্লেদ জন্মিল; আবার এই চরমুখে বাহা তুলিলাম, তাহার আমার বোধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যকে বহুস্তে নষ্ট করিলে কোন সংকল্প সিদ্ধ হইবে। আমার অস্ত্র চিন্তার লেশমাত্র নাই। কিন্তু বলিতে কি, তোমার অস্ত্র আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছি। তোমার অবস্থাটি স্বভদ্র। তোমাকে এক প্রকার পিতার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে হইবে। মালিকরাজ! আমার হৃদয় সিহরিভেছে। আমি অধীর হইতেছি। বলি, তুমি এখনও নিবৃত্ত হইতে পার। আমার পক্ষ তোমাকে করিতে যদিচ আমার বিশেষ বন্ধ হইতেছে, কিন্তু তোমাকে আমি বলিতে সাহস করিতেছি না। ভাল, আমার জ্ঞান হইতেছে যে, তুমি এ চরের প্রকাশিত ও রেবতীপ্রোক্ত সকল সম্ভারের মিগূঢ় জন। তোমাকে আমি কতবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে নানা প্রকারে ছলিয়াছ; কখন স্পষ্ট বলিলে না। এখন আমি একমাত্র কথা তোমার জিজ্ঞাসা করি। সকল জিজ্ঞাসিলে তুমি বলিবে না। কিন্তু প্রেমের খাতিরে অবশ্য একটির প্রকৃত সুর উত্তর দিবে।”

মালিকরাজ স্বর্ধাকুমারের স্বক্কে হাত দিয়া বলিল। “স্বর্ধাকুমার! তোমার নিকট কোন কথা আমার গুপ্ত আছে? এমন কি কথা আমি জানি বাহা তোমাকে বলি না? আমি কখন তোমাকে ভেদ জ্ঞান করি না। তবে যে তোমার সকল প্রেমের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ স্বভদ্র। নেতী কেবল তোমার মঙ্গলশয়ে। বল, কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে?”

স্বর্ধাকুমার বলিল। “মালিকরাজ! ইন্দুমতী কে? আর মহারাজ বসন্তরায় তাহাকে কোথায় পান? অমাকে এই উত্তরটি দাও। আমি তোমার বুদ্ধের পূর্বে আর কোন কথাই জয় বিরক্ত করব না।”

মালিকরাজ বলিল। “স্বর্ধাকুমার! তোমাকে অসন্তোষ কিছুই নাই। তুমি আমার হৃদয়বন্দিত।” মালিকরাজ পার্শ্বে ফিরিয়া স্বর্ধাকুমারের গলদেশ আক্রমণ করিয়া কর্ণে কর্ণে একটিমাত্র কথা বলিল। স্বর্ধাকুমার অমনি চমকিয়া উঠিল। পর্ধকে উঠিয়া বলিল। কণেক এমুঃ মালিকরাজের শ্রেতে চাহিয়া রহিল। ক্রমে স্বর্ধাকুমারের নিবাস রোধ হইতে লাগিল। ক্রমে বকোবেপন বুদ্ধি পাইল। স্বর্ধাকুমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ভোগ করিয়া অনর্বাণ অক্ষ নগর ভ্রমিতে লাগিল। ক্রমে রোদনে অরপ্রায় হইল। কণেক পরে রোদন করিতে করতে মালিকরাজের গলদেশ ধারণ করিল। পরে তাহার বকে মুখ রাখিয়া রোদন করিল। কতক্ষণ পরে মুখ উঠাইয়া মালিকরাজের চক্ষের দিকে চাহিল। মালিকরাজও হুই বস্ত্রে তাহার গণ্ডদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। হুই বস্ত্রে এই রূপ নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া, কতক্ষণ অক্ষপাত করিলেন। ক্রমে উভয়ের অক্ষ মিশিল। কিছুক্ষণ পরে পরস্পর পরস্পরের বন বন মুখ চুম্বন করিয়া গাত্রোখান করিলেন।

হৃদয়কুমার বলিল। “মালিকরাজ ! তবে রেবতীর কথাগুলি সকল সত্য ; বাহা হউক, এখন প্রতাপাদিত্যকে বহুতে না ক্ষেদ করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব না ।”

মালিকরাজ বলিল। “হৃদয়কুমার ! তোমার যাহা অভিরূচি হয় করিও, কিন্তু বহুতে তাহার প্রাণ নাশ করিও না । একদিন হউক বা দুইদিন হউক, সে তোমাকে অন্ন দিরাছে । সেটি তাবিও ।”

হৃদয়কুমার বলিল। “তুচ্ছ তাই কেন, সে যে সরমার পিতা । আমা হইতে তাহার শরীরে আঘাত করা হইবে না । কিন্তু মালিকরাজ ! তুমি দেখিও, আমার পক্ষে সংসার অসার হইল ।”

বর্ধারুত পুরুষ সম্মুখে আলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন। “হিগো রাজজামাতা ! মহারাজ মানসিংহ আলিয়া পৌছিরাছেন, সে বার্তা জান ? তিনি তোমাকে স্মরণ করিরাছেন ।”

হৃদয়কুমার হাসিতে হাসিতে গাত্রোখান করিল। আপন বর্ধাদি অঙ্গে বোজলা করিল। পরে মহারাজ মানসিংহের শিবিরান্তিমুখে যাত্রা করিল। মালিকরাজও অনুসরণ করিল।

এদিকে মহারাজ মানসিংহের শিবির-সম্মুখে একাঙ চম্রোতপ পড়িয়াছে। চতুর্দিকে সেনারা গভীরত করিতেছে। মহারাজ মানসিংহ উচ্চ আসনে বসিরাছেন। সর্বাঙ্গ বর্ধারুত। তাহার সম্মুখে একখানা একাঙ অতি বিস্তৃত কাঠের উচ্চ পাদ-মক (১) পাতি আছে। তাহার চতুর্দিক বস্তকগুলি চৌকীতে প্রথম প্রথম সেনানী। মেজের উপর বস্তকগুলি মানচিত্র বিস্তৃত আছে। চম্রোতপের চতুর্দিক অবাগ্নোহী প্রহরীরা রক্ষা করিতেছে। ক্রমে হৃদয়কুমার ও মালিকরাজ চম্রোতপে প্রবেশ করিলে কিছু পরেই বর্ধারুতপুরুষও তাহার উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ সকলকে বধাযোগ্য সম্মান করিলে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইল। পরে মানসিংহ আপন আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোখান করিলেন, সভাভঙ্গসূচক জুরী বাজিল। সকলে সঙ্গত্রে গাত্রোখান করিল। মহারাজ মানসিংহ সকলের হস্ত স্পর্শ করিয়া বিদায় দিলেন, তাহার। ব ব কর্ণে চলিয়া গেল। কেবল বর্ধারুতপুরুষ, হৃদয়কুমার ও মালিকরাজ অবস্থান করিলেন।

বর্ধারুতপুরুষ বলিলেন। “মহারাজ ! অমোদিনের উপর বিশেষ বিশেষ কর্ত্ত নিয়োগের আজ্ঞা হউক।”

মানসিংহ বলিলেন। “তুমিত একজনকার বর্ত্তমান সমস্ত সমাচার অবগত আছ। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কত সেনা, কত সেনাপতি, কে কেমন কোশলী ও বলবান্ ;

ও কে কোন স্থান রক্ষায় তার লইরাছেন, তাহা বিশেষ জ্ঞাত আছি। সেদামধ্যে বাহার বেরণ ভাব ও যে বত দূর দক্ষ, তাহাও তোমার অগোচর নহে। রায়গড় অত্যন্ত কঠিন হুর্ভেদ্য দুর্গ তাহার গঠনপ্রণালী অতি কৌশলগর্ভ। তাহার যে স্থানে বত তোপ ও যে যে মুরচা বত বলবান ও সেনারক্ষক তাহাও তোমার অবদিত নাই। গড় মধ্যে মহারাজ স্বীয় ভেজমী পুণ্যবান বীরচূড়ামণি জগন্নাথ দিল্লীবরচক্রিত বসন্তরায় বাহা-
দুরের বুদ্ধি কৌশলে দুইটি অতি গুপ্ত স্তূপ আছে। তাহাদিগের দ্বার গ্রামের প্রান্তে। সে স্থলে সেনা রক্ষা করা তোমার মত, আমি অবগত আছি। এ দিকে অতীত জ্যোতি-
দ্বান জিহাদিগ সাহেব সেদানল বত বলবান ও সোৎসুক, তাহাও তুমি জান। আর দিল্লী হইতে আগত সেনানীরা এই সভায় সকলেই বর্তমান ছিলেন, তাহাদিগের প্রত্যেকের বল ও বুদ্ধি অবগত আছি। এ সকল অবস্থায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে যে প্রকারে পরাজিত করা যায় ও হুঃসহ দুর্গ যে প্রকারে অধিকার করা যায় ও মহারাজ প্রতাপা-
দিত্যের জ্যোতি বাহাতে দিল্লীসম্রাটের সম্মুখীন করা যায়, বাহাতে সে জ্যোতি আমা-
দিককে পর্যন্ত জ্যোতিদ্বান করে, এরূপ উপায় কম। তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণ। সম্মুখে প্রশংসা করা উচিত নহে, তোমার বেরূপ সম্মুখিত বোধ হয়, সেইরূপ সেনা সংস্থাপন
কর ও দুর্গ আক্রমণ কর। দিল্লীবরের নিরোজিত সেনাপতিরা বধাবিধি স্ব স্ব অধিকৃত
বশবর্তী সেনা চালন করুক। জয়সীরাজপুত্র সূর্যকুমার ও বিজয়র সচিবপুত্র মালিকরাজ
উভয় পক্ষে রক্ষা করুন। তুমি কতকগুলি সেনা লইয়া যেখানে বলাভাব বোধ হইবে,
উপস্থিত হইবে। ঐ মানচিত্র দেখ। রায়গড়ের সম্মুখে দ্বারের আঙ্গলে অধিক সেনার
স্থান নাই।”

মহারাজ মানসিংহ সেই মানচিত্রটি মকে বিস্তারিলেন। বর্খাবুতপুরুষ, সূর্যকুমার ও
মালিকরাজ মকের উপর ত্বর দিয়া মানচিত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ
মানসিংহ দুই দুই কাঠে দুই বর্ষের সেনাপংক্তি বধাবিহিত স্থানে নিরোজন করিলেন
ও ক্রমে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সেনা-চালনাদি করার বিধিবিহিত পরামর্শ ও
আজ্ঞা দিলেন। মাকে মাকে বর্খাবুতপুরুষ, মালিকরাজ ও সূর্যকুমার বধাজ্ঞান মন্ত্রণা
দিলে অবশেষে আক্রমণপ্রণালী নির্ধারিত হইল। ক্রমে চারি সেনাপতির চক্রে
উৎসাহ ও জর দৃষ্ট হইল। এইরূপ প্রায় দুই দশ কাল বিবেচ্য বিবেচিত হইল।
পরে মহারাজ মানসিংহ চম্ভোতপ হইতে বাহিরে গেলেন। সূর্যকুমার, মালিক-
রাজ ও বর্খাবুতপুরুষ অনেককণ মানসিংহপ্রোক্ত মন্ত্রণা শুনি আন্দোলন
করিলেন। পরে ক্রমে এক এক জন করিয়া পঞ্চ-বাক্সিরা আসিয়া উপস্থিত
হইল। ইহার তিন জনে তাহাদিগকে বধাবোধ্য, আজ্ঞা ও উপদেশ দিলে
তাহারা চলিয়া গেল। স্ব স্ব শিবিরে বাইরা সহস্র সেনাপ্রজাবিন্দকে বিধিবিহিত

আদেশ দিলে সেই আদেশ শতাধিক ও দশাধিক অবশেষে প্রত্যেক সেনা অবগত হইল।

এই মতে মহারাজ মানসিংহের আজ্ঞা ও অভিমত অতি অল্প সময়ে হুচাক-রূপে সমস্ত সেনাসমুদায় প্রচারিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে আজ্ঞা দানে কোন গোল-বোণ উপস্থিত হইবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। নির্দিষ্ট সময়ে একটি তুরীও বাজিল না, একটি দামামার শব্দও হইল না। অথচ সেনাসমূহ সদজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইল। পরে সেনারা নীরবে আপন আপন অধ্যক্ষের পশ্চাৎ হইয়া গোহুলি অন্তঃরায়গড় ভিত্তিতে যাত্রা করিল। এমন স্থানান্তরিত সেনাদল ও বলঃগুলীতে এমন শৃঙ্খলা যে, এত সেনা পথে বাত্মা করিল বটে কিন্তু পাদক্ষেপশব্দ ব্যতীত আর কিছুমাত্র শব্দ হইল না। ক্রমে চতুর্দিকে অন্ধকার হইয়া আসিল। সেনারা আপন মনে নীরবে ঘারীর জাগাল ছাড়িয়া চলিয়াছে, কোন শব্দটি নাই! কেবল পর্য্যায়ের (১) ও বস্ত্র পাছকাণ্ডির মস্ মস্ শব্দ। অন্ধকার হইলে মহারাজ মানসিংহ একটি অশ্ব আর চতু হইয়া প্রত্যেক সেনার পার্শ্বে বাইয়া কাহার স্বরূপ দেশে হস্ত দিয়া আদর করিলেন, কাহাকেও বা মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। সকলে লইয়া এইরূপে প্রীতিভাভে চলিতে লাগিলেন।

বর্ষাবৃতপুরুষ স্বর্ঘ্যমুখর ও মালিকরাজ একত্রে অশ্ব বাইয়েছিলেন। ক্রমে বাগড়ের নিকটস্থ হইলে সেনারা থামিল। বর্ষাবৃতপুরুষ অগ্রসর হইয়া পূর্বাভ্যু প্রেরিত সেনা-দলের নিশ্চিতে সেতুচরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইলে দেখেন সেনারা সন্ধ্যার পর কতকগুলি সেতু বঁধিয়া, আর কতকগুলি অতি দীর্ঘ হই সম্পন্ন করিবে। সেই সকল সেতু দিয়া সেনারা গারীর জাগালের দক্ষিণ খাদ পার হইল। কতকগুলি সেনা মালিকরাজের অগ্গে গারীর জাগাল বহিয়া অতি সতর্কণে রায়গড়ের নিকটস্থ হইল। পরে উত্তরের খাদ পার হইয়া ঘুরিয়া দূর দিয়া বাগড়ের পূর্ব প্রান্তে বাইয়া উপস্থিত হইল। বাকি সেনা কতকগুলি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে উত্তরের মাঠে বাইয়া দাঁড়াইল। কতকগুলি পশ্চিমের মাঠে দূর দাঁড়াইল। স্বর্ঘ্যমুখর আপন সেনা লইয়া রায়গড়ের পশ্চিম দিকে দাঁড়াইল। বর্ষাবৃতপুরুষ একবার ক্রতপনে মালিকরাজের সেনাচরের অবস্থা ও ভোপসংস্থান দেখিয়া আসিলেন। ক্রমে রাত্রি শিক হইতে লাগিল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর রাগড়ের প্রধান ঘর রুদ্ধ হইল। তাহারই অব্যবহিত পরে বাগড়ের মুরচা হইতে নিত্য ভোপের একটি শব্দ হইল! সেনাবিশ্রামের তুরী বাজিল। আক্রমণী সেনারা কিন্তু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ভজহারি অতি বেগে অশ্ব আনিয়া

মালিকরাজকে কি বলিয়া গেল । তাহার অনভিবিদ্যে সৰ্ব্ব চিহ্নিত বর্ষাবৃত্ত পুরুষের ভীষণ তুরোধনি হইল । তুরোধনি দূরের বনে মিলিতে না মিলিতে রায়গড়ের পূর্ব ও পশ্চিম দিক্ এককালে ধ্বংস করিয়া জলিয়া উঠিল । অমনি এককালে এক শত তোপের শব্দ শুনা গেল । ভীম শব্দে অগ্নি কাঁপিল ধূমে চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন হইল ! এমতি দিল্লীখবরের সেনামণ্ডলীতে শ্রদ্ধা লাগে, পূর্বদিকে মালিকরাজের তোপচয় অগ্নে, না পশ্চিমস্থ স্বর্ধাকুমারের তোপচয় অগ্নে অগ্নি ও ধূম উৎপাদিত, কিছুই স্থির নাই । তাহারই পরে জুলতান রণবাণী উভয় দিক্ হইতে বাজিয়া উঠিল । তাসা, দামামা, তুরী ভেরী শব্দে সেনাসমূহ উত্তেজিত হইল । তোপধ্বনির প্রাতিধ্বনি দূরের মাঠ পৌছিতে না-পৌছিতে আবার স্থানান্তরকরে অগ্নিময় হইল । বেধ হইল যেন, পাবক স্তম্ভিমাস্ হইয়া মুখ ব্যাদানপূর্বক রায়গড় গ্রাস করিলেন । স্বর্ধাকুমার ও মালিকরাজ উভয় দিক্ হইতে বন বন তোপ চালাইতে লাগিল । একবার এখানে দাঁড়াইয়া একবার বা হাসা-জর হইতে তোপ চলিল । মুহূর্ত্ত মধ্যে রায়গড়ের ভিতর তন-কোলাহল শোনা গেল । দুর্গমধ্যে তুরী, ভেরী প্রভৃতি রণবাণী বাজিয়া উঠিল । ক্ষণেকে গড়ের মুরচা হইতে তোপ চলিতে লাগিল । গড়ের ভিতর যদিচ মহারাজ প্রতাপাদিত্য মহারাজ মানসিংহের বজবজ্ঞ-আগমনবার্তা পাইয়া ঘূড়ের সমস্ত আয়োজন করিতেছিলেন ও গড় হইতে বাহির হইয়া অন্তরে মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন মনন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত সেনা এখনওক আসিয়া পৌছায় নাই বলিয়া একপ্রকার নিকাম ছিলেন । যে চর মহারাজ মানসিংহ ও বর্ষাবৃত্তপুরুষের সৈন্য রায়গড়াভিমুখ বাতীর সন্ধান আনিতেছিল, পথিমধ্যে সে বন্দী হওয়ায় প্রতাপাদিত্য সে সমাচারটি এখনও পান নাই । নকুবা এত সেনাসমাগম বার্তা অবশ্য প্রতাপাদিত্যের কর্ণে উঠিত । ঐতিহাসিক সত্যাদির ত্যাগ করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন আবাসে গিয়া আহাৰাদি সমাপনে একবার বিমলাদেবীর গৃহে যান । ওখায় সমাক্ষসমানৃত হন না । বজ্রধ্বনি বিমলার সঙ্গে বাজ-বিভক্ত হয় । এমত সময় রায়গড়ের এই ব্যাপারটি উপস্থিত হইল । বিজয়রক্ষ, ককনাথ ও হজুরমল সভা ত্যাগ করে নাই । প্রথম তোপশব্দে সন্নিবাসিত ব্যস্ত হইল । পরেই প্রতোলীপ্রাকারের প্রহরী উপস্থিত বিদ্যের বার্তা দিলে তিন জনে সেনা প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া সভা হইতে বাহির হইলেন । সেনারা সজ্জ হইয়া মুরচার উপর বাইতে লাগিল ! এ দিকে মহারাজের আবাসমন্দিরে সমাচার গেল । মহারাজ তথায় নাই শুনিয়া, বিজয়রক্ষ চিহ্নিত হইল । তাহারই অব্যবহিত পরে মহারাজ বর্ষাবৃত্ত হইয়া বেগে চতুর্দিক্ পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে ছল । সেনা মণ্ডলীতে দাঙ্গা ও উৎসাহ দানে সকলকে এককালে উত্তেজিত করিয়াছেন । মুরচা হইতে সেনারা শব্দ চালাইতে লাগিল ও প্রতোলী প্রাকার হইতে, বন বন তোপ চলিতে লাগিল । অক-

কার থাকার মুহূর্তাহ সেনারা সন্ধান লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিন্তু ভোপের গোলা উঠহান হইতে নিকট হওয়ার দূরে বাইরা নৃধাকুমারের ও মালিকরাজের সেনা-বণ্ডসীতে নিরা পড়িতে লাগিল, তাহাদিগের সেনা এক স্থানে ছিন্ন না থাকার আর অত্যন্ত দূরে অবস্থান করার বিশেষ আশাত প্রাপ্ত হইল না। কিছুকণ এইরূপ উভয় পক্ষের বন বন ভোপ ঢালানের পর নৃধাকুমার আপনায় সেনা লইয়া সহসা মাঠ ত্যাগ করিল ও ভোপ সকল ঢালান বন্ধ করিয়া, দূরে চলিয়া গেল। এ দিকে পড়হ সেনারা পশ্চিমহ বিপক্ষের কিছুকণ ভোপনক না পাইয়া বুঝিল যে, তাহারা পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু মালিকরাজ দিকট হইয়া, ভোপ ঢালান হুরুহ জানে আপন সেনা অন্তর করিল। প্রতাপাদিত্যের সেনারা উৎসাহ পাইয়া বলে গোলা ও বাণ নিক্ষেপিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্যের ভোপ মুরচা হইতে ঢালাইবার পর ও পুনর্বীর প্রভৃত হইবার পূর্বে মালিকরাজ সহসা এমত বেনে ভোপের অধ ঢালন করিল যে, চক্ষের সিমেষ পড়িতে না পড়িতে মালিকরাজের ভোপের মুখ প্রায় সারগড়ের পরিধার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতাপাদিত্যের সেনারা অন্ধকারে সেটি লক্ষ্য করিতে পারিল না। পূর্বের ভোপে ভয় নিরা পূর্বলক্ষ্যে ভোপ ও শর বোজন করিয়া গোলা ঢালাইল। কিন্তু গোলা ভোপ হইতে বহির্গত হইতে না-হইতে মালিকরাজের ভোপসমূহ হইতে এককালে বিবম বেনে অতি বিশাল অগ্নি উল্গাশিল। ভোপ অত্যন্ত নিকট থাকতে গোলা অতি বেনে বাইরা প্রতালী প্রাকারহ ভোপে ও গোলন্দাজ সেনাদিগকে এককালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেনারা নিকট বিপদ দেখিয়া আর অকস্মাৎ এত ভোপের বল সহ করিতে অক্ষম হইল। মালিকরাজের এক পড়িত্ত ভোপ গোলা কেলিয়া পূঁচাং হইতে না-হইতে অপর পড়িত্ত অঙ্গলয় হইয়া তাহারই অব্যবহিত পরে, আবার মুরচার উপর ও প্রতালী প্রাকারে গোলা মাগিল। এইরূপ উপর্যুপরি চার পাঁচ বার ভোপ ঢালানতে, সে দিককার প্রতালী প্রাকার প্রায় সেনাবল হীন হইল। কিন্তু সেই ভয়ানক নৃত্যচীৎকারের মধ্য হইতে সর্বচিহ্নিত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভীম বর ভগ্না গেল। মহারাজ বরং প্রতালী প্রাকারে ও প্রতি মুরচার ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যেক সেনাকে উৎসাহ দিতেছেন। যেখানে বলাকাব বোধ হইতেছে, সেই খানেই উপস্থিত হইতেছেন। সেনাদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রতীকের প্রাকার পার্শ্বের মুরচা হইতে ভোপ ঢালাইতে আজ্ঞা দিলেন। সমুখের ভোপের গোলা নিকটহ বিপক সেনাকে কোনক্রমে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাকার মধ্যহ গবাক হইতে শর ও তুলি ঢালাইতে বলিলেন। সেনারা রাজসমুখে অতীব উৎসাহ পাইয়া প্রতীবপার্শ্বের (১) মুরচা ও নিম্নহ প্রাকারের

পর্বাঙ্কুর দিয়া শত্রু নিকোপ করিতে লাগিল । মালিকরাজ অতি নিকটে থাকিয়া অস্ত্রবেগ সহ করা অনন্তব জ্ঞানে ক্রমে হঠিয়া স্থানান্তরে আক্রমণ করিল । মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সেনা গড়মধ্যে বর্তমান ছিল না । কাজে কাজেই গড়ের সকল অংশ এককালে স্বকণে অগ্নি । স্থানান্তরে মালিকরাজ আক্রমণ করিবারাত্র, প্রতাপাদিত্য আপাততঃ কিছু চঞ্চল হইলেন । মাঠে সেনা সকালন অতি সুলভ বলিয়া মালিকরাজ কণে আক্রমণের স্থান পরিবর্তন করিতে লাগিল । কিন্তু গড়স্থ সেনাদিগের পক্ষে উত্তম নীতি নব-আক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর হইতে লাগিল । কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ক্ষুণ্ণিতে সে কষ্ট লক্ষ্য হইল না । কণে এখানে, কণে ওখানে, যে স্থানে মালিকরাজ আক্রমণ করে, অমনি সেইস্থান হইতে তোপ চালাইতে লাগিল । এইরূপে কিছুক্ষণ একদিকের যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমে চতুর্দিক হইল । মালিকরাজ এরূপ অস্থির রূপে প্রাকারভেদ অনন্তব জ্ঞানে কিছু ভাবিত হইল । এতক্ষণ অন্ধকারে অলক্ষিত হইয়া বধেচ্ছা সফল করিতে-ছিল, কিন্তু এখন জ্যোৎস্নার সেটি অনন্তব হইল । যে স্থানে মালিকরাজের সেনা দাঁড়াইয়া অস্ত্র চালায়, অমনি সেই স্থানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভীষণ তোপচয়ের আনুশ্রুতি ভয়ানক গোলাচয় আসিয়া উপস্থিত হয় ।

এ দিকে গড়মধ্যে রণবীর বাহাহুর ও হজুরমল এক প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়া তোপ চালান দেখিতেছিল । বিজয়রুক ও প্রতাপাদিত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, রণবীর বাহাহুর বলিলেন । “মহারাজ ! অচুমতি করেন ত, এই সময় সিংহাসন হইতে বাহির হইয়া ঐ সেনার পশ্চাৎ আক্রমণ করি ।”

প্রতাপাদিত্য কৃকলাধের কথা শুনিবামাত্র অচুমতি দিলেন । কৃকলাধ ও হজুরমল অমনি দাকর হইতে নামিয়া, হুগুহ মাঠে রায়দীঘির পূর্বপাড়ে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিল ।

বাহিরে মালিকরাজ সেনাকয়-ভরে একবার দূরে হঠিয়া গেল । প্রতাপাদিত্য সন্মুখ হইতে লক্ষ্য করিয়া তুরী দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কৃকলাধকে নীতি বাহির হইতে আজ্ঞা দিলেন ।

এদিকে চতুর্দিক হইবামাত্র সূর্য্য:মার অজে মাঠ পার হইয়া আপন সেনামণ্ডলী দ্বারা গড়ের দায়ের নিকটে খানিয়া উপস্থিত করিল । তাহাঃ মন ছিল, মালিকরাজের সেনার সঙ্গে যোগ দিয়া এককালে পূর্বদিক আধিকার করে । এ দিকে বন্দ্রবৃত্ত প্রকৃষ পেলা লইয়া ক্রমে মালিকরাজের সেনার সহিত মিলাইয়া গেলেন । উভয় সেনা একত্র হইবামাত্র সূর্য্যকুমারের সেনার অস্ত্র অপেক্ষা না করিয়া, এককালে বিহম বেগে পূর্বদিক আক্রমণ করিলেন । মালিকরাজকে হঠাৎ হঠিয়া বাইতে দেখিয়া, আর তোপ চালান ব্যর্থ জ্ঞানে, প্রাকারস্থ প্রতাপাদিত্যের সেনা একবার দূরে হইয়া দাঁড়াইল । এতদূর মালিক-

রাজের সেনারা হঠিয়া পেছে যে সেখানে ভোপের গোলা কোন ক্রমে পৌঁছে না। বর্ষাবৃত পুরুষ বিপক্ষ সেনাকে নিরস্ত দেখিয়া এত বেগে পূর্বদিকে আক্রমণ করিলেন, ও এত অধিক তোপ এককালে এত নিকটে যোজন্য করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মুরচা ও প্রাকারস্থ সেনারা এককালে অবসর হইল। কণ্ঠকে প্রাকার হইতে শত শত সেনা নিপাতিত হইল। তখন কাহার সাধ্য অগ্রসর হইয়া তোপে বারুদ দেয়! প্রতাপাদিত্য অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিলেন ছিন্ন করিয়া, অপর প্রগ্রীৱ হইতে তে প চালাইবেন মনন করিলেন। আর কৃষ্ণনাথের সাহসে অধিক ভয় দিয়া তাহাকে নীত্র বার হইতে বাহিরে দিয়া আক্রমণ করিতে আদেশিলেন। অতি বেগে হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ সেনা লইয়া, দ্বারের নিকট ঘাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বারটি বিষম শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। তুরায় শৃঙ্খলা খোলা দুক্লহ। অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু গ্রন্থি সকল ব্যস্ত হওয়ায় আরও জটিল হইল। অগত্যা মিস্ত্রি দ্বারা শৃঙ্খলাচর কাটিতে আদেশিলেন। লৌহকারেরা যন্ত্রাদি দ্বারা ভীম আঘাত করিতে লাগিল।

স্বর্ধাকুমার সেই সময় দ্বারের জাদাল দিয়া দ্বার পার হইতেছিলেন। দ্বারের ভিতর অতীব তীব্র ভীম ধরের নিনাদ শুনিয়া, সেনাদলকে সেখানে অবস্থান করিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি অথ লইয়া, দ্বারের নিকটবর্তী হইলেন। ভিতরে সেনাচরের গোলযোগ ও বস্ত্রশব্দ শুনিয়া বুঝিলেন, দ্বারটা হীনবল আছে, ধ্বংসের দ্বারা নৃতল লৌহখণ্ড সকল বেগজনা হইতেছে। অতএব এই সময় দ্বারে আক্রমণ করিলে অবশ্যই ভাঙিতে পারিব। অমনি কিরিয়া আসিয়া সেনামণ্ডলীকে দ্বারের সম্মুখে সেতুবন্ধনে অনুমতি দিলেন। সেনারা মহোৎসাহে সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল।

ও দিকে বর্ষাবৃত পুরুষ দিব্য সুযোগ বুঝিয়া বেগে পরিবার তীর পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পরিখা জলে পূর্ণ থাকায় কোন সুযোগে পার হইবার উপায় পাইলেন না। দেখিলেন যে, সেতুবন্ধের অবকাশ নাই। কণ্ঠকে আমাদের তোপ চালান বন্ধ হইলেই বিপক্ষেরা আপন আপন তোপ অধিকার করিবে, আর বিপক্ষের তোপচর তাহাদিগের বশীকৃত থাকিলে দিল্লীসেনার অত নিকটে থাকা দুক্ল হইবে। চকিতেই স্তায় চিহ্নিয়া বন বন তোপ চালাইতে অনুমতি দিলেন, আর আপনি একবার খান্দে খেড়র নামিলেন। খান্দে নামিয়া জল অন্ন দেখা মালিকরাজকে ডাকিয়া বলিলেন। “সাহসীরা জরা হইবে ও আমার পাতৃ আইস।” বর্ষাবৃত পুরুষের কথা সাজ হইতে না-হইতে মালিকরাজ আর প্রায় দুই সহস্র অমিতভেজা অতীব উগ্র অথারোহী এক কালে খান্দের জলে লক্ষ দিল। এত অথারোহীর এব কালে লক্ষ দেখাওতে খান্দের জল প্রাণিত হইল। চকিতেই অস্ত্র জলবন্দোলে কাহাকেই দেখা গেল না। ও দিকে তীব্র তোপ পচয়ের অতীব উচ্চানক পেলা উর্দ্ধ দিয়া চারপাশের পাহাড়ের

প্রাচীরে ও তাহার উপরস্থ সেনাভয়ে আঘাত করিতে লাগিল। তোপের ধ্বংসে
হুল অধিকার হইল। আর তোপের শব্দে ভলগ্ন বন কোলাহল জ্বলিতগত হইল
না। খাদ্যটি কর্দ্দময় হইয়া গেল। নিমেষমাধ্যে দিল্লীর ছই সহস্র অধারোহী
সেনা রায়গড়ের প্রাচীর স্পর্শ করিল। অথ হইতে অবতীর্ণ হইতে নিমেষমাত্র
পাড়িল না। অবতীর্ণ হইয়া বর্ষাবৃত পুরুষ রায়গড়ের প্রাচীরে কৌলক যারিতে
আরম্ভ করিলেন। কণেকের মধ্যে প্রায় ৪০ জন সেনা কৌলক যারিয়া প্রাচীরে
উঠিতে লাগিল। ও দিকে অপর পার হইতে অস্ত্র অধারোহীরা নীত্র নীত্র দীর্ঘ
লোপ্তানচয় আসিয়া উপহৃত করিল। এ সকল কর্ম করিতে নিমেষমাত্র পাড়িল
না। ও দিকে প্রতাপাদিত্য সেনাচয় লইয়া প্রগ্রীষের রূঢ়া সংস্থাপন করিবামাত্র
দেখেন যে, পিঙ্গলিকার গালের মত রায়গড়ের প্রাচীরে বহুল সেনা উঠিতেছে।
কেহ অর্ধ প্রাচীর, কেহ বা প্রায় শেষ, কেহ বা আরম্ভমাত্র করিয়াছে। সকলেই
সম উৎসাহী। মহারাজ এ অবস্থা লক্ষ্য করিবামাত্র কতকগুলি সেনাদিগকে
ঐ বিপক্ষসেনা লক্ষ্য করিয়া গোলাগুলি শর চালাইতে বলিলেন ও আপনি
কতকগুলি অতি সাহসী সেনা লইয়া সে স্থলের প্রাকারের উপর উপস্থিত
হইলেন। প্রতাপাদিত্যকে সে দিকে আনিতে দেখিয়া বর্ষাবৃতপুরুষ একবার
ভীষনাদে তুরোধনি করিলেন। আর অতি নিকট উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “মালিক-
রাজ! আর একপদ, রায়গড় আমরা।”

মালিকরাজ সেনাদিগকে উৎসাহ দিবার আশয়ে “দিল্লীধরর জয়!” বলিয়া
লক্ষ দিয়া উর্দ্ধে উঠিল। সেনামণ্ডলাতে “দিল্লীধরের জয়! মানসিংহের জয়!”
শব্দ অভিধ্বনিত হইল। সেনাদিগের ভীষণ বেশ। প্রায় সকলেরই অঙ্গে বর্ষা।
বাম কটিতে তলবারো, দক্ষিণ কটিতে পরশু। পৃষ্ঠে কাহার বন্দুক, কাহার বা ধনু ও
তুণ্ডয়। তাহাদিগের বাম হস্তে দীর্ঘ লোহের শলাকা। দক্ষিণ হস্তে একাণ্ড বন
(১)। বাম হস্তের শলাকা ভ্রূমে দাঁড়াইয়া প্রায় তিন হাত উর্দ্ধে প্রাচীরে বন দিয়া
গাড়িতেছে, পরে তাহার উপর দাঁড়ইয়া আবার আরো উর্দ্ধে আর একটি গাড়িতেছে।
এই মতে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতেছে। ও দিকে প্রগ্রীব হইতে সন্ সন্ করিয়া একটা গুলি
একজন সেনার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শমাত্র কারয়া চলিয়া গেল। সেনাটি সহসা গুলিকা স্পর্শে
কম্পিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সাহস পাইয়া উঠিতে লাগিল। বর্ষাবৃতপুরুষ
প্রাচীরের শেষে যাইয়া উপহৃত হইলেন। তাহার দক্ষিণ হস্ত মুরচার শরে
লাগিয়াছে, আর কৌলক বসান প্রয়োজন নাই, জানে মার্কুলটি আপনায় পৃষ্ঠদেশে

রাখিলেন। অমনি দেখেন যে, প্রতাপাদিত্য মুরচার পার্শ্বে আনিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। বর্ষাবৃত্তপুরুষ কণকাল অচেতন প্রায় হইলেন, আবার উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে পড়িতে লাগিল। এক লক্ষ মুরচার শিরোনেশে দণ্ডারমান হইলেন। মুরচার উপর গড়াইয়া উঠেঃবরে বলিলেন। “প্রতাপাদিত্য পলাইল, তাহার অনুসরণ কর, তাহাকে বন্দী করিতে হইবে।”

মালিকরাজ এই কথা শ্রবণমাত্রে উঠেঃবরে সেনানিকট উদ্দেশিয়া বলিল। “এ প্রতাপাদিত্য পলাইতেছে, ধরিয়া আনিবে পুরস্কার পাইবে।”

সেনারা প্রতাপাদিত্যের পলায়নবার্তা শুনিয়া এক এক লক্ষ প্রতাপাদিত্য প্রাকার ও মুরচার উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সেনারা যে যেমন উঠিল, অমনি তাহাকে বন্দুকের আঘাত বা বলে ফেলিয়া দিল। কত সেনা সেই অতীব উচ্চ মুরচা হইতে নিপতিত হইতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। গড়ের সেনারা ভীম প্রস্তর নিক্ষেপিতে লাগিল। কিন্তু সেনা পতন কোল হলে মালিকরাজ প্রভৃতি কয়েকজন অতীব সাহসী অধ্যক্ষ্যরা উঠিয়াই থড়া হস্তে বিপক্ষসেনা-বধাশয়ে অগ্রসর হইল। নিযুক্ত আরত হইল। আক্রমণী সেনারা মুরচার ধার ত্যাগ করিয়া গড়ের দিকে দৌড়িল। কিন্তু গড়ের সেনা কেহ প্রস্তর কেহ বা বড় তোপের গোলা উপর হইতে গড়াইয়া দিতে লাগিল। বর্ষাবৃত্তপুরুষ চন্দ্রহাস হস্তে লইয়া দ্রুত প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইলেন। একবার মুখ ফিরাইয়া “তোপ অকর্মণ্য কর,” বলিয়া মালিকরাজকে আদেশ দিলেন। মালিকরাজ ছোট ছোট গজাল লইয়া তোপের রক্তকের ব্যস্ত হইতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রতাপাদিত্য বর্ষাবৃত্তপুরুষকে চন্দ্রহাস লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া আপনি একথানা চন্দ্রহাস হস্তে অগ্রসর হইলেন। ও দিকে গড়ের অপর সেনারা মুরচার নিকট আসিয়া অগ্র সেনাকে উপরে উঠিতে বাধা দিতে লাগিল। ওদিকে ভজহারি প্রভৃতি কএক জনে বৈচর্য্য লাগাইয়া বলে উঠিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। গড়ের স্থানে স্থানে তুমুল বুদ্ধ উপস্থিত হইল। উত্তর সেনাই স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণপণ করিল। আক্রমণী সেনা কত নষ্ট হইল, তাহার পরিমাণ নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সেনা ককবর্ষাবৃত্তপুরুষের আগমনে কিছু হতাশ হইয়া পড়িল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন। “গড় রণাভিনয়ে বোধ করি মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে পাই নাই। এক্ষণে ভীমের সেবা করিব, প্রস্তুত হউন।” বর্ষাবৃত্তপুরুষ তাহার কোন উত্তর না দিয়া চন্দ্রহাস উঠাইয়া বেগে আঘাত করিলেন। অমিতভেজা প্রতাপাদিত্য আপন চন্দ্রহাসে বেগ ধারণ করিলেন। পরেই লক্ষ দিয়া এমত বলে আপন চন্দ্রহাস উঠাইলেন যে, বোধ হইল, বর্ষাবৃত্তপুরুষের শিরঃস্থক হইতে অস্তর হইবে। কিন্তু বর্ষাবৃত্তপুরুষ একবার

সকলকে ঘুরিয়া গে আসাত অতিক্রম করিলে বীরবরের যুদ্ধ দেখিয়া উত্তর পক্ষের সেনাচর ত্বরিত ত্বরিত ধস্তবাদ দিল । কিন্তু এনিকে গড়হ সেনা একজন বেগে আসিয়া বর্ষাবৃতপুরুষের বিরোধে আসি চালাইল । কঠিন বর্ষে আসি নিপতিত হইয়া মাত্র অস্ত্রটা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল । মালিকরাজ দূরে একদল অস্ত্রবহু দেখিয়া আপনায় সেনা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উপর নিয়োজন করিল : মহারাজ প্রতাপাদিত্য চতুর্দিক হইতে এককালে আক্রান্ত হইলে একবার সাহায্যের জন্য চারি দিকে চাহিলেন । কিন্তু কোন বলবান সেনাকে বর্তমান না দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন । এমন সময় চারদিক বলবান গড়ের সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহার উপস্থিত হইয়া মাত্র একটা তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । দূর হইতে বিজয়কৃষ্ণ মহারাজকে ডাকাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন ।

ও দিকে রণবীর বাহাদুর যেমন দ্বার খুলিয়া চলসেতু (১) পাড়িয়া দিলেন, স্মৃতি কুমার সেনা লইয়া বেগে গড়ে প্রবেশ করিল । গড়বারে তুমুল যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু কণেকে মহারাজ মানসিংহ সেনাবল লইয়া দ্বারে আসিলে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনারা ভঙ্গ হিল । রণবীর বাহাদুর ও হজুমল ক্রমে বহুক্ষণ যুদ্ধে সেনা ভঙ্গ দেখিয়া অবশেষে পলায়নতৎপর হইল । মহারাজ মানসিংহ ও স্মৃতি-কুমার গড়ে প্রবেশ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইলেন । অবশেষে রায়দীঘির কূলে আসিলে বিজয়কৃষ্ণ প্রতাপাদিত্যকে ডাকিল । মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিজয় কৃষ্ণের প্রার্থনা ও দিকের অবস্থা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, পরে বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রণায় সড়ক দিয়া পলায়ন করিলেন ।

রাত্রি প্রভাত হইতে না-হইতে রায়গড় মানসিংহের অধিকারস্থ হইল । প্রতাপাদিত্য পলায়নের পর বাকী সেনারা ক্রমে পলাইল ।

মহারাজ মানসিংহ রায়দীঘির উত্তরের ঢালালে আসিয়া দাঁড়াইলেন । স্মৃতি কুমার তুরী লইয়া জয় উচ্চারণ করিল । তাহারই অব্যবহিত পরে দিল্লীখবরের সুশিকিত বাণ্যকরেরা জয়বাণ্য বাজাইতে লাগিল । স্মৃতি কুমার একাঙা ঘোড়ায় গেল লইয়া রায়দীঘির কূলে পাড়িল ।

জয়বাণ্য শুনিয়া বর্ষাবৃতপুরুষ ও মালিকরাজ দীঘির কূলে আসিলে, মানসিংহ সন্ত্রমে গাত্রোধান করিয়া বলিলেন । “কচুরায় ! বঙ্গেশ বিজয় হইল ! এখন রায়গড় তোমার, দিল্লীখবরের আদেশানুসারে তোমার পৈত্রিক গড়ে তোমার অধিকারী করিলাম ।” মালিকরাজকে ডাকাইয়া অগ্রসর হইতে চাপ চালাইতে অনুমতি দিলেন ।

দূর হইতে ভীম নাদে ভোপধ্বনি হইলে লাগিল । জয়চন্ডা বেগে বাজিয়া উঠিল । সেলায়া “মানসিংহের জয়, মহারাজ কচুরারের জয়!” বলিয়া ধড়বান ও আশিষ করিল ।

সূর্য্যকুমার মহারাজ মানসিংহের সহসা একরূপ বর্ষ্যাবৃতপুরুষকে কচুরার বলিয়া সম্বোধন করার চমৎকৃত হইল । তাহার মনের ভাবে বাঙানিস্পত্তি হইল না ।

বর্ষ্যাবৃত পুরুষ অস্তিত্বে ভয় দিয়া মহারাজ মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন । মহারাজ মানসিংহ আপন তলবারী লইয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন । পরেই সূর্য্যকুমারকে আহ্বান করিয়া বলিলেন । “জয়দ্বীপের সূর্য্যকুমার! আমার আলিঙ্গন কর ।” সূর্য্যকুমার সম্মুখে গাত্রোখান করিয়া, অগ্রসর হইলে মহারাজ মানসিংহ প্রেমে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । পরে বর্ষ্যাবৃতপুরুষ অগ্রসর হইয়া সূর্য্যকুমারকে বলিলেন । “ভাই সূর্য্যকুমার! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করিয়াছি ।”

সূর্য্যকুমার হস্তধর বিস্তারিয়া আলিঙ্গন করিল । পরে মালিকরাজের সঙ্গে সকলের মেল হইল ।

মহারাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের অধেষণে লোক পাঠাইলেন । ইত্যবসরে একজন লোক আসিয়া বলিল “মহারাজ প্রতাপাদিত্য পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণের জড়ক দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন । রামনারায়ণে মির-আমিনের পাহারার সম্মুখীন হওয়াতে তাহার তাঁহাকে ধরিয়াছে । আপনার সম্মুখীন আনিতেছে ।” এ কথা সাদ হইতে না হইতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া সম্মুখে আনিল ।

পরিশিষ্টের সূচনা।

“বজ্রাশ্রিতো দূরমুপৈতি নৈবং তচ্ছুপ্তস্ত তথৈবেতি।

দূরমুপৈতি জ্যোতির্বাং জ্যোতির্নেকং তস্মৈ মনঃ শিবসকলমন্ত ॥”

পরদিন প্রাতে মহারাজ মানসিংহ রাগড়ের প্রাধান মন্দিরে সভা করিয়া বসিয়াছিলেন। সম্মুখে মহারাজ প্রতাপাদিত্য এক আসনে উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে পৃথক্‌র উপর বিমলার ব্যবস্ত্রিত শব্দ। অপর কএক আসনে সূর্য্যসুন্দর, মালিকরাজ, বিজয়রুক, কচুরায় ও অশ্বাশ্ব সত্যোত্তা উপবিষ্ট আছেন। প্রহরীরা বলত শুকুমহাশয়কে ধরিয়া আনি। তাহারই পরে অনঙ্গপালদেব, প্রতাবতী, ইন্দুপতী, অন্নকতী, বরদাকর্ষ, গোবিন্দ, ভজহরি, শঙ্কর আসিয়া এক এক আসনে উপবিষ্ট হইল। কিছু পরে হজুরমল প্রহরীবেষ্টিত হইয় আসন্ন করিল।

কচুরায় গাত্রোখান করিয়া একখানি পত্র পাঠ করিলেন। পত্রপাঠান্তে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। “মহারাজ প্রতাপাদিত্য! এ সকল কথা আপনায় কি বক্তব্য আছে? বলুন। আপনার কথা সঙ্গ হইলে অগ্র কএক জনের কথা শুনা বাইবেক।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “আমায় ইহাতে কিছুই বলিবার নাই। তবে বে বরভক্ত ও হজুরমল এ বিষয়ে লিপ্ত আছে, তাহা একজন ধনের লোভে আর একজন আমর আচ্ছায় সে কশ্মে নিযুক্ত হইয়াছিল! তাহাদিগের ইহাতে কোন দোষ নাই।”

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ক্ষান্ত হইলেন। সভা নীরব হইল। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। “বরভক্ত! তুমি স্বহস্তে বিমলাদেবীর সঙ্গে যোগ করিয়া মহারাজ বসন্তরায়কে বিষ খাওয়াইয়াছিলে। মহারাজ বসন্তরায় তাহাতে অকালে কালগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব তোমার প্রাণ দণ্ডার্ত হইল। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিলাম। হজুরমল তোমারও সেই আজ্ঞা।”

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রথম অধ্যায় ।

“ভৎভৎ কিমপি জ্বাং যো হি বস্ত্র প্রিয়ো জনঃ।”

“তাই সরমা, তুমি এসে পর্যন্ত একবার মুখতুলে দেখিলে না। তোমার মন মুখ দেখে আমার মন অস্থির হইয়াছে। মালতি, একবার সরমাকে বুঝাও,” বলিয়া কমলা দেবী সরমার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন ও প্রেমে তাহার চিবুক ধারণ করিয়া ললাট চুম্বন করিলেন। শোকসন্তপ্তা সরমা ভূতৃষ্টিতে থাকিয়া কেবল ঘন ঘন শ্বাস তাগে উত্তরিলেন ও তাহার নেত্রের হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নিঃসরিল। কিছুক্ষণ পরে কমলা দেবীর গলদেশে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বসন লুকাইলেন। আহা! যেন শরৎ-চন্দ্রিকা প্রস্তুটিতে কুসুমিনীতে প্রবেশ করিল,—যেন কনকচন্দ্রকদামপোস্ত্রী-কমলাদেবীর লাবণ্যসরোবরে বিকসিত কমলিনী ভাসিল!

সরমা বলিলেন, “আর্য্য, আপনার প্রেম আমার মন প্রবৃত্ত না করিয়া আমার শোক উদ্দীপিত করিতেছে। যদি, কিঞ্ছন শোক এমত হুইবে সান্ত্বনা মানে না। অতীত শোকানল শোচনীয় দৃশ্যভিত্তিতে যেমত প্রজলিত হয়, আবার সান্ত্বনাবারি নিকমেও তেমত জলিয়া উঠে। বিপরীতধর্ম্মী দ্রুত ও বারি এ অভাগিনীর অন্তরে সমুদ্র গুণাবলী হইয়াছে। এখন আমার মন কেবল সেই অরতীরাজকুমারের কথাই চিন্তিতে চাহে ও তাঁহারই গুণকীর্তনাত পানেই স্থির হইতে পারে। বিধাতা আমার বাহ্য করিবায় তাহা করিয়াছে। আমি আর কোন বিষয় ভাব করি না। তবে আমার মাতার অস্ত চিন্তা উপহিত হইয়াছে। মা ক্রমে তকাইয়া বাইতেছেন। তিনি সর্বদা আমাকে সান্ত্বনা করত বটে, কিন্তু তাঁহার পদপদ বাক্যে ও মলিন মুখত্রীতে আমার মন আরও ব্যথিত হয়। না! তুমি এত উৎসাহ হইলে আমিও তার জীবিত থাকিতে পারি না।”

সহিবা সরমার কথাই কোন উত্তর না করিয়া নিকটে আসিয়া কমলাদেবীর ক্রোড়স্থ সরমার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বামহস্ত দিয়া অকল লইয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন।

মালতী বলিল, “রাগি, আপনি ভাল সান্ত্বনা করিতেছেন। আপনার চক্ষুর জলে সরমার পৃষ্ঠদেশে ভাসিয়া গেল। কেন এত শোকের কারণ কি? স্বর্গস্থান বীর-

কন্ত, উন্নত প্রভৃতির বীর পুরুষ, আবার তাহার সঙ্গে মালিকরাজ আছে। শুণ্ড-
পতির প্রমুখ্যৎ সুন্দরী বাহা ভনিয়া আসিল, তাহার ত ত্রাহাদিদের অয়োজাল হইয়াছে।
একথা ভনিয়া আমাদিদের আমোদ করা উচিত। তবে কেন সকলেই মুগ্ধ হইয়া
য়োজন করিতেছি ও ত্রাহাদিদের অমঙ্গল ঘটাইতেছি ?”

সরমা উঠিয়া বলিয়া বলিলেন, “মালতি, হৃদয়কুমারের কুশল সমাচার জ্ঞাত কিছু
আমায় এত চিন্তা হয় না—আমি জানি সে ধার্মিকচূড়ামণি কখন বিপদে পড়িবে
না—না কালী তাহাকে সর্বদা রক্ষা করিবেন। আমার উদ্বেগ অতকারণ-মূলক।
তথোৎসাহে মন আমার মগ্নিত হইয়াছে—আমি কখনও অকারণ হাত করি, আবার
পরকথ্যেই হাতে অশক্ত বুদ্ধিরা নিমজ্ঞ হই, আবার কখন অকারণ আমার মন
কাদিয়া উঠে, কিছুতেই বাগ মানে না। আমি স্বয়ং কোল কারণ বুঝিতে পারি
না—কেবল হাসিমুচক উদ্বেগ।”

বিমলাদেবী ঘরে আসিয়া বলিলেন, “কি গো সরমা দিদি, কেন বল আছিস।
ওমা সরমা তোমার মুখ মালস যে? মহারাজ উপযুক্ত কভার পাত্র কাহাকে মনোনীত
করিয়াছেন? আহা! এ রহ যে পাইবে সে সংসার ত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি
সরমার সেবার নিযুক্ত থাকিলেও শ্রেয়ঃ! সরমা দিদি, তোর বর কোথায় সাধ্যন্ত
হইয়াছে?”

মালতী বলিল, “বিধাতা যোগ্যেই যোগ্য নিয়োজন করেন। সরমার যোগ্য
বর এ দেশে নাই।”

মাহবী বলিলেন, “ছোটখুড়ী, মহারাজ সরমার জ্ঞাত অরতীরাজকুমার হৃদয়কুমার
দেখকে বর হির করিয়াছেন। ভবিষ্যত কে খণ্ডন করিতে পারে? সেদিন
মহারাজ সহসা এ কথা উত্থাপন করিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন না, সদ্য
বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। আমরাও মাতিলাম—বহুনা পরাইয়ে মহা
উৎসাহ হইল। কিন্তু আমরা অত্যন্ত মনস্তাপ পাইলাম। তৎকালেই হৃদয়কুমার
ও মালিকরাজ নিরুদ্দেশ হইল,—উৎসাহ ভঙ্গ হইল; আমরা সরমা মুর্ছাবিভা হইয়া
মুক্তকণ্ঠক সার্পণীর ভায় জীর্ণ ও স্ত্রিমাকা হইলেন। আহা! তদবধি সরমার
ভাবান্তর হইয়াছে, এত বুঝাইতেছি কিছুই মানে না। মালতি, তুমি হৃদয়কুমারের
কি সমাচার পাইয়াছ?”

মালতী বলিল, “সুন্দরীর মুখে শুনিলাম যে, রায়গড়ের শুণ্ডপতি হৃদয়কুমার ও
মালিকরাজকে মহারাজা মানসিংহের বজ্রবলের স্বকাবারে দেখিয়া আসিয়াছে।
সে বলি তাঁহার মানসিংহের সৈন্ত লইয়া ইন্দুমতী উজ্জয়িনী জ্ঞাত ও তদ্রূপ করিণী-
শাসনের উদ্দেশে ললবীপ নিয়াছেন।”

বিমলা বলিলেন, “হাঁ! তাহা আমি। কিন্তু আমি এই তুমিরা আসিলাম যে, তাহারা ইন্দুমতী ও প্রতাপতীকে তাহার বৃদ্ধ পিতামহ উদ্ধার করিয়া সন্যাস হইতে ‘কিন্নরী দুর্যোধন’ে করেকজন বন্দী সঙ্গে আনিয়াছে ও অন্যাই অনুমান করি, মহারাজ মানসিংহ রায়গড় আক্রমণ করিবেন।”

কমলাদেবী ব্যস্তে বলিলেন, “ভগ্নি, আমার ইন্দু কোথায়? সে বজবজে আসিয়া সেইখানেই রহিল! এখানে আসিল না কেন? এখানে তাহাকে ক্রমশঃ আনাও। হুট ফিন্নসীরা বাহ্যকে কতই কষ্ট নিয়াছে, তাহিলে আমার জ্ঞান কাটিয়া যায়! বাছ! আমাদিগের অকের নড়ি।”

বিমলা বলিলেন, “দাদি, আমি শুনিযামাত্র পত্র পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু অপর একজন চর আসিয়া বলিল, পত্রবাহক বজবজে পৌঁছিতে পারে নাই, পথেই ধরা পড়িয়াছে। বুদ্ধের উদ্যোগে লোকের গমনাগমন রোধ হইয়াছে; সমাচার পাওয়া যায় না। মহারাজ মানসিংহের স্বকাব্যে (১) সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ আছেন, ইন্দুমতীর শুশ্রূষা অবশ্যই হইবেক। মানসিংহও বীরপুরুষ, তাহাতে আবার সূর্য্যনার আর সেই অজ্ঞাত বীরবৃত্ত পুরুষ আছে—ইন্দুমতীর জন্ত কোন চিন্তা করিবেন না। সপ্রতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জন্ত সমূহ উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে।”

মহিষী বলিলেন, “আমি নগের কি বিপদ!—তুমিরা আমার হৃৎকম্প হইতে ছ।”

সংসারী সবহে বিমলাদেবীর মুখের দিকে চাহিলেন। যেন বিমলার চক্ষুঃ নিরা অস্তরের লেখা পড়বেন।

কমলা বলিলেন, “কেন প্রতাপাদিত্যের কি বিপদ? চল—আমরা তাঁহার নিকট যাই।”

বিমলা বলিলেন, “তাহার নিকট যাইয়া কিছুই প্রতিকার করিতে পারিব না। এখন দৈববল ব্যতীত অপর কিছুই উপায় নাই—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কুগ্রহ উপহিত—চতুর্দিকেই শত্রু বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠজামাতা চন্দ্রবীপের রাজা আমাদিগের রামচন্দ্র রায় বশোহরে কারাবদ্ধ থাকিয়া কিছু নিশ্চিন্ত নাই; তাহার প্রজাবর্গ ফিন্নসীশাসনে একান্ত অসন্তুষ্ট; চট্টগ্রামের প্রজারা অবিকার্য মগ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া তাহাদিগের প্রকৃত টান বঙ্গরাজের দিকে—তিনিও অবকাশ পাইয়াছেন। চট্টগ্রাম বঙ্গরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এখন হোপলা ও মলচিঠি বৃদ্ধি হাওছাড়া হয়।”

মহিষী বলিলেন, “জামাতার জন্ত আমি কতবার বলিয়াছি, বিশেষ উপরোধও করিগছি, কিন্তু কেমন বিপর্য্যতা—অনুরোধ করিলে বলেন যে, রাজ্যভার ও কৌশল

তীক্ষ্ণভিত্তি বোধগম্য নহে। আমি কি করিব—কেবল নিরাশে বলিয়া কাঁদি ও কালীর স্তুতিবাদ করি—মাতার যাহা মানস তাহাই হইবেক।”

বিমলা বলিলেন “মহিষি, তোমার গুণ ও সপত্নী-হৃদিতার প্রতি প্রেম—অগণ্য বিখ্যাত। কি করিবে মা ? রাজা ও তোমার বশবর্তী নহেন। আমরা জানি যে, তোমারই সহায়তায় রামচন্দ্র জীবন লাভ করিয়াছে, নতুবা রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার সময় তাহার মস্তক ছিন্ন হইত।”

কমলা বলিলেন, “আহা! আমাদের নাতিনী কেহই সুখী হইল না। সরস্বতী এই নশা, তার জ্যেষ্ঠা সূমতিরও কথাই নাই,—সে নবীনাবালা রাত্রি হইয়াও আজন্মকাল খেচ্ছাবাসে কারাগারে কাটাইল। কিন্তু সে সত্যী—লক্ষ্মী! এমত পতি-পরায়ণা বালিকা আমি আর কখন দেখি নাই।”

মহিষী বলিলেন, “আহা! বাছা—নামে সূমতি, কথ্যেও সূমতি। বাছা আমার এখন আবার স্বামিনেবা করিতেও নৈরাশ হইয়াছে—রাজা উদ্যত হইয়া তাহার নগ্নদেহ লক্ষ্যভেদে করিয়াছেন—সম্প্রতি তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে রাখিতে আদেশ দিয়াছেন,—পিতার মন এত চিহ্নিত হয় তা জানি না। আমি বলকের ভাগী হইরাছি। লোক মনে করে যে, আমারই হিংসায় মহারাজ তাহার কন্তাপ্রাণাত্যক করিতেছেন। লোকে ভাবে মহারাজ ক্রোধ, কিন্তু এমত পাব্য-হৃদয় জীব আর দেখি না।”

কমলা বলিলেন, “মা—তোর মত সতীলক্ষ্মী নাই। তোর ও সপত্নী-কন্তা বলিয়া ভেদজ্ঞান নাই—তুমি সূমতিকে সরস্বতী তুল্য ভালবাস। আহা, সে যে সূমতি!”

লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া বলিল, “ওমা! কি হবে! চরে আসিয়া বলিল যে, মানসিংহ সৈন্যে রাগগড় আক্রমণ করিবেন!”

কমলা বলিলেন, “কেন, রাগগড়ের ঘোষ কি? অনঙ্গপাল দেখকে তাকাও; রাগগড় প্রস্তুত হইতে বল; জটনৈক দূত মহারাজ মানসিংহের নিকট পাঠাও—তাঁহাকে বুঝাও যে, অনাধিনীর রাগহৃৎের উপর ক্রোধপ্রকাশ কি বীরত্ব হইবেক?”

বিমলা দেবী বলিলেন, “মানসিংহের নিকট কোন প্রেরণে প্রেরণজন নাই। আমি তাঁহার পত্র পাইছি পত্রটি আপনার নামে নাম লেখল। আনি অতিশয়-সেবার ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমি স্বয়ং তাহার উত্তর পাঠাইয়াছি।”

কমলা বলিলেন, “ভাল করিয়াছ—তোমার মতই আমার মত। তুমি বুদ্ধিমতী,—রাজ্যনায়ে বিশেষ দক্ষ,—বাছা করিয়াছ ভালই হইয়াছে।”

বিমলা বলিলেন, “আমি সে পত্র পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। মানসিংহের নিকট হইতে এমত পত্র আসা—উচিত হয় না।”

সন্ন্যাসিনী কমলা বলিলেন, “মানসিংহের বয়োধিক্যে বুকের ভ্রম হইয়াছে।”

বিমলা বলিলেন, “তিনি প্রতাপাদিত্যের উপর রুষ্ট হইয়াছেন—তাহাকে বঁধিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে বলেন।”

কমলা বলিল, “তাও কি হয়! মানসিংহ অত্যন্ত অত্যাচারী! মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার “জ্ঞা,—তাহার ক্রোধে মরিলে আমরা এক পণ্ড জল পাইব। আমাদিগের অপর কে আছে?”

বিমলা বলিলেন, “কেবল সেই বিচার নর, আরও কাবণ আছে। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে রায়গড়ের আভিষি, আভিষি সংকার গৃহস্থের প্রধান ধর্ম। তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে শত্রুহস্তে দিতে পারি?”

কমলা বলিলেন, “প্রাণ যার সেও স্বীকার, রাজ্য যার তাহাও প্রের্য; কিন্তু আপনার অপত্যকে, বিশেষে আভিষি অবস্থার বিরূপে শত্রুহস্তে সমর্পণ করি? মানসিংহ অত্যন্ত আবেষ্টক। রায়গড়ের প্রতাপাদিত্যের সৈন্য সংস্থাপন কর। আহা! এমত সময় ইন্দুমতী থাকিলে কতই উদ্যোগ করিত! আবার আমার প্রভাবতী সাহসী হই-সেনাসী—আহা, সেও নাই। যেখানে হুগের আধিপত্যী হ্রী, সেখানে সেনাপত্নীই থাকি উচিত।”

বিমলা বলিল, “সকল সত্য ঘটে, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ মানসিংহের নিকট আমাদিগের পরমাত্মীয় কর্তব্য জন আছে। আমরা বৈর ব্যবহার করিলে, অসুখান করি, তিনি তাহাদিগকে অব্যাহতি দিবেন না। তাহাদিগকে রণপ্রাত্যুৎসব (১) করিয়া রাখিয়াছেন।”

সন্ন্যাসিনী বলিল, “স্বর্গাকুমাৰও ত সেই খানে আছেন। তাঁহার কি হইবে?”

মহিষী বলিলেন, “সব মা তুমি চিন্তিত হইও না। যশোহরেশ্বরী সঙ্কটকে বক্ষা করিবেন। তিনি আমাদিগের মহাদেবীর কুলবধাত্রী (২) ও বৃন্দদেবতা। তিনি থাকিতে আমাদিগের কোন চিন্তা নাই।”

সন্ন্যাসিনী বলিল, “তাতে আমি, কিন্তু স্বাক্ষরারে প্রবাদ যে, যশোহরেশ্বরী ‘বমুখ হইয়াছেন ও মন্দিরের অপরান্নে ফিরিয়া বাসিয়াছেন। মাগো আমাদিগের কি সর্বনাশ!”

মহিষী বলিলেন, “কোন দুঃখাত্মা তোমাকে এ সমাচার দিল। আমি বাছা সেই কথা শুনিয়া অবধি তোমা ছাড়া এক ক্ষণও নেই। কিন্তু পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও এই ভয়ে বিন্দুবিদগুণ তোমাকে ইত্থিতে বলি নাই।”

সন্ন্যাসিনী বলিল, “মা তুমি যদি বলিলে, তবে আমিও বলি, আমি শুনিয়াছি যে,

বশোহরেশ্বরী মহারাজের সভায় আমার দিদি স্নমতির রূপ ধরে 'বাই বাই' বলিয়া হুলপূৰ্ণক ভক্ত কন্যার, মহারাজ তাহাকে কটু বাক্যে বিদায় দেন । আহা বশোহরেশ্বরী কি কৃপা ! জানান না দিয়া বিমুখ হইলেন না ! আবার মহারাজের গুরুদেবের উদয়ের পূৰ্বেও বশোহরের মন্দিরস্থ প্রতিমূর্তি কিরিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজকে সতর্ক করিতেছেন ; ইহাতেও কি মহারাজের চৈতন্য হয় না ! মহারাজ ভবানীর বরপুত্র হইয়াও এমনত নিকোঁথ হইলেন কেন ? মা ! এই সব ভাবনাই আমার রোগের কারণ, এ রোগ নহে গুরুষ্ট (১) ।”

বিমলা বলিলেন, “সন্ন্যাস, রাজার প্রতি গ্রহেরা অপ্রসন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই, নতুবা এ হেন দিগ্বিজয়ী রাজার অভাব কি ? আর চিন্তাই বা কি ? বিলি বঙ্গের বাদশ তৌমিককে পরাজয় করিয়া বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনি অতি সামান্য বিষয়ে মুগ্ধ হইলেন । আহা ! তাঁহার কি স্বার্থ চিন্তা নাই । তিনি দিল্লীর সহিত লজ্জি রাবিয়া একছত্রী হইয়া পরম স্তখে বঙ্গের উন্নতি সাধন ও স্বীয় বশঃকোত্তর সহিত রাজ্য সম্বৰ্দ্ধন করিতে পারিতেন । কিন্তু আসন্নকাণে বিপরীত বুদ্ধি হয় । দিল্লীর কৃপার পিতা ও পিতৃব্যের হস্ত হইতে রাজ্য লইয়া স্বীয় শিরে মুকুট বসাইলেন । দেখিতেছি সে যে কণ্ঠকের জন্ত হইল । আবার কটক ফুটিতেছে, এখন মুকুটের দ্বারে মৃতক পর্য্যন্ত যায় । মুকুটও ত ছাড়ে না । এতে একা মহারাজের ক্ষতি নহে ; এ বঙ্গের অধোগতি । এই হইতেই বঙ্গের স্বাধীনতা ফুরাইল । বাঙ্গালার সূর্যের এইবারে মহা অস্ত হইল । হায়রে ! যদি প্রতাপান্বিত বুদ্ধি চাণিতে পারিত, তবে এত দিনে বাঙ্গালার স্বরও (২) পরিবর্তন হইত ।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “মা আমি একবার দিল্লির সহিত সাক্ষাৎ করিব । আমি অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই, আমার মন কানিয়া উঠিতেছে । দিদি সত্যি সত্যি, জানা হলেই বা বশোহরেশ্বরী তাঁহার বেশে মহারাজার নিকট কেন যাইবেন !”

মহিষী বলিলেন, “মহারাজকে তোমার ইচ্ছা জানাইব । এ আমি হৃদয়ঙ্গম কি, স্নমতিকে জানাইলেই হুবে । না হয়ত আমরাই বশোহর যাইব ।”

কমলা বলিলেন, “স্নমতি বাধাকে আমিও অনেক দিন দেখি নাই । স্নমতি কেমন আছে ? তাহার সন্তান সন্ততি কি হইয়াছে ?”

বিমলা বলিলেন, “দাদি, আহা স্নমতি বড়ই মনের কষ্টে আছে । সে এখন কারাগারে থাকিয়াও পড়িসেবা করিতে পাইতেছে না । মহারাজ তাঁহার পাপসকল ক্ষমাই পূর্ণ করিতেছেন ।”

সন্ন্যাসী ব্যস্ত হইয়া যবে প্রবেশ করিলে বিমলা বলিলেন, “কিনো এক কষ্ট কেন ?”

সুন্দরী বলিল, “বায়ে ভজহরি আনিয়া অপেক্ষা করিতেছে; সে বজবজ হইতে আসিয়াছে; তাহার নিকট কমলা দেবীর ভ্রাতৃ পত্রও আছে।”

বিমলা বলিলেন, “কৈ ভজহরিকে ডাক। বিমলা ও কমলাদেবী উভয়েই প্ৰহাস্তরে গেলেন।”

সুন্দরী কণেক পরেই ভজহরিকে লইয়া উপস্থিত হইলে ভজহরি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথম করিয়া বলিল, ‘বড় মা, এই ইন্দুমতীর পত্র; ছোট মা, এটা আপনার ভ্রাতৃ, আর সরমার ভ্রাতৃ এইটা স্বর্ধাকুমার দিয়াছেন। এটি মালতীর ভ্রাতৃ মালিকরাজ আমার হস্তে গোপনে সঁপিরাছেন। আর বড়মা ঠাকুরাণীর নিকট আমার অপরাপর সমাচার আছে।’

কমলা পত্রটি হাত পাতিয়া লইলেন ও বলিলেন, “বাছা বাটে মুখ হাত প্রকাশিয়া আনিয়া ব’স। পথশ্রম নিবারণ কর। বিমলা এঁকে কিছু খাইতে দাও। আহা! বাছার মুখ কালী বর্ণ হইয়াছে। ভজ! বাবা! কখন বজবজে হইতে ছাড়িয়াছিলে? আহা রোজ লানিয়াছে। সরমা দিদি! ভজকে একটি নারকেল দিতে বল।” স্বয়ং উঠিয়া এক খানি পাখা লইয়া বলিলেন, “নে বাছা ধর একটু বাতাস থা।”

ভজহরি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পাখাটি লইল। বিমলা দেবী পত্রটি পাঠ করিয়া কোন কথা কহিলেন না।

কমলা বলিলেন, “বিমলা, তুই এ পত্র খানিও পড়। ইন্দু কি লিখিয়াছে?”

বিমলা পত্রটি হাত পাতিয়া লইয়া পড়িলেন, ও কমলাকে অন্তরে লইয়া বলিলেন, “দ্বিদি, ইন্দু লিখিতেছেন যে, মহারাজ মানসিংহ তাঁহার পত্রের উত্তর না পাওয়ার বিনা সম্বন্ধে রাগগড় আক্রমণ করিবেন। ইন্দু আমাদিগকে মহারাজ মানসিংহের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এক্ষণে আমার পরামর্শ, ইন্দুমতীর মতামুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু রাগগড় আক্রান্ত হইলেই, অধীনস্থ সমস্ত সেনাই দ্রুত: ধড়গহস্ত হইয়া উপস্থিত হইবে ও মানসিংহের বিপক্ষে অস্ত্র চালন করিবে; তাহা কি এক্ষণে শাস্ত করা যায়?”

ভজহরি নিকটে বাইয়া বলিল, “ছোট মা, আমি স্বয়ং আসিয়াছি, অলাই প্রাণে প্রাণে বাইয়া সকলকে সমাচার দিব ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অজ্ঞাতে এ দুর্গ হইতে পলাইব। আপনারা সাবধানে থাকিবেন। দিবার দক্ষিণ ভাঁরে প্রধান সতামন্দিরে থাকিল, সেখানে গোলা বাইবে না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন। অমরপালদেব সন্দেহ হইতে আসিয়াছেন, তিনিও এই বিষয়ে আপনাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি প্রাণের প্রাণ ও মণ্ডলদিগকে স্বয়ং বাইয়া বলিবেন ও বজাধিপ পালেন উল্লসিত সংগ্রহ করিয়া মহারাজ মানসিংহের দলভুক্ত হইবেন। তিনি বলেন, এক্ষণে প্রতাপাদিত্য

স্বয়ংগতের শত্রু ; কেননা তিনি সেনানিবেশ দ্বারা অসংখ্যক হানে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । চরের মুখে শুনা যায় যে, ঠাহার স্বয়ংগতে আসিবার মূল উদ্দেশ্যই গড় অধিকার করা । এরূপ বিবাসভাভকতা দ্বারা স্ত্রীঘরের হস্ত হইতে দুর্গ কাড়িয়া লওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই ।”

বিমলা বলিলেন, “আমরা ইহার প্রতিকার করিব । তুমি বিজ্ঞান করিয়া মানসিংহের স্বকাবারে বাও ও বলিও যে, আমরা প্রতাপাদিত্যের চাতুরী এক্ষণে বুঝলাম । আমরা দুর্গ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব ।”

কমলা বলিলেন । “ইন্দুমতী কেমন আছে ?”

ভজহরি বলিল, “তিনি ভাল আছেন, আপনাদিগকে তাহার প্রণাম জানাইয়াছেন । প্রতাপবতী আপনাদিগের অনাময় (১) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও মঙ্গলান্ন সমাচার লইয়া বাইতে বলিয়াছেন ও কমলা দেবাকে তাঁহার জন্ত আচার পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন ।”

কমলা বলিলেন, “বিমলা তাই, ভজহরিকে ভাল আচার আনাইয়া দাও, প্রতাপ আচার ভালবাসে । আহা ! বাছা সনদ্বীপে কতকষ্টই পাইয়াছে ।”

বিমলা ভিতরে আসিয়া বলিলেন : “মহাশ, চল আমরা সতামন্দিরে বাই । বৈষ্ণব সমাচার পাইতেছি, তাহাতে এখানে ঝাকা ভয়ের বিষয় । প্রতোলীপ্রাকারের এত সন্নিকটে ঝাকা উচিত নহে । মহারাজকে এ সমাচার পাঠাইয়া দাও । ভজহরি তুমি এস আমার নিকট হইতে পত্র লইয়া স্বয়ংগড়ভাগ কর ।”

ভজহরি বিমলাদেবীর পশ্চাৎ গমন করিয়া দিবাগ কুলে উপস্থিত হইল ।

বিমলা বলিলেন । “তুমি বাইবার পূর্বে একবার আয়ুধাগারে বাইবা, শিবচন্দ্রকে বলিবা যে, আয়ুধ ও বাক্স ও গুলি ইত্যাদি ত্বরায় স্থানান্তর করুক ।”

ভজহরি বলিল, “আমি আসিবার সময় তাহার সাহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম । সে বলিল, “প্রতাপাদিত্যের অনুমতিতে আয়ুধ ও বস্ত্র শস্ত্রাদি প্রতোলীপ্রাকারের নিকটস্থ লগুনায় মধ্যে পাঠান বাইতেছে ।”

বিমলা বলিল, “ভাল, এ অবস্থায় আমাদিগের তৌশলে কার্য সাধন করিতে হইবে । স্বয়ংগড় এখন প্রতাপাদিত্যের অধীন । আমরা এখন বলহীন নিঃসহায় । তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও । এই মন্দিরপ্রতোলী প্রাকারের নিকট আয়ুধাদি রাখার উপযুক্ত স্থান ।”

ভজহরি বলিল, “আমি তবে এখন বাই, শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া দিব ।”

বিমলা বলিলেন, “তুমি কোন্ দিক্‌দ্বারা আসিলে ?”

ভজহরি বলিল, “আমি হুড়ু দিয়া আসিয়াছি ও সেই পথেই বাইব। ছোট মা এণাম। আশীর্বাদ করুন আমার ফিরিয়া আনি। হার! অকারণ পরের দ্বারে দ্বার-গড়ের খননষ্ট, অশ্রুক্ষর ও দুর্গহামি।”

ভজহরি চলিয়া গেল, বিমলা স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিবর সন্ধ্যার শান্ত ঘন ক্রমে শরীরকে অবসর করিলে, তিনি কমলার জ্বোড়ে মিজিতা হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

“স বস্ত্রে মহতীং নিজাং তবসাগ্রান্তচেতনঃ।”

বেলা ১০টা হইয়াছে, প্রাতঃকালাবধি অত্যন্ত কুজ্জ্বলিকা হওয়ার গ্রামে লোক গমনাগমন প্রায় নাই। রাজমার্গ প্রায় জনশূন্য, জনৈক রাজকর্মচারী ক্রতপদে বাই-ভেছে, পথে কিলেদার গোবর্দ্ধন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার ব্যতীত তাহাকে অভিধান করিয়া পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

গোবর্দ্ধন রায় আকারে খর্ব্ব, কিন্তু বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫। সতেজ চক্ষু, সর্ব্বাঙ্গ লোমাবৃত, মস্তকটি ছোট, তনুর পরিমাণ ক্ষুদ্র। দেহরাগ উজ্জ্বল শ্রাম। দেখিলেই বোধ হয় বেন বিধাতা তাহাকে নির্জনে বসিয়া অন্ন ও সামান্য মৃত্তিকায় বত দূর শোভা সম্ভব তাহা দিয়াছেন। কেননা গোবর্দ্ধনের মুখত্রী মন্দ নহে। এখন জোড়ার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত থাকায় বিশেষে মস্তকে অরীর তাজে মাথাটা নিতান্ত ছোট দেখাইতেছে না; গোবর্দ্ধনের আকার ভুলিয়া গেলে মুখ ভোলা যায় না; ক্রোধ ও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ চিবুকে বেন স্বার্থপরতা মাথা আছে! আর ভ্রূর নাসিকামূলে মিশাতে কথঞ্চিৎ আঁচল-অধীন বলিয়া পরিচয় দিতেছে। সতেজ ও অস্থির চক্রে স্বার্থ প্রবণতার ইষ্ট অনুসন্ধান করিতেছে। উজ্জীঠ অপেক্ষা অধরোষ্ঠ স্থূল ও বড় থাকায় কতকটা অমুচ্চ প্রকৃতির চিহ্নস্বরূপ হইয়াছে!

গোবর্দ্ধন রায় অর্ধে বাইতেছিল, উহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “জেহের এমন সময় কোথায় বাইতেছ?”

জেহের বলিল! “মহাশয়, আমি হুজুরের নিকট বাইতেছিলাম, টানখানে একটা হেঙ্গাম ষটিয়াছে, রামচন্দ্র রায় মরিয়াছে।”

গোবর্দ্ধন বলিল। যাঃ! কি বলে, রামচন্দ্র রায় মরেছে! কেন তাহার নি হইয়াছিল? কে আমাকেত কেহ কোন কথা শুনার নাই। তাহার কোন রোগের লক্ষণও পাই নাই। কি হইয়াছিল?”

জেহের বলিল, “মহাশয়, কৈ এমন কিছই ত হয় নাই। কালরাত্রি বৎস
নেক প্রহরের পাহারা বদল হয় তখন আমি রীতিমত তাঁহার ঘরে গিয়াছিলাম।
তাঁহাকে একখানা কেতাব পড়িতে দেখিয়া আসি। তার পর আজ প্রাতে হাকি
আসিয়া আমাকে বলিল যে, আজ সকালে ঘর খুলিতেই দেখিলাম রামচন্দ্র রায় বেমন
নেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল তেমনি বাসিয়া আছে, একখানি বাহ ডাইনে পড়ে
আছে। প্রদোপটা নিকটে জ্বলিতেছে। আমি শুনিয়া দেখিতে গেলাম ও ঐ তাব
দেখিয়া ভয় হইল। কেমন চক্ষু বুজাইয়া বসিয়া আছে, বোধ হয় যেন ঘুমাইতেছে।
কোন সাড়া শব্দ নাই। আমি গিয়া ডাকাডাকি ঠেলা ঠেলি নানান রকম করিলাম।
কে কারে ডাকে, ও কে কারে বলে! নাকে হাত দিয়া দোখলাম নিখাস পড়ে না।
কেবল উপসর্গের মধ্যে মুখ দিয়া গোটা লাল ভাদিয়াছে ও চোয়াল খুলিয়া
পড়িয়াছে। মহাশয় চলুন, দেখিবেন কি ব্যাপার।”

গোবর্দ্ধন রায় বশোহরের কিলেদার, তদ্রত্য কারাগার ও পেটা তাঁহার অধীনে
ছিল। তিনি আতিতে বৈদ্য, বহুকালাবধি ঐ বর্ণে নিযুক্ত ছিলেন। চাঁদখানের
আমলে তাঁহার পিতা ঐ পদে ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের একজন বিশ্বস্ত
প্রধান কর্মচারী। যদিচ বশোহরে তাহার উপরস্থ অপর দুই তিনটি কর্মচারী
ছিল; কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বিশ্বস্ত বলিয়া তাহার আবিদ্যামানে সকলেই রায়মহাশয়ের
মত না লইয়া কোন কর্ম করিত না। যে দিন সন্ধ্যাপ হইতে বর্ষারূপ পুরুষ
বজবজে প্রতাপগমন করেন, সেইদিন বশোহরে এই ব্যাপার ঘটনা হয়। গোবর্দ্ধন
রায় রামচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া উদ্ভিগ্ন হইলেন, কিন্তু শোকসূচক কোন-
প্রকার ভাবভঙ্গি দেখা গেল না। জেহেরের কথা শুনিয়া একটু নিস্তকে স্থির হইয়া
ধাকিয়া বলিলেন “জেহের, আমি চাঁদখানে যাইতোছ, তুমি সীত্র নাএব কোজনাককে
সেইখানে লইয়া আইস।” জেহের শির নোয়াইয়া চালিয়া গেল, রায়মহাশয় চাঁদখানের
দিকে অগ্র চলাইলেন। বেগে অগ্র চলিল ফণেকে চাঁদখানের ঘরে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। ঘরের বাহরে পিণ্ডলের উপর কারাগারের গাছিক (১) চণ্ডীচরণ
দত্ত দাঁড়াইয়াছিল, অগ্রসর হইয়া আভিবাদন করিলে গোবর্দ্ধন অগ্র হইতে অবতরণ
হইয়া তাহার হস্তে অঘের কবীর (২) দিলেন। চণ্ডীচরণ কবীর ধরিয়া অগ্রকে
পিণ্ডলপারে নিকটস্থ একটি গাছের ডালে বাঁধিয়া গোবর্দ্ধনের পশ্চাত্ত গমন করিল।
গোবর্দ্ধন কারাগারের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া পক্ষপালী (৩) দিয়া ভিতর বাটীতে গেলেন।
গাছিক দত্ত তাহার পশ্চাত্ত গমন করিল। রামচন্দ্রের ঘরের ঘরে আসিলে দত্ত

বলিল “হজুর কাল সন্ধ্যার সময় রামচন্দ্র দ্বারা আমার নিকট হইতে কাগজ কলম আনা হইয়া লইয়াছিলেন। রাজ্যের মধ্যে কি হইল বলিতে পারি না। হায়! সংসারের অনিত্য!”

গোবর্দ্ধন বলিল “দস্তজ! হঠাৎ কি যোগ হইল বলিতে পারি না। তুমি দেখিরাছ কি হইয়াছে?”

দস্তজ বলিল, “স্বাস্থ্য নাই; আমি এই আসিতেছিলাম, পথে জেহের আমাকে এই সমাচার দিল। মামুষের মানুষ, ভিতরে মানুষ।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “তুমি ঘরে যাও আমি বাইতেছি।”

চণ্ডীচরণ দস্ত অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল “কি আশ্চর্য! এ দেখে কে বলিবে যে মরিয়াছে; যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া আছে! আবার এদীপটীও জলিতেছে।”

রামচন্দ্র দ্বারা চন্দ্রবোপের রাজপুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অসম্মান মধ্যে স্বীয় স্বপ্নের কোপে পড়িয়াছিলেন। দেখিতে অতি সুন্দর। কীর্ণ শরীর বলিয়া কিছু অস্থি পঙ্কজ দেখা যায় না। স্বভাবতঃ তাঁহার আকৃতি শুল নহে বরং ত্রীলোকনিগের মত সুগোল হওয়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোমলতা বুদ্ধিকে পাইয়াছে। বহুকাল কারাবাস বলিয়া শরীরের সন্ধিস্থানে কন্দমাদি জন্মিয়াছে, বোধ হইতেছে যেমন নিকষ হেমপাত্রে পক পড়িয়াছে। রামচন্দ্র দীর্ঘকায়, শরীরের উপযুক্ত প্রশস্ত বক্ষঃস্থল ও বধ্যবোধ্য দীর্ঘাঙ। দেখিলে সুখী স্থিঃপ্রকৃতির রাজকুমার বোধ হয়। বয়ঃক্রম বদিত প্রায় ২৫ বৎসর কিন্তু শরীরের বাহুল্য লালিত্য আজও নষ্ট হয় নাই। অনুমানে প্রায় পঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কম বোধ হয়। চন্দ্র মুদিত আছে কিন্তু জরথার পাত্তীর্ণ ও কৃকৃৎ গৌর ললাটের উপর শোভিয়াছে। গণ্ডে ও চিবুকে টোল থাকার মুখশ্রী অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছে। গোবর্দ্ধন গৃহে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই বাহিরে আসিয়া দাঁড়ইল।

সেই সময় ফৌজদার মাহুদা আসিয়া “বন্দগী দ্বারা মহাশয়” বলিয়া অভিবাৎসল করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বলিল “এক রামচন্দ্র যে অক্সা পেয়েছেন। বৈদ্যা বসে ছিল এসা হেলিয়া আছে; কি ডাক্তার! মোত এরসা হৈয়। কি হইল কিসে মলো। খোদার ক্রোমত কিছুই সমঝা যায় না। দ্বারা মহাশয় এ মলো কিসে?”

গোবর্দ্ধন বলিল, “কিছু বলিতে পারি না। মুখে গোটা লাল ভাজিয়াছে। সাপে খেয়ে থাকিবে।”

মাহুদা বলিল, “তা হ’তে পারে। লোকের সাঁপের দাঁতের মিসাল কোথা?” বলিয়া সর্বদিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন বলিল, “নাশে খেলে কি টলে পড়তো না ? যেমন ঠেস্ দিয়া বলিয়াছিল সেই মতই আছে ।”

মাহুলা উঠিয়া ঘরের নিকে দেখিয়া এক কোণ হইতে একটা ভোক্তার তীর উঠাইয়া লইয়া বলিল, “এ তীর এখানে কেন ?”

গোবর্দ্ধন ঘরে প্রবেশ করিয়া তীরটা হাতে করিয়া লইল ও যত্নে তাহার অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া বলিল “ইহার অগ্র বস্ত্র হইয়াছে কোন কঠিন অব্যে আঘাত লাগিয়া থাকিবেক ।”

মাহুলা চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে গৃহের বিপক্ষ প্রাচারে খানিকটা বালি ও চূণ খসা দেখিয়া বলিল, “এই খানে ময়া দেওয়াল ভাঙ্গা দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি ?” পরে কতক টুকরা কাগজ উঠাইয়া বলিল “এ কোণে এ কাগজগুলি কেন ?”

একত সময় নাএব কৃপারাম চট্র আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চমকিয়া উঠিল, বলিল, “আহা এ সুপুরুষের অকস্মাৎ এরূপ কেন হইল ? বিধাতার সমস্ত ইচ্ছা। হুমতির কি সর্বনাশ। আহা বাছা অন্ন বয়েসে মাতৃহীনা। তাহাতে আমার বাহীর বসীত্বতা হওয়ার পিতার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, এক্ষণে বিধাতা তাহাকে বৈধব্য বস্ত্রায় কেলিলেন ! কিলেদার মহাশয়, অনুমতি করুন হুমতিকে একবার এখানে আসা যাক্। জন্মের ভরে একবার তাহার স্বামীকে চক্ষু দিয়া দেখুন।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “হৃৎখের বিষয় বটে কিন্তু যবেচনা করিলে এ একপ্রকার ভালই হইয়াছে। রাজপুত্র কারাগারে জীবন কাটাইবার অপেক্ষা এখানে মরা ভাল। তুমি যে হুমতিকে এখানে আনাইতে বাচিতেছ তাহার আমার সাহস হয় না। পাছে হুমতির সাহিত তাহার স্বামীর বদাচ সাক্ষ্য হয় উদ্দেশে, মহারাজ উত্তরকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন। নতুবা হুমতিকে কারাগারে রাখা তাহার কিছু বড় ইচ্ছা নহে ।”

কৃপারাম বলিল, “রাজার অনুমতি বিরুদ্ধ হইবেক বটে; কিন্তু মরণের পর আর কাহার অধিকার ? এক্ষণে শাস্ত্রনাম্যত হুমতিই সংকারের অধিকারিণী। সেই ঐশ্ব্যানে অগ্নিকাণ্ডের বেলা দেখা হইবার পূর্বে একবার এখন দেখা হওয়া ভাল। নতুবা হুমতিকে অত্যন্ত শোক লাগিবেক। অনুমান করি মহাশয় এ বিষয়ে বাধ্য করিবেন, মহারাজ তাহার অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি একবার হুমতিকে সমাচার দেওয়াস ।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “আমি তাহার অকম। মহারাজের স্পষ্ট অনুমতি ছিল যে, এস্ত্রীপুরুষে ঐশ্ব্যানেও সাক্ষ্য করিতে দিও না। তিনি বলিয়াছিলেন যে, একের

স্বল্প হইলে অপরে সংস্কার করিতেও বাইবেক না। ফলে তাঁহাদের স্বাধীনতা বহু
সাম্রাজ্যের সংস্কার নিষেধ। সাম্রাজ্যের শব্দ বনে কেলিগা দিবার অনুমতি আছে।”

কৃপারাম বলিল, “মহাশয় উক্ত আদেশ আমিও বিশেষ অবগত আছি। মহাশয়
বঙ্গপি আমাকে সাহস বেন ত আমি যার স্তব্ধ দেব সীকার করিয়া সুমতি
এখানে আনাই।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “আমার তাহে কিছুই বক্তব্য নাই। কারাগার জেবার স্বাধীন-
ধীন। জেবার অনুমতি এ কারাগারে প্রবল। যদিচ তুমি আমার অধীন ও
বর্ণন্য বট তবাত এ সমস্ত ব্যাপারে তুমি স্বাধীন। তুমি বিবেচনা কর ও শেষে
আমাকে দোষের তানী না হইতে হয় ত বাহা ভাল বোঝা করহ। আমি বেন এ
সকল বিষয় আগত নহি।”

কৃপারাম কারাগারের পাক্ষিক বলিল, “চণ্ডী, শ্রীমত সুমতিকে এই বিপদের কথা
জান্যও; তিনি বঙ্গপি এখানে আনিতে চাহেন, তাহাকে আনিতে বল।”

চণ্ডীচরণ চলিয়া গেল। কারাগারের অপর প্রান্তের কোঠে সুমতির বাস।
সুমতি একান্ত দীনা অলাভ্যার দ্বার সেই অমশুভ মন্দির বন্দী হইয়া আত্ম ভিন বৎসর
বাস করিতেছেন। অল্প বয়সে মাতৃ হীনা হওয়ার বিমাতার বহু মাতৃশোক বিস্তৃত
হইয়াছিলেন। চন্দ্রবীণের রাজা কারহকুলভিত্তিক কন্দর্পরায় তুমিকের একমাত্র
পুত্র মহারাজ রাচন্দ্র রায় তুমিকের সহিত বিবাহ হয়। রামচন্দ্র রায় পিতার পর-
লোক যাত্রার পর স্বরাষ্ট্রে অভ্যস্ত হইয়া কিছুদিন প্রজাপালনে ও আত্মরক্ষায়
মগ্ন রাজার দৌরাত্ম্য দূর করত কীৰ্ত্তি লাভ করেন। মগেরা বাকলার তুমিককে
পদচ্যুত করত তাহার রাজ্য পুট করিয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব সংস্থাপন করে।
বাকলার রাজার সাহায্যের জন্য চন্দ্রবীণের তুমিক রামচন্দ্র রায় বধেই যত্ন করেন।
এমন কি স্বীয় ব্যয়ে পকাশী শূণ্ণীকৃত গুল্য (১) পাঠান। এক এক চন্দ্রবীণের
গুল্যে দু-টা করিয়া হস্তী, নয়টা গধু, সাতাইশটা অশ্বারোহী ও বহু পদাতি।
প্রতাপালিত্য আত্মরক্ষার মগ ও ভক্ত্য ফিরিঙ্গী দলের অনুকুলে বহুবল ছিলেন।
লোণারপ্রাচীর নবাবের বিপক্ষতাচরণে অল্প দলবদ্ধ করা অভিপ্রায়ে তাহাণিগের সহিত
প্রতাপালিত্যের কপালসঙ্গি হইয়াছিল। তাহাতে পরস্পর পরস্পরঃ র সহচর (২)
ও সহচর (৩) সাহায্যের জন্য স্বীকৃত ছিলেন। ফলে দোণারপ্রাচীর নবাবের
বিপক্ষতাচরণে প্রতাপালিত্য আত্মরক্ষার মগ ও বহু ফিঙ্গী একবদ্ধ হইয়া পরস্প-
রের পাক্ষিকতা (৪) অবস্থা লাভ করিয়াছিল। রামচন্দ্র রায়ের সাহায্যে প্রতাপা-
লিত্য অস্ত্রাভ্যাস প্রকাশ করিয়া দান্তিক বাক্য প্রয়োগপূর্বক স্বীয় আত্মরক্ষা

ভর্ৎসনা করিয়া পাঠান ও বাকলা হইতে সহায়কারী সেনা প্রত্যাবর্তন করিয়া আনিতে অনুরোধ করেন । রামচন্দ্র রায় স্বপ্নের উপদেশ বুঝা করিলে স্বীয় বিষয়ে ভাবনাকৃত আচরণ হইয়া না গিয়া অর্থাৎ ‘সবকার পিতা’ শাস্ত্রীয় গুরুজনের বাক্য অগ্রথা করা লৌকিক দোষ জ্ঞানে স্বয়ং নিদানাদি (১) দর্শাইয়া আশ্রয় স্থায় সংস্থাপন ও প্রতাপাদিত্যকে তুষ্ট করিবার চেষ্টায় চন্দ্রদীপ হইতে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করেন ও নিম্নোক্ত (২) স্বরূপ জৈনক প্রধান সভাসদ সঙ্গে পালনার প্রিয়পাত্র রমাইবীরকে পাঠান । রমাইবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইয়া রসিকতামূলক মহারাজের প্রতি হুই একটী ব্যঙ্গোক্তি করার যশোহরপতি রমাইবীরকে কারারুদ্ধ করেন ও রামচন্দ্র রায় সম্মুখীন হইলে তাহার অবস্থার অতিরিক্ত ভিন্নতার করিয়া তাহাকেও কারারুদ্ধ করেন ও স্বীয় কস্তা স্ত্রীমতি রামচন্দ্রের অনুগত হইয়া তাহাকেও বিবাহপাশে দিগ্ধা সমুচিত দণ্ডবিধান করেন । হর্ভাগা স্ত্রীমতি স্বামীর নিন্দা ও অপমানে মরিয়া হইয়া ত্রিমাণা হন । প্রথমে তর্ভাকে নান প্রকারে শাস্ত করিতে চেষ্টা পাল, পরে পিতা ও স্বামীর বন্দে স্বামীর সপক হইলে পিতৃকোপে নিপতিতা হন ও স্বামীর সহ কান্নাবদ্ধ হন । একস্থানে থাকিয়া বিপদের সময় নিঃশলাক (৩) কারাগারে কিয়দিন তর্ভাসেনার আশ্রয়স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু রোষপরবশ পিতা কারাগারেও দম্পতীর পরামর্শের সহযোগে কষ্টের হ্রাস হইয়া দেখিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করে । স্ত্রীমতি তদবধিই একাকিনী কারাগারে অনাথা দীনীর স্থায় কালযাপন করিতেন ।

চতুর্দশ কৃপারামের আদেশ মতে চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধন বলিল, “কৃপারাম ! বহুদিন যাবৎ মহারাজের কোন বিশেষ সমাচার পাই নাই । শুনিতে পাই মহারাজ নাকি পুরুষোত্তম নরসিং দেবের বাক্যে যাত্রা করিবেন । কিন্তু আবার নাকি মহারাজ মানসিংহ বাজারায় দণ্ডযাত্রার (৪) আসিয়াছেন । অন্য শুনিলাম যমুনাপুত্রই হইতে আদেশ আসিয়াছে ও তৎক্ষণ অত্র প্রধান প্রধান সেনাপতির স্বীয় স্বীয় সৈন্য লইয়া তথায় বাইতেছিল, পরিস্থিতি রাষ্ট্রাঙ্কুর সায়ে আবার যশোহর প্রত্যাগমন করিবে । যশোহরে সোনার প্রাচীর নবাবের আসিবার কথা শুনিতে পাই ।”

কৃপারাম বলিল, “বঙ্গের লক্ষণ বড় ভাল দেখিতে পাই না । মানসিংহের সভায় ভবানন্দ উপস্থিত হইয়াছেন ও গত ষটিকিতে বিশেষ ১ হায়ত : কংস বাগোঠান পরগণার রাজত্ব পাইবার আশা করিতেছেন । স্বজাতি অন্তর্মিলন ; বহিলে মহারাজ মানসিংহ কিছু বঙ্গে প্রতিপত্তি পাইতেন না । আমরা এনে করিয়াছিলাম যে, অকাল কাণ্ডে জাহা

(১) আদি কারণ ।

(২) সমস্ত ক্রমতাপ্রাপ্ত রাজসূত ।

(৩) জনশূন্য ।

(৪) শাসনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা ।

সেমা অবসন্ন হইয়া থাকিবে । কিন্তু ভবানন্দের সাহায্যে নৌকা ও রসদ লাভে লক্ষ্যজীব প্রায় হইয়াছে ।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “ভবানন্দের অদৃষ্ট ভাল । আজ কাল তাহার প্রতি বৃহৎস্পতি সূত্রসম । কোথা দেবতাপ্রতিষ্ঠার আয়োজন, কোথা নৃপেন্দ্রপূজা ? ও হয়ত এই অবকাশে তাঁহার স্বার্থ দিক্ছি হইল । ঝড় ও বারিষৎবর্ষণে অকাল হওয়ার প্রতিষ্ঠাদি নৈব কর্ত্তব্য ব্যাঘাত হইল বটে, কিন্তু এমন তাহার প্রাতঃবিধাতার শুভ দৃষ্টি যে, অসম্ভাবি ঘটনায় ভবানন্দ মারুৎ হইয়া পেল । কুপারাম, কি হইতে কি হয় কেহই বলিতে পারে না । হৃদয়ে অপরের পক্ষে উভা কুল কৃতি হইত । আয়োজিত জব্যের হানি ও উৎসাহ-তরু । কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে, ভবানন্দের সমস্তই মঙ্গলের জন্ত হইয়াছিল । সত্য বলিতে কি লোকে বলে যে, ভবানন্দ পূর্নাবধি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে যুগ্মযাত্রার বিষয় অবগত ছিলেন । পাছে স্পষ্ট আয়োজন করিলে আমাধিপের মহারাজের কোপ-দৃষ্টিতে পড়েন এই ভয়ে দেবপ্রতিষ্ঠা বলিয়া একটা রটনামাত্র করিয়াছিলেন ।”

কুপারাম বলিল, “মহাশয়, ভবানন্দের কথা কন কেন ? ভবানন্দ বালককালাবধি শুভগ্রহের কলভোগ করিতেছেন । সমুদ্রারের বিষয় লাভ, হুগলিতে লবায়ের অঙ্গুগ্রহে পারসী শিকা, আবার কানুনগোই পদাভিষেক ; পরে বলভপুত্রের রাজ্য, এ সমস্তই শুভ গ্রহের দৃষ্টির চিহ্ন সন্দেহ নাই । যদি মহাশয় বেক্রপ বালভেছেন, সুযোগ পাইয়া থাকেন, তবে ত তিনি যৎ এক জন প্রধান অধিকারী হইবেন সন্দেহ নাই । হুগলিাস তাহার শৈশবাবধি বুদ্ধিজীবী ও পরম সাহসিক ।”

একজন পদাভি আসিয়া, বলিল “মহাশয় যমুনাপর হইতে আগত জনৈক অধা-রোহী পতামায় (১) ব্যারে অপেক্ষা করিতেছে । মহাশয়াদিপের জন্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় হস্তবলহস্ত (২), আছে, বালভেছে আপনাদিপের হস্তে অর্পণ করিবে ।”

কুপারাম ও গোবর্দ্ধন সম চারটি তনিয়া পরস্পরের দিকে স-তাব দৃষ্টি করিয়া একত্রে ব্যস্তে কারাগারের দ্বারটিমুখে নেলেন । দেখেন, চন্দ্রাণের শিশুর অনতিদূরে একটা গাছের তলে একটা অধ পড়িয়া আছে । তাহার পার্শ্বের গছে আশ্রয় করিয়া অধারোহী বসিয়া আছে । ইহাদিপের আসিতে দেখিয়া সে অতি দ্রুত পাত্তোত্থান করিল ।

গোবর্দ্ধন বলিল । “ভাধারী সিংহ, তোমার অধের কি হইল ? কতদূর হইতে আসিতেছ ?”

ভাধারী পতামায় বলিল, “হজুর বন্দনী ! ইঃ ষোড়ী বরোবদ্ব যমুনা সে মেয়ে সত্তর-গ্নসে আতিথী । অ-গরু পাড় হোরু খড়ী ন হোগী । ইসকী দম্ব নিবলু গরী ।

জানি তি গয়ী । যেয়ে পিন্নারকি ঘোড়ী থি । বচ্পনুসে মৈনে ইস্কা হেফাজৎ কি ।
বহোত কড়ো পানি কী আনোবর রহী অব ইস্কা বকুত আ পঁহচি ।” বলিয়া আপনার
বক্ষঃস্থল হইতে চন্দ্রাবৃত এক পত্র লইয়া গোবর্দ্ধনের হস্তে দিল । “উজীর বাহাদুর সে
মুজ্জ্বকো ইস্ লেফাকা দি, হোর হজুরকী দস্তমে দাখিল করনেকো ফরমায়ী । গোস্তাকী
মাপ কিজিয়ে, মৈনে নেহারেং কাবু তয়া হুঁ” বলিয়া বসিথা পড়িল ।

গোবর্দ্ধন পার্শ্বস্থ দণ্ডপাংশুলকঃ (১) ভিত্তারী সিংহের শুজ্জাধা করিতে বলিয়া পত্র
লইয়া কৃপারামকে ডাকিয়া কিছু স্বত্বেরে গেলেন ও পত্র পড়িয়া কৃপারামের হস্তে দিলেন ।
কৃপারাম পত্রটী আদ্যস্ত পড়িয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল । আবার আদ্যস্ত পড়িয়া
বলিল “মহাশয় একরূপ স্বন স্বন বিপরীত অনুমতির কারণ কি ? সে দিন সমস্ত ফৌজ
যমুনাপর হইয়ে ওলব হইল ; আজ আবার তাহাদিগকে বশোহরে থাকিতে অনুমতি
আসিল ; এ ব্যাপারখানা কি ? যশোহরে এত ফৌজ থাকিয়া কি করিবে ? হস্বল
হুকুমে দেখা যায় যে, উজীর স্বয়ং মহারাজের আদেশে এই হস্বল হুকুম জারি
করিয়াছেন ও লেখেন যে, অনুমান হয় সোনারগ্রামের নবাব ডরায় বশোহর
আক্রমণ করিবেন, অতএব আক্রমণের পূর্ব-উদ্যোগ যথাবিহিত করিতে আদেশ
করিতেছেন ।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “ভালই হইয়াছে । যমুনা বাইতে বাইতে পথ হইতে ফিরিয়া
আসায় ডটমণ্ডলীতে (২) উৎসব ভঙ্গ ও উৎসাহ রূহিত হইয়াছিল, এমনত কি ভাটীর
(৩) জন্ত গোলযোগ করিতেছিল । অনেকে বালয়াছিল যে, আমরা বিদেশ নমনাশয়ে
পার্বস্থ্য সমস্ত বশোস্ত করিয়াছি, তাহার আমাদিগের বহল ব্যয় হইয়াছে, এক্ষণে
আমরা বঙ্গ্যপি ভাটীবৈতন না পাই, তাহা হইলে আমাদিগের ক্ষতি হয় । মুসলমান
কাণ্ডপৃষ্ঠেরা (৪) বিশেষতঃ পারিকসৈন্য শ্রেণীভ্যাগ করিয়া বাইবার ইজিতও করিয়াছিল ।
অনেক লাস্তানা করায় রুকুৎসুরা (৫) আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছে । কএকজন মুসল-
মান কবচহর (৬) সৈনিক তাহানগরের স্ব স্ব সেনা লইয়া পথিমধ্যে ছাটিল করিয়া
আছে । ভাটীর বিষয়ে বুকনাথ রূপবীর বাহাদুরের দস্তক (৭) অনুমতি না পাইলে
মধ্যাহ্নস্থ্যাহ্নস্থ্যের জন্ত অস্ত্র ধারণ করিবেক না । সৈন্যধ্যাকের দস্তক আসি-
বার প্রতীকা করিতেছে । এখন বঙ্গ্যপি সেনাচালন দস্তক জারি হয়, তাহা হইলেই
তাহানগরের ভাটী লভ হইবেক ও সেনামণ্ডলীতে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে ।”

(১) হরকরা । (২) সৈন্য সমষ্টি । (৩) ভাড়া ।

(৪) খাজুকী সেনা । (৫) অবরোধ ইচ্ছুক । (৬) কবচধারী সেনা ।

(৭) মোগল পাতসাহের দপ্তরের আদেশ পত্র ।

কপ'গ্রাম বলিল। “মহাশয়, বহুল সেনাসমাপন্ন অবস্থার মূল। যে রাজা স্বায় সৈন্যকে সর্বদা যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত রাখিতে পারে, সেই সুবুদ্ধি মুপতি হুখে সিদ্ধি যায়। সেনাদিপতির মন এমনি আশ্রয় যে, মিত্র হইলেই নানা প্রকার বিজ্রোহ ও বিপ্লবের নিকে ধাবমান হয়। দৈনিকেরা যেন বাসবন্ধের মত চুপ্ৰবৃত্ত হইলেই কুপথে গমন করে। বসিয়া বসিয়া মহারাজের তর্ক (১) ভোগ করিলে চূর্ণ্য হইতে সন্দেহ নাই। অতএব চিরসেনা অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের মতে তাত্‌কালিক সেনা অনেক বিধায় উৎকৃষ্ট। মহারাজ বসন্তরায় ও ঈহার শাসনকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কক্ষবেক্ষক (২) রাজীব (৩) প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বৈতনিক চিরসেনা ব্যতীত অতিরিক্ত সেনা রাখিতেন না। প্রয়োজন হইলেই গ্রামবাসীদিগকে যুদ্ধে নিয়োজন করিতেন ও তাহাদিগকে অত্যন্ত শত্রু করিবার জন্ত লম্বের সময়ে পর্যবেক্ষণাদি করিতেন।”

পে'বর্জন বলিল। “এ কথা সত্য বটে, কিন্তু চিরসেনা না থাকিলে প্রয়োজন মতে সুশিক্ষিত সেনাসমূহ সংগঠন করা হইতে পারে। সে বাহা হউক, জয়ভীপুত্রের নাকি বিপ্লবচটনার উদ্যোগ হইতেছে। কল্য যে কমলালেবুর কএক থান লোকা আসিয়াছে, তাহার চতুর্দার কএকজন আপনা আপনি যাহা বলাবলি করিতেছিল, তাহা বাজারে রটিয়াছে। এ যাত্রায় জয়ভীপুত্র হইতে অনেক লোক সমাপন্ন হইয়াছে। এত পাহাড়ী লোকের আগমন আর কখন হয় নাই। কমলা লেবুর আমদানি ভত নাই, কিন্তু মূল্য কম। ইহারই বা কারণ কি। এত অল্প আমদানিতে অল্প মূল্য কখন দেখি নাই। পত্নী রাত্রিতে শুনিলাম তথাকার বর্তমান রাজার উপর ভরত্যা অনেকানেক মীরাশদার, দল্লুই ও চৌধুরী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট আছে। জয়ভীপুত্র লটকা তনুলাম মধ্যে খ্রীহট্টের অধিপতির সহিত কএকটা হস্তা লইয়া বিবাদে খ্রীহট্টের বিপক্ষে রাটা (৪) প্রকাশ করার ওমরাও মণ্ডলীতে বিশেষ নিকার (৫) উপস্থিত হয় ও কএকজন প্রধান প্রধান দল্লুই ও চৌধুরীরা জয়ভীপুত্র লটকার বিপক্ষে আকার ইঙ্গিত করেন। রাজা তাহার একান্ত স্পষ্ট রোষ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, স্তম্ভ-সিংহের শাসনের উপায় পোপনে চেষ্টা করিতেছেন। ইতোমধ্যে মুখ্য চৌধুরীরা বীর অমঙ্গল আশঙ্কার পূর্বহিন্দুরাজপুত্র স্বর্ঘ্যকুমারের জন্ত উদ্যোগী আছেন। যদিচ জয়ভীপুত্রের অধিকাংশই অনাধ্যাপকতার ভাতি; কিন্তু স্বর্ঘ্যকুমারের পিতার শাসনকালে শাসনপ্রণালী ও রাজ্যনায়ে সন্তুষ্ট ছিল।”

(১) সেনা বেতন। (২) বাটীর অনুচর প্রহরী।

(৩) রাজার শরীর রক্ষক সেনা।

(৪) রাজকীয় ইচ্ছাচার। (৫) অমাত্য মণ্ডলীতে বিপক্ষ মত।

কুপারাম বলিল, “মহাশয়, সূর্য্যাকুমারের পিতার রাজ্যনার ধর্ম্মমূলক ছিল। তিনি আমাদিগের রাজপিতৃব্য বসন্তরাজার বিশেষ আশ্রয় ছিলেন ও সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। কামাখ্যার মন্দিরে উভয়ের মিলন হয় ও তদবধি যশোহর ও জয়ন্তীপুর মিত্রভাবে পরস্পরকে দেখিত। তৎকাল বিগত চৌধুরী নন্দরাম স্মৃতিতেছি জীবিত আছে ও এখন সে সূর্য্যাকুমারকে জয়ন্তীসিংহাসনে বসাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে। সে নাকি আমাদিগের মহারাজকে উক্ত বিষয়ে কি পত্র লিখিয়াছিল।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “হঁ। আমরা সে পত্রের বিষয় অবগত আছি। সে পত্রকে কোথা হইতে পাঠাইল ও কি প্রকারে মহারাজের গোশাগৃহে (১) পৌঁছিল, তাহা তদন্তের জন্য আমার উপর ভার হয়। আমি যশোহরের সমস্ত চৌলদ্রী (২) ও সরাই ও পেটায় (৩) অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কিছুই অনুসন্ধান পাইলাম না। মহারাজ তাহার আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লেখকের অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে গুপ্তগতি (৪) নিযুক্ত করিতে আদেশিলেন ও বলিলেন, ‘বেকেহ নন্দরাম চৌধুরীকে জীবিত বা মৃত আনিবে তাহাকে আমি বিহিত পুরস্কার দিব। নন্দরাম স্মৃতিলাম পত্রে তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করে ও সূর্য্যাকুমারকে তাহার রাজ্যে পাঠাইতে লেখে।’ এই কথা বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন আপন অশ্ব আরোহণ করিল। এমত সময় চণ্ডীচরণকে আসিতে দেখিয়া কুপারাম বলিল, “মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন, চণ্ডীচরণ আসিতেছে।”

চণ্ডীচরণ আসিয়া বলিল। “মহাশয় স্মৃতি অনুমান করি উন্নতা হইয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট বাইরা ক্রমে ক্রমে রামচন্দ্রের অকস্মাৎ হত্যার কথা প্রকাশিলম। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে কয়েক কাল চাহিয়া থাকিয়া লক্ষ্য দিয়া উঠিলেন ও এমত স্নেহ (৫) অট্টহাস হাসিলেন যে, আমার রক্তাশ্র (৬) হইতে সমস্ত শোণিত স্নায়ুভাটায় (৭) ছায় বেগে সর্ব্বাঙ্গে বহিতে লাগিল ও আমার রোমাধিকার (৮) হইল। আমি শিহরিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। আবশ্য পশ্চিমধ্যে দেখি স্মৃতি উন্নতাশ্রয় আলুলাবিতকবরী সর্ব্বাঙ্গে ভস্মাবৃত্তা হইয়া নোড়িয়া বাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে কয়েক জন লণ্ডপাংগুল দৌড়িয়া বাইতেছে কিন্তু স্মৃতির বে লক্ষ ও বেগ, অতি লীলা তিনি তাহারিগকে দূরে রাখিয়া বাইবেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ফিরিয়া তাহারিগের প্রতি তল তল করিয়া হাসিতেছেন আবার বেন দ্রিষ্ (৯) গাততে লিহলিয়া বাইতেছেন।

(১) রাজশয়নাগার। (২) বে সরাইতে ব্রাহ্মণ অনুচর নিযুক্ত থাকে।

(৩) দুর্গবেষ্টিত পত্নী। (৪) চর। (৫) ভয়ানক বীভৎস। (৬) স্রুপিত।

(৭) জোয়ারভাটা। (৮) লোমাক। (৯) গিহলিয়া বাওয়া।

‘তাহার বেগ ও মস্ততা দেখিয়া আমি দণ্ডপাংস্তলগণকে দিরজ হইতে কহিয়াছি । এখনে বাহা বিধের আশ্রয় করুন । উন্নতাকে কারাগারে রাখার আর ফণ কি ?’

গোবর্দ্ধন বলিল । “দণ্ড পাংস্তলগণকে নিবৃত্ত হইতে বলা তোমার ভাল হয় নাট । তাহার পরান্ত হইয়া প্রত্যগম্য করিলেই ভাল হইত । যাহা হউক এ বিষয়ে তুমি স্থায়্য এতেনা দিব ।”

চণ্ডীচরণ বলিল ‘বধা আদেশ আচরিব ।’

গোবর্দ্ধন স্বীয় অর্থ চালন করেন, এমত সময় স্মৃতি ক্রতপদে আসিয়া তাহার অশ্বের নিখালদেশ (৭) ধরিল । ভক্তিল (৮) অমনি স্থির হইয়া দাঁড়াইল । আহা ! তপ্তকাকন নিত্য বর্ষে যনঙ্গনদের স্থায় কেনভার হি বোভাচ্ছে । স্মৃতির আলুনারিত কেশ তাঁহার ক্রতগমনে ও বয়ুবেগে কৃকচমরীর স্বক্বেশের স্থায় বোধ হইতেছে ও কেশান্ত-রুল দিয়া মুখচন্দ্রের লালিত্য যেন তমাল তরুর যনশাখা মধ্য দিয়া শশী দর্শন হইতেছে । স্মৃতি দীর্ঘছন্দা, পরন্তু দৈর্ঘ্যের হিত রূপলাবণ্য ও অক্লের কোমলতা একতান হওয়ার যেন বিহীনতার স্থায় শোভিয়াছে । স্মৃতির চক্ষু এমত সম্রাতিত ও এত বিস্তৃত যে, মুগ্ধবয়স বলিলে তাহার অংশমাত্রের উপমা হয়, কিন্তু চাকল্যের অগ্র ধঙ্কনকে মনে পড়ে । স্মৃতির নাসিকা দীর্ঘল ও টীকল, উজ্জ্বল অধরাপেকা প্রতুল, কিন্তু ওষ্ঠবয়ের গঠন এমত মূললিত ও রক্তিম যে, স্মৃতি যদি স্থির হইয়া ধ্যানে বসেন, তাহা হইলে পক্ষিতে চক্ৰাঘাতে অসংসী হইবেক না বলিলে অতিরিক্ত বলা হয় না । স্মৃতির দৈর্ঘ্যোগ-বোণী বিস্তৃত বন্ধস্থল আর কৃষ্ণদণ্ড সমুপবৃত্ত পীন । স্মৃতির সর্বদ্রষ্ট মুগঠিত ও মুচাক্স পরিণত ; এমত কি স্মৃতি কে দেখিলেই একটা বীরাদনা বলিয়া বোধ হয় । উন্নতপ্রায় হওয়ার নেত্র আরাক্তম হইয়াছে । আলুনারিত কবরীতে বেন পাক্ৰীত দেবীর শক্তিস্বরূপ বোধ হইতেছে । দেখিলে বেন গৌরী বিন্যাস আবির্ভাব জ্ঞান হয় । একাধারে প্রেম ও বল, দৈর্ঘ্য আর লালিত্য, প্রসন্নতা আর করালতা আর কুত্ৰাপি দেখা যায় না । বেন মস্ত মাতী প্রায়, বেন মহিষমার্কিনী চণ্ডিকা তুল্য, বেন নব-কুম্মিত আধপ্রক্ষুতি বনস্তানগমের কমলিনী স্থায় । আধ-কুম্মিত কমলপটলের উন্নতাবস্থা দেখিয়া কঠিঞ্জের সহিত কোমলতা অনুভূত হয়, স্মৃতির উন্নতভেদে সেই-রূপ অনুভব হইতেছে । গোবর্দ্ধন চমকিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, “বেঙ স্মৃতি । না তুমি এখনে কেন ? চল রামচন্দ্রের ঘরে বাই ।”

স্মৃতি বলিলেন । “কিলেদার ! এখন সেখানে বাইয়া আর কি করিব ? রামচন্দ্র রায় জীবিত থাকিতে আমাকে তাঁহার শ্রীচরণ দেখিতে দিলে না, এখন আর সেখানে বাইব না । তুমি আছে, ঐ নায়েব আছে, এখন এ স্থলে মহারাজ নাই । তোমাগিগের

আজাই বলবতী । আমাকে আদেশ দাও ; আমি পড়িয় সহগমন করি ।” বলিয়া অবনিগাল ছাড়িয়া অবের স্বক্বেশে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন ।

কৃপারাম নিকটে আসিলে গোবর্দ্ধন বলিল । “কৃপারাম ! স্মৃতি তাঁহার পড়িয় সহগমন করিতে চাহেন । তোমার তাহাতে কি মত ?”

স্মৃতি বলিল, “এখন আর মতামতের সময় নাই, আমি একান্তই আমি-বিরহ সহ করিতে পারিব না ।”

মামুজা আসিলে স্মৃতি বলিল, “কৌজদার ! তোমার অনুমতি চাহি ; আমি আমার আমি সহগমন করিব ।”

মামুজা বলিল । “মরিতে চাহ মর । তাহা কি প্রকারে ঠেকাইতে পারি । তবে সতীর মত মরিতে পাইবে না । মহরাজের আদেশ আছে যে, হিন্দুমতে তোমান্নের সংকার হইবেক না । আমরা রামচন্দ্রকে বলে কি ভাড়াড়ে ফেলিয়া দিব । লাল আলাইতে দিব না । তোমার মরিয়ার ইচ্ছা হয় মর ! তোমার লাস বেখানে ফেলিব, রামচন্দ্রের লাস সেথায় ফেলিব না ।”

স্মৃতি, মামুজার এই কঠোর বাক্য শুনিয়া নিতুঙ্গ হইল । একটা নিখাল ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে তক্তিলের স্বক্বেশ হইতে তাহার হাত সরাইল । ক্রমেক হেঁট মুণ্ডে দাঁড়াইয়া কারাগারের দিকে দৌড়িয়া গেল । মামুজা চণ্ডীচরণগতিককে বলিল । “চণ্ডীচরণ ! স্মৃতি কারাগারে বাইতেছে, তাহাকে বরে বন্ধ করিয়া রাখিবা ।”

গোবর্দ্ধন কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল । কৃপারাম নাএব তাহার পশ্চাৎ গমন করিল । মামুজা স্বীয় কর্ণে হানাত্তরে গেল ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

“অনেকা বদমিতং বিকূৰ্জতে বস্তুভিঃ ক ইব তত্র বিস্ময়ঃ ।”

গোবর্দ্ধন টানখানের কারাগার হইতে বাইতে বাইতে পথিমধ্যে এক বড় আত্ম বাগানের ধারে অনেক জনসমাগম দেখিয়া জটনক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন । “ওখানে কিসের জনতা ?”

পান্ডা বলিল । “মহাশয় ! ওখানে একজন সাধু বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট সকলে নানাবিধ রোগের ঔষধ লইতেছে ও স্বীয় স্বীয় অন্তঃকরণ ফল বিচার করিতেছে । বড় আশ্চর্য্য সাধু ! তিনি আজ ১২ দিন সেইখানে বসিয়া আছেন,

কিছু খান না, অবশেষে বলবান হুহ শরীর পূর্বে দেখিরাছিলাম, আজও তেমত আছেন।”

অপর একটা লোক আসিয়া বলিল। “মহাশয়! এত অসাধারণ ক্ষমতা আর কাহার দেখি নাই। সাধু প্রভিগ্রহ করেন না ও অকাতরে সকলের রোগশান্তি ও নৈকামনা পূর্ণ করাইয়া দেন। সাধু পিশাচাদি কি সিদ্ধপুরুষ না হইলে এত ক্ষমতা কোথা হইতে হইল?”

অপর এক জন বলিল। ‘মহাশয়! ঐ যে সাধুর পশ্চাতে বসিয়া আছে, উটি জন্মক, ইহার বয়স এখান হইতে অনেক দূর, তালিলা। নন্দীয়া বাসিন্দা। ঐ লোকটি সোণারগ্রামে কৰ্ম্মবশতঃ তাহার সহোদরের নিকট বাইতেছিল। নৌকা হইতে উহার সঙ্গগণ আহার করিতে বাজারে নামিয়াছিল, বাজারে অকটিকে এক বিপণির নিকট রাখির তাহার সঙ্গের লোক অপরাপর জন্মাদি ফের করিতে বিনয় হওয়ার অকটী সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে যাইবার উদ্দেশ্য করে। বৃষ্টি না থাকায়, নদীতীরে এই সাধুটি বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তপ করিতেছিলেন। ইহার উপর পড়িয়া যায়। সাধুর বোণ ভয় হওয়ার সাধু চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন। “তুমি কি চক্ষু থাকিতে দেখ না? আমার উপর আসিয়া পড়িলে?” তাহাকে ঐ অকটী বলিল, ‘আমি জন্মক। আমার চক্ষু নাই। সঙ্গের লোক কোথা গেল আমি না। আমি পথও পাই না। তুমি যে পথে বসিয়া আছ, তাহা আমি কি প্রকারে জানিব?’ সাধু বলিল। ‘তোমার চক্ষু থাকিতে তুমি দেখনা?’ অকটী বলিল। ‘আমার চক্ষু নাই তা দেখিব কি?’ সাধু, ‘আমাকে স্পর্শ করিয়া কে অকটী?’ বলিয়া পাত্রেখান করিয়া চক্ষুতে পল্লবত বুলাইয়া দিলেন। জন্মকটি চক্ষু চাহিয়া দেখিল ও তৎক্ষণাৎ সাধুর চরণবয়স মন্তকে লইয়া বলিল। ‘প্রভু! তুমি আমার পিতা ও আমার কর্তা, আমার জন্মদাতা অপেক্ষাও অধিক দান করিয়াছ, তুমি কে?’ বল।’ সাধু বলিলেন। ‘বাবা! আমি ককি, আমি তোমা অপেক্ষা নায়কী ও পাপী, আমার পদস্পর্শ করিও না। জন্মক বলিল। ‘বাবা! আমার জন্মবন্ধির অকটী হুহ করিয়াছ, তুমি অধিক চক্ষুদান করিয়াছ, তুমি বড়।’ মহাশয়! আজ কয়েক দিনের মধ্যে সাধু কত অকটী চক্ষু দিয়াছেন, কত পঙ্গুকে পদ দিয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। দেশ যিনেশ হইতে নৌকা করিয়া লোক তাঁহার নিকট আসিতেছে ও যেউলাত করিয়া তাঁহার খজান করিতেছে। প্রথম জন্মকটি তাঁহাকে ভয় বলিয়াছে ও সোণারগ্রাম বাওরা ত্যাগ করিয়া সাধুর সঙ্গে ককির হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি আসিতেছে সেই ইষ্টলাত করিতেছে, আর সাধুর শিষ্য হইয়া তাঁহার সেবাদি করিতেছে। তাঁহার সঙ্গ ছাড়ক না। সাধু, জনতার ভয়ে বাকার হইতে উঠিয়া এই আত্মবাগানে অন্য প্রান্তে আসিয়া বসিয়াছেন।

এখানেও লোকসমাগম হইতেছে। মহাশয়! চন্দ্রন সাধু দর্শন করুন। আমার কতায় সন্তান হয় নাই বলিয়া এখানে আসিয়াছিলাম। সাধু, এই ঔষধ ধারণ করিলে পুত্র সন্তান হইবেক বলিয়াছেন, আমি ঔষধ লইয়া বাইতেছি।”

অপর একজন বলিল। “আমার পক্ষাঘাতে দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া নিরাহিল। জীবিকা-নির্বাহ অল্প আমাকে পন্নিভ্রম করিতে হয়। আমি নৌকার চড়নদার হইয়া চূপ আনিয়াছিলাম! আমি আজ ছয় দিবস সাধুর পদসংস্পর্শে আমার রোগ ত্যাগ হইয়াছে। আমি দক্ষিণ অঙ্গ বল পাইয়াছি ও সুখে বেড়াইতেছি।” অপর একজন বলিল। “মহাশয়! সাধুর কৃপায় আমার বথঃসর্বস্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কল্য সন্ধ্যার সময় বাজারের বাটে আমার পুটুলি রাখিয়া নদীতে হস্ত পদাদি ধৌত করিতে লামিয়াছিলাম। উঠিয়াই দেখিলাম যে আমার পুটুলি নাই। আমি বিদেশীর ভ্রুংখী লোক, আমার পাথের যথাসর্বস্ব অপহৃত হওয়ার আমি উন্মত্তঃবরে রোদন করিতে লাগিলাম। সাধু কৃপা করিয়া আমাকে বলিলেন। ‘বেটা! রোর মৎ, তেরা কাপড়া ও রুপৈয়া ঐ পাছে আছে।’ আমি পাছের তলার বাইধামাত্র তাহার ডাল হইতে আমার পুটুলিটি আমার স্বকে পড়িল।

গোবর্দ্ধন, এই সকল কথা শুনিয়া কৌতুহলে সাধুদর্শনে গেলেন। বাগানের বাহিরে আপনায় অব হইতে অবতীর্ণ হইয়া হাঁটিয়া ভিতরে বাইতে বাইতে লোকারণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বতলোক যাতারত করিতেছে, তাহার মধ্যে পরিভ্রিত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অনেকই বিদেশীর, পূর্ব ও উত্তর স্বাজ্যের বাঙ্গালী, মাঝে মাঝে চুই চাক্রিজন অনুমানে ত্রীহট ও জয়ন্তীপুরের পার্বত্যদের মত দেখা গেল। ক্রমে অগ্রসর হইলে দেখেন, বিশালকর সুবিস্তৃতশাখ প্রবীণ একটি আম্র গাছের তলার সাধু একটা বাঘছালের উপর বসিয়া আছেন। সাধুর শুভ্র শ্রাফ্র প্রশান্ত বকুলকে আবরণ করিয়া মাভীদেশ পর্য্যন্ত প্রগম্বিত হইয়াছে। শিয়োভাগ জটাভারে মহন্ত লাভ করিয়াছে। জটাগুলি ললাট হইতে অপহৃত হইয়া স্বকদেশকে আবৃত করিয়াছে। কাকপক্ষ (১) দিয়া সমস্তগুলি ললাটের পঞ্চাৎ ভাগে বাঁধা। সর্কাজে বিভূর্তিলিপ্ত হওয়ার চমৎকার সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। শরীর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘল। তাহাতে সাধু, সাহসক্রে পন্নাসনে বসিয়া দক্ষিণ করে প্রকাণ্ড রুড্রাঙ্কষ্টক মালা ফিরাইতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড শমী গাছের সমূল স্বক অঙ্গে অঙ্গে ভ্রমরাশির উপর অলিঙেছে। শান্ত-প্রকৃতি সাধু সকলেরই সহিত হস্তবদনে আলাপ করিতেছেন, কিন্তু দক্ষিণ করে জপমালাও ফিরাতে ক্রটি হইতেছে না। সাধুর নিকটস্থ হইলে, সাধু ইবৎ কটাক-

হৃষ্টিতে গোবর্দ্ধনের প্রতি দেখিয়া চন্দ্রবর্ষ ভূমির দিকে নামাইলেন ও হাতবন্দনে জ্রমে পত্নীতাব অবলম্বন করিলেন। গোবর্দ্ধন সমস্ত্রমে সাধুকে প্রণাম করিলে, সাধু নীরবে দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্বক হস্তিতে আশীষ করিলেন। গোবর্দ্ধন তাহার আশ্বাসকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া গলগলীয়িতবাসে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। সাধু সেটি লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে পরে ঈষদ্ প্রসন্নবদনে গোবর্দ্ধনের প্রতি চাহিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন। গোবর্দ্ধন একটি কুশাগনে বসিলে, সাধু পশ্চাত্তস্থ চেলায় প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জনতা অপসারণ করিতে বলিলে পশ্চাত্তস্থ চেলা নিকটস্থ লোক-সকলকে অন্তরে বাইতে বলিল। তাহার দূরে চলিয়া গেলে সাধু বলিলেন। “বাবা! তোমার রাজচিহ্ন দেখিতে পাই, তুমি তুমি হুয়ায় হুজুরারী রাজা হইবে।”

গোবর্দ্ধন, এই শ্রুতিশ্রবণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল। “বাবা মহাশয়, কএক দিন এখানে আসিয়াছেন, আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই। জানিতে পারিলে অগ্রেই আপনার ত্রিচরণ দর্শন করিতাম। আমাদিগের বশোহরের অন্য অতৃষ্ট শুভ বোধ করিতেছি। আপনার তুল্য সিদ্ধ পুরুষের এ সকল স্থানে স্তভাগমন একান্ত বিরল। মহাশয় এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন?”

সাধু বলিল। “বাবা! আমি কামরূপ হইতে আসিতেছি, ইচ্ছা আছে চন্দ্র-শেখর হইয়া মহেশখালীর আদিনাথ শাবার দর্শনে বাইব।”

গোবর্দ্ধন। “বাবাজি! আপনি দয়ার সাগর! শুনিলাম, অনেক চিরকোণী ও অর ও পক্ষুকে আরোগ্য ও চন্দ্র ও বল দান করিয়াছেন, আপনার অসীম কৃপাতা শুনিয়া আমি বাবাজীউর নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আনিয়াছি। শুনিলাম আপনি নাকি ভূত ও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালেই সমদর্শী।”

সাধু বলিলেন। “বাবা! আমি অত্যন্ত দারকী ও হীনবল সামান্ত মনুষ্য। আমি কিছুই জানি না। তবে বাবা বলি সে আমাকে কে বলায়। লোকের রোগ আমি আরাম করি নাই, ঈশ্বর সমস্ত জানেন।”

গোবর্দ্ধন বলিল। “বাবাজি! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি বর, আমি একান্ত তোমার দাস।”

সাধু বলিলেন। “বাবা! আমি জানি, তুমি বড় মনের অশ্বখে আছে। তোমার ত্রীর শস্য রোগ হওয়ার তোমার সন্তানসন্ততি হয় নাই। চিন্তিত হইও না। তুমি এককালে সন্তান লাভ ও রাজ্যলাভ করিবে। তোমার ললাটে উজ্জ্বলতা আছে, এটা রাজদণ্ড। বাবা, তোমার কর দেখি?”

গোবর্দ্ধন আপনার দক্ষিণ কর বিতরণিয়া সাধুর সম্মুখে রাখিলে সাধু বলিলেন। তোমার পরমায়ুরেখা অতি হৃদীর্ঘ, অশীতিবৎসর বয়স্ক্রমে তোমার একটি ব্যাঘাত

বাটবে, তাহা উত্তীর্ণ হইলে তুমি শত শারদজীবী হইবে। বাবা! ভীত হইও না। ভীকর সংসারে কিছুই হয় না। ভীকরতাবের রাজ্য লাভ, হয়ত স্বল্প তুমি লাভে পরিণত হয়। উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্য লাভ করে। বসুন্ধরা বীরভোগ্য বলিয়া বিখ্যাত। অতএব বাবা! সুযোগ পাইলে, “অদৃষ্টে থাকেত পাব” বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইও না। দৈবে দেয় বটে, কিন্তু আয়াসাতাবে ফলের লাভ হয়। নিকটে আইস, তোমাকে একটা গুপ্ত কথা বলি। প্রতাপাদিত্যের পাপ কলস পূর্ণ হইয়াছে। নারকীয় গ্রহবৈজ্ঞান্য। বাও বাবা! দেখিয়া আইস, যশোহরের শরীর মন্দিরে তাঁহার মুখ কোন্ দিকে? তিনি বিমুখ হইয়াছেন। বিক্রমাদিত্য পূর্বে এ সমস্ত অনুমান করিয়াছিল। বসুন্ধরার, সরলতাব হেতুক যশোহর ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু বিধির পুণিতে তাঁহার বংশে যশোহরের সিংহাসন লিখিয়াছিল। তিনি যশোহর ত্যাগ কর/ অর্থাৎ বিধির লিখন অগ্রবা হইবার উপায় হইল। বাবা! স্থির হইয়া শুস। তিনি নির্বংশ হইয়াছেন, এখন প্রতাপাদিত্যও তরার নষ্ট হইবেক, আমি নিশ্চয় চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তুমি এখনকার রাজা হইবে। বাবা! বুঝে বুঝে কাজ করিবা। অধিক কি বলিব?”

এই কথা শুনিতে শুনিতে গোবর্দ্ধনের শরীরে রোমহর্ষণ হইল। গোবর্দ্ধন ক্ষতিগ্রস্ত বচনে মুগ্ধ হইল। বলিল “একু। আমার অদৃষ্টে রাজ্য কখন হইবেক না। আমি সামান্য কিলেন্দার, আমার কি ক্ষমতা?”

সাদু বলিলেন “বাবা! তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না। বিধাতার এমন মায়ী, যে প্রোক্ষিতছাগ ক্ষেদ্রস্তম্ভে আবদ্ধ হইলেও উপচারের ফুল চবাইতে ফ্রেটা করে না। তজ্জপ আগন্তুক সুখ পাত্রকে পূর্ককণেও মোহ হইতে মুক্ত করে না। উপাকৃত (১) পত্বে যেমত তাহার নিকট মৃত্যু বৃক্তে পারে না, তুমিও সেইরূপ আত্মত্যাগ (২) হইয়াও আগতপ্রায় সৌভাগ্য বৃক্তে পারিতেছ না। আমি কিন্তু সমস্ত দেখিতে পাইতেছি। এখন বাও, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া আচরিবে। সুযোগ ছাড়িও না।”

সাদু নীরব হইয়া চিন্তা মুগ্ধিত করিয়া অপমালা ফিরাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন কণেক স্থিরদৃষ্টিতে বদিয়া “একু। এক্ষণে বিদায় হই” বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল, পাত্ৰোপান করিয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিয়া গেল। পথে তাহার মনে নানা প্রকার ভাব উদয় হইতে লাগিল। সাদু-যোগে বীজ সমুচিত্তহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তাবিল, আমার উন্নতির ব্যাঘাত কিছুই দেখি না। সর্বত্রই এইরূপ ষাটগা থাকে। একের অধোগতিতে সন্ন্যাসিত লোকের উন্নতি হয়। ক্রেতাদাসেও দিল্লীর বাদশাহী

পাইয়াছে। বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই। বিজ্ঞানমিত্যের পুণ্যে বশোহরে তাহার বংশে লক্ষী স্থির ছিলেন। এক্ষণে আর সে পুণ্যের বল নাই। ভাল, একবার বশোহরের বরীদ দর্শন করিয়া যাই। ক্রমে তাঁহার মন্দিরের নিকট হইলে অগ্ন হইতে অবতীর্ণ হইয়া মন্দিরের দ্বারে হস্তপদাদি ধোত করিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ মাত্র তথাকার পূজক ব্রাহ্মণ আলিয়া অশ্রুট স্বরে বলিল। “মহাশয়! অন্য প্রাতে আমি আপনার বাটীতে গিয়াছিলাম। মহাশয় অবে বাহিরে গেছেন শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আবার মহাশয়ের দর্শনে হাইতেছিলাম।”

গোবর্দ্ধন বলিল। “কেন ভট্টাচার্য্য তোমার সমস্ত মঙ্গল ত?”

পূজক বলিল। “মহাশয়ের কল্যাণে কার্য্যিক মঙ্গল বটে, কিন্তু অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়াছি। অন্য প্রাতে দেবীর দ্বার খুলিয়া দেখি, মাতা আমাদিগের প্রতি বিমূগ্ধ হইয়াছেন। আপনি একবার মন্দিরে আহুন।”

গোবর্দ্ধন মাটিশালা পার হইয়া মন্দিরের দ্বারে গিয়া চমকিয়া উঠিল ও বলিল। “ওঃ একি? সাধু প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ। বাহা বলিয়াছে তাহা সত্যই ঘটয়াছে। একি, এমনত কখন শুনি নাই। এই মূর্তি উদ্ধারের সময় দৈববাণী হয় যে, “আমার আনন পর্য্যন্তই তোমরা পূজা করহ, আমার শরীর তুলিবার প্রয়োজন নাই।” এ নৈবাজ্ঞা অগ্রাহ করিয়া আমরা অধিক খনন করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐদেবীর আনন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় নাই। বস্তু নীচে খনন করা হইয়াছিল ততই প্রত্যন্ত, তাহার শেষ নাই। এক্ষণে সেই দেবী পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন। এতক্ষণে সাধুর বাক্য আমার বিশ্বাস হইল। বশোহরের সিংহাসন একান্তই শূণ্য হইল।” বলিয়া মনে মনে ভাবিল, “এক্ষণে আমার চেষ্টার সময়।” বলিল “ভট্টাচার্য্য! কি করিব? প্রতাপাদিত্যের অদিত্য অন্তিমিত হইতেছে, এক্ষণে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবেন না।”

ভট্টাচার্য্য বলিল। “মহাশয়! এক্ষণে মহারাজ অবর্ত্তমানে আমাদিগের হৃৎকথন কথা শুনে, এমত লোক নাই। শাস্ত্র মত অস্ত্রত্যাগ আবশ্যক। তাহাতে মহাশয়ের বৈরাগ্য মত।”

গোবর্দ্ধন বলিল। “অবশ্য, শাস্ত্রিকরণ কর্তব্য সন্দেহ নাই। এক্ষণে মহারাজের নিকট হইতে আদেশ আনাইতে বিলম্ব হইবেক। অথচ দৈবকর্ত্তে অবস্থ করা উচিত নহে। দেবী বখন পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন, তখন মন্দিরের দ্বার পশ্চিম দিকে ফুটান উচিত। আমি দেবীর পশ্চিম দিকে স্বর্ণের কবাট করিয়া দিব। তুমি আমার মঙ্গলোদ্দেশ্যে দেবীর নিকট অন্য “জাতবেদসে” মন্ত্রে সহস্র সাজ্য বিশ্বপত্রেয় হোম করহ। মহারাজের অবিলম্বে আমায় মঙ্গলেই রাজ্যের মঙ্গল। অতএব অন্যান্যি আমায় নামে দেবীর মূল পূজা দিব।”

ভট্টাচার্য্য বলিল। “বে অজ্ঞা মহাশয়, শাস্ত্রে বলে অমাত্যের মঙ্গলে রাজ্যে মঙ্গল।”

গোবর্দ্ধন, অঙ্গরক্ষকের কোষ হইতে বিংশতি ধান আকবরী মোহর বাহির করিয়া দেবীর সমুখে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, ভট্টাচার্য্য বলিল। “মহাশয়! আপনি রাজা হউন। বিধাতা মহাশয়ের মন রাজার মনের তুল্য করিয়াছেন।”

গোবর্দ্ধন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। স্বীয় গৃহে বাইতে পথে রাজমন্দিরের দ্বারের সমুখে আসিয়া দেখিল, দ্বারে বহুবক্তা লোক দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, “মহাশয়! গত রাত্রিতে মহারাজের শয়নমন্দিরে আগুন লাগিয়াছিল। তাহার তাঁহার সমস্ত পুস্তক ও পঞ্জাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কি প্রকারে আগুন লাগিল, বুঝিতে পারি না। এক্ষণে কি করা উচিত? আমরা মহাশয়ের নিকট এতদংশ দিতে গিয়াছিলাম। মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।”

গোবর্দ্ধন বলিল। “বিধাতা একান্ত বাম না হইলে গৃহনাশ হয় না, এটি উপসর্গ। এক্ষণে আমার কি করা উচিত, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আশ্রয়ান্তে আমার নিকট বাইও, আমি ব্যর্থতা করিয়া দিব।”

গোবর্দ্ধন ক্রমে অধিক রোজ হওয়ার ব্যস্ত হইয়া স্বীয় আবাসাশ্রমস্থলে চলিল, কিছু দূর বাইলে রাজকোষের সমুখে বক্সি (১) ও অপরাপর অনেক লোককে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল। “বক্সি! তেমার এখানে আমার কি ব্যাপার? এত জনতা কেন?”

বক্সি অগ্রসর হইয়া বলিল “মহাশয়! আমি ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। আমি প্রাতঃকাল অবধি এখানে উপস্থিত। মহাশয়! সন্নিধান ঘটয়াছে। আমি কোন্‌দার মহাশয়কে এতদংশ দেওয়ার তিনি আমাকে বলিলেন, ‘যখন রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন এখানে আর ভাণ্ডার রাখা উচিত নহে। আমার বাটীর নিকটে বাক্সের কয়েকটা বর আছে, তাহার সমস্ত বিন্দু পাঠাইয়া দাও।’ তিনি স্বয়ং বিংশতি জন লোক দ্বারা বিশদিত তোড়া মোহর লইয়া গেলেন। বলিলেন, আমি এই লোকদিগকে স্থান দেখাইয়া দিই, আর বরঞ্চাল পরিষ্কার করাই। অকারণ নিস্তব্ধ হইতে বিশজন লোক বাক্সের অপেক্ষা, বিশমোট মোহর লইয়া বাক। যত রংগোলা হয় ততই ভাল।”

গোবর্দ্ধন বলিল। “দেখি কি হইয়াছে?” নিকটে বাইয়া বলিল। “এত আপনি ভাঙে নাই, এ যে বেশ বাক্সের উড়ানের মত দেখায়। ইহারই লক্ষণে বোধ হয় অন্য রোজ মুহুর্তে (২) পাঠাইয়াছিলাম। এখানে বাক্সের কোথা হইতে আসিল?”

বক্সি বলিল। “মহাশয়! বাক্স আস নহে। ঐ দেখুন রীতিমত ভড়ক দিয়া বাক্সের কোষ হইয়াছিল ও তাৎক্ষণিকই দ্বারও মর তত্বে উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।”

গোবর্দ্ধন অনেক দ্বিগ্ন হইয়া বলিল। “এখানে খাজানা রাখা উচিত নহে। মাসুলার বাটার নিকট যে পুরাতন বারুনের স্তম্ভ আছে, তাহেও কোষ রাখা উচিত নহে। এখন তুমি আর কে'থাও পাঠাইওনা আমি আহাৰ করিয়া আসিতেছি। এখানে রীতিমত পাহারা বসাইয়া দাও। আমার মতে পাঁচ সাত জন প্রহরী কৰ্ম্ম নহে। একটা কোজ রাখাও ”

বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইল দেখিয়া, গোবর্দ্ধন ব্যস্ত হইয়া স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দ্বার নিকট গিয়া বলিল। “গঙ্গামণি! আজ একজন সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বাহা বলিলেন, যদি সত্য হয় তবে বিধাতা আমাদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া দেখিলেন। তিনি বলেন, তুমি স্বরাস পুত্রবতী হইবে ও পাটমহিষী হইবে।”

গঙ্গা বলিল। “আমি তোমাকে বলি নাই। পাছে তুমি হস্ত কৰ, সেই ভয়ে মুখে গো দিয়াছিলাম। আজ চারি দিন হইল বেলা দুই প্রহর একটার সময় আমি গবাক্ষ বসিয়াছিলাম। দেখি, পথে একজন নবীন যুগ্ম অতি রূপবান্ ব্রাহ্মণ বাইতেছে। তাহার কক্ষে একটা তালপাতার পুখী, দক্ষিণ বরে একটা কঠিনী, বামকরে ছত্র ও যষ্টি। প্রশস্ত ললাট গঙ্গাদৃষ্টিকার ত্রিশুণ্ড। তাহাকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইল। যুবাটি আমাদিগের দ্বার অতিক্রম করিয়া কিছুদূর বাইয়া আবার প্রত্যাগমন করিয়া ধারে দাঁড়াইল। আমি দাসীকে ধারে পাঠাইলে ব্রাহ্মণ-কুমার বলিল। “বাটার গৃহিণীকে বল যে, জ্যোতির্বেতাগণক আসিয়াছেন, অদৃষ্ট গণাইবার ইচ্ছা হয়, তুত ভবিষ্যত বর্তমান সমস্ত গণিতে পারি।” দাসী আসিয়া আমাকে সমাচার দিলে আমি ব্রাহ্মণকে আমার কাছে ডাকাইলাম। ব্রাহ্মণ খড়ি পাতিয়া অনেক গণনা করিয়া আমার স্তম্ভরোগের কথা কহিল; কিন্তু বলিল ঠাকুরাণী, তোমার প্রহ কাটিয়াছে, এইবার তোমার সন্তান হইবেক ও তুমি স্বরাস রাজমহিষী হইবে।” সাধুর কথা ও গণকের কথা যখন এক হইল, তখন সমস্ত সভ্য না হয় কিম্বৎসন সভ্য বটে। কেননা “বাহা রটে তাহার কিছু বটে।” ব্রাহ্মণকে আবার আসিতে বলিয়াছি। তোমার কৰ্ম্ম দেখিয়া তোমার অদৃষ্টের বিষয় গণাইবার আমার অভিলাষ আছে ”

গোবর্দ্ধন বলিল। “সে কবে আসিবে? আমার তাহার গণনা দেখিবার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে। আজ মহাশয়ের যে সকল অমঙ্গলহৃৎক উপসর্গ ঘটনা দেখিয়া আসিলাম, তাহার মন আর দ্বিগ্ন হয় না। গণনাশাস্ত্র তুল্য ফলিতশাস্ত্র আর কিছুই নাই। আমার বোধ হইতেছে ব্রাহ্মণটা জ্ঞানী বটে।”

গঙ্গামণি বলিল। “সংস্কৃত শাস্ত্র তাহার কতদূর পড়া আছে, বলিতে পারি না।

খোন্সার বচন ও মন্ত অনেক জানে। ব্রাহ্মণ বলিল; কামাখ্যার বাইরা কলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, অনেক দিন কামাখ্যার থাকায় তাহার কথায় কামাখ্যার টান আছে।”

গোবর্দ্ধন বলিল। “আচ্ছা! সাধুও কামাখ্যা দর্শনের ফেরত এখানে আসিয়াছেন। সাধু কথাবাত্তায় কিছু টান দেখা যায়।”

এইরূপ কথাবাত্তায় দ্বী পুরুষে আহাশ্রয় সমাপন করিয়া পথ্যকে উপবিষ্ট হইয়া তন্মিহ্নে ব নাগুলির বিষয় আলাপ করিতেছিল, এমন সময় দাসী আদিয়া বলিল, গণক ব্রাহ্মণ কুমার আদিয়াছে, অনুমতিয় জন্ত দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। গোবর্দ্ধন ও গঙ্গামণি এককালে উভয়ে ‘তঁাহাকে উপরে আন’ বলিয়া আদেশ দিল। ব্রাহ্মণ শ্রবেণ করিয়া বলিল। “যশোহরশক্তি! ভোমায় জয় হউক।” গোবর্দ্ধন ও গঙ্গামণি পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, কোন কথা কহিল না। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিয়া আপনার পথ্যক হইতে উঠিয়া স্বতন্ত্র আসনে বসিল।

ব্রাহ্মণ বলিল। “কিলেশ্বর মহাশয়! আপনার গ্রহ কাটিয়াছে, এক্ষণে আমাকে পুরস্কার দিন, আপনার সমস্ত অদৃষ্ট বলিয়া দিই। দেখি আপনার হাত দেখি।”

গোবর্দ্ধন লক্ষণ কর বাড়াইয়া দিলে ব্রাহ্মণ রেখাগুলি দেখিয়া বলিল। “তর্জ্জনী হইতে কনিষ্ঠা পথ্যক রেখা তবে, অন্তিমবৎসর বয়সে একটা সঙ্কট আছে, উত্তীর্ণ হইলেই বহুকাল বাঁচিবে। “কাক বকা কাক বকা মড়ার মাথায় দিগে পা, গণে আনি পেটের ছা।” ‘একটা ফুলের নাম করুন।’ গোবর্দ্ধন বলিল “কলম্বু”। ব্রাহ্মণ বলিল। “অস্ত্র গাছের অস্ত্র ফল, গোপাছে নারিকেল, তাল গাছে বাড়ে বাহুড়, আর মামদো আর, ধন ধন দেবতা গুল কন্দুর পালায়, জলের ভিতর বাগাবেটা ভুড় ভুড়ি দেখায়। মহাশয়! আপনার তাল হইলে আমার কি পুরস্কার দিবেন?”

গোবর্দ্ধন বলিল। “তোমাকে সঙ্কট করিব।”

ব্রাহ্মণ বলিল। “মহাশয়কে আমার পণনার ফল গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি।”

গোবর্দ্ধন এই কথা শুনিয়া আবাস ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেল, ব্রাহ্মণ আসন হইতে উঠিয়া, “শাস্ত্রের বিষয়, ঔষধ ও মন্ত্রাদির জ্ঞায় যটকর্ণ ভেল হইলে ফলে না,” বলিয়া গোবর্দ্ধনকে অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে গোবর্দ্ধন একা গৃহে প্রত্যগমন করিয়া গঙ্গামণিকে বলিল, “আমি এখন রাজবাটীতে বাই; আমার আগমনে বিলম্ব হইবে, চিন্তিত হইও না। যখন স্বর্গ মর্ত্য একত্র হইয়াছে, তখন আমার আর নির্জীবের মত ব্যবহার করা উচিত নহে।”

পদ্মাবতী বলিল। “যেহা ১ উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে রাজত্ব অবিকার করা অতি স্বাভাৱ্যসাধ্য। বাও, যেন ছত্রধারী হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিও।”

গোবর্দ্ধন ব্যস্তে যুদ্ধবেশে সসজ্জ হইতে লাগিল ও অজানুপজ্ঞ (১) পাহুকা ধারণ করিল। অগ্রে কাণ্ধলন লাগাইল। বকে উন্নতগুন (২) ধারণ করিল। চুর্ভেদ্য নাগোনে (৩) লাভিনেশ আবরণ করিল। বামহস্তে গোধা লাগাইয়া সর্কীয় কয়কটামুত (৪) করিল। শিরে শিরদ্বাপ বসাইল। দেখিতে যেন ভীষণ লৌহমুর্তি হইল। বধাবিহিত অস্ত্র শস্তাদি লইয়া একপ দংশিত (৫) হইল, যে, দেখিলেই শরীর সিহরে। শিরদ্বাপের উপর রাজচিহ্ন হোমারপন্ন লাগাইয়া পীর অগ্নে আরোহণ করিয়া বেগে প্রধান সেনানী-মণ্ডলীতে পন্ন করিল। তথায় বাইয়া স্বকাবারের সেনা প্রস্তুত হুতক তুরী বাজাইল। তুরী বাজ্যের অনতিবিলম্বে তথাকার সেনানী তিন চারি জনে আসিয়া তাহাকে সর্কীয়ধারী দেখিয়া বলিল, “মহাশয়! এবশে কেন?” গোবর্দ্ধন বলিল, “অন্য তোমা-দিগের ভটমণ্ডলীতে সসজ্জ হইতে আদেশ দাও, সজ্জীভূত হইলে আমাকে আসিয়া সমাচার দিবা।” বলিয়া বেগে স্বীয়সেনার স্বকাবারে বাইয়া প্রধান প্রধান সৈনিককে ডাকিয়া বলিল। “তোমরা আমার লহিত বহকাল একত্রে যুদ্ধ করিয়াছ ও সর্কীয়ই তোমাদিগের বলবিক্রমে আমি জয়লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোম কর্ম করিতে ইচ্ছুক নহি। প্রতাপাদিত্যের স্তত নৃথ্য অন্ত হইয়াছে, অন্তত চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। দিল্লীর তঁহার উপর রোষ প্রকাশ করিয়া বাঁকা-লায় মানসিংহকে সমুচিতসেনা সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। অনুমতি আছে, প্রতাপাদিত্যকে পদচ্যুত করিয়া জনৈক মুসলমান নবাবকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া বাইবেল। প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া দিল্লীতে লইবার অনুমতি আছে। এই করমান লইয়া মানসিংহ বর্তমান হইতে আজ চার পাঁচ দিন রওনা হইয়াছেন। ঢাকা সোনারদ্বারের নবাব মস্ননই অগ্নি ইষ্টাখান, সৈন্ত লইয়া বশোহর আক্রমণ করিতে আসিতে-ছেন। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে যমুনা-পক্কইএ আছেন। তথা হইতে যে হস্বল হুকুম আসিয়াছে, তাহে বশোহর রক্ষার জন্ত আমার উপর ভার হইয়াছে। অতএব এখন তোমাদিগের সাহায্য ব্যতীত আমার আর কোন উপায় নাই। তোমরা কায়মনো-বাক্যে আমার সহায়তা করিলে, আমি লোণারদ্বারকে পরাস্ত করিয়া বশোহরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি। তোমাদিগের এ বিষয়ে বাহ্যর বাহা বক্তব্য থাকে, মন স্থলিয়া বল। আমার ইচ্ছা, প্রতাপাদিত্যের অবিন্যমানে আমি স্বাক্ষর লক্ষ্মী (৬) ধারণ করি। প্রতাপাদিত্য যদি জয়ী হইয়া এখানে প্রত্যাগমন করেন, তবে

(১) হাঁটু পর্যন্ত জুতা। (২) বকুলের বর্ষ। (৩) উন্নতের বর্ষ।

(৪) বর্ষ। (৫) বর্ষাভূত। (৬) লৌহ কড়া।

তাহার আসন তিনিই পাইবেন। মুক্তবিষয় ও রাজ্যরক্ষা গ্রাহকূট (১) দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তৎক্ষণাৎ অনেক উপযুক্ত ওমরাঙকে তার লওয়া উচিত। এ স্থলে যশোহরের বসিচ দেওয়ানজী আমা অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত রাজপুংসব, কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে কিলে-দার জ্ঞানসম্বত উচ্চতর লোক, সন্দেহ নাই। অতএব রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত আমি এাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তার লইতে প্রস্তুত আছি। তোমরা এ বিষয়ে অনুমোদন করিলে কার্যে হস্তক্ষেপ করা যায়।” এই কথা শুনিয়া সৈনিকেরা বলিল। “মহাশয়! আমরা বালককালাবধি আপনি ব্যাভাৱ অপর কাহাকেও আমি না। আমরা আপ-নার লোক। যে বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন, আমরা কখন অস্বীকার করিব না।”

গোবর্দ্ধন, বীর সৈনিকদিগকে বধেই অনুগত ও তর্জুতাক্ষিত (২) দোষের সাহস পাইল ও ক্ষুণ্ণমনে বলিল। “মহাতাব সিংহ! তোমাকে আমি যশোহরের নায়ক করি-লাম। তুমি অদ্যাবধি ঐ পদে অভিষিক্ত হইয়া যশোহর রক্ষণে নিযুক্ত হও। চেংসিংহ! তোমাকে ও কতেসিংহ! তোমাকে পঞ্চহাজারী করিলাম। কৃপারামকে ডাকাও, তাহাকে একটা উচ্চ পদ না দিলে ভাল হয় না। মাহুলা, বজ্রীর নিকট হইতে খাখালা লইয়া গিয়াছে। মহাতাবসিংহ! তুমি অবিলম্বে একশত পদাভি ও বিংশতি অবাগোহী মাহুলায় বাটী পাঠাও; তাহারা বাইরা মাহুলাকে গেরেস্তার করে ও সে যে খাখালাখালা হইতে বিংশতি মোট মেহর লইয়া গিয়াছে, তাহা আমার নিকট হাজির করে। বজ্রীকে ফৌজদারী দিব ও বামাচরণ বহুকে বজ্রী পদে নিযুক্ত করিব।” এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া গোবর্দ্ধন, প্রধান কক্ষাধারে বাইরা দেখে যে, সেনারা সজ্জীভূত হইয়া শ্রেণীবদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। গোবর্দ্ধন, তাহাদিগের প্রধানকে ডাকাইয়া বলিল। “সোণারগ্রাম হইতে আক্রমণী সেনা বাহাতে যশোহরে সহসা উপস্থিত হইতে না পারে, এমনত উপায় কর। নদীতীরে হাসে হাসে ছাউনি করহ ও দূরে গুলুগতি প্রেরণ করহ। তাহারা মনসমই আগর গতি ও মন্ত্রণা আমাকে সময়ে সময়ে নিবেদিবে। এক্ষণে তোমাদিগের অধীনে দশ সহস্র তত আছে, তাহাদিগকে দশ গুণে বিভক্ত করিয়া যশোহর হইতে নোণারগ্রামের একদিনের পথ পর্যন্ত সৈন্ত স্থাপন করহ। সেনারা যত দিন যশোহরের বাহিরে থাকিবেক, তত দিন ব ব তর্জুতাক্ষিত সার্ক ভর্য তাটী পাইবেক। সম্প্রতি যমুনাপ্রবই হইতে আগত হসুল বহুমাণুযারী যশোহরে প্রত্যাগত সৈন্তেরা অন্য হইতে অতীব পুঙ্খা-বধি তাটী পাইবেক।” কৃপারাম আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিল। “কৃপারাম! এক্ষণে তোমাকে কিলেদার কর্ণে নিযুক্ত করা গেল। তুমি যশোহররক্ষণে নিযুক্ত

হও। মহাত্মাবসিংহ তোমায় নাএব হইল।” প্রধান সৈনিককে বাইতে অহুমতি দিলে, সে শির মোরাইয়া চলিয়া গেল।

কৃপারাম বলিল। “মহাশয়! আপনার সমস্ত ক্ষমতা, কিন্তু আমার কিলেদার পনের সনন্দ কোথা?”

গোবর্দ্ধন বলিল। “পরে যথাকালে সনন্দ স্বাক্ষর করিয়া দিব। আমার বুজায় (১) শক নাই। অদ্যকার শক খোদাইয়া, আমার চপ (২) প্রস্তুত হইলে স্বাক্ষর ও মুদ্রিত হইবেক। কৃপারাম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। গোবর্দ্ধন বলিল। “এখন সোণারগ্রামের দিকে সৈন্ত পাঠাইতে অহুমতি দিয়াছি, তুমি স্বয়ং সে সকল তত্ত্ব বধারণ করিবা। যে সকল গুপ্তে মুসলমান ভট্টের প্রাধান্য, সে গুপ্ত সোণারগ্রামের সন্নিকটে রাখিবা। ক্ষীণভক্তি ভট্টগণকে দূরে রাখা সর্ব্বভো-
ভাবে বিধেয়। নিকটে থাকিলে নানা প্রকার গোলযোগ করিবেক। এই আদেশ পত্র লও, বামাচরণ বহু বস্ত্রীকে দিয়া তাহার সহিত যন্ত্রণায় যে পরিমাণে অর্থ আবশ্যক হয়, লইও। রাজকোষের একটা বন্দোবস্ত প্রয়োজন হইতেছে। কোষাগারের দ্বার উন্নিয়া গিয়াছে। কি একারে নষ্ট হইল ও কাহার দ্বারা এই পক্ষটি ঘটয়াছে, ইহা পরে অনুসন্ধান করা যাইবেক। আপাতত আমার বোধ হয়, কলত্রে (৩) কোষ রাখিলে ভাল হয়। অতএব তুমি বস্ত্রীকে আনি যে কলত্রে কোষ পাঠাইতে কহ।” কৃপারাম চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধন স্বকা-
বারে বাইয়া দেখে যে, ভট্টমণ্ডলীতে মহা উৎসাহ; সবলে আনন্দে স্বীয় স্বীয় জবাসমূহ সংগ্রহ করিয়া আপন আপন মোট প্রস্তুত করিতেছে ও এক এক দলের মোট গুলি একত্র করিয়া এক এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া সাজান হইতেছে। স্বকাবারের সম্মুখ, গাজী (৪) ও শকট (৫) ও দণ্ডার (৬) সমূহে পূর্ণ। কোথাও গাজী জোয়াহল নত হইয়া ভূমিতে ঠোকরা আছে। গাজীর পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ, তাহার দ্বাশি দ্বাশি মোট তোলা হইতেছে। গাজীর যুগন্ধে (৭) নাথ (৮) বাধা। কোথাও বা অনেক পিণ্ডার (৯) মহিষযুগ্মকে, নাথ দিয়া প্রাণি (১০), পিণ্ড (১১) বা চক্রের অপর

(১) বড় মোহরযুক্ত অসুতী। (২) নীল আসটী।

(৩) রাজ দুর্গ। (৪) গরুর গাড়ী।

(৫) জয়াদি বহনের জন্য মো ত্রিশ অপর পশুদ্বারা বাহিত গাড়ী।

(৬) এক পশুবাহিত গাড়ী, একাডেম। (৭) জোয়াল।

(৮) পশুর নাসাহিত্রগত রক্ত, নাকাল। (৯) মহিষপালক।

(১০) ঢাকার হাল। (১১) চক্রস্ফাতি।

ভাগে বাঁধিয়াছে। মহিবহর সুল সন্টক জিহ্বাগ্রাধারা নাথ চাটিতেছে। কোথাও বা কেবল শট পড়িয়া আছে। অদূরের নান্দীমুখে (১) পিটার দাঁড়াইয়া এপাচক্ষে (২) ঘুগাইতেছে ও মহিবহর উদ্ধত ক্রত (৩) জলপান করিতেছে। কোল কুপের এপা (৪) হইতে পিটার জল লইয়া মহিবকে খোয়াইয়া তাহার পিচণ্ডে (৫) বসিয়া আসিতেছে। হাতে একটা দীর্ঘ যষ্টি, এজনের (৬) পরিবর্তে মহিব খেলাইবার অস্ত্র নিযুক্ত হইতেছে। কোথাও দীর্ঘ বক্ষে বঁটীতে পিটারেরা বসিয়া রান রানি বিচালী কাটিতেছে ও বড় বড় চাকারী করিয়া খলির সহিত বিচালী মাথাইয়া মহিবাণির সম্মুখে দিয়াছে, তাহারা বাড় কঁট করিয়া চিবাইতেছে। কোথাও মহিব ও বলীবর্দ (৭) ভূমে শুইয়া রোমন্থন (৮) দ্বারা ক্ষুদ্র জব্য পুনঃ চর্ষণ করিতেছে। কোথাও দংশদংশনে (৯) ব্যস্ত হইয়া একটা মহিব, বন বন দেহচর্চা হিল্লোলের পর ব্যভে দাঁড়াইয়া উঠিল। অগ্র স্থানে জনৈক চারক (১০) অশ্বের পশ্চাত্ত্ব কীলক হইতে রতল (১১) খুলিয়া দিলে অষ্টটি একেবারে চতুর্পদ বিস্তারিয়া অভভঙ্গ করিয়া দাঁড়াইল। চারক অথ প্রভৃতে নিযুক্ত হইল। কোথাও অশ্বের মুখ হইতে বজ্র পট, (১২) খুলিয়া দেখিল; তাহার প্রায় একশের চপক অবশিষ্ট আছে। চারক চপকগুলি নাড়া চাড়া করিয়া বজ্রপট অশ্বের মুখে টান করিয়া বাঁধিয়া দিল। অব, মুখ কাঁকাড়িয়া চপক চিবাইতে লাগিল। কোথাও অপর একটি চারক, অশ্বের নিগালে কাঠ ও আদানাদি নিয়েজল করিয়া অথ আনিয়া দণ্ডারে নিযুক্ত করিল। এদিকে মহামাত্র একটি কনেরের (১৩) কর্ণ ধরিয়া তাহাকে বসাইলে, তাহার পৃষ্ঠে বিচালীর গদা দিয়া তাহার উপর উৎকৃষ্ট নহবৎ বসাইয়া কর্ণপালক ধরিয়া কনেরের কর্ণদেশে পা দিয়া বলপূর্বক কর্ণপালক টানিয়া বাঁধিল। কনেরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিকপালিক (১৪) দস্ত দুইটি কুন্দসন্নিভ শুভ্র। বামা দিয়া পাজমার্জনে রমণীর ধুলর বর্ণ কর, নৃত্যর মধ্যে কি শোভা ধারণ করিয়াছে! তাহে আবার কর্ণতুস্তবর অবগ্রহ (১৫) নির্ঘাণ (১৬) ও চুলিকা, (১৭) কঠিনী (১৮) ও নাগপর্ভে (১৯) রঞ্জিত, পৃষ্ঠে

(১) কুপাঙ্কান দালান। (২) কুপাদি হইতে জলোত্তলনের ধাত্রাবিশেষ।

(৩) বাহিত জল।

(৪) কুপাদি হইতে বেধানে জল তুলিয়া ঢালিয়া দেয়—জগৎ ইতি ভাষা।

(৫) পশুপৃষ্ঠ। (৬) পশু তাড়ন দণ্ড, গোলাবাড়ি। (৭) বলদ।

(৮) জাগর কাটা। (৯) ডাঁপ। (১০) সহিস।

(১১) বেগ। (১২) ভোবড়া। (১৩) অজাত শাবক হস্তিনী।

(১৪) নভের হরিত বর্ণ মলাশুভ্র। (১৫) হস্তীর ললাট দেশ।

(১৬) হস্তীর চক্ষুকোণ। (১৭) হস্তিকর্ণমূল। (১৮) বড়িমাটি। (১৯) মেটেনিন্দুর।

মহাবতের চাকচাক্য ও কণ্ঠপাশকে রেশমের স্তবক ও তাম্রশিষ্টকার হস্তিনীর অতি কমলীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। মহামাত্রের লাগ উকীষ, কটীদেশে মলকঙ্কর উপর কঠরিকা বাঁধা। হস্তে ভীম লৌহঅক্ষুণ, সর্কাদা ব্যবহারে মুষ্টি প্রমুখ (১) ও অগ্রভাগ নিশিত (২) হইয়াছে। মহাবতের রক্তার্ধ দুইটি ফলকপাণি ভট, দীর্ঘশূল ব্যবহৃত করিয়া কনেরের উত্তর পার্শ্বে দাঁড়াইল। কনেরটী মন্দে মন্দে তাহার দীর্ঘ রামরত্নাতরুল্য শুভ্র এদিক্ ওদিক্ নাড়িতেছে ও মাঝে মাঝে পট পট শব্দে সূর্য্যাকার কর্ণধরে স্বীয়রক্তে আঘাতে লংশ ও কীটাদি অপসারণ করিতেছে ও বিস্তৃত কর্ণ রোম-কেশীঘরসমবিশিত পেচকবাগ্না (৩) মধ্যে অধর দেশে লংশ নিবারণ করিতেছে। ও দিকে একটি একাশু মস্তী লুভ (৪) মহাবত পৃষ্ঠে করিয়া অমিতবেগে বজ্রআলাভায় শব্দ করিতে করিতে উত্তপুচ্ছে দৌড়িয়া আসিতেছে। গোরকু (৫) অবকাশ পাইলে যেমন অচেতনে লক্ষ্য রাখ করিয়া ধাবমান হয়, লুভও তদ্রূপ অবিবেকে ধাবমান হইতেছে। বৃংহিত (৬) মাত্র কনের (৭) মাথা তিরাইয়া শুভ্র বাঁকাইয়া শব্দে ধ্বনির দ্বার শব্দ করিল ও ব্যস্তে ঘন ঘন, যে দিক্ হইতে লুভ আসিতেছে, সে দিকে চাহিতে লাগিল। মহামাত্র দূর হইতে লুভভাগমন দেখিয়া সবলে কনেরের মস্তকে অক্ষুণ্ণ ধারা আঘাত করার কনের জ্ঞানমহতক একটি ধ্বনি করিল। পার্শ্বস্থ জলমণ্ডলীতে, “লুভ! মস্তহস্তী! প্রতির (৮) প্রতির! পালিও পুলাও! কনের হটাও! কনের তবৎ কর! সাবধান! সামাল!” বলিয়া উঠিল। গ্রামকট, বাতাগ্রস্থিত শুকর্ণের দ্বার ভয়বিপ্লুত হইয়া পলায়নপন্নায়ন হইল। কে কোন্ দিকে যায়, কে কাহার উপর পড়ে, কিছুই বোঝা যায় না। লুভকে দিকটস্থ দেখিয়া কনেররক্তাকীর্ণ মহামাত্র কনেরকে পূর্ণদিকে চালাইল। লুভকে আধোরণ, ঘন ঘন অক্ষুণ্ণভাবে লুভের হস্তঘর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, দরদরিত ধারে রক্ত বহিতেছে, কিন্তু লুভ মস্তভাগপরবশ হইয়া কোস বিবর গ্রোহ না করিয়া কনেরের দিকে দৌড়িতেছে। এতি আঘাতে কষ্ট-একাশক একটি করিয়া বৃংহিত করিতেছে। আবার শুভ্র লাড়িয়া হস্তকের উপর হুংকার ঐয়োগে বম্বুসেচন (৯) করিতেছে, আধোরণের সর্কাস লুভভুতও এদিকপুত্রলীকরে (১০) আর্দ্র হইতেছে। লুভ আহত হইলেই স্বীয় শুভ্র বিশাল

(১) পালিশ ক্রিয়া। (২) সামসে। (৩) হস্তিপুচ্ছ।

(৪) মস্তহস্তী। (৫) বাঁধাপন্ন। (৬) হস্তিপূর্ণ। (৭) হস্তিনী।

(৮) কনেরর হস্তী। (৯) হস্তভুতওনিহত জলকণা।

(১০) বাঁধাবি প্রেরিত জলকণা।

মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া তুণ্ডস্থ জন শোষণ করিয়া শুণ্ড পূর্ণ করত, কন বাহির করিয়া কুন্তলরে ও উরদেশে বসথু সেচিতেছে। এক একবার কন প্রসারিয়া স্বকন্য আধোরণের পদ ধারণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু চতুর্ন মহামাত্র পদব্রজ সম্বন্ধিত করিয়া স্বকন্য উপর বলিয়াছে। অসুষ্ঠু দ্বারা চুলিকায় বেগ দিতেছে। লুণ্ডের পৃষ্ঠস্থ নহবত লুণ্ডের ক্রমগতিহিন্দ্রলে বরাশিখিল হওয়ার ক্রমে দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল। কিন্তু নহবত লুণ্ড অধিবকে কনেরকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছে। কনেরের মহামাত্র মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিয়া লুণ্ডকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কনেরকে পুনঃপুনঃ আঘাতে ও “মৈল মৈল” শব্দে ক্রমগতিতে চালাইতেছে। এদিকে লুণ্ডের পিচতু নহবত ক্রমে শিখিল হইতেছিল, কণ্ঠশাপক ও পুরুষের রজ্জু ছিন্ন হওয়ার নহবত একবারে টলিয়া লুণ্ডের উপরের দিকে ঝুলিয়া পড়িলে, লুণ্ড নহবত পতনে চমকিয়া উঠিল। পদ-চতুস্তরের মধ্যে নহবত ঝুলিতে লাগিল; তাহার পদচালনে ব্যাঘাত হওয়ার লুণ্ডের গতি ক্রমেকের অল্প মন্দ হইল বটে; কিন্তু মন্দগতিতে অসম্বৃত্ত হইয়া দুই একবার পদ বিস্তারিয়া কেঁলিল; পরে মত্ত লুণ্ড রুট হইয়া ক্রমেক হিবভাবে দাঁড়াইয়া করদ্বারা নহবতের কাঠকুন্ত ধারণপূর্বক বলে আকর্ষণ করার নহবত কুণ্ডলসহিত (১) লুণ্ডের অগ্রপদব্রজে বাধিয়া মড়মড় শব্দে ভাঙিয়া গেল। অপর তত্ত্বও সেই প্রকারে ভাঙিয়া লুণ্ড শরীর ব্রজে করিয়া নহবতটি খণ্ডখণ্ড করিয়া কেঁলিল। স্বকন্য আধোরণ অক্লপ দ্বারা কত আঘাত করিল, কিন্তু লুণ্ড কোন বিষয়ে উপেক্ষা করিল না, নহবত নষ্ট করিয়া আবার কনেরের দিকে ধাবমান হইল। ইতোমধ্যে কনেরের মহামাত্র নিকটস্থ নদীর পুলিসে ও বাঁওড়ের তীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল দিয়া বাঁওড়ের অপর পারে বাইয়া দৌড়িল। লুণ্ডস্থ আধোরণ ক্রমাগত অক্লপাঘাতে তাহাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া হতাশপ্রায় বলিয়া রহিল। লুণ্ড কন হইতে কনেরকে বাঁওড়ের অপর পারে দৌড়িতে পাইয়া বেগে বলমধ্যে দৌড়িলে, অদূর বাইবার পরই তাহার গতিমন্দ ও পদ ভার হইল; লুণ্ড বত বেগপূর্বক পদচালনে আয়াস পাইল, ততই তাহার পদ পক্ষে নিপোষিত হইতে লাগিল, ক্রমে আর বক্রপৃষ্ঠ পক্ষে বলিয়া গেল। আধোরণ লুণ্ডকে পঙ্কাবদ্ধ দেখিয়া তাহার পিচতু দিয়া পেতক আশ্রয়পূর্বক পশ্চাৎভাগে অবতরণ করিল, কিন্তু ভূমিতে তাহার পদস্পর্শ করিল না, সে হস্তমণ্ডিত দাম ও বনের উপর নামিল। পরে লুণ্ডের কর্ণাধি দ্বারা তাহাকে পশ্চাৎ দিকে ত্বর দিয়া অগ্রপদ উত্তোলনের চেষ্টা করিতে ইজিত করার লুণ্ড মত্ততা বশতঃ কোন মতে হটিবার ইচ্ছাও করিল না। বরং অগ্রসর হইবার অভিপ্রায়

‘তত ওটাইয়া ততের উপর সমস্ত শরীরের ভার দিয়া মস্তক ও ততের সহায়-
 তার অগ্রহ নক্ষিপ পদ তুলিতে বত আয়াস করিতে লাগিল, ততই পকে প্রোধিত
 হইল; ক্রমে ক্রমে ভীমবলে এইরূপ ভ্রম করার এককালে অবসর, নিম্নে পদ
 রহিত হইয়া পড়িলে এমন করুণায় বৃথিত করিল যে, অপর পারের কনের তনিকা-
 মাত্র কিম্বিয়া দাঁড়াইল। মহামাত্র পদহ হস্তীর অবস্থা দেখিয়া কনেরকে বাঁড়ের ভীম
 দিয়া ক্রমে লুপ্তের নিকটে আনিবে কনেরের মহামাত্র ভীমের অবস্থা দেখিয়া চিত্তিতে
 লাগিল; কনেরকে অগ্রসর করিতে হই একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কনের ততের অগ্র-
 ভাগ দিয়া পদক্ষেপের পূর্বে স্থানটি টািপয়া দেখিয়া ক্রমে পশ্চাৎ হটিতে লাগিল।
 মহামাত্র অন্তর্ভ দ্বারা তাহার চুলিকা (১) টিপিয়া অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল। অন্তর্ভের
 বলে কণ্ঠ কিম্বিয়া গেল, কিন্তু কনের এক পদও অগ্রে নিক্ষেপ করিল না। মহামাত্র
 কদম্বা (২) দেখিয়া কনেরকে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অন্তরে বাইয়া দাঁড়াইল। লুপ্তের
 মহামাত্র নিকটে আসিলে তাহাকে বলিল, “লুপ্তকে বাঁচাইবার উপায় কি স্থির করিলে ?
 সময় থাকিতে তাহাকে ফিরাইতে পারিলে না ?” মহামাত্র বলিল, “কেন তুমি কি
 দেখ নাই যে, লুপ্ত কনেরকে অনুসরণ করিতে চৈতন্যরহিত হইয়াছিল ?” এই কথা
 বলিতে বলিতে লুপ্ত আর একবার পদ হইতে উদ্ধারের জন্য অসীম আয়াস করিল,
 কিন্তু আয়াসে কেবল ভ্রমমাত্র হইল ও ক্রমে ক্রমে হতশাস হইয়া বরুণায়
 বৃথিত করিতে লাগিল। ক্রমে স্বক্কাবারের লোকে ও সৈন্তেরা আসিয়া ভীম
 দাঁড়াইল; কিন্তু উদ্ধারের কোন বিশেষ উপায় স্থির হইল না। জনৈক সৈনিক
 আসিয়া বলিল “এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, পকে হস্তী পড়িয়াছে
 তাহাকে আর কে উঠাইতে পারে ? ইহার আশা ত্যাগ কর, ততশ্রী কূচ করিয়াছে
 চল।” লুপ্তের মহামাত্র বলিল, “মহাশয়, এই হস্তীটি মহারাজ পদ বৎসর জিপিয়া
 হইতে বিশ হাজার টাকায় লইয়াছেন। এ হস্তী মুশিক্ষিত শিকারী, মহারাজের সমস্ত
 হস্তিশালায় ইহার তুল্য প্রকাণ্ড শরীর ও দলবান্ হস্তী আর নাই; আমি মহারাজকে
 এবিষয়ে কি বলিব—আর তিনি আমার জিজ্ঞাসা করিলে কি কহিব—আবার অপেক্ষা
 হুঁতগা আর কেহই নাই।” কনেরের মহামাত্র মন্দে মন্দে কনেরকে স্বক্কাবারের দিকে
 চালাইল। পথে অপর হস্তীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার তাহার মহামাত্রের সহিত লুপ্তের
 পকে পতনের বিষয়ের কথাবার্তা কহিতে কহিতে ক্রমে স্বক্কাবারে আগিয়া দেখে যে, প্রায়
 সমস্ত গুপ্ত চলিয়া গিয়াছে কেবলমাত্র কতিপয় হস্তিযট। ৩) দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে
 গোবর্দ্ধন দায়কে দেখিয়া শির নোয়াইয়া অভিবাদন করিলে গোবর্দ্ধন বলিল, “কোন্

হাতীট পকে পোষিত হইয়াছে ?” জনৈক আধোরণ বলিল, “হজুর, ত্রিপুরার নৃত্য নাটকটি পকে পড়িয়াছে ।” গোবর্দ্ধন বলিল “তাহাকে তুলিবার কোন উপায় কর ।” আধোরণেরা বলিল “হজুর হাতি পাঁকে পড়িলে আর কে উঠাইতে পারে ?” গোবর্দ্ধন জনৈক প্রতিহারীকে (১) ডাকিয়া বলিল, “যে মাতঙ্গ পকে পড়িয়াছে তাহার আধোরণকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও ।” গোবর্দ্ধন এই কথা বলিয়া ধীর আবাসাভিমুখে চলিয়া গেল । দূরে ভট্টশালার পয়নজানিত রমণীয় ঢকা দামামাদির বাজ্য শোনা যাইতে লাগিল ও উভয় অকলে এমত ঘূর্ণি উৎখিত হইল যে, গগননগল আচ্ছন্ন হইয়া গেল । ক্রমে স্বাভাব্য জনগুণশ্রম হইল ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

‘মৃগয়াতাকে মৃগয়াবিহারী সিংহানবাপ বিপদং নৃসিংহঃ’

যে সময় রায়গড়ে মহারাজ মানসিংহের সৈন্তের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হইতেছিল ও যখন বর্ষাবৃত পুরুষ দুর্গের ঘরপিণ্ডে দাঁড়াইয়া হৃগশ্রাক্রে তেপের দ্বারা আঘাত করিতেছিলেন, যে সময় মৃগাকুমার রায়গড়ের দক্ষিণ গোপুরে স্বীয় অস্ত্রের ভ্রম লইয়া ভীমবেধনরূপে (২) মস্ত, যখন উভয় পক্ষের ভট্টশালীকে বিষম গোল্যপানবহন (৩) মাতঙ্গের দ্বারা ভীষণ ভীমর (৪) প্রবহিত হইতেছিল; যখন উভয় পক্ষের মধ্যে কেহই প্রদ্রাবকজন (৫) করে নাই; যখন নিষঙ্গ (৬) নিশিত নীললোহ-মুখ (৭) কাণ্ডগোচর পুঞ্জ (৮) পৃষ্ঠস্থ কলাপ (৯) হইতে লইয়া ভীষণ ধনু হাতে ক্রমাগতেরে অ্যা (১০) নিঃশবে নিকেপ করিতেছিল; যখন কাণ্ডপৃষ্ঠরা (১১) গোবিন্দ (১২) হইতে ভোহাভিনেয় (১৩) দ্বারা ক্রমাগতেরে পাষণ্ডক্ষেপে রায়গড়ের প্রতৌলী প্রাকার আচ্ছন্ন করিতেছিল; তখন চেন্দ্রবালী নদীতীরে জয়ন্তীপুরে মণ্ডা সমারোহ । জয়ন্তী-পুরবাসীরা পোদ (১৪) কালে মহারাজ গ্রামধানে (১৫) বাহবেন বাঁকিয়া মহা উৎসাহে মৃগয়া উন্মাদন পাইতেছে । চারিদিকে হুই ক্রোশ নীল (১৬) মধ্যে

- (১) ভারবান্ । (২) যুদ্ধে আহ্বান । (৩) উগ্রমদ্য । (৪) যন-স্কন্ধ ।
(৫) সেনাপালয়ন । (৬) রথী । (৭) ইস্পাত । (৮) লোহবাণ ।
(৯) ভূম । (১০) ধনুর্ভূম । (১১) শরপৃষ্ঠদেশ । (১২) ক্ষিপ্ত ।
(১৩) শিল । (১৪) প্রাতঃকাল । (১৫) মৃগয়া । (১৬) বনমধ্যে মনুষ্যবাস ।

বোধ হয় গত সন্ধ্যার কেহ শয়ন করে নাই। পার্শ্বভীমদিগের মৃগয়া একটি মহৎ আশ্রয়ের কর্তৃক; আবার বধন সে মৃগয়ার মহারাজ স্বয়ং ব্যস্ত আছেন, কুকী, লুঘাই ও মিকির জনসমাজে আমোদের লীলা নাই। ইহারা একান্ত মৃগয়াপ্রিয়। এমন কি মৃগয়াধারা গ্রাম স্বকীয় হয় হেতুবাৎ মৃগয়াকে গ্রামাধান বলিত। অরতীপূর্ণতের বাসি-গণ তাহা আভিতে বিভক্ত। তাহাদিগের মধ্যে নিজ অরতীপুরে সৈন্তটকই অধিক। অরতীপুরের চৌধুরী একজন সৈন্তটক; তাহার পিতা পূর্বে মহারাজ নৃধীকুমারের পিতার সময়ে জোবালাসামক গ্রামের একজন প্রধান হুন্সই ছিলেন, পরে মহারাজের মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্যের অরতীপুর গমনে অরতীপুরের পুরাতন চৌধুরী সন্দরাম ভয়ে পলায়ন করার সৈন্তটকজাতীর জোবালা গ্রামের হুন্সই গোপাল উক্ত পদে অভিষিক্ত হইবার আশায় প্রতাপাদিত্যের সহিত সাফাং করে ও তাঁহার বিশেষ সাহায্য করার প্রতাপাদিত্য গোপাল দল্লুইকে সন্দরাম চৌধুরীর পরিবর্তে চৌধুরীপদে নিযুক্ত করেন। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং অরতীপুরে থাকিয়া বিশেষ শাসন করিতে অক্ষমজ্ঞানে মিকীর জাতীর জনৈক মীরাসদারকে আপনার অধীন রাজা করিয়া বাস। লটকা অরতীপুরের সিংহাসন পাইয়া চিরমরপূর্ণত কালীদেবীর উদ্দেশ্যে করেকটি মন্দির প্রস্তুত করেন ও তাহার অষ্টোত্তর-শত মন্দির দিয়া লুঘাই, মিকির, কুকী ও সৈন্তটকজাতি মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অরতীপুরের রাজা লটকা অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। অরতীপুরে রাজ্য-প্রণালী অত্যন্ত সরল। অরতীপূর্ণত অঞ্চলে গ্রামে কর ছিল না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের দল্লুই প্রতিবর্ষে অরতীপুরকে একটি করিয়া পুংছাপ করবরূপ দিতেন। অরতী পূর্ণত কৃষিকর্ম জুম (১) রীতিতে প্রবাহিত হইত, লাঙ্গলাদি কার্যবস্ত্র কিছুই ব্যবহার হইত না। কেবল একমাত্র দাও দ্বারা জুমচাষ নির্বাহ হইত। অরতীর উপত্যকা ভাগে সিয়প্রদেশের প্রণালীতে হলদিবহন ও বীজ বপন হইত। গ্রামচরে চূর্ণ, কমলালবু ও সীলক ইত্যাদি দ্রব্য করবরূপ রাজার তাণ্ডারে পাঠান হইত। রাজার পক্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে লেই সকল দ্রব্য ডাক ইকরাধারা বিক্রয় হইত ও তাহার যে স্বয়ং অর্থ লাভ হইত তাহার বিসময়ে মহারাজ সিয়প্রদেশজাত বস্ত্রাদি দ্রব্য লইতেন। অন্য রাজ্যে অরতীপুরের হাটতলার ধারে ডেবখালী নদী-তীরে অত্যন্ত সমারোহ। প্রকৃত একটী দেবদারুনাছের তলার লেলারমান সত্য (২) অগ্নি জলিতেছে, সন্ধ্যা ও শাল নির্ঘাস (৩) চকুর্দিক্ সদগন্ধে আমোদিত করিয়াছে, তাহে আবার শীতকাল, জলমরিভাপ প্রিয়লব্ধ বগরার চারিদিকে লোকারণ্য। অগ্নির অগ্নিরূপ করেকজন সৈন্তটকজাতীর প্রধান দল্লুই বসিয়া

আছে—এমত সময় শিলামাধ্যক প্রত্যেক নুহুই আসিয়া চক্ষু প্রবিষ্ট হইল, সকলে তাহাকে সমাদর সম্ভাষণ করিলে সে বলিল, “বুঝু! চল আমরা অগ্রসর হই। আমাদিগের ত চিরমঙ্গল পাহারে বাইরা রাজার অত্র শিবির সংস্থাপন করিতে হইবেক।”

বুঝু বলিল, “বল, এত রাজি থাকিতে বাইরা কি হইবে? এখন বোধ হয় এক প্রহরের অধিক রাজি আছে; এই অমঙ্গল হইল কাণকেহু পশ্চিমে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এখনও সুখভাৱা উঠে নাই।” শিলা বসিয়া করতল অগ্নির দিকে বিহাইয়া একবার নোকিয়া লইয়া করপুট বসিতে বসিতে বলিল, “অন্য অত্যন্ত উত্তরে বাতাস দিয়াছে; আমি জোবালা হইতে যে সকল প্রত্যন্ত (১) পক্ষ দিয়া আসিলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষীণ হইয়া গেছে। অন্য যুগয়ার এত সহ্যরোহ হইল কেন?” বুঝু বলিল, “জামনা, রাজার প্রতি লুঘাই ও মিকির আভির কতকটা অন্তোষ তাব দেখা বাইতেছে। যুগয়ার মহারাজ তাহাদিগের সহিত অধীরতা বুজির আশা করেন, চল আমরা অগ্রসর হই।” শিলা বলিল “একান্ত বাইবে ত চল।” উঠিয়া তাহার নিকটেই ঋষাকে বলিল “ঋষা, আমার অঙ্গ হই বলাপ লিঙ্গক (২) তুলিও না। তনিলাম আজ কাল অত্যন্ত ব্যাভ্রের ও ভয়ঙ্কর দৌরাণ্য বুদ্ধি হইয়াছে। লিঙ্গক না থাকিলে কাণ্ডপোচের ব্যাভ্রনমন সুবিধা নহে।”

বুঝু বলিল, “কেন লোহবাণে কি ব্যাভ্র বারী যায় না? চিরকালত কাণ্ডপোচের আমরা শিকার করিয়া আসিলাম। বিবালগু বাণ ত কজির রাজারা ব্যবহার করেন না। লিঙ্গক ব্যবহার ব্যাভ্র প্রত্যন্তরাদ (৩) রাজপুত্রাদিগের গ্রাঙ্ক; ভ্যেয় পক্ষে কাণ্ডপোচের যথেষ্ট। যদি একই কাণ্ডপোচের ব্যাভ্র ভূমিশারী না করিতে পার, তবে যুগয়ার বিবলিগু লিঙ্গকে কি প্রয়োজন? ব্যাভ্র আহত হইয়াই ত আক্রমণ কায়বেক।”

শিলা বলিল, “তাই এ তোমার ব্যাভ্রের বিষ মাখান লিঙ্গক লহে যে, বিদ্ধ হইবার হুই তিন দিন পরে কলঙ্ক (৪) মরিয়া বাইবেক। এ বাললায় নূতন লিঙ্গক। ইহা প্রতাপাদিত্যের রাজতৈবদ্য সৌন্দর্য্যের হরি-চন্দ্রারের প্রভুত বিব মাখান। ইহা ভ্রম্বে প্রবেশমাত্রে বত বড় ভক্ত হউক না, এককালে অচেতন হইয়া ভূমিশারী হইবেক। ইহা দ্বারা আহত জন্ত আমাদিগের দেশীয় লিঙ্গকবিদ্ধ কলঙ্কের ভায় দূষিত হইয়া যবে না। আমাকে নন্দরাম বশোহর বাইবার সময় এক পাতা বিব দিয়া দিয়াছে, সেই বিবে এই লিঙ্গক শ্রুত হইয়াছে।” ঋষাকে বলিল, “ঋষা, মঠে আছে দেখিও লিঙ্গকে এতি সাধবানে হাত দিও। একটু আঁচড় লাগিলে

(১) পক্ষিভেদে সম্বন্ধটহ পক্ষিত।

(২) বিবলিগু তীর (৩) আদ্রলালি।

(৪) বিবলিগুশরহত পত।

তৎক্ষণাৎ মরিতে হয় । লিপ্তকে অতি উত্তানক বিষ মাখান । বাও হুই কলাপ লিপ্তক লইয়া শীত্ৰ আমাণিগের সহিত মিলিও, আমরা অল্পে অল্পে অথৈ অগ্রসর হই ।”

অথা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল । শিলা ও বুকু হুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া দূরে বাইয়া হুই ছোট ছোট মলিনুরি টাইতে চাপিয়া মন্দগতিতে চিরমজলপর্বতাভিমুখে চলিল । পথে বুকু বলিল, “মন্দরাম কোথায় গেল, সে আর কত দিন লুকাইয়া থাকিবে ?”

শিলা বলিল, “সেও আর এখন লুকাইয়া নাই, সে যে এখন প্রতাপাদিত্যের সত্য শিবচন্দ্রের পুত্র স্বর্ধাকুমারকে আনিতে গিয়াছে ।”

বুকু বলিল, “আমি তাহা জ্ঞাত আছি । কিন্তু কবে স্বর্ধাকুমার আসিয়া পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেক । তুমি কি শিবচন্দ্র রাজ্যের সহিত শিকার করিয়াছিলে ?”

শিলা বলিল, “যে দিন মহারাজ শিবচন্দ্র মৃগয়ার বনমধ্যে পড়িয়া মরিয়া যান, আমি সেদিন সেই মৃগয়ার দলে ছিলাম, কিন্তু শিবির আমার জিন্মায় থাকায় আমি রাজ্যের নিকটে ছিলাম না ।”

বুকু বলিল, “আমি প্রথম মৃগয়ার প্রায় প্রহারাজ্যের পার্শ্বে ছিলাম, পরে এখন একটা প্রকাণ্ড গণ্ডক সমুখিত হইল, তখন মহারাজ ও প্রতাপাদিত্য ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদিগের আশা ছিল খড়্গাটী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যোদ্ধাসংগ্ৰামে নিযুক্ত হইবেন । কিন্তু লোকজনতা দেখিয়া গণ্ডক ক্ষুরণ (১) পূর্বেক পলায়ন করিল । রিরংহ (২) নৃপত্বয় ব্যগ্রে তাহাকে অনুসরণ করিলেন । খড়্গাটী যত বেগে দৌড়িতে লাগিল রিরংসাপরবশ রাজ্যেরাও তত অধিকতর বেগে অগ্র-চালন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে যোধ হইল মহারাজ শিবচন্দ্র খড়্গাটী লাভ করিলেন, অমনি লৌহবল্লভের উপর দাঁড়াইয়া খীর দীর্ঘ শেল লইয়া আঘাতের জন্ত উত্তোলন করিলেন । অধসামিধাতীত খড়্গাটী আরও বেগে দৌড়ল । ক্রমে খড়্গাটী ও মহারাজের মধ্যস্থ ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । মহারাজ প্রতাপাদিত্য শিবচন্দ্রের লক্ষ্যবাক্ত হইবার যথেষ্ট যত্ন পাইলেন, কিন্তু শিবচন্দ্রের ভক্তির পার্কতীর উচ্চ নীচ ভূমিতে অভ্যস্তপদ ধাবায় প্রতাপাদিত্যের অঙ্গকে পশ্চাতে রাখিয়া দৌড়িল । আমার টাই মৃগয়া-উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া অমিতবেগে ধাবমান হইল । কিন্তু অকৃত মন্দ বশতঃ আমি অমবধানতার ফলভোগ করিলাম—মিকটস্থ বোপমধ্যগত কৃত্রিম (৩) লক্ষ্য করিলাম না ; বেগে প্রান্তরস্থ দরী (৪) মধ্যে নিপতিত হইলাম । বিধাতার

(১) বেগে গমন । (২) মৃগয়া করিতে ইচ্ছুক ।

(৩) পক্ষীদের উচ্চ সাহু । (৪) শুহাধিশেষ ।

কর্ম, অবশেষে দিবাভািত গহ্বর মধ্যস্থ গাছের ডালে তাহার উদর ও উরদেশ বিদ্ধ হইল। আমি গাছের ডালের উপর পড়িলাম। হস্ত প্রসারিয়া যে ডালটি ধরিলাম, সেই ডালটি ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু নাচের ডালে আমার জন্ম। আবহ হওয়ার কষ্টে রক্ষা পাইলাম।”

শিলা বলিল “মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এখানে আসিয়া মৃগয়া করিবার কারণ কি ? আমাদিগের মহারাজের মৃত্যুই বা কি প্রকারে ঘটিল ?”

বুকু বলিল। “চাঁদখানের রাজ্য প্রতাপাদিত্য আপনার খুলতাত বসন্তরাতের নিকট হইতে রাজ্য লাভের কিছুদিন পরেই হস্তদেবতার পূজার উদ্দেশ্যে সৈন্যে কামরূপ যাত্রা করেন। তথায় দেবীমান্দরে জয়ন্তীপুরের রাজার রেগের সমাচার পাইয়া তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করিতে জয়ন্তীপুর যাত্রা করেন। প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু স্বভ্রম ছিল। কামাখ্যায় সেবাইত ব্রাহ্মণদিগের নিকট জয়ন্তীপুরের অসীম প্রশংসা শুনিয়া তথাকার পক্ষিতে নানাবিধ ধাতু ও অপরাপর স্বর্ণনির লোতে, বিশেষতঃ জয়ন্তী মণিপুর ত্রিপুরার মধ্যে জয়ন্তী পর্বতেই তৎকালে যথেষ্ট হস্তী পাওয়া যাইত—তথাকার অধিপত্য থাকিলে স্বদেশের জন্ত হস্তিযুদ্ধ ও মণিপুরের টাট্টাঘোড়া পাইবার সুবিধা বৃদ্ধি। জয়ন্তীপুরে প্রতিপত্তি সংস্থাপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। কামাখ্যা হইতে জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্রসিংহকে টাহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায় জানান ; জয়ন্তীরাজ তাটমুখে প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপ শুনিয়া তাঁহাকে স্বরাজধানীতে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন ও স্বয়ং গাছা পর্বত পৰ্য্যন্ত আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া বান। প্রতাপাদিত্যের রূপলাবণ্য, তাহার সৈন্যবলের প্রাণালী ও ক্রীতি মীতি ও তাঁহার রেশমের চাকচিক্যদর্শনে জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্র অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন ও অতি স্বল্পদিনেই পদুম্পরের বিশেষ সৌহৃদ্য অর্জিল। মনঃ লোকের আত্মীয়তা অল্পেতেই জন্মে ও ভবিষ্যে দুরার নষ্ট হয় না, বেল বর্ষবটের ছায় হুর্ভেদ্য ও আশু সঞ্চার। হুর্ভেদের আত্মীয়তা মৃদুবটের ছায় অনারসে ভাঙ্গিয়া যায় আর ভাঙ্গিলে ঘোড়া লাগে না। মহারাজ জয়ন্তীপুরের রাজা শিবচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্য জয়ন্তীপুরে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিবস পার্শ্বভীত রাজধানীতে বাস করেন। অকস্মাৎ আমোদের মধ্যে সমারোহে প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার জয়ন্তীপুরস্থ সমস্ত প্রধান প্রধান চৌধুরী নন্দুই ও মীরসাদামেরা বোণ দের। মহারাজ শিবচন্দ্র ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য উভয়ে স্ব স্ব অধারোহণে গমন করেন। যেন অনেক অন্ত শিকার করিতে করিতে একটি গণ্ডকের অনুসরণে উভয়ে অধে ক্ষতবেগে গমন করেন। ক্ষেমে অপরাপর রাজপুরুষ ও সৈনিকদিগকে অতিক্রম করিয়া দুই সখার জনশূন্য পার্শ্বভীত বনে প্রবেশ করেন। বেগানুসরণে

ও পার্শ্বভীর নিখুঁত বায়ুসেবনে উভয়ের বোধোচিত উৎসাহবল্লভ হয় ও ফলে এত বেগে গণ্ডকে অনুসরণ করেন যে, প্রায় একঘণ্টা পর গণ্ডকে জ্ঞাত হইয়া নিকট হইতে গািল। মহারাজ শিবচন্দ্রের সর্বদা মুগ্ধায় অভ্যাস থাকায় তাহার অথ আগ্রসর হইল ও ক্রমে মহারাজ প্রতাপাদিত্য পশ্চাত্ত হইলেন। এমন সময় একটা সরল গাছের কোণের মধ্যে গণ্ডক ও শিবচন্দ্র তাঁহার অথ সহিত অদৃষ্ট হইলেন। ক্রমে পয়ে নন্দরাম চৌধুরী বেগে অথৈ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রতাপাদিত্য স্বীয় অথৈ উঠিয়া বলিলেন ও বলিলেন, “নন্দরাম, আমি অত্যন্ত জ্ঞাত হইয়াছি। শিবচন্দ্র কোথায় গেলেন, দেখিতে পাইতেছি না। আমি অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম এইখানে আসিয়া এই কোণে একটু বিশ্রাম করিলাম।” নন্দরাম প্রতাপাদিত্যের কথা শুনিয়া বলিল। “মহারাজ, অনুমতি করেন ও আমি মহারাজ শিবচন্দ্রের অবেশে ঘাই।” তাহার প্রতাপাদিত্য বলিলেন “হাঁ চল, আমিও ঘাই। এদিকে ও শিবচন্দ্র আসেন নাই। তিনি পূর্বদিকে গিয়াছেন।” নন্দরাম বলিল, “মহারাজ আমি জয়ন্তী-রাজকে এই কোণের ভিত্তর ঘাইতে দেখিয়াছি আমার সন্দেহ তিনি এই নিকটের কোন গছের নিপতিত হইয়াছেন। এ অতি অনিশ্চিত প্রদেশে কোথায় গুহা, কোথায় বান কিছুই জানা যায় না।” তাহে প্রতাপাদিত্য বলিল। “না তিনি এদিকে যান নাই।” নন্দরাম বলিল। “মহারাজ ঐ দেখুন কোণের উপর তাঁহার উকীষ পড়িয়া আছে।” প্রতাপাদিত্য উকীষ দেখিয়া বলিলেন। “আমার বোধ হয় ও উকীষ অপর কাহার।” নন্দরাম বলিল। “মহারাজ, আপনি এইখানে থাকুন আমি কোণের ভিত্তর দেখিয়া আসি।” এই কথা বলিয়া নন্দরাম স্বীয় অথ হইতে অবতীর্ণ হইলে প্রতাপাদিত্য ক্রমে চিত্তিয়া আপনিও অথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নন্দরাম ব্যতী কোণের দিকে চালিয়া গেল।”

শিলা বলিল, নন্দরাম আমাদিগকে এ সকল কথা কিছু জ্ঞানিয়া বলে নাই। মহারাজ শিবচন্দ্র খানে পড়িয়া অথচাপানে মরিয়া বান, এই মাত্র শুনিয়াছিলাম। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্ট অত্যন্ত সুপ্রসন্ন, কেননা কোথা বনের রাজা, বিনা দুই কামাখ্য প্রত্যাগমনে জয়ন্তীপুরে আসিয়া স্বীয় শাসন সংস্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন।”

বুদ্ধ বলিল, “সমস্তই দিনের কর্ম। মহারাজ শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তখনকার চৌধুরী মধ্যে পরস্পরের শ্রীতিপ্রণয় না থাকায় ও হৃৎপোষ্য বালক নৃসিংহমারের নাম করিয়া সৈন্তটক ও বিক্রয় আতিমধ্যে আশ্রয়িচ্ছন হয়। বিশেষে মহারাজ শিবচন্দ্র কর্তার রাজা,—আমাদিগের স্বাতি শাসন পাইব, এই পরামর্শে আমরা প্রতাপাদিত্যের সহকে চলিয়া গেলাম। এমন কি আমিই প্রতাপাদিত্যের সহায়তা লাভের

জন্ত প্রথম তাঁহার শিবিরে বাইরা তাঁহাকে বলিলাম, “মহারাজ, আমাদিগের রাজা শিবচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে হৃদ্যপোষ্য কুমারমাজ্ঞ আছে, তাহা হইতে আমাদিগের পার্বত্যরদেশ শাসন হওয়া হুঙ্কর; বিশেষ মণিপুরে ও ত্রিপুরারাজের সহিত আমাদিগের প্রণয়তাৰ। আমাদিগের ইচ্ছা, মহারাজ জয়ন্তীয়ারাজের একটা বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাহাতে তিনি বলিলেন, “আমি এই চিন্তায় ব্যস্ত আছি। আমার অভিপ্রায়, মহারাজ কুমার সূর্য্যকুমারকে রাজমহিবীর সহিত বনে যশোহরে লইয়া যাই। তাহার বাংলাবহাদর যশোহরে আমার নিকট রাখিয়া রাজনীতি শিক্ষা দিই। পরে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তাহার রাজ্যে তাঁহাকে পাঠাইব। ইতোমধ্যে সূর্য্যকুমারের নামে তাহার বাংলাবহাদর জয়ন্তীশাসন জন্ত তোমাদিগের মধ্যে প্রধাম চৌধুরী জনৈককে নিযুক্ত করিয়া যাই।” আমি তাহার সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি লটকার নাম করিলেন। লটকা তখন সর্বদা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট যাতায়াত করিত ও ত্রিপুরার সহিত গুপ্ত যুদ্ধে জয়লাভ করার জোবাল ও জয়ন্তীপুরে অত্যন্ত প্রতিপন্ন হয়। তখন সেনামণ্ডলীতে লটকার নাম শুনিলে পুলকোৎসাহ হইত আর শত্রুশিবিরে বিশেষে ত্রিপুরার আবালবৃদ্ধ সকলেই লটকাকে কালাভক যমের জ্ঞান দেখিত। লটকার অদৃষ্ট ভাল, সর্ববাদী সম্মত হইল। প্রতাপাদিত্য তাহাকে রাজ্যভার দিয়া রাজমহিবী ও রাজকুমার লইয়া বাঙ্গালার চলিয়া গেলেন।”

শিলা বলিল, “এখন ত লটকাও জনসমাজে অস্তিত্ব হইয়া উঠিয়াছে। লটকা পদমন্ত্যায় পূর্ব্বের আশ্রয় বিস্মৃত হইতেছে, এখন সে ছিন্ন রাজা, কাহাকেও অপেক্ষা করে না, মনে বাহা উদয় হয় তাহাই করে।”

বুদ্ধ বলিল, “সকল কৰ্ম্ম শেষে বুদ্ধি পায়; তবে চুই একটা ব্যবস্থাকৃতি মধ্যে বুদ্ধি পায় ত অস্ত্রে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু সকলেরই শেষ আছে, যখন বোড়শ কলা পূর্ণ হইবেক, তখন কৃকপক্ষের উদয় হইবেক সন্দেহ নাই। এ সংসারের নিত্য কিছুই নাই, নিত্যের মধ্যে নাশই নিত্য।”

একটা পাছের অভয়াল হইতে জনৈক লম্বুপদে আসিয়া বুদ্ধের অঙ্গের বঙ্গা ধরিয়া অতি নম্র ও স্নেহবশে বলিল, “মহাশয়, একটু এইখানে অপেক্ষা করুন, অগ্রে একটা ব্যাত্র বসিয়াছে; বসিয়া তাহাকে মারিবার জন্ত অতি সন্তুর্পণে অগ্রসর হইয়াছে। লম্বু পাইলে ব্যাত্রটি পলাইয়া যাইবে। এটা অভ্যস্ত বৃহৎ ব্যাত্র, কল্য সন্ধ্যায় সময় স্বাভাৱি বোড়া মারিয়াছে ও আমাদেৱ দ্বজ হইতে একটা ত্রীলোক মুখে ধরিয়া পলাইয়াছে।”

বুদ্ধ ও শিলা উভয়ে কথা শুনিয়া অববেগ লম্বরণ করিল ও বলিল “এখানে দাঁড়াইয়া

বা কি করিব। যে উত্তরে বাতাস দিতেছে, ইহাতে ব্যাঙ্গ আবাদিগের গন্ধ পাইয়া সাবধান হইবেক।”

ভুঙ্কু বলিল, “মহাশয় আমি তাহার উপায় করিয়াছি। ঐ গাছের পার্শ্বে আগুনের কাছে চলুন।”

বুঙ্কু ও শিলা গাছের দিকে বাইতে বাইতে পশ্চিমধ্যে বলিল “বস'পোড়া গন্ধ পাই-তেছি। ইহাতে ভাঙ্কু আসিবার সম্ভাবনা, এমত অবোধের মত কণ্ঠ করিয়া অন্ধকারে বসিয়া থাকি উচিত নহে।”

ভুঙ্কু বলিল “মহাশয় ভাঙ্কুর ভয় নাই। এই পার্শ্বেই অগম্য ভূগু প্রান্তর। এ খান দিয়া সর্প উঠিতে পারে না, তা ভাঙ্কুর কথা কি? এস্থানটি হাতিবাসের উপযুক্ত স্থান। আমি ও ধনিয়া এখানে সন্ধ্যা অবধি ঐ বাজের প্রতীকার বসিয়াছিলাম। দেখুন এ স্থানের তিন দিকে খান ও আমরা ভাল জানি, এ খানের উপর একখানা আলগা পাথরে আমরা বসিয়া আছি। নীচে একটি রম্য গহ্বর; অতএব নীচে দিয়া কোল জন্ত আসিবার উপায় নাই। কেবল এই পূর্বদক্ষিণ কোণে পথ, তাহার অর্ধেক সত্যায় আমি আলিয়া অপরার্দ্ধ পাছে অভ্যরালে বসিয়াছিলাম। ব্যাঙ্গ ও ভালুদিগের জন্ম জন্মাইবার জন্য সভাজ্যগিতে বসাদিয়াছি, গন্ধ দূর হইতে হিংস্রক জন্ত প্রলোভন করিয়া আনিবেক। এই ক্ষণেক কাল হইল ব্যাঙ্গটী এই পথ দিয়া চলিয়া গেলে ধনিয়া ভাহাকে আন্তে আন্তে অনুসরণ করিতেছে।”

বুঙ্কু ও শিলা স্থানটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল। বুঙ্কু বলিল “এইরূপ খানেই শিবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আমাদিগের দেশে এরূপ ভয়াবহ ভূগু বধেষ্ঠ থাকার অবশ্য চাপিয়া মৃগয়া করা অত্যন্ত অনর্থমূলক হইয়া থাকে। তবে এ স্থানটির একটা সুবিধা দেখিতে পাই, ইহার কোল দিকেই বন বা বোপ নাই। বোপ থাকিলে এখানে মৃগয়ার সন্ধান জানিতে হইত। ঐ ধনুর টকার হইল। অনুমান করি ধনিয়া তীর ছাড়িয়াছে। তাহারই অব্যবহিত পরে একটি ভীষণ গর্জন হইল। মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল। বুঙ্কু শিলা ও ভুঙ্কু ব্যস্তে স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইল। বুঙ্কু বৃকের অভ্যরালে অশ্রু-বর বহনপূর্বক সভাজ্যগি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া অধিক শুক কাষ্ঠ দ্বারা আঘাতি বিভাঙ্গিয়া ঐ স্থানের দ্বারের স্বরূপ পথের মধ্যে ব্যবধান করিয়া দিল। পরে তিন জনে দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ শেল ও বাম হস্তে অভেদ্য দীর্ঘ কাষ্ঠকলক লইয়া অগ্রসর হইলে দেখিল যে, অল্প দূরে ধনিয়া ক্রমে পতিত হইয়াছে ও ব্যাঙ্গটী তাহার বাম ভূজশিরে উন্নত নখরপান ও ধনিয়ার দক্ষিণ অভ্যর বাম নখর (১) দিয়া ধরিয়া ধনিয়ার মুখের নিকট নাসিকা দিয়া

ভ্রাণ লইতেছে। ধনিয়া বৈরাগ্য বজ্রনখনধ্বজাহত (১) হইয়া রক্তরক্তীকৃতাজ হইয়াছে। শিলা ও ভুচ্ ধনিয়ার জীবন স শর দেখিয়া প্রত্যাশী (২) হইয়া অমিতবেগে ব্যাত্তের শিরোদেশ ও ললট লক্ষ্য করিয় শেণ নিকেপিল। শেলয় ভিন্মি শেলের জ্বার যেনে বাইরা ব্যাত্তের শিরোদেশে বিদ্ধ হইল। ব্যাত্তটি আর একটি অর্ধসর্জন করিয়া ধনিয়াকে ত্যাপ বরিয়া লক্ষ্য দিল ও প্রায় বশহাত অন্তরে দিয়া চীঃপাত হইল। ইত্যবসরে বুদ্ধ বয়োধিক্য বশতঃ কোন ক্রীড়া বা দুর্যভা না দেখাইয়া স্বীয় তীক্ষ্ণাধ কর্ত্তরিকা দিয়া ব্যাত্তের বক্ষঃদেশে ভেদ করিল। ব্যাত্তটি গোঁগড়াইয়া নিতুল হইল। তিন জনের আঘাত এত দয়াকালের মধ্যে পড়িল যে, বুদ্ধর কর্ত্তরিকার কি শিলা ও ভুচ্,র শেলে ব্যাত্তটি প্রাণত্যাগ করিল। বুঝা গেল না। ধনিয়া অবকাশ পাইয়া সামনে বুদ্ধ,র পদগুলি লইল ও ভুচ্,ব ও শিলার সহিত কোলাহুলি করিল।

বুদ্ধ বলিল, “ধনিয়া, তোমার এমত অসমসাহসিকের দ্বার আচরণ হুক্তিবুক্ত হয় নাই। সামান্য তীর কি কংগোচর হস্তে নিরাশ্রয়ে ভূমে থাকিয়া ব্যাত্তের সম্মুখে অস্ত্র চালন উদ্ভাস্তমাত্র—উচিত নহে।”

ধনিয়া বলিল, “মহাশয় আমি গাছের অন্তরালে থাকিয়া তীর সারিগাছিলাম, এই দেখুন তীর এখনও ব্যাত্তের গুকে বেঁধে আছে। আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে ব্যাত্তটি একই তীরে যমালয় গিয়াছে; কেন না সে তীরে বাইরা ভীমগর্জনে ভূমে পড়িল। তখন আমি গাছের অন্তরাল হইতে যেমন বাহির হইয়া কর্ত্তরিকা দিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিকর্ষ করিতে বাইব, অর্মান সে উঠিয়া লক্ষ্য দিয়া আমাকে মৃৎশায়ী করিল।”

শিলা বলিল, “দেখি, তোমার জজ্বার কি প্রকার ক্ষত হইয়াছে—তোমার কুজশিরে ত অধিক লাগে নাই?”

ধনিয়া বলিল, “আমার জজ্বার অধিক আঘাত লাগিয়াছে, আমি লক্ষ্য দেওয়ার কুজশির ধরিতে পারি নাই; পরে পড়ির গেলে কেব ব্যাত্তের ধাবমাত্র লাগিয়াছিল। মহাশয়, সে বাহা হউক, রাজার আঁসবার বিলম্ব কত? বিলম্ব থাকে ত আমি একটা বোড়ার সন্ধান দেখি।”

বুদ্ধ বলিল, রাজার আঁসবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তুমি আমার বোড়ার চল, চিরমুখে আমি আর একটা বোড়া করিয়া লইব।”

শিলা বলিল, “মহাশয়, আপনার বোড়ার আপসি যান, ধনিয়া আমার বোড়া লউন।”

ধনিয়া বলিল, “যেটা হউক,—আমি যতশ্রাবে ক্রীণবল বোধ করিতেছি।”

(১) ব্যাত্তের কঠিন নখ ও নড়াহত।

(২) বাহনক অগ্রসর করিয়া দাঁড়ান।

বুঝু ধনিয়ার অন্ধবৈরুদ্য (দেখিয়া স্বীয় মকর-বন্দ বস্ত্র ভাষার ভাব্যর বাধিয়া দিল ও বলিল, “স্বাধার নিকট আমার জীব্য সামগ্রী আছে, আসিলেই ঔষধ লাগাইয়া দিব।”

ধনিয়া অগ্রে বলিলে সকলে একত্র হইয়া মন্দগতিতে পথ দিয়া চলিল। ক্রমে পূর্ব-দিক্ রক্তবর্ণ হইতে লাগিল। প্রাতঃকালের অনির্কটনীর সন্ধ্যা চারি দিকে ছুটিল। দুয়ের গাছে ও কোপে মলাল (১) প্রকৃতি বড় বড় বস্ত্র ফুলটানির শব্দ পাওয়া বাইতে লাগিল। গোমায় (২) শূণ্যালে ক্ষতপদে পথের এ দিক্ হইতে ওদিকে দোড়িয়া স্বীয় গর্ভের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ওখানে একটা বেতবর্ণ শূণ্যাল ঘুর হইতে মনুষ্যপদের শব্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। এখানে একট ভালুক ঘোত ঘোত করিয়া হু হু দিয়া পলাইয়া গেল। শিলা ও বুঝু ভয়ক দেখিয়া কণ্ডালি দিয়া চীৎকার করিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে রাজার অগ্রবর্তী রাজপুরুষদিগের আগমন শব্দ পাইয়া বুঝু পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইল। ক্রমে লটকার অথ নিকটস্থ হইলে জয়দারাজ বলিলেন, “বুঝু, তুমি এখনও যে পথে দাঁড়াইয়া আছ ?”

বুঝু বলিল, “মহারাজ—জয় হউক! আমি প্রায় রাত্রি এক প্রহর থাকিতে রওনা হইয়াছিলাম; পথে ধনিয়াকে একটা ব্যাজ্রে আবদ্ধ করার বিলম্ব হইয়াছে; অনুমান করি, আপনি ব্যাজ শব্দে পথে দেখিয়া থাকিবেন। আমি গত রাত্রিতে লোক পাঠাইয়া চিরমুখে সমস্ত উদ্যোগ করিতে অনুমতি দিয়াছি। আশা করি মহারাজের কোন বিষয়ে অনুবিধা হইবেক না।”

লটকা বলিলেন, “বুঝু, তুমি পুরাতন লোক, বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে বলিয়া বাহ্য বল সকল সাঙ্গে। ইদানী আমার কৰ্ম্ম কার্য্যে তোমার শৈথিল্য দেখিতে পাই, এবিষয়ে তোমাকে একবার ইজিতও করিয়াছি—তোমার চৈতন্য হয় নাই। তুমি রাজকার্য্যে অপটু। আমি জানি, অনুমতি দেওয়া আমার কৰ্ম্ম; মা কালী তোমাদিগকে আদেশ বহন করিতে দিয়াছেন।” পরে পার্থক্য ওমরাও পুঁড়াকে বলিলেন “পুঁড়া তুমি কি? বুঝু অনুমতি দিয়াছেন ও আশা করেন আমার কোন বিষয়ে অনুবিধা হইবেক না।” অবার বুঝু দিকে ব্যজ বলিলেন “মহারাজ, আপনার প্রসাদে ও আশাতে আমার কোথাও কোন বিষয়ের অনুবিধা হয় না। আমার অনুবিধা অপরের শিরশ্ছেদনমূলক।”

ক্রমে লটকার রাগবৃদ্ধ হইতে লাগিল। লটকা প্রাতেই মড়ই (৩) ও পচান (৪) গোলাপনে (৫) চক্ষুর রক্তবর্ণ করিয়াছিল; আবার এখন রোষ হওয়ার

(১) পর্বতীয় ফুলট। (২) পেশেশালী (৩) মেড়ুরা শব্দভাষ মন্য।

(৪) ভাত পচান মন্য। (৫) লজ্জিত উগ্র মন্য।

পোলাকার চক্ষু আরও বৃদ্ধিতে লাগিল, যেন—কালান্তক যম—বীর কোটর হইতে লক্ষ দিবেক ।

রাজার কটুবাণ্য শুনিতে শুনিতে শিলা ও তুচ্ছ স্ব স্ব শেলগুলি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল ও এত বলে অধরোষ্ঠ দৃঢ় দিয়া চাপিল, যে, বোধ হইল চর্ম কাটিয়া রক্ত নির্গত হইবেক ।

বুজু চেটশিমে বলিল, “মহারাজ, আমি রাজসংসারে আর চাঙ্গিশ বৎসর কর্তৃক কহিলাম । মহারাজ শিবচন্দ্রের নিকট দ্বাধোগ্য মানে কাটাইয়াছি, কিন্তু এতদূর ব্যবহার কখন আমার অন্তরে ঘটে নাই । হজুর এত—অধীনের প্রতি বধেচ্ছাচরণ করিতে পারেন, কিন্তু বিনাপরাধে দণ্ড বিধান রাজার কর্তব্য নহে ।”

লটকা বুজুর পত্তীয়বাক্যে ও হির অজ্ঞভাবে কতকটা চমকিয়া গেল; কিন্তু বীর চাপল্যাবতাবশতঃ বলিল, তুমি যে প্রতাপাদিত্যের সত্যসনের ভায় নীতি উপদেশ দিতে শিখিলে । আমার অসত্য পার্শ্বীয়দেশে, বিশেষ শ্রোমটকর মুখে অত ভায়া-মাথা কথা শোভা পায় না । কাশুর্য শিবচন্দ্রের শাসন নহে । এ মহাপুরুষ লটকেবর রাজার অধিকার । তুমি খবরদার আমার প্রতিগোচরে শিবচন্দ্রের নাম করিও না ।”

বুজু বলিল, “মহারাজ, আপনার সহিত তুল্য উক্তি আমাতে লভবে না । আমার অপরাধ হইয়াছে কমা করুন । আমার গমন বিলম্ব অপরাধ মার্জনা করুন ।”

লটকা, “ইনি আমার কমা প্রার্থী করিতে শিখিয়াছেন ।” বলিয়া মত্ততাবশতঃ হস্তের কশা মুষ্টিদেশ দিয়া ব্যঞ্জে বুজুর কর্ণদেশ স্পর্শ করিয়া স্থণাচক খুঁচু করিয়া তাহার নিকে ফুৎকার দিলেন । শ্রোমটক নম্রুই ও চৌধুরিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ।

পুঁড়া রাজার এ প্রকার কুখ্যবহার দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, “মহারাজ, এটা আপনার উচিত কর্তব্য হইতেছে না । বুজু আমাদিগের মধ্যে অত্যন্ত সম্মান লোক । তাহার কোনই অপরাধ দেখিতে পাই না । চিরমজ্ঞে বাইর বদ্যাপ কোন বিষয়ে ত্রুটি পান, তবেই বুজু অপরাধী হইবেক । দৈবঘটনার উপর কাহারও আয়ত্ত নাই । পথে ধন্য ব্যক্তির হস্তে পড়িয়াছিল ; ধন্য বুজুর আত্মীয়—এতেই তাহার জজ্জ্বার জন্ত কিছু বিলম্ব করিতে হইয়াছে । তাহাতেই বা মহারাজের কতি কি ?”

রাজা পুঁড়ার এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গিয়া উঠিলেন । বুজুকে ছাড়িয়া পুঁড়ার প্রতি কটাক করিয়া বলিলেন, “কেহে—তুমিও যে বিচারশীল হইয়াছ ! ছোট মুখে বড় কথা ভাল শোনায়ে না । তুমি আমার ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করিয়া সদস্য বিচার করিও না, তুমি আমার আজ্ঞাবর্তী, আমার অহুমতি রক্ষা করিবে ।”

পুঁড়া বলিল, “মহারাজ, আমি আপনার অধীন বটি, কিন্তু আপনার ওয়রাও পরামর্শ দিবার লোক। সামান্য বুদ্ধিতে গী ভূত্ব্য নহি। আপনি আমাদিগকে একটু সাবধানে ব্যবহার করিবেন।”

লটকা বলিল, “রে পামর, আমার প্রতি ‘সাবধানে’ বাধ্য প্ররোপ করিলি। পুঁড়ী! তুই মগ অপেক্ষা অধম।”

পুঁড়া বলিল, “আমাদিগের অষ্ট মদ। আমাদিগের পিতৃপিতামহের ধর্ম্য নষ্ট হইল, এখন নিয়ন্ত্রণের দেবদেবার সেবার রাত্রি ও রাজপুরুষেরা নিবৃত্ত হইয়াছেন, এখন ক্রায় (১) আর পূজা হয় না। এখন ধর্ম্যপণ্ডিত পুঁড়ী ঘৃণাসূচক বটু বাক্য হইয়াছে। মহারাজ, এই দোষেই আমরা শিবচন্দ্রের রাজত্বে বিশেষ অনুরক্ত ছিলাম না। তিনি নিয়ন্ত্রণের লোক ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রায় উপর কোন অভক্তি ঘৃণা বা ঘেব করিতেন না। তিনি বলিতেন ডোমদিগের স্রা আমাদিগের বিষ্ণুর নবম অবতার—অবশ্য পূজ্য। তিনি ক্রায় উদ্দেশ্যে কয়েকটা কার্যক (২) মন্দির প্রস্তুত করেন। তিনি পুঁড়ীকে নিয়ন্ত্রণের পণ্ডিতের মত মাত্ত করিতেন। তিনি উভয় ধর্ম্মে সমদৃশ ছিলেন বলিয়া আমরা প্রতাপাদিত্যের কুহকে পড়িয়া আপনার কণ্ঠস্থ স্বীকার করিলাম। আশা করিলাম, স্বজাতির রাজা আমাদিগের ধর্ম্মের অনুশীলন করি। আমাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। আপনি বিস্ত সিংহাসনে বসিয়াই প্রথমে কলীর মন্দির স্থাপন করলেন। অসত্য পার্শ্বতোরেরা সরবল প্রস্তুত নৃশংস আচরণে আপনার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিল—মুর্খেণ্ডা বীর ধন ক্রমে ত্যাগ করিল। মুর্খেণ্ডা জানে না যে, আমাদিগের বৌদ্ধধর্ম্ম কত উচ্চনীতি শিক্ষা দেয়। বাহা হউক কেবল ধর্ম্ম কেন, আপনার অপরাপর আচরণে আমরা আপনার প্রতি আর তক্তি করিতে পারি না। আমরা এতদিন লুপ্তাশ্রমে আপনার বচস্বর (৩) হইয়াছিলাম। অন্যকার আচরণে সে শৃঙ্খলাটি ছিন্ন হইল। মহারাজ, আপনার পথ এক—আমাদিগের পথ স্বতন্ত্র।” বলিয়া পুঁড়া আপনার অধের মুখ অপর দিকে ফিরাইল।

লটকা রোষে ভাহার প্রতি আঘাতজন্ত যেমন কশা উত্তোলন করিলেন, পার্শ্ব চিহ্নাই নামক অপর ওয়রাও রাজার হাত ধরিয়া বলিল, “মহারাজ, ওয়রাওর অঙ্গে হস্তোত্তলন করা আপনার বোধ্য নহে। রোষাঙ্গে ঘোহিত হইয়া অনুচিত কর্ণে মন দিবেন না। ক্রমে সূর্যোদয় হইতেছে; বিলম্বে সূর্য্যার ব্যাঘাত হইবেক। চলুন, অগ্রসর হউন।”

(১) বৌদ্ধ। (২) ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মগৃহ।

(৩) হস্তমৌলিকা।

রাজা বলপূৰ্ব্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন “চিমাই, অন্য তোমাঙ্গিণের কি হইয়াছে? সকলেই আমার সম্মুখে অত্যাচার অরত করিয়াছে—ব্যাপার কি। কেহই কি আমার বশবস্তা নহ? চোপদার! চোপদার!”

চোপদার গিরি কোয়াইয়। সম্মুখে উপস্থিত হইল, রাজা বলিলেন, “চোপদার, চিমাই আমার অঙ্গ হাত দিয়াছে, তাহারে বাঁধ।” চোপদার চিমাইয়ের দিকে চাহিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া প-চাতে ঢালিয়া গেল। রাজা আপন অঙ্গ চাপাইলেন। চিমাই ক্রমে রাজাকে অঙ্গদ হইতে দিয়া মঙ্গলভিতে প-চাও স্থা শিল, বুকু, ভুরু, পুঁড়া প্রভৃতি কয়েকজন ওমরাও নিকটে আনিবে, সকলে পার্শ্বপাশ্বিক হইয়া চলল। ক্রমে রাজা সদলবল অঙ্গদ হইলে একটা গাছের নীচে কয়েকজন অরোহণ করিল। বুকু বলিল, “আজ ষট্কার কি হইয়াছে? সে একরূপ ব্যবহার করিতেছে কেন?”

চিমাই বলিল, “ওর গতক ঐ প্রকার—ইদানী অহঙ্কারে ভূমি পা পড়ে না—কাহারও মান রাখে না! ওমরাওদিগকে সৰ্ব্বদাই এই প্রকার ব্যবহার করে। এখানে চৌধুরী ও দলুইয়ের মাগু বাই। আমি অন্যান্যবিধ ইংরাজ সঙ্গ ছাড়িয়া।”

শিলা বলিল, “লটকা বুকু সহিত বেকরুপ আচারিল তাহে আমার তৎক্ষণাৎ একটা পক্ষ করিবার ইচ্ছা ছিল। কি বলিব, তে,মরা সকলে সহ করিলে আমাকেও অগত্যা সহ করিতে হইল।”

বুকু বলিল, “অন্য বোধ হয় অতিরিক্ত মদুরা পান করিয়াছে।”

পুঁড়া বলিল, “না লটকা স্বভাবতঃ ঐরূপ অবিবেক, তাতে আবার উচ্চপদ পাইয়াছে। পদের উত্থাপ কোথায় বাৎসরিক? অন্য প্রাধান্যের ব্যতীরা পূৰ্ণে কেবল এক বাণ পচান পান করিয়াছিল। সে আবার আসামী পচান, তাহার কি আছে—কেবল ভাতের পচা সৌবীরমাত্র (১)। আসামীয়াও সৌবীরকে সধিত (২) করে না, নগরুও (৩) বকাল (৪) দিয়া অষ্টাহের পচান ভাতের সৌবীর আলা ভরিয়া অতি-বধ করে।”

বুকু বলিল, “আসামী পচান মিডান্ত কাক্কি (৫) নহে, সে বকালটিতে ভনিয়াছি বধেই ধুতরের বাজ বাটিয়া দেয় আর সঙ্গদের অঙ্গ জায়ফল ও ছোট এলাচীর চূর্ণ দিয়া রাখে। একে পচানের মততা তাতে আবার এই সকল ভাপকর দ্রব্য—আসামী

(১) কঁজীমদ্য। (২) মদ্য চোলাই।

(৩) যে সকল উপদানে মদ্য উৎসিভ হয়, মদ্যবীজ।

(৪) যে গাছগাছড়ার বোণে মদ গাঁজিয়া উঠে। (৫) কঁজী

পটান আমাদিগের মডুরা অপেক্ষা অধিক কৈব্য। মডুরার কেবল মডুরতের বসাগু (১) করেক দিল তাপে বন্ধা করিলে কুঞ্জলের (২) ভায় অন্ন হয়। আমরা তাহা লভিত করিয়া নৌল্যতান (৩) বুদ্ধি করি বটে, কিন্তু আমাদিগের নৌল্যে বহু মানকতা আছে, আসামী পটানে ততোধিক কৈব্য (৪)।”

তিমাই বলিল, “আপনারা ঐ সবই জানেন—মডুরার আর পটানের কৈব্য ও মানকতা নইরা বিচার করিতেছেন, এদিকে জানেন না যে, প্রতাপাদিত্যের লিখিত হইতে পতনালে যে ভেট আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে বকপুত্রের হুয়া আইসে তত্তুল্য কৈব্য-পানীর আমি কখন দেখি না। আমরা চৌধুরী অত পারী, সে এক চোকা পানের পর আর বলিতে পারিল না। রাজা আজ কয়েকদিন হইতে হুয়া করিতেছেন। শুনিতে পাই একপায়ে নৌকা (৫) ও পৌষ্টিকনৌকা (৬) তাকীর সহিত দশবার সজিত করার বকপুত্রের হুয়ার অর্ধেকের অধিক তান নৌকা আছে। রাজা অন্য ব্যক্তির পূর্বে দুই তিন বাণ বকপুত্রের হুয়া পান করিয়াছেন।”

বুঝু বলিল, “বাহ! হটক একপে চল—আমরা এখানে থাকিয়া আর কি করিব? তিরস্কৃত বাই, দেখি লটকা কি করিতেছেন। রাজার উপর রাগ করিয়া হুয়া ত্যাগ করা হইবেক না।”

পুঁড়া বলিল, “সন্দরামের পক্ষমতে অন্যাইত আমাদিগের একটা উপায় চিন্তিতে হয়। অবকাশও পাওয়া গিয়াছে, রাজার পাণও পূর্ণ—যোড়শ কলা প্রাপ্ত।”

বুঝু বলিল, “তাহা সত্য বটে, কিন্তু বাহাকে একবার রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি ও লাভ করিতেছি, তাহার বিপক্ষে অন্য থরিতে আমার মন নয় না।”

তিমাই বলিল, “আমরাই লটকাকে রাজা করিয়াছি। তিনি যদি আমাদিগের লাভ না রাখেন, তবে আমরা তাঁহাকে উক্ত পদে রাখিতে প্রস্তুত নহি। ফলে লটকার স্মরণ করা উচিত যে, আমরা তাঁহার তত্ত্বাধিত প্রজা নহি। আমাদিগের মধ্যে লটকা হইতে অপেক্ষাকৃত লাভ ও সন্তোষ লোক আছে। বুঝু প্রায় বিষপুরুষ চৌধুরী, পুঁড়াও একজন প্রায় চৌধুরী আমার পূর্বপুরুষ অতি সন্তোষ দ ই ছিলেন, আমি আজ চারি-পুরুষে চৌধুরী। ঐ প্রায় দুই মধ্যে একজন গণ্য ও সন্তোষ। ফল বলিতে গেলে তেলটক তাকীর মীরানদার মধ্যে প্রায়ের মীরানদার অপর কেহ নহে। আমাদিগকে লামাভ দাসের বহু ব্যবহার করিয়া যে তিনি জরতীতে রাজ্য করিবেন, তাহা

(১) বহু লাভ ইত্যাদির মাড়। (২) অন্ন মদ্য।

(৩) মদ্যের মানক অংশ। (৪) মতভাজনক অর্থ।

(৫) গুড় হইতে জাত মদ্য। (৬) চাউল হইতে জাত মদ্য।

কখনই ছাড়ে ন। শিবচন্দ্রের বংশকে রাজ্য দিব। নন্দরাম লিখিয়াছে যে, হুঘু-
কুমার বাক্যগায় সমূহ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি আবার একটি অগ্রগণ্য বীর।
তাহা হইতে অরুণা শাসন অতি সুগারে সমাধান হইবেক।”

এমত সময় জনৈক পত্নী আসিয়া বলিল, “চৌধুরী, দলুই ও মীরানদারদিগকে
মহারাজ স্মরণ করিয়াছেন। বস দেখা হইয়াছে; যুগয়া আরম্ভ হইয়াছে; অনুমান
করি অন্য আমাদিগের প্রথম সার্থক হইবেক—অন্য ব্যাত্ত, তরলু, (১) ভলুদ, গোমার
মুগ ও গণ্ডক বধেই উল্লিখিত হইয়াছে। এমত সকল গ্রামাধান ত্বরায় দেখা যায় না।
বহাশবেরা চলুন।”

গ্রামাধানের সম্মান, ষোল্লটক কর্বে অতি সুশ্রাব্য, সকলেরই মুখ দিয়া লাল পড়িতে
লাগিল। পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ও সকলেই সভ্যমধ্যে বসন্তম
বুড়র প্রতি চাহিলে বুড়ু বলিল, “চল, এখন যুগয়াও করা যাক, পরে যাহা হইবার
তাহা হইবেক।” এই কথা শুনিবামাত্র ঋষা করেকটা চুফ (২) পূর্ববংশপাত্র এতোকের
হস্তে দিল। সকলে অথের উপর দাঁড়াইয়া এক এক পানে কশপাত্রটি দিশেষ করিল,
ও কশাঘাতে আপন আপন অবচালন করিল। ব্যাত্ত-আহত ধনিয়া আর হিত হইয়া
থাকিতে পারিল না। ঋষা নিকট হইতে গৌল্য পান করিয়া জুলশির ও জজ্বা
কবলিকা বন্ধ করিয়া এক টাট্ চাপিয়া চলিল। অল্পদূর অবচালনে তাহার জুলশিরের
কবলিকা শিথিল হইল, বর্ষণে কষ্টকর বোধ হওয়ার, ঋষাকে ডাকিয়া কবলিকা পুনর্ব্বার
বাঁধাইয়া কতদেশে আবরণ করিল। ক্রমে করেকজন অবরোহী চৌধুরী ও দলুইরা
চিরমঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখে যে, কশটীলার প্রশস্ত সামুতে
গ্রামাধানের দায় হইয়াছে ও তথায় অরুণারাজ লটকা ও আর করেকজন প্রধান প্রধান
চৌধুরী, কেহ অথ, কেহ হস্তপুটে, কেহ বা জুমে, অর্দ্ধচন্দ্রাকার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক
এক রঙ্গী অস্তরে দাঁড়াইয়াছে, অপরাপর সৈনিক ও গ্রামবৃদ্ধ চিরমঙ্গের পশ্চিম কটক
(৩) হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাসের জুমি ঘিরিয়া, মাদল, ঢাক প্রভৃতি বাণ্য ও চীৎকার
ও হুকাবাদি তরঙ্গপ্রদর্শক শব্দ করিতেছে। জনৈক দলুইয়ের সমুখ দিয়া সম্ভব লক্ষকর্ণ
(৪) দাড়িয়া গেল। দলুই হস্তস্থ ভোমরাঘাতে অগ্রের লক্ষকর্ণকে ভূমিশায়ী করিয়া
দৌড়িয়া অনুসরণ করত আর তিনটিকে আহত করিল। পরে লক্ষকর্ণচতুষ্টয় উঠাইয়া
আনিয়া রাজার সমুখে রাখিল। গ্রামাধানের নিয়মানুসারে প্রথম শিকার রাজার প্রাপ্য।

রাজা লক্ষকর্ণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন “অন্যকাল

(১) হুতার, ভেড়েল, চরখা। (২) ছিরকা।

(৩) গিরিনিতম্ব। (৪) শলকভেদ।

আমাখান বড় মঙ্গলের নহে, প্রথমেই লক্ষকর্ণ শিকার হানিকর। তুমি ইহা ছাড়িয়া
'দলে না কেন?'

নিকটস্থ মুণ্ডী চৌরী বলিল "লক্ষকর্ণ আবার শশকজাতীয় মধ্যে হেয়, ইহার মাংসও
ভেত কে মল নঃ, ইহা রাজাপহারের অযোগ্য!" দলুই অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল।

ইতোমধ্যে বুদ্ধ প্রভৃতি বয়েঃজন আসিয়া শ্রমীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে
এমত সময় একদলে তিনটি কৃষ্ণসার বায়ু-বলে তাহা'নগের মধ্য দিয়া
ধূলী উড়াইয়া দোড়িল। চমাই আপন'র ধনু ত একটি তীক্ষ্ণকল্পত্র (১)
নিয়োজন করিয়া যেমন সজ্জন করিবেক, অমনি ধনু'র জ্যা ছিঁড়িয়া গেল। একটি
বুধা টঙ্কার হইল ও ছিন্ন বর্ষাকর্ষু কর (২) আঘাতে তাহার গোধার (৩)
উর্দ্ধদেশের চর্ম কাটিয়া গেল। কৃষ্ণসার কিন্তু অব্যাহতি পাইল না। পুঁড়ার
দীর্ঘ শরে বিদ্ধ হইয়া ভূমে উটোইয়া পড়িল। বুদ্ধ আর একটিকে ভূমে পাড়িল!
কিন্তু গটকা চমাই'র ধনুর্ভাণ ছিন্ন দেখিয়া বলিল, "ইহার অন্য পরামর্শ করিয়া
বাহাতে আমার অঙ্গল ষটে এমত ব্যবহার করিতেছে; কৃষ্ণসারের প্রতি প্রথম
সন্ধানে জ্যা ভঙ্গ দৃশ্যের অনর্থক নঃ। চমাই! চমাই!" চমাই নিকটে গেল
বলিলেন, "তুমি একান্ত এমত অক্ষম হইয়া থাক ত ঘরে যাও। এখানে আসিয়া
আমার মৃগয়ার হানি করিবার আবশ্যক নাই!" চমাই কোন উত্তর করিল না,
অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ও'দিকে বরাশূলা ও নীলগাই কয়েকটি দোড়িয়া
গেল, শরে ও ভিন্দপালে (৪) ছয়টি ভূমিশারী হইল, একটিমাত্র দীর্ঘকায় নীলগাই
একটি শরপৃষ্ঠ করিয়া পলাইল। জনৈক অসারোহী দলুই শূল হস্তে তাহার
পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এ'দিকে রাজার নিকট দিয়া একটি মুণ্ডী ও দুইটি পৃথত
বেমত দৌড়িয়া বাইবেক, অমনি রাজভক্ত শরে ভূমিশারী হইল। রাজা এতবলে
শরদ্বয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, পৃথতদেহ তেল করিয়া তীক্ষ্ণগ্রা অপর দিকে দেখা
বাইতেছিল। একপার্শ্বে কল্পত্র ও অপর পার্শ্বে তীক্ষ্ণগ্রা মাত্র দেখা গেল। ক্রমে
বিশালবিষণ তক্ষু, মহানু গব্ব, শম্বর, নীলাণ্ড সগোত্র, খেতেরখা, রাজীব, শূ-
হীন মুণ্ডী, তাত্রবর্ণ হরিন, স্রৈব্দ তাত্রবর্ণ বরাশূলা বা কুরঙ্গ দুই চারিটি করিয়া
আহত হংল। পুনীল ও স্বয় ও ত্রী নীলাণ্ডরোহিতও মারা পড়িল। মধ্যে মধ্যে
অসংখ্য বকুট।

(১) পক্ষযুক্ত বাণ। (২) বাঁধা ধনু।

(৩) হস্তাক্ষদীত্রাণ।

(৪) কণ্ঠকর্ষু হইতে উৎক শর।

লটকা বলিলেন, “চোপনার শ্রেনচিভেরা (১) কোথায়? তাহাদের খোঁজ দেখাইতে বল। গ্রামাধানে শ্রৈষ্ঠম্পাত (২) হওয়া উচিত; শ্রেনটকলাতীর চৌধুরীদিগের শ্রৈষ্ঠম্পাত অত্যন্ত প্রিয় মৃগয়া।”

হুমের বলিল, “মহাঃজ বুদ্ধকে ডাকাইতে আদেশ করুন, বুদ্ধর অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও বলবান শ্রেন ও কপোতার প্রভৃতি আছে। তাহার শ্রেনকদম্ব (৩) তুল্য মহারাজার প্রভুদ (৪) নাই। বজ্রের আদেশ মাত্রেই বুদ্ধ সানন্দে তাহার শ্রেনকদম্বের গুণ দেখাইবে।

রাজা বলিলেন, “কেন বুদ্ধ কি দেখিতেছে না যে, আমাকে তাহার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে হইবেক। সেও একজন প্রধান শ্রেনটক ও রাজামাতাও বাটে। এরূপ সাধারণ গ্রামাধানে কেনই বা স্বয়ং উদ্যোগী হইবেক না? রাজকর্মচারীর

কর্ম্মে স্বতঃ সর্বদা নিযুক্ত থাকা। আমার আবদারকে (৫) কিছু পানীয় আনিতে বল, আমার অত্যন্ত কণ্ঠশেষ হইতেছে।”

অনেকে অম্বদার আসিয়া উপস্থিত হইলে লটকা বলিল “আসামী মাড়ুয়া আন।” অম্বদার প্রেষণ্ত বংশের একটা পাত্র আনিয়া তাহা হইতে ক্ষুদ্র একটা বংশপাত্রে ভরিয়া কিংকং আসামী মাড়ুয়া ঢালিয়া রাজার হস্তে দিলে, রাজা একখানে শোষণ করিয়া ওষ্ঠ চট্‌পট্‌ করিয়া বলিলেন। “আঃ! আসামী মাড়ুয়া প্রাপ্তপ্রাণ! জয়ন্তীর বলাপালেয়া (৬) এরূপ গৌল্য প্রস্তুতে অক্ষম। ইহারা একান্ত অকর্ম্মণ্য। আমি আসাম হইতে দক্ষ কল্যাণাল কয়েকজন আনাইয়া জয়ন্তীপুরে বাস করাইব। হুমের বলিল, “মহারাজ, আসামী মাড়ুয়া অপেক্ষা বঙ্গের গোড়ী ও পৌষ্টী অত্যন্ত উপাদায়ক। ভনিরাছি তাহার প্রায় তিন ভাগ গৌল্য ও বক্রী তত্ত্ব্য নিয়মেশজাত সুমিষ্ট ঐক্ষবরস ও ধাত্তের নিকষ থাকে। আমার জনৈক আত্মীয় গতরাত্রিতে কিংকং আমাকে দিয়াছিল। আমি এক পোয়া আনুমানিক পান করিয়া সমস্ত রাত্রি শিশিরে ও হিমে পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হইল যে, ভঠরাগ্নি সর্বদা দগ্ধ করিল! আর সে সুরাপানকালীন সুরা বতদূর গলাধঃকরণ হয়, ততদূর যেন ভেজে উত্তেজিত হইতে থাকে।”

রাজা বলিলেন, “কোথা দেখি সে কি প্রকার সুরা?” হুমের একটু অন্তরে থাইয়া অপানর অন্তরকের চর্মেয় থলি হইতে একটা কাচের বোতল আনিয়া তাহা হইতে আনুমানিক এক ছটাক একটা ক্ষুদ্র বংশ পাত্রে ঢালিয়া মহারাজের সম্মুখে

(১) বাহারা শিকরা ইত্যাদি পালন করে।

(২) শিকরা বাহা শিকার। (৩) শিকরা ইত্যাদির সমূহ।

(৪) শিকারী পক্ষী। (৫) যে ভৃত্যের নিকট পানীয় থাকে। (৬) ভণ্ডী।

বলিল। রাজা বলিলেন, “এতটুকুতে কি হইবেক? ইহাতো জিহ্বা ও দন্ত আঁঠ করিতে নষ্ট হইবেক! আর একটুকু দাও গলাধঃকরণ চটক।”

সুমের আর একটুকু ঢালিয়া দিলে তাহার মহারাজ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “এত অল্পমাত্রায় সুরা আমি কখনপান করি না! এই লও তোমার অব্য ভূমিই পান কর!”

সুমের বলিল, “মহারাজ, এ অত্যন্ত তীব্র সুরা, ইহার লৈব্য প্রায় অসহ। বার বার আদেশ করিলে অগ্রথা করিতে অক্ষম। এই লন।”

প্রায় এক পোয়া সেই সুরা লইয়া রাজা এক খাসে পানের জন্ত যেমত শোষণ করিলেন, অমনি এমত বিষম লাগিল, যে হস্ত হইতে বংশপাত্রটি ঝগিয়া পড়িল। অনেক বিশ্রাম করিয়া বলিলেন, হাঁ এ অতি উৎকৃষ্ট সুরা বটে। ইহা কে তোমাকে দিল? আমার জ্বর পর্যন্ত জলিয়া উঠিয়াছে।’ বহু অসভ্য জাতির বত তীর স্বাদই উপাদেয় বোধ হয়। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “সুমের এই সুরা আমার জন্ত আনাইয়া দিতে হইবেক।”

সুমের বলিল, “মহারাজ, এ অতি মূল্যবান কার্য। সম্প্রতি আপনার শ্রেনকমল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বহুক্ষণ হইল আর কোন জন্ত উন্মিত হইতেছে না। আদেশ দেন ও চতুর্পার্শ্বের খিটানকে (১) নিকট আসিতে বলা যায়।”

রাজা বলিলেন, “ক্রমে চক্রে সক্ষীর্ণ করুক, যদি তাহার কোন জন্ত উন্মিত না হয়, তাহা হইলে বনে আগুন দেওয়া বাইবেক।”

সুমের রাজার অভিপ্রায় মত আদেশ দিলে খিটরা ক্রমে চক্রে সঙ্কোচ করিতে লাগিল ও মহা সমারোহে মানল, ঢকা ও ঝাজ বাজাইলে, এক দল কপিঞ্জল সমুন্মিত হইয়া চিরমগ্নের কটক হইতে প্রান্তরের দিকে কিচ্-কিচ্ শব্দ করিতে করিতে কতক দৌড়িয়া, কতক বা অঙ্গ অঙ্গ পক্ষ হিলোলে চলিল। তাহার মধ্যে তিস্ত্রী, আসামী দৌহারীতিবর্ণকণ্ঠ ও জৈবদন্তবর্ণচকুপুটধারী কোএরা নামক অপর জাতীয় কপিঞ্জল, লেপচাঙ্গির হরিৎপৃষ্ঠ কোহেঙ্গো ও ভালুকা পর্বতের রক্তকণ্ঠী পোখও যথেষ্ট দৌড়িল। রাজা ইন্দ্রিত করিবামাত্র জনৈক শ্রেনচিত তাহার চক্ষ্যগত বামহস্ত হইতে একটি সুশিক্ষিত শ্রেন ছাড়িয়া দিয়া একটি শিশ দিল। শ্রেনটি শিশ শুনিবাসাত্র উর্দ্ধে উঠিয়া নিম্নবামাত্র স্থির হইয়া একটি কুকী পর্বতের বেঙ্গটী জাতীয় তিস্ত্রীর উপর হেঁ। মারিয়া যেমন পড়িল, অমনি বেঙ্গটী পক্ষবিস্তারিয়া বক্রগতিতে মৃৎশারী হইয়া বলিল। শ্রেন কিরিয়া দ্বিতীয় বার তাহার পৃষ্ঠদেশে স্বীয় প্রথর নখে বিদ্ধ করিয়া উড়িল ও উড়িতে

উড়িতে বেঙ্গটর মস্তকে চকুহারা আঁষাড করিয়া তাহার শিরঃপৰ্শ ছিঁড়িতে লাগিল। বেঙ্গট কাতরস্বরে টি টি করিতে লাগিল। এদিকে কতকগুলি লওয়া, বটের, মণিপুরী সেইপল ও লেপচা টিমোকফো প্রভৃতি দুহু দুহু গোলাকার নানা বস্তুর পক্ষী গুড় গুড় করিয়া নোড়িল। যে বাগাকে পাইল ভোমর, করপালিক প্রভৃতি অস্ত্রাঘাতে ও শব্দনিষ্ক্ষেপে রাশি রাশি মারিয়া একত্রিত করিতে লাগিল। ক্রমে উলুময়র ও কুতভিতর দেখা গেল। লটকা স্বয়ং গুলেল নিয়া উড্ডীন পুং উলুময়র একটা ভূমে পাড়িলেন। এমত সময় বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ ঐ একটা দেবদুৰ্গম যাইতেছে।” রাজা বাঁটল নিয়া উড্ডীন দেবদুৰ্গমকে লক্ষ্য করিয়া গুলেল ছাড়িলেন। বাঁটল লাগিবারাত্র দেবদুৰ্গম তাহার সচক্ষু-পক্ষ বিস্তারিয়া ভূমে পড়িল। আহা পক্ষের কি শোভা! প্রায় চার সারি ব্রতবর্ষ পরসার জায় দাগ। পক্ষীটি ভূমে পড়িয়া এমত বেগে ঘোড়িতে লাগিল যে, তাহাকে অনুসরণ করা এককালে অসম্ভব বোধে অগত্যা ত্যাগ করিতে হইল। অনেক এই প্রকার কুক্কট, কপিপলাদি পক্ষীর সমুদ্রাস্থের পর আর কিছুই দেখা গেল না। লটকার রিহৎসার তৃপ্তি হইল না। লটকা ঘন ঘন অতীত তীর কৈবল্য পানে মগ্ন হইয়া গব্যাদি বৃহৎ শিকার না পাইয়া বিষক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল; যে কেহ দৃষ্টিপথে পড়িল একটা না-একটা দোষ উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে রুঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলে, সকলেই রাজার নিকট ছাড়িয়া দূরে গেল। এমত সময় সুমরাকে দেখিয়া বলিলেন, “সুমরা তোমার জাল ও ফাঁদ কোথা? তাহার কি পড়িল?”

সুমরা বলিল, “মহারাজ আমি বথান্থানে জালাদি নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু তথায় কি হইয়াছে বলিতে পারি না।”

চোপনার জনৈক অগ্রসর হইয়া বলিল, “মহারাজ, অন্য ফাঁদে কিছুই পড়ে নাই।”

লটকা বলিল; “আমার আজ্ঞা কেহই রক্ষা করে না! তুমিও একান্ত অকর্মণ্য। তোমার শাসন আবশ্যক।”

সুমরা বলিল, “মহারাজ, প্রতিনিধি নিয়োগজন করিয়া তত্ত্ব লউন। এ প্রকার জনতায় কি ফাঁদে কোন ফল দেয়? বৈরুপ লোকারণ্য ও বাদ্যাদির ধ্বনি, তাহার এ বনে এখন পাঁচ ছয় মাস আর কিছুই হইবেক না।”

লটকা বলিলেন, “আমি ও সকল ওজর শুনিতে চাহি না। তুই দেখি বুদ্ধ অহু-সরণ করিহি।”

সুমরা বলিল, “মহারাজ, আপনায় মতিভ্রম হইয়াছে। আপনার কালও নিকট! লতুবা চৌধুরী ও দল্লুই এতি এ প্রকার পরমবাক্য কেহই প্রয়োগ করে নাই। মহা-রাজের বুদ্ধর প্রতি লক্ষ্য সপনের জায় বেষপ্রকাশ করা উচিত নহে। বুদ্ধর মানে আপনার রাজ্যের মান।”

লটকা বলিলেন, “আমি বুদ্ধর অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া রাজ্য করিব না। অরুণ্ডী

‘পুত্রের দুই হৃদয় এককালে উভয় হইতে দিবা না। বুদ্ধ কিছু আমার সমকক্ষ নহে।’ চোপদারকে বলিলেন, “বুদ্ধকে আমার সম্মুখীন কর।” চোপদার বুদ্ধের নিম্নে বসিয়া দেখে যে, বুদ্ধ, শিলা ও পুঁড়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান চৌধুরীরা এবং দূরের জঙ্গলে গিয়া শ্রোতৃপাণ্ডে ব্যস্ত আছে। ভিত্তিহীন, বসিগল, গিরে চেগুণা প্রভৃতি তজ্জাতসামিধ্য পক্ষিচয় হুশীকৃত শ্রোতের সহায়তায় রাশি রাশি ধ্বংস হইতেছে। এদিকে বুদ্ধর আদেশে প্রধান শ্রোতচিহ্নকে ডাকান হইল। সেটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ জাতিতে মুসলমান, আবক্ষসম্বন্ধকৃষ্ণবর্ণশ্রদ্ধা, শিরে একটি সরোমমৃগচর্ম্মের টেপী, তাহার কুঙ্গসের পালক, উভয় হস্তে অকোণ পঞ্চাঙ্গ চর্ম্মের দস্তানা। আজানুলবিত পুষ্ঠানৈয় (১) অঙ্গরক্ষক বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে আবরণ করিয়াছে, নীলবর্ণে রঞ্জিত মোটা ত্রিপুরাবস্ত্রের অষ্টীৎ পর্যন্ত পাজামা, কটীদেশে হুবিভূত চর্ম্মের কোমরবন্ধ, তাহার চর্ম্মের কোষ। বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে লগিত ঘাসুল বিভূত চর্ম্মের ফিতার উভয় দিকে রূপার বলয় বেওয়া; তাহা হইতে রেশমের সূত রজ্জ্ব বন্ধে বিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি কাঠনগুণের দুই কোণে বাঁধা। পৃষ্ঠদেশেও তাহার প্রতিকূপ। শ্যোনচিত্র উক্ত দণ্ডচতুষ্টয় মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, দণ্ডচতুষ্টয় তাহার চারি দিকে উল্লিখিত বক্ষ ও পৃষ্ঠজুত মুণ্ডিত। দণ্ডচতুষ্টয়ে চারিটি অবগুণ্ঠিত তীক্ষ্ণ চকু বক্রনথ ক্রুস। সে গুলি ধকু হইতে পুচ্ছাপ্রাণান্ত প্রায় দেড় হাত দীর্ঘ। পক্ষ বিভূত করিলে পক্ষ্যগ্র প্রায় চারি হস্ত চোড়া। শরীরগোল নিরেট, আর পক্ষের পালক এত দীর্ঘ, লঘুতর পুচ্ছ হইতে লম্বা। সর্কাক্স প্রায় তাম্রধূসর, তাহে উজ্জ্বলধূসরে রঞ্জিত। স্বন্দ্রদেশ খেতবর্ণ। পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতর ধূস। পুচ্ছে পাংশু বর্ণ কৃষ্ণরেখা। শিরোভাগ আরক্ত পীত। ফলে সে একপ্রকার দীর্ঘকায় প্রকাণ্ড বলবান্ন বাজ বা শিকরে পক্ষী। টাইটানী ও চীন-দেশে বিশেষত পশ্চিম রাজ্যে পূর্ব্বতন রাজারা এই পক্ষী হুশীকৃত করিয়া মৃগয়া জন্ত পালন করিতেন। প্রধান শ্রোতচিহ্নের পশ্চাতে প্রায় তদ্রূপ বেশধারী অন্ন বার জন শ্রোতচিহ্ন। প্রথম শ্রোতচিহ্নের নিকট দুইটী ভৈরব-বাজ, তাহার চক্ষে অবগুণ্ঠন নাই। এই পক্ষীকে হিন্দু রাজারা সাচীন বলিয়া ডাকিতেন ও তাহাঙ্গিরের মৃগয়ার অত্যন্ত প্রিয়পক্ষী বলিয়া ব্যবহৃত হইত। ভৈরব-বাজকে অল্প বাজের ছায় শিকার দেখাইয়া দিতে হয় না। খেলা আরম্ভ হইলে ভৈরব-বাজকে ছাড়িয়া দেয়, ভৈরব-বাজ অত্যন্ত উর্দ্ধপ্রদেশে উর্দ্ধডীন হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, পরে পক্ষি শিকারের পক্ষী উল্লিখিত হইলে উচ্চতর প্রদেশ হইতে তাহার পৃষ্ঠে অমিতবেগে অজ্ঞাত-স্থিতিতে নিশিড়িত হয় ও বক্রগ্রা বিধম নখে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বৃহৎ পক্ষ হয় ত

তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া চলৎশক্তির মাংস কাটিয়া ফেলে ও স্বীয় উপর পূর্ণ করে । জনৈকের নিকট চারিটি সাহীবাজ বাহাকে পশ্চিম রাজ্যে কএল বলিয়া জানে । এ জাতীয় বাজ অশুভ বংশের কালান্তক বয় । ইহাকে অশুভমাত্রাই ভয় করে । নির্লজ্জ কাক ইহাকে দেখিলে দূর হইতে পরাস্তরে যায় । ভিত্তী ইহাকে উদ্ভ্রমণে ভ্রমণ করিতে দেখিলে অড়নড় হইয়া অভিকূত হয় । রাজহংস ভয়ে ডুবিলে কুলিয়া দিয়া ইহার নখাঘাতে মৃত্যু হয় । সাহীবাজ মুশিক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে ছ টি মুক্ত পক্ষী মারিয়া দুই পদে লইয়া শ্চেনচিত্তের নিকট ফিরাই আইসে । ইহার লক্ষ্যের উপর পতন এত বেগবান যে, গ্রামাথানে ভূমি লক্ষ্য পলায়ন করিলে সাহীবাজ স্বীয় বেগ সম্বরণে অক্ষম হইয়া ভূমে নিপতিত হইয়া পক্ষ হু পায় । জলে হইলে হংসাদি বৈদ্য পলায়ন করিলে ছেঁ। মারিতে গিয়া ডুবিয়া যায় । পক্ষিশিকারের পক্ষে সাহীবাজ কুল্য শ্রেন দেখা যায় না । ইহার মত জবন পক্ষি আর নাই । পক্ষশাস্ত্রমতে এই পক্ষী প্রকৃত শ্রেন । অপর শ্চেনচিত্তের নিবট একটি লগুণ্ড বাজ ও তিনটি বর্জনা-বাজ । কাহার নিকট দোরেরী । কাহার দণ্ডে তুরুমতী ও নাজীবাস । কেহ শিকরা ও রাজবয় শ্রেনকনস লইয়া আসিতেছে । বহুক্ষণ পক্ষীর মুগময় ভ্রান্ত প্রার হইয়াছে দেখিয়া বুদ্ধ তাহারাদগকে আহ্বার দিতে আদেশ করিল । এমত সময় চৌপদার আসিয়া রাজাজ্ঞা অবগত করাইল বুদ্ধ লটকার নিকট চলিল । সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সমস্ত প্রধান প্রধান চৌধুরীও চলিল । পশ্চাতে কয়েক জন শ্রেনচিত্ত ও ভ্রমসম্পাৎলক স্থানীকৃত পশু পক্ষী । কাহার স্বন্ধে লম্ববর্ণচতুষ্টয়, কাহার শশক ছয়টা, কেহ একটা কৃষ্ণগার স্বন্ধে লইয়া বাইতেছে ও দুই হস্তে তাহার পদচতুষ্টয় দুই স্বন্ধের উপর দিয়া ধরিয়াছে । কৃষ্ণসারের সশৃঙ্গ মুণ্ড পৃষ্ঠদিকে ঝুলিতেছে । কাহার স্বন্ধে ভিত্তিরী কপিঙ্গলের মাগা । কেহ মবাল, পোখ, বোহেল্পো প্রভৃতি সুদর্শন কুক্কট হস্তে লইয়া বাইতেছে । অদূরে দুই জনের স্বন্ধে এষ্ট সরল ডালে একটি প্রাগু চন্দরী নবর ঝুলিতেছে ; বহুকেয়া ভারবহনে ক্ষিন্ন হইতেছে । নিটহ হইলে বুদ্ধর মুগময় লাক্ষ্য দেখিয়া লটকার হিংসা হইল । বলিল, “হাঁ বুঝিয়াছি ইহারই লজ্জ আমি মুগমাধানে এমত নি ক্ষল হইলাম । সমস্ত পশু ও তোমরাই মারিয়াছ ! এই লজ্জ কি আমি তোমাকে পূর্বে লঙ্ঘন দিয়াছিলাম ? এরূপ অত্যাচার আমি সহ করিব না ।”

বুদ্ধ বলিল, “আমাকে কি আদেশ করিবেন করুন । আমরা মুগময় ভ্রান্ত হই-
য়াছি । রোজও ক্রমে অসহ্য হইতেছে । অনুমতি পাইলে স্বরার সানাহার করি ।

মহারাজের মুগময় এত নিষ্ফল হইল কেন ?”

লটকা বলিলেন, “নিষ্ফলের কারণ তুমি । গ্রামাথানে দুই স্থানে মুগময় হইলে

যেখানে স্বেচ্ছাস্থিত হয় সেইখানেই অধিক পণ্ড আহত হয়। তোমাদিগের সঙ্গে কি শিকারী চিতা ছিল?”

বুদ্ধ বলিল, “আমার দুইটা শিয়োগোষ ও একটা চিতা আর পুঁড়ার একটা শিরাগোষমাত্র ছিল।”

লটকা বলিল, “তোমার স্বেচ্ছাস্থিতও প্রচুর।”

বুদ্ধ বলিল, “আমার ফুঁস লইয়া বিংশতিটি আর আমাদিগের শিলা, পুঁড়া, চিমাई ও অপরাপর কয়েক জনার একুশে প্রায় পঞ্চাশটি স্ত্রেন। আর আমাদিগের দলে প্রায় দেড় শত বুকুরও ছিল।”

লটকা যোষে বলিল, “এ তবে তোমাদিগেরই গ্রামাধান হইয়াছে, আমি তোমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছি। ভাল আগন্তুককে এরূপ মৈত্রাণ করা উচিত হয় নাই। বলি তোমাদিগের।ক কিছু বুদ্ধি নাই—আমার সমীহ করিলে না—এ অত্যন্ত অজ্ঞান!”

বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ, কেন এ ত কিছুই নহে। গ্রামাধানের নিয়মই এই। যে যেখানে ইচ্ছা শিকার করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত করিবে। আমরাও রীত্যনুসারে সমস্ত বুকুরে আসিয়াছি।”

লটকা বলিল, “আমি তোমাদিগের উচ্ছিষ্ট লাভের পাত্র নহি। পাময়েরা যথেষ্ট চরণ করিতেছে, আমি অন্যই শাসন করিব। অন্য প্রাতঃকালাবধি আমাকে বিধিযতে উপেক্ষ করিয়াছে। বুদ্ধ, তুই অত্যন্ত নির্লজ্জ; তোক প্রাতে কশাঘাত করিলাম, তাহাতেও তোর ঘৃণা হইল না। তুই কাপুরুষ দূর হ—আমার রাজ্য হইতে বাহিষ্কৃত হ।”

বুদ্ধ বলিল, “মহারাজ, কান্ত হউন, উৎকর্ষায় সময় রাগারাগিতে প্রয়োজন নাই। কোন দোষের জন্ত কাহাকে দণ্ড দিতে হইলে নিরপেক্ষ হইয়া শাস্তমুদ্রিতে বিচার করিলে শাসন যথারীতি প্রবাহিত হয় ও শাসনের ফল দর্শে। রোষপরায়ণ হইলে দণ্ডের অর্ধেক ফল দেখে।”

এই কথা শুনিতে শুনিতে লটকা আশ্চর্যবিস্মৃত হইয়া স্বীয় কশা লইয়া বুদ্ধর ভূতে উপন্যুপরি ছুই তিন বার আঘাত করিলে বুদ্ধর চক্ষু ফুটিয়া শোণিত নির্গত হইল। পার্শ্বে শিলা দাঁড়াইয়াছিল স্বীয় শেল লইয়া লটকার বক্ষস্থলে বেগে মারিল, লটকা শিলার শেলোস্তন দেখিয়া হটিয়া গিয়া স্বীয় শেল উঠাইল। লটকার পার্শ্বস্থ রাজপুরুষেরা কেহ কোন কথা বলিল না। শিলার শেল ব্যর্থ হইয়া ভূমে পড়িল বটে, কিন্তু লটকার শেল শিলার জন্তা বিদ্ধ করিয়া শিলাকে ভূমে পাড়িল। বুদ্ধ অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া আপন চক্ষু-ঘরে করতল দিয়া আশ্রয় করিয়া আছে। শিলা ভূমিসং হইয়া চৌকর করিয়া বলিল, “নন্দরাজকে স্মরণ করিয়া শিবচন্দ্র রাজার নাম লইয়া কেহ প্রকৃত শ্যেনটক থাকত এ দুরাচার লটকাকে বমালয়ে পাঠাও।”

পুঁড়া অগ্রসর হইয়া বলিল, “লটকা, তোর ভোগ হইয়াছে, তুই বঙ্গাধিপ খেচ্ছার জয়ন্তীসিংহাসন ছাড়িয়া দিস, তবে তোকে প্রাণ রাখি। বা তোকে শিবচন্দ্রের পথে পাঠাইব।” লটকা পুঁড়ার ক্রুর বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইল। চোপদারগণ প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দিল, কিন্তু কেহই তাহা না করিয়া ছিন্ন হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। লটকা তাহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া হইয়া বলিল, “কেহ কি আমার আদেশ গ্রাহ্য কর না? শুনিতেছিঁসু?” চোপদারগণের দৃষ্টি তাহার দিকে রহিল। পরে সুমরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, “সুমরা, পুঁড়া সুমের কটীহ ভোজালী লইয়া অগ্রসর হইলে পুঁড়া বলিল, “দেখিতেছি, তুমিও কি নগরমের শাসনে অসন্তুষ্ট নহ।”

সুমরা বলিল, “পুঁড়া তোর মাতৃচ্ছন্ন হইয়াছে। তোরা রাজার সহিত এরূপ ব্যবহার করিগেছিঁসু, আনিস না যে তোদের সবংশে ধ্বংস হইতে হইবেক।”

ভুক্ত বলিল, “আর বুঝা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, এই লণ্ড জয়ন্তী রাজ্য নিকণ্টক করি, বলিয়া ভোজালী লইয়া লটকাকে আক্রমণ করিল। লটকা স্বীয় শেল ও ফলক লইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতে ও বরফণে নিযুক্ত হইল। সুমরা প্রভৃতি বতকগুলি নিতান্ত লটকার আত্মীয় ও বশবর্তী চৌধুরী রাজার পক্ষ হইয়া সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভুক্তর দলে বক্রী সমস্ত চৌধুরী ও রাজপুরুষ ও প্রতিহার ও চোপদারগণ দাঁড়াইল। তুমুল সংগ্রাসের উপক্রম হইল। আত্মবিচ্ছেদে—বিশেষত বিজ্ঞোহ-বিলম্বে—যুদ্ধের কোন সীতাই থাকে না। যে বাহা মনে করে, তাহাই করিয়া থাকে। রাজার আরম্ভ না থাকিলে দেশ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়! দলানান হওয়ার কণ্ঠের জন্ত অস্ত্রচালন ক্রান্ত হইল। লটকা স্বীয় দল অত্যন্ত কীণবল দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল। “সুমরা, চল এখন আসের বেলা হইয়াছে। আমরা শিবিরে বাই। পরে বিজ্ঞোহদিগকে সমুচিত শাসন করিব।” রাজা ও তাহার কয়েকজন অচ্যুত চৌধুরী ও কণ্ঠচাৰী শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল। বুকু পুঁড়া প্রভৃতি বিপক্ষ চৌধুরীরা শলাকে ধরাধরি করিয়া চিরমন্দের উপত্যকা হইতে চলিয়া গেল।

গ্রামকুটের এক একদলে বিংশ পঁচিশ জনা একত্রিত হইয়া কয়েকটা শাল সয়ল ও চান্দী বৃক্ষের দ্বারা আশ্রয় লইল ও মগরালজ পশুপক্ষী বধাতীত বিস্তৃত হইলে, স্বীয় স্বীয় দলের অংশ লইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলনপূর্বক কেহ শূল নিষ্টিপ্ত (১) করিয়া কেহ পরিদহন করিয়া, কেহ কেবল অগ্নির উপর জিকাঠিকার খুলাইয়া কেহ বা লোম ও পক্ষ সহিত জলদগর-রাশির উপর নিক্ষেপ করিয়া পাক আরম্ভ করিল, কেহ বা

অধিগত বালুকাযথো মাৎসর্যম্ভায়ে কান্দব (১) করিয়া লইল। হানে হানে একাণ্ড প্রশস্ত দৃতিপূর্ণ পানি বহু গৌণ্য বংশপাত্রে ঢালিয়া পান করিতেছে।

এরিকে বুদ্ধরা উপকৃত কৃতকণ্ঠল বংশের মাচার উপর বনের মধ্যে একটি গৃহে প্রবেশ করিল। বুদ্ধের বয়স। বুদ্ধের সাহিত সকলে একত্র হইয়া অনেককণ পরামর্শ করিয়া বালুকাযথো মাৎসর্যম্ভায়ে ঢালিয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অন্যাল'কা ফু'খীনা ভূর্বহৌ সলিলোচ্ছ্রিতা ।

ব্যক্তকার্কা সনক্ৰতা নির্মেষব নতঃস্থলী ॥

চটগ্রামের দক্ষিণ লবণসমুদ্রের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের পূর্বে পার্শ্বে নাত অন্তরী-
পের নিকট একটি কঠাল (২) অঙ্গে অঙ্গে দণ্ডকপণে দক্ষিণাভিমুখে বাইতেছে।
বারিধিতর কঠাল হইতে প্রায় অর্ধকোশ পূর্বে আছে বলিয়া মহাসমুদ্রের হিজলো-
মাত্র কঠালে লাগিতেছে ও প্রতিহিংসে বর্ষাল যেম গভীরভাবে মন্দে মন্দে
ষাট নাড়িতেছে। কঠালটি সমলতুল গর্জন কাঠের নির্মিত, বৃহৎ ডেঙ্গার আকার।
একটি সমগ্র কৃতমভাস্তরগন্ধ গাছ স্ত্রুথার ভিতর কুন্দিয়া লুপোল ঠাম করিয়াছে।
কঠালের গুপ্তীত (৩) মোটা কাটীর মাহুরের উপর অনেক মগনেশীয় পুন্নি
বলিয়া আছে—কাবার বসনমসীত, হস্তে একটি ভালবৃত্ত, শিরোদেশ মুণ্ডিত—
অত্যন্ত বিমর্ষভাবে শূন্যদৃষ্টিতে হেঁটুগে বসিয়া আছে। কঠালের মধ্যার্ধে
একটি হোগলার দোচালা, সেইমাত্র রৌদ্র ও শিশিরের আধরণ। কঠালের
পশ্চাৎভাগে কঠালের ওঠের উপর বসিয়া কর্ণগ্রাহ (৪) কাঠের লম্বু বাঁটরা দিয়া
কর্ণিকের কর্ণের সহিত অঙ্গ পশ্চাৎভাগে টানিতেছে ও কঠালটি বেগে যেম
জলের উপর পিছলাইয় বাইতেছে। রাত্রি প্রথম প্রহর, এখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই;
মাষমান—ঈদের আমেজ আছে। প্রতিবর্ণাযাতে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অগ্নি-
ফুলিস ছুটিতেছে ও কঠালের পদবীরেখা (৫) সত্যোক্তি দেখাইতেছে। প্রতিবার
কর্ণ (৬) ফুলিলে কর্ণের পাতায় বিন্দু বিন্দু অগ্নিফুলিসের জ্বায় জ্যোতির্ময় পরমাণুসমষ্টি
দেখা বাইতেছে। অন্যাই প্রথম মলয়াল হইতে মন্দে মন্দে সমীরণ বহিতেছে।

(১) তুলস পক। (২) কৌণা ডোঙ্গ। (৩) নৌকার খোল।

(৪) বাজি। (৫) পদ্যর চিহ্ন। (৬) হাল, বাঁটরা।

আহা! শীতের পর দক্ষিণবায়ু কি সুখসেবা! স্পর্শধাত্রে তীব্রত্বের জ্বর প্রশম হয়। কর্ণধার লাকীরে দেশীর কান্নার গীত ধরিয়েছে। বদ্বিচ জাতিতে মগ ও ধর্ম্যে বৌদ্ধ; কিন্তু অনভিজ্ঞ ভারতবর্ষ সন্নিকটস্থ অসভ্যদেশ সকলের গ্রামকুটীর হিন্দুদিগের দেবদেবীর উপাসনা প্রয়োজনমত বাদ দেয় না; অনেকই ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এ হিন্দুধর্ম্মের এমনত অসীমমোহিনী শক্তি যে, ইহাদিগের সহিত কিছুকাল বসবাসে যখন ও মুসলমানমণ্ডলেও অনেক হিন্দুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। বিশেষ আকর্ষণসাহেব প্রসাদগুণে ও সহিষ্ণুতা বলে হিন্দু-মুসলমানের ভেদের ভীত ছিল না। ধনী হিন্দুতে তাজিগাদি মহম্মদী উৎসব করিত ও মুসলমানের হোলীতে আদ্যোদিত করিত। কর্ণধার কান্নার গান ধরিল। এদিকে বারিবিষ অনির্বচনীয় দুর্ভেদ্য নভীর নিবানধ্বনি দশদিক পুরিয়াছে, বোধ হয় যেন প্রায়কালীন ঝড় বহিতেছে; কিন্তু সাগরের বিস্তার এমনত দূর ও শ্রদ্ধ (১) ও শান্ত ও অশ্রুত (২) যে ধর্ম্মগুণ ও বারিবিষ বিস্তার প্রতিমার্কে (৩) একই আকার ধরিয়েছে। অহা কি মনোরম! অসীম ঋণোল যেন ভূগোলে মিলিয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে কিছুই তরঙ্গ নাই, অতি শান্ত ভাবে বঙ্গদেশে দীর্ঘবাস ফেলিতেছেন ও তাহার বিশাল বঙ্গদেশ যেন উৎসর্গিত হইতেছে। প্রলোঠন কি সুখজনক! সুমহান লবন্য কি অপরিমিত। চক্রেবাল বাহার সীমা, অন্তর্দর্শনে মরনযুগল যেন পরাজিত হইয়াছে। একে অন্ধকার, তাহাতে আবার উদ্ভিষ্টিও নাই, এই খানেই ভগসাদেবী দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; চক্রেবালের প্রান্তরে বৃষ্টির শেষে, রত্নকরের কূলে কেবল মণিনন্দ প্রবাহিত হইতেছে। সেই খানেই জল সজীব, সেই বোধ হয় সপ্রাণ বঙ্গদেশে। জলের কি আবার প্রাণ আছে? কেনই বা নাই। চক্রেবালের মধ্যদেশে তলের উরোভাগ, তীর জলের অন্তঃকার ও প্রতীকনিকর, কূলের তরঙ্গ ও লহরী জলে চক্ষুচর। সমুদ্র! তুমি সহস্রাক সহস্র-পাত, সহস্রভুজ! সাগর! তুমি যে প্রাণী তোমকে শত সহস্র বসিলেও বলা যায়। তুমি শতশারদ। কেননা তোমার অন্ত নাই ও আদি নাই। যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র সত্য হয়, একসহস্র সাত ১৩ বিলু বাপে একবিলু জল জন্মে; বায়ুসংশ্লিষ্ট! কত অনন্ত বিলুবাংশের তোমার এ মহান শরীর! সমুদ্র তুমি হৃষ্টমেঘ! তোমার এসরেণুয় সংখ্যা যেমত অগণনীয় তোমার খোল্যও তেমন অপরিমিত। মন তোমার বিস্তারের, দৈর্ঘ্যকে এককালে আচ্ছিন্ন করিতে অক্ষম। পরোনিধি! তোমারই সম্বন্ধে অপারগ শব্দ বোধ্য হয়। লবণার্ণবের বিস্তার যেমত অশ্রুত

(১) ভয়। (২) অসন্তপ্ত।

(৩) জলে ঋণোলের প্রতিবিম্ব।

তাহার আকাশও তেমনি নিঃশব্দ । নিঃশব্দক সাগরাকাশে শব্দমধ্যে কর্ণধারের গান ও এক একটি মৌরময়নার টিটি শ্রবণ । নিবানপত্তীর সাগরকল্লোলে দিম্বুধ পূর্ণ হওয়ার বেন সেইটি সাগরের বতাবলিন্দ অবস্থা, কেবল মধ্যে মধ্যে মৌরময়নার শব্দ । সামুদ্রিকগণকে চতুর্দিক পূর্ণ, বাহ্যিক ও মিত্য লবীনাবহ (১) ও প্রিয়লব্ধ । বত আভ্রাণ করা বার, ততই ক্ষুণ্ণ হৃদিকে পায় সাগরের বিস্তার আজি (২) দূরের চক্রে-বালের প্রান্তরে সিম্র হইয়া পৃথীর কোণাভাবস্থ সমর্থন করিতেছে । ক্রমে বরষা-সমুখিত (৩) হইল । ক্রমে তুলসি পথগুলো বহিরা উত্তরাভিমুখে চলিল, ক্রমে দিপটক এত ব্যাপে পূর্ণ হইল যে, নক্ষত্রের অদৃশ্য হইল, দূরত্বই যৌথ হইল । ক্রমে কঠালের এক ওঠ হইতে অপসারিতের লোক দেখা হইল ।

কঠালে কর্ণধার লইয়া ছয়জন দণ্ডধারক । তাহার মধ্যে চারিজনকে দণ্ডকোণ করিতেছে ও একজন একটা মৃৎচুম্বীর উপর লঘু কাঠের অগ্নিতে পাক করিতেছে । একটা সরাবাকার মৃৎপাত্রের একপ্রাণি মূলকথণ্ড ও অপর মৃৎপাত্রের কতকগুলি লজা ও হরিদ্রা ও পলাতু পেঁবা আছে, সিকটক কাঠজোবিতের দ্বারীকৃত লটীয়া মন্ত দেখিতে বেন কাচের তদ্রূপগুলি পড়িয়া আছে । ফলে লটীয়া মন্ত এমন বহু যে, দুই হইতে কাচের লটী মন্ত বোধ হয় । তদ্রূপমূলমান মহলে অভ্যস্ত ঘির ও শুকাবহার অপর শুকনুতাপেক্ষা বহুমূল্য । পুত্ৰী কতকজন নিঃশব্দ শূন্যহৃদে থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশব্দ ছাড়িয়া বলিল, “নাথ অভ্যঙ্গীপ কতদূর ?”

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়, টেকসাক ছাড়াইলাম বামে রহিল । এখন বকরাভার অধিকারে আসিয়াছি । বামে বকরাজ্য ।”

পুত্ৰী বলিল, “অদ্য রাত্রিতে কি মন্তনহে থাকিবে, না লৌহবার পঞ্চম আমাকে লইয়া বাইবে ? লৌহবারে না একটি প্রকাণ্ড কার্য্যক আছে, সেখানে অনেক পুত্ৰী থাকে ও অভিধিলেবাও হইয়া থাকে ?”

কর্ণধার বলিল, “টেকসাকের দক্ষিণ দিগা মজদোতে লামাইয়া দিলে আপনি শুকপথে বাইতে পারিবেন । মজদোতে হাতিও পাওয়া যায়, আপনার গমন সুন্দর হইবেক ; মজুবা লোহালাদা পঞ্চম এই কৌদার বাইতে কল্য সমস্ত দিন লাগিবেক । আপনার যেমত অভিধি ।”

পুত্ৰী বলিল, “আমাকে তবে মন্তনহের পথে লামাইয়া দাও । সেই মন্তন (৪) ভীরে একটা বড় কার্য্যক আছে না ?”

(১) মিত্য নৃত্য করে । (২) সমতল ।

(৩) কুরাসা । (৪) দলীসমুদ্র সমুদ্র ।

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়, খাড়ীর তীরের সে কারোকেই আজ যাসাবধি ডাকিয়া
দিয়াছে। সেটি সেখানকার বড় কারোকে ছিল। এখন তাহার উত্তরে আর একপোরা
অন্তরে টালার উপর ছোট কারোকে অভিধিসেবা হয়। আপনি কি এ পথে কখন
আসেন নাই? ইহার নাম যুমার টালা।”

পূজী বলিল, “আমি নৌদানেই বাতায়ত করিয়া থাকি। এ অকলে আর আসি
না, এখানকার সমাচর বিশেষ অবগত নহি। গোহবার কখন পার হই নাই, তাহার
পূর্বপাহাড় পর্যন্তই আমার গমনাগমন ছিল।”

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়, মহামুর্গ কোরঙ্গ দেখিয়াছেন? শুনিতে পাই আমা-
দিগের রাজা নাকি তাহার পাশে এই নৃতন কোরঙ্গ প্রান্ততে অনেক ব্যয় করিয়াছেন ও
তথায় তিন্মুণী ও ত্রীষোগীদিগের থাকিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সিংহল
হইতে যে একজন ত্রীপূজী আসিয়াছেন, তাহারই অনুসরণে ফ্রান্স নামে এই কারোকে
নির্দ্রিত হইয়াছে।”

পূজী বলিল, “হঁ।! শুধুমাত্র উত্তরমখুরার মহামুর্গ কোরঙ্গের কথা বলিতেছ? কে
সেখানে ত বহুকালাবধি তিন্মুণী ও ত্রীষোগীদিগের থাকিবার স্থান ছিল?”

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়, তাহা ছিল বটে, কিন্তু অসম্ভবতঃ পলায়নের পর, মহারাজ
তাঁহার ও অন্নাপোয়ামের অনুসন্ধানে অনেক ফৌজ পাঠান ও পরে হুকুম প্রদানের
কোন কোরঙ্গে তাঁহার আশ্রয় লইয়াছেন শুনিয়া হুকুমপ্রদানের উত্তরমখুরাপ্রান্ত
সমস্ত কারোকে ও কোরঙ্গ আলাইরা দিবার অনুমতি দেন। তাহাতে সমস্ত কোরঙ্গ
আলাল হয়। কেবল মহামুর্গ কোরঙ্গে অগ্নি দিলে তাহার অগ্নি লাগিল না বলিয়া
সেইটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে এই ত্রীপূজীর পরামর্শে তাহারই নিকট বহুব্যয়ে
এ নৃতন কোরঙ্গ প্রান্তত করিয়াছেন।”

যে দণ্ডধারকটি পাক করিতেছিল, বলিল, “মহাশয়, মহামুর্গ মঠে নাকি ফ্রান্স
একটি দত্ত আছে ও সেই অস্ত্রই তাহাতে অগ্নি দিলে ও তাহা জলে নাই। আমি
ভানিয়াছি যে, কোরঙ্গে রাজার স্রাতা অন্নাপোয়াম ও তাহার তরী অসম্ভবতঃ ছিলেন,
সে কোরঙ্গে অগ্নি, স্রাপানে তাহার হুইজনে পুড়িয়া মরেন, কিন্তু সে কোরঙ্গের কোন
পূজীর সঙ্গে অগ্নি স্পর্শ করে নাই ও যে সোণার হুক ছিল, তাহার রেশমের দণাপ্রান্ত
জলে নাই। সমস্ত কোরঙ্গ তদ্ব্যবশেষ হইল, কিন্তু অগ্নি নির্বাণ হইলে সকলে
দেখিল যে পূজীরা ধ্যানে বাসিয়া আছেন ও সমুখে সোণারহুক রেশমের দণা বুজি-
হুতছে। মহাশয়, সেই কোরঙ্গে যে ফ্রান্স দাঁত ছিল, সেই দাঁত মহামুর্গ কোরঙ্গে
আনা হয়।”

পূজী বলিল, “আমি অনেক দিন এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, এখানকার কোন
সমাচার আমি না। ভানিয়াছি মহামুর্গ মঠ অত্যন্ত পুণ্যভূমির মন্দির। উত্তরমখুরা

মহাভাজ। সগর সংস্থাপন করিলেন। তাঁহারই স্থাপিত উত্তরমধুপুর আর উত্তরমধুপুর নগরধর।”

কর্ণধার বলিল, “মহাশয় উত্তরমধুপুরের সিংহাসনে বসিয়া ধন্য রাজা তাঁহার কনিষ্ঠ উষধগরের প্রতি সন্মোহ করিয়া তাৎক্ষণিক পীড়ন করার কেবল রাজার আশ্রয় লইয়াছিল ও পরে তাহার সত্যবোধ উত্তরমধুপুরে প্রতিফলিত হয় ও সেই পর্যন্ত রাজার ভ্রাতা পলায়ন করিলেন, উত্তরমধুপুরে আশ্রয় লইত।”

পুন্ডী বলিল, “উত্তরমধুপুরের রাজা তাহার কনিষ্ঠের প্রতি হিংসা করিয়া তাহার জীবন মন্ঠের চেষ্টা করার উপসংহার ক সত্যজ্ঞান আশ্রয় লইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সম্ভাবনায় নগরীতে পলায়ন করে। পরে বৃদ্ধপুত্র আসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ সগরকে মুক্ত পরাজিত করিয়া বৃদ্ধপুত্র কিছুকাল রাজ্য করিবার পর উত্তরমধুপুর স্থাপন করে।”

কর্ণধার বলিল, “বৃদ্ধ গৌতমের সময়ে অশ্বাবতী ও উত্তরমধুপুর বৃদ্ধ গৌতমের আদেশে নটেরা নির্মাণ করিয়াছিল।”

পুন্ডী বলিল, “হঁ, সম্ভাবতীনগরী বৃদ্ধ গৌতমের সময়ের বটে, কিন্তু উত্তরমধুপুর মন্ঠের সত্যজ্ঞান উপসংহার কেবল রঞ্জিত করেন, কিন্তু সগর রাজার স্থাপিত মহাবলি মন্ঠের স্বর্ণক্ষেত্র বহুকালাবধি ছিল।” এমনত সময় একজন ক্ষুদ্র পক্ষী নক্ষত্রবেশে বেশ সন্মুখের জল স্পর্শ করিয়া কণ্ঠালের সমুখ দিগা চলিয়া গেল ও তাহার মধ্যে একটি কণ্ঠালের অগ্রোত্তে বেশে আঘাত পাওয়া জল পড়িল। অগ্রহ নগ্নধারক হেঁট হইয়া জল হইতে তাহাকে ভুলিল। ক্ষুদ্র পক্ষী বীর বেগাঘাতে অচেতন হইয়াছে। নগ্নধারক পক্ষীটি লইয়া নিদীক্ষণ করিয়া দেখিয়া অকস্মাতে স্থির করিতে না পারিয়া চুপস্ব আলোকে পক্ষীটি দেখিয়া দেখিয়াই বলিল, “এ যে পাংচটা, রাত্রিতে পাংচটা উড়িলে বাধ হইয়া থাকে।”

কর্ণধার বলিল, “পাংচটা! দেখি” বলিয়া অগ্রসর হইয়া পক্ষীটি হস্তে লইয়া বলিল, “না এ পাংচটা নহে, এ একজাতি তেহাণী, ইহার রাত্রিকালে জলের জ্যোতির্ভর পোকা খাইতে আসে। ইহার ঠোঁট পাংচোর হইতে সুরু আর পাংচটা হইতে আরও সরল।”

পুন্ডী বলিল, “আর কতদূর আছে—ঐ আলোক দেখা যায় না?”

কর্ণধার বলিল, মহাশয় আমরা আসিয়া পৌছিগাছি। ঐ, বাটে কৈবর্তের ভিজি দেখা যায়।”

কণ্ঠাল ক্রমে তীরের নিকট হইলে পুন্ডী ভিজির লোককে বলিল, “কেমন হে কি মাছ পাইলে?”

ভিজির কৈবর্ত বলিল, “আমরা মাছ ধরি না। আমরা মৌরশাটা ভুলিতেছি।”

পুন্ডী বলিল, “রাত্রিতে কেন? দিনে ডোলাও সহজ হয়।”

কৈবর্ত বলিল, “কেও, পূজী যে! মহাশয় অবধান করি। দিনে মীরপাটী ভাল দেখা যায় না। তাহার উপর যে সমস্ত স্ক্রু স্ক্রু কীট লিপ্ত থাকে, সেইগুলি রাত্রিতে জলে; আর জলের উপর হইতে সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া আল ফেলিলেই পাটী-জালে জড়াইয়া উঠিয়া আসে।”

পূজী বলিল, “এখানকার কোন কোয়াজে অভিষেকের পাশ্চাট্য আছে?”

কৈবর্ত বলিল, “মহামন্ত্র কোয়াজে সর্কোপেক্ষা অভিধন বহু হয় ও তাহারই জন্ত ভাষ্য অনেক শোক সমাগম হয়। আমরা উক্ত কোয়াজের ব্যবহারের জন্ত মীরপাটী বোগাইয়া উঠিতে পারি না। নিরামিষভোজী পূজী ও অভিধন জন্ত মীরপাটীভূম্য বলকারক সুখাদ্য ও গুণকর অল্প কোন খাদ্য নাই। অন্য সেই কোয়াজে সাংকালে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে, তাহার মধ্যে তুমিতে পাইলাম, জনৈক রাজপুরুষ অব্যবহারে সোণারগ্রাম অকল হইতে আসিয়াছে। কেবল তাহার অল্প অন্য আবাদিগের উপর মৎস্যাদি ধরিবার আদেশ হইয়াছে। আমি স্বরায় বাঁধি, কিন্তু অন্য প্রায় তিনমাস পরে জল ফেলিলাম এখনও একটা মৎস্য তুমিতে পারিলাম না। রাজপুরুষের জন্ত বিশেষ করিয়া লটিয়া মৎস্য প্রয়োজন; সে দেশের লোক লটীরা চক্ষেও দেখে নাই। কোয়াজের দারপা বলিলেন যে, বড় বড় লটীরা আনিতে চাহ। তাহা আমি রাত্রিকালে কি প্রকারে পাই?”

পূজী বলিল, “তুমি কি রাজপুরুষকে দেখিয়াছ? সে কি প্রকার লোক, কি আভি?”

কৈবর্ত বলিল, “মহাশয় সে মগ নহে, অনুমানে বোধ হয় বাদ্যালার হিন্দু। সে ব্যক্তি এক বেগে আসিয়াছে যে, কোয়াজে দাঁড়াইবামাত্র তাহার অধ তাহার নীচে যে পড়িল, অমনি প্রাণত্যাগ করিল। ফেনে অধের সর্কোপ শুভ্রীকৃত। শুমিলাম অখটি চট-প্রাণের কোল মহাজনের,—রাজপুরুষকে দ্রুতগমন জন্ত ব্যবহার করিতে অন্য দিয়াছিল। এই রাজপুরুষ চলিগাটি খোড়া বলল করিয়া আসিয়াছে ও তাহার মধ্যে কেবল দুইটি খোড়া জীবিত আছে। অত দ্রুত গমনে, বিশেষতঃ দূর ধাবমান হইলে লোহের অধ বাঁধে না।”

এই কথা হইতে হইতে কঠাল ও ডোঙ্গা উভয়েই তীরে আসিয়া পৌঁছিল। কঠালের কর্ণধারের অনুমতিতে জনৈক দণ্ডধারক ব্যক্ত হইয়া জলে লাকাইয়া দাঁড়াইয়া কঠালের অগ্রোষ্ঠহরজ্জু ধরিয়া কঠালের তীরগমন বেগ সম্বরণ করিল। কঠালের তল তীরস্থ স্থল বালুচরে ঠেকিল, করকর শব্দে বর্ষণ হইলে পূজী কঠালের শুভীতে দাঁড়াইল। এদিকে ডোঙ্গার কৈবর্ত তীরের নিকট আসিয়া লগী দিয়া ডোঙ্গা ছিন্ন করিয়া, ডোঙ্গা হইতে চারি পাঁচ বোঝা মীরপাটী ক্রমে মাথার করিয়া তীরের শুকনামে রাখিল। পরে ডোঙ্গা টানিয়া ডাঙ্গার জুলিয়া দূরের কীলকে রাখিয়া বোঝা লইয়া চলিয়া

গেল। পূজী কবেকাল ছিন্ন হইয়া থাকিয়া কর্ণালের কর্ণধারকে বলিল, “মহানুনি কোরাক এখান হইতে কতদূর? সেখা দাইবার পথে আর কোন কোরাক আছে কি?”

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়, মহানুনি কোরাক এখান হইতে আর একপোয়া পথ। পথে ছোট ছোট আর দুইটি কোরাক আছে, তথায় অতিবিসংকারও হইয়া থাকে।”

পূজী অতি কষ্টে কর্ণাল হইতে নতধারকের সহায়তার অবতীর্ণ হইয়া বীর যুগ্ম উপর ভর দিয়া তার হইতে ক্রমে কাছারে উঠিতে লাগিল। কিন্তু চড়িতে উঠিতে অনেক দিন হইল ও অত্যন্ত কষ্ট করিতে হইল। পরে সমতলে পৌঁছিয়া একবার এদিক ওদিক দেখিল, পথ ধরিয়া উত্তরাভিমুখ হইল। কণেকে পথের বামে একটি নিচিহ্ন কোরাক দেখিয়া তাহার দিকটাই হইয়া লভকমরনে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কোন শব্দাদি না পাওয়ার সঙ্গে তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরেই কাঠনির্মিত লোপাশচর। সোপানের পর কাঠের তন্তের উপর কাঠফলকে নির্মিত বিহার, তাহার দ্বারখোলা থাকায় ভিতরের পিতলের শৃংখলে লম্বমান অন্নজ্যোতি দীপ দেখিতে পাইল ও দীপালোকে তত্ত্ব্য দুইজন পূজীকে বলিয়া পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া সাহসে গৃহে প্রবেশ করিয়া “অতিথি; অত্রাধিষ্ঠানের আশা করি” বলিলে আসীন বৃদ্ধ পূজীটি উঠিয়া ব্যস্তে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিয়া বলিল “আমাদিগের জনশ্রুত কোরাকে মহাশয়ের তুল্য পৃথকীণ লোকের ভক্তাপননে আমরা চরিতার্থ হইলাম। আমাদিগের আর অন্ন, এ গ্রাম দীনকৈবর্তে পূর্ণ; জ্ঞাত্যদির অভাব, আমাদিগের ভক্তি ও ভক্ত্যবাস পূরণ করিতে আশা করি। মহাশয়ের বাক্যমঞ্চল বলুন। আপনার নাম কি?”

নবানুত পূজী আমাদিগের অনুপন্নাম, একটু চিন্তিয়া বলিল “আমার নাম লাবা। মহাশয়ের নাম কি? আর এই বুঝা থাকুকেনই বা নাম কি?”

বৃদ্ধ পূজী বলিল, “আমি এই কোরাকের অর্হত, আমার নাম কম্পাই, এই বুঝা আমার জটনক শিষ্য। ইটি এক্ষণে দেখে বলিয়া পরিচিত। মহাশয় কোথা হইতে আসি-তেছেন? পথে কোন কষ্ট হয় নাই?”

অনুপন্নাম বলিল, “আমি ধর্মপ্রচারে নিবৃত্ত হইয়া বাজালায় পরিভ্রম করিতে গিয়াছিলাম। বুদ্ধগয়া দর্শন করিয়াছি; পথে এক পদে নিপতিত হওয়ার বিশেষ ব্যথা পাইয়া কষ্ট পাইতোছি, চলৎশক্তির হানি হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত দিবস অনাহার।”

কম্পাই বলিল, ‘সমস্ত দিন অনাহার থাকিলে রাত্রিতে আহার করিতে পারে, এমন আত্মশয় গৌতমের ছিল। দেখে, দেখে আমাদিগের অতিবিসংকারোপযোগী কি আছে?’

ঐক্যব্রত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল, কিছুক্ষণ পর এক তুষী অন্ন আনিয়া বলিল, “মহাশয় পান্য।” একটি দরিদ্রাই নারিকেলের কলঙলু করিয়া স্বচ্ছ ঈষৎ

হস্তবর্ণের নিষ্কণ্ণ বরকী কতকগুলি রাখিল ও অপর একটি দুই তুয়া করিয়া পানীর জলও আনিল ।

অনুপরাম উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরের কাঠফলকহ একটা হিস্ণ লক্ষ্য করিয়া তুয়ার জলে হস্তপদাদি ধৌত করিল ও স্নিগ্ধ হইল কম্পাই পুস্তীর নিকট আসিয়া বসিল ।

দেবব্রত বলিল “মহাশয়, এই ভক্ষ্য ও এই পানীয়, অনুগ্রহে প্রতিগ্রহণ ও জীবনরক্ষা করুন ।”

অনুপরাম কমণ্ডলুর বরকী খাইয়া বলিল “আহা! অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে । এ নিশ্চয় কি আপনাদের কোরাস্ত্রে প্রস্তুত করিয়াছেন, না এ অপর কোথাও হইতে পাইয়া থাকেন ?”

কম্পাই বলিল, “এ আমরাই প্রস্তুত করিয়া থাকি । কোরাস্ত্রের ভক্ত প্রস্তুত্য কৈব-
র্ত্তের নিকট হইতে মাসে মাসে এক বোকা করিয়া পাইয়া থাকি । কোরাস্ত্র প্রতিষ্ঠানা-
বধি এটি আমাদিগের কোরাস্ত্ররক্ষণের প্রাণ্য ; মাসে মাসে একবোকা মীরপণ্ডী,
দশমাণ চাউল ও কিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়া থাকি, তাহাতেই আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহ
হয় । আমরা অন্নপ্রাণী জীব ।”

অনুপরাম বলিল, “এখানে কি সর্বদা অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয় ?”

কম্পাই বলিল, “সংভদ্রহ লৌহবার বাইবার প্রধাম পথ । বাহারা পদব্রজে
যাত্রায়ত করে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ না-কেহ প্রেরয় হুই প্রেরয়ের ভক্ত এখানে
থিহাস করিয়া যায় ।” অন্য দুই দিস হইতে কিছু অতিথির আগমন অধিক । অন্য
অনেককাল হইল হুইজন কিরিনী সনসীপ হইতে আসিয়াছিল । তাহারা বকপুয়ে
বাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধাম বোধ হইল ।”

পুস্তীবেশধারী সনসীপের নাম ভসিরা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, “তাহারা কতজন
এখানে ছাড়িয়া গিয়াছে ? আমার তাহাদিগের সহিত প্রয়োজন আছে, কোথা বাইল
তাহাদিগকে পাইব ?”

কম্পাই বলিল, “তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না । তাহারা বকপুয়ে
বাইবার ভক্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে । এমন কি পথের লানপ্রকার বিভাবিকা দেখান্তেও
তাহারা এ কোরাস্ত্রের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বিরত হইল না । তাহাদিগের সূখে
ভসিরা, দিম্বীর মোগল শেভিল দখল করিয়াছে ও আমাদিগের রাজার জাত
গেডিলে মারা পড়িয়াছে । আহা! তাহার ভুল্য হতভাগ্য লোক আর কাহাকেও
দেখিতে পাই না । সে ব্যক্তি বীর অবস্থায় অসম্মত হইয়া অবশেষে বিশেষে প্রাণ
হারাছিল । বিবাত তাহার উপর বাম । কোথা রাজজাত, রাজার ভুল্যই সূখে ও
মানে থাকিত, এমন কি হয় ত রাজার অপেকাও দেশের লোকের নিকট প্রিয় হইতে

পারিত। আমাণিপের রাজা তখন বিষয়াদি কিছুই দেখেন না। অনুপরাম থাকিলে সমস্ত কর্ণের ভায় তাঁহারই উপর পড়িত, কিন্তু অবোধ অকালে বিজ্ঞোহী হইল। এখনও ক্রমে সকলেই তাহার অস্ত্র অনুতাপ করে।”

দেবব্রত বলিল, “এখন অনেক আমীর ওমরাও বর্তমান রাজার অত্যাচারে চিড়িত হইয়াছে। সেদিন আমাণিপের লোহাদারার প্রধান পুত্রী, রাজার উষ্মেণে ব্যস্ত হইয়া স্বীয় কোরাস ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সিংহলের স্ত্রীযোগীর আগমনাবধি স্ত্রীযোগীদিগের প্রতিপত্তি হইয়াছে, এখন আর পুত্রের ভায় পুত্রীর মাথা নাই। স্নানিতে পাই রাজা স্ত্রীযোগী লইয়াই থাকেন। এ রাজার নিকট বিদেশী লোকের মান আছে, স্বদেশীয় মগপুত্রীকে রাজা ঘৃণা করেন।”

কম্পাই বলিল, “লাবা ভায়ার কোন্ গ্রামে বাস?”

লাবা নামধেয় অনুপরাম বলিল, “আমার আদিম বাস রুঙ্গনগরীতে, পরে তথা হইতে রাজধানী বেকোম নগরীতে পরিবর্তিত হইলে আমরাও বঙ্গপুত্র বাস করি। আমি আজ স্বল্পদিন যাবৎ রাজধানী ছাড়িয়া পশ্চিম রাজ্য গিয়াছিলাম। আমার যাত্রাকালে রাজার ভ্রাতা অনুপরামের সহিত রাজার বিপরীত ব্যবহার ছিল। রাজার পীড়নে অনুপরাম বেকোম ত্যাগ করিয়া পুরাতন রাজধানী রুঙ্গনগরীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তথায় তাহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই সমাচার মাত্র শুনিয়া আমি বঙ্গপুর হইতে চলিয়া যাই।”

কম্পাই বলিল, “অনুপরাম তাহার ভ্রাতা অল্পকালের অর্থ-সহায়তায় কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে রাজশাসন অবহেলা করিয়া বঙ্গপুরের রাজকোষ আক্রমণ করে। পরে বঙ্গপুর হইতে স হ সেলা বইয়া তাহাকে সে নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাজশাসন পুনর্ব্বার সংস্থাপন করে। অনুপরাম তাহার ভ্রাতাকে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করে। ইতোমধ্যে মহারাজার আদেশানুসারে তাহার অনুসন্ধান চতুর্দিকে লোক পাঠান হয়। অনুপরামের যুগের মূল্য নির্দেশ হইল। অনেকই অর্থলোভে অনুপরামকে নষ্ট করিতে বস্তুবান হইল। অনুপরাম প্রাণভয়ে মুমূর্ষুতে কিছুদিন থাকিয়া পরে কুলাদান নদীতে ধীরবেশে কতদিন অতিবাহিত করিল। সেখানেও অল্পস্থত হইল। অংশেবে ছত্রবেশে প্রাণরক্ষা সংশয় হওয়ায় উত্তরমখাপুরের কোরাসে ধর্ম্ম আশ্রয় লইল। তথাকার প্রধান প্রধান পুত্রী রাজার উপর অসন্তুষ্ট থাকায় অনুপরামকে আশ্রয় দিল ও বধেষ্ঠ সাহস দিল। রাজা পুত্রীকে আদেশিলেও পুত্রী আতিথ্য রীতির ছলে রাজাভ্রাতা অবমাননা করিলেন, ও বলিলেন যে, অনুপরাম তিসুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অনুপরাম সন্ন্যাস আশ্রয় করিল। বেঙ্গকান প্রভৃতি অষ্ট ঐবর্ষ্য ধারণ করিল। রাজা সিংহলদেশীয় স্ত্রীপুত্রীকে এবিধের কণ্ঠব্যাকণ্ঠ্য বিজ্ঞান

করায়, তিনি ঐশ্বৰ্য্যের নাম গণনা লইয়া পোলবোগ উপস্থিত করিয়া অবশেষে ব্যবস্থা নিহলন যে, প্রকৃত অষ্ট ঐশ্বৰ্য্য না থাকিলে ভিক্ষু অবধ্য হইয়া, অতএব কোয়াজ হইতে বলপূৰ্ব্বক তাহাকে ধরিয়া আনিবার আবশ্যক নাই, যে কোয়াজে আজ্ঞাপন লইয়াছে তাহার অগ্নি নিয়োজন কর । রাজপুরুষেরা এই অনুমতি পাইবামাত্র উত্তরমথুরার সমস্ত কোয়াজে অগ্নি দ্যায় । মহামুনি কোয়াজে অনুপরাম ও অরুণতী নন্দ হইয়া নিড়াচ্ছে, এই কথা দেশে প্রচার হইলে সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিল ও অদ্যাবধি অনেকে সেই অত্যাচারের জন্য রাজার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত আছে । পূজী-মাজেই ত এককালে খড়্গহস্ত ; তবে অন্ত্যধারণ তাহাদিগের ধর্ম্ম নহে বলিয়া কিছুই প্রতিকার করে নাই ।”

দেবব্রত বলিল, “গুরুজি, সিংহলের মতে অষ্ট ঐশ্বৰ্য্য কি কি ? আমাদের মতে কাষায় উত্তরীয় পরিবেষ্টিত, কাষায় তৃতীয়বস্ত্র, দাম্ভ, কমণ্ডলু, ক্ষুরধ্বজ, মৃৎসম্ভাব ও হুটিকা এই অষ্ট ঐশ্বৰ্য্য পূজীমাজেরই অবশ্য বাক্য । সিংহলমতে এ কি অষ্ট ঐশ্বৰ্য্য নহে ?

কম্পাই বলিল, “পিঙ্গলশাস্ত্রে খেঙ্গকাম বা অঙ্গাধান অর্থাৎ কাষায় পরিধেয় বহির্বাঁস প্রথম ঐশ্বৰ্য্য, খেঙ্গবহন বা পুঙ্গবহন অর্থাৎ অন্তর্বাঁস দ্বিতীয় ঐশ্বৰ্য্য, থাকোট অর্থাৎ কাষায় উত্তরীয় তৃতীয় ঐশ্বৰ্য্য, খবন্ বা দাম্ভ অর্থাৎ পটের কটীস্থ অন্তর্বাঁসধারণক ডোর চতুর্থ ঐশ্বৰ্য্য, ধারোইঙ্গ বা কমণ্ডলু পঞ্চম ঐশ্বৰ্য্য, খেঙ্গডন অর্থাৎ ক্ষুর বষ্ট ঐশ্বৰ্য্য, খেঙ্গবিত অর্থাৎ অস্ত্রের মৃৎপাত্র সপ্তম ঐশ্বৰ্য্য ও হুটিকা কষ্টেই অর্থাৎ লিখিবার লোহময় লেখনী অষ্টম ঐশ্বৰ্য্য ”

লাবা বলিল, মহাশয় আমি শুনিয়াছি অনুপরাম জীবিত আছে, সে বঙ্গাধিপ একদশ এদেশে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পৈতৃক আসন পাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পূজীদিগের সহায়তা পাইতে পারে কি না ? আপনার ইহাতে কি প্রকার অনুমান ?”

কম্পাই বলিল, “আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না । আমরা জানিতাম, অনুপরাম কোয়াজদ্বারা মরিয়াছে । আবার অন্য ফিরিঙ্গির মুখে শুনিলাম যে, সে জীবিত ছিল, সম্প্রতি গেড়িজে মোগলসৈন্য হস্তে সমুখযুদ্ধে নিপতিত হইয়াছে । আবার আপনি বলিতেছেন যে, সে জীবিত আছে । বাহাউক, আপাততঃ বর্তমান রাজ্যে যেরূপ ধর্ম্মদেবী, তাহাতে অনুমান করি, অনুপরাম নিতান্ত অশ্রয় হইবেক না । মহাশয়, অনুপরামের সন্ধান কোথা পাইলেন ? আমার বিশেষ অবগত হইতে কৌতুক জন্মিতেছে । আমার উৎসাহ উদ্বেক হইল । তাহার ভগ্নী অরুণতী কোথায় ? তিনি আমার মন্ত্রশিষ্য । অরুণতীর পিতার রাজ্যে আমি বঙ্গপুত্রের বাস করিতাম । পুরাতন প্রথা অনুসারে অরুণতীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্তমান রাজার বিবাহ দিবেন ”

বরিয়াছিলেন। যদিচ প্রথমে এ ধর্মসম্বন্ধে প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইদানীন্তন লোকের চক্ষে এই মন্ত্রণাটি একান্ত অসঙ্গত বোধ হইল। সচিব ও মন্ত্রিবর্গে এবিষয়ের মন্তব্যে রাজার কর্ণে উঠিল। রাজা কতকটা চিন্তিত হইলেন। কথাপাত্রের বয়ো-যিকো, সোভারহেতু মিথুনসৌন্দর্যের ব্যাধিত শঙ্কায়, অরুন্ধতীর শৈশবাবস্থাতেই তাহার জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাহ কল্পনা করিলেন। বিবাহের আয়োজনও হইল। অভ্যাদিনীর লগাট মন্দ; রাজার স্রীবিয়োগ হইল; মহিষী অরুন্ধতীকে ছয়মাসের শিশু রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। রাজা মনস্তাপ পাইলেন। কল্পিত বিবাহ স্থগিত হইল; উৎসাহভঙ্গ হইল। শিশুর পালনের চিন্তা বলবতী হইল। চতুর্ষ-বর্ষাবধি তাঁহার ভগিনী স্বীয়া ভ্রাতৃকণ্ঠকে স্তম্ভপানে লালন করেন, পরে আমি অরুন্ধতীর লালনপালনের ভার রাজ্যদেশে গ্রহণ করিলাম। দুই বৎসর যাবৎ যক্ষপুরে থাকি, পরে রাজ্যজায় ক্রমপে তের পশ্চিমে বাস করিতে হইল। রাজার প্রুর্ষ মানস পরিবর্তিত হইল না; তবে সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে অরুন্ধতীকে দূরদেশে রাখিলেন; তাহা হইলেই তিনি রাজার সহিত সম্পর্ক ভুলিয়া যাইবেন। ক্রমে অরুন্ধতী আমার কোষাগারে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। এদিকে কালে রাজার মনও পরি-বর্ত হইল। অরুন্ধতীর নবমবর্ষের সময় তিনি আমাকে ডাকাইয়া অরুন্ধতীকে রাজ-মন্দিরে রাখিয়া যাইতে বলিলেন। অরুন্ধতী স্বীয় পিতা ও ভ্রাতৃগণ মধ্যে পরমমুখে সকলের সেবা শুশ্রূষা করিয়া প্রীতিভাজন হইলেন। রাজা আমাকে এই কোষাগারের প্রধান পুঙ্গী করিয়া দিলেন। অরুন্ধতীর পিতার জীবদ্দশায় আমি বর্ষে বর্ষে ভাদ্রকৃষ্ণ-দ্বাদশীতে যক্ষপুরে যাইতাম; অরুন্ধতী আমার কতই সমাদর করিত। আহা! তাহার পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ পিতৃকল্পনা যক্ষপতিলাষে অরুন্ধতীর পালিত্ব গ্রহণ করিবেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। অরুন্ধতী ব্রীড়িতা হইয়া তাহার অসঙ্গতি প্রকাশ করায় রাজার মন ভার হইল। আহা! সেই অরুন্ধতীর কষ্টের অকুর! তিনি কি জীবিতা আছেন?”

অনুপরাম পুঙ্গীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমি অরুন্ধতীর বিষয় সমস্ত অবগত আছি। আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ছিল। ফলে এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস পাইতেছি। আমার এখানে আঙ্গিবার মূল উদ্দেশ্য—অরুন্ধতীর মঙ্গল। অন্য আমি বঙ্গরাজ্যে অরুন্ধতীর আত্মীয় পাইয়াছি, এখন তাহাকে পুনরায় স্বদেশে আনিয়া যথাযোগ্য স্থানে বসাইতে পারিব, এমনত অনুমান করিতেছি। কিন্তু মহাশয়ের সহায়তা আবশ্যক।”

এমত সময় কোষাগারের কার্ঠবৈজয়ন্তীতে পদক্ষেপের শব্দ পাইয়া দেবব্রত উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিয়াই বলিল, গুরুজি, “সেই কিরণী দুইজন আসিতেছে।”

লাবা এই সম্বাদ পাইবামাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কোয়ার্টে অপর বিভাগে চলিয়া গেল ও বলিল, “মহাশয়, আমি নিভূতে থাকিয়া একবার ফিরিঙ্গীরা কে ও কেন প্রত্যাগমন করিয়াছে, অবগত হইতে বাগনা করি, মহাশয়, অনুগ্রহ রাখিবেন ।”

কম্পাই বলিল, “কোয়ার্টে ধর্ম্ম আশ্রম, এখানে কাহার রহস্ত কেহ অবগত হইতে পায় না । আমরা ধর্ম্মব্যবসায়ী, আমাদের নিকট কাহারও কোন বিষয় গুপ্ত নাই । আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার প্রাণ থাকিতে আপনার কথা প্রকাশ পাইবেক না । বিশেষে আপনি স্বয়ং একজন পুঙ্গু, আবার অক্ষমতার হিতাকাঙ্ক্ষী ।”

লাবা কাষ্ঠবিভাগের অন্তরালে গেল, এমত সময়ে দুইজন ফিরিঙ্গী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল । কম্পাই বলিল, “মহাশয়েরা প্রত্যাগমন করিয়া ভাল বিবেচনা করিয়াছেন । একে অন্ধকার, তাহাতে আবার অজ্ঞাততুর্গমপথ, কোন বিধায় এ আশ্রয় ত্যাগ করা উচিত নহে ।”

দেবব্রত আসিয়া ছুটি তুহী করিয়া পান্য জল দিল ও পূর্ব্বমত মীরকক্ষ (১) নিকষের বরফী আনিয়া দিলে অগ্রস্থ ফিরিঙ্গী বলিল, “পুঙ্গুজি, আর গাহড়ার আমাদের প্ররুতি নাই । যদি চ অপরাপর আহারের মধ্যে মীরকক্ষের নিকষ অত্যন্ত-মুখরোচক, কিন্তু একাএক ক্রেমাষয়ে ভাল লাগে না ; এক্ষণে মাংসাদি না হইলে আমাদের উদর পূর্ণ হয় না । কৃপা করিয়া কোন চক্ষ্য খাদ্য দিবেন ।”

কম্পাই বলিল, “দেবব্রত, আপাততঃ কি উপস্থিত আছে দেখ ।”

দেবব্রত বলিল, “মহাশয়, আপাততঃ মাংস পাওয়া হুক্ষর, তবে ভাণ্ডারে গৃজন (২) আছে, আজ দুইদিন হইল ব্যাধেরা কয়েকটা বলজমূগ (৩) দিয়াছিল, তাহারই মাংস ও কিকিৎ ভরটক আছে, আদেশ করেন ত অন্নপাক করিয়া দিই ।”

কম্পাই বলিল, “তবে নাপ্তি (৪) ও পলাণ্ডু দিয়া বিদলের স্থপ, তাহাতে ভরটক খণ্ড, পলাণ্ডু দিয়া গৃজন ও অন্নপাক কর ।”

দেবব্রত চলিয়া গেলে কম্পাই বলিল, “মহাশয়েরা তত্তক্ষণ এই মিষ্টান্ন সেবা করিয়া পঞ্চম দূর করুন ।”

ফিরিঙ্গীদ্বয় সম্মুখস্থ পাত্রের সামুদ্রিক পাটীর বরফী করেকথানা খাইয়া কিকিৎ জলপান করিয়া বলিল, “পুঙ্গুজি, দেশের খবর কি ?”

কম্পাই বলিল, “মহাশয়, আমাদের নৃত্য ও বিছুই নাই । আপনারা বিশেষ হইতে আসিতেছেন ; আপনারাঙ্গের সমাচার কি ? দিল্লীর মোগলসেনা সনধ্যাপে আগ-

(১) মীরপাটী । (২) বিবলিগু শরহত পদ্মমাংস ।

(৩) বিবলিগু শরহত পদ্ম ।

(৪) স্বনামখ্যাত ব্রহ্মদেশীয় চ্যু নৈয়ম মসলা ।

বার কারণ কি, আর মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরই বা সমাচার কি? চন্দ্রদ্বীপ কি এখন বাকলার অধিকারে নাই? মহাশয়দিগের নাম কি?”

অগ্রহু ফিরঙ্গী বলিল, “আমার নাম গঙ্গালিস, আমি গেড়িজের অধিপতি; ইনি আমার আদ্রীয়।” একটু ধামিয়া বলিল, “ইহার নাম পিঙ্গু, ইনি আমাদিগের সহিত গেড়িজে ছিলেন, ইনি আমাদিগের জনৈক সেনানী। বাকলার রাজাও প্রতাপাদিত্যের বশোহতের কারণে রুদ্ধ আছেন। এখন চন্দ্রদ্বীপে না তাঁহার অধিকার, না প্রতাপাদিত্যের। রামচন্দ্র রায়ের কারারুদ্ধ হওয়া অবধি চন্দ্রদ্বীপে আমরাই শাসন ছিল। আশা করি শুনঃ আমার নীলবর্ণ ধ্বজা ফরায় গেড়িজের প্রতৌলীপ্রাকার হইতে উড়িবেক।”

কম্পাই বলিল, “অনুপরাম কোথায়, সে কি সত্য যুদ্ধে মরিয়াছে? সে দিল্লীর মোগলের সহিত কেন যুদ্ধ করিতে গেল?”

গঙ্গালিস বলিল, “সে এদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আমার আশ্রয় লইল ও আমরাই নিকট প্রতিপালিত হইতেছিল। তাহারই জন্ত দিল্লীর মোগলের সহিত আমার যুদ্ধ হয়।” অন্তরালে অনুপরাম বলিল, “বিশ্বাসঘাতকের বড়াইয়ের ছটা দেখ।”

কম্পাই বলিল, “তাহার ভগ্নী অরুন্ধতী কোথায়? তিনি কি জীবিত আছেন?”

গঙ্গালিস বলিল, “নষ্ট মোগল তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে; আমি তাহারই প্রতিবন্ধকতাধি এখানে আসিয়াছি; দেখ, যদি অরুন্ধতী স্বীয় ভগ্নীর উদ্ধারের জন্ত কোন উপায় চিন্তা করেন।”

কম্পাই বলিল, “আমার অনুমান, অরুন্ধতী অরুন্ধতীলাভের জন্ত চেষ্টা করিতে ক্রটি করিবেন না। কেন না, অরুন্ধতীর উপর সৌভ্রাতৃ ছাড়া তাঁহার সৌহার্দ-বৃষ্টিও আছে।”

গঙ্গালিস বলিল, “আমি তাহা কথকটা অবগত আছি। অনুপরাম আমার সে বিষয় পূর্বেই বাগদাছিলেন। এখন যদি অনুপরাম থাকিত তাহা হইলে সে কিছু নিশ্চিন্ত থাকিত না; আর ভগ্নীর উদ্ধারের জন্ত চেষ্টা পাইত। অনুপরামের মৃত্যুতে আমার দক্ষিণহস্ত নিগড়েছে।” অন্তরালে লাবানামধেয় পুঙ্গীসঙ্গী অনুপরাম ডাবিল—বল না কেন, ‘তোমার বন্দুত।’ “সে আমার পরম হৃদয় ছিল। যদিচ কোন কোন সামান্য বিষয় লইয়া তাহার সহিত শেষে আমার বিতণ্ডা হয়, কিন্তু মনের মালিগের বিষয় অগ্নে নাই।”

পিঙ্গু বলিল, “সত্য বলিতে কি, সে একটি নিতান্ত ভক্তলোক; আমি শুনিয়াছি তোমার সহিত তাহার এত আত্মীয়তা ছিল যে, তোমার সহিত বাচ নিক বিবাদ হও-
য়াতেও সে তোমার দল ছাড়ে নাই।” অন্তরালে অনুপরাম ডাবিল—‘হাড়িয়া কোথায় যায়।’

কম্পাই বলিল, “তিনি এখন বর্তমান থাকিলে আমাদিগের দেশেরও মঙ্গল হইত। আমাদিগের বর্তমান রাজার প্রতি সবলের ঐতি নাই। কোন কারণে যদ্যপি গ্রাম্য-কুট উদ্ভেজিত হয়, তাহা হইলে ইহার সিংহাসন রক্ষা দুকর হইবেক। আমরা এক-কালে দেশের পশ্চিমপ্রান্তে বাস করি, সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত মহি, কিন্তু জন-প্রবান, য্যাকোবে রক্ষনগরীতে দুই দল আঘাত্য হইয়াছে ও রাজার বিপক্ষ দল জ্রমে আধিপত্য স্থাপিতেছে। অনুপরাম জীবিত থাকিলে এই আঘাতের সময়। হিন্দুরা বলেন—অকালে লক্ষ আহতি কিছু নহে।”

শিফ্র বলিল, “উভয় দলের মধ্যে সারথান্ ব্যক্তি কোন্ দলে অধিক? কেবল সংখ্যার অধিক হইলে সকল সময় সকল কৰ্ম্ম পাওয়া যায় না।”

কম্পাই বলিল, “অমাত্যমধ্যে তর্জুতাকিত দল অত্যন্ত অল্প। কিন্তু আঢ় আমাত্য মাত্রই রাজার বিশেষ প্রিয় ও বশবর্তী। তবে পুঙ্গীমহলে রাজার আত্মীয় প্রায় নাই বলিলেই হয়। সে বাহা হটক অরুদ্বতীর উদ্ধারের উপায় আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন? মোগলেরা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে?”

গঞ্জালিস বলিল, “অরুদ্বতীকে তাহার রাগগড়ে রাখিয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি অধিক সৈন্য হইলে, আমার সৈন্তের সহিত একত্র করিয়া গেডিজ অধিকার করিতে পারিলেই, অনেক লোক বন্দী করা যাইবেক। আর মোগল বন্দী হইলে তাহার বিনিময়ে অরুদ্বতীর উদ্ধার হইতে পারে। এখন আমরা যক্ষপুরে বাইরা রাজার সিকট এই প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি। রাজার মতামত লইয়া পরে উপস্থিত মন্ত কার্য করিব। যদ্যপি রাজার সাহায্য না পাই, তবে আমার স্বীয় সেনা লইয়া গেডিজ অধিকার করিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধন হইল। তবে বলিতে কি, আমি অরুদ্বতীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছি। অনুপরামের সহিত এবিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। এমন কি অরুদ্বতীকে ধর্ম্মপত্নী করিবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছিল। (অন্তরালে অনুপরাম গোষে দস্তে দস্তে বর্ষণ করিল!) দৈবাৎ একটা ঘটনায় সে উদ্যম নিষ্ফল হয়। এক্ষণে আমরা প্রেমের জগুই এওহুর আসা। সৈন্তাধিক্য না হইলে কেবল গেডিজ অধিকারমাত্র হয়; তবে বলাধিক্যে স্বেচ্ছামত ফল পাওয়া যায়।”

শিফ্র বলিল, “যক্ষরাজার যদি এমতই হৃকুর্জি ঘটে, তবে তাহার রাজ্যে অকুন্ঠিত বিদ্রোহ বাহাতে শীঘ্র প্রকাশ আকারে পদ্রিণত হয়, তাহার চেষ্টায় থাকিব। এখানে বিদ্রোহ হইলে আমাদিগের মঙ্গল সন্দেহ নাই। একদল আমাদিগের অনুচর হইবেই; কেবলা এক্ষণে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যখন মোগল শাসনদণ্ড আক্রমণ করিয়াছে, তখন যক্ষ-রাজ্য আর কতদূর?”

কম্পাই বলিল, “মোগল আক্রমণের ভয় আমরা করি না; যক্ষপুরের উত্তর পশ্চিম

বিভাগ এমত হীনদেশ যে তাহা রক্ষণ আমাদিগের রাজার রাজ্যনাশবহির্ভূত বোধ হইতেছে ।”

দেবব্রত আসিয়া বলিল, “মহাশয়, আহাৰ প্রস্তুত হইয়াছে, অনুমতি করেন, অন্নাদি পরিবেশন করি।” এই কথা শুনিয়া কম্পাই বলিল, “মহাশয়েরা গাজোখান করুন। দেবব্রত ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও ।”

গজালিস ও পিফ্র উঠিয়া দেবব্রতের সঙ্গে বিদগান্তরে গেল। কম্পাই উঠিলে পার্শ্ব বিভাগ হইতে পুঙ্গী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, “কম্পাই, তোমার সহিত আমার কিঞ্চিৎ গুপ্ত পরামর্শ আছে, একটু নিরালে চল ।”

কম্পাই বলিল, “চগ উদ্যানে যাই; চন্দ্রোদয় হইয়াছে, দিব্য দক্ষিণ সমীরণ বহিতেছে, আপনার পথশ্রমও দূর হইবেক।” উভয়ে কাঠবৈজয়ন্তী দিয়া নাচে নামিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে গজালিস ও পিফ্র আহাৰাদি সমাপন করিয়া দেবব্রতকে বলিল, “দেওখ, মাংসও হইল মৎস্তও হইল, এখন পিপাসা দূরের কোন পের না দিলে ত পথশ্রম দূর হয় না।” দেবব্রত বলিল, “আমরা পুঙ্গী, আমাদিগের অন্নই একমাত্র পের; হৃদ্ধ সর্ষদ পাওয়া যায় না, বিশেষে রাত্রি অধিক হইয়াছে, চেষ্টা করিলেও পাইব না।”

গজালিস বলিল, “হৃদ্ধ শিশুর স্নেহে বটে, কিন্তু হৃদ্ধে আমাদিগের তত স্পৃহা নাই। অপর কোন পের নাই? কেন প্রধান প্রধান কোয়াজে আমাকে বধেষ্ট কল্য (১) ও আসব (২) দিয়া আতিথ্য করিয়াছে। এখানে অবশ্যই থাকিবেক। আমরা রহস্যজ্ঞ, সংকৃত হইলে কৃতঘ্ন হইব না। আমরা পথশ্রমে এবৎপ্রকার আপন্ন, আমাদিগের বল-কারী পানীয় আবশ্যক।”

দেবব্রত বলিল, “দেখি, যদি চিকিৎসার জন্ত কোন তীর্থ পের থাকে ও আনিব।” অন্নরঞ্জে একটি বোতল আনিয়া বলিল, “এই লন, ইহা বহাননের পুরাতন তারি, অতি উপাদেয়।”

গজালিস বলিল, “হাঁ, হাঁ আমি জানি তারি পুরাতন না হইলে কেমন একটা হৃগ্ন হয়, আমি সহ্য করিতে পারি না। এ কোথাকার আমদানি?”

দেবব্রত বলিল, এ সিঙ্গাপুরের তারি—অতি উপাদেয় ও বলকারক; ইহার তুল্য তীব্রপানীয় আর কিছুই নাই। এ বতদূর গলাধিকরণ হয়, ততদূর একেবারে দম্ব করে।”

পিফ্র বলিল, “তারি অ.ব্যয় কি? একি ওড়ি নহে? আমাদিগের দেশে ত

খাজুর গাছের রস বকাল দিয়া তাড়ি প্রস্তুত করে; আর বৈশাখ মাসে তালের রসে তাড়ি হয়। তাকে ও আমরা তাড়ি বলি।”

দেবব্রত বলিল, “মহাশয়, এ সে জব্য নহে, তাহাতে ও ইহাতে স্বর্গমুক্ত্য ভেদ। সে হৃগন্ধ, অন্ন ও অতিঅপবিত্র পদার্থ—এ অতি সৎস্কৃত ও উপাদেয়! সে কেবল পরিণত তালের রস, তালসত্ত্ব বলিলেই হয়। আর বদ্যাপি খাজুরের হয়, সে কেবল ধুস্তুরা-বীজের পাঁচন। এ আমাদিগের তারিগাছের রস। আপনি কি তারিগাছ দেখেন নাই? কেন সম্বোধিতে অনেক তারিগাছ আছে।”

গঙ্গালিস বলিল, “তারিগাছ প্রায় নারিকেল গাছের মত, কেবল কাঠা নাই। ইহার ফল প্রায় তালের আঁটি মত এককিঞ্চ একটু সফ্র। সনদ্বীপের দক্ষিণ সাগরকুলের বালুকার উপর অনেক শুক কল ভাসিয়া গিয়া লাগে। এই গাছের ফল কাটিয়া তালের মোচের মত মাজিয়া ভাঙি দিলে যথেষ্ট মাদককল্য রস নিঃসৃত হয়; সেই রসকে সিঙ্গাপুরের লোকেরা আল দিয়া দুই দিনবার সঞ্চিত করে, পরে তাহার বধাযোগ্য পৌড়ী মন ও সপস্ক মসলা দিয়া আবার চোলাই করে। এ প্রকার প্রস্তুত তারি এমনত মাদক যে একপাত্র পান করিলে মাতঙ্গের মত্ততা জন্মে। দেবব্রত, এ কি সত্য সিঙ্গাপুরের তারি?”

দেবব্রত বলিল, “এ সিঙ্গাপুরের অত্যন্ত পুরাতন তারি। ইহা এই কোয়ান্ডো প্রায় কয়েক বৎসর আছে। একটু ঢালিলেই বুকিতে পারিবেন।”

গঙ্গালিস একটি মুৎপাত্রে কিঞ্চিৎ তারি ঢালিতেই এমনত জায়ফল ও দারুচিনির গন্ধ পাইল যে, গন্ধে মুগ্ধ হইয়া জিহ্বাধারা ওষ্ঠলেহন করিয়া বলিল, “সত্য এ ভাল জব্য।” পরে একটু পান করিয়া বলিল, “আঃ! এমন পের আমার জন্মেও খাই নাই।” আবার একটু পান করিয়া ওষ্ঠ ও জিহ্বা নাড়িয়া চাড়িয়া আবার একটু পান করিল। এমতে তিন চারিবারে প্রায় দেড়ছটাক পান করিয়া পিচ্চকে কিঞ্চিৎ দিলে, পিচ্চ এক ষোট পান করিয়াই বলিল, “উঃ! কি ভেজ! এ অগ্নিবিশেষ!” কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটু পান করিল। পরে উভয়ের বার বার পানের পর দেবব্রতকে একটু পান করিতে বলিলে দেবব্রত বলিল, “মহাশয়, আমি পান করি না; তবে আপনাদিগের অনুরোধে একটু স্বাদ লইলাম।” বলিয়া একপাত্র একশোষে পান করিল।

গঙ্গালিস বলিল, “মহাশয়কে এ তীব্রবোধ হয় না?”

দেবব্রত বলিল, “আপনারা মৎস্তমাংস ভোজন করেন অগ্নিদ্রব্যকে অজেই তীব্রবোধ হয়। আমরা নিরামিষভোজী, অনেক লক্ষ্য মরিচ ও পৌরাজ স্বভাব্য করি, আবার যে নাগ্নি আছে—”

পিচ্চ বলিল, “নাগ্নি আবার কি?” দেবব্রত তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া

বলিল, “আমাদিগের পক্ষে কোন দ্রব্যই তীব্র নহে; শাস্ত্রে আমাদিগের মাদক দ্রব্য গ্রহণে নিষেধ। তারি আমাদিগকে মত্ত করে না বলিয়া ভাল ভাল পুঞ্জীর মতে তারি ব্যবহার্য। কিন্তু কেহ বদ্যাপি মত্ত হইবার বজনায়ে—তারি কথ্য কি, একটু তামুক খায়, তাহা হইলে সে শাস্ত্রমতে অত্যন্ত অপরাধী। তারিপান আমাদিগের মধ্যে মাদক দ্রব্য পান করা নহে। তারি আমাদিগের শাস্ত্রে সামান্ত পের মাত্র।”

পিঞ্জ বলিল, “নাগ্নি কাকে বলেন, সে আবার কি?”

দেবব্রত বলিল, “সে এক চমৎকার উপাদান।”

গঞ্জালিস বলিল, “আহা! তাহার কথা কহিও না। সে দ্রব্যের তুল্য পদার্থ এ ভূভারতে নাই। সংসারের সবল দ্রব্য ঈশ্বরের সৃষ্টি, কেবল নাগ্নিটি আমাদিগের গহজুরের সৃষ্টি! সেটি অনুপম! তাহার পক্ষে ম’তুদুই উঠে! তাহার উপাধানে প-বৃত্ত উপদেবতা মগ। পৃথিবীর স্বয়ং মৃতপুত্র শব ও মৃত্যুদি একটা গর্তে বা বড় জালায় রাখিয়া, পচিলে, তাহার চিংড়ী মৎস্য দিয়া সমস্ত একীভূত করা হয়, পরে বত পচা পদার্থ তত লম্বার গুড়া দিয়া একত্র করিয়া গোলা পাকাইয়া শুখান হয়। মগবাণুদিগের ব্যঞ্জনেনে নাগ্নিমসলা না দিলে ব্যঞ্জনই হয় না।”

দেবব্রত বলিল, “মহাশয় ও কি কথা! নাগ্নিতে দুর্গন্ধ নাই। নাগ্নি অতি চমৎকার মসলা, নাগ্নি না দিলে ব্যঞ্জন মজে না। নাগ্নি যদি দুর্গন্ধ হয় তবে মহাশয় হুরিওকে কি বলেন?”

গঞ্জালিস বলিল, “যে দেশে স্বয়ংমুতের মাংস খাদ্যমধ্যে গণ্য, সেই দেশেরই যোগ্য মসলা নাগ্নি ও দুখাত্ত ফল হুরিও। যাহা হউক, এখানে কি হুরিও পাওয়া যায়?”

দেবব্রত বলিল, “এখানে হুরিও পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সিজাপুর ও কাহ্নোজ অকলে হুরিও যথেষ্ট।”

গঞ্জালিস বলিল, “যাহা হউক, আমাদিগের ম্যাঙ্গোষ্টিন্ প্রকৃত উপাদানের ফল। এমত অল্পমধুস্বাদ আর কোন ফলে নাই।”

পিঞ্জ বলিল, “ম্যাঙ্গোষ্টিন্ কোথা পাওয়া যায়?”

গঞ্জালিস বলিল, “এ দেশেও পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে এমত সময় অন্নে না। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েই ম্যাঙ্গোষ্টিন্ প্রচুর।” এমত সময় কম্পাই আনিয়া বলিল, “গঞ্জালিস, আহা হইয়াছে?”

গঞ্জালিস। “আজ্ঞা হাঁ, আমার হইয়াছে, এখন পান করিতেছি। আপনায় তারি অতি মনোমৌ পের।” বলিয়া আবার একটু তারি পান করিল।

কম্পাই বলিল, “গঞ্জালিস, আমাদিগের কোয়াজে সমস্ত দ্রব্য লেখ নাই, একবার এদিকে আইস তোদাকে সমস্ত দেখাই। গঞ্জালিস কম্পাইয়ের পশ্চাৎ গমন করিল।”

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

নিঃশব্দঃ শব্দমবিস্ময়ান্ করংকৃতজনিকাং ২৫ ।

অনুক্রমোহরিতিধ্বনি শয্যাশেষা বিবেশ তৎ ।

গঞ্জালিস চলিয়া গেলে পিঙ্ক বলিল, “দেবব্রত, তোমাদিগের নাপ্তি কেমন আমাকে একটু দেখাইতে পার ?”

দেবব্রত বলিল, “তাহা পাকে ভাল লাগে, কাঁচা কি দেখাইব ?”

পিঙ্ক বলিল, “ইহার কোথায় গেল ? কম্পাই গঞ্জালিসকে কিজন্ত ডাকিয়া লইয়া গেল বলিতে পার ?”

দেবব্রত বলিল, “আমি তাহা কিছুই জানি না। গঞ্জালিসকে কম্পাই পূর্বে চিনিত না। অন্যই উভয়ের পরিচয় হইল। তবে গঞ্জালিস ফিরিস্তানের কর্তা, বোধ করি কোন বিশেষ কর্ম থাকিবেক। কোয়াজের কোন জব্য প্রয়োজন হইবেক। য.হা হউক, চল না, দেখা যাক তাহার কোথায় গেল।”

পিঙ্ক বলিল, “আমিও কখন কোয়াজের ভিতর প্রবেশ করি নাই। ফলে তোমাদিগের কাঠের ম'চার উপরের বর দেখিয়া আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে, চল আমিও কোয়াজ দেখিগে যাই।”

দেবব্রত বলিল, “চল, কিন্তু তাহার কোন্‌দিকে গেল জানিতে পারিলাম না।”

পিঙ্ক দেবব্রতের পশ্চাৎ চলিল, ক্রমে লিহার (১) হইয়া মহালয়ের (২) কিস্মীতে (৩) উপস্থিত হইল। কিস্মীটি প্রায় ত্রিশহাত পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ও প্রায় বিশহাত প্রস্থ, ইহার ভিত্তিকে কাঠের স্তম্ভপুঞ্জ, তাহার বহির্দেশে ছয় পথ প্রায় ছয় হাত প্রস্থ। পশ্চিমদিকে প্রকৃত মহালয়, প্রায় দুইহাত উচ্চবেদী, তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দীর্ঘ লণ্ডের উপর বিকশিত নব্র কমলাকার বিস্তৃত স্বর্ণছত্র। তাহার স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থানিদানী কিস্কিনী মালা দোতুল্যমান রহিয়াছে। নগ্ন আভরণ করিয়া একটি প্রকৃত মনুষ্যাকার শাক্যসিংহের ধারী মূর্তি, সেটি কাঠের উপর স্বর্ণমণ্ডিত। এই মূর্তির হই পাশ্বে স্তরে স্তরে পধ্যায়ক্রমে স্কৃৎ বুদ্ধমূর্তি, কেহ ধারী, কেহ বা অভয়মূর্তি, কেহ লণ্ডায়মান, কেহ যোগাসীন, কেহ বা অনন্তশারী! বেদীর অগ্রভাগে বিচিত্র কাংশের ধূপাদান। মহালয়ের সূচিক্রিত পটল হইতে স্বর্ণশৃঙ্গলত্রয়লব্ধিত প্রধান মূর্তির উভয় পাশ্বে স্বর্ণের প্রদীপদ্বয় দিবা রাত্রি স্নুবা-সিত তৈল ও পবায়ুতে স্তূলবর্তিকে জলিতেছে ও সমস্ত মহালয়কে সঙ্গল পুন্নি-রাছে। বেদীর উপর অতি রমণীয় মাণিক্যচিত্র একখানি স্কৃৎ স্বর্ণপাত্রের উপর

(১) মন্দিরের দাঁড়বর। (২) মন্দিরের বে ভাগে প্রতিমা থাকে। (৩) নাটমন্দির

এলাচী, নারিকেল খণ্ড ও অন্ন আছে। বেকীর অনতিদূরে পটল হইতে রৌপ্য-শৃঙ্খলে একটি স্বর্ণবর্ণ কাংসের তেরঞ্জ নামে ত্রিকোণ কাংসাকার বড়ী এমনতরুতান, যে কাঠের ক্ষুদ্র দণ্ড লইয়া তেরঞ্জের উন্নত মণ্ডলাকার কোণে আঘাত করিলে, তেরঞ্জের ধ্বনি ও রেব প্রায় একদণ্ডকাল সমস্ত কিম্বার বায়ুকে সঞ্চালন করে ও সেই রেবে সমস্ত বক্ষা পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। কিম্বার মধ্যভাগ কাঠ পটল হইতে একটি স্তূরহং কাংসবর্টা ও বেকী হইতে দূরে একটি প্রবীণ গজ (১) বেশ মহান কাংস বুলিভেছে। প্রতি কাঠের স্তম্ভে স্বর্ণমণ্ডিত কীলক হইতে স্থূল অর্দ্ধবংশ খণ্ডে দীর্ঘ পালী অক্ষরে “যে ধর্ম্মহেতু প্রভাব” প্রভৃতি বৌদ্ধবীজমন্ত্র খোদা। বংশফলক গুলি স্বন দূরদলশ্রাম ও সুসংস্কৃত হওয়ার স্নান্নবোধ হইতেছে। বংশ-খণ্ডগুলি অনুযানে ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত। স্তম্ভপটুতির বহির্দেশে ছত্রপথে কাঠবিভাগে স্তরগঙ্ঘ্রিতে স্তূপাকার তাড়পত্রের প্রস্তাপান্নমিতার পুঁথি; পত্রের কোটি (২) স্বর্ণমণ্ডিত ও পাটীগুলি লাক্ষ্যে রঞ্জিত ও স্বর্ণরেখার চিত্রিত! কিম্বার পূর্বে ও পশ্চিম প্রান্তে দ্বারচতুষ্টয় দিয়া কিম্বার উত্তর পার্শ্বের গৃহে বাওয়া যায়।

দেবব্রত কিম্বাতে প্রবেশ করিয়া অষ্টাংগে তার দিয়া ভূমে শির নোয়াইয়া মহালয়ের বেকীস্থ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম করিল ও মন্দ্রস্বরে আপনা আপনি একটি মন্ত্র পড়িয়া কক্ষা দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। পিত্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া বুদ্ধের সুবিস্তৃত ছত্রের দিকে দেখিতে দেখিতে চলিল; একবার পিঙ্কল স্তূপ সৈগগকাঠের ফলকসংস্কৃত (৩) দেখিয়া বলিল, “আহা কি সুন্দর!”

পরে পশ্চিম দক্ষিণদিকের ক্ষুদ্র স্বরে প্রবেশ করিয়া দেখে, যে বেত্রাসনে কম্পাই ও গজালিন বসিয়া আছে ও গৃহের প্রান্তরে জনৈক পুত্ৰী দাঁড়াইয়া কিসের উত্তর দিতেছে। পিত্র কবেক তাহার দিকে চাহিয়া চমৎকৃত হইল। লাভা পিত্রকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সিংহরিল ও বলিল, “কিহে তুমি যে বেশ বদল করিয়াছ—তুমি আবার কিরিন্দী হইলে ববে? আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি রায়গড়ের মাটি—”

একটা বিকট অমাত্যবী বাক্সনা শোণা গেল। সকলেই সিংহরিল। সমস্ত কোরাঙ্গটি কাপিয়া উঠিল! কম্পাই লাফাইয়া স্বীয় আনন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। গজালিন দাঁড়াইয়াই স্বীয় কটীস্থ ছুরিকায় মুঠি লাগাইল। দেবব্রত বলিল “এ কি! কোরাঙ্গের দ্বার ভাঙ্গিল কে? পিত্র বলিল “এ কিসের শব্দ হইল?” লাভা যেমত দাঁড়াইয়াছিল আশ্বাতের হিলোলে কোরাঙ্গের কাঠের বিভাগে হাত বাড়াইয়া ধরিল।

কম্পাই বলিল, “ভূমিকম্পে ও এমন অনির্বচনীয় শব্দ হয় না। এ দ্বারভাঙ্গি—মহালয়ও কিম্বাতে বেগে পদচালনের শব্দ হইল ও কম্পাই প্রভৃতি স্যামলাইয়া বিবে-

চনা করিবার পূর্বেই গৃহের দ্বার দিয়া সাত্ত গোবিন্দ, বল্লভ ও চারি পাঁচজন রাজপুরুষ বেগে প্রবেশ করিল । গোবিন্দ গৃহে প্রবেশমাত্র গঞ্জালিস কর্ত্তরিকা দক্ষিণহস্তে লইয়া লক্ষ দিয়া যেমত গোবিন্দের বক্ষে আঘাত করিতে উঠিয়াছে, অমনি পার্শ্বস্থ বল্লভ তাহার হস্তস্থ তলবারির অপরাধি দিয়া গঞ্জালিসের কটীদেশে এমত বেগে আঘাত করিল যে, গঞ্জালিস ত্রুণ শপথ করিয়া কাষ্ঠেলে ভীমশব্দে নির্পাত্ত হইল । অমনি গোবিন্দ ও বল্লভ তাহাকে চাপিয়া ধরিতে গেল । গঞ্জালিস ভীমবিক্রমে তাহাদিগকে পরিত্ত করিবার উদ্যম করিতে লাগিল । বল্লভ নিকটস্থ পিচ্চকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “এই ফিরিকী বেশধারী পামর মুসলমানকে এখনই বাধ ।” ইতোমধ্যে আর দশবার জন আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পরস্পরের বিপ্লব সঙ্কুলে কাহার হস্তদণ্ড লাগিয়া লম্বমান দীপটি ভাঙিয়া গেল ও গৃহটি অন্ধকারময় হইল । কতক্ষণ অন্ধকারে কে কাহাকে মারে, কে কাহাকে ধরে, কিছুই বোঝা গেল না, ক্রমে পরে অনৈক রাজপুরুষ কিস্মী হইতে একটা দীপ গৃহে আনিতে তাহার আশেপাশে দেখা গেল, যে গঞ্জালিসের কর্ত্তরিকা দ্বারা গোবিন্দের হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে । শোণিতে গঞ্জালিসের ও গোবিন্দের মুখ বিকটদর্শন হইয়াছে । চারিজন রাজপুরুষের সহায়তায় গঞ্জালিস গোবিন্দের দীর্ঘ-উক্ষীষবস্ত্রে বদ্ধপক্ষ (১) হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিশাল উরদেশ ক্ষীত করিয়া কুটিল ভ্রুটুটিতে অপরোষ্ঠ দণ্ডবারা নিষ্পীড়ন করিতেছে ; যন খন খান ছাড়িতেছে ও গোবিন্দের প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপিতেছে । ক্রমে যদি অগ্নি থাকিত ত গোবিন্দ ভস্মীভূত হইত সন্দেহ নাই । রক্তলিপ্ত মুখ, রক্তবিস্কুরিতনয়ন—গঞ্জালিস ভীষণমুষ্টি ধারণ করিয়াছে ! কয়েকজন রাজপুরুষে পিচ্চকে ভূমে পাড়িয়া জানু দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে ও ভীমবলে তাহার বাহুদ্বয় এমত টানিয়া ধরিয়াছে যে, বোধহয় যেন ভুজশির পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া আনিবেক । আলোক দেখিয়া একজন নিকটস্থ কৌলক হইতে দীর্ঘ কুপারজু একটা লইয়া পিচ্চকে বাঁধিল । ক্রমে পরে খাসলাভ করিয়া গোবিন্দ বলিল, “আর একজন পুত্ৰী ছিল সে কোথায় পলাইল ?” বল্লভ কম্পাই প্রতি বলিল, “কে সে কোথা গেল ?”

রাজপুরুষদ্বয়মধ্যস্থ বদ্ধপক্ষ কম্পাই নৃশংস ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়াছে ; তাহার কাষায়-বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া পাড়িয়া গিয়াছে ; কেবল কটীস্থ দামনে অন্তরীক্সমাত্র আছে ; বীর কণ্ঠে মুগ্ধ—কোন উত্তর দিল না । দেবব্রতেরও সেইরূপ দুর্দশা, কিন্তু তাহার কটীতে ছিন্ন উত্তরীয় ওড়ান থাকায় কতকটা আবরণ আছে ; সেও বদ্ধপক্ষ, বলিল, “মহাশয় আমরা কিছুই বলিতে পারি না । আমরা দিগকে কেন কষ্ট দিতে ছেন ? আমরা জানি

না ইহারা কে ও কোথা হইতে আসিল । অন্য সক্যার পর অতিথি বলিয়া আশ্রয় লইয়াছে । কোন পরামর্শে আমরা নাই ।”

রাজপুরুষ বলিল, হাঁ, তুমি ! অতিথিসেবার শরই এই । অতিথি ছয়পথে ও কিম্বার বাহিরে থাকে ; এ যে ভোদের শয়নাগার ! আর এত রাত্রিতে শয়নাগারে অতিথির সহিত কি কথা হইতেছিল ?”

কম্পাই বলিল, “ধর্মের বিপরীত ব্যবহার করিলে—কোয়াজের আশ্রয় মামিলে না—বলপূর্বক কোয়াজে প্রবেশ করিলে—নিরপরাধী পুঞ্জীর উপর হস্তোত্তোলন করিলে—ভাল ! ইহার বিচার হইবেক ।”

রাজপুরুষ বলিল, হাঁ, সকল বিচার এইবার হইবেক । মহারাজ এইবার একেবারে কোয়াজ সব তুলিয়া লিবেন । কোয়াজ যত নষ্টলোকের আশ্রয় হইয়াছে । পৃথিবীর যত পাপ কোয়াজে জন্মে, তাহার ধর্মকোষে আরও থাকিয়া বৃদ্ধি পায় ও শেষে রাজ-বিদ্রোহে পরিণত হয় । এখন আর একটা পুঞ্জী কোথা গেল বল ?”

কম্পাই বলিল, “আমরা এ কোয়াজে দুই জনমাত্র থাকি, অপর পুঞ্জীর কথা বলিতে পারি না ।”

রাজপুরুষ বলিল, “এই আমরা বরে আসিয়া তিন পুঞ্জী দেখিলাম, এখন দুই জন দেখিতেছি । তৃতীয় ব্যক্তি কোথা গেল ?”

দেবব্রত বলিল, “গ্রামের রক্ষককে জিজ্ঞাসা করুন, আমরা দুই জন ব্যতীত কোয়াজে, আর কেহই থাকে না ।”

অপর একজন রাজপুরুষ বলিল, “হাঁ, হাঁ, আমরা তা জানি ; কিন্তু অন্য টমকিন কৈবর্তের মুখে শুনিলাম, যে প্রায় রাত্রি নয়টার সময় একটা কৌশা হইতে একজন পুঞ্জী বাটে নামিয়াছে । আমরা সমস্ত কোয়াজে অনুসন্ধান করিয়াছি, সে অস্ত্র কোথায় যায় নাই । এই কোয়াজেই আসিয়া থাকিবে ।”

অপর একজন রাজপুরুষ বলিল, কেন আমি বরে প্রবেশমাত্রে তিন জনকে দেখিয়াছি ; প্রতীপ মিথিয়া গেলে সে পলায়ন করিয়াছে । দুই ভিনজনে অর্ধে অনুসন্ধান করিলে সে একদেই ধরা পড়িবেক । দিব্য জ্যোৎস্না আছে ; সে অধিক দূর বাইতে পারে নাই । বিনশ্বে প্রয়োজন নাই ; তাহাকে না ধরিতে পারিলে এ বিষয় সমস্ত প্রকাশ হইবেক না । চল আমরা এই চারিজনকে লইয়া বাই । লসন, কিম্পো, ফিকু, তোমরা তুরায় পথ দিয়া মহামুনি কোয়াজের দিকে যাও । কিটনা ও উত্তরমথুরার দারগাও পাইকেরা এই গ্রামের চকুর্দিক রক্ষা করুক । আমরা বন্দী চারিজনকে অপর লোকের জিন্মায় দিয়া উদ্যম টিলাকন্দরাদি (১) অবশেষ করি ।

তৃতীয় পুত্ৰী অবশ্যই ধরা পড়িবেক । গোবিন্দ আপনাকে বিশেষ চোট লাগিয়াছে ; চলুন, নীচে বাইরা হস্তপদাদি ধৌত করুন ।”

গোবিন্দ বলিল, আমি এখন গঞ্জালিসকে ধরিয়াছি, তখনই আমার সমস্ত ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে । এক্ষণে আমার পেড়িজের বৈবরণীতন হইল । তোমরা বলভের স্তুতি পাঠ কর, বলভ শোণিত্রাবে দীপবল হইয়াছে ।”

রাজপুত্রব বলিল, বলভ স্পন্দরহিত হইয়াছে ! ফলে বলভ শিবনেত্র হইল । কাঠের বিভাগ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে । চিবুক খুলিয়া পড়িয়াছে ও ঝক ঠেকিয়াছে । স্পন্দরহিত, পৃষ্ঠদেশ বহিরা শোণিত্রাবে বলভের পরিধেয়কে ভিজাইয়াছে । অন্ধকারে বিগ্নবদন্তুলে গঞ্জালিসের কঠরিকা তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত হইয়াছে ও অবিদ্রান্ত শোণিত্রাবে বলভকে দীপবল করিয়াছে । রাজপুত্রব ব্যস্তে জল আনিয়া চক্ষে বেগে সিক্কন করিলে, বলভ সচেতন হইল । গোবিন্দ বলভের কটদেশ ধরিয়া তাহাকে জুমে বসাইল ও তালবস্ত্র লইয়া বন্ধন করিতে লাগিল । স্বীয় উকীষাভাবে বলভের উত্তরীয় দিয়া কবলিকা প্রস্তুত করিতে লাগিল ।

সপ্তম অধ্যায় ।

ওধাপি মমতাংকৈঃ মোহিতৈঃ নিপাতিতঃ ।

তোপধ্বনি শুনিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিমলার দূর হইতে চলিয়া গেলেন । বিমলার সহচরী দুই দম্পতি মহারাজের দিকে এবড়ুই কতকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “যাও ! তোমার হয় ত এই শেষ দর্শন । বিমলা জঁঝা ও ঘেঁষে জলিয়া উঠিয়াছে । তা আমার কি দেখ ? আমি ত প্রতাপাদিত্যকে ডাকিতে বাই নাই ? তিনিই আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করেন । কি করিব, দেশের রাজ্য, তাতে আমার সম্বন্ধে ভগ্নপতি, আমার সহিত বাক্যের দুটা আমোদ আহ্বান করেন, বিমলার অভিমান এইবারে কিন্তু চূর্ণ হইবেক । মানসিংহ সমস্তই জানিয়াছে । রাজার অদৃষ্টে বাহা আছে, ইহার অদৃষ্টেও তাই ।” কিঞ্চিৎ ভাবিয়া আবার একটা শ্বাস ছাড়িয়া বলিল, “যাই, দেখি যুদ্ধের পরিকটা কি ? এখন কঠিন সময় উপস্থিত । হয় ত এইবারেই বঙ্গ একটা রাজ্য বলে নাম হারাইল । এখন অধি এদেশ ঢাকার নবাবের একটা চাকলা হবে ।” বল হইতে বাহিরে আসিয়া দেখে যে নীচের প্রাঙ্গণে ও গৃহে লোকারণ্য ; বাহকেরা রাশি রাশি বাল্লদ ও গুলি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধযোগ্য জব্য সকল আনিয়া রাখিতেছে । বিমলা প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন ।

সুন্দরী ক্রমে বিমলার নিকট উপস্থিত হইল; কিন্তু বিমলা কোন শব্দ করিলেন না। ক্রমেক পরে বিমলা অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতে সুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “সুন্দরি, তুমি এত নীচ মহারাজাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিলে? যাও যাও, তিনি আবার মনস্তাপ পাইবেন। যাহা হউক, এখন যশোহর সুন্দরীমহিষীতে শোভিবেক!”

সুন্দরী বিমলার বাক্যে লজ্জিত হইল। কিঞ্চিৎ ক্রোধও জন্মিল। বলিল “পোড়া লোকের জালায় কাহার সহিত কোন কথা কহিবার যোগ নাই। কথা কহিলেই যেন প্রেমের কথা কহিতে হয়। দেখা হইলেই যেন প্রেমের দেখা। অল্প মাগীর অল্প চিন্তা, দোমাগীর কিসের চিন্তা!”

বিমলা কোপে কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার মনে অপমান, লজ্জা, কোপ, ঈর্ষা প্রভৃতি কুবৃদ্ধি উদ্ভেজিত হইল। বদন ফুলিয়া উঠিল, গণ্ডদেশ আরক্ত হইল। চক্ষু অশ্রুধারা ভাসিতে লাগিল। তিনি অপরোষ্ঠ দন্তদ্বারা চিবাইয়া ওষ্ঠটি এককালে লাড়িম কুহুমোস্তর করিলেন; বোধ হইল যেন, দন্তাগ্রগুলি রক্তে বর্জিত হইল। হৃদয়ের তাণ্ডেয়াতে বক্ষস্থল প্রলোড়িত হইতে লাগিল। বলিলেন, “সুন্দরি, অবস্থার অতিরিক্ত বাক্য প্রস্তুত তাপিয়া উঠে, মনুষ্যের কথা কি? তোমার কি বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে যে, তুমি আমাকে যথেষ্ট পুরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে? তুমি আদর পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছ; কিন্তু তোমার অবস্থা বিস্মৃত হইও না। যাও আমি তোমার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না।”

সুন্দরী দক্ষিণহস্ত উল্টাইয়া বলিল, “সেটা উভয়ত! আমি তোমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা করি না। যাহার হৃদয়ে এত বিষ, তাহার সঙ্গে কাহারও মিশ থায় না। আমি চলিলাম এখন তুমি নিম্নগতকে মহারাজের সহিত একাধিপত্য কর; কিন্তু তোমারও সুখের শেষ জানিও। আমার মনস্তাপ ব্যর্থ হইবেক না—তুমিও মনের কষ্টে জীর্ণ হইবে, সমস্ত প্রকাশও পাইবেক। আমি মহারাজ মানসিংহের স্বজীবীর চলিলাম। আমার কি! আমরা সকল কর্তাই করিতে পারি—আমাদিগের মানাপমান নাই। আমি ও মরণ সঙ্কল্প করিয়াছি—এখন অনায়াসে গঙ্গাদিকে পা।” বলিয়া ধরপদে ছুইহাত নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল। বিমলা অঙ্গে অঙ্গে স্বীয় গৃহের দিকে প্রত্যাগমন করিতে করিতে ভাবিলেন, “নষ্ট লোকের নিকট সয়ল হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করা, কেবল আত্মাকে তাহাদিগের নির্দয়হস্তে অর্পণ করা মাত্র; তাহাদিগের প্রয়োজনমতে মূল্য করিয়া বিক্রয় করে, অথবা স্বীয় বৈরনির্ঘাতন করে। অবকাশ পাইলে ছাড়ে না। কিন্তু প্রেমের ও বিশ্বাসলব্ধ পরামর্শ ও জ্ঞান ভদ্রে বৈরনির্ঘাতনেও ব্যবহার করে না।” গৃহে আসিয়া দ্বারের পিণ্ডের উপর ভ্রূমাসনে বসিলেন; ক্রমে হস্তদ্বয় দিয়া আপনার ললাটদেশ চাপিয়া ধরিলেন; তাহার ৫/৬

হইল যেন লগাট ফাটিয়া যাইতেছে, যেন কর্ণধর ঠাঁতে জলিয়া উঠিতেছে, যেন নাসিকারজ্জ পিয়া অগ্নি নির্গত হইতেছে। কতকক্ষণ এই অবস্থায় রহিলেন; চক্ষুর্দয় মালিত আছে কিন্তু চক্ষে কিছু দেখিতেছেন না; জাগ্রত আছেন কিন্তু বর্ণে কিছু শুনিতেছেন না, মনেও কোন একটা বিশেষ ভাবের স্থিতি নাই—একটি ঈর্ষান্বিত কথা, কি অপমানের সত্য্যবনা, কি লজ্জার ভাৱ, কি দুঃখের কষ্ট মনে উদ্ভূত হইতেছে। আবার তাহার পরক্ষণেই সেটা নিকিয়া যাইয়া অপর একটা ভাব উদ্ভূত হইতেছে। নানারূপ চিন্তা, শোক ও মনোব্যথা মনকে আক্রমণ করিতেছে। নানাপ্রকার প্রতিকারও প্রতিহিংসার উপায় যেমত উপজিতেছে, অধনি সেটিতে দোষ স্পর্শ করাইয়া অথবা ততোধিক বলবতী চিন্তা উত্তেজিত হওয়ায়, সেটি ত্যাগ করিতেছেন। ‘মানিনী রাজমহিষী প্রতাপাদিত্যের শুশ্রূষায় ও যত্নে সপ্তম স্বর্গে ছিলেন, এখন সুন্দরীর পরুষবাণ্য হৃদয়ে শেলবৎ বিধিল। নবম নরকে নিপাতিত হইলেন। এই অবস্থায় থাকতে ক্রমে শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল ও ক্রমে শরীর শিথিল হওয়ায় নির্জীব-প্রায় হইলেন; এমত সময়ে আবার ভয়ানক ভোপের শব্দে চেতনা পাইলেন। ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একবার অশ্রু মনে শব্দের দিকে ফ্রুতপদে কিছুদূর যাইয়া পথ-মধ্যে সুন্দরীকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, “সুন্দরি, এ যে বারিদিক্ হইতে ভোপের শব্দ পাইতেছি; ব্যাপার কি—রায়গড় কি চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াছে? কোন সমাচার জান?”

সুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, “আমি অত কিছু জানি না। এখন পলাইবার পথ দেখ—মানসিংহ তোমার সমস্ত সমাচার জানিয়াছে; স্বকাবারে অত্যন্ত রোষপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, দুষ্টকে যথোচিত শাস্তি দিব।”

বিমলা বলিল, “সুন্দরি, এখনও যে তোমার মন ভারি। অদ্য তোমার কি হইয়াছে? তুমি ত কখন আমার সহিত এরূপ ব্যবহার কর নাই। আমি তিরদিন তোমাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত স্নেহ করিয়াছি। তুমিও আমাকে জ্যেষ্ঠার স্থায় ভ্রাতা ও মাতা করিয়াছ। অদ্য কি কক্ষণে প্রতাপাদিত্যের সহিত দেখা হইল, তদবধি তুমি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেছ।”

সুন্দরী বলিল, “দেবি, বিষদৃষ্টিটা উভয়ত। মন মুকুরের মত, সকল ভাব প্রতি-বিস্তৃত হয়। সত্য বলিতে কি, এখনও যে আমার বিষদৃষ্টি নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমার মনের বিপরীত ভাব আপনার ভাবের প্রতিচ্ছন্দ-মাত্র (১)। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তিরকাল আমাকে যত্ন করেন; আমি অসুমান

করি, তিনি আমাকে মনের সহিত ভাল বাসেন; তবে আমি রাজকন্যা নহি, রাজ-মহিষীও নহি, আর রাজার খুড়ীর মত নিকট সহচরিনীও নহি—(বিমলা চমকিলেন)—আমি হুণী, পিতৃমাতৃহীনা দুঃখাতি কন্যা। অবস্থার দায়ে, স্বর্গীয় মহারাজ বসন্তরাজের দত্তার, আপনাদিগের সেবার নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগের উচ্ছিতে জীবিত আছি। আমার বাহ প্রাণ্ডলভ্য ফলের দিকে কখনই উত্তোলিত হয় না। আমি অবস্থার অতিরিক্ত আশা করি না। তবে বদ্যাপি দৈববশে মহারাজের নতুনলগ্ণে প্রবল পথমধ্যে আমার আরম্ভের মধ্যে আসে তখন আমি হস্তে ধারণ করি। ইহা কি আমার এতই অসঙ্গত অপরাধ! আপনি জানেন যে প্রেম জাতিভেদ মানে না, অবস্থার উচ্চনীচ জানেন না, ধন দেখেন না, প্রেম মনই বোঝে। মহারাজ আপনার ভয়ে সর্বদাই সজ্জিত, পাছে আপনি রাগ করেন, পাছে আপনার সাপেক্ষে জঁধা জমে, এই আশঙ্কায় সর্বদা উদ্বিগ্ন। তাঁহার ভাষ্যভিত্তিতে, কথামতায়, আকার ইচ্ছাতে এ সমস্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; আপনিও তাহা অবগত আছেন। যুবাশ্রুত, বিশেষে মহারাজ ঐশ্বর্য্য, দুঃখসিদ্ধি অতীবোহু হুণী ও অধম লোকের হৃদয়ের প্রত্যক্ষ কার্য্যকর হৃদয়ে হুণী রসগর্ভবাক্য প্রয়োগ করিলে, কি মহৎ পাশ করা হয়, বুঝিতে পারি না। রসিকমাত্রেই শুদ্ধকণ্ঠেও প্রেমমুগ্ধক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে ত কোম দোষ দেখি না। আপনার কেমন অকৃত্য, কেমন মোহ, কেমন অবিবেকতা বলিতে পারি না। আপনি কতদিন আমার নিকট মহারাজকে নিন্দা করিয়াছেন; তাঁহাকে আপনার মন হইতে অপসৃত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাঁহার নামও আর করিবেন না, ইহাও বলিয়াছেন,—অন্য মহারাজের উপর কতই অনাদর ও ঔদাস্য—কিন্তু মনে মনে আপনার এমন টান যে, মহারাজের কণমান্দ্র অংশও অপর কাহাকে স্পর্শও করিতে দিবে না। মহারাজ যেন আপনার শৈত্রিকসকল (বিমলা ভাবিলেন কেন শৈত্রিক, এককালে আমার সাতপুরুষের ধন) এ ভাবে আমি বুঝিতে পারি না। আদৌ বিপরীত সম্বন্ধে এ প্রকার আত্মীয়তাই গর্হিত; কিন্তু মোহপরবশ হইয়া আবার সেই আত্মীয়তার অধস্তম লঘুদৃষ্টিতে বাধ্য হইয়া,—আনি এতকাণে সহচরী—আমার অবমাননা করিলেন। আপনি ভাবিলেন না যে, বালস্বভাব-সুলভ-চাকল্যের বশবর্তী হইয়া মহারাজের যদি একবার অস্থানে পাদধ্বনন হইয়া থাকে; কিন্তু এক্ষণে মহারাজ তাহা অপ্রিয় বোধ করেন, এমন কি ঘৃণাও করিয়া থাকেন। কিন্তু পাপের এমনি অটিলবন্ধন যে তাহা এককালে ছাড়াইতে সাহস করেন না। অনেকে সন্দেহ করে যে, আপনাদিগের মধ্যে কন্দর্পব্যতীত কুবেশ কুসংসর্গ নৃষ্টি আছে। পাছে অস্ত্রোত্তের মধ্যে কেহ সেইটি প্রকাশ করে, এই ভয়ে কন্দর্পের ডোর পরস্পরের কণ্ঠে নিরোজন—ছলনামাত্র। নিত্য নৃতনে

প্রবৃত্তি এটি নৈসর্গিক নিয়ম। কন্দর্পের ডোর প্রেমরজ্জুর তুল্য নহে। পুরাতন হইলে লাবণ্যক্ষরের সহিত শিথিল হয়। এখন কিঞ্চিৎ কাল উত্তরকেই একই সম্বন্ধে ফেলিয়াছে; এখন এমন সমূহ বিপদ যে দেই প্রতাপাদিত্যের আর রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। রাস্তা প্রায় দেড় গ্রহর হইল। রায়গড়ের একটিও সেনা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল না। শোহরপতির সেনামণ্ডলী যমুনাপর্যন্তইয়ের স্বর্ধাকৃত পুরুষকে দেখিয়া ভয়বিপ্লুত হইয়াছে। আবার স্বর্ধাকৃত ও মালিকরাজ প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে হুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। হুর্গের সাত্তা (১) অনঙ্গপাল দেবও প্রতাপাদিত্যের বিপরীতচরণ করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া সেনারা আর হির হইতে পারিতেছে না। এখন কে বল দক্ষ সেনানীর অভাব নহে, আবার কতকগুলি সেনামণ্ডলীতে একপ্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত। মালিকরাজের ভট্ট তাহার বিপক্ষে অস্ত্র চালাইবে না বলিয়া প্রত্যাশীপ্রকার হইতে অস্ত্রে যাইয়া ঐ নীধীর কূলে বসিয়া আছে। স্বর্ধাকৃতের ফৌজ হুড়ঙ্গের নিকট অবস্থান করিতেছে। শুনিয়া আসিলাম যে, হুর্গের পেটাবাসীরা সাত্ত হইয়া বহির্দেশে অবস্থান করিতেছে—প্রতাপাদিত্যের পলায়ন রোধ করিবে। বহুত ব্যস্ত হইয়া হুর্গের চারিদিকে কিরিয়া বেড়াইতেছে ও মহারাজ মানসিংহের আক্রমণ সেনার সহায়তার জয়সামগ্রী যোগাইতেছে। বিমলাদেবী তোমারও অর্ধট ভাঙ্গিল! এখন আমার সহিত কৃত্যবহারের সময় নহে। দাবানল প্রাণ হইলে ব্যাঘ্রে ও গরুত পার্শ্বপার্শ্ব পলায়ন করে, কেহ কাহাকেও অস্তিত্বাবে দেখে না। ঐ দেখ পট্টাপ্রাণের সেনারা বুঝি ভয় দিল!”

বিমলা বলিল, “ওঃ! কি ভয়নক কোলাহল। যাও দেখিয়া আইস।” সুন্দরী কিঞ্চিৎ দূর চলিয়া গেলে, বিমলা ব্যস্তে তাহার নিকট বাইয়া তাহার গলদেশে বামবাছ দিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার চিতুর্ধরীয়া তাহকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “সুন্দরি, তুমি আমার বাগ্যাবস্থার সহচরী, আমাকে চিরকাল ভাল বাস; যত্ন করিতে গেলে ছুটা একটা অস্ত্রের কথাবার্তা হইয়া থাকে, কিন্তু দেটা সময়ের স্তব্ধ আনিও, তাহাতে আমার মনের ভাবের অস্ত্রধা নাই।”

সুন্দরী বিমলার একটা উদার ব্যবহারের আশ্চর্য হইল। বিমলা কটীদেশ বানহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে তাহার কঠিনে গড়াইয়া তাহাকে পুনঃচুষন করিলেন। সুন্দরীর চক্ষুর্ধর অস্ত্রধারিত পূর্ণ হইল—চক্ষুর্ধর দিয়া বহির্দেশে লাগিল। সুন্দরীর কঠিন বন্ধনধর্মের প্রাণাধন বিমলার বন্ধন ধরিলেন দেউতা প্রলোড়িত হইল। বিমলারও রেহ উপজিল। বিমলার গুঠ কাঁপিতে লাগিল। বিমলার চক্ষুর্ধর আশ-মুক্তিত আশ-

উন্নীলিত হওয়ায়, অশ্রুবিম্ববয় চক্ষুর কোণে মুক্তাকলের ত্রাণ, কমলদলের জলবিন্দুর ত্রাণ জ্যোতিষ্মান হইল । বিমলার ভুজবন্ধ প্রগাঢ় হইল ।

বিমলা বলিল, “সুন্দরি, আমরা উভয়েই দুঃখিনী । সম্প্রকালেও প্রেম ছিল ; আপদে প্রীতির অভাব হইবেক না । দেখ এ কলরব কিসের ? অন্যাই বোধ হয় আমা-
দিগের শেষ ! সুন্দরি, যদি মরি ত উভয়ে একত্রে মরিব । জীবদ্দশায় হুইজনে যাহার মুখচন্দ্র দেখিয়া প্রীতলাভ করিয়াছিলাম ; হুইজনে নিরালে বসিয়া কত দুঃখের ও সুখের কথা কহিয়াছি ; এখন অভিমুখে উভয়ের মনের ভাৱ এক হওয়ায় আমার বিষাদে হরিষ হইতেছে । অদৃষ্টের নীলপটের বিদ্যুৎমাত্র পঞ্চদশী হইয়াছে, তাহাকে চাকিতেই ত্রাণ দেখিলাম, কিন্তু কখন ধরিতে পারিলাম না ।”

আবার কলরব শুনিয়া সুন্দরী চমকিয়া উঠিল । বিমলা সুন্দরীকে ছাড়িয়া বলিলেন, “সুন্দরি ! যাও ত্বরায় সমাচার আনিও । এ সময়ে বোধ হয় নিরবহালিকায় (১) কোলা-
হল হইল ।”

সুন্দরী চলিয়া গেলে বিমলা ক্রমে ক্রমে গৃহদ্বারে আসিয়া বসিলেন, আবার কি মনে হইল গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি সুন্দর গজদন্ত ফলক আনিলেন । তাহার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাল্যকালের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত ছিল । সর্বদা ব্যবহার ও কালে স্থানে স্থানের রক্ষা স্নান হইয়াছে ; কিন্তু এখনও সেই কোমল বাল্যভাব সুগোল মুখ, শিরে জরীর টোপি, তাহে দিব্য হোমার পর দেখা যাইতেছে ! মূর্তিটি মহারাজ বসন্তরায়ের উপদেশে লিখিত হয় । চিত্রপটে প্রতাপাদিত্য যোদ্ধাবটুক বেশে লিখিত । কর্ণে দিব্য গজমুক্তারচিত কর্ণপালী, কণ্ঠে ত্রিশূলমুক্তার স্তম্ভাঙ্গ, তাহার মধ্যে হীরকের তরল, হস্তে হীরকের বলয় বাহুতে মাণিকময় কবচ । কটীদেশে বারানসী তাসের কটীবন্ধ, তাহে মুক্তার গোছার পেচ । প্রতাপাদিত্যের প্রতিমূর্তি বাল্যলীলিতে ঢল ঢল ; দেখিলে, যেন কুমার রা কন্দর্পের কল্পিত প্রতিমূর্তি বোধহয় । চক্ষু এত ভেজস্বী যেন পট হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে । বিমলা এই লিখন টি কতক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন, পরে ক্রমে তাহার হাত ঐ গজদন্তফলক লইয়া ক্রমে মুখের কাছে উঠিল, ক্রমে তাঁহার ওষ্ঠ প্রতিমূর্তির মুখে ঠেকিল কি না—ঠেকিল—বিমলা চক্ষু মুদ্রিত করলেন । কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া আবার চক্ষু চাহিয়া সেই প্রতাপবটুক দেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন । ইহাতে এমন সুখস্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন ও এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক প্রহরকাল অতীত হইল, তজ্জাপি ছবি দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না ; যতই দেখেন, ততই শরীর শিথিল হয় বটে, কিন্তু তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় । সুন্দরী ইতোমধ্যে আসিয়া একপার্শ্বে নিঃশব্দে

দাঁড়াইল। বিমলার প্রেম এত তীব্র ও এত নিরীহ যে, সুন্দরী যদিচ স্বভাবত ব্যঙ্গপ্রিয়, বিশেষে অন্যাকার ব্যবহারে কথকটা রুষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু সেই নির্মল প্রেমের প্রবাহ ভঙ্গ করিতে সাহস করিল না; একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ক্রমে বিমলার পশ্চাতে যাইয়া প্রতিমূর্তিটি এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তাহারও মন গলিয়া গেল। সে মূর্তি দেখিল কাহার না মন টলে? অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া বলিল, “দেবি, আহা! এ মূর্তিটি আমি ত কখন দেখি নাই। এটি যে একান্ত মনোহর।”

বিমলা চমকাইয়া উঠিলেন, সুন্দরীর দিকে সরোষে চাহিলেন, কিন্তু তাহার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া স্থির হইয়া বলিলেন, “সুন্দরি, এটি আমি মহারাজ বসন্তরায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলাম। তিনি দিব্যার সময় বলিয়াছিলেন, ‘বিমলা, আমি তোমাদের পরস্পরের অতীব বালাকালের প্রেমের বিষয় সমস্ত অবগত আছি; সে নিরীহ প্রেম আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। এক্ষণে তুমি আমার ধর্মপত্নী হইয়াছ—তোমার ধর্মজ্ঞানই তোমার মহৎ দুর্গ—সেই তোমাকে রক্ষা করিবেক। তবে মনকে একান্ত স্থির করিতে অক্ষম হও, এই পটটি রাখিও, ইহা সময়ে সময়ে তোমার বালাকালের আত্মীয় ও সহকৌড়কের কথা মনে করিয়া দিবেক ও তাৎকালিক নিরীহ প্রেম বর্ধিত করিবেক।’ ভাই, আমি সেই অবধি এই চিত্রপটখানি অতি গোপনে রাখিয়াছি। প্রতাপাদিত্যও এবিষয় অবগত নহেন। সত্য বলিতে কি, আমার এ পটের সহিত যত প্রেম, তাহার শতাংশের একাংশও ইহার আদর্শের সহিত নহে। প্রতাপাদিত্যের এক্ষণ অনেক পরিবর্তন হইয়াছে—এখন বয়ঃক্রমধর্মী পুরুষ-চিহ্ন শাশ্রু উঠিয়াছে, তাহার গণ্ডদেশের আর সে লালিত্য নাই,—এখন তাহার বদনের ছায়া মনও কঠিন হইয়াছে। এখন প্রতাপাদিত্যকে দেখিলে আমার সময়ে সময়ে বিরাগ জন্মে, আবার এই চিত্রের পরিণাম বলিয়া এক একবার মনও দ্রব হয়।”

সুন্দরী বলিল,—“দেবি আমি এমত সুরূপ বালক! কখনও দেখি নাই। যদিচ আপনাদ্বা আমা অপেক্ষা বয়সে অধিক বড় হইবেন না; কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আমি যুবা অবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার বালাবস্থায় দেখিলে আমি লজ্জাভয় রাশিতাম না, আমি আমার যথাসর্ব্ব্ব্ব তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতাম।”

বিমলা বলিলেন,—সুন্দরি! আমি যখন বালিকা ছিলাম, ও প্রতাপাদিত্য যখন বালক, তখন আমরা বাল্যকৌড়ায় পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ করি। পরে মহারাজ বসন্তরায় যশোহর ত্যাগ করিয়া রায়গড়ে আসিয়া বাস করিলে, তাঁহার সহিত আমার আত্মীয়েরাও রায়গড়ে আসিয়া বাস করিলেন। আমিও ‘অগত্য’ রায়গড়ে আসিলাম; কিন্তু আমার মন যশোহরেই রহিল! কিছুদিন পরে মহারাজ বসন্তরায়ের সহিত বিবাহ হইল

একদিন অবকাশ পাইয়া মহারাজকে আমার বাগ্যকালের মনের ভাব সমস্ত অবগত করাইলাম। মহারাজ আশ্চর্য্য শুনিয়া চিত্ত হইলেন, বলিলেন ‘বিমলা, তুমি বিবাহের পূর্বে আমার এ বিষয় অবগত করাইলে, আমি কখন তোমাকে কষ্টকর নিবন্ধে বদ্ধ করিতাম না।’ বাহা হউক, এখন দেখিতেছি, আমার সহিত তোমার বিবাহে উভয়ের অনুরূপ হইবেক সন্দেহ নাই। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী হইয়াছ; তুমি সম্বংশজাত; বংশের গুণে ও তোমার স্বীয় ধর্ম্মভয়ে ও অবশ্যই তোমার পরকাল রক্ষা করিবেক, আমি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। তবে অড়শরীর সকল সময় মনের বশবর্ত্তী হয় না; অতএব সেই কাঙ্ক্ষিত সন্তোষের জন্ত,—আমার নিকট প্রতাপাদিত্যের বাংলা-কালের একটি চিত্রপট আছে, তোমাকে দিব। তোমার মন ব্যাকুল হইলে তুমি সেটি নির্জনে বসিয়া দেখিবে—তোমার বিমলপ্রেম তাহাতেই সন্তোষলাভ করিবেক। তোমার প্রতি আমার ভক্তি ও বঙ্গনা উদয় হইবে। তোমার নির্মল ও প্রকৃত প্রেমে আমার জ্ঞান হইল, আর তোমার উদারতায় তোমার মানসিক ব্যথা অবগত হওয়ায়, আমার কষ্টের উদ্ভূত হইল। তোমার ব্যথা দূর বরিবার কোন উপায় নাই। তোমার উদ্ভব সঙ্কট। তুমি আমার প্রতি অবিবাহিত হইলে জন্মের তরে কষ্ট পাইবে, জন-সমাজে নির্মিত ও ঘৃণিত হইবে; তুমি আপনি আপনাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু তোমার স্বভাব অত্যন্ত শাস্ত দেখিতেছি। বিমলা ইহজন্মে কষ্ট সহ করিলে পরকালে পরম মুখে কাটাইবে। এই প্রতিমূর্ত্তিকে তোমার মনের চিত্রপুঙ্খলিকা জ্ঞানে সর্ব্বদা দেখিও।’ বলিয়া আমার একটি চুম্বন করিলেন। আহা! সেই আমার ধর্ম্মস্বামীর শেষ চুম্বন। মহারাজ বসন্তায় সেই দিন ৭ বধি আমাকে দিদির ভগ্নেকা অধিক জেহ, ও বিশেষ যত্ন ও মায়া করিতেন, কিন্তু কখন আমার সহিত আর একেলা বসিতেন না। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া আমি নিকটে গেলে তিনি অপর কাহাকে ডাকিয়া লইতেন। আমার প্রীতির জন্য আহা! তিনি কমলাদেবীর সহিতও একাকী বসেন নাই। এমন বিবেচক স্বামীকে আমি ভক্তিপ্রজ্ঞা ব্যতীত কখন ভাল বাসিতে পারিলাম না! কমলা সরলতার চাক্ষুষ পরিচয়! তিনি কতদিন রাজাকে আমার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু রাজা নানাপ্রকার ওজর আপত্তি করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন। পরে আমরা দুই ভগিনীতেই তাঁহার সহিত বাস করিতাম।”

হৃদয় বলিল, “দেবি, আপনার কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমি পূর্বেই এ সকল অনুমান করিয়াছিলাম; কিন্তু এ চিত্রপটের কথা কিছুই জানিতাম না। এখন দেখিতেছি এই পটই আপনার প্রেমের তাজন। এ বিস্তৃত প্রেম কেহ জানে না—বুঝে না—দেবি, তুমি অসামান্য।”

বিমলার চক্ষু নিয়া অমর্গল জল বহিতে লাগিল। বিমলা অকল দিয়া মুখ আবরণ করিলেন। সুন্দরী তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া বলিল, দেবি, আপনি একান্ত হুতুটী! বাহা হউক, আপনার বিত্তক চরিত্র দেখিয়া আমার এত ভক্তি হইতেছে যে, আমি আপনাকে দেবংশ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি।”

বিমলা সুন্দরীর কণ্ঠদেশ ধরিলেন ও তাঁহার স্ট্রীম কোমল স্তনদ্বয়ের দ্রোণিতে স্বীয় মুখাবিভদ্র ঢাকিলেন। যেন শরচ্ছত্র হিমাচলের কন্দরমধ্যে লুকাইল। সুন্দরী বলিল, “দেবী, অস্থির হইও না।—আমি যে সান্ত্বনা করিবার কোন কথাই পাইতেছি না।” সুন্দরীও তাঁহার স্বকের উপর কপোলদেশ রাখিয়া কাদিতে লাগিল।

আবার নিরবহালিকায় তখনক কোলাহল হওয়ায় বিমলা চমকিয়া উঠিয়া যেন চেতনা পাইলেন; বলিলেন, “সুন্দরি! ভাই, শীঘ্র যাও আমাকে সমাচার আনিয়া দাও।”

সুন্দরী গৃহ হইতে কিছুদূর বাইতে ন-বাটিতে একজন রায়গড়ের রাজপুরুষ আদিয়া বলিল, “ছোট বা! রায়গড় আর দাঁড়াইতে পারে না। মালিকরাজের অধীন সেনারা নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল। প্রতৌলীপ্রাকারের বাহিরে নতুন আগত একদল সৈন্ত দেখিয়া প্রাকারস্থ সেনাসঙনীতে কোলাহল হইল। দিবাের তীক্ষ্ণ মালিকরাজের পক্ষহাজারী কয়েকজন প্রাকারে গোলের কারণ দেখিতে গিয়া নিরবহালিকায় বহির্দেশে মবাগত অলহাজাতীয়া উলঙ্গপ্রায়, দীর্ঘ শেলহস্ত লৈল দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে নাএক, তাহাদিগকে জয়ন্তীপুরের সোঁা বলিয়া চিনিল ও মহা আনন্দে কোলাহল করিয়া সূর্য্যকুমারের পক্ষহাজারী প্রতৌলীপ্রাকারে ডাকিল। সকলে মহা উৎসাহে প্রতৌলীপ্রাকারে বাইয়া প্রতাপাদিত্যের দুর্গরক্ষার্থী সেনাদিগকে হাত ধরিয়া মায়াইয়া দিল। তদবধি দুর্গের সেদিকে আর যুদ্ধ নাই; তত্রত্য আক্রমী সেনারা আপনার আক্রমী সেনার অপেক্ষা করিতেছে। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে ভগ্নোৎসাহ, হতোদ্যম হইয়াছেন। কমলাদেবীকে এ বিষয় অবগত করায় তিনি কি বলিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমরা কি করিব?”

বিমলা বলিলেন, “তোমাদের অদ্য কিছুই করিতে হইবেক না। আর কয়জনই বা আছে? তবে যেখানে যত বারুদ আছে সমস্ত আনিয়া এই দণ্ডমন্দিরে রাখ। তোমার বড়মাতা ও মহিষীকে দীবাের দক্ষিণ বাটীতে ফরায় বাইতে বল, আমিও যথাকালে সেখানে উপস্থিত হইব।”

রাজপুরুষ চলিয়া গেলে সুন্দরীকে বলিলেন, “ভাই, আমার মন একান্ত অস্থির হইয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি, প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেই বা আমার কি? আর মানসিংহ পলায়ন করিলেই বা আমার কি? রাজ্যনার আগায় ভাল লাগে না।”

হুন্দরী বলিল, “দেবি ! উত্তলা চইবেন না, দেখুন কোথাকার জল কোথায় মরে ; এখনও কিছু প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন নাই। আপনার যদি এতই কষ্ট হইতেছে, তবে যখন ভজহরি সমাচার আনিয়াছিল, তখন তাহাকে দুর্গরক্ষার উদ্যোগ করিতে বলিলেই হইত।”

বিমলা বলিলেন, “তখন দুর্গরক্ষা করা যুক্তিমত্ত হইল না। প্রতাপাদিত্য অন্যায় করিয়া রায়গড়ে সৈন্যে নিবেশ করিলেন, একবার যুদ্ধের কথা আমাকে বলিলেন না। আবার গুপ্তগতিমুখে বাহা শুনিলাম তাহাও সহ হইল না।”

হুন্দরী বলিল, “তিনি বন্যাপি দুর্গই অধিকার করেন, তাহা হইলেই বা তোমা-
নিগের কি ? তোমরা পতিপুত্রবিহীন। রাজা গড় অধিকার করিলে কিছু তোমা-
দিগকে বহিস্কৃত করিতেন না।”

বিমলা বলিলেন, “বি ! দুর্গের অধিকারিণী হইয়া আবার একজনের হাত-
তোলার মধ্যে থাকিব ? আমি দ্বিতীয়া হইতে পারি না। দিদি আমাকে বিবাহ
অবধি সমস্ত কর্ণের ভার দিয়াছেন। মহারাজ বসন্তরায়ও—

নগুমন্দিরের পার্শ্ব দিয়া হস্তা করিয়া সেনামণ্ডলী পলাইতেছে, ব্যস্ত হইয়া একজন
রায়গড়ের রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, “ছেট মং, মানসিংহ দুর্গভেদ করিয়াছেন।
প্রতাপাদিত্যের সৈন্য ভুঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোথায়
কেহ বলিতে পারে না। আপনি একবার দীর্ঘার দক্ষিণের বাসগৃহে চলুন, বড় মা
আপনাকে ডাকিতেছেন। মাহয়ী ও রাজকণ্ঠা অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছেন।”

বিমলা বলিলেন, “তুমি অগ্রসর হও আমি যাইতেছি।” রাজপুরুষ চলিয়া গেলে
প্রা-র্শ্ব দাঁড়াইয়া হুন্দরীকে ডাকিলে হুন্দরী নিকটে আসিল। বলিলেন,
“ভাই, একবার জন্মের তরে কোল দাও, আমি তোমাকে অন্য অনেক কটুবাক্য বলি-
য়াছি—” হুন্দরী ব্যস্তে বিমলাকে আলিঙ্গন করিল। বিমলা ক্রমে পরে হুন্দরীকে
ছাড়াইয়া বলিলেন, “হুন্দরি, আমি এই চিত্রপটকে লইয়া সহমরণ করিব ! তুমি ভাই
আমার সংকার করিও।”

হুন্দরী শিহরিয়া বলিল—“দেবি ! এমত কর্ম করিবেন না।”

বিমলা বলিলেন, “বিচারের সময় নাই, তুমি এস্থান হইতে পলাও, যাও যাও বিলম্ব
করিও না।”

হুন্দরী বলিল, “আমার উপর কোপ করিবেন না। আমি ভয়ে এ পরামর্শ দিই
নাই। তবে বলি সহমরণের সময় আছে।”

বিমলা বলিলেন, “কি ! তুমি আমার সহিত ব্যঙ্গ কর।” বিমলার চক্ষু রক্তবর্ণ
হইল। বিমলা স্বীয় অকল কটীদেশে জড়াইয়া দস্তে দস্ত দিয়া বলিলেন, “বা !
আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; প্রতাপাদিত্য নষ্ট হইয়াছে ; আমিও সহমরণ করিব।”

সুন্দরী বলিল, “দেবি, একথা কাহাকেও বলিবেন না । এ শুনিতে লজ্জা ও বলিতেও লজ্জা । বাহা আছে মনে মনে রাখুন ।”

বিমলা উদ্ভাসপ্রায় হইয়া বলিলেন, “লজ্জার কথা কি ? আমি মনে মনে কষ্টাবস্থায় তাহাকে বরণ করিয়াছি । যদিচ বসন্তরায় আমাকে শাস্ত্র ও লৌকিক নিয়মে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অশাস্ত্র । বিশেষে যখন সে বিবাহ কখন সম্পাদিত হয় নাই,—ধর্ম সাক্ষ্য ! অদূরে গভীরে আকাশবাণী হইল ! “ধর্ম সাক্ষ্য” আর মহা-রাজা বসন্তরায়ের প্রেত যদি এখানে উপস্থিত থাকে, সাক্ষ্য দিবেক সন্দেহ নাই । গভীর আকাশবাণী হইল “সন্দেহ নাই ।” আমি কারমনোবাক্যে প্রতাপাদিত্যকে পতিত্ব বরণ করিয়াছি । দৈবহাবপাকে বসন্তরায়ের সহিত আমার বিবাহ হইয়া-ছিল । কিন্তু তিনি কখন আমাকে ব্যবহার করেন নাই । ধর্ম সাক্ষ্য ! আকাশ-শব্দ হইল “সত্য” । আমি প্রতাপাদিত্যের চিত্রপট লইয়া জীবন কাটাইয়াছি । কতবার মিলন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন—একটা না একটা উপলক্ষ্যে আমি অভিমান করার মিলন ঘটে নাই—ধর্ম আমার সাক্ষ্য ।” অমাত্যবী শব্দ হইল “রক্ষা হইয়াছে” এই কথা বলিতে বলিতে বিমলা ক্রমে জ্বলিয়া উঠিলেন । ক্রমে তাহার স্বর ভীষণ হইতে লাগিল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, “সুন্দরি ! তুমি এখান হইতে পলাও আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি । তোমার নিকট করপুটে প্রার্থন করিতেছি, এস্থল ত্যাগ কর—খাকিও না খাকিও না ।”

এমন সময় দণ্ডমন্দিরের ছাদ হইতে অতি ভীমরবে শব্দ হইল “খাকিও না, পলাও ।”

সুন্দরী কয়েকবার অমাত্যবী শব্দে চমৎকৃত হইয়াছিল । এই বারে শব্দমাত্রে ভীত হইয়া চতুর্দিকে দৌড়িতে লাগিল ; কাহাকেও দৌড়িতে পাইল না ।

বিমলা বলিল, “পলাও । শুনিতেছ, ভূত প্রেত পর্যন্ত আমার দিকে হইয়াছে, পলাও !”

সুন্দরী অগত্যা অঙ্গে অঙ্গে দণ্ডমন্দিরের বাহির হইতে লাগিল । সুন্দরী প্রায় দণ্ডমন্দির পার হইবার সময় একটি ভয়াবহ হৃদভেদী অটহাস হইল । তাহার পরেই বিমলা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “সুন্দরি, আমি প্রতাপাদিত্যের সহিত সহবাস করি নাই,—আমি ধর্মরক্ষা করিয়াছি,—কিন্তু আমার মন পাশে লিপ্ত ! আমি বসন্তরায়ের স্ত্রী নহি,—ধর্ম সাক্ষ্য ! ওঃ ! বসন্তরায় সাক্ষ্য !”

ভীম রবে “সমস্ত সত্য ! বিমলার সত্যই নষ্ট হয় নাই !” এই শব্দটি হইল । অদূরে একটি সুদ্র বন্দকের শব্দ হইল । তাহারই পর একটি গগনভেদী অনির্বচনীয় অরণীর ভয়ানক ভীষণ শব্দ হইল ; সমস্ত রাগনগড়ের দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল ; যেন

আকাশ ভাঙিয় পড়িল ; তাহারই পর দণ্ডমন্দির দেখানে ছিল, সেই স্থানে প্রায়োচিত্ত অগ্নিশিখা ও ধূমচর দেখা গেল ! শব্দে যেমন দশদিক পূরিল,—আলোকেও তদ্রূপ দশদিক ভাসিল—বোধ হইল যেন পৃথিবী বিধা হইয়া অন্তরের অগ্ন্যাগ্নায় করিতেছে ! যে দেখানে যে অবস্থায় ছিল, সে সেই ধ্বনিই অপেক্ষের জন্ত অচেতন !

অষ্টম অধ্যায় ।

নৃত্যরসঃ স্বর্গগৌরুশ্রুতুর্গুণোববান্ ।

এদিকে স্বর্ধকুমার দীঘীর উত্তরের চানালের পার্শ্বে ধ্বজা গাড়িয়া স্বীয় পার্শ্বতীর কুদীপৈল্লবলকে দীর্ঘবংশের যষ্টি একটা লইয়া ভীমবলে বাজাইয়া ডাকিলে, তাহার মতোসাহে হল্লা করিয়া স্বর্ধকুমারের নিকট হইল । সে ভীষণাকার দেখিলেই হৃৎকম্প হয় । তাহার নম্র, সন্দিগ্ধ মনাবিধ উদ্ভি ও সিন্দুররেখায় রঞ্জিত ; শরীরে কোনই আচ্ছাদন নাই—আবরণের মধ্যে এক এমটি রুক্ষচর্মদ্বীপবয়ের পুচ্ছ কটীদেশ হইতে সমুখে প্রায় একহাত বুকিতেছে ; তাহানিগের উর্দ্ধ শিখায় মনালাদি পার্শ্বতীর পক্ষীর পালক ; বাম হস্তে কাঠের দীর্ঘ ফলক, চর্মের কর্ণ্য করে ও দক্ষিণ হস্তে সলোম তীক্ষ্ণ শেল ; কটিদেশে নেপালী ভোজালী ; সকলেরই বামপদে নূপুর ; কাহার গলদেশে শঙ্খের মালা ; কাহার বা বাহকে শক্রদন্তের তাবিজ । স্বর্ধকুমার তাহানিকে বধ্য-যোগ্য সমাদর করিয়া তাহানিগের মধ্যে প্রধান মীরাশদারকে ডাকিয়া বলিলেন, “নন্দরাম, ভাই ! তোমার কপায় আমার জয়ন্তীরাজ্যের মান রক্ষা হইয়াছে ; আমার ইচ্ছা আমি এতোক শূলধারীর সহিত আলিঙ্গন করি ।”

নন্দরাম বলিল, “সেনারা আপনার সহিত সাক্ষাতে ঘেরণ সঙ্কট হইয়াছে, তাহার আলিঙ্গন করিলে একেবারে রক্তদাস হইবেক । তাহার আপনার বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল, অমিতভেজ ও অসম সাহস দেখিয়া অত্যন্ত শ্রীত হইয়াছে । আমি তাহানিকে আপনার অভিপ্রায় অবগত করাইতেছি” বলিয়া তাহানিগের নিকট চলিয়া গেল । তাহারই কিছুক্ষণ পরে এমত ভীমরব করিয়া কুকীসেনারা একটা লক্ষ্য দিল যে, মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল । স্বর্ধকুমার তাব বুঝিয়া অগ্রসর হইলেন, পরে স্বর্ধকুমারকে মধ্যে রাখিয়া পাঁচশত কুকীসেনা চক্রাকারে নানা অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করিতে লাগিল । স্বর্ধকুমার স্বভাবতঃ আয়োদ্ধার, তাহানিগের নৃত্য দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া আপনিও তাহানিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন । চক্রনৃত্য দেখিতে চারিদিকে লোকারণ্য হইলে,

মহাশয় মানসিংহ দূর হইতে স্বর্ধাকুমার নৃত্য করিতেছে শুনিয়া কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া নৃত্য দেখিতে গেলেন । মালিকরাজ নৃত্য দেখিয়া হাসিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিলে কচুরায় বলিল, “মালিক, এ ব্যঙ্গ করিবার নহে ! স্বর্ধাকুমার দেশীয় আচার-ব্যবহার বিস্মৃত হয় নাই ও ঘৃণা করে না, ইহা আমাদেরই মহা আনন্দ ও স্পর্ধার বিষয় । অসত্য পার্শ্বভীরুরা নিজস্ব মোগলের সভার থাকিয়াও যে দেশী আচার রক্ষা করিতে লজ্জিত হয় না, ইহা একান্ত সাহসের কথা ।”

মালিকরাজ বলিল, “আপনি বাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু এরূপ ভুলের নাচ দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না । মহাশয়, দেখুন দেখি ঐ বৃদ্ধ বৃদ্ধ মিন্দেললা কেমন কোমর বাঁকিয়ে হাত ঝুলাইয়া মাথা নোয়াইয়া নাচিতেছে ।”

কচুরায় বলিল, “বাস্তাসার নৃত্য অপেক্ষা এ অনেক ভাল । আমাদেরই পুরুষের নৃত্যই নাই বলিলে হয় । তবে যা আছে সে নিতান্ত টমে । এ কেমন সতেজ ও বলকারক ।”

মালিকরাজ বলিল, “ইহাতে আমোদ হউক বা না হউক, যথেষ্ট পরিভ্রম হয় বটে । এ হেন মাখমাস, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এখনও দেখুন সকলেই বসন্ত হইল । নৃত্য আর জনেক থাকিলে কেহ আর দাঁড়াইতে পারিবেক না ।”

কচুরায় বলিল, “স্বর্ধাকুমারের এখন জাম হইতেছে ! উহার পার্শ্বভীরুলোক ; এরূপ নৃত্য অভ্যাস আছে ; স্বর্ধাকুমার বাণ্যকালাবধি এদেশে থাকায় কতকটা কোমলবোধ হইয়াছে ।”

মালিকরাজ বলিল, “মহাশয়, এ আবার কি ঐ দেখুন কুকীরা ! ক করিতেছে ।”

কুকীরা নৃত্য ক্ষান্ত হইলে কয়েকজনে ছয়টা শেল পূর্ব-পশ্চিমে করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল, আর কয়েকজনে ছয়টা শেল উত্তর দক্ষিণে করিয়া দাঁড়াইল । এরূপে যে শেলের মাচা হইল, স্বর্ধাকুমারকে ধরাধরি করিয়া তাহাতে উঠাইয়া দিলে, স্বর্ধাকুমার তাহার উপর দাঁড়াইলে, ক্রমে সেই মাচা সবলে স্বঞ্চে লইয়া একচক্রে ঘুরিয়া আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল । স্বর্ধাকুমার এক লম্ফে ভূমিতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে কচুরায়ের নিকট বাইবামাত্র কচুরায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, “ভাই তোমার মজল হউক । তোমার ক্ষুধা দেখিয়া আমার নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইতেছে ।”

মালিকরাজ বলিল, “বাহা হউক, সরমা তোমার এত বিদ্যা আছে দেখিলে চমকিয়া উঠিবেন ও আতঙ্কে হয়ত অচেতন হইবেন ।”

স্বর্ধাকুমার হাসিয়া বলিল, “আমরা পাহাড়ে লোক, আমাদের আমোদও পাহাড়ে ।”

কচুরায় বলিল, “নন্দরাম কোথায় ?”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “সে কুকীসেনার রসনের অঙ্গ অনঙ্গপাল দেবের নিকট গিয়াছে ।

তাহারা যশোহরে এই যুদ্ধের বিষয় শুনিয়া ক্রোধান্বনে আগিতে পথে একে অঙ্গলা-
বাদ—তাহে এখানে ব্যস্ত থাকায় আহাতি প্রায় কিছুই হয় নাই ।

কচুরায় বলিল, “চল আমরা ইন্দুমতীর আবাসে যাই । তাহাকে কি দুর্গের ভিত্তর
আনা হইয়াছে ?”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “আমি ও আদেশ দিয়াছি । অনুমান করি এতক্ষণে তাহারা
অন্তঃপুরে গিয়া থাকিবেন । প্রভাবতী ও যুদ্ধের জগ্ন ব্যস্ত ছিলেন ; তাঁহাকে অনেক
বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলাম ।”

কচুরায় বলিল, “রায়গড়ের গতক এক প্রকার । ইন্দুমতীও যুদ্ধে আসিতে চাহিয়া-
ছিলেন । আমি নিষেধ করায় অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন ।”

মালিকরাজ বলিল, “এ যে ত.হাঁরা আসিতেছেন । অরক্ষণীয় অশচ্যাপনে পট্ ।”

কচুরায় বলিলেন, “তিনি রাজকন্যা, বিশেষে পার্শ্বতীর দেশে বাস ; তিনি বোধ
হয় আমাদিগের অপেক্ষা অশ্রবিদ্যায় দক্ষ । দেখিতেছ কি কলে অশ চলাইতেছেন ।”

ক্রমে তিনজনে দীবার নিকটস্থ হইলে সবলেই অশবেগ সংযম করিয়া স্বীয়
স্বীয় অশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । কচুরায় অগ্রসর হইয়া বলিলেন “দেবি, এখন
রায়গড় নিশ্চল হইল ।”

ইন্দুমতী বলিলেন, “নিকটক হইল বটে, কিন্তু বঙ্গও পরাধীন হইল !”

প্রভাবতী বলিলেন, “প্রতাপাদিত্য কোথায় ? শুনিলাম, হজুরমল নাকি গড়ে,
ধাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ? সে নরাদম কোথায় ?”

কচুরায় বলিলেন, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোথায় আছেন বলিতে পারি না ;
যাহা হউক তিনি প্রকৃত বীরপুরুষ বটেন । বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল না হইলে
তাঁহাকে যথায়ুদ্ধে জয় করে এমনত লোক বিরল । স্বীয় বুদ্ধির দোষেই তিনি কষ্ট
পাইতেছেন । যে বিষয় কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ না
করাই বিজ্ঞের কর্তব্য । বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি রক্ষা করা নীতিজ্ঞ রাজার উচিত,
নতুবা তাহাকে বিরক্ত করিলে কেবল উষ্মেগের কারণ হয় ।”

মালিকরাজ আঁসিয়া বলিল, “নন্দরাম আপনায় সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে ।

কচুরায় বলিল, তাহাকে পাঠাইয়া দাও, আমরা এই চালালে বসি ।

মালিকরাজ চলিয়া গেল । কচুরায়, স্বর্ধাকুমার, প্রভাবতী, ইন্দুমতী ও অরক্ষণীয় দীবার
ষাটের চালালে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলে ভজহারি আসিয়া সম্মুখে একখানা
প্রকাণ্ড গালিচা আনাইয়া পাতিয়া দিল । কিছুক্ষণ পরে নন্দরামশ্রেয়ষ আটজন চৌধুরী ও
মিরাশদার আসিলে, তাহাদিগকে এক গালিচার বসিতে আজ্ঞা দিল তাহারা যথাবোধ
স্থানে উপবিষ্ট হইল । মালিকরাজ স্বর্ধাকুমারের সন্নিবর্তে ভূমাসনে বসিল ।

কচুরায় বলিলেন, “নন্দরাম, তোমার সমরোচিত সাহায্যে মানসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন ও আমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে, তোমাদিগকে, বিশেষ জয়ন্তীপুরের চৌধুরী চুড়ামণি নন্দরাম ! তোমাকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে কহিয়াছেন। তোমার সেনা সমাগমে রায়গড়ের স্বর্ধ্যকুমার ও মালিকরাণের সেনামণ্ডলীতে অভিনব উৎসাহ সঞ্চিত হইয়াছিল ও সেই সহায়তায় রায়গড়ের পশ্চিম প্রাচীর প্রায় অনাগ্রাসে লাভ করা হইয়াছে। মহারাজ মানসিংহ স্বর্ধ্যোদয় হইলেই মহাগভা আহ্বান করিবেন, ওধায় তোমাদিগেরও স্থান হইবেক।”

স্বর্ধ্যকুমার বলিল, “নন্দরাম, তোমার সেনামণ্ডলীর আহ্বারের কি বন্দোবস্ত করিলে ? অনঙ্গদেব কিছু বোগাড় দিয়াছেন ?”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, আপনার প্রশংসা আমাদিগের কিছুই অভাব নাই। অনঙ্গপালদেবের আদেশমতে একসংখ্য ছাগ আনান হইয়াছে। ভজহরি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমি হুজুরের সৈন্যদিগকে ইজিত করিয়াছি, তাহারা একটু সাবধান হইয়া পাকা দিবে। তাহাদিগের জন্ত একটু নিভৃত স্থান হইলে ভাল হয়।”

কচুরায় বলিল, “নিভৃত স্থানের অভাব নাই। রায়গড়ের অংশালা অত্যন্ত বিস্তৃত স্থান, সেখানে এক্ষণে অশ্বাদি কিছুই নাই। আর সেস্থানে কেহই যায় না।”

স্বর্ধ্যকুমার বলিলেন, “বেদিকে প্রতাপাদিত্যের অধিরোহীদিগের বাসা হইয়াছিল ; এক্ষণে বুদ্ধাবশেষ কোথায় আছে বলিতে পার না ! আমি বলিতেছিলাম যে আপনার বধ্যাপি অতিপ্রায় হয় ও কুকৌসৈন্য তালপুত্রের পূর্বপাড়ে পাঠাই। সেটি নিভৃত নিঃশলাক স্থান, চারিদিকে অগম্য বন, নিকটে জলপটীও বটে।”

কচুরায় বলিলেন, “তাহাতে কোন হানি নাই ! তবে সে স্থান অনুমান করি কুকৌদিগের মনোনীত হইবেক না।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, সে স্থান তাহারা আসিবার সময় গত রাত্রিতে দেখিয়া আসিয়াছে ; অত্যন্ত রম্যস্থান বলিয়া তাহাদিগের বোধ হইয়াছে,—নিকটে চাঁড়য়ালের দহ আর হুদীর্ঘ প্রায় পাঁচক্রোশী বিল, স্থানটিও উচ্চ বটে নানা গুপ্তসমাকীর্ণ কুকৌদিগের প্রিয়।”

কচুরায় বলিল, “বাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় তাহাই কর।”

নন্দরাম জনৈক পার্শ্বস্থ দল্লুইকে বাঁচিয়া দিলে দল্লুই উঠিয়া চলিয়া গেল।

কচুরায় বলিলেন, “নন্দরাম, তুমি রায়গড়ের যুদ্ধের সমাচার কোথায় পাইলে ?”

নন্দরাম বলিল, “আমি যশোহরে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র ওধায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাদিগের প্রাণে বহুলাপুত্রইয়ে তলব শুনিলাম ও আমাদিগকে জনৈক মিশ্রাণদার এখানকার রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের বাস ও মানসিংহের আক্রমণসম্বন্ধে দিলে,

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল যে, রামচন্দ্ররায়ের সহায়তা করিয়া বশোহর হইতে আধুনিক গোবর্দ্ধনকে বহিষ্কৃত করি। কিন্তু রামচন্দ্রের উদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী রমাই বীর সমস্ত কষ্টই মস্করাম ও রসিকতায় নিক্ষেপ করিতে চাহে। তাহাকে বুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক রামচন্দ্ররায়কে ছাড়াইবার পরামর্শ বলায় সে বলিল, “ভায়া, আমরা ভাত খাই কাঁসী বাজাই—আমাদিগের ইন্দুর খরা পড়িলেই হল, হেজামে প্রয়োজন কি? সে লোকটি কিন্তু সুচতুর, এত কৌশল ও ছল করিয়াছে যে, সহজে কোন বিষয় বোঝা যায় না—সমস্ত যেন ভেলকিবাজী।”

কচুরায় বলিলেন, “রাজা রামচন্দ্র রায় কি অদেশে গিয়াছেন, না বশোহরের চাঁদ-খানের কারাগারে আছেন?”

নন্দরাম বলিল, “না তিনি সেই রমাইবীরের কোশলে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন;—শব বলিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার অনুমতি হয়; রমাইবীর সম্রাসী সাজিয়া সেই শব লইয়া নৌকায় তোলে, পরে তাহার স্ত্রী প্রতাপাদিত্যের কন্ডাকে লইয়া রাতারাতি বশোহর হইতে পলায়ন করিয়াছে। রমাই বীরের কোশলে গোবর্দ্ধন কিলেদার মাতিয়া উঠিয়াছে। সে আবার অধঃ বশোহরের সিংহাসনে বসিয়া রাজা হইয়াছে। বশোহরে এখন ভায়া গোলযোগ।”

স্বর্ঘ্যকুমার বলিল, “জয়ন্তীপুরের সমাচার।ক?”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, আপনি তথায় বাইলেই নিজের পৈত্রিক সিংহাসনে বসিবেন। লটকা একে ত অক্ষম বলিয়া সমস্ত প্রজাই খড়গহস্ত, আবার বেক্রমে রাজদণ্ড ও তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা আমরা সকলে অবগত আছি।”

ভজহরি ব্যস্তে আসিয়া কচুরায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, “মহারাজ, দুর্গ প্রবেশ কালে যেখানটি শক পাইয়াছেন, তাহা আমাদিগের সর্বনাশন্যক,—হায়! হায়! লব্ধম প্রতাপাদিত্য সকল নষ্ট করিল।”

কচুরায় ও ইন্দুমতী একত্রে বলিল, “কি হইয়াছে?”

প্রতাবতী ব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, “আমার পতা কোথায়?”

ভজহরি বলিল, “অনন্তপাল দেব মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে বসিয়া আছেন; খেতনে বস্ত্র ও সনদ্বীপের বরদাকর্ষণ আছেন; তাঁহারায় রায়গড়ের বন্দোবস্তের পরামর্শ করিতেছেন ও সেনাদিগের থাকিবার স্থান ও রসদের যোগাড় হইতেছে।”

কচুরায় বলিলেন, “সে শকাটি কিসের?”

ভজহরি বলিল, “দীঘীর দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ প্রতৌলী প্রাকারের পূর্বের দণ্ডমন্দির উড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগের ছোট মা বিমলাদেবীর ব্যাবহিক শব্দ সেই তন্মাবশেষ—ভয়মন্দিরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কেহই কিছু বলিতে পারে না। হৃদয়বীকে

জিজ্ঞাসা করায় হৃদয় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। কমলাদেবী এ সমাচার পাইয়া একেবারে নির্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছেন। ইন্দুমতীদেবী একবার সেখানে গমন করিলে ভাল হয়,—মহিষী অতিভৃত্য, রাজকন্যা সরমা উদযাতার, কে কাহাকে সান্ত্বনা করে,—অন্তর্ধানের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! গৃহের দ্বারের উপর সরমা হতাশ হইয়া পড়িয়া আছেন; আহা! তুলিবার কেহই নাই;—তঁাহার অর্দ্ধাঙ্গ গৃহ ও অর্দ্ধাঙ্গ বারাগে;—কমলাদেবী বারাগার পড়িয়াছেন;—মহিষী শূন্যদৃষ্টিতে স্বহস্তে বপোল স্তম্ভ করিয়া বসিয়া আছেন;—মালতী কোথায় গিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না।”

ভজহরি, বাক্য শেষ হইতে না, হইতে ইন্দুমতী প্রভাবতী ও অন্নকণ্ঠী উঠিয়া জন্তর্দ্বারের দিকে চলিয়া গেলেন।

কচুরায় উঠিয়া বলিলেন, “ভাই সূর্যকুমার, আমি একবার মানসিংহের নিকট হইতে আনিতেছি।”

ভজহরি বলিল, “আপনার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন? শুনিতেছি, বলভকে ও বরদাকর্ষকে অন্য রাত্রিতেই প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আনিতে পাঠাইবেন।”

নন্দরায় বলিল, এই লোকটি আসিয়া আমাকে বলিল, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছেন।”

ভজহরি বলিল, “কোথায় ধরা পড়িয়াছেন?”

নবগত লোকটি বলিল, “আমি সবিশেষ অবগত নহি, এইরাত্র স্বকাবারে জন-প্রবাদ শুনিয়া আনিলাম।”

কচুরায় বলিলেন, “বাহা হউক, হজুরমল, গজালিস ও অনুপরাংকে, সম্মুখপে ব্যস্ত থাকার জন্য অনুসরণ করা হয় নাই; এখন তজ্জন্ত লোক পাঠান উচিত। আমি বাই, দেখি কি হইতেছে।”

কচুরায় চলিয়া গেলে, নন্দরায়ও উঠিয়া চলিয়া গেল। অপরাপর সবলেই চলিয়া গেলে সূর্যকুমার বলিল, ভাই মালিক! “তোমার মালতী কোথায়?”

মালিকরাজ বলিল, “যখনপুঙ্খই হইতে আসা অবধি আমি ত কোন সংবাদ পাই নাই। ভজহরি দ্বারা বজবজ হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তরও পাই নাই। কে জানে ভাই, বেরূপ আজকালের গতি! কায় অদৃষ্টে কি আছে বলি যায় না—অদৃষ্টে বাহা থাকে তাহাই ঘটবেক। আমার পিতার কিন্তু কোন সংবাদ পাই নাই।”

সূর্যকুমার বলিল, “আমি হুর্গে প্রবেশ করিয়াই, অনুমান হয়, যেন তাঁহাকে লক্ষ্মণ অকলে ক্রতপদে বাইতে দেখিয়াছি।”

মালিকরাজ বলিল, “আমি সমাচার না পাইয়া উবিধ হইতেছি। রায়গড়ের বৃদ্ধ কলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত সর্বনাশী হইল! বাই আমি দেখিগে।”

হৃদয়কুমার বলিল, “চল আমিও বাই।”

দুই বন্ধুতে একত্রে পরস্পরের স্বৰ্কে হস্ত দিয়া চলিয়া গেল।

নবম অধ্যায়।

“হিমেনৈব হিমং শাম্যেৎ হৃক্ষতেনৈব হৃক্ষতং।”

কুলদান নদীর পূর্বশাখার পূর্বতীরে, নীল পর্বতের নখে, সাগরসঙ্গম হইতে প্রায় বিশ ক্রোশ উত্তরে, ভৃগুকটাকাঁকীর্ণ শৃঙ্গচয়ের স্রোণীর মধ্যে, চতুষ্কোণ স্থল প্রাচীরে বেষ্টিত বজ্ররাজধানী স্রোহৌ! স্রোহৌ হইতে অনতিদূরে উত্তর ও পূর্বপ্রান্তরে মায়ু ও বোমপর্বতের নখচয়ে অগম্য প্রান্তনবনতরুচয়ে পূর্ণ ও নানাবিধ ভৃগু-সমাকীর্ণ। সৈগন, কাওড়া, গর্জ্জন, কুচিলা ও শিশুর প্রবীণ তরুচয়, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-ক্ষীত গ্রন্থিবৃক্ষ অভেদ্য বংশনিকর। তাহার নীচে কেতকী, আনারস ও বেত্র প্রভৃতি সপুষ্টক উদ্ভিদ। দরীমধ্যে টেকী, চিলে প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার অপুষ্প-পাদপ। সাগরসামিধ্য হেতু নদীর জল কর্দমে বনীবৃত্ত ও গিরিনখবহির্ভূত নদীভাগে সমস্তল। নগরীভাগ নদীর জোয়ার ভাঁটায় দিব্যরাত্রিতে দুইবার প্রাবিত হওয়ায় সমস্তলভূমি তরল কর্দমাকীর্ণ। তরল পঙ্ককর্ষটে স্থলচিক্রণ পাতৃ হরিতবর্ণ প্রায় গোল, পর্ণসমবিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোনা, পরেশ, রূপা, গরান, গঁউয়া, হুন্দরী প্রভৃতি বীজরূপে পূর্ণ হওয়ায় জলের হ্রাস বৃদ্ধিতে স্রোতোরোধ হেতু দিন দিন নদীরয়-আনীত মুক্তিকা পাতিত হইতেছে ও নববীজরূহচয় যেন চক্রকলার স্থায় বৃদ্ধি পাইতেছে। বীজরূহের কক্ষার অধোভাগ নদীরগাধাতে পত্রহীন ও সেইজন্ত অনেক দূর দেখা বাইতেছে। পঙ্ককর্ষটে দীর্ঘপদ কানতুণ্ডী, স্রম্বহংস, বজ্রহুণ্ড, কাস্তে-চেরা, স্থলচকু, সামুকখোল, প্রশস্তচকুচিত্তে, সোনাঙ্গাঙ্গা, গোপলা, কাঁক, অঞ্জন, ডাক, কাম, দলাপিপি, পানপায়রা, কুলঙ্গ প্রভৃতি দীর্ঘজন্ম উভচর পক্ষিচয় চরিয়া বেড়াইতেছে। জলের তীরে কাদাখোঁচা, চাষা প্রভৃতি পুচ্ছ নাড়িয়া কীটাহার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গগনগরালের বিস্তৃত পক্ষ পড়িয়া আছে।

চতুষ্কোণ হৃগ্নমধ্যস্থ নগরীটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তাহার একমাত্র দ্বার লৌহকবাটে আবদ্ধ। ঐ দ্বারের অন্তরালে কয়েকটি বর্জিত উচ্চশ্রেণীর মগরাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এখনও সূর্যোদয় হয় নাই বলিয়া গোপূর বন্ধ আছে, সূর্যোদয়কালেই দ্বার

খোলা হইয়া থাকে । রাজপুরুষদিগের পরিধেয় বস্ত্র বিচিত্র রেশমের বহির্বাস, পল্লবের আজানুলব্ধিত চৰ্ম্মপাচ্ছাদিত । নিম্ন রেশমের অঙ্গরক্ষ বস্ত্রের উত্তরপার্শ্বে স্বর্ণের বদরী দিয়া রেশমের ঘূর্ণিতে বাঁধা । মাথায় চিত্রিত রেশমের রমাল জড়ান । মুখে এক একটি কাগজের চুরুট, মধ্যে মধ্যে নীলিনিভ ধূম উড়িতেছে । তাহাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠটি বলিল, “মেজচু তুমি এত প্রাতে কোথা হইতে আসিলে ? কোথা গিয়াছিলে ? মক্কেলের সমাচার কি ?”

মেজচু বলিল, “মহাশয়রা যে উদ্দেশে গিয়াছিলেন, আমিও সেই কৰ্ম্মে ফিরিতেছি ; অনুমান করি কতকটা কৃতকার্ধ্য হইয়াছি । অন্য রাত্রে কয়েকজন বিপক্ষপন মঙ্গলদায়ক্যের দ্বারা পড়িয়াছে ।”

বৃদ্ধটি বলিল, “হাঁ, ধরা পড়িয়াছে । টে কিস্তি অনুপরাম কোথায় ? লোকমুখে বাহা শুনা গিয়াছিল তাহা কতক সত্য । যোগ করি বত গরজে তত বর্ষে না ।”

মেজচু বলিল, “কেন মহাশয়, সকলই সত্য হইবেক, দেখিবেন । আমার নায়েব বাহা শুনিয়া আসিয়াছে, তাহা সত্য । আবার শুনিয়াছেন ? বাঙ্গালার দূতের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক পুংবেণে চর হইয়া আসিয়াছে ? স্ত্রীলোকের কি সাহস ? একা অস্বাভাব্যে চট্টগ্রাম দিয়া কিরূপে আসিল ?”

ফোহোসিন, একজন প্রধান অমাত্য—উত্তর করিল, “আর ভাই বুঝিতে না, সে ত কেবল রাজকৰ্ম্মে আসে নাই, সে যে স্বীয় প্রাণনাথের রক্ষার্থে আসিয়াছে । আসিবার সময় তাহার আত্মীয়-অন্তরঙ্গের অমতে লুকাইয়া আসিয়াছে । বাঙ্গালার স্ত্রীলোক সে বিষয় কেমন মুখ, অনেকের তরে একবার স্বামী গ্রহণ করে ; আবার শুনিয়াছি স্বামীর মৃত্যু হইলে আত্মস্বাতী হয় ।”

মেজচু বলিল, “সে আমাদিগের দেশের প্রথা অপেক্ষা ভাল । আমাদিগের স্ত্রীপুরুষে তত প্রেম জন্মে না,—স্বল্প কালের জ্ঞা বিবাহ কতকটা অসত্য প্রথা,—ইহাকে বিবাহ বলা যায় না এ এক প্রকার পথাচার ।”

ফোহোসিন বলিল, “হাঁ, এখনকার কালের গতিই এই, পুরাতন প্রথাসমুদয়ে দোষ দিয়া বাঙ্গালার প্রথার পুরস্কার করা, কিছু একা তোমার দোষ নহে ; বুঝা যাচ্ছেই ঐক্লপ বলিয়া থাকে, কিস্তি একটু বরস অধিক হইলে এ সকল ভ্রম দূর হইবেক, তখন মনের প্রথা সুপ্রথা বহিরা জািনবে । ভাই, যে দেশে যে প্রথাটি জন্মিয়াছে, সে দেশে সেটি উপযোগী না হইলে কখন প্রথারূপে পরিণত হইত না । প্রথা প্রয়োজনীয় ও সুবিধা না হইলে কখন প্রথাহিত হয় না । আমি মনে করিলেই কিছু একটানুতন প্রথা প্রচার করিতে পারি না । কে, তুমি জোয়ার ভাঁটা পরিবর্তন করিতে পার না ? নটের মত কোন নৃতন নবরী স্থাপিত করিতে কি সম্ভব ?”

মেজচু বলিল, “মহাশয়, রাজা ও ধনী ব্যক্তিই প্রথায় মূল। তাহারা যে কর্তৃ করে, সেইটি আপামর সাধারণ অনুকরণ করিতে করিতে প্রথা হইয়া যায়। আবার বঙ্গাধিপ সে প্রথার আত্মস্থতোপ সত্তাবনা থাকে, তাহা হইলেই সে প্রথা এককালে অকর্তব্য হয়।”

এমত সময় মূলশৃঙ্খলের কল্পনা ও লৌহ অর্গলেশ শব্দ ভুলিয়া মেজচু বলিল, “মহাশয়, এই দ্বার খুলিতেছে, চলুন নীত্রে প্রবেশ করুন বাক; নতুবা মহারাজ সত্যর বলিলে এ সকল সমাচার স্বাক্ষকে দেওয়া হইবেক না। আপনার ধর কি?”

কোহোসিন বলিল, “চল যাই, কিন্তু আমি ত অনুপন্নামকে ধরিতে পারি নাই—এখন রাজার কে'পে পড়িতে হইবেক।”

মেজচু বলিল, “কেন আপনার দোষ কি? আপনি ত যথালোচ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আমি কি উত্তর দিব? আমি ত সে চরটি কে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, শুনিয়াছি, সে বৈদ্যনাথ নামক দূতের প্রাপক, কেন না সে কেবল বৈদ্যনাথের শরীর রক্ষণে বিশেষ যত্ববান। ঐ যে লাওনী আলিতেছে? তাহার সঙ্গে বন্দীও দেখিতে পাইব—সে কি দ্রৌদুত ধরিতাছে নাকি?”

কোহোসিন বলিল, “কি দূতের প্রতি হস্তক্ষেপ! এ ত কোন দেশের প্রথা নহে, আমাদিগের রাজ্যের আবিচার! অনুপন্নাম এ সকল বিষয়ে ত ভাল ছিল।”

মেজচু বলিল, “কেন, অনুপন্নাম অনেক বিষয়ে ভাল—তাহার শরীরে অনেক গুণ আছে। সে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া নির্কোষের মত কর্তৃত্ব করিয়াছে। সে এখানে দলবদ্ধ হইয়া থাকিলে এতদিনে একটা বাহা কিছু হইয়া যাইত।”

কোহোসিন বলিল, “হাঁ। বলেছ ভাল। তাহা হইলেই সে আর ইহলোকে থাকিত না। তাহার বিপক্ষে বেঙ্গল কঠিন আদেশ প্রচলিত হইয়াছিল ও তৎকালে গ্রামকূটের বরুণ কোপ; তাহার পলায়ন ব্যতীত অপর উপায় কিছুই ছিল না।”

মেজচু বলিল, “অল্পকালেক সজে লইয়া যাওয়া তাহার অজ্ঞার হইয়াছিল। অল্পকালী রক্তপ্রদেশের রাজমহিষী হইলে তিনিও সুখী হইতেন; আর আমাদিগের রাজবংশে অপর শোণিতমিশ্রিত হইত না। তাইবোনে বিবাহ—কি মজা করে করে! আমাদিগের বহুপুরাতন প্রথা।”

কোহোসিন বলিল, “এটিকে প্রথা বলা যায় না, তবে আমাদিগের মধ্যে একরূপ ব্যবহারের পূর্ব প্রতীমা (১) আছে।” এই কথা বলিতে বলিতে রাজদ্বারে প্রবেশ করিয়া সত্য হইয়া দেখে, সত্যর সকল প্রথান রাজপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অন্ত-

ধারী প্রহরিনগ্ন স্তরে স্তরে প্রেয়স্বজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যকরাজ ভীষণ দৃষ্টিতে ইহাদিগের প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া অপর দিকে দৃষ্টি করিলে পাঁচজন অস্ত্রধারী অগ্রসর হইয়া নবাগত ফোহোসিনপ্রমুখ পাঁচজন রাজপুরুষের পার্শ্বে আনিয়া দাঁড়াইল। ফোহোসিন তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, মূহুর্তে বলিল, “কিহে সমাচার কি?” বিরক্তনয়নে অস্ত্রধারী বলিল, “তোমরা বন্দী হইলে!”

ফোহোসিন বলিল, “অপরাধ?”

অস্ত্রধারী বলিল, “শুনিবে এখন।”

প্রধান অমাত্য অগ্রসর হইয়া করপুটে বলিল, “মহারাজ, ফোহোসিন ও মেজচু প্রভৃতি দোহাংয়ের অধ্যক্ষ উপস্থিত; এক্ষণে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ আদেশ হয়।”

রাজা বলিলেন, “ফোহোসিন, তুমি এই সংসারে বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার একরূপ দুর্বুদ্ধির কারণ কি? তুমি নাকি আমার অনুপায়ের সাহায্যে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আমার আদেশের বিপরীতাচরণ করিয়াছ? আরও শুনিতে পাই, একটি বিপক্ষ দলবদ্ধ করিয়াছ। তোমার প্রাণ লণ্ডাহ হইয়াছে, অতএব তোমাকে আপাততঃ কারাবদ্ধ করিলাম, পরে বিশেষ অনুমতি দিব। প্রতিহারিন্, ফোহোসিন প্রভৃতি পাঁচজনকে কারাগারে লইয়া যাও।” অমাত্যের প্রতি “কৈ, দৃত কোথা গেল? এখনও এখানে উপস্থিত হইল না?”

অগ্রধারী প্রতিহারীরা ফোহোসিন প্রভৃতিকে লইয়া চলিয়া গেলে রাজা অমাত্যকে বলিলেন, “এখন অনুপায়ের তত্ত্ব লও, তাহাকে জীবিতই হউক বা মৃতই হউক আমার সম্মুখীন করিতে হইবেক। সে এদেশে স্বাধীন হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিলে বিদ্রোহ বৃদ্ধি করিবেক। আপাততঃ যেরূপ দেশীয় লোকের মনের ভাব, তাহার সামান্য উৎসাহ বা সাহস পাইলে একেবারে উত্তেজিত হইবে ও উন্মত্তের জ্ঞান আচরণ করিবে। আমার গ্রামকূটের এমত স্বভাব যে, যখন উত্তেজিত হয়, তখন উৎসাহদাতার আধিকারের বহির্ভূত কর্ম্ম করে, তখন আর কিছুতেই বাগ মানেন না। অনুপায় এদেশে আনিয়াছে শুনিয়া কতকগুলি স্বাধিপার অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও মন্দির সমস্ত সত্য নানাবিধ বিষয় লইয়া আন্দোলন কারিতেছে। এ দেশে ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নষ্ট না করিলে হয় ত যুগ্মদার শোণিতপ্লাবনও ক্ষত হইবেক। ফোহোসিন বহুকালের মাত্র ওধরাও; আমি যদি তাহাকে কারাগারে পাঠিলাম; বিজ্ঞ তাহাকে জানাইও যে, আমার মন তাহার জঁজ এখনও ত্রুণনকর; আমি তাহাকে বিশ্বস্ত হইব না; কি কর রাজ্যের কুশলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে অস্ত্রীর বাগ দিতে হয় কার কপায়, অসুমান করি, আমাকে তত্তদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে হইবেক না। বাহা হউক তাহাকে কতকটা সান্ত্বনা করিও। এখন সে প্রিয়দর্শ স্ত্রীদূত কোথায়?”

অমাত্য বলিল, “মহারাজ, আমি শুনিয়াছি দ্রৌপদী মৃত হইয়াছে । তাহাকে আমি-
রাছে, রাজবাটীতেই আছে ; অনুমতি করেন তাহাকে সম্মুখীন করি ।”

যক্ষরাজ বলিলেন, “তাহাকে ও বরদাকর্ত্তকে আনাও ।”

অমাত্য চলিয়া গেলে যক্ষরাজ নিকটস্থ সিংহলদেশীয় দ্রৌপদীকে বলিলেন, “মাতা-
দেবি, এক্ষণে কি করা উচিত ? মৃত সৰ্ব্বদেশে অবধা, তাহাতে আবার জীলোক,
তাহার কি দণ্ড উপযুক্ত হয় ?”

দ্রৌপদী বলিল, “সে আসিলে তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বখাবিধান করিবেন ।
তবে বরদাকর্ত্তকে মৃত্যু অনুমতি তাহার বক্তব্য শুনিলে ভাল হয় ।”

রাজা ইজিত করিলে জনৈক রাক্ষসকুল্য ব্যক্তি চলিয়া গেল, এক্ষণকপরে আসিয়া
বলিল, “মহারাজ, তাহা দিগের পরাম্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই । বরদাকর্ত্ত আপদি
রাজপুত্রীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আবেগে বিজ্ঞান করিতে গিয়াছে । কোতোয়াল
তাহার বাটীর চকুদিকে প্রবেশী বসাইয়া রাখিয়াছে । সহসা দিল্লীর প্রেরিত দূতের
উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা যাই ন ; অতএব তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা
হইয়াছে ।”

যক্ষরাজ দ্রৌপদীর প্রতি বলিল, “ভাল হইয়াছে, দিল্লীর মুলতান অত্যন্ত বলবান্
বাদসার তাহার সহিত সামান্য বিষয়ে বিবাদ করা সংযুক্তি নহে । কোথা, সে
দ্রৌপদী কোথা ?”

দ্রৌপদী বলিল, “এ দ্রৌপদী কি মহারাজের নিকট উপস্থিত হয় নাই ?”

রাজা বলিলেন, “না, কৈ দ্রৌপদীর কথা আমি পূর্বে কিছুই জানি না, তবে
আমায় নিকট বরদাকর্ত্তমাত্র মহারাজ মানসিংহের পক্ষে লইয়া উপস্থিত হল । আমি
তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া রাজবাটীর নিকটে আবাস দিয়াছি । বরদাকর্ত্ত
এখানে আসিয়াই অনুপমায় ও গজালসের অনুসন্ধান লোহানারার পুনঃপ্রাপ্ত
করে । বাজালীরা অত্যন্ত বঠোরপ্রাণ ; চট্টগ্রাম হইতে লিবারাজি অথবা আসিয়া
লোহানারার কৌশল ও হাতি চাপিয়া ক্রমাগত অবিচলিত জয়লাভ করিয়াছে ; এখানে
যক্ষপুরে তিন বর্ষমাত্র ছিল, আর তিনদিন কেবল দুইমাত্র আহার করিয়াছিল ।
নিরাশ্রয় ভাঙ্গী বাজালীরা আমায়নকে শিকার দিতে পট্ট । পরালের দুই পাল করিয়া
অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিল ।”

মহারাজের বলিলেন, “পরালের দুই বর্ষে প্রশংসায় যোগ্য । পরালতুল্য উপকারী
প্রাণী জন্ত আর কিছুই নাই । পাণ্ডী প্রাণীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু যেখানে
পরাল নাই, সেই দেশে পাণ্ডীর মাত্র । পাণ্ডীর শরীর সুকোমল, অলপেই
বোঝাযিত হয় ও বসন্তে মট্ট হয় । সহজে সহিবের বসন্ত হয় না বটে,

কিন্তু পর্যাল সে বিষয়ে অতুল্য, কোন রোগই জন্মে না। বলশালী পুত্র হুঙ্কার করে।”

রাজা বলিল, “পর্যাল পরিমাণেও অধিক হুঙ্কার দেয়। শুধিরাছি বঙ্গের গাভী কখন কখন দশসের পর্যন্ত হুঙ্কার দেয়। কিন্তু পরালের পক্ষে এমন হুঙ্কার দেওয়া সাধারণ; হুঙ্কার দ্বন্দ্বীও বধেই জন্মায়। গাভীর একসের হুঙ্কার এক হটাক নবনী উঠে হওয়া কঠিন, কিন্তু পরালের একসের হুঙ্কারে আর এক পোয়ার অধিক নবনী উঠেই হয়। মহিম বোধ হয় পর্যাল ও গাভীর মধ্যগত পুত্র। বরদাকঠ পর্যাল হুঙ্কারে পর্যাল দেখিতে আমার গোষ্ঠে গিয়াছিল, পরে পরালের দাঁড়াপিচ্ছিল শব্দ দেখিয়া বহু মহিম যোষ করিয়াছিল। পরে তাহার রোমরাজী দেখিয়া পর্যাল মহিম লঙ্ঘন সাব্যস্ত করিয়াই আমার দিকট আসিয়া চারিটা হুঙ্কার পর্যাল ও একটি পুং পরালের জন্ত বলিলে, আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি। আমার ইচ্ছা মহারাজ মানসিংহের জন্তও কয়েকটি তাল তাল পর্যাল ও গবর ও চমরী পাঠাইয়া দিব।”

নারায়ণী বলিল, “রাজগোড়া মনো পরস্পরের প্রেমবর্জন জন্ত স্বয়ং দেশীয় উপায়ে পদার্থ উলটোকল দেওয়া উচিত। বরদার সন্দেহ কি অপর কোন দূতের কথা উদ্বেগ ছিল?”

রাজা বলিলেন, “না, সে পত্রে এইবার ছিঁই যে, গিল্লীঘরের আদেশমতে বঙ্গরাজ্য কিরিন্দী-দহ্য হইতে মুক্ত করবার উদ্দেশে বাঙ্গালীর আপনয়া সনদীপে আমার প্রধান সেলাপতি পাঠাইয়াছিলাম, তঁহে পোস্তজ নানক কামরা দহ্যর কেটির অধিকার করিয়া থাকা হইতে লরাধম পঞ্জালসকে দূর করিয়াছে। পাশত প্রাপ্ত-র ভ্রমিতে পাইলাম চট্টগ্রাম হইতে বৈশালী নগরীতে বাহবেক। চট্টগ্রাম বধাদিন অবধি আপনার শাসন অবমাননা করিতেছে ও কিরা দর প্রধান আবাস দান হওয়ার সঙ্কাবেদোহা লোক প্রচার পাইয়াছে। রক্ত সিংহাসনাকাজক্ষী অহুশরাম কোষার তাহার অহুসকান পাওয়া যায় নাহ। অতএব যথাকালে আপনকে সমাচার দেওয়া যাউতেছে ও অত্রত্য জনৈক প্রধান আমাত্য সনদশের পক্ষ হাজারী ফোজলার বরদাকঠকে সন্ধি বিগ্রহাদি সমস্ত ক্ষমতা দিয়া পাঠান গেল। তিনি কিরিন্দীর অহুসকান ও শাসন উদ্দেশে চালিলেন। মহারাজ তাহাকে আশ্রয় ও সাহায্য দিবেন। আমরা ত্রয়ার চট্টগ্রামে সসৈন্তে উপস্থিত হইব। আপনার সহিত উক্ত চাকলা সুনরায় বন্দোবস্ত করবার অমতও দিল্লীঘরের আদেশমতে আমার উপর আছে।”

নারায়ণী বলিলেন, “তবে আপান স্ত্রীত্বের সমাচার কোষার পাইলেন? সেটী কী শুণ্ডগাত? সে কি মিথ্রভাবে এ দেশে আসিয়াছে?”

রাজা বলিলেন, “বরদা কল্য আমার দরবারে ঐ সনদ পেষ করিয়াই লোহাদারায়

চলিয়া যায়। তাহারই পর লোহাদারার নাএব আমার নিকট দিল্লীশ্বরের অপর এক জননের অনুলিপি পাঠাইয়া। জনৈক অপর দূতগমনের সমাচার দিয়াছে; এই দরবার হইতে ত্রোহী পর্য্যন্ত তাহার আসিবার ছাড় পাঠান হয়। পরে লোহাদারা হইতে অপর এক কর্ণচারী, যখন গঙ্গালিন ধরা পড়িয়াছে সমাচার আনে, তখন সেই লোক প্রমুখাৎ শুনিলাম যে দ্বিতীয় দূতটী স্ত্রীলোক। এই প্রবাদ একবার রটনা হইবামাত্র গ্রামকূট মহাকোলাহল উপস্থিত হয়। তদবধি কতকগুলি বিদ্রোহী অনুপরাম জীবিত আছে ও তাহার জ্ঞাত অস্ত্রধারণ করিলে দূর্ব্বল লোকদিগের স্বার্থ সিদ্ধ হইবেক, বিবেচনা করিয়া একটি দল বাধিয়াছে।”

মায়াদেবী বলিলেন, “লোহাদারার নাএব, দূতটী স্ত্রীলোক কি পুরুষ বলিয়া কিছুই উল্লেখ মরে নাই। স্ত্রীদূত বুঝিলে এমত অসাধারণ সমাচার অবশ্যই মহারাজকে লিখিত। যাহা হউক স্ত্রীদূত কখন শুনা যায় নাই। সেই অবশ্য চর হইবেক, এই যে প্রহরী আসিতেছে। কি কৈ স্ত্রীদূত আনিলে না?”

প্রহরী বলিল, “মেটা উন্মাদ, তাহাকে মহারাজের সভায় আনিতে সাহস পাইতেছি না; পুনরাগেশ পর্য্যন্ত দোবারিক বাহিরে রাখিয়াছে।” এমত সময় রাজবাটীর নাচে বাহর্দ্দেশে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া গবাক দিয়া দেখিয়া বলিলেন “একি, এটা যে একান্ত উন্মাদ! এ বুঝা যে বিবমবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ঐ কি দূত নাকি?”

প্রহরী বলিল, “হাঁ মহারাজ, ঐ দূতও এখন নগরের ভয়ে মহত্তা ভান করিতেছে।”

রাজা বলিলেন, “যদি ভান করিতেছে তবে লোকে এত ভীত হইয়া তাহার নিকট হইতে পলাইতেছে কেন? তাহাকে ধরিয়া বাধিতে বল।”

রাজা, মায়াদেবী ও প্রহরী রাজবাটীর বিহারে আসিয়া কাষ্ঠসোপানের উপর দাড়াইলে দূর হইতে উন্নতা রেবতী দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া সেই দিকে আসিল।

রাজা বলিলেন, “তুমি কে, এমত বেশ কেন? কোথা হইতে আসিলে, কি চাও?”

রেবতী বলিল, “মহারাজার জয় হউক! অনুপরাম মুক্তক! গঙ্গালিন মরছে! আমিও মরিয়াছি! আমার নাম মা! আমি জগতের মা! আমি ভারত প্রতিপালন বরি! আমি তোমার মা! ঐ মেয়েটী কে গা? অহা খোবনে ও রূপে কি গেরুয়া-বসন সাজে! তুমি লক্ষ্মী—আবার সন্ন্যাসী—কার তুমি রাজমহিষী হও, আমি তোমার ভালবাগি। ভালবাসা ভাল জিনিস। যার ধন নাই তার জিনিস নাই। জিনিষ থাবুলে চেরে ছায়—মনও চেরে ছায়—হাঃ হাঃ হাঃ!” বলিয়া ভীম অটহাস হাসিয়া একটি বুড়ীলাপ খাইয়া লাফাইতে লাফাইতে নাচিতে নাচিতে ওঁৎ কাষ্ঠতুল্য দীর্ঘ হস্তধর বিস্তারিত দূরে চলিয়া গেল। আগুলায়িতবেশী রেবতীর শবের ছায় চুলগুলি বায়-

বেগে উড়িতে লাগিল । কাটীর অধোদেশে একটা রক্তবর্ণ বলাভের পায়লামা পরা । পায়ে লালজুতা, কটীর উজ্জ্বল নয় । শুক লোলমাংস ও তলোকাভুল্য স্তন্যের গমন-বেগে তুলিতে লাগিল ও চট চট করিয়া বক্ষে ও কক্ষে আঘাত হইতে লাগিল । দেবতীর তল্লত বেশ ও ভীষণ চীংকার আর অসাধারণ লক্ষ লক্ষ দেখিয়া ভয়ে গ্রামকূট পথ ছাড়িয়া দিল । রাজা এই মূর্তি দেখিয়া কতকটা চমৎকৃত হইয়া আবার কতকটা রোষ করিয়া বলিলেন । “কি আশ্চর্য! একটা বৃদ্ধা শুকা জীলোক দেখিয়া তোমরা ভয়ে পলায়ন করিলে? সে কি খাইয়া ফেলিবে? প্রহরী, তাহাকে ধরিয়া আন ।”

প্রহরী অঙ্গে অঙ্গে রাজার পশ্চাৎ হইতে কাষ্ঠতোরণ দিয়া নামিয়া গেল । গ্রামকূট বলিল “কোথা যাও ওকে মানুষ যে ওকে ধরিবে । ও নট, ও যুগপর্কতের পেতনী”

মায়াদেবী বলিলেন, “এ ব্যাপারটা কি? ঐ উমন্তার আদ্যন্ত বিবরণ কে বলিতে পারে? ও স্ত্রীটিকে কে এখানে আনিল?”

রাজা বলিলেন, “এ বিষয় তদন্ত করা উচিত । এই কি লোহাদারায় দিল্লীর দূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল?”

মায়াদেবী বলিলেন, “এমত ত বোধ হয় না।” প্রধান জৈনক রাজপুরুষকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, “লেমরু তুমি ঐ পাগলিনীর বিষয় কিছু জান?”

লেমরু বলিল, “মহারাজ, আমি উহার আদ্যন্ত সমস্তই অবগত আছি । যখন লোহাদারায় দিল্লীখয়ের দ্বিতীয় দূত আসিয়া জনন্দ দেখাইল, তখন আমি লোহাদারায় উপস্থিত ছিলাম । আমি রামরি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মঙ্গলোত্তে থাকিয়া নৌকা হইতে অব্যাহি নামাইতেছি, এমত সময় একটি কর্ণালে করিয়া একটি হৃদৃশ বাল্যলী রাজপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হয় । তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে দিল্লীর পত্র দারোগার হাতে দেয় । পরে নায়েবের প্রমুখ্য পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলে তাহার গমনের জন্ত একটা পেণ্ডটাটু আনাইয়া তাহাকে লোহাদারায় পাঠায় । আমিও তাহার সহিত লোহাদারায় বাই । পথিমধ্যে তাহার অভূতপূর্ব্ব অশ্চালনপ্রণালী দেখিয়া আমি চমৎকৃত হই । অব এত বেগে সঞ্চালন করিয়াছিল যে, সে দূত আমার লোহাদারায় পৌঁছবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্ব পৌঁছিয়াছে । তনিলাম যে ওথাকার নায়েবকে দিল্লীর পত্র দেখাইয়া সেখানে অব ত্যাগ করিয়া একটা জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে । লোকে বলে, তাহার সেই দূতরূপী নটকে অন্নই কেয়াস দিয়া যুগপর্কত পার হইতে দেখিয়াছিল । কিন্তু অল্পকণ পরেই সে লাভ অস্ত্রীপের দিক্ হইতে এক মণিপূরী অব করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল । বাহারা তাহাকে প্রথমবার দেখিয়াছিল, সকলেই বলিল যে, দূত ভিতর-বাস্ত্রে ভদ্রপেছা বয়োজ্যেষ্ঠ ও শুক ও লীর্ণকায় বিস্ত্র অধিকতর তেজশালী ও বলবান্-মূর্তি । দূতটি প্রত্যাগমন করিয়া নায়েবের নিকট রোষপ্রকাশ করিয়া অনেক তর্কসমাদি,

করিল ও অমাত্যস্বী আহারাদি করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার পদব্রজে পূর্বমত স্বজাতিস্থ সুন্দর মূর্তি ধরিয়া আনিয়া পূর্ণতাক্ত পেণ্ড অথবা জন্তু বলয় নিয়ে বহুতরঙ্গিত মত কোন উত্তর করিতে পারিল না। দূত তথাকার কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়া অপর একটি পেণ্ড অথ আনাহইয় চলিয়া গেল। মহারাজ এমতে নটটি একবার তরঙ্গরূপে আর একবার এই পাগলিনীর মত বুদ্ধারূপে আবির্ভূত হয়। এটি নট বটে, তাহার সন্দেহ নাই।”

মায়াদেবী বলিলেন, “তুমি কি ইহাকে প্রেতযোনি বল?”

রাজা বলিলেন, “হাঁ নট একপ্রকার প্রেতযোনির মতই বটে। মনুষ্যাদি মন্দির গেল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ধর্ম ও গুণযুক্ত হয়, নট স্বতই সেই সকল গুণযুক্ত। নট কিছু কোন জীবের প্রেতত্ব অবস্থা নহে, নটের জন্মমৃত্যু নাই। নট বাঙ্গালীদিগের দেবতার মত, কিন্তু সর্বদা মানুষ সমাজে ভালমন্দ কর্মে মিশ্রিত হয়।”

লেমরু বলিল, “মহারাজ, নট আমাদের মধ্যে পূজ্যযোনি। কেন না স্বপ্ন ছায়ামুনি বুদ্ধ হইবার জন্ত ওপস্কা করিতে বসিয়াছিলেন তখন নট মার মূর্তিতে তাহার অনেক শাস্তি দেন ও ছায়ামুনি অবশেষে নটের স্তুতিবাদ করিয়া জয়লাভ করেন। নট দুই জাতি, সুনটেরা বুদ্ধগৌতমের সময় রাম্যাবতী নগরী নির্মাণ করিয়াছিল। অথুয়গণ কুনট। তাহার মনুষ্যদেবী। বাঙ্গালীরা তাহাকে দেবদেবী অম্বর বলে। সুনট ব্যাখ্যামা ও অথুয়ের মধ্যপ্রাচীর জীব। বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্ম আছে, তাহার উপর পৃথিবী স্বজনের ভার। বুদ্ধ গৌতম বলেন, ব্রাহ্মণ্ডে কোটি কোটি ব্যাখ্যামা আছে, ব্যাখ্যামা নট হইতে উচ্চশ্রেণী, আবার নট অথুয় অপেক্ষা উচ্চ।”

রাজা বলিলেন, “এটি নট হউক বা দূত হউক এ কোথা গেল তাহার তত্ত্ব লও। বাহার ইহাকে ধরয়া আনিয়াছিল তাহাদিগের আমার নিকট পাঠাইয়া দেও।”

লেমরু বলিল, “মহারাজ, এই সৈনিক তাহাকে ধরিয়া আনে।” রাজা সৈনিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে আচাত্যহার হ্রায় ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিল, অভিবা-
নাদি কিছুই করিল না; তাহার শূন্যদৃষ্টি, আধাবক্ষ্যারত বদন, লোলমাস অধরোষ্ঠ, অবচ্ছ উচ্চাধ, মুণ্ডত মস্তক, কর্মমাক্ত শরীর, ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাদি দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন। তাহার পাখের চারি পাঁচজনের সেইরূপ অবসর বেশ ও অভিজ্ঞত মূর্তি দেখিয়া বলিলেন। “তোমাদিগের এমন অবস্থা কেন? তোমাদিগের বেণী কি হইল?” ব্রহ্ম ও চান্দেন্দ্রীয় লোকেরা বেণী আঁত বস্ত্রে রক্ষা করিয়া থাকে; এমত কি তথাকার গুরুপাপের দণ্ড বেণীর অগ্রভাগ ছেদন। আরাকানবাসীরাও ব্রহ্মদেশীয় প্রমা অঙ্গুলরণ করিয়া বেণী বহু যত্নে রক্ষা করে। বেণীছেদন তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুবৎ অপমান। কয়েকজন সৈনিকের মুণ্ডিত নগণিতের

উল্লেখ করার তাহারা মৃতপ্রায় হইল । পূর্বেই পরাজিত ও ভয়বিধ্বত হওয়ার একপ্রকার হতবুদ্ধি হইয়াছিল । কিন্তু রাজা এত জনসমাজে মৃগুনের শির উল্লেখ করার তাহারা নিরুত্তর হইয়া মস্তক করপুটবারা অবরণ করিয়া ভূমে বসিয়া পড়িল । রেবতীর অনৈসর্গিক ব্যবহারে গ্রামকূটের মনে অপূর্ব ভয় জন্মিয়াছিল, নতুবা মুক্তিভঙ্গির নৈমিত্তিক দর্শনে তাহাদিগের হস্তবস্ত্রের উদ্ভাবন হইত সন্দেহ নাই । মুণ্ডিত শিরে লক্ষ্য পড়িতেই সন্তানের মনে অর্কচর্চনীয় ত্রাণ উদ্ভূত হইল । রাজা মায়াদেবীকে বলিলেন, “এ ব্যাপার কি ? আমি তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ।”

মায়াদেবী বলিলেন, “মহারাজ, চলুন গৃহে চলুন, তথায় স্বীয় আসনে বসিয়া সমস্ত অবগত হইবেন । নটের সম্মুখে আবদ্ধকবচে দাঁড়ান উচিত হয় নাই । রাজসিংহাসনে নটের কি অথুয়ের দৃষ্টি চলে না ?” রাজা মায়াদেবীর বথা শুনিয়া সভাকূটস্থে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, অতীব মনোহর জনৈক যুব। অস্থধারী বিদেশী রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে । রাজাকে দেখিয়া সে সমস্ত্রমে অভিবাদন করিলে, রাজা বলিলেন, “তুমি কে কোথা হইতে আসিলে ?”

রাজপুরুষ বলিল, “মহারাজের ভয় হউক । আমি দিল্লীরের দূত । মহারাজ মানসিংহ বাজালায় আসিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ ফিল্ডীদস শাসন করিবার জন্ত যক্ষরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমায় বৈশালীনাগরীতে পাঠাইয়াছেন । সনদীপ ও রায়গড়ের সংগ্রামে গজালিস প্রভৃতি কএকজনায় পলায়ন করায় তাহাদিগের অনুসরণ করিতে বিশেষ অনুপরামের যক্ষরাজের বিপক্ষে কুপরামর্শ সমস্ত যক্ষরাজকে অবগত করাইয়া সাবধান করণভিলাষে তত্রাত্য প্রধান ও বিশ্বস্ত কন্সচারীও রায়গড়ের মহারাজ বসন্তরায়ের আশ্রয় ব্রহ্মকে পাঠাইয়াছেন । তাঁহার সঙ্গে ও সনদীপের প্রধান মহাজন পুত্র বরদাকণ্ঠকে প্রেরণ করিলে পর এক দৌত্যে সন্ধি বিহের কন্স সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত আশঙ্কায় আমি রায়গড়ের সচিবের সন্তান, আমাকে পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করার অগ্নিও তথা হইতে রওনা হইয়া মহারাজের বিচিত্র রাজ্য দর্শন করিয়া আত্মকে চরিতার্থ করিলাম । সম্প্রতি মহারাজা মানসিংহের পত্র যক্ষরাজ সমীপে অর্পণ করিতে মানস করি । অনুমতি যে মত হয় ।” যক্ষরাজ সুমিত্র মনোহারী কথা শুনিয়া মোহিত হইলেন । বিশেষে দূত যুবর অনৈসর্গিক রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন । “দিল্লীরের দূত যক্ষপুরে সর্বদা স্বাগত । তোমার পথে কোন কষ্ট হয় নাই ? অনুমান করি তুমিই লোহাদারায় নায়েবের দ্বিট হইতে আমাকে সন্ধান দিয়াছিলে । পশ্চিমধ্যে অত্রত্য রাজপুরুষেরা তো তোমার সমুচিত সমাদর করিয়াছে ?”

দূত বলিল, “মহারাজের দৌর্দণ্ডপ্রতাপ শরৎচন্দ্রের মর্যাদিবে, তাহার মিষ্টতা রসপূর্ণ । এমত রাজ্য প্রাণলো আর আমি কৃত্রাপি দেখি নাই ।”

দশম অধ্যায় ।

“যুবা সুবাসাঃ পশ্বিবীত আগাৎ ।”

রাজা দূতের কথা শুনিতেছেন । রাজা দূতের নিকট সমস্ত সমাচার লইতে লাগিলেন । এমনত সময় লেমরু ক্ষুণ্ণপদে ব্যস্ত হইয়া অপর দ্বার দ্বিগত করিয়া বেগে রাজসভায় প্রবেশ করিয়াই অবাক হইয়া গৃহমধ্যে দাঁড়াইল । তাহারই অব্যবহিত পরে পাঁচ সাতজন রাজপুরুষ নষ্টখান হউয়া বেগে সভায় প্রবেশ করিল । মায়াদেবী রাজার সহিত সভায় প্রবেশ করিয়া নবগত নবীনবয়স্ক দূতকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্য কণেক লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইলেন ও এমন বশীকৃত হইলেন যে, তিলেকের ক্ষণ দূতের মুখতী হইতে দর্শন অপসারণ করিতে পারিলেন না । যক্ষরাজ মহারাজা মানসিংহের পত্র পাঠান্তে পুনরায় দূতের প্রতি চাহিলে দূত বলিল, “মহারাজ চট্টগ্রাম অল্প দিন বাবৎ আপনার অধিকার হইতে অপস্থত হইয়াছে । এই বিপ্লবের মূল সেই দুই গঙ্গালিস ও তাহার নারকী ফিরঙ্গী অনুচরগণ । মানসিংহ বাহাদুরের অভিপ্রায় যে, এই স্বাতন্ত্র্যেই ফিরঙ্গী দমন করিয়া চট্টগ্রামে পুনরায় শাসন সংস্থাপন করেন । তাহাতে যক্ষরাজের অভিপ্রায় অবগত হইতে মানস । চট্টগ্রাম অধিকৃত করা সেই জগজ্জয়ী মানসিংহের পক্ষে এত অসম্ভবসাধ্য ক্রিয়া যে তন্নিমিত্ত তিনি যক্ষরাজকে চিত্তোন্মত্ত করাইতে অনিচ্ছুক ।”

রাজা বলিলেন, “হাঁ বহুদিন বাবৎ ফিরঙ্গীরা যক্ষরাজভাণ্ডারে রীতিমত কর আনাগর করে না । তাহারা দণ্ডার্থ হইয়াছে । কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিহ্নিত (১) শত্রুজ্ঞানে আমি সে দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই ।” (আগত লেমরু ও অপরাপর রাজপুরুষদিগের প্রতি) “তোমরা এত ব্যস্ত হইয়া কেন ? সেই বঙ্গদূতবেশধারী পাগলিনী কোথায় ?” লেমরু কণেক নিরুত্তরে থাকিয়া পরে সাহস করিয়া বলিল, “মহারাজ ! এই সে পাগলিনী । মহারাজ সাবধান ! ইহাকে বিশ্বাস করিবেন না । ইহার মত মায়াবী আর কেহই নাই । এ কণে কণে মূর্তি পরিবর্তন করে । এই বুদ্ধা পাগলিনী, আবার এই যুবা বঙ্গদূত ।”

রাজা এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন । মায়াদেবীর দিকে চাহিলেন । মায়াদেবী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে মস্ত পাঠ করিতে লাগিলেন । রাজা মায়াদেবীকে ভীত দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হইলেন । বঙ্গদূত সভায় সমস্ত সত্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সকলকে বিষয় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া বলিল, “মহারাজ নিশ্চিন্ত হউন, জয়ের কোন কারণ নাই । আমি নট নহি, একান্ত মনুষ্যজাতি । আপনার রাজ-

পুরুষেরা মুখ্যতঃ-মূলভ্রমে ভীত হইয়াছে । আমি সে পাগলিনী নহি । আমি সে পাগলিনীকে দেখিয়াছি, সেও প্রকৃত মনুষ্য ।”

লেমর বলিল, “মহারাজ ! আমরা এইমাত্র সেই পাগলিনীকে অনুসরণ করিতে করিতে রাজবাটীর অন্তরদ্বারে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, আর সেই বৃদ্ধা পাগলিনী গৃহে প্রবেশ করিবারাত্র পুরুষবেশ ধারণ করিয়া মহারাজের সম্মুখীন হইয়াছে । মহারাজ, আমরা যখন প্রথমে ঘোমপর্দার দ্রোণিতে ইহাকে এই বেশে ও এই মুর্তিতে ধরি, তখন কিছুদূর আমাদিগের সহিত অবশে এই বেশে আসিয়া দ্রোণীর প্রান্তরে একটা কন্দরমধ্যে লুপ্ত হইয়া যায় । পরে ক্ষণেক সেই কন্দরের নিকট দাঁড়াইলে ইনি বৃদ্ধা ক্রীবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের সহিত নানাবিধ পাগুলামী করেন । ইহার সঙ্গে আর হইজন ছিল, তাহারা যে কোথায় গেল আর কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারি না ; অনুমান করি, তাহারা ইহার শরীরে লীন হইয়াছে । মহারাজ, বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু ইহার অপায়ণীলা ! কিছুদূর আমাদিগের সঙ্গে সেই পাগলিনী বেশে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হওয়ার পাগলিনী একটি গাছে উঠিয়া গেল, আমরাও সেই গাছের নীচে থাকিতে থাকিতে গাছ হইতে একটি ভালুকবেশে আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইল — আমরা পলায়ন করিলাম । তদবধি ইহাকে দেখি না, সে বজ্রের লোক হুটিও নাই — সেই পাগলিনীও নাই—কেহই নাই । সেই অবধি হতবুদ্ধি হইয়া আমরা রক্ত নগরীতে কিরিয়া আসি ; এখানে আসিয়া আবার পাগলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, আবার তাহার অনুসরণ জন্ত মহারাজের আদেশ পাইয়া পশ্চাৎদিকে এই থানে প্রথম মূর্তি বঙ্গদূত দেখিলাম । মহারাজ ইহাকে বহিষ্কৃত করুন, আপনি কখন ইহার মায়ায় মুগ্ধ হইবেন না ;—ইহার সহিত কথা কহিলে এ আপনাকে মুগ্ধ করিবে ।”

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, আপনার রাজপুরুষের বিপক্ষে আমার অনুযোগ করা উচিত নহে, তবে যখন ইহারা এত ভীত হইয়া অজ্ঞানের মত কথা কহিতেছেন, তখন মহারাজকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক । মহারাজ, রাগগড় হইতে বরদাকর্ষ, বরদ ও ভজহরি নামক তিনজন মহারাজ মানসিংহের আদেশমতে গজাঙ্গি ও অনুপরামের সমাচার লইয়া যক্ষপুরে বাত্মা করিলে পর, আমি একক তথা হইতে স্বতন্ত্র অবশে, পূর্বগত দূতদিগের অজ্ঞাতে রাগগড় হইতে রঙনা হইয়া মৎসঙ্গ ও লৌহধার পার হইয়া বমজোণিতে লেমরর দলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার, তাহারা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার গতিরোধ করে ; আমি বঙ্গদূত, দূত সর্কিত অবধ্য বলিয়া নানাপ্রকার বুকাইলাম ও বলিলাম যে, আমি রাজ্যের প্রয়োজনীয় সমাচার লইয়া যক্ষরাজার নিকট যাইতেছি ; কিন্তু কিছুতেই মানিল না, আমার শরীরে আঘাত করিবার উপক্রম করিলে, আমি

একবার মনে করিলাম যে, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে হঠাইয়া দিই; কিন্তু যখন দেখিলাম যে তাহারা আমাকে যক্ষপূরে লইয়া আসিতে প্রস্তুত, তখন অকারণ রক্তপাত নিশ্চেষ্টয়োজন জানিয়া তাহাদিগের সহিত একত্রে যক্ষপুরাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে তাহারা তারি ও মধ্যপানে মস্ত হইয়া পড়িয় রহিল। আমি ক্রমশঃ যক্ষপূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি যান বোম্বকন্দর হইতে বহির্গত হই তখন ঐ পাগলিনীকে দেখিতে পাই। আমার অনুমান যে লেমকু মচেতন হইয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অবেষণ করে; পরে ঐ পাগলিনীলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মস্তগণ্ডিত বুদ্ধিজডহেতু ভীত হইয়া এই সকল ঐক্যনৈতিক রূপক কল্পনা করিয়াছে। আমি এখনও বন্দীকর্ত্ত, বল্লভ ও ভক্তহরির সহিত সাক্ষাৎ করি নাই; অনুমতি হয়, মহারাজের প্রাণ্ডস্তর লইয়া অদ্যই আমি রায়গড় প্রত্যগমন করি; তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবারা বলস আমার সহবেক না।”

রাজা বললেন, “লেমকু, তুমি এখন স্থানান্তরে যাও। মায়াদেবী, আমরা দিল্লী-বরের প্রস্তাবে কি উত্তর দিতে পারি?”

মায়াদেবী বললেন, “বহুকাল যাবৎ চট্টগ্রাম ফিরাজ বশবর্তী হইয়াছে, এক্ষণে দিল্লী-বরের সহায়তায় ফিরাজ দমন হইলেই, উভয় রাজ্যের মঙ্গল।”

রাজা বলিলেন, “পূর্বে ফিরাজদিকে বনবাদ করিতে চট্টগ্রামে স্থান দেওয়াই অবোধের কৰ্ম্ম হইয়াছে। কৃতঘ্নেরা এখন আশ্রয় পাইয়া সেই তরুর মূল ছেদন করিতেছে। অতএব দিল্লী-বরের প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ মত; দূত! তুমি মহারাজ মান্নাংকে এই সমাচার দিবা। গজালসের সমাচার কিছু অবগত আছ?”

বজ্রদূত বলিল, “মহারাজ, পাথন্থে গজালিস ধরা পাড়িয়াছে শুনিয়াছি; অনুপরাম কোথায়—বিছু বলিতে পারি না; অনুমান কার, আমি তাহাকে জ্ঞাপিত করিয়া উরুভঙ্গ করিয়াছি।” দেবতী পূর্ব্ববেশে অন্তর্দ্বার দিয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বলিল, “অনুপরাম জন পুঙ্গবশ ধারণ করিয়াছে; সে মনস্তদহের কোয়াঙ্গে ছিল; যখন গজালিস ধৃত হয়, সে সেই অবকাশে অক্ষকারে পলায়ন করে। এই বজ্রদূত অকস্মাৎ তাহার উরুভঙ্গ করায়, সে নিকটস্থ ভূত হইতে গড়াইয়া নদীর গর্ভে বালুগাচয়ে পড়িয়া অচেতন হয়। আমি সেই নদীতীরে বেড়াইতেছিলাম, নিকটে গিয়া দেখি যে, মাতাছাড়া অনুপরাম!—তাহার চক্ষে মুখে জল দিয়া চেতনা হইলে, তাহাকে আমি সেইখানে রাখিয়া বজ্রদূতের অবেষণে আসিয়াছি। অনুপরামের চলৎশক্তি নাই, লোক পাঠাইলেই ধরিবে। আমি বড় খুসী আছি—আহা! অকস্মতীর কি দশাই বাধিল;—পাপী কষ্ট পাইবেক! রাজা শেলাম চলুম।” এক লক্ষ্যে অন্তর্দ্বার দিয়া চলিয়া গেল

রাজা বলিলেন, “এত পাগল নহে, দিব্য সজ্ঞানের মত কথা কহিল । এ অস্ত্রধারি
দিয়া কেমনে আসিল ? আমি এক্ষণে বুঝিলাম যে, কেবল মানকপানে জ্ঞানশূন্য
হইয়া লেমক ভয় পাইয়াছে । যাহা হউক, মায়াবী ! আপনি অনুপরামকে ধরিয়া
আনিবার জন্য রাজপুরুষ পাঠান । এক্ষণে বঙ্গদূতকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিই ।”
(বঙ্গদূতের, প্রতি) তুমি মহারাজ মানসিংহকে বলিবা যে, তাঁহার প্রস্তাবে আমার
মত আছে । ”

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজার জয় হউক ! আমি আপনার আদেশ মানসিংহকে অব-
গত করাইব ; কিন্তু চট্টগ্রামের বন্দোবস্তের বিষয়ে মহারাজের কিরূপ অতিশ্রী ?
দিল্লীর সৈন্তাধারী ওখাকার দহ্মাদমন ও শাদনসংস্থাপনে মহারাজার পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ
সহায়তা আবশ্যক । দিল্লীর ঈশ্বরজানিত অধিপতি, তাঁহার মাশরুকা করা মহারাজ-
কুল্য অতুলবিক্রম নৃপতির কর্তব্য । মানীর গাফ রক্ষা মানী লোকেই জনে ; বাহার
মান নাই সে মানীকে মান দিতে প্রস্তুত থাকে না । আপনার রাজ্যে হস্তী ও গয়াল
বধেই ; সাহায্য বা উপঢৌকন অথবা প্রীতিলানস্বরূপ বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ অত্রদেশস্থলত
সামান্য মূল্যের দ্রব্য পাঠাইলে ; অনুমান করি, কল্যাণসে চট্টগ্রামস্থ ফিরঙ্গীদহ্ম শাসন
ও স্থায় সংস্থাপন হয় । মহারাজের যে মত অভিরূচি : ”

রাজা বলিলেন, “আমিত তাহাই চিন্তা করিতেছি ; দিল্লীররকে চট্টগ্রামের দেও-
মানীর পুরস্কারস্বরূপ কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক । মায়াদেবী কোথা গেলেন ? ”

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, আমি সাহস পাই না, কিন্তু বঙ্গ যে সকল দ্রব্য আপনার
প্রতিপত্তী হইতে পারে, তাহা আমি বিশেষ তাগত অছি ; অনুমতি করিলে নিবেদিত
পারি । ”

রাজা বলিলেন, “ভাল বলিয়াছ, বঙ্গরাজার প্রিয়দত্ত কি ? ”

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, গজদন্ত, হস্তী, গাণ্ডকীখড়্গ ও চন্দ্র, মনিপুরে টাটু, দুষ্ক-
বতী গয়াল, ব্যাজ্রচন্দ্র ও নখ, লোহাকাঠ প্রভৃতি দ্রব্য—বঙ্গের আদর বধেই । ”

রাজা বলিলেন, “এ সকল ত এখানে অনায়াসলভ্য । ভাল, বর্ষে বর্ষে হাতী
এককুড়ি, গজদন্ত, এককুড়ি খড়্গ ও একশত চন্দ্র, পঁচিশটা মনিপুরের টাটু, দুইটা
দুষ্কবতী গয়াল, এককুড়ি ব্যাজ্রচন্দ্র ও নখ ও একশত খণ্ড লোহাকাঠ পাঠাইয়া দিবা । ”

বঙ্গদূত বলিল, “বধেই হইয়াছে দিল্লীর এই সকল দ্রব্যে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ
নাই । আদেশ হইত আমি বিদায় হই । ”

রাজা বলিলেন, “হাঁ, তোমার পুরস্কার লইয়া বাইও । ”

বঙ্গদূত শির নোয়াইয়া বিদায় হইয়া যত্ন হইতে বাহিরে আসিয়া আবার কিরিরি গেল ।

রাজা বলিলেন, “কি সমাচার ? ”

দূত বলিল, “মহারাজ, পথে বন্যাপি সমস্ত দ্রব্যের নাম স্মরণ না থাকে, তাই বলি, কৃপা করিয়া একটা সনন্দ দিলে ভাল হয় ।”

রাজা বলিলেন, “ভাল, আমার মীরমুনসীকে ডাকাও ।” কিছুক্ষণে মীর মুনসী আসিলে রাজা বলিলেন, “বঙ্গের দূতের অভিপ্রায় মত পারসীক ভাষায় একখানা সন্ধিপত্র লিখিয়া আন, আমি স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিব ।” মীর মুনসী ও দূত চলিয়া গেল । ক্ষণেক পরে রীতিমত এক সন্ধিপত্র লিখিয়া উপস্থিত করিল । তাহার চট্টগ্রামের প্রদেশ দিল্লীরবের শাসন অস্ত্র ছাড়িয়া দেওয়া হইল ও যক্ষদেশ রক্ষাজ্ঞ বার্ষিক উল্লিখিত দ্রব্যাদি উপঢৌকন স্বরূপ দিতে স্বীকার করিলেন । রাজা সেই সন্ধিপত্রে ব্রহ্মাক্ষরে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া মুদ্রাঙ্কন করিয়া দিলে, বঙ্গদূত সন্ধিপত্র লইয়া শিরে রাখিল ও রীতিমত পুরস্কার সহিত দপ্তর হইতে স্বদেশ প্রত্যাপন ছাড় লইয়া রাজবাটী হইতে চলিয়া গেল । যক্ষপুরে রাজারে যাইয়া পূর্বাগত দূতদিগের অধেষণে তাহা-দিগের বাসস্থানে চলিল ।

এদিকে প্রাতঃকাল হইতে বজ্রভ, বরলাকর্ষ ও ভজহরি স্ব স্ব বেশভূষা করিয়া রাজবাটীতে গিয়া পৌছিল । পরে তাহাদিগের সঙ্গে রাজপুরুষ দেখিয়া ভজহরি বলিল, “মহাশয়, আমাদিগকে এ অসভ্য মগেরা নজরবন্দী করিয়াছে । এক রাত্রিতে একরূপ ভাবের ব্যত্যয়ের কারণ কি ?”

বজ্রভ বলিল, “ইহাদিগের আচার ব্যবহার কিছুই বুঝিতে পারি না । এ অসভ্য-দিগের রীতিনীতি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি । সে যাহা হউক, গজালিসকে আনিয়াছে ?”

ভজহরি বলিল হাঁ, তাহাকে লইয়া এই রাজবাটীর দিকে গেল । তাহার সহিত এত গ্রামকূট লাগিয়াছে যে, পথে লোকারণ্য । সকলেই তাহাদিগের গালীগালাজ দিতেছে, কেহ ধূলী ছড়াইতেছে, কেহবা ইট মারিতেছে, এমন অবস্থা করিয়াছে যে, তাহাদিগের জীবন সংশয় । গজালিসের সঙ্গে হজুরমলও ধরা পড়িয়াছে । আমরা রাত্রির অন্ধকারে গোলযোগ বুঝিতে পারি নাই । ফিরিঙ্গীবেশধারী সে দীর্ঘাকার লোকটি হজুরমল । আজ প্রাতে যখন রাজমার্গ দিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায়, তখন আমি চিনিয়া বলিলাম ‘কিনো হজুরমলসাহেব, এখন বেগম বাহাদুর কোথায় আর পোলাওয়ের খুঁকা কোথায় ? তাহাতে সে বলিল, ‘যদি ঈষৎ অবগত হইতাম ত দেখি-তাম রায়পুত্রের রাখালের কি কমতা !’

বরলাকর্ষ বলিল, “আমি তাহাকে বিশেষ চিনি না বলিয়াই রাত্রিতে বুঝিতে পারি নাই । চল রাজসভায়, দেখা যাক কি হইতেছে ।”

ভজহরি বলিল, “যাহা হউক, আমাদিগের অন্যাই এখন হইতে ফিরিয়া যাইতে

হইতেছে । আর এ অঙ্গলে থাকা পোষায় না । তবে হজুরমলের একটা শান্তি দেখিবাঁ ।
গেলেই ভাল হয় ।” তাহারা রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, শুনিল যে, রাজাজ্ঞায় বন্দীরা
কঠিন কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে ; অনুপরামেব আগমন পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রাণদণ্ড
হইবেক না ;—সকলের প্রাণ দৈন্য প্রাণস্বাস্থ্যে নষ্ট করা হইবেক । এই সমাচার
পাইয়া তাহারা দ্বার হইতে প্রত্যগত হইয়া বাজারের দিকে গেলে, একজন রাজপুরুষ
আসিয়া বলিল, “সহাশয়েরা কোথায় যাইতেছেন—আপনাদিগের বাজারে যাইবার
আদেশ নাই ।”

বল্লভ বলিল, “কেন, আমরা দিল্লীর দূত, আমাদিগের অগম্য স্থান কোথাও নাই ।”

রাজপুরুষ বলিল “না, আপনারা নজরবন্দী আছেন । এই মার্গপার হইবার অনু-
মতি নাই । এই মার্গের পূর্বে যতদূর ইচ্ছা বেড়াইতে পারেন ।”

বরদা বলিল, “কেন, আমাদিগের নজরবন্দীর কারণ কি ? তুমি জান আমরা
কে,—আর কাহার দূত ? দূতের অগম্য স্থান কোথাও নাই । আমরা অবশ্যই যাইব ।”

রাজপুরুষ বলিল, “মহারাজের আদেশ ছিল যে, তোমাদিগকে মাত্তের সহিত ব্যব-
হার করি, কিন্তু তোমাদিগের স্বীয় অহঙ্কারে, সে অনুগ্রহ আর চলে না । আমি
তোমাদিগকে কোথাও যাইতে দিব না । তোমরা দূত নহে, ছদ্মবেশী চর । প্রকৃত
বজ্রের দূত রাজার নিকট উপস্থিত আছে ।”

বল্লভ বলিল, “সে আবার কি ? বজ্রের অপর দূত কে আসিল ? আমাদিগের
আসিবার পূর্বেই অপর কোন দূত পাঠান হয় নাই । এ ব্যাপারটি সন্দেহহৃৎক ।”

ভজহরি বলিল, “এ আমার বোধ হয় গাঞ্জালিসের খেলা । আমাদিগের আসিবার
সম্বাদ পাইয়া—আমাদিগের উদ্দেশ্য নষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে—অনুমান করি,
কাহাকেও দূত সাজাইয়া পাঠাইয়াছে ।”

বরদা বলিল, “বাহা হউক, এ বিষয় তদন্ত করা আবশ্যিক । এ বিদেশ, এখানে
নিশ্চিত হইয়া থাকা উচিত নহে ।”

বল্লভ বলিল, “বিশেষে অসভ্যমণ্ডলী, ইহাদিগের কোন বাণ্ডুজান নাই, ইহারা
সকল প্রকার অত্যাচার করিতে পারে ।”

বরদা বলিল ; “ভাল, তবে আমাদিগের রাজসম্মুখে লইয়া চল ।”

রাজপুরুষ বলিল, “এখন রাজদরবারে যাইবার সময় নহে । এখন রাজা সংহল-
দৈন্য পূর্ণ লইয়া রাজকোষাঙ্গে উপাসনা করিতে গেছেন ; এখন সাক্ষাৎ হইবেক না ।
কল্যাণ প্রাতে তাঁহাকে জানাইব, পরে যদি আদেশ করেন লইয়া যাইব ।”

বরদা বলিল, “ও কোন কাজের কথা । নহে, আমরা অদ্যই রাগগড়ে রওনা হইব,
আমরা আর বিলম্ব করিতে পারি না । আমাদিগের যে উদ্দেশ্যে আসা তাহা সিদ্ধ

হইয়াছে—পাণ্ডী গঙ্গালিস ধরা পড়িয়াছে। এখন আমাদিগকে ত্বরান্বিতভাবে বাইরা মহাত্মক মানসিংহের নিকট সমস্ত জানাইতে হইবেক। তিনি আমার অবিলম্বে বর্জমান যাত্রা করিবেন।”

রাজপুরুষ বলিল, “আমি ও সকল কিছু বুঝি না। এখন বাসার চল।”

বল্লভ বলিল, “আমরা আসার বাইব না।”

রাজপুরুষ বলিল, “আমি বলপূর্বক লইয়া যাইব। তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নহে। তোমাদিগের আপন দোষে কারাবদ্ধ হইতে হইবেক।”

বরদাও বলিল, “কাহার সাধ,—মানসিংহের দৃতকে কারাবদ্ধ করে!”

রাজপুরুষ বলিল, “কে তোমার মানসিংহ?—আমরা তাহাকে জাদি না। আমাদিগের যক্ষরাজ্যের আদেশমত আমরা কৰ্ম্ম করিয়া থাকি; যক্ষরাজ্যের অনুমতি পালন করিব।” দূরে অপর চারিজন রাজপুরুষকে দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিলে, তাহারা নিকটে আসিলে ‘চল, এই তিনজনকে ধরিয়া কারাগারে দি’, এই কথা বলিলে, তাহারা আসিয়া বরদাকর্ত্তের স্বকলেশে হাতদ্বিধাযাত্র বরদা কটীত তরবারি খুলিয়া বলিল, “অন্তরে থাক,—নিঃশেষে আসিলে তোমার নেড়ামাথা স্বস্ত হইতে ভূমে পাড়িবে। অপর প্রহরী বরদাকে তরবারি উঠাইতে দেখিয়া স্বীয় হস্তে লাঠী দিয়া বরদায় কনুয়ায় এমত বেগে আঘাত করিল যে, বরদার হস্ত হইতে তরবারি খুলিয়া বাহ্যে করিয়া ভূমে পড়িল। অপর একজন প্রহরী সেটি উঠাইয়া লইল। ইত্যবসরে বাজারের লোকেরা একটা হেঙ্গাম দেখিয়া মহাশয় করিয়া বহুদূত তিনজনকে আসিয়া বেরিল। বল্লভ ও ভদ্রহরি যদিচ বরদাকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রাস করিল, কিন্তু কোন অস্ত্র সঙ্গে না থাকায় ও অনেক লোকের জনতা হওয়ার ও এরূপ বৈরঘটনা অসম্ভব জ্ঞানে অপ্রস্তুত থাকায়, শীঘ্র পরাজিত হইল ও তিনজনেই প্রায়কূটের প্রহারে ও প্রহরী ও রাজপুরুষের বলে পরাস্ত হইয়া ভূমে পড়িল। কিন্তু কণমাট্রে বেল্লপ বীৰ্য্যপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার মনমণ্ডলীতে এমত অমির্ভটনীয় শক্তি অদ্বাইয়াছিল যে, তাহারা ভয়ে মৃত-প্রায় ভূমে পতিত তিনজনের নিকট সহসা কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করিল না! দূর হইতে ধাতার দিয়া দাঁড়াইয়া গুলিল। ইতিমধ্যে লক্ষিপত্র লইয়া সুবাদূত স্বীয় অশ্বে যক্ষরাজ্য পুরস্কার লইয়া মহাসমারোহে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সঙ্গে অনেক প্রধান প্রধান রাজপুরুষ তাহাকে নগরের প্রান্তর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিবার তত্ব তাহার সহিত ছিল। বহুদূত দূর হইতে বাজারের নিকট লোক সমাগম ও ছত্রবেশী ফিরঙ্গী ইত্যাদি শব্দ পাইয়া বলিল, “এ কিসের গোল?” একজন-প্রহরী আসিয়া বলিল, “মহাশয়, তিনজন ছত্রবেশী ফিরঙ্গী-বলের দূত বলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত প্রহরীদিগের গোলযোগ হওয়ার মারামারি হইয়াছে।”

যুবদূত তুমি বাতে সেখানে দিয়া বরদাকঠ, বলত ও ভজহরি অবস্থা দেখিয়াই ইজিত করিলে, প্রহরীরা গ্রামকূটে অস্তর করিয়া দিল। যুবদূত অথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জল আমাইয়া পরং বস্ত্রের মুখে ও ঢাকে জল দিকন করিয়া ভালরূপে ব্যঞ্জন করিলে, বলত সংজ্ঞা পাইয়া চক্ষুঃশিশির ধরিয়া যুবদূত পতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিল,—“কিছুই বুঝিতে পারি না; কখনে এতু দ্বিত করিয়া থাকিরা আবার চক্ষু চাহিয়াই বসিল, “ধন্য,—না সত্য!” যুবদূত বলতকে সংজ্ঞা পাইতে দেখিয়া অনেক রাজপুরুষকে তাহার শুভ্রাধা কণ্ঠে বলিয়া ভজহরি ও বরদাকঠকে সচেতন করিলে ভজহরি বলিল, “কে না, পূর্বের অমর!” যুবদূত তাহাদিগকে সচেতন দেখিয়া স্বীয় অর্থ আদ্যোহন করিয়া নিকটস্থ প্রধান রাজপুরুষকে বলিল, “ইহারা প্রকৃত মনের দূত বটে; এই আমার ছাড়ে ইহাদিগের ছাড় আছে; যক্ষরাজ ইহাদিগের একমুহুরত্বই হইয়াছে শুনিবে মহাক্রোধ করিবেন, অতএব তুমি ইহাদিগকে লাতুনা করিয়া উদযুক্ত বস্ত্রাদি ও অর্থ দিয়া আমার পশ্চাতে প্রেরণ কর; আমি অল্পে অল্পে নদী পার হইয়া নদীপারের কোরমে ইহাদিগের লজ্জা প্রতীক্ষা করিব। দেখিও ইহাদিগকে বিপদ করাইও না।” রাজপুরুষ সসন্ত্রমে চলিয়া গেলে, যুবদূত অল্পে অল্পে বার ভাঙ্গালন করিল ও মনোমণে বস্ত্রের দিকে করিয়া ফিরিয়া চাহিতে ছাগিল; ক্রমে জ্যেষ্ঠিতে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রাজপুরুষদিগকে বিদায় দিয়া নিকটস্থ রক্ষক বায় অথ বন্ধনপূর্বক ভূমে নামিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল, “বিধাতার ভবিতব্য কেহই ঞ্জাইতে পারে না;—আমি তাহাকে হক্ষা করিতে করিতে আলিলাম, আর পরে যাবার সময় বিপত্তা কি বিপদ ঘটাইল। আহা! বলত কতই কষ্ট পাইয়াছে, কতই বেদনা লাগিয়াছে! ঈশ্বরের অনুগ্রহে কোন অজ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোমল অঙ্গ আঘাতে নীলী হইয়াছে! মরণো যেমত কাপুক্ষ্য আবার তেমনি নির্দয়হৃদয়, এমত ক্রুর আর কোন জাত নহে। বলত আমাকে চিনিতে পারে নাই। এ বেশ সহজে চেনা যায় না, তাহাতে আবার এদেশে আমার আলাই অসম্ভব। এখনও একপ্রকার পরিভ্রাণ হইল। কিন্তু মহারাজ মানসিংহের নিকট কি হইবেক, জগদীশ্বর জানে। আমি সে সম্বাদ্য শুনিয়া অশ্রু চিন্তায় আর ছিন্ন নাই। আহা! এই কারণেই আমার বলত বাবজীবন অল্পে কাটা হইয়াছে,—এই মমোবাধাই তাহার শূলবেদন। আমি তখন বুঝিতাম না—সে যে বলিত যে আমার সঙ্গে তাহার কখন মিলন সম্ভবে না,—তাহার কারণ এই। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ কি? সে জানে না যে, পাপ প্রতাপাদিত্য এত বঠিনপ্রাণ,—যে জানে না যে, বিমলা এমত রাক্ষসী। কিন্তু সে ঈশ্বর দিবার পরই অনুমান করিয়া থাকিবেক, নতুবা এত বনস্তাপ কিসের? নে যে ভেদে-ভেদে এ হেন মারকীয় নৃশংস কর্ণে

হস্ত দিয়া জন্মের তরে যৌর আশ্বাকে কলুষিত করিবে, ইহা অসম্ভব। রেবতী সমস্ত অবগত আছে। আহা! এই সকল দেখিয়াই তাহার জ্ঞানত্যাগ হইয়াছে—মন এত শোক ও কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম! কিন্তু রেবতী বড় বুদ্ধিমতী—কাতের সময় দিব্য জ্ঞান প্রকাশ পায়। তাহারই বুদ্ধিমোশলে আমি অব্যাহতি পাইলাম ও কৃত-কার্য্য হইয়াছি। ধেরূপ সন্ধিপত্র পাইয়াছি, তাহার অবশ্য মহারাজ মানসিংহ সম্বন্ধে হইবেন। মগেরা একান্ত মুর্থ, ইহাদিগের কোন বিবেক নাই। বাহা হউক, রেবতী এখানে কি প্রকারে আসিল? যেমন আবার রক্ষকের স্তায় যথাযোগ্যকালে উপস্থিত হইয়াছিল! সে এখন কোথায়? তাহাকে পাইলে ছুটা মনের কথা কহি। সে আমার সমস্ত মন্ত্রণা অবগত আছে। তাহাকে এ সকল কে বলিল? সেই ত পথে গাছের ছায়ে বসন্তের গতির বিষয় লিখিয়া ছিল; সেই ত আমার পথ দেখাইয়া আনিয়াছে। আমি যখন পথবিষয়ে সন্দেহ করিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়াছি, তখনই দেখি যেন কে আমাকে অঙ্গুলি দিয়া পথ দেখাইয়াছে। অনুমান করি, মৎস-দেহের কোণারূপে সেই গজালসকে দেখিয়া বসন্তকে সমাচার দিয়াছিল; আবার সে বলিল, সেই ১২-রূপেরে বাঁধিয়া আসিয়াছে। আমাকে যখন মন রাজপুত্রেরা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ধরিয়াছিল, তখনই মনে করিয়াছিলাম যে, বিধাতা আমার অন্তিমকাল উপস্থিত করিলেন। অসভ্য ও কদাচারী মগমধ্যে একাকিনী পুংবেশধারী স্ত্রীলোক আশ্রয়ক্ষয় এতটা অক্ষম। তখন কি সময়েচিত ব্যবহারই হইয়াছিল! রেবতী কেমনে জানিল যে, আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে! আমি যখন কমলদরীতে প্রবেশ করিলাম, যখন রায়ে ১২ জন নৃশংস মগরাজপুত্রের খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন আমার আশ্রয়ত্যাগ মনে হইয়াছিল—তখন বিধাতাকে স্বরূপ করিয়া আমি বাণী কর্ত্তব্যক নিয়োগ করিতে উদ্যত! রেবতী আমার মাতার হৃদয় ব্যর্থ করিল। পরীর অন্তরাল হইতে আসিয়া আমার হস্ত ধরিলে, আমাকে যেন প্রাচীন নীতিদর্শকের স্তায় বক্তৃতা করিল, বলিল, ‘এখন নিশ্চিন্ত থাক, মগেরা মন্যপান করিতেছে, তাহারা এক্ষণেই অচেতন হইবেক;—তাহাদিগের মধ্যে এমন মাদক বকাল দিয়াছি যে, এক এক বিন্দু পান করিলে ওরাই মৃতপ্রায় হইবেক।’ আমাকে পলায়নের পথ দেখাইয়া গেল। আপনি তাহাদিগের কুসংস্কারের সুযোগ নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখাইয়া নট বলিয়া বিশ্বাস বরাইল। স্বল্প অসুতোভয়ে তাহাদিগের সহিত নানাবিধ ছলনার যজ্ঞপুত্র পর্য্যন্ত কখন দৃষ্টভাবে, কখন অদৃষ্টভাবে চলিল। আবার রাজার নিবট স্বাকালে দেখা দিয়া আমাকে অন্তর্দ্বার দেখাইয়া কেমন অন্তরালে রহিল! হায়! এ যাত্রা রেবতী না থাকিলে আমার কোন উপায় থাকিত না। রেবতী! তুমি আমার মা! একবার আমার মনের অভিলাষ তোমার দেখি।”

যুবাদূত এই প্রকার নানাবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসন্ত, ভজহারি ও বন্দাকঠের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় দরার উর্দ্ধস্থ ডুগু হইতে অগ্নি অগ্নি রেবতী পল্লব রুলাইয়া ক্রমে যেন ভূমে খসিয়া পড়িল । যুবাদূত অকস্মাৎ ভূগর্ভ হইতে মনুষ্যপতনে, চমৎকৃত হইতে না-হইতে রেবতী যুবর গলদেশ ধরিয়া মস্তকে চুম্বন করিয়া বলিল, “প্রভাবতী, এই তোর রেবতী, কোন চিন্তা করিস না; যখন বিপদে পড়িবি তখনই তোর রেবতী তোরই কণ্ঠে আছে। না! না! না! আর না! বাড়িবাড়ি কিছুই নয়!” বলিয়া দ্রুতপদে দ্রোণীর অপর দিকে চলিয়া গেল । প্রভাবতী যেন স্বপ্নোখিতের ছায়, যেন নববিদেশিনীর ছায়, যেন সহসা লজ্জাধি নরিত্রের ছায়, যেন প্রাপ্তচক্ষু জগন্ময়ের ছায়, বিহ্বলা হইয়া কতক্ষণ সেই দ্রোণীর প্রস্থরের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহা জ্ঞান নাই; পরে নিঃশেষে অশ্রুপদশব্দে চৈতন্য পাইয়া ব্যস্তে স্বীয় অশ্রু আরোহণ করিয়া এক বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল । ক্রমে পদশব্দ নিকটস্থ হইলে, ক্রমে ভজহারি বসন্ত ও বন্দাকঠকে দেখা গেল, ক্রমে তাহারা দ্রোণীতে প্রবেশ করিল । প্রভাবতী তাহাদিগের সহিত এক্ষণে সাক্ষাৎ করা উচিত কিনা চিন্তা করিতে করিতে দেখেন যে, দ্রোণীর অপরদিক হইতে একটা মনোপুরী টাট্টতে রেবতী আসিয়া বসন্তকে বলিল, বসন্ত, চল আমরা ফ্যোরাঙ্গে না গিয়া একেবারে নাভ-অন্তরাপের দিকে যাই, দেখিবে মানসিংহের উপচৌকমের পোত প্রস্তুত হইতেছে ও আমাদিগের কণ্ঠাল সেখানে প্রস্তুত আছে, একেবারে রায়গড়ে পৌঁছিব । পথে কোন ব্যক্তি আমাদিগের সঙ্গে মিলিবেক, কিন্তু তোমাদিগকে কণ্ঠালে স্ব স্ব চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবেক ।”

বসন্ত বলিল, “রেবতী, তোমার কৃপাতেই আমরা পদে পদে উদ্ধার হইয়াছি । তুমি যেমত আজ্ঞা করিবে তাহার অশ্রুতা করিব না । কিন্তু—বাজারের নিকট যে পরম দেব-প্রভু যুবাপুর খটি আমাদিগের স্তম্ভাধি করিতেছিলেন, তিনি কে?”

রেবতী বলিল, “সে কথা পরে হইবেক, এখন দ্রুত চল ।” রেবতীর কথা ও তাহার অশ্রুচালনবেগ দেখিয়া সকলেই বেগে অশ্রু চালাইল । প্রভাবতী বৃক্ষের অন্তরালে হইতে রেবতীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিয়া তিনিও তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ।”

একাদশ অধ্যায় ।

“ক্রমা দ্যৌঃক্রমা পৃথিবী ক্রমাঃ পৰ্কতা ইমে ।

ক্রবৎ বিশ্বম্ ইনম্ জগৎ ক্রবো রাজা বিশামহম্ ॥”

“সাবধান সাবধান ! দিদি নীত্র উঠে এসগো ! ওমা কি হবে ? ঐ যে ভূণ কয়
তেসে আবার ডুবে গেল । কর্ণধার নৌকা ভেড়াও !” কর্ণধার বহুদর্শী, নৌকার পৃষ্ঠ-
দেশে দাঁড়াইয়া দূরস্থ যুহৎ একটা কুস্তীরের গতি লক্ষ্য করিতেছিল । কুস্তীরকে নিকটে
আসিয়া আসিয়া উঠিতে দেখিয়া নিকটস্থ দীর্ঘবাঁশের লগী দুই হাতে উঠাইয়া বিমম ভাৱে
ভাসমান খড়্গরত্নকবিত্ত ভীমমকরের পৃষ্ঠদেশে চটাশ শব্দে আঘাত করিল । আঘাতমাত্র
তত্ত্বাত্তা অল চতুর্দিকে ছিটকাইয়া উঠিল ও জিলেকের অস্ত্র সে স্থানাকাশ অলবিন্দুতে
আপ্ত হইল । কুস্তীরের পৃষ্ঠদেশে বাঁশটা লাগিয়া মড় মড় করিয়া ভাঙিয়া গেল ।
কুস্তীরটা অল ওলটপালট করিয়া তিন চারি হাত পিছলাইয়া বাইয়া ডুবিল । তাঁরে
সুযতি কটদেশে পধ্যস্ত অলে দাঁড়াইয়া স্থান করিতেছিলেন, শকমাত্রে ব্যস্ত হইয়া
নৌড়িয়া তাঁরে যেমন উঠিয়াছেন অমনি তীরস্থ অল আলোড়িত করিয়া ভীষণ লাফ-
ঝিলোলে একে ইচ্ছামতীর খোলা অল আরও কর্ণমাত্ত করিল । কুস্তীর এতবেগে সে
স্থানে গিয়াছিল যে, প্রায় তাহার সকণ্টক শরীর সমস্তই দেখা গেল । ‘হাঁ হাঁ । ধর
ধর’ মার মার ! সর্কমাশ এগোয়ে !” বলিয়া চতুর্দিকে মহাকালাহল উঠিল ;
সকলে দূর ও নিকট হইতে শকমাত্র করিল, কিন্তু কেহই একপা অগ্রসর হইল না !
অকস্মাৎ এই ব্যাপারটি উপস্থিত হওয়ার সকলে প্রায় হতবুদ্ধি হইয়াছিল । রমাইবীর
নিকটের অপর এক নৌকার বসিয়া কলসীর কানাত্তার উপর বহু সাড়ে পাঁচলয়া
গোল ডাবার প্রায় দুই হাত লম্বা একটা নলের কাটি লাগাইয়া নৌকার কূপকে ঠেল
দিয়া টিমে চালে অঙ্গে অঙ্গে তামাক টানিতেছিল । মাজির বাঁশ ভাঙিবার পরই
দাঁড়াইয়া উঠিল, সুযতির নিকটস্থ তাঁরে অলে কুস্তীরগমন হেতু আলোড়ন দেখিয়া এক
লক্ষে তাঁরে পড়িয়া নিমেষমধ্যে সুযতির হাত ধরিয়া টানিয়া উপরে লইয়া গেল ।
সুযতি তাঁরে লজ্জাহোনাপ্রায় হইয়া দুইহাতে রমাইবীরের দক্ষিণবাহু চাপিয়া বসিল ।
রমাইবীর উপরে বাইয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, “রামনালা, আজ তোমার গৃহিণী
বেহাত হইল—আমি তাহার একপাণি গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু সুযতিদিদি তোমার অস্ত্র
একটিও হাত না রাখিয়া আমাকে লুই পাণি দিয়া গ্রহণ করিল । উলুসু ! উলুসু !
আজ রমাইবীরের বে,—কুস্তীর তার খটক, আর ইচ্ছামতী তার ইচ্ছালাভলা !”

রাজা রামচন্দ্র স্বয়ং কোলাহল শকমাত্রে নৌকার উঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—

রমাইবীরের সমরোচিত সহায়তায় সম্ভূত হইয়া হানিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ ভাই, তোমার কিন্তু বোগভঙ্গ হইল, এখন অগ্নি পরীক্ষা না করিলে আর আমি স্নমভিকে ঘরে লইব না ।”

স্নমতী রমাইবীরের বাক্যে লজ্জিতা হইলেন, ব্যস্তে অকলবারা মুখ আবরণ করিলেন । রমাইবীরের বাহ ছাডিয়া বসিয়া পড়িলেন । রমাই তাঁহার নিকট হইতে নাচিতে নাচিতে “আজ আমার বে হবে, কুমীর সইতে বাবে জল ; রামচন্দ্র নয়না দেখে রমাই পাবে ফল ।” এই কথা শ্রব করিয়া গাইতে গাইতে রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহারাজ, আপনার শস্ত্রের আলীকর্মে আপনাদের ও অগ্নি-কার্য নাই ; তাই অগ্নিপরীক্ষা কেমন সম্ভব ? আপনার ইচ্ছা হয় তালা পরীক্ষা করিতে পারেন । কুমীর মামাত ভোবা পরীক্ষার চেষ্টায় ছিলেন । আমি কিন্তু লাচা পরীক্ষায় মজবুত ।” বলিয়া একপাক তাখেই তাখেই করিয়া তাণ্ডন্য করিল ।

রাজা বলিলেন, “তোমার নাচের ধমকে নৌকার ভক্তা ভাসিয়া গেল, এ নাচের উপযুক্ত পুরস্কার কি ?”

রমাইবীর বলিল, “এর পুরস্কার চাঁদখানের দেনো মোণ্ডা । দাদা সত্য কথা বলতে কি, তুমি আমার চাঁদখানের কারাগারে বাণ্ড আমি আমবাগানে সাধুবনে বসিয়া দেবার গোলা খাই, আমার তোমার চক্রবীপ হতে দেনো মোণ্ডা ভাল লাগে ।”

রাজা বলিলেন, “যা হউক, এ বড় ভয়ানক নদী, ইহার জল যেমত বোলা, আমার তীরেও যেমত জল ।”

রমাই বলিল, “মহারাজ, এমনি আপনার শস্ত্রের শাসন যে, এদেশে জলে বাঘ ডাকায় কুমীর ; এত বড় প্রকাণ্ড কেঁদো বাঘ ত আমি কখন দেখি নাই ।”

রাজা বলিলেন, “কেন আমি পূর্বেই ত বলিয়াছিলাম যে, ইচ্ছামতীতে কুমীর অনেক ; এখানে জলস্পর্শ করা উচিত নহে ।”

রমাই বলিল, “মহারাজ, তা বলি কি হয় ? আমাদিগের দিদিরা জলের বাঘ, কথা করে দেখুন আপনার কপালে হাত না পা । তিনি আমার বাহুতে হাত দিয়ে আপনার স্বন্ধে পা দিবেন ।”

রাজা বলিলেন, “সত্য একবার যাইয়া দেখি স্নমতি কি বলেন ।” রাজা সোকা হইতে স্নমতির নৌকার দিকে গেলেন । স্নমতি হাস পাইয়া আপনার নৌকার দিয়া বসিয়াছেন, দাসীরা তাঁহার স্নদীর্ঘ কালীয় সর্পের জার বেণী দিয়া কবরীভায় বাঁধিয়াছে, তাহে পরচন্দ্রনিভ-মুস্তাফল জড়াইতে জড়াইতে কামিনী নামক সহচরী বলিল, “রমাইবীর প্রকৃত বীরই বটে ।”

স্নমতি বলিল, “ভাই সত্য বলিতে কি, রমাই আর জন্মে আমাদিগের কেউ ছিল, —

নতুবা পদে পদে আমাদের জীবন রক্ষা করিবে কেন? যেখানে বিপদ সেইখানেই রমাই বীর। যেখানে সঙ্কট সেইখানেই রমাই বীর।”

কামিনী বলিল, “রমাই যখন তখন পাগল ভাঁড়ের মত এলমেল বেড়ায়; কিন্তু কাজের সময় বিশেষ হোঁসিয়ায়। কেমন বাগিয়ে আপনার হাত ধরেছিল। আপনিও বেশ ভাবে তার বাহু জড়িয়ে ছিলেন;—আমরা মনে করিলাম বুঝি এই অবকাশে একটা কি হইয়া পড়ে।”

সুমতি ঈষৎ হাস্তবদনে অকল দিয়া আবরণ করিয়া বলিলেন, “ও মা, লাজে মরে যাই—আমার তখন চেতনা ছিল না। এত লোকের মধ্যে কেমন করে লজ্জার মাতা খেয়ে ঐ মিনেষ্টার হাত ধরলাম। আমার বড় ভয় হইয়াছিল, বোধহয় যেন এবারে জন্মের তরে গেলাম।”

কামিনী বলিল, “ঠাকুরাণি, আপনি এতদিন কি রমাইবীরকে চিনতে পারেন নি?”

সুমতি বলিল, “আমি তখন পাগলিনী প্রায়;—বহুকাল কারাবাসে, আবার তাহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমি জীবন্ত প্রায় ছিলাম। যখন কিলেদারের লোক আমায় সেই কুসমাচারটি দেয়, তখন আমাতে আর আমি নাই—আমি যেন উন্মত্ত প্রায় হলাম। আর লজ্জা ত জীবন পর্য্যন্ত—যখন সহমরণ করিতে প্রস্তুত তখন আর কি লজ্জা থাকে?”

কামিনী বলিল, “কেন রমাইবীর কি আপনাকে পরামর্শভেদে বলে নাই? আমরা ত সকলে কেউ তৈরবী, কেউ ব্রহ্মচারিণী সেজে, কেউ বা ছেনী, কেউ বা নাপতিনী সেজে স্বরে স্বরে ঘরে ঘরে বেড়াইতাম, আর রোজকে রোজ দুবেলা রমাইকে সমাচার এনে দিতাম। রমাই যদি আমাদের ইঙ্গিত করিত তা হলে চাই কি আমি রোজ দুবেলা আপনার কাছে যেতাম।”

দক্ষিণা বলিল, “আমরা জানি যে, রমাই আপনার সঙ্গে সকল পরামর্শ করিয়া চলিত। আমি রমাইকে একদিন আপনার কথা বলায় সে বলিল যে, ও কাজ অমাকে ছেড়ে দাও—তোমরা ওতে হাত দিও না।”

সুমতি বলিল, “কামিনী দিদি, তুই কি সেজেছিলি?”

কামিনী বলিল, “হৃৎকণ্ঠে কথা কও কেন? আমি নাপতিনী সেজে মহা বিপদে পড়েছিলাম। আমায় রমাই বলিল যে, তুমি একবার গোবিন্দের গৃহিণীর কাছে যাও ও তার ভাব ভক্তি বুঝি এস, পার ত তাহার স্ত্রীর মনে ভাল করে যিজোহীর ভাব তুলে দিও। নানা রকম ভোচোজ দিয়ে কেলে গোপালে আমড়াগেছে করে একবার তার মনটা গরম করে গাছে তুলে দিতে পার ত বড়ই ভাল।”

সুমতি বলিল, “যেন এত হলনার প্রয়োজন? আর তার মন গরম হইলেই বা কি ফল?”

দক্ষিণা বলিল, “কেন বুঝিতে পারিতেছ না? তোমাদিগের পলায়ন সময় দেশে রাজবিপ্লব ও আত্মবিদ্রোহ হইলে, রাজপুরুষেরা সেই বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবেক, আপনাদিগের পলায়নের যথেষ্ট সুবিধা—কেহ অনুসরণ করিবার থাকিবেক না।”

কামিনী বলিল, “শুদ্ধ তাই কেন ভাই? রমাই এই কল্পটায় বিশেষ রাজ্যকৌশলে নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে কচুরায় আদিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন ও তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বঙ্গে দিল্লীর একাধিপত্য স্থাপন করিবেন; অতএব এ সময় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে নানাবিধ বিপ্লব না উপস্থিত করিলে, তাহার সমস্ত সেনা একত্র হওয়ার সম্ভব ছিল।”

সুমতি বলিল, “হাঁ, তা বটে, মহারাজ যদিপি স্বীয় সমস্ত সেনা একত্র করিয়া স্বয়ং সেনাপতি হন, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন রাজাই তাহার সম্মুখীন হইতে পারে না—তাঁহার তুলা প্রবল ও যুদ্ধকুশলজ্ঞ আর কেহ নাই। আহা! মহারাজের ও সমূহ বিপদ! এখন মহারাজ কোথায় আছেন তাহা কিছূ জান?”

কামিনী বলিল, “এখন মহারাজ রায়গড়ে; এই আমাদিগের শেষ সম্বাদ। কিন্তু অন্য মহারাজ কোথা ও কি করিতেছেন আমি বলিতে পারি না।”

এমত সময় মহারাজ রামচন্দ্র রায় নৌকার উঠিলে, ব্যস্তে একজন সহচরী আদিয়া বলিল, “দাদি, মহারাজ আসিতেছেন।” সুমতি ব্যস্তে শিরোদেশে বস্ত্র টানিয়া দিলেন ও গাত্রোখান করিয়া মহারাজকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কামিনী ও দক্ষিণা কেশবন্ধনের দ্রব্য সকল স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। বিস্তৃত দর্পণ লইয়া দক্ষিণা অন্তর্গৃহে প্রবেশ করিতেছে, সুমতি দর্পণে রাজার ও তাঁহার সহিত রমাই বীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কামিনীকে বলিলেন, “কামিনী, একখোড়া ভল হীরকের বাণা ও একটা নক্ষত্রমালা মুক্তার হার আন।”

মহারাজ প্রবেশ করিলে সুমতি বলিলেন, “মহারাজ, এমত অসময়ে এখানে যে?”

রাজা বলিলেন, “আমি তোমাকে দেখিতে আসিলাম। তোমার ও কোথাও আঘাত লাগে নাই? কি ঈশ্বরের রূপা! এক দুঃখ ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে না-হইতে আবার বিপদ উপস্থিত! মা যশোহরেশ্বরীর রূপাতেই অন্য রূপা পাওয়া গেল।”

সুমতি বলিলেন, “মহারাজ, এই আসনে বহুন, রমাই বোস—ভাই বোস, আজ তোমার দত্ত প্রাণ পাইয়াছি।”

রাজা বলিলেন, “কোন কষ্ট হয় নাই?”

সুমতি বলিল, “মহারাজ, এখন বিধাতা আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন, নতুবা একরূপ অসম্ভব অব্যাহতি কেন হইবে? রমাই আমাদিগের মঙ্গলগ্রহ।”

রমাই বলিল, “এ পোড়ার অঁটে গ্রহস্তণ ছুটিল না। বিশেষ অনুগ্রহ তাই

কুগ্রহ হয় নাই । কেন আর কি কোন মিষ্ট বিশেষণ পেলেন না । আমাকে কেন নঙ্গু ষট বলুন না ।”

সুমতি বলিলেন, “মহারাজ, আপনার উপর আমার একটি অভিমান আছে । আপনি যখন রমাই বীরের পত্র পেলেন ও তাহার দস্ত মালক জব্য গ্রহণ করিলেন, তখন কেন একবার এ দাসীকে স্মরণ করিলেন না ? মহারাজ, আপনি বড় বঠিনছন্দ, পুরুষমাত্রেই নির্দয়, তাহার স্ত্রীলোকে মনের ভাব কখন বুঝতে পারে না । মহারাজ একবার স্ত্রী হইলে পতিত্ব কর্ত্তে দক্ষতা জন্মিবেক ।”

রমাই বলিল, “মহারাজকে আর স্ত্রী হ’তে হবে না, উনি ত স্ত্রী হইয়াই আছেন । স্ত্রী না হলে স্ত্রীর মর্যাদা জ্ঞান না । কিন্তু মহারাজ পতির মর্যাদা যদি জানতেন তাহলে আর আপনার কাছে আসতেন না, দিদিকে ডেকে পাঠাতেন ।”

সুমতি বলিল, “মহারাজ, আমিও ত তাই বলিতেছি ; এ দাসীকে একবার ডেকে পাঠাইলেই হইত ।”

রাজা বলিলেন, “লেটা তৎকালে অসম্ভব । আমি নিজে কারারুদ্ধ, আমার আত্মা কে বহন করিত ?”

সুমতি বলিল, “কেন রমাইকে উত্তর দিয়া লিখে দিলে হ’ত ।”

রাজা বলিলেন, “সত্য বলিতে কি, আমার উদ্ধারের সমাচারে এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তখন আমার বিবেক ছিল না ।”

রমাই বলিল, “মহিষি, এইবারে বাগে পেয়েছেন, চেপে ধরুন ছাড়বেন না । মহারাজ উৎসাহে প্রিয়তমা বিস্মৃত হন ।”

রমাইবীরের এই কথাটি শুনিবামাত্র মহারাজের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল ! বলিলেন, “রমাই ভাই, তুমি আর বিপজ্জতাচরণ করিও না । এখন আমাকে সাহায্য কর ।”

সুমতি বলিল, “না না তা হবে না, রমাই আমার দলে, সে মহারাজের সহায়তা করিবে না ।”

রমাই বলিল, “আমি অত জানি না, যে আমার মোণ্ডা দেবে সেই আমার প্রভু ।”

রাজা ঝড়িত হইয়া কোনমতে এই প্রস্তাব বিস্মরিবার মানসে বলিলেন, “সুমতি, রমাইকে অন্যকার জন্ত কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত । কি বল তোমার মত কি ?”

সুমতি ইঙ্গিত করিবামাত্র কামিনী অগস্ত্যরথর আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা হীরকের বাল লইয়া রমাইবীরের হাতে পরাইবার উদ্যম করিলে রমাই পশ্চাতে হটিয়া যাইয়া বলিল, “মহারাজ এ হাতে আশনার অধিকার নাই ।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “ভাল ভাই, আমার ত পল্লদেশে অধিকার আছে ? আমি নক্ষত্রহার পরাইয়া দিব ।”

রমাইবীর বলিল, “এ কথা অবশ্যই মানিতে হইবেক। আপনি দেশের রাজা কথায় কথায় শির লইতে পারেন, কিন্তু হাত রাজমহিবীর।”

সুমতি ঈষৎ হাস্য করিয়া অবনতমুখে হীরকের বালা রমাইবীরের হস্তে পরাইতে চেষ্টা করিলেন। দ্রাব উপযোগী বলয় পুরুষের স্মুল ও প্রশস্ত কন্যায়ের অস্থিতে বলিল না! রমাই বলিল, “বাবা আমার বালায় বাজ নাই, এ ত হাতকড়ি, এ রাজকস্তা ও রাজমহিবীর হাতেই ভাল শোভে।” রাজা “দেখি আমি বলাইতে পারি কি না।” বলিয়া বলয়ের কৌলিক খুলিয়া অর্ধচন্দ্রাকৃতি বলয়দ্বয় বলে রমাইয়ের কন্যায়ের বলাইতে গেলে রমাই চীৎকার করিয়া অন্তরে পলাইল! কামিনী হার ও বলয় দিয়া অন্তরে দাঁড়াইয়াছিল, চীৎকার শুনিয়া “আহা” বলিয়া রমাইয়ের পার্শ্বে যাইয়া রমাইয়ের হাত আপন হস্তে লইয়া অঙ্গুল্যাগ্রিমা স্বর্ষণ করিতে লাগিল। রমাই বলিল, “মহারাজ আর একবার চেষ্টা করুন, সত্য বলিতে কি, আপনি দিব্যরাজ্য এমত যন্ত্রণা দিলে আমি ভাল থাকি। যন্ত্রণার ব্যথার পরে প্রতিকারের বর্ষণে মায় শুদ শোধ হয়।”

কামিনী রমাইবীরের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া অপর গৃহে পলাইয়া গেলে রাজা ও সুমতি উভয়ে এক স্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কামিনী কোথা যাও, এস রমাইকে আবার বালা পরাইব।”

রমাই বলিল, “মহারাজ, কামিনীর দয়া তাহার মনের মত চকল।”

সুমতি বলিলেন, “মহারাজ যাহা হউক এ বালা যদি রমাইবীরের হাতে না হয় তবে কামিনীকে পরাইয়া দিই, তাহা হইলেই রমাই সন্তুষ্ট হইবেন।”

রমাই বলিল, “গহনায় আমার আপত্তি নাই; ও বালা কেন এ হারও কামিনীর কর্তে দিলে শোভা পায়, তবে মোত্তার বেলা আমি তাহা বলিতে পারি না। মোত্তাটা আমি পাইলেই ভাল হয়।”

রাজা বলিলেন, “রমাই এখন ব্যঙ্গ ত্যাগ কর। আমার ইচ্ছা ও আমার বিশ্বাস সুমতিরও আগ্রহ যে তোমাকে আমরা যথা বথকিৎ সুখী করি। অতএব তোমাকে আমার সরকার বস্ত্রের চাকলেন্দারী পদ দিই। কামিনী কোথা গেলে, গিথিবীর কাগজ ও কলম আন।”

ক্লেপকে দক্ষিণ এক খণ্ড মোনার হলকরা কাগজ ও একটি মৌখিক কলম দানের লক্ষ্য অপ্রশস্ত বস্ত্র আনিলে রাজা তাহার ডালা খুলিয়া একটা ককীয় সোণার হলকরা কলম লইয়া বাস্ত্রে অপর পার্শ্বস্থ বোয়াত হইতে কালা লইয়া একটা সন্দল স্বহস্তে লিখিয়া স্বীয় অঙ্গুলির দিয়া মুদ্রা করিয়া দিলেন। রমাই শির নোয়াইয়া তাহা লইয়া বলিল, “মহারাজ, আমি আপনার কি শত্রুতাচরণ করিলাম যে, আমাকে মহারাজের সজ হইতে বিদায় দিতেছেন? মহারাজ, আমি দীন কায়দ, আমার সংসারে

আর কেহই না, আমার একমাত্র বন্ধু ও সহায় আপনি ; আমার চাকলাদারিতে কোন প্রয়োজন নাই। আমার অর্থেরও আবশ্যক নাই। আমি চক্ষু বুজাইলেই অন্ধকার! আমার কানিবার লোক নাই। আমাকে এই চাকলাদারীর নাম করিয়া কেন দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। আমাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে আমাকে ধনলোভ দেখাই-বেন না। আমাকে আপনার সঙ্গে গৃহাধে ও অভয়ে বাস করিতে দেন, তাহা হইলেই আমার সমুচিত পুরস্কার। হীরা মুক্তিতেও আমার প্রয়োজন নাই। যাহা আমাকে পুরস্কার মনন করিয়াছেন, তাহা কামিনীকে দিনে সে সমস্ত হইবেক।”

রাজা বলিলেন, “তবে কামিনীকে ডাক।”

রমাইবীর “কামিনী কামিনী করিয়া ডাকিল কিন্তু কামিনী উত্তর দিল না। পরে রাজার হস্তে তাঁহার সনদটি রাখিয়া নৌকা হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।”

রাজা বলিলেন, “সুমতি, রমাই অত্যন্ত সৎ ও আমাদিগের একান্ত অনুগত, তাহাকে সংসারে স্থিত করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। সে এখন উল্লাসীনের মত যথেষ্টাচরণে কাগ কাটাইতেছে, তুমি কামিনীকে ডাকিয়া রমাইয়ের কথা বুঝাইয়া বলিও। রমাই গৃহস্থান্ত্রম অবলম্বন করুক। তাহা হইলেই বিষয়াদিতে টান হইবেক।”

সুমতি বলিল, রমাই আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করে, তাহায় সে আশ্রয় ইষ্টানিষ্ট সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। দেখুন না আপনার অপরাপর কণ্ঠ্যচারীত অনেক ছিল ও আশ্রয় কুটুম্বও যথেষ্ট, কিন্তু এতদিন কেহই আপনার উদ্ধারের জ্ঞে চেষ্টা পায় নাই।”

রাজা বলিলেন, “অনুমান করি, হাতপূর্বে চেষ্টা পাইলেও কেহ কৃতকার্য হইতে পারিত না। কেন না, একেত পাপের ভোগ পূর্ণ না হইলে উদ্ধার হয় না, আবার প্রতাপাদিত্য বতদিন যশোহরে ছিলেন, ততদিন ও প্রকার চেষ্টা কেবল উন্নততামাত্র। এখন দেশকাল উপস্থিত হইয়াছে রমাইও কৃতকার্য হইল।”

সুমতি বলিল, “স্বাধীনতা, আমার এখনও ভয় যায় নাই। গোবর্দ্ধন যদি আমাদিগকে অনুসরণ করে তবেই ত ধরিবেক, অতএব আমি বসি যে, পথে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।”

রাজা বলিলেন, “সুমতি, সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক! আমরা গত সন্ধ্যার সময় যখন চাঁদখান হইতে রওয়ানা হই; তখন চাঁদখানে মহা হলস্থূল। সত্য বলিতে কি, সেখানে এক প্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত। গোবর্দ্ধন কিলেদার রাজত্বগ্রহণ করিয়াছে, সে সনদ জারি করিয়া অপরাপর লোককে পঞ্চহাজারী, ফিলেনার, বাঁক প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত করি-ছেছে। মুসলমানসেনা যশোহর হইতে ঢাকা সোণারগ্রাম অকলে প্রস্থান করিয়াছে। এখন যশোহরে কেবল গোবর্দ্ধন স্বীয় ভটমাত্র লইয়া আছে, তাহে আবার গুলিতে পড়ি-য়া তিনশত সেনাবীরের অভাব! এস্থলে বলিতে গেলে এখন যশোহরে মোটে ছ

সাতশতমাত্র সেনা আছে। তাহার বশোহর ছাড়িয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিতে পারিবেক না। এ দিকে আবার গোবর্দ্ধন নিজের দ্বারে উদ্বিগ্ন, সে রাজ্য পাইয়াছে। চক্রবর্তী বা ছত্রধারী হইবেক, এই উৎসাহে মত্ত; সে এখন মাদৃশ বন্দীর অনুসন্ধানে চিন্তিত হইবেক না।”

হুমতি বলিল, “সে রাজত্ব কি উপাবে পাইতে আশা করে? বস্তু কি আমার পিতার পরিবর্তে গোবর্দ্ধনকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত? আর তাহাও যদি হয় কিন্তু মাহুল্লা আমাদিগকে শীঘ্র বিমুক্ত হইবেক না। তাহার আমাদিগের উপর যে জাতক্রোধ।”

রাজা বলিলেন, “হুমতি, তুমি মিথ্যা উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্বক্লেশ বৃদ্ধি করিতেছে। রমাই এই ব্যাপারে এমত কৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, কোন বিষয়ই অনুশঙ্ক্য নাই। মাহুল্লা, রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেলে প্রথমে ভীত হইয়াছিল। রমাই তাহার নিকট সেই গোবর্দ্ধনের সময় ছদ্মবেশে লোক পাঠাইয়া কোষের ধন কিছু মাহুল্লাকে হস্তগত করিতে ইঙ্গিত ও পরস্পর দেওয়ার মজাজি লেভে পড়িয়া রাজকোষের ধন স্বীয় আবেশে লইয়া যন। আবার গোবর্দ্ধনের নিকট নেই সমাচার ভাবগুঞ্জে জনানে গোবর্দ্ধন বলপূর্বক সেই ধন ফিরাইয়া লইয়া ঘাইবার আদেশ দেয়। আবার গোবর্দ্ধনের আদেশ মাহুল্লা'র কঙ্কণচর হইতে ন-হইতে রমাই মাহুল্লাকে সাবধান করিয়া দিলে মাহুল্লা প্রায় দশজন অন্ত্রধারী লইয়া সেই ধন রক্ষা করে। আদেশ অমান্য ও তাহার বিপক্ষে অন্ত্রোত্তোলন করার মহাক্রান্ত হইয়া গোবর্দ্ধন মাহুল্লা'র গৃহ আক্রমণ করিল। সমরে তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। মাহুল্লা এখন বন্দী। অন্য এতক্ষেণে তাহার বাহা হউক একটা হইয়াছে। অনুমান মাহুল্লা'র শিরশ্ছেদন হইয়া থাকিবেক। গোবর্দ্ধন উৎসাহে এমত সন্দ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছে যে, মাহুল্লা জীবিত থাকিতে নিশ্চিন্ত হইবেক না।”

হুমতি বলিলেন, “কোষের দ্বার উন্মুক্ত কেন?”

রাজা বলিলেন, “সেও রমাই বীরের খেলা।”

হুমতি বলিলেন, “গোবর্দ্ধন, রাজ্যলাভে কি সাহসে মন দিল।”

রাজা বলিলেন, “সেটি কেবল রমাই ভায়ার কেরামত। দালা সাপ হইয়া দংশিয়া আবার ওকা হইয়া বাড়াইয়াছেন। রমাই যে প্রণালীতে আমাদিগের মুক্ত করিবার জন্ত যত্ন করিয়াছে, অনুমান করি এরূপ সর্ববিধায় হস্ত ও দৃঢ়দশী বুদ্ধি অপর কাহারও সম্ভবে না। সেই ত প্রথমে সাধু হইয়া বশোহরের সমস্ত সমাচার গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে বাক্রায় ফিরিয়া গিয়া তথা হইতে সমস্ত সেনা রাজপুরুষ দাসদাসী সহচরী ইত্যাদি আনাইয়া বশোহরের দূরে রাখিয়া, ক্রমে ক্রমে

নালাছলে ও নালাবেশে কেহ চেল, কেহ ব্যবসারী, কেহ রোগী, কেহ অন্ধ, কেহ পঙ্গু, ইত্যাদি বেশে তাহার নিকট উপস্থিত করাইল। একপ ছলনা ও যোগাযোগ না হইলে আমরা কন্মিন্‌কালে মুক্ত হইতাম না। তাহার দুইটি পরামর্শ ছিল, যদি কোশলে আমাদেরকে উদ্ধারিতে না পারিত, তাহাহইলে সেই সমস্ত চেল ও ব্যবসারী বেশধারী নেনার দ্বারা যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত ছিল। দৈবযোগে বিধাতা জন্ম হইলেন সূর্য্যকুমারের অবশেষে জ্যেষ্ঠী রাজা হইতে নন্দরাম সচিব রমাই-রের সঙ্গে যোগ দিল। তাহারও স্বকর্ম্ম সিন্ধু হইল; সে যথোপায় থাকিয়া সূর্য্যকুমারকে সমাচার পাঠায়। এদিকে রমাই সাংবেশে একবার গে বর্জনর মনে লোভ দেখাইয়া আশা অতুলিত করিয়া ওদিকে গণকরূপে তাহার স্ত্রীর মন এমত উত্তেজিত করিয়া দিল যে, গোবর্জন মস্ত হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধ হইয়া মানিল না। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বিষম পাপে মন লাগাইল। কিন্তু বলিতে কি এ সমস্ত গ্রহের কর্ম্ম, প্রতাপাদিত্যের অংশগতির কাল উপস্থিত, মানা প্রকার উপলক্ষ্যও হইল।”

সুমতি বলিল, “মহারাজ, আপনার কথার আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমার এ হৃদয়ে বিষাদ। পিতা আমার প্রতি নির্দিষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি যে পিতা একথা আমি বিশ্বাসিতে পারিতেছি না। যখন বঙ্গাধিপ প্রথমে আপনাকে কারাক্ষক করেন, তখন রাগে ও শোকে আমার ভক্তির বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন পিতার বপন ভুলিয়া আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে। মহারাজ, আমি একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।”

রাজা বলিলেন, “হাঁ তুমি কেন আমিও ইচ্ছা করি, কিন্তু আমি সাক্ষাৎ করিলে অন্য ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিব না। বলিতে কি আমার এখন ইচ্ছা যে, বাক্রাচলদীপে না বাইয়া সৈন্ত লইয়া মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে যোগ দিয়া নরাদম কারকুৎসকুলোদ্ধারকে তাহার পাপের মত স্বহস্তে শাসন করি।”

সুমতি বলিল, “মহারাজ, তোমার রোষ হইতে পারে, কিন্তু তিনি তোমার গুরুজন। যদি কর্ত্ত্বের পতিতে কোন অকোশল করিয়া থাকেন তাঁহার মনে স্নেহের অভাব নাই জানিয়া গে বিষয়ে ক্ষমা করা মহত্ত্বের কার্য্য। মহারাজ! ক্ষমাই মহত্ত্বের একমাত্র গুণ। তিনি তোমাকে কারাক্ষক করেন নাই। অসুমান করি রাজারক্ষার জন্য বাক্রার ভৌমিককে হস্তগত করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য স্বীয় জামাতার উপেক্ষাও করেন না। মহারাজ, এ বড় সামান্য গুণ নহে। রামরাজ্যের জন্য স্বস্তের মান্যের জন্য তিনি আত্মত্যাগে খাতির রাখিলেন না। মহারাজ অযোগ্যপতি জনপ্রবাদের ভয়ে প্রাণত্যাগ জানকীকে বনবাস দেন ও অগ্নিপরাীক্ষা করিয়া গ্রহণ করেন।

আপনিও সেই অমমভারণ নাম ধারণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করুন—স্বীয় স্বাধীনতা-

ব্যয়ে দেশের মঙ্গল আশা করা উচিত। মহারাজ, স্বার্থপ্রবণনেত্রে যে কর্মকে দোষ বলিয়া দেখিতেছেন, একটু নিরপেক্ষ হইয়া দেখিলে সেটি গুণ বলিয়া মানিতে হইবেক—যশোহররাজ যদ্যপি সে সময় আপনাকে কারাগারে না রাখেন, তাহা হইলে আপনি দিল্লীখরের দলভুক্ত হইয়া বঙ্গাধিপের এক চক্রের হানি জন্মাইতে পারিতেন।”

রাজা বলিলেন, “সুমতি, তোমার বাক্য ও বিচার ঞ্জতিশ্রয়, যেন পণ্ডর প্রীতি স্বাতকের উক্তি! ই!। হিংস্রক জন্ত হইতে রক্ষার্থে আমাকে বন্ধনস্থ করিয়া- ছিলেন, আর আমি এখন মুক্তলাভের আশায় মোচিত হইয়াছি। কিন্তু আমি তোমার কথায় অনুমোদন করিতে পারি না। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যদ্যপি এতই বঙ্গের প্রাধিক্ত সমর্থন যত্বান, লাহা হইলে বঙ্গের দ্বাদশভৌমিককে একে একে হীনবল করিয়া মধ্যাহ্নস্থ্যচিক্রপতাকা তাহাদিগের দুর্গের উপর উড়ান তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। নিজে সমস্ত ভৌমিকের রাজ্য ক্রমে ক্রমে লুপ্ত করিয়া লইলেন, স্বরাজ্যের আয়ত্ত বুদ্ধি হইল বটে কিন্তু দূরদেশে সমুচিত শাসন হইল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রীতিনীতি আচার ব্যবহার প্রভেদ; প্রতাপাদিত্য স্বয়ং তথায় সর্কণা যাভায়াতে ও পর্যবেক্ষণে অক্ষম হওয়ায় তত্রত্য লোকসমাজে প্রেমলাভ করিতে পারিলেন না। ক্রমে প্রজারা স্বীয় চিরপরিচিত পুরাতন রাজবংশের অভাব বোধ করিয়া অবশেষে প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে হস্তোত্তোলন করিল। এমন অবস্থায় একাকী মিষ্টভোজী কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? এরূপ না করিয়া প্রতাপাদিত্য যদ্যপি সকল ভৌমিকের সহিত প্রীতি প্রণয় রাখিতেন, তাহা হইলে সকলে একত্র হইয়া দিল্লীখরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিতাম; এখন প্রতাপাদিত্য একান্ত মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।”

সুমতি বলিলেন, “মহারাজ, কেন যশোহরের শাসনে অসন্তুষ্ট? সে যাহা হউক, বঙ্গাধিপ ত হিন্দুধর্মী, বঙ্গাধিপ ত বাঙ্গালী, বঙ্গাধিপ ত কায়স্থ—আমি তাহার সহিত আপনার সম্পর্কের কথা কহিব না—এই ভিন কারণে মহারাজ, বঙ্গাধিপের পক্ষ হওয়া উচিত।”

রাজা বলিলেন, “তুমি এমত ক্ষুদ্রদর্শী হইতেছ কেন? হিন্দু ও বাঙ্গালী ও কায়স্থ বলিয়া কি অযোগ্য মান দিব? আমি হইতে তাহা হইবেক না। তুমি এখন সে সব কথা ত্যাগ কর, এখন আমার রাজধানী কোথায় করিব, তাহার বিচার কর।”

সুমতি বলিলেন, “মহারাজ, এ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। আমার জ্ঞান এই যে, ঐ ভিন্ন কারণের মধ্যে একেই অনর্থ ঘটতে পারে, সেস্থলে তিনের যোগে যে কি ঘটবে বলিতে পারি না।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “সুমতি, ‘ওন জনথৈ এক অর্থ হটিল।’

সুমতি বলিলেন, “মহারাজ, বিষয়বস্তুর কথা—ব্যঙ্গ করিবেন না। তিন কুকে এক খেত হয়?”

রাজা হাস্য করিয়া বলিলেন, “সুমতি, এখন আমরা প্রতাপাদিত্যের কোন বিপদভা-
চরণে প্রবৃত্ত হইতেছি না, অতএব অকারণ আত্মবিচ্ছেদে প্রয়োজন কি? যখন সময়
উপস্থিত হইবে, তখন বিবেচনা করা যাইবেক। এতকালের কারাবাসের পর সবে
পাঁচ প্রহরমাত্র সাঙ্গাং, এখনও দম্পত্যের উপযোগী কোন মিষ্টভাষণ হয় নাই; আজ
প্রায় তিন বৎসর যদিচ একই স্থানে ছিলাম, কিন্তু কাহার কি অবস্থা কেহ কিছুই
জানিতে পারি নাই। তুমি নৌকায় কখন উঠিলে?” রাজা এই কথা বলিতে বলিতে
সুমতির হাত ধরিয়া নিকটের আসনে বসাইলেন।

সুমতি বলিলেন, “মহারাজ, আমি আপনার অমঙ্গলসহাদ পাইয়া সহমরণ প্রতিজ্ঞা
করিয়া কারাগার হইতে বাহিরে গেলাম, কিন্তু মানুষের পরুষ উক্তিভে আমার হৃদয়
বিনীত হইয়া গেল। আমি কোথায় যাইব কি করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে
পারিলাম না। আমবাগানের সাধুর আখড়ায় যাইয়া এক পাसे বসিয়া অনেককণ কতই
কাঁদিতাম, তাহা এখন মনে হইলে স্বপ্নবৎ বোধ হয়। অকস্মাৎ এ দুর্দৈব হওয়ার
কল্পনা সাংক্রান্তিপাখ্যান মনে আনিব; কায়মনোবাক্যে যশোহরেশ্বরীর নিকট স্তুতিবাদ
করিলাম, শক্রাদমহাহাত্য অদ্যন্ত মনে মনে সংযত হইয়া আবৃত্তি করিলাম, অনেককণ
ধরিয়া জাতবেদসে মত্ত জপ করিলাম; ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন
অনাহারে কোন ক্ষুধে ধ হইল না—”

রাজা বলিলেন, “আহা! এখনও তোমার মুখ মলিন হইয়া আছে। একেই ও
কারাবাসের কষ্টে শরীর নীর্ণ, তাতে আবার গতকালের মনোব্যথা ও উপবাস। সুমতি,
তোমার মুখ দোষিয়া আমার মন মধিত হইতেছে—পাপ প্রতাপাদিত্য ইহার প্রতিফল
অবশ্য ভুগিবেক।”

সুমতি বলিলেন, “মহারাজ, প্রিয়জনের পিতা কোপভাজন হইতে পারে না।
মহারাজ, আপনি আমাকে দণ্ড দিন, কিন্তু মনে মনে যাহা থাকুক, এতাব আমার
নিকট প্রকাশ করিবেন না।”

সুমতির সঙ্কল্পবাক্যে রাজার মন দ্রব হইল ও কিঞ্চিৎ অশ্রুজত হইয়া বলিলেন,
“সুমতি, আমার সকল কথা কাণে করিও না—যত গর্জে ওত বর্ষে না—আমার জীবন
ধাকিতে তোমার কষ্টে ঘটিবেক না।” সুমতির কপোলদেশ ঈষৎ রঞ্জিত হইল,
তাহে বামে ঈষৎ দক্ষিণে ঈষৎ স্নিগ্ধ অশ্রুধারাবহু অতি অল্পে অল্পে বহিল;
অথরোষ্ঠ কাঁপিল।

সুমতি বলিল, “মহারাজ রমাই যে ঔষধ দিয়াছিল, তাহা সেবনের কতক্ষণ পরে আপনার চৈতন্ত্য যায় ?”

রাজা সীতোষ্ণবদ্যুয় চুঁষিয়া বলিলেন, “আমি সে ঔষধ সাংকালেই ধারণ করি ও মহাভারতের বনপর্ব্ব কিছুক্ষণ পাঠান্তে, যদ্যপি ঔষধে মন্দফল ঘটে, এই আশঙ্কায় একবার চিন্তিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কখন অচেতন হই তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই । তবে অশ্রু মাৎসর্য কিনা বিষয়ানে বেরূপ কষ্ট হয়, তাহা কিছুমাত্র বোধ করি নাই, ক্রমে যেন আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইতে লাগিল ও ক্রমে নিদ্রাগ্রস্ত হইলাম । তুমি তাহার পর কি করিলে ?”

সুমতি বলিলেন, “প্রদোষসময়ে সাধু আমাকে ডাকিয়া আমার সহিত কথা কহিলে আমি রমাইকে চিনিতে পারিলাম না । সাধু আমায় বলিলেন, ‘মা, ভাবিও না, তোমার মন থাকে ত অবশ্যই সহমরণ করিবে,—একশেষেই রাজা রামচন্দ্রের শব ভাগাড়ে ফেলিতে যাইবেক ; আমি শবসাধন করিব বলিয়া কিলোদার গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে ঐ শব চাহিবার জন্ত একজন চেলা পাঠাইয়াছি, লোক ফিরিয়া আসে নাই ; অনুমান করি, তিনি ইহাতে কোন আপত্তি করিবেন না ; শব পাইলে আমি স্বয়ং শাশানে যাইয়া শবসাধন করিব ; মা, তুমি আমার সঙ্গে যাইও, আমার সাধনের পর ইচ্ছা হয় সহগমন করিও । আমি মহা সমুদ্রে হইয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে উদ্যোগ পাইলে, তিনি বলিলেন, ‘মা—স্ত্রী—লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ শক্তি—আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি অভ্যাচার করিও না ।’ আমি অগত্যা ক্লান্ত হইলাম, ইতোমধ্যে একজন চেলা আসিয়া বলিল, ‘বাবাজি, এই সনন্দ লউন, গোবর্দ্ধন আপনাকে প্রণাম জানাইয়াছেন ও বলিয়াছেন, কল্যাণে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন ;—এত অতি সামান্য আদেশ—শব লইয়া যথেষ্ট আচরণ করুন । যখন বাহা প্রয়োজন, অনুমতি করিতে কুন্তিত হইবেন না ।’ চেলার নিকট সনন্দ লইয়া সাধু দ্বিষা খাটের উপর গদী, লেপ ও তাহার মধ্যমলের উপর কারচোপের কাজকরা মছলন্দ পাতিয়া বিশজন চেলারদ্বারা মহাসমারোহে ঢোল, ঢাক, ডঙ্কা বাজাইয়া চাঁদখানের কাটাগারের দিকে চলিলেন । আমাকে একটা মহাপায়ার চাপিতে বলিলেন ; আমিও মহাপায়ার চাপিলাম । ক্রমে পথে মহাপায়া হইতে দেখিলাম, যে দশটা হাতির উপর ডঙ্কা ; উলঙ্গ, ভস্মমাধা অটোধারী নাপা সন্ন্যাসীরা ডঙ্কা বাজাইতেছে ; তাহার পর ঘোড়ার উপরও সেইরূপ সন্ন্যাসীরা দল ; তাহার পর দীর্ঘ স্বর্ণদণ্ডধারী সন্ন্যাসী ; তাহার পর প্রশস্ত রেশমের ও মধ্যমলের নিশান, তাহে কাল-বড়ুর কাজ ও সলমা চুমকীর কাজ ; তাহার পর প্রায় দুইসহস্র অন্ত্রধারী লজ্জোটিপরা ভস্মমাধা নাগাসন্ন্যাসী ; মহাসমারোহে সাধু সৰ্গপশ্চাতে পদব্রজে চলিলেন । যশো-

হয়ের পরে লোকারণ্য হইল। ক্রমে চাঁদখানে পৌঁছিয়া মহারাজ, আপনার অচেতন শরীর দিয়া চন্দ্রনাক্ত পাটলাজলে ধৌত করিয়া রাজবেশ পরাইয়া যখন খাটের উপর শোয়াইয়া দিল, মহারাজ, তখন আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, আমি চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিলাম। আমার পার্শ্বে কামিনী ও দক্ষিণা আসিয়া নাপাতিনী ও মেছুনীর বেশে নানা সান্ত্বনা করিতে লাগিল; আমি এমত মুগ্ধ যে, তাহাদিগকে চিনিতে পারিলাম না, আর মুগ্ধ না হইলেও চিনিতে পারিতাম না—অকস্মাৎ বিশেষ মলিন বস্ত্রাবৃত মৎস্তগন্ধে আচ্ছন্ন, মস্তকে রুহিতের ভার, চুর্বাড়ির উপর ডাগা, তাহার একটা দীর্ঘ বঁটা—অসুস্থমান করি, রাত্রিকালে দেবেশে দক্ষিণা মহারাজার নিকট আসিলে আপনিও চিনিতে পারেন না।”

রাজা বলিলেন, “রমাই কি পর্কই করিয়াছে—একীর্তি দেশ বিশেষে রটিবেক। আহা রমাই আমার প্রণের সখা! সে যে বালককালে পাঠশালায় আমার বলিয়াছিল যে, তুমি রাজপুত্র বটে কিন্তু আমার বুদ্ধি না হইলে তরিবে না—এখন সত্যই তাহা ঘটিল। কেবল বুদ্ধি কেন—তাহার জ্ঞান ও যত্ন।—কামিনী কোথা?”

কামিনী বলিল, “মহারাজ, নাপাতিনী একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজ, যে দিন রমাই আমাদিগকে বাকলা হইতে লইয়া যায়, সে দিন আমরা রমাইয়ের কথার বিশ্বাস করি নাই ও তাহার কথাত্তেও যশোহরে যাই নাই। আমরা জনিতাম, রমাই পাপল, তবে এই সুবোণে একবার রাজার ও মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ হইবেক, এইমাত্র আশা ও ইচ্ছা ছিল।”

দক্ষিণা বলিল, “মহারাজ, এখন যুগলমূর্ত্তি প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমাদিগের আশ্রয় উৎপলিতোছে। মহারাজ, মনের ইচ্ছা, একবার যে বেশে বিবাহ হইয়াছিল, সেই বেশে যুগলমূর্ত্তি বাকলার রাজসিংহাসনে দেখি।”

রাজা বলিলেন, “তোমরা আমার প্রিয়র সহচরী—আমারও প্রিয়তমা। যুগলমূর্ত্তি লোথতে পাইল; কিন্তু তাহার সহিত অপর যুগলমূর্ত্তিও চাহি।”

রমাই হঠাৎ প্রবেশ করিয়া বলিল, “মহারাজ, বিগ্রহ স্পর্শাদিহুত হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠাবিধি; আমরা দেশে যাইয়া যুগলমূর্ত্তি অভিষেক করিব। আর মহারাজের অভিশ্রম মতে শতযুগলমূর্ত্তির রাশি করিব।”

রাজা বলিলেন, “রমাই, তাই তোমারই বাহাওয়া শুনিতেছিলাম। সুমতি, তার পর কি হল?”

রমাই বলিল, “মহারাজ, আমি বলি—তার পর তোমাদের ফুল ফুটিলো আর সুমতি আপনার সহগমন না করে সহবাস করিলেন।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “খাটের উপর বসলল দিলে কেন?”

রমাই বলিল, “আমার ইচ্ছা ছিল যে, হুজুরকে সেই মসলকে ডরাইয়া লইয়া বাই ও বাকলার আপমানিগের শয়নমন্দিরে রাখিয়া চৈতন্ত করাই, কিন্তু কাজের গতিকে তাহা বাটিল না; বহা হটক, এখন সহযোগটা দেখিলেই সন্তুষ্ট হই ।”

রাজা হাসিয়া সুম তর হাত ধরিয়া বলিলেন, “সুমতি, অপর কোন কারণে না হটক রমাইকে সন্তোষ করিবার জন্য আমানিগের সহায়তা করা উচিত ।”

সুমতি লজ্জার অবনতমুখী হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি বাড়ি মিলজ্ঞ ।”

র ই বলিল, “দ্বিদি, আপনিই ত বলেছেন যে, লজ্জার জীবনপন্থা সীমা । মুতে এখন সে কোথায় কাটাইয়াছেন—অব লজ্জা কি ? এখন সব খণ্ডে গেছে ।”

রাজা বলিলেন, “তর পর আমার শব কোথায় লইয়া গেল ?”

সুমতি বলিল, “ক্রমে শাশানের নিকটস্থ হইলে অন্ধকার হইল; দর্শকেরা সন্নিয়া গেল, মিতান্ত কোতুলী যাহারা ছিল, তাহাদিগকে নানাদ্রব্যের পৈশাচিকবিভীষিকা দেখানতে, তাহারাও চলিয়া গেল । শাশানে কেবল সাধুর চেলাগণ রহিল । কণেক পরে শাশানের নিকট নদীতীরে নানাবিধ পোত ও নৌকা আসিয়া লাগিলে, সাধু কি ঔষধ লইয়া আপনার নাসারঞ্জে দিয়া চক্ষে জলসেচন করিতে লাগিল, ক্রমে আপনার চৈতন্ত হইতে লাগিল । তখন সাধু আসিয়া আমাকে বলিলেন “মহিষি, মহারাজ জীবন্ত আছেন, আমার নাম রমাই বীর, এই আপনার লোকলঙ্কর, ঐ লন, নৌকার চলন, স্বরায় বাকলা বাজা করুন ।” আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না, আমি মহারাজের নিকট যাইয়া বসিলাম ।

রমাই বলিল, “দ্বিদি, সত্য বল দেখি, এখন সহগমন করিবে ?”

দ্বাদশ অধ্যায় ।

মা নো বধীঃ ক্রুদ্ধ মা পরাধাঃ মা তে কুমপ্রসিতৌ হীলিতস্ত ।

আ নো ভজ বর্হিষি জীবনংশে যুস্মন্ত অতিভিঃ সপা নঃ ॥

যুগাধানের পরদিন প্রাতে জয়ন্তীপুরে লটকার বাসগৃহে অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত নিকটস্থ আর চার পাঁচখানি ঘর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে । লটকা ক্রোধাক্ত হইয়া একটা সরল গাছের তলার একাকী বসিয়া আছে—নিকটে জনপ্রাপ্তি নাই—তাহার স্বীয় অন্তর ভ্রাতোরাও লাহস করিয়া সম্মুখীন হইতেছে না; তাহার ঐ বর্তমান মহিষা—দুঃ হইতে তাহার একমাত্র প্রাপ্তবোধসর্ব পুঞ্জকে জাতিয়া বলিল, “নাশা, বাও ও পাগলটাকে বুঝাও গৃহদাহ দৈব ঘটনা, অতি সাবধান হইয়া

থাকিলেও ঘটে,—পৰ্ণকুটীর বংশের ও কাঠের মাচায় যে এতদিন অগ্নি লাগে নাই তাহাই আশ্চর্য্য! এ সকল গৃহ অগ্নি লাগিলেই হয়। আর এখন কোপ করিয়াই বা কি করিবেন,—কাহাকে মারিয়া ফেলিলে ত নগ্নগৃহ পুনর্লোভ হইবেক না?”

নাগা বলিল, “আমি বাইতে পারিব না—এখন ঘেরূপ রোক করিয়া বসিয়া আছে, আমি নিকটে বাইলেই আমাকে মারিবেক। তুমি যাইবে যাও, আর এখন গিয়াই বা কি হইবেক? উনি ত দ্বাস্ত হইবার লোক নহে! যতক্ষণ না তুমি একজন আহত হয় ততক্ষণ এহার এ রাগ পড়িবেক না।”

বুঝু আসিয়া বলিল, “নাগা, কি বলিতেছ?”

নাগা বলিল, “ছোট মা, আমাকে রাজার নিকট যাইয়া সান্ত্বনা করিতে বলিতেছেন।”

বুঝু বলিল, “ভাল, তুমি থাক আমি যাই।”

এমত সময় পুঁড়া আসিয়া বলিল, “কাহারও বাইতে হইবেক না, আমি বাইতেছি।

বুঝু বলিল, “না:—ত মার যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমরা রতপঁচিশে, একশ গিয়াই একট হেঙ্গাম উপস্থিত করিবে।”

চিমাই বলিল, “একটা হেঙ্গাম করিলেই ভাল হয়—আর ঢাক ঢাক গুড় গুড়ে কাজ নাই—চল আমরা সকলেই যাই।”

রাজা দূর হইতে ইহাদিগের ফুসফুস্ পরামর্শ শেখিয়া সব্যস্তে নিকটে আসিয়া আরক্ত নগনে বলিল, “তোরা এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিস?—কাহারও সর্বনাশ কাহারও পোষ্যাস—গৃহদাহে আমার যথাসম্ভব নষ্ট হইল, আর তোদের আনন্দ ও পরামর্শ!”

বুঝু বলিল, “মহারাজ, আমরা মদ কথা বলিতেছি না, আপনার গৃহদাহে আমাদের সকলেই চৈতন্য হইয়াছে; ঘেরূপ তৃণকাঠের গৃহে আমরা বাস করি, তাহার সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়; গৃহদাহাদি সমস্ত দৈব উৎপাত, তাহার শাস্তি করা প্রয়োজন।”

রাজা বলিল, “হাঁ—দৈব বৈ কি! আপনাদিগের দোষ কাটাইবার ওটি দিব্য সহজ উপায়।”

চিমাই বলিল, “মহারাজ, আপনার গৃহদাহে অমাদিগের কি দোষ?”

রাজা বলিল, “আমার অহমান, এটি দুষ্ট লোকের ক্রিয়া, এটি দৈব ঘটনা নহে! ভাল, যে কারণে হটুক, যখন গৃহদাহ প্রকাশ পাইল, তখন তোমরা জনপ্রাণী কেহ সাহায্য করিতে আসিলে না—ইহার অর্থ কি? আমি অন্যই সকলের সমুচিত দণ্ড করিব।”

বুঝু বলিল, “মহারাজ, আমরা তখন কেহই গৃহে ছিলাম না; আমরা এইমাত্র জল হইতে আসিতেছি, এখনও গৃহে যাই নাই।”

রাজা বলিল, “হাঁ, সেটি তোমাদিগের পরামর্শ মত ঘটয়াছে ;—তোমরা সকলেই ইচ্ছাক্রমে স্থানান্তরে ছিলে । কিন্তু সে বাহা হউক, তোমাদিগের বালকেক্ষণে কি কেহ গৃহে ছিল না ? আমি স্বয়ং ঘরে ঘরে ঘাইয়া লাম খরিয়া ডাকিয়াছিলাম, তাহার কেহ উত্তর দিল না ; কেহবা ঘরে থাকিয়াই বলিল, আমার অস্থখ করিয়াছে ঘাইতে পারিষ না । সুত্বে, তোমার স্ত্রী বাহিরে আসিয়া বলিল, ‘মহারাজ, গৃহে অগ্নি লাগিলে নির্ঝণ করিতে নাহি—ব্রহ্মার পূজা দিয়া বাহাতে অগ্নি আরও প্রজ্জলিত হয় তাহা করা উচিত—ব্রহ্মার খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহাকে তরপুর খাইতে দিন।’ ফলে তোমার পরিবারের মতে আমার অপচাপর গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া ব্রহ্মার পূজা করা উচিত । আমি তাই তোমার স্বরেও আন্তর লাগাইয়া দিয়াছি !”

বুঝু বলিল, “মহারাজ, আপনার যত্নে আচরণ করুন, আমার তাহান কোন বিয়ক্তি নাই ।”

চিমাই বুঝুর নিকটে যুঝুঘরে বলিল, “এ দুট্টটা বলে কি ! এ কি সত্য তোমার গৃহে অগ্নি লাগাইয়াছে ?”

পুঁড়া বলিল, “ইহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই ! চল আমরা আপন আপন ঘরে বাই ।”

বুঝু বলিল, “মহারাজ, সত্যই কি আমার গৃহে অগ্নি দিয়াছেন ?”

রাজা বলিল, “সত্য না ও কি, আমি তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতেছি ?”

বুঝু বলিল, “আমি চলিলাম,” ব্যস্তে বগুহাতিমুখে গেল । পরিভের সাহু পাশ হইয়াই ভূতদেশ হইতে দেখে যে, উপত্যকাতল একেবারে কালিমার্ঘ—গ্রামের একদিক্ হইতে অপর দিক্ পর্যন্ত সমস্ত গৃহগুলি লুপ্ত হইয়া ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছে । দেখিবামাত্র চিমাই, পুঁড়া, লীলা প্রভৃতি সকলে একেবারে জলিয়া উঠিল, সকলেই হতশ হইয়া ভ্রমে বলিল ; নীচের দিকে দৃষ্টিপাতে দেখে যে, একটিও ঘর রক্ষা হয় নাই,—অসামান্য বালক বালিকাগণ ফুলকামুখী হইয়া শূণ্যহৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক্ করিয়া খেড়াইতেছে, কেহই কোন বিশেষ উদ্দেশে কোথাও বাইতেছে না, অনুমানে বোধ হইল, যেন তাহারা কোথায় বাইরা জুড়াইবে ও কি করিলে সুখী হইবে, ভাবিয়া ঠিক কারণে পারিতেছে না ; স্ত্রীলোকেরা ইতস্ততঃ হইয়া জলন্ত অঙ্গারমধ্য হইতে দীর্ঘ কাঠদণ্ড দিয়া টানিয়া হুইএকটা পাত্ৰাদির উদ্ধারের অস্ত্র চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু অগ্নি এখনও নির্ঝণাপিত হয় নাই বলিয়া কিছুই ফলবতী হইতেছে না—অগ্নির তাপে নিত্যন্ত নিকট হইতে লাহস করিতেছে না ; কিন্তু হুই একবার কাঠদণ্ড জলন্ত অঙ্গারমধ্যে প্রবেশ করার দণ্ডটি জলিয়া উঠিতেছে—অঙ্গার নাড়াচাচার চারিদিকে অগ্নি-ফুলিজ বায়ুবেগে বিলুপ্ত হইতেছে ; মধ্যে মধ্যে কোথাও অঙ্গ অঙ্গ ধূম উঠিতে উঠিতে ধপ করিয়া জলিয়া উঠিল ! পুংহের হাঙ্গর ও কাঁড় সমস্ত জলিয়া গিয়াছে, কেবল মোটা মোটা ভক্তগুলি কালিমার্ঘ হইয়া

দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও একটা চেটাইয়ের দক্ষবশেষ কোথায় আছে; কোন টুকরার চারিদিকে কাল রেখা, কাহার দুই দিনে কাল অসার; কোথাও বৃহৎ ব্যক্তচর্য দক্ষ হইয়া সঙ্কুচিত অবর্ণনীয় ক্ষুদ্র কদাকার শিশুগাত্র হইয়াছে; কোথাও বশেষ চোঙ্গার গাঁট মাত্রটি ফাটিয়া আছে, তাহার অগ্রভাগ দক্ষ হইয়াছে; কোথাও ধনুকের ছিলাটিমাত্র পুড়িয়া যাওয়ার, ধনুটি দূরে ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে; কোথাও কাটারির বাট পুড়িয়া গিয়াছে ও অন্ত্রভাগ উত্তাপে বিকৃতাবস্থ হইয়াছে; নিম্নদেশে চর্মমাংস ও অপরাপর-দ্রব্য-দগ্ধজাত দুর্গন্ধে পূর্ণ, কোনটি বা বায়ু-গে অগ্নিতেছে। যদিচ বুদ্ধ ও তাহার দলহ সকলে অনেক উজ্জ্বল ভূগুণ্ডে বসিয়াছিল, কিন্তু এক একবার বায়ুবেগে এমনতর হলকা আসিতে লাগিল যে, তাহাদিগের সেহান ত্যাগ করিতে হইল—সকলেই একমনে যেন অগ্নিদ্বারা অকৃষ্ট হইল—ক্রমে নিম্নদেশে নামিতে লাগিল। ক্রমে উপত্যকাভাগে পৌঁছিতে, তাহাদিগকে দেখিয়া বালকগুলি দৌড়াইয়া আসিয়া উজ্জ্বলতার কাঁদিতে লাগিল,—এতক্ষণ যেন আশ্রয় অভাবে তাহাদিগের শোক লাগে নাই। স্ত্রীলোকগুলিও বালকবৃন্দের ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালকবৃন্দের কাতরধ্বনি ও স্ত্রীলোকদিগের আর্তনাদে বুদ্ধ-প্রমুখ মৃগাধান হইতে প্রত্যগত চৌধুরী ও দল্লুইরা আর দাঁড়াইতে পারিল না। তাহারাও ক্রন্দন করিতে করিতে বেহ একটি, বেহ দুই সন্তান ক্রোড়ে করিয়া লইল; কেহ বা আপনার স্ত্রীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক পরে বালকবৃন্দ স্ব স্ব পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-স্বভনের ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া স্থির হইল, কেহ বা হালস্ফাবজুলভ অমোদে নিমগ্ন হইল; বেহ দীর্ঘ কাষ্টদণ্ড হইয়া জলদঙ্গরে ঘোঁচা দিতে লাগিল, আর অসহ্যহন্দোলে যে অগ্নিস্ফুটিল ছুটিল তাহা দেখিয়া মহা-উৎসাহে নাচিতে লাগিল। বেহ বা তাহার পিতার ক্রোড়ে বসিয়াই বলিল, “বাবা কি এদেহিন্? শিকারের খংগেস খাব,” জনকেরা ক্রমে মোহ হইতে মুক্ত হইয়া শিকারলব্ধ মাংস পাক করিতে নিযুক্ত হইল। বুদ্ধ আপনার পরিবারকে ডাকিয়া আদ্যন্ত সমস্ত অবগত হইয়া বলিল, “দেখ মেসী, তুমি এ কথা কাহাবো বলিও না। আপাততঃ চটকার প্রতি সমস্ত হেংবের খেরপ বোপ, তাহে এই সমাচার পাইলে তাহাকে আর জীবিত রাখিবক না।”

মেসী বলিল, “আমায় কিছু বলিতে হইবেক না—গ্রামের সবচেই দেখিয়াছে ও স্বকর্ণে শুনিয়াছে। গ্রামের “রফেং মণ্ডে চাওঁচন মাত্র ছিল; তাহারা যথাসাধ্য অগ্নি নিকীর্ণপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যা বাষ্ঠ ও ভূগে অগ্নিস্পন্দ হইলে বান্ধব অপেক্ষা ভেঙ্গে জালিয়া উঠে, তাতে আবার সেই সময় খেরপ দুর্গা বায়ু বলিতে লাগিল, কেহই নিবটে বাইতে পারিল না—এ দেখ বতদুয়ের গাছ সকল ঝলসিয়া গেছে।”

বুন্ধ পূর্বদিকে বাইরা দেখে যে, দেবদারু ও সরল গাছ কয়েকটি জলিতেছে ও মাঝে মাঝে ভীষণশব্দে কাটিয়া বাইতেছে ।

বুন্ধ বলিল, “লটকা কি সত্যই শহস্রে আগুন লাগাইয়াছিল—না তাহার গৃহের উদ্ভা আসিয়া গ্রামে পড়িল ?”

মেথী বলিল, “না—সে ভুল হইতে সকলকে সাহায্য কার্তে ডাকায়, গ্রামে কেহই ছিল না বলিয়া উত্তর না পায়। দোষপরবশ হইয়া নিম্নভূমিতে আসিয়া আমার ঘরের পার্শ্বে চুল্লা হইতে জ্বলন্ত সরল ডাল গহিয়া প্রথমে আমারই চালে আগুন লাগাইল । পরে অগ্নি এমত বেগবান হইল যে, কেহ সামলাইতে পারিল না । অগ্নিবিপ্লব দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা লটকাকে মারিবার আভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলে, লটকা পলায়ন করিল। কেহ কেহ প্রস্তর ফেলিয়া মারিয়াছে, তাই একটা তাহার অঙ্গে লাগিয়া থাকিবেক ।”

বুন্ধ এই কথা শুনিয়া নীরব হইল । কতক্ষণ পরে গ্রামস্থ সকল পুরুষ একত্র হইয়া মহা কোলাহলে ও কলরবে বুন্ধের নিকটে আসিয়া বলিল, “বুন্ধ, আজ আমরা লটকার প্রাণসংহার করিব ; সে যখন আমাদের নিদ্রাসিত করিয়াছে, তখন আমরা তাহাকে এ জন্মের তরে মারিব ।”

বুন্ধ বলিল, “তোমরা ক্ষান্ত হও, আমাদের ক্ষমা কর । সে তোমাদিগের ঘর আগাই-বার আভিপ্রায়ে করে নাহ ; আমার পরিবারের ক্রটি দোষেরা দেশের রাজা, আমাদের শাসন করিতে—দেবযোগে সেই অগ্নি তোমাদিগের ঘরে লাগিয়াছে ; অতএব তোমরা আমাকে দণ্ড দাও ।”

সকলে চাঁৎকার করিয়া বলিল, “আর আমরা তোমার কথা শুনিব না ।” সকলে হস্তা করিয়া ভূমির দিকে ধামান হইল । বুন্ধ, তাহাদিগের উত্তোজিত অবস্থা দেখিয়া লটকার প্রাণের জন্য ভীত হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে ধামান হইল ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

“জামিঃ সিন্ধু নাং ভ্রাতা ইব শত্রুঃ ইত্যন্নরাজা যনাভুত্দিয়ং
বাউহজতঃ বনাবহাদামঃ হ দাঁত রোম পৃথিব্যাঃ ॥”

ভূক্তুর যুগাধান হইতে প্রত্যাগমন করিতে “স্বাধক বলস” হইয়াছিল । এখন রাজ-বাটীর নিকটে আসিয়া দক্ষাশিষ্ট বর, দ্বারু দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, নিকটে কেহই নাই যে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করে ; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া চিত্তিত হইল । চতুর্দিক্ জনশূন্য, একটি পক্ষীরও রব নাই—কেবল বেগবান্ বায়ুর সরল

বৃক্ষের চমরীপুচ্ছাকৃতি পত্রের মধ্যে শৌ শৌ শব্দ, মধ্যে মধ্যে নিম্নদেশে উপত্যকা ভাগের অসংবংশের গ্রাসিষ্কেট । কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কোথায় বাইবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি প্রায় হইল ; পরে কতক্ষণ এক দৃষ্টিতে ভ্রমাবশিষ্ট গৃহের স্থান দেখিয়া মুখ ক্রিয়াইয়া প্রাণাণমন করিল । পরে একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে রাজমহিষী সভরে ও মৃগযরে “ভুচ্ ভুচ্” বলিয়া দুইবার ডাকিয়াই বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইল । জনশূণ্য স্থানে অকস্মাৎ আপনার নাম শুনিয়া ভুচ্ চমকিয়া উঠিল, বলিল, “কে আমাকে ডাকে ?”

রাণী বলিল, “ভুচ্, আমি—বিদাই ।”

বিদাই-নাম শুনিবামাত্র যেন মৃতশরীর সজীব হইল, ভুচ্ ব্যস্তে বলিল, “কোথা ? এস এখানে কেহই নাই ।”

বিদাই বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইবামাত্র ভুচ্ তাহার নিকট বাইরা বলিল, “এখানে একা কেন ?”

বিদাই বলিল, “আমার সমূহ সঙ্কট, আমি প্রাণের দ্বারে এখানে লুকাইয়া আছি ।”

ভুচ্, বলিল, “কেন লটকা কি আবার মত্ত হইয়া তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে ! সে নষ্টের দৌরাগ্ন্যে ত বাস করা দায় হইল । হুট্ট লোকের ক্ষমতা হওয়া অতি ভয়ানক । সে ত সর্বদাই তোমাকে নির্দয়ভাবে গ্রহণ করে,—এমত কঠিন-হৃদয় লোক ত দেখি নাই । একেই স্বভাবতঃ অসন্তোষ একশেষ, তাহাতে আবার পান করিলে পান্ডুর অধম হয় ।”

বিদাই বলিল, “এখন আর তাহার ভয় করি না—সে দিবাভাগে কিছু কহিতে পারি বেক না । তবে রাত্রিতে দেখ কোন্ নাছে আশ্রয় করে । জীবিতাবস্থায় বত দৌরাগ্ন্য করিত, অহুমান করি, এখন ততোধিক অপকারী প্রেত হইবেক । কিন্তু তাহাকে যে প্রকারে মারিয়াছে, সেরূপে আমরা শুবৎকে মারি না ! লোভে তাহার শরীর কতবিকৃত হইয়াছে ! সে পলায়ন করিলে প্রাণস্থ লবলে তাহার পশাৎ ধাবমান হইল ও চলিতে চলিতে লোভী চিহ্নেপ করিতে লাগিল । আহা ! তুমি দেখিলে তোমারও মনে দয়া হইত । লটকা পলাইতে পলাইতে হোচট বাইরা পড়িয়া গেল, তবুও শিঙার নাই । লটকা উঠিতে উঠিতে আরও লোভাঘাত ! একবার কদ্রিয়া দৌড়িয়া আবার পড়িয়া আবার উঠিয়া পাহাড়ের কোলপৃষ্ঠে গেল । অবশেষে হতবাস হইয়া বখন পড়িল, তখন একেবারে তিন চারিগত লোক তাহাকে লাঠী, বল্লম দাও প্রভৃতি অস্ত্রে কেহ বা বড় বড় প্রস্তরাঘাতে তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিল ; সর্বাঙ্গ পেষিত হইল—মুখ নাসিকা কিছুই চেনা গেল না ; প্রহারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল ! সর্বাঙ্গ চক্রে রঞ্জিত আর হুল-বর্দ্ধমাত্যঙ্গ শরীর ; একটা পাঞ্জি তাহার শরীর ভেদিয়া প্রস্তরে

ঠেকিয়া ভাঙিয়া গেল, পাঞ্জর অগ্রভাগ কড়কটা বাঁশ সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া রহিল। তাহার মৃত্যুর পরও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফুকুরকে খাওয়াইল ও মধ্যে মধ্যে বাজ শিকরে চিল প্রভৃতি পক্ষীকে খাইতে ফেলিয়া দিল—দেখিয়া আমি ‘লায়ন’ করিয়াছি। তাহার পুত্র নাগাকেও সেইরূপ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। এখন আমাকে দেখিলেই মারিবেক; তুমি আমাকে রক্ষা কর”—বলিয়া ভুচ্চর পা দুটি হাত দিয়া ধরিল।

ভুচ্চর বলিল, “আহা! ও কি কর, তুমি রাজমহিষী—স্ত্রী—লক্ষ্মী—তুমি আমার পান্দম্পর্শ করিও না। নিশ্চিন্ত হও, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কেহ তোমাকে মারিবেক না।”

বিদাই বলিল, “ভুচ্চর, তুমি সে নৃশংসগণের নিকট বাইও না; তোমাকে দেখিলেই মারিবেক।”

ভুচ্চর বলিল, “লটকার সঙ্গে এখন আমার কি হইয়াছিল?”

বিদাই বলিল, “তা আর কি বলিব—সে আপনার পাপের ভোগ ভুগিয়াছে, কিন্তু নাগার অস্ত্র আমার হুঃখ হইতেছে। আহা! নিরপরাধী বালক, সে আমাকে কখন সম্যক মতন ব্যবহার করিত না—সে আমাকে ভাল বাসিত।”

ভুচ্চর বলিল, “লটকাকে মারিল কেন?”

বিদাই বলিল, “লটকার গৃহে, উপত্যকা হইতে কে একজন সাজার শর মারিয়া বরে আশ্রয় দিয়াছিল। লটকা যদিচ তাহা দেখে নাই, কিন্তু গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে দেখিয়াই, এটি শত্রুপক্ষ লোকের কণ্ঠ বিবেচনায় ও অনুমানে প্রথমে উপত্যকার বাইরা সাহায্যের অস্ত্র সকলকে ডাকিয়াছিল। গ্রামে প্রবেশ ছিল না। পরে বুকুর স্ত্রীর সহিত কি বচসা হওয়ায়, বুকুর চুল্লী হইতে অলসকার লইয়া তাহার গৃহের সহিত চালে লাগাইয়া দিল; সেই অগ্নিতে সমস্ত গ্রামটি অগ্নিয়া পিয়াছে।”

ভুচ্চর বলিল, “এ নরাধমের তুল্য নটহরণ হুটবুদ্ধি পিশাচ আমি কখন দেখি নাই। আমায় বর কি হইয়াছে?”

বিদাই আবার ভুচ্চর চরণদ্বয় ধরিয়া বলিল, “আমার কোন দোষ নাই—তোমারও গৃহনাশ হইয়াছে।”

ভুচ্চর বিদায়ের হাত অতর করিয়া বলিল, “তুমি ঐ দরৌমধ্যে অবস্থান কর; আমি একবার দেখিয়া আসি।”

ভুচ্চর চলিয়া গেলে, বিদাই মালবদনে ভরকল্লিত কলেবরে সতর্ক পদবিক্ষেপে সশঙ্কিতমনে চারিদিক দেখিতে দেখিতে দরৌর দিকে গেল। এদিকে ভুচ্চর প্রাণভাগ হইতে ‘নিরভুমির কালিমাবর্ণ’ দেখিয়া হতাশপ্রায় হইল, চিন্তিল, আমার গৃহ ত দেখিতে পাই না, তবে এখন কাছুরা জীবিত থাকিলেই আমার বধেট। প্রত্যক্ষ

উপত্যকার অবতারণ হইবামাত্র বুকুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, বুকু বলিল, “ভাই, এই ত বিপদ। লটকাও মারা পড়িয়াছে, আর উৎকৃষ্ট গ্রামকূটে নিরপরাধে নাগা রাজকুমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আহা, আমিই এ সমস্ত অত্যাচারের মূল!”

ভুচ্চ বলিল, “আমার ত বর জালিয়া গিয়াছে। এখন কাছুরা কোথা জান?”

বুকু বলিল, “কাছুরা ভাল আছে, কোন চিন্তা নাই। সে তোমার ব্যাক্কে খুঁজিতে গিয়াছে।”

ভুচ্চ বলিল, “কখন গিয়াছে?”

বুকু বলিল, “লটকার উপর হস্তার সময়, সেও ভুগুতে গিয়াছিল। তার পর রাজার মৃত্যুর পর সে আমাকে বলিল, চাচা, দাদা! কোথায়—এখনও আসেন নাই। আমাদিগের ব্যাক কোথা দেখিতে পাইতেছি না। তিনি আসিলে তুমি বলিও—আমি ব্যাককে ধরিয়া আনি।”

“ভুচ্চ বলিল, “লটকাকে কোথা মারিল?”

বুকু বলিল, “তাহাকে খেদাইয়া মারিতে মারিতে দক্ষিণের শিবদরীতে সে পলাইল, সেইখানে তাহার শেষ। পরে আবার তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র নিরপরাধ নাগাকে সেই দরীতে লইয়া মারিল। আহা, তাহার কারাগার আর্তনাদ এখনও আমার মনে বিদ্ধ হইয়া আছে! গ্রামকূট এমত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহার এ পক্ষের স্ত্রী বিদাইকেও পাইলে মারিয়া ফেলিত।” বুকু ঈষদ্বাহস্যবদনে—“কিন্তু তোমার বিদাই স্বেচ্ছুরা, সময়কালে এমত পলাইল যে, কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না!”

ভুচ্চ বলিল, “এখন সে স্ত্রীটাকে বাঁচাইবার কি হইবেক?”

বুকু বলিল, “আপাততঃ কেহই তাহার নাম করিতেছে না; তবে দেখিলে হয় ত রাগের উদ্বেগ হইতে পারে। গ্রামকূটের চরিত্র বিচিত্র, কিছুই বোঝা যায় না—সময়ে অতীব সহিষ্ণুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার কখন কখন সামান্য কারণে জালিয়া উঠে। বাহা হউক, এখন দুই চারি দিনই বিদাই কোথাও লুকাইয়া থাকুক, পরে বাহা হয় বিবেচনা করা যাইবেক। নন্দরামের কোন সমাচার নাই;—এখনও জয়ন্তীপুর প্রকৃত অরাজক। ভালই হউক আর মন্দই হউক, বাহা হউক, দেশের একটা মস্তক ছিল;—এখন আমরা হস্তপদাদি বিশিষ্ট কবকের তায় অকর্ণ্য হইলাম। মহারাজ শিবচন্দ্রের পুত্র হৃদয়কুমার কি জীবিত আছেন?”

ভুচ্চ বলিল, “কেন—বঙ্গ হইতে যে লেবুর নৌকা আসিয়াছে, তাহাতে সকল সন্সমাচার? আমাদিগের যে পাঁচ শত নাগাসৈন্য নেল, তাহার অবশ্যই কৃতকার্য হইয়া আসিবেক—সন্দেহ নাই।”

বুঝু কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিল, “ভুজ, তুমি বালক !—বঙ্গে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে পাঁচ শত, কি পাঁচ হাজার কুকৌশল্য কিছু করিতে পাবিবে না; তবে নন্দরামের পরামর্শ, কোশলে সূর্য্যকুমারকে এখানে আনিবে। বাহা হউক, এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেই ভাল হয়।”

ভুজ বলিল, “এখন যদি আঙ্গানীনাগারা আমাদিগের অগ্রাঙ্ক সমাচার পায়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ষ অগমান স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ দিতে ছাড়িবেন না।”

বুঝু বলিল, “এখনও সকলে মৃগাধান হইতে ফেরে নাই; একত্র হইলে একটা পরামর্শ করিতে হইবেক।”

ভুজ বলিল, “এখনও লট্কার দলভুক্ত কি কেহ আছে? তাহা থাকিলে আশ্র-বিচ্ছেদ সম্ভব।”

বুঝু বলিল, “ইদানীং লট্কার কুব্যবহারে সকলেই ত অসম্মত ছিল। কেবল দুই চারি জন দুষ্টাভিসন্ধি লোকেই সীম স্বার্থ ও ইষ্টলাভেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিত; কিন্তু উপত্যকার গ্রামে অগ্নি লাগা অবধি সকলেরই সমান হানি হওয়ার আশঙ্কা বুদ্ধ সকলেই একমত হইয়াছে। অপর গ্রামের কেহই লট্কার বশবর্তী ছিল না। কিন্তু দুষ্টলোকের আত্মীয়তা লক্ষ্যহীন। একজন ক্ষমতাশালী লোক না থাকিলে সকল প্রকার প্রযুক্তির লোককে বশীভূত করিতে পারিবেক না।”

ভুজ বলিল, “বিদাহিকে কোথা রাখা যায়? আমি ত হাকে শিবচন্দ্রের দরীতে লুকাইতে বলিয়াছি।”

বুঝু বলিল, “ভাল হইয়াছে—সে নিতান্ত নিভৃতস্থান। কিন্তু বিধাতার কি নিয়ম! সেই দরীতেই শিবচন্দ্রের অকালমৃত্যু হয়। এখন বলিতে কি, প্রতাপাদিত্যই তাঁহাকে শেষ করে। নন্দরাম বলিয়াছিল যে, শিবচন্দ্র সাধ ঐ দরীর নিকট পড়িয়া গেলে, ক্ষণেক পরে চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া নিকটে বঙ্গবার জলগান করিতে অতি বটে গড়াইয়া যান, প্রতাপাদিত্য সেই স্থানে তাঁহাকে আশ্রিতপূর্ব্বক প্রাণনষ্ট করিয়া দরীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান।”

ভুজ বলিল, “ঐ দরী, দেখিতে পাই, ভয়ঙ্করীরাভিগের সম্মুখ। বিদাহী তথায় থাকিলে কি আনি কি যতে!”

বুঝু বলিল, “আপাততঃ কোন চিন্তা নাই! আমার মতে সূর্য্যকুমারের এখানে আসা পর্য্যন্ত বিদাহী এখানে থাকিলেই ভাল হয়। বেননা কি আনি, গ্রামকুটের কখন কি প্রকার মন—কণেকে পরিবর্তন হয়, অবারণ হয় পায় আর অবস্থায় আসিয়া উঠে!”

বুঝু বলিল, “ঐ নাও কাছুরা আসিবেহে।”

কাজুয়া একাও একটা ব্যাকের পৃষ্ঠে শুইয়া আছে, ব্যাক ব্যাক লাড়িতে লাড়িতে লঙ্ঘনের নিকট হইয়া দুই চারিবার বায়ুপ্রাণ লইয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল ।

যুহু বলিল, “ব্যাকপর্যন্ত লট্কার অভ্যাচারে বিন্মিত হইয়াছে । দেখ, দাঁড়াইয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুচ্ছ উচ্চ করিয়া ফিঃিয়া দৌড়িল ।”

কাজুয়া পৃষ্ঠে শুইয়াছিল ; ব্যাক মুখ ফিরাইলে, তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল ও দীর্ঘ দণ্ড লইয়া আঘাত করিল । কিন্তু ব্যাক মানিল না, কিছুদূর দৌড়িয়া গিয়া দাঁড়াইল, ফিঃিয়া দেখিতে মানিল । ভূচ্, ভ্রতপদে ব্যাকের নিকটে দৌড়িয়া গেল ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

“গামজৈব আহর্যতি লাক্জৈবো অপাবধাৎ ।

বগদ্রপ্যাখ্যাং তামক্ৰেকদিতি মন্ততে ॥”

সন্ধ্যোপে গেড়িঙ্গের বন্যরে প্রথম পদোতে একটা মলিন ডাকিয়া ঠেস দিয়া হাতে একটি ডাবা হাঁফা লইয়া বৈদ্যনাথ বসিয়া আছে । বৈদ্যনাথের বিষয়বসন আর অঙ্গ পরিসর মলিন পরিধেয় জাহ্নব উপর উঠিয়াছে । বৈদ্যনাথের লাভীয় উর্দ্ধদেশে কিছু আশ্রয় নাই । নিকটে দড়ির আলনায় একটি কৈঁচাম উত্তরীয় রহিয়াছে ! পদীর ঘরটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত ; ঘরে প্রবেশ করিয়াই বামদিকে একখানি তক্তা পাতা, তাহার উপর একখানি সালা চাদর বহুব্যবহারে স্থানে স্থানে কালী পড়ার বিকৃতবর্ণ হইয়াছে । ঘরটি উত্তর দিক্‌তে দীর্ঘ । ঘরের পূর্বদিকে কয়েক খানি তক্তা পাতা, তাহার দীর্ঘ কাটার সপের উপর এক এক ছোট ছোট বাস্স ; সমুদ্যে মোটা মেটা খোকা, খতিয়ান, রোজনামা প্রভৃতি নানাবিধ হিসাবের খাতা পড়িয়া আছে । এতি বাস্সের নিকট এক একটি মোটা মাটি লাগান দোয়াত ও একটি একটি করিয়া ছোট মেটে হাঁড়ীর ভিতর চোতা কাগজ ও বহুব্যবহৃত চুনাট । এতি বাস্সের সমুখে এক এক জন বস্ত্র বলিয়া আছে । তাহার দক্ষিণে একজন করিয়া মুহুরী পাকাখাতা লিখিতেছে ।

বৈদ্যনাথ তামাক টানিতে টানিতে বলিল, “মজিকজি, গোবিন্দের সমাচার কি ? আজ কতক দিন হইল বরদাকর্ষ মানসিংহের সঙ্গে গেল, কোল সমাচারও পাওয়া গেল না ।”

মজিকজী প্রবীণ দেওয়ান ; বহুকালাবধি বৈদ্যনাথের সংসারে প্রতিপালিত । মজিক-জী প্রিতা পূর্বে রাজা রামচন্দ্র দ্বায়ের দপ্তরে কাজল্‌গোই ছিল । বৈদ্যনাথের পিতামহ

আমলে—মল্লিকজী বাংলা, বহাঙ্গ, মেডিকেলবন্দরের গদীতে লেখা পড়া শিক্ষা করেন ; পরে ক্রমে মুদ্রাপ্রণ হইতে এক্ষণে প্রাণ দেওয়ানজী হইয়াছেন । পৈত্রিক কিছু সম্পত্তিও আছে । তাহার স্বীয় রোজগার বেন মোগার উপর সোহাগা হইয়াছে । মল্লিকজীর কথা পুত্র কিছুই নাই । মল্লিকজীকে জন্মবক্ষ্য বলিলেও হয় । মল্লিকজী গৌরাদ—‘মুগকাণ্ড’ ; ‘সেরা গাতি রকমের ভুঁড়ি,’ গলায় সূক্ষ্ম কাঠের মালা, তাহার চারি পাঁচদানা সোণার হাটার পরিমাণের রুম্বাকও আছে, একটি সুন্দর মুক্তা, একটি পলা, একটি রূপার বড়াই । কলে মল্লিকজীর কণ্ঠে পঞ্চরত্নের অভাব নাই—নবরত্ন হউক বা না হউক সাত আট রত্ন ছিল । মল্লিকজীর একটি সৌখিনী রকমের শিক্ষা, তাহার অগ্রভাগে একটি ছোট সোণার মাহুলী ! কেশের মধ্যে একটি কুন্দ কুন্দ । মল্লিকজীর উত্তরীয়, পশ্চাতের দেওয়ালের গজকন্তে ঝুলিতেছে । মল্লিকজীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ উর্দ্ধ পাঁচ বৎসর, চক্রে কাঁচকড়ার বাধান বড় গোল চসমা । মল্লিকজী শান্ত, কেমন লগাটে দীর্ঘ সুগোল রক্তচন্দনের কোঁটা । মল্লিকজী বৈদ্যনাথের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে চসমা নামাইয়া বহে কোঁচায় কাপড় দিয়া তাহার দাঁথর দুটি আস্তে আস্তে মুছিয়া চসমাটি ব্যঞ্জের উপর রাখিয়া দীর্ঘ ওষাতির পাকা কলমটি কাণে রাখিয়া বলিলেন, “আস্তে—পেগিবেস্বর কোন সমাচার পাই নাই ! অসুস্থান করি, দুই এক দিন মধ্যে আসিবেক । বরদাকণ্ঠের সমাচার উড়া তাহার শুনিয়াছি যে, তিনি আরাফা হইতে অসুপন্নামকে ধরিয়া লইয়া স্বামগড়ে কিরিয়া গিয়াছেন ।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “সে কেমন কথা ! সে যদি আরাফা যাইত, তাহা হইলে অবশু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত—আরাফা যাইবারও এই পথ । এমন হবে না । তে.মাকে কে বলিল ?”

মল্লিকজী বলিল, “আমাদিগের চড়নদারের নিকট শুনিলাম । চড়নদার চটগ্রাম হইতে আসিবার সময় আরাফা পেরে কোঁচাওগাও নিকট শুনিয়াছে ।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “কে চড়নদার—তাহাকে ডাকাও ।”

মল্লিকজী একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিল । সে চলিয়া গেলে, মল্লিকজী বলিল, “আপনি সাহাবাজপুর হইতে কি ব্যবস্থা পাইলেন ?”

বৈদ্যনাথ বলিল, “ব্যবস্থা পাওয়া অর্থাৎ আমি মনস্তাপে আছি—ব্যবহার সমস্তই অক্ষমতার পক্ষ । আমি এমন জানিলে, আর্হা ! তাহাকে এত ভৎসনা করিতাম না । বাহা হউক, সে এখন দিব্য আশ্রয় পাইয়াছে । কুমি রাচগড়ে একখানা পত্র পাঠাই, তাহার ব্যবহার নকল পাঠাইও, আর পত্রে বরদাকে লিখিবা যে, সে অক্ষমতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যবহার বিষয় অবগত করায় । আমি আরাফা হইতে যে পত্র পাইয়াছি, সেখানিরও নকল করিয়া ঐ পত্রসহ বরদাকে পাঠাইবা । অক্ষমতা সত্যই

আরাকান-রাক্ষস—কেন তুমি আমার দহিত বিবাহ করিতে হইবে ভয়ে, সে পলায়ন করিয়াছে। অরুণ্ডতী লক্ষ্মী আর শ্রীমতী।”

মল্লিকজী বলিল, “আমি ত তখনই মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, আপনি তখন তুলিলেন না—কেননা যে আপনার কে। হইল। ফলে আমার অনুমান, অরুণ্ডতীকে আপনার পুত্রবধূ করিতে পারিলে আপনার দর্শ প্রকারে মঙ্গল। সে রাজকন্যা ও সব লক্ষণবতী—তাতে আবার ধর্মভোগ; আপনার বরদার সহিত তাহার প্রেমও জন্মিয়াছে। এ সম্পর্কে আপনার ব্যর্থতায় উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “আমি সেই বিষয় ত ওত্তমোত্ত করিয়া বিবেচনা করিলাম, আমার এখন দিব্য বোধ হইয়াছে যে, এ সম্বন্ধে আমার ভ্রমের বটে। মহারাজ রামচন্দ্র রায় তনিতৈছি খালাস হইয়া আসিতেছেন। রমাই এই আমাকে পত্র লিখিয়াছে। আর মহারাজ সহজেও আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার নৌকা ও ধনের সহায়তার অনেক প্রণয়না করিয়াছেন। তা আর অধিক কি হইয়াছে,—তিনি দেশের রাজা, চিরকাল কাম্যবাসে থাকিবেন, তাহা আমরা লেখিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে থাকিতে পারি। আমার ক্ষণ কক্ষ্মই করিয়াছি। তাহার পত্রও বরাবর পাঠাইতে চাহি, তবে রাজ অক্ষর না পাঠাইয়া একটা অনুলিপি পাঠাও। তুমি এ পত্রখানি দেখ নাই—এই লও” বৈদ্য পাণ্ডের বাক্য হইতে পত্র দুইখানি মল্লিকজীর হাতে দিলেন।

মল্লিকজী পত্র দুইখানি লইয়া চক্ষু চমকিয়া দিয়া আনন্দ ও অস্ত হইতে আদি পর্যন্ত দুই তিনবার পাড়িয়া চমকি চক্ষু হইতে খুলিয়া পূর্বমত মুছিয়া বাল্লের উপর রাখিয়া আবার পত্র দুইখানি হাতে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, “মহাশয়, আপনার অন্তঃস্থ সু-সুন্দর, এত টাকার করিয়াছিলেন তাহা নান্দ হইল। এ আপনার চারিখানা জাহাজের লভ্য এ-কবারে আদায় হইল। আপনার দণ হাজার টাকার বাসনা নৌকা ও পঁচশ গোলের খোরাক ও অন্তে উল্লবনখ্যা আর দশ হাজার পড়ক, তিনি আপনাকে হাথিখানিকর সম্বল দিলেন আর চন্দ্রদ্বীপের খাজনাখানার উপর পকাশ হাজার টাকার চিঠি দিয়াছেন। আর বড় লভ্য চান।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “মল্লিক, অর্থলভ্য ত বটেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ আছে। তিনি লেখেন যে, তুমি আমাকে পত্র দিবেন।” বৈদ্যনাথ এই কথা বলিয়াই আর আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিল না—তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু নিপতিত হইল। বৈদ্যনাথ একটু স্থির হইয়া বলিল, “একবার আমার ষাটমাজিকে ডাকাও, রাজ্য-রামচন্দ্রের সমাচার লইব।”

মল্লিকজী বলিল, “মহাশয়, ষাটমাজিকে ডাকিতে হইবেক না, সে শীঘ্রই এখানে

আসিবেক, তাহার একটা হিসাব বাকী আছে,—ঐ যে সে আসিতেছে” বলিয়া “কালু, এদিকে এস—” কালু বজ্রকলের প্রাচীন লোক, জাতিতে বাগদৌ, এককালে অত্যন্ত বলবান্ ছিল—এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মীকার হেতু শরীরের গঠন লোল হয় নাই। বৈদ্যনাথের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইল মল্লিকজী অঙ্গুলী দিয়া ঈঙ্গিত করিলে বৈদ্যনাথের তক্তার নিকট গিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ বলিল, “কালু, তোমার জাহাজের সমাচার কি?”

কালু বলিল, “মহাশয় অন্য একখানা জাহাজ আকাঙ্ক্ষা বেরওয়ান হইল। বোঝাই—ছোলা ও মটর, আর টারিশত ছাগল ও ভেড়ী; চড়নদার—বীরগোস্থায়ীর কনিষ্ঠ ব্রহ্মনাথ; মাল তাহারই, ষাট্রিক—দুইজন মাত্র; তাহার মধ্যে একজন কুতুবদৌয়ার নীচে মহিষখালি আদিনাথ দর্শনে যাইবেক, সেটি সাধু; আর একজন রামু বাইবেক তাহার নাম তনুমন, সে নিজে বলে মুংসুদি।”

বৈদ্যনাথ বলিল,—“হী—আমি আজ তিনদিন হইল একজন হিন্দুস্থানী সাধুকে মহিষখালী যাইবার ছাড় দিয়াছিলাম। তোমার আমদানী জাহাজের কি সমাচার?”

কালু বলিল, “মহাশয়, এখন বন্দরে দুইখানা জাহাজ আছে—একখানা পুরী হইতে শাগকণ্ঠ আনিয়াছে, আর একখানা চট্টগ্রামে যাইবে, জল লইতে, কল্য সন্ধ্যার সময় লাগিয়াছে। অপর কোন জাহাজের সমাচার কিছু পাই নাই। আর কাহার ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই! যে জাহাজ যে রাত্রি ফিরিবার লুটিয়াছিল, তাহা অন্য প্রাণে খুলিয়া গিয়াছে। মহাশয়, অন্য একজন মাল্লার মুখে শুনিলাম যে, আমাদিগের মহারাজ বশোহর হইতে রওয়ানা হইয়াছেন, দুই একদিন মধ্যে আসিবেন। নদীর ধরূপ জলের টান অন্য আবির্ভাবিত আসিতে পারেন। রমাইবীরের পত্র লইয়া একজন মাল্লা রাজবাটীতে গিয়াছে, রাজার শুভাগমন জ্ঞাত আয়োজন হইতেছে।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “কালু, রাজা রাগচন্দ্রায় আমাদিগের আত্মীয় রাজা,—আমায় ইচ্ছা তাহার শুভাগমনে আমবা বিশেষ আয়োদ প্রকাশ করি। তোমার আপাততঃ ষাটে কত ‘ডাঙ্গী পাওয়া যাইবেক?”

কালু বলিল, “মহাশয়, যত্ন করিলে ছোট বড় আর দুইশত ডিঙ্গী খোঁগাড় হইতে পারে। কি করিতে হইবে ও কখন প্রস্তুত চাহি?”

বৈদ্যনাথ বলিল, “কিছুই করিতে হইবেক না; তবে আমার ইচ্ছা, একবার রাজাকে আনিতে আগবাড়ানে যাইব কি বল?”

কালু বলিল, “মহাশয়, সে ত মহা কান্দেদর কথা। মাল্লাহলে মহা উৎসাহ হইবেক, একবার বাচের কথা বলিলেই হয়।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “ওবে যত ডিজি পার বাচের জন্য কল্য এতে প্রস্তুত করিও ; এখন যাও উদ্যোগ পাও ।”

কালু বৈদ্যনাথকে সম্বন্ধ করিয়া মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইলে, বৈদ্যনাথ বলিল, “কালু তোমার হিসাব এখন থাক, পরে হইবেক ; এখন ছুয়া করিয়া বাচের উদ্যোগ লেখ ।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “মল্লিকজী, ক’লুর কি কিছু পাওনা হইবেক ?”

মল্লিকজী বলিল, “মহাশয়, হিসাব না দেবিলে বলিতে পারি না ।”

কালু বলিল, “আমাকে গোটা পকাশেক টাকা দেওয়াইয়া দিলেই এখনকার মত কর্ত্ত চলে ।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “টাকা এখন তহবিলে অধিক নাই, বিশ টাকা লইয়া যাও ।”

কালু বলিল, “মহাশয় চল্লিশটি না হইলেই নহে ।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “আচ্ছা ত্রিশ টাকা দাও । কালু, তুমি একই ঘুরিয়া আসিও, অপর পরামর্শ আছে ।”

কালু মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইলে, মল্লিকজী পাঁচশটি টাকা লইয়া বলিলেন, “এই লও আর এখন হবে না ।”

কালু তাহা লইয়া তাহা হইতে একটি টাকা ব্যস্তের উপর রাখিয়া বোড়হাট করিলে, মল্লিকজী আর তিনটি টাকা ব্যস্তের ভিতর হইতে লইয়া ব্যস্তের উপরের টাকার উপর রাখিয়া দিলেন । কালু সেই চারিটি টাকা একত্রে আটশটি টাকা ভুলে বাজাইয়া লইয়া চলিয়া গেল । বাইবার সময় বৈদ্যনাথকে আর একটি প্রণাম করিয়া গেল । কালু চলিয়া গেলে মল্লিকজী পার্শ্বের মুহুরীকে—“মিত্রজী, কালুর নামে ত্রিশ টাকা আজকে খরচ লিখ ।” বলিয়া দুটি টাকা ব্যস্তের মধ্যে থলী হইতে লইয়া ব্যস্তের দক্ষিণ দিকের দেবতে রাখিতে রাখিতে কালু দৌড়িয়া আসিয়া বৈদ্যনাথকে বলিল, “মহাশয় মহারাজ রামচন্দ্র রায় আলহিড়ার মোহানার আলিয়া পৌঁছিয়াছেন—ডিজিতে সমাচার আসিল ।”

বৈদ্যনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিল, “কালু শীঘ্র যত ডিজি পার সাজাইয়া লও, আর বাটে ও বন্দরে আমার বা অপর মহাজনের যত লৌকা ও জাহাজ আছে সকলকে আনন্দ-মুহুর্ত নিদান উঠাইতে বল । আমি এক ঘণ্টার মধ্যে বস্ত্র পরিধান করিয়া বাইতেছি ।”

কালু “হে আজ্ঞা” বলিয়া চলিয়া গেল । বৈদ্যনাথ ব্যস্ত হইয়া গদীর ভিতর যেরে গেলেন, বাইবার সময় মল্লিকজীকে বলিলেন, “মল্লিকজী, আজি গদী বন্ধ করিয়া সকল লোকজন মুহুরী কারুণকে অবকাশ দাও ; সকলকে ভাল ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটে যাইতে বল । আমার লোকজন লিপাহি লব্ধ যে বেথানে আছে, সকলকে বাটে উপস্থিত হইতে বল । এই বন্দর দিয়াই রাজবাটীর পথ, আমার

গোশালা হইতে সমস্ত বৎসযুক্ত গাভী বন্ধরের বাটের দক্ষিণদিকে রাখিতে বল; বাটে রূপার পূর্ণভুজ, আত্মশাখা, কদলী বৃক্ষাদি বসাত; পাড়ার নটীঘহলে উলু দিবার জন্য সমাচার দাও, শ্রমাদির শব্দ করিতে কহিয়া বাজারে যত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদিগকে ফাঁটা কাটিয়া বাটের দক্ষিণদিকে দাঁড়াইতে বল; আমার তিনটা পোষা চিত্তেয়ুগ আছে তাহাও দক্ষিণদিকে রাখাইবা; অব সাজাইয়া সমুখে রাখাও; রাজা যেমন বাটে পদার্পণ করিবেন, অমনি দক্ষিণের পথের সমুখে প্রকাণ্ড একটা অগ্নি জ্বলাইবে; ভাল ভাল স্ত্রী নটাদিগকে পথের ধারে দাঁড়াইতে কহিবা, বাজারে মালাকারকে ডাকাইয়া কতকগুলি মালা পথে ঝুলাইতে বল; দুই তিনটা ঘূতের মটকী, সদ্যামংস, চার পাঁচ ভার দধি ও দুই তিনভার দুগ্ধ ও দুইতিন কদলী সস্তু আনাও; স্থানে স্থানে শুক্কধান্য ও পতাকা উড়াইও; আর ভীমরবে এক বুড়ি তোপ আছে, তাহাও চালাইতে কহিবে; ধনুপ বড় মঙ্গলশুভক। আমি চলিলাম, গোবিন্দ থাকিলে তোমায় এত কষ্ট হইত না। যাহা হউক তোমার উপর সমস্ত ভার।

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল। মল্লিকজী নাএব ও কারকুণ সকলকে ডাকাইয়া এক একজনকে এক এক কর্ত্ত্বের ভারপার্পণ করিলে, নিমেষের মধ্যে সকলে সমস্ত কর্ত্ত্বের আয়োজনে বাব-মান হইল। মল্লিকজী স্বয়ং ব্যস্ত হইয়া বাসায় যাইবার পূর্বে জমাদারকে ডাকাইয়া পদ্বি চারিদিকে চাষি তালী লাগাইলেন ও স্বয়ং সদরবারের কুঞ্জী লইয়া চলিয়া গেলেন। বাসায় যাইয়া বাস্তুে সিন্দুকের উপর কাচের কটোরায় যে অহিফেন ভিজান ছিল, তাহা বধাকাল না হওয়ার ভাল তিজে নাই দেখিয়া তর্জ্জনীর দ্বারা শিট্টা বধিয়া অহিফেন গুলিয়া জলটা পান করিলেন ও সেইখানে বড় এক বাটি—আনুমানিক দুই লের—বনীকৃত তুঙ্কের উপর হরিজাবর্ণ মোটা সর বসিয়াছিল, সর সহিত পান করিয়া একটি পান চিবাইতে চিবাইতে সিন্দুক খুলিলেন ও অনেক তর তর করিয়া ভাল ঢাকাই মসনদের একটি জোড়া বাহির করিয়া পরিলেন; কোমরে জড়ির পাড় লেওয়া ডিমটীর কোমরবন্ধ বাধিলেন ও মাথার লাটু দ্বারা পাগড়ি; পায়ে লপেটা জুতা পরিয়া বাহিরে আসিলেন। অনেক উড়িয়া ছোপয়া কাণে শালপাতার চুকুট দিয়া প্রায় ছয় হাত দীর্ঘ একটা তলতা বাশের উপর আটগলার মত একটা গোলপাতার ছাতা ধরিল। মল্লিকজী এইরূপ সজ্জা করিয়া বাটের দিকে চলিলেন। পথে লোকারণ্য;—দুইধায়ে, কেহ নমস্কার, কেহ প্রণাম, কেহ বা সেলাম, কেহ বা রাম রাম কহিয়া সমাদর করিল। দেখেন যে প্রায় সমস্ত সন্তান আছত হইতেছে। এমত সময় মহা কলরবের পর একবার নিস্তব্ধ হইল, তাহারই পর একটি তোপের ভীমগর্জনে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল। মল্লিকজী ব্যস্ত হইয়া দ্রুতপদে বাটের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে দেখেন যে, রাজবাটীর লোকেরা ব্যস্ত হইয়া বাটে যাইতেছে; পথে লোকারণ্য। ক্রমে “রাজা! রাজা! মহারাজ

আসিতেছেন, ঐ যে মহারাজ নামিলেন। আহ! কত দিনের পর রাজা স্বদেশে এলেন।” এই সকল শব্দ শুনা গেল। মল্লিকজী আর রাজপুরুষের ভিড়ে অগ্র-সর হইতে অক্ষম হইলেন। ক্ষণেক মহারাজ রামচন্দ্র রায় সত্রৌক অঞ্চলে চাপিয়া চলিলেন,—দক্ষিণে রমাইবৌর, বামে বৈদ্যনাথ, অগ্রে রাজসেনা ও বৈদ্যনাথের সেনা পশ্চাতে লোকারণ্য। রাজা বৈদ্যনাথের গদীর নিকট আসিয়া একবার দাঁড়াইয়া বৈদ্যনাথকে বিদায় লিলেন; কিন্তু বৈদ্যনাথ তাহা না শুনিয়া রাজার সঙ্গে চলিল। ক্রমে রাজমার্গ দিয়া সকলে চলিয়া গেল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

“ব্রতালি অস্ত্রঃ সর্মিথেষু জিহ্মতে ব্রতানি অস্ত্রঃ অভিরক্ষতে সদা।”

দণ্ডমন্দির পরমাণুচয়ে স্থানস্থিত হইলে শব্দে সবচেই অভিভূত হইল। সরমা অকস্মাৎ প্রলয়কালীন ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলেন। রামমহিষী শ্যস্ত হইয়া সরমাকে ধরিলেন। সরমা দিগ্বল্ল অর্পণতার ছায়, নীচীন হৃদয়ে বিদ্যাদামের ছায় রয়ক্ষিপ্ত লোহিতমংস্তের ছায় ভূমে পড়িয়া আছেন, মহিষী তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত দিয়া স্রিয়মাণা অধোদৃষ্টিতে—। কমলাদেবী শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় শব্দর বর্ণবেশে আসিয়া বলিল, “বড় মা! রাগেণ্ড মহারাজ মানসিংহের অধিকার হইল! মহারাজ প্রতাপাদিত্য রূপে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছিলেন, দক্ষিণ পশ্চিমের বুদ্ধদের মুখে রামনারায়ণের সৈন্তের হস্তে পড়ায়, তাহারাই তাঁহাকে ধরিয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট লইয়া গিয়াছে। এদিকে দণ্ডমন্দিরের নীচে রায়-গড়ের সমস্ত আয়ুধ ও বাকুল ছোটামার আদেশমত আনা হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহায় আশ্রয় লাগায় সমস্ত দণ্ড মন্দিরটি উড়িয়া গিয়াছে। ঐ ভীষণ শব্দ তাহার। ছোট মা সেই সঙ্গে হত হইয়াছেন।”

কমলাদেবী এই হৃদয়মথনী বৃহত্তা ভনিবামাত্র অচেতন হইয়া দণ্ডকাঠের ছায় ভূমে পড়িলেন; পতনআঘাতে তাহার নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। মহিষী, “কি হইল!” বলিয়া চাঁকাকর করিয়া মুর্ছিতা হইলেন। সরমা শব্দ শুনিয়াই একপ্রকার চেতনাহীন ছিলেন, শব্দরের সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন না। শব্দর এই মর্ম্মভেদী বাক্য দিয়া, “হায় কি করিলাম!” বলিয়া আপনার ললাটে চপেটাঘাত করিল, গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কোন দাসদাসীর দেখা না পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ছায় বারাগায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমন

সময় রেবতী ফুল্গুণী হইয়া বেগে গৃহে প্রবেশ করিল, তিনটি অচেতন রাজমহিষী ও সন্নিকট বসিয়া আশ্রয় লইয়া প্রথমে কমলাদেবীর মুখে সেচিতে লাগিল ও স্নিগ্ধ বারি দিয়া আশ্রয় লইয়া ভিজিয়া কমলাদেবীর বান মুহাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে পরে মালতী কানিতে কানিতে গৃহে প্রবেশ করিলে, রাজমহিষী ও সরমার অনাথবস্থা দেখিয়া আবার কুস্মির কানিয়া উঠিল। রেবতী বলিল, “মালতি, এখন কানিদ্বার সময় নহে, আমি একটু, নতুন। আমি মহিষীকে তুলিয়া, তুমি এই মল লও মহিষীর মুখে ও চক্ষে দাও। কমলাদেবী সীত্রাই চেতনা পাইবেন! তিনি একটু সজীব হইলেই আমি সরমাকে তুলিতেছি।”

মালতী কানিতে কানিতে বলিল, “আমাদিগের দশ! কি হইল! আমি কি বলিয়া মহিষীকে সান্ত্বনা করিব? আমি আর এমুখ কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখাইব? দিদি সরমাই বা চেতন হইলে কি বলিবেন! আহা! বাসিকা কতই সহিষে। আমার বোধ হয়, বাছা অচেতন, ভালই আছে।” মালতী আরও কানিতে লাগিল।

রেবতী বলিল, “মালতি, তুমি বিবেচক হইয়া অবদার হইতেছ কেন? সবলেই এমত সময় খর্যাপি অস্থির হও, তবে ত মহিলা তিনটি প্রাণে মায়্য যাইবেক। অনেকক্ষণ হইল ইহারা অচেতন হইয়া আছে—তরায় চেতনা করা আবশ্যক। তুমি কি উদ্বুদ্ধ হইলে? এই লও জল লও—না পান ত—” আপনার অকল হইতে এক খণ্ড ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, “দেখ, এই আর্দ্র কাপড় লইয়া তুমি কমলাদেবীর চক্ষে ও নাসিকামূলে ও ওষ্ঠে দাও, আমি ততক্ষণ সরমাকে ও মহিষীকে উঠাইতেছি।”

মালতী পুস্তলিকার মত রেবতীর হাত হইতে আর্দ্র নদ্বখণ্ড লইয়া কমলাদেবীর চক্ষে ও নাসিকামূলে স্নিগ্ধ জল সেচিতে লাগিল। রেবতী সরমার চক্ষে দুইচারি বার স্নিগ্ধবারি সেচন করিলে, সরমা চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, “স্বধ্য! মাতের কি হইল?” রেবতী কোন উত্তর না করিয়া আরও জল দিতে লাগিল। সরমা ক্রমে চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। রেবতী সরমাকে উঠিতে দেখিয়া তাঁহার মাতা রাজমহিষীর চক্ষে জল-সেচন করিলে, তিনিও চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, “মহারাজ কোথায়? আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—তোমরা একবার মানসিংহকে গিয়া বল—আমার জন্মের সাথ একবার মিটাইয়া লইব।”

রেবতী বলিল, “মহিষি, একটু স্থস্থ হও, দেখা হইবেক—দেখিবার জন্ত চিহ্নিত হইও না।”

সরমা বলিল, “কি, মহারাজের কি হইয়াছে? তিনি কোথায়?”

মহিষী সজিত করিবামাত্র রেবতী বলিল, “তিনি রাগনড়েই আছেন, কোন চিন্তা করিও না।”

ওদিকে কমলাদেবী ক্রমে ক্রমে চেতনা পাইয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, পরে,
“বিমলা তুমি কোথায় গেলো।” বলিয়া চীৎকার করিয়া আবার চক্ষু বুজিলেন।

রেবতী কমলায় নিকট বাইয়া বলিল, “দিদি, জ্ঞান হও—ধৈর্য ধর। তুমি সুখিবেচক
হইয়া কেবল অধীর হইতেছ? বিমলার কাল উপস্থিত হইয়াছিল,—একশে বহায়ায়
কচুরায়ের মঙ্গল চিত্তা কর।”

ইন্দুমতী ব্যস্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “কোথায়—কচুরায় কোথায়—আহা!
তিনি কি জীবিত আছেন?”

কমলাদেবী কচুরায়ের নাম ও ইন্দুমতীর বয়স এককালে স্মৃতিতে পাইয়া একটি দীর্ঘ
নিশ্বাস ছাড়িয়া বেগে উঠিয়া বলিলেন, বলিয়া যেমত ইন্দুমতীকে স্পর্শ করিতে বাইবেন,
অমনি তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তিনি টলিয়া পড়িলেন। ইন্দুমতী ব্যস্ত হইয়া
তাঁহাকে কোলে ধরিলেন। কতক্ষণ ইন্দুমতী ও রেবতীর শুশ্রূষায় চৈতন্য পাইয়া
বলিলেন, “মা ইন্দুমতি, তুমি কি সত্যই আমার আসিয়াছিস? মা, এত দিন বজবজ
কেমন করিয়া রহিলে? এখানে তোমার দুটা মা যেন পাগলিনী প্রায় হইয়াছি।”
ইন্দুমতীর গলদেশ ধরিয়া তাহার মস্তক আত্মাণ করিয়া বন বন চুম্বন করিয়া
বলিলেন, “মা, আমার বক্ষঃস্থল শীতল হইল, একবার আমার গোত্রে হাত দাও।—
এত স্বপ্ন লছে?” ইন্দুমতী যদিচ কমলাদেবীকে বড় মা বলিয়া ডাকিতেন; কিন্তু অত্যা
বিমলাদেবীর ভয়ানক, অফলমুহুর্তা অবগত হইয়া বলিলেন, “মা। আমি এইখানেই
আছি, আর কোথাও বাইব না। নরাদম ফিরিঙ্গিয়া ধরা পড়িয়াছে। তুমি জ্ঞান হও।”

কমলা রেবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বাহা, এ, মেয়েটী কে? এ যে
আমার কচুরায়ের কথা বলিতেছিল।”

রেবতীর এখন সে মলিন পাগলিনীর বেশ নাই। কষ্টে শুকা হইয়াছিল বটে,
কিন্তু অন্য কামাদির দ্বারা ও হস্তপদাদি ধোত করিয়া রীতিমত শুক্লবস্ত্র পরিয়া অবস্ফুটন
পর্যন্ত দিয়া যেন শিষ্টা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে উপস্থিত হইয়াছে। কমলাদেবীর কথা
তিনি ইন্দুমতীকে তাঁহার উত্তর দিতে সময় না দিয়া বলিল, “দিদি, আমি তোমার
রেবতী”—আপনার আশ্রয়ন জুগিয়া বলিল, “দিদি, একশ চিনিতে পারিয়াছ? এ
আমাদিগের কি মুখের দিল?”

কমলা বলিলেন, “দিদি, তাকে এমন দেখে আমার প্রাণ বুড়াইল। আহা! তুমি
কত কষ্ট পেয়েছ। কত দেশে ঘুরেছ! সকলই আমার জন্ত! আহা! এখন কোথা
হইতে আসিলে? তোমাকে অনেক দিন আর স্নায়গড়ে দেখি নাই।”

রেবতী বলিল, “দিদি, আমার অষ্টোত্তর দিন ভোগ ছিল, তাহা জুসিগাম, এখন
তোমাদিগের কল্যাণে একপ্রকার সুস্থ হইয়াছি। কিন্তু আমি বাস্তব হইয়া কতই অত্যা-

টার করিয়াছি ? এ সমস্ত হাকাম মিটিয়া গেলে ভট্টাচার্যের ব্যবস্থা লইয়া এবটা প্রায়-চিহ্ন করিব । সে বাহা হউক, নিদি, এখন তোমার কচুরায় এসেছেন !”

কমলা বলিলেন, “নিদি, আমার কেন ? ও তোমার কচুরায় ! আমি কেবল গর্ভে ধরিয়াছিলামহাজ, কিন্তু তুমিই তাহাকে বন্ধে রাখিয়া স্তনপানে জীবন দিয়াছ । তুমিই তাহাকে বশোহরের কচুৎনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে । আহা ! তোমার লে করেক দিনের দুর্গতি মনে হইলে, আমার জলর বিদীর্ণ হয় ! তুমি বাছা কচুরায়ের জন্ত উমা-দীনীপ্রায় দেশে দেশে হার হতাশ করিয়া বেড়াইলে—আমি অন্যরাসে তাহাকে বিস্মরিয়া রাজ-হুখে মত্ত রহিলাম ! নিদি, কচুরায় তোমার । সে আমার হইলে, তাহার জন্ত আমি পাগলিনী হইতাম : এখন তিনি কোথায়—একবার চক্রে দেখিতে পাই না ?”

শ্রবতী বলিল, “নিদি, তিনি রায়গড়ই আছেন—তিনি সেই কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত পুরুষ ।”

ইন্দুমতী বলিলেন, “মা, আমি সেই রাত্রিতেই অনুমান করিয়াছিলাম ; তবে সাহস করিয়া—পাছে ভ্রমে তোমাকে কষ্ট দিই । আশঙ্কায়—ছুটয়া বলিতে পারিলাম না । অন্য মহারাজ মানসিংহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন !”

শ্রবতী আসিয়া বলিল, “জ্যেঠাই, আমি আলিয়াছি ।”

কমলা বলিলেন, “কেও—প্রভা এস বাছা, প্রণাম হই । বাছা তোর ভরে আমি কত কৈদেছি । তুই যদি বাছা বুকের সময় থাকতিস্—”

শ্রবতী হাসিয়া বলিল, “জ্যেঠাই, তাহা হইলে তোমার কচুরায়কে পরাজিত করিয়া রাখিয়া তোমার চরণে আনিয়া দিতাম ।”

অক্ষতী এতক্ষণ স্ত্রিয়মাণা হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইরাছিল, এখন অগ্রসর হইয়া কমলাদেবীকে জুমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “মা, এও তোর আর একটি পাগল মেয়ে ।”

কমলা তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন, ইন্দুমতী বলিলেন, “মা, ইনি আরাধণ-রাজকন্যা—অনুপরামের তনয়ী । ফিরিজীরা ইহাকে নানাবিধ কষ্ট দিয়াছিল, পরে চন্দ্রদীপের মহাজন বরদাকর্ষ ইহাকে রক্ষা করিয়া মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে এখানে আনিয়াছেন ।”

কমলা বলিলেন, “এস, মা—এস, আমার এখন সমস্ত অভ্যস্ত ভাল, নতুবা তোমার মত লক্ষীর দেখা পাব কেন ? আহা বিমলা থাকিলে কত বহু করিত । ইন্দুমতি ! আমার মন বিমলার জন্ত থেকে থেকে কৈদে উঠে,—বিমলার বিবাহের পূর্বে আমি তাহাকে কত ভাল বাসিতাম, তাহার পর ত আমার ভগ্নীই হল ; তুই জানিল, সে আমাকে কত মাত্র করিত !”

কমলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, একটি দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িলেন, হেঁটমুণ্ডে কণেক

রহিলেন, চক্ষের জলে বকঃ ভাসিয়া গেল। নীরব, নিঃশব্দ শোক বড় মর্শ্বভেদী—।

ইন্দুমতী কমলার নীরব বেদনা দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না—এত যত্ন করিলেন, কিন্তু চক্ষু তাঁহার বশবর্তী নহে, ওঠে তাঁহার অধীন নহে, বন্ধঃস্থল তাঁহার ইচ্ছার অনুগত নহে—চক্ষুও ভাসিল, ওঠেও কাঁপিল, বন্ধঃস্থলও প্রলোড়িত হইল, খাসও বন্ধ হইল, ইন্দুমতী কঁদিয়া কঁদিয়া উঠিলেন। অক্ষততা কখন বিমলকে দেখেন নাই, হইল কি হইল, সাহিত্যবর্ষ অতি প্রবল—ইহজনের শোক দেখিয়া ঋণেতে পারিল না—তাঁহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, অঞ্চল লইয়া মুখ আবরণ করিল। রেবতী—আহা! যে, শোকে পাগলিনী হইয়াছিল, সে কি শোকের ছবি দেখিয়া নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে? তাহারও শোকের ভার নূন নহে। বিমলার অবাধমৃত্যুর জ্ঞাত হইতে না হইতে, তাহার স্বীয় হিমাবের অনেক শোক জমা ছিল। আহা! শোকের অগ্র-গণ্য পুত্রশোক প্রবল হইল, তাহার পর আর শোক—পাগলিনী রেবতীও কাঁদিল। রাজমহিষী—তাঁহার শোকভার ত ক্ষুদ্রতম। তাঁহার স্বামী—বঙ্গ একছত্রী, তিনি যশে পরাশ্রয় হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন। আহা! ঈর্ষুর বিধাতা তাঁহার দ্বাদশপনের আসন লইয়া সমুদ্র হইল না; সম্পত্তি-শ্রুতি প্রাণও ছাড়িবেক না। এ সমাচারে কি রাজ-মহিষীর মন স্থির থাকে? তাঁহার মন মথিত হইতেছে, ফ্রেন্ডনধনি ভিনয় যেন তাঁহার শোকারণো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল—তিনিও এ বারে ফাটিয়া উঠিলেন, “ও! মা! গো!” বলিয়া ডাকছাড়িয়া কঁদিয়া উঠিলেন। আহা! কোমলা সরমা—পিতার এই দশা—তাহাতেই ত অস্থির—তাহার উপর আবার প্রেমাঙ্গদের চিন্তা বলবর্তী হইল, ভাবিল, এখন কে আমার মরলচিন্তা করিবেক? কে আমার স্বচ্ছন্দের জ্ঞাত ভাবিবেক? তিনিও আপনার মাতার গলদেশে জড়াইয়া কঁদিয়া উঠিলেন। মালতী—সেও কি স্থস্থিয়া? তাহার চিন্তা আছে—তাহারও শোক লাগিয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে সে পিতার তুল্য দেখিত, সে চকলা—সদানন্দ—সদাপ্রহুলা বিজ্ঞ সূতেরা; সে মনে মনে ভাবিল, এই সর্বনাশে তাহারও সমস্ত আশা একেবারে মুছিয়া পড়িত হইল। সেও কাঁদিল। আহা! এখন রাজ দ্বির ফ্রেন্ডনধনি, আর্জনদ, বিনয়ন ও বাতরোত্তিতে পুঁহিল। অনুমান যেন নিজের দেওয়ালগুণিও প্রতিধ্বনিতে কাঁদিতেছে। নিকটে শুভাশ্রিতা ছিল না, থাকিলে তাহারাও কাঁদিত সন্দেহ নাই। অপর দাসদাসীরা বেহ ঘরে, বাহিরে, কেহ বারাতায় দাঁড়াইয়া, কেহ দূরে বসিয়া ভ্রিয়মাণ হইয়া, কেহ হেঁটমুণ্ডে, কেহ চক্ষে অঞ্চল দিয়া, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে, দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শোক যেন সংসারে আর কোথাও স্থান পায় নাই—যেন রায়গড়েই ঘনিয়াছে আর রায়গড়েই পরিবর্ধিত হইয়াছে। শোক অতি দারুণবল্লভ—যে ভুগিয়াছে, সেই জানে। দেখা যায় না শোক বিজ্ঞ মনকে ছাড়েনা। শোকে বিগত সূতের সমালোচনা করে, আর ভবিষ্যতে সেই সূতের

অসন্তোষিতা জগৎ হুঃখ মনে কল্পনা করিয়া দেয়, এই কারণই শোকে লোক বিনাইয়া
কাঁদে । যত কেন বিজ্ঞ হউক না, যত কেন বিমল প্রেম হউক না, শোকের সময় কীৰ্ত্তন
স্বার্থপর হয় আর অভাবজনিত হুঃখ মনে তুলিয়া দেয়—কমলা বিনাইয়া বিমলার জগৎ
কাঁদিলেন ; মৃহবী বিনাইয়া প্রতাপাদিত্যের জগৎ কাঁদিলেন ; সরমা বিনাইতে পারিল না
ব.ট, কেবল “মা আমার কি হবে—ওমা আমি কোথা যাবনো!” করিয়া কাঁদিলেন ;
রেবতী বিনাইয়া আপনার পুত্রের জগৎ কাঁদিল । মালতী কেবল ফুফিয়া কাঁদিল ;
অরুন্ধতী আপনার অদৃষ্টকে হুশিল, বলিল, “এমতি আমার অদৃষ্ট মন্দ—স্বীয় রাস্যস্থখ
পাইলাম না, সনদ্বীপে গেলাম, বৈদ্যনাথ রূপা করিয়া আমার আশ্রয় দিলেন ; পোড়া
বিধাতা তাহার পুত্রকে কারাগারে দিল, তাহার ধন ফিরিস্টি লুটিল, আবার কোথা
রায়গড়ে জুড়াইতে আসিলাম, তাহা বিধাতা আমার আগমনে এখানেও সর্বনাশ করিল ।
আমি আর সংসারে থাকিব না—আমার দৃষ্টি পোড়া শনির দৃষ্টি অপেক্ষা খব, আমার
সঙ্গ সর্বস্বনশে সঙ্গ ।” দাসদাসীরা কঁদিল—আমাদিগের রাজার যখন রাজ্য গেল,
কারাবন্দী হইলেন, তখন আমাদিগের আশ্রয় গেল, এখন আমরা কি করি—কোথায়
যাই ? প্রভাবতী ক্ষণেক মাত্র ফেস ফেস করিয়া চাহিয়াছিলেন, তাঁহারও মৃগনেত্রে বাণ
উৎখলিল—তিনিও কাঁদিলেন,—বলভের এইবারে কাল উপস্থিত হইল—প্রতাপাদিত্য
এক প্রকার বলভের প্রতিভূরূপ ছিল, এখন আর তাহার পরিভ্রাণ নাই, “হায় কি
হইল।” বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন । এই ক্রন্দনের কোলাহলের মধ্যে কচুরায় আসিয়া
উপস্থিত । গৃহে প্রবেশ করি । রাজমহিলাগণের আলুলায়িতকেশ, বিবর্ণ মুখশ্রী,
অশ্রুবিপ্লুত বসন, ভূগিতে উপবেশন ও হায় হতাশাদি দেখিয়া দ্বারের একপার্শ্বে দাঁড়াই-
লেন—তাঁহারও মন গলিয়া গেল, তাঁহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তাঁহারও
বক্ষঃ মধ্যে পাষাণতুল্য ভারবোধ হইল ! তিনি অঙ্গে অঙ্গে কমলা দেবীর নিকট দাঁড়াই-
লেন । তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রেবতী ক্ষান্ত হইল, অকলে মুখ মুছিয়া
একদৃষ্টে সত্যকনয়নে তাঁহার দিকে চাহিলে, কচুরায় অগ্রসর হইয়া জামু পাতিয়া ভূমিষ্ঠ
হইয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা রেণুতীর দক্ষিণ চরণ বামদ্বারে রেবতীর বাম চরণ স্পর্শ করতঃ
গদগদস্বরে বলিলেন, “মা, প্রণাম হই ! আমি কখন আশা করি নাই যে, তোমাকে এ
অবস্থায় দেখিব । তোমাকে যখন সনদ্বীপে প্রথম দেখিলাম, মা তোমার অবস্থায় আমার
হৃদয় বিদীর্ণ হইল । কিন্তু বিধাতা পাণ্ডুসূত্রে মধ্যে কণামাত্র অগ্নি রাখিয়াছিলেন,
সেই আমার একমাত্র আশার উপায় ছিল । এখন মাতা আর ধাতী একত্রে দেখিলাম,
বলিয়া কমলা দেবীর চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন । রেবতীর বিষাদ অশ্রু আনন্দাশ্রুতে
পরিণত হইল । রেবতী ব্যস্তে কচুরায়ের চিবুকদেশে হাত দিয়া চুষন করিলেন ।
কমলাদেবী অনেকদিন কচুরায়কে দেখেন নাই—মার প্রাণ—মা শব্দটি কর্ণে প্রবেশ

করিষ্যামাত্র করপুটে পূৰ্ণাঙ্গ হইয়া উদ্দেশে বশোহরেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “মাপো, এ সমস্ত তোর খেলা! তুই এখনও বশোহরবংশকে ভুলিসনি। মা এখন আমার অতিরিক্ত ফল পাইলাম, যেন অন্তিমকালে চরণে স্থান দিস!” বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন, “বাছা কচুয়ায়, একবার বশোহরেশ্বরীকে প্রণাম কর।”

কচুয়ায় মাতার আদেশ মতে ভূমিষ্ঠ হইয়া কমলা দেবীর চরণের নিকট আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, “মা, আমার দেবদেব, অগদগুস্ত তুমি—তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ বস্তু ও অগতের ঈশ্বরী! তোমার আঁচরণপসাদে সৰ্ব্বত্র মঙ্গল—মা তুমিই আমার ইষ্টদেবতা।”

কমলা কচুয়ায় হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, “বাছা, আর একবার কোলে বস।” কচুয়ায় উঠিতে অঙ্গ বিলম্ব করিয়াছেন কি না—কমলা বলিলেন, “বাছা, বত বড়ই হও না কেন, তুমি মার কোলে বসিতে লজ্জা করিও না।” বচুয়ায় ভাবিতেছিলেন যে, মাতা বৃদ্ধা, তাঁহাকে কোলে বসাইতে কষ্ট পাইবেন। বাহা হউক, উঠিয়া মাতার এক পার্শ্বে অতি সন্তর্পণে বসিলেন। কমলা বলিলেন, “বাছা, বচুয়ায়! তুই ভাল ক’রে কোল বুড়ে বস না—বাবা গাছকে কি ফল ভারি লাগে?”

কচুয়ায় কমলার কথায় তাঁহার কোল জুড়িয়া ভাল করিয়া বসিলেন। রেবতী দেখিয়া বলিল, “দিদি এ সাদ আমি স্বপ্নে দেখিতাম—এখন বিধাতার অনুগ্রহে এ চক্ষে দেখিলাম! দিদি তুই ধন্য!”

কমলার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, কমলা ঘন ঘন মস্তকান্ধাণ লইয়া বলিলেন, “বাবা, অনেক দিন তোকে দেখি নাই—একবার মুখ তোল দেখি!”

কচুয়ায় তাঁহার গর্ভধারিণীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলে, কমলা বলিলেন, “আহা! বাছার মুখ শুকাইয়া গেছে, রেবতি, কিছু খাবার নিয়ে এসো।”

ইন্দুমতী ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, বচুয়ায় বলিল, “মা, এখন প্রায় প্রত্যুষ হইয়াছে, এখন আর খাব না।

কমলা বলিলেন, “বাবা, মার কোলে বসে খাও। তার আবার সময় বিয়ে? ইন্দুমতি বাছার জন্য কিছু খাবার আন।”

রাজহাবী কচুয়ায়ের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার স্তম্ভর সৌম্যমুর্তি দেখিয়া স্থির হইয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সরমাকে বলিলেন, “সরমা, তোর খুড় এহেছেন, উঠ, তাঁহাকে প্রণাম কর।” সরমা ব্যস্তে উঠিয়া মাতার কাণড় টানিয়া দিয়া কচুয়ায়ের লিখটে বাকীয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। কচুয়ায় বলিলেন, “ধাক্ অমনি আশীর্বাদ করিতেছি, তিরস্রী

হও ও শীঘ্র রাজমহিষী হও। ত্রীলোক পান্দ্রপার্শ্ব করা উচিত নয়। মহিষি! কন্যা উপযুক্ত হইয়াছেন, এখন একটি পাত্র স্থির কর।”

মহিষী একটি মিশ্রাস ছাড়িয়া বলিলেন, “ভাই, এখন এ কতাদায় তোমার—। আহা! মনে বড় আশা ছিল—তা বিধাতা পাধরে আছাড়িলেন।”

কচুরায় মহিষীর সম্মুখীন হওয়ার, বিশেষে এই সুরে কথা পড়ায়, কতকটা অপ্রস্তুত হইলেন, বুঝিলেন, এ নিত্য ভয়ানক ভূমি, ইহাতে অধিকক্ষণ থাকিলেই ডুবিতে হইবেক; হয় ত মহিষীর অগ্নি দুই চারি কথা কহিতে হইবেক। কিন্তু এরূপ সমুহ সম্বন্ধের সময় মহিষীর শোকোদ্বীপন করিতে মনে বস্তু হইল। ইত্যন্ত: ভাবিয়া ঐ কথা চাপা দিবার আশয়ে বলিলেন, “মা, কৈ কি খাবার দিবে?”

ইন্দুমতী ইতোমধ্যে একখানি স্বর্ণপাত্রে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিলে, বচুরায় স্থানান্তরে উঠিয়া বসিলেন ও আহারের পূর্ক আচমন করিতে উদ্যত হইলে, একটি তোপের শব্দ হইল। চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “মা, এখন আমি চলিলাম। মহারাজ মানসিংহের অনুমতিতে খুঁপ ছুটিতেছে। অস্ত্রশূচক ধনিও শুনিতেছি। পূর্কদিক পরিষ্কার হইয়াছে, এক্ষণেই মহারাজ মানসিংহের সভা হইবেক; আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। মধ্যাহ্নে আসিয়া আমরা আপনার নিকট আহার করিব।” রাজমহিষীকে বলিলেন, “মহিষি, আহারের সময় আসিয়া সাক্ষাৎ করিব,” উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রেবতী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে বাহিরে আসিলে, কচুরায় তাঁহাকে কি বলিয়া দিলেন। রেবতী প্রথমে অসম্মতিশূচক মাথা নাড়িলেন; কিন্তু কচুরায় আবার বলায় স্বীকার পাঠিলেন।

ষোড়শ অধ্যায় ।

“রাজ্যং নিম্পাদ্য নির্কিয়মথবাংসল্যপেশনঃ ।

বিভাজ্য বজ্জুভ্যোষু বৃভূজে পার্থিবঃ প্রিয়ম্ ॥”

“রায়গড় অধিকার হইল। শত্রুপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে। স্বর্ধ্যকুমারের কুকীর্ষন। ভালপুথুরে কটক করিয়াছে।” এইস্বিধ শব্দ হৃদয়গি চতুর্দিকের পেটোগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্কই প্রচার হইয়াছে। আবাল বৃদ্ধ, যুবা ও প্রৌঢ়, স্ত্রী ও পুরুষ, গৃহস্থ ও কুবীলোক স্বীয় শত বর্ষ ত্যাগ করিয়া পূর্ক, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর দিক বিভাগ হইতে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ুপ্রদিক হইতে কেহ রায়গড়ের শত্রুপাদিত্য প্রকাশিত-

যুগে, কেহ দীর্ঘকাল দিকে, কেহ কমলাদেবীর আবাসে, কেহবা কৌতুহলপ্রিয় ভাল-পুথুরের কুশীকটকে চলিতেছে। যাহারা মহারাজ মানসিংহের আক্রমণের সমাচার পাইয়াও স্বীয় দ্বারপাণ্ড অতিক্রম করে নাই যাহারা গ্রামে জায় যায় না, যাহারা পিণ্ডমাত্রেরোপজীবী যাহারা গ্রামের মধ্যে গোবিশ্ব বলিয়া পরিচিত তাহারাও গো-সকালের প্রায়শ্চক ধ্বনিত ও মেদিনীর কল্পনে চালিত হইয়াছে। কেহ ভয়-বিপ্লুত, কেহ কৌতুহলপূর্ণ, কেহ প্রদানবসনায় দৌড়িতেছে। বেহ বলিতেছে। “আমাদের উদ্যোগে কাকধ্বজের পেনে গঙ্গা-প্রতিপদে রায়গড়ের মন্দিরচয় সংক্ষেপে শকলীভূত হইয়াছে।” কেহ—“রাহগড়ে জনপ্রাণী নাই, যেখানে সভামন্দির ছিল, সেখানে ভীষণ অতলস্পর্শ দহ হইয়াছে।” কেহ—“শরশুণার অগ্ন্যগ্ন্যয়ের উচ্চতম শাখায় বিমলাদেবীর হস্ত ঝুলিতেছে।” কেহ বলিল, “এমত দুর্ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই।”

গ্রামের গুরুমহাশয়ের মধ্যে বয়ঃকণ্ঠি যাইতে যাইতে পার্শ্বস্থ ভট্টনৈক বৃদ্ধ ভগ্ন-পায়িক্কে দেখিয়া বলিল, “হ্যাঁদে গোঁধী, শুনেছ—আমি উষাকালে কি ব্যাপার হইয়াছে?”

গোঁধী পূর্বে বঙ্গ-সংস্করণের শাখায় জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধে ভোগ-ক্ষেপে তাহার দক্ষিণ পদ ছিন্ন হইয়া, মহারাজ তাহাকে জীবিতবশেষে গীতুত করিয়া বৃন্দনকরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বলিল, “মশাই, মানসিংহ পুড়ুক্ষেপেদ্বারা রায়গড় শকলীভূত করিয়া ছন। আমরা মহারাজের সময়ে এ প্রাণীরা যুদ্ধ অনেক করিয়াছি। ক্ষেপেটর জন্ত বাকুদ প্রস্তুত করিতে আমরা গরুর ভাগ অধিক পাতাম।”

গুরুমহাশয় বলিল, “না হে তুঁ” বৃদ্ধ হস্তাঙ্গল বিষয়ে ভাব হইয়াছে। ধাতুবেদীর ক্ষেপেটগুণ কিছুই নাই—তক্ষাই ক্ষেপেটের উপজীব্য।”

গোঁধী বলিল “মশাই আমি তুমি হাঁ? এমত কথা কহিবেন না। গন্ধক জার করতাই, মোরা সে বস্তুই হাঁ বোলায় উড়তাই। সেড়ের ভাগ কম থাকিলে বাকুদে শক বড় হয় না।”

গুরুমহাশয় বলিলেন, “সে যা চটক, গত প্রাতে একটি নৈদর্গিক ব্যাপার হইয়াছিল। ও তোমার ‘সোর ও লে উড়নার’ সাত কোন সংস্করণ নাই। চটগ্রামের আশ্রয়গিরি নিকট, দেখনি সন্ধ্যা আশ্রয়গিরের এখানে ভূমিকম্প হয়। সীতাকুণ্ডের গিরিগহ্বরে সাগরবারি প্রবেশ করায় গিরিক্ষেপে হইয়াছে ও তাহাই কল্পনে রায়গড় শকলীভূত হইয়াছে।”

গোঁধী জানিত গুরু মহাশয় হইলেই অসামান্য বুদ্ধিশালী হয়। গুরুমহাশয় কথা কহিয়া আচম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। এমত সময় উদ্ভা-

সেন নামক শরশূণ্য গ্রামের অতি কপোদিতগুল বেগে অথৈ আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বলিল, “গুরুসংগম, গুনগাহ—এতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে? অন্য বোলা নেড়প্রহরের নম্বর বাগিচা উত্তর তীরে মহাসভা হইবে। গ্রামের আপামর সাধারণের তথায় আত্মান আছে। ভুল বটে না?—আমার ছেলে গণপকে সঙ্গে লইয়া যাইও।”

গুরুশূণ্য ব্যস্তে উগ্রসেনকে পুনর্নি। বলিল, “মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন? গণপকে আম লইয়া যাই। এতে ভয়ানক শত্রুর বাধণ কি? গোষ বলে, বাকুল-সহায়তায় রায়গড়ের কলত্র কাটিত হইয়াছে। গোষব জ্ঞান না, এতে আগর বয়ল হওয়ায় ভ্রান্ত জ্ঞানগ্রাহ্য।”

উগ্রসেন বলিল, “গোষীর অনুমান বড় অসঙ্গত। গত রাত্রিশেষে বিমলাদেবীর বাসাবন্দির শকল ভুগ হইয়াছে। কানপ নিশেয় হইয়াছে, কিন্তু অসুমান, যে বাকুলে অদম্য অগ্নি লাগায় এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে। বিমলাদেবীও নষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থিত শবদীঘীর কুল মাখিয়াছে।”

উগ্রসেনের কথা শনিয়া গুরুশূণ্য উত্তর দিতে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু উগ্রসেন প্রতীক্ষা না করিয়া অথচালাইয় দৌড়িল। গুরুশূণ্য বলিল “গোষী, উগ্রসেনের অদৃষ্টে কতকগুলি কাড় হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার গুরু কেশবর যাইবেক। এসকল নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রকৃত নিদান বুঝিতে সেনে, গোষী-মে অবিকারি থাকি আবশ্যক।”

গোষী কোন উত্তর না করিয়া গুরুশূণ্যর পশ্চৎ চলিল, ক্রমে যত দূরীয় নিকট হইতে লাগিল, দেখে—এখ লেনের এবা অধিক, লোকারণ্যে গণচলা সঙ্কট। প্রাতঃকাল বলিয়া ও বিশেষ স্থানে স্থানে দাড়াইয়া ছায়া ও নবদুর্দাদ তৃণভূত হেতু ধূলী তত উঠে নাই।

এদিকে রায়গড়ে কলত্রমধ্য বাধপূর্ণমেরা ব্যস্ত পশু প্রায়গতনে দৌড়িতেছে। সূর্য্যকুমার ক্ষণেকে দুকাটক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মালিকগাজের অবেষণ করিতে করিতে গোবিন্দের সহিত মাল্য হস্তায়, দূর হইতে গোবিন্দ অভ্যয়ান করিয়া সমস্রমে বলিল, “জরতীরাজ! গত রাত্রিতে আপনার কুণীপ্তম্বে যথেষ্ট শ্রম করিয়াছে।”

সূর্য্যকুমার বলিল, “ভাই, কলত্রয় যত হউক বা না হক, অনেকটা বিভীষিকায় সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যেমত অদভ্যুত, আমাদিগের বেশভূষাও তদুপযুক্ত। আমাদিগের অস্ত্রে, এখনকার যুদ্ধ প্রণালীতে কোন ফল দেখে না। অগ্নিযন্ত্র যেক্রম শত্রুঘাতী, কাণ্ডোচের ও বন্দপত্র বান্ধাড়াইয়া হইয়াছে। সুবিধার মধ্যে কুকী-সেনার অসভ্য আকার, বিকট গর্জনা ও অনৈসর্গিক ক্ষমবান্ধ দেখিয়া প্রতাপাদিত্যের সেনারা ত্রিতিকাল বলিয়া তাহাদিগকে ভূত প্রেত দংশনে যুদ্ধে ভগ্ন দিয়াছিল।”

গোবিন্দ বলিল, ‘মহাশয়, আপনার কথা আমি শুনিতেছি না। আমি স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছি, কুকীসেনার মত অকুতোভয়, অসমসাহসী ও অমিততেজা অস্ত্রধারী গত রাত্রির যুদ্ধে কেহই ছিল না। এত উৎসাহ ও এমত প্রভুভক্ত ভট প্রায় দেখা যায় না।’

স্বর্ধকুমার বলিল, “আমার পিতা শিষ্যচক্র মহারাজের গুণেই এ কুকীরা এককালে মোহিত হইয়াছিল। এখন ঠান্ডারই পুত্র বলিয়া আমাকে স্নেহ করে।”

গোবিন্দ বলিল, “তাহার কোন সন্দেহ নাই। অপরিমিত অন্ধা না থাকিলে আপনার অনবগতিতে তাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর হইতে আপনার আদেশ পালন করিতে আগ্রহিত না।”

স্বর্ধকুমার বলিল, “ইহাতে নন্দরামের বিশেষ সাহায্য আছে। ধেরূপ তনিত্তে পাই। লটটার শাণনে প্রজ্ঞামণ্ডলাতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বরায় আমার নেহনে উদ্ভূত হওয়া আবশ্যক। নন্দরাম আমাকে রণনা করিবার জন্ত ব্যস্ত করিয়াছে। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মালিকরাজের অনুসন্ধান করিতেছি, তুমি মালিকরাজকে কোথাও দেখিয়াছ?”

গোবিন্দ বলিল, “মালিকরাজকে আমি কলত্রের দক্ষিণ দ্বারে দেখিয়াছিলাম— তাহার পিতা বিজয়রাজের সহিত কথা কহিতেছিল।”

স্বর্ধকুমার বলিল, “আমি তাহার নিকট চলিলাম, ত্বরায় পুনরায় সাক্ষাৎ হইবেক। তোমার দেশের সমাচার কি?”

গোবিন্দ বলিল, “এই ত সবে আমরা গেভিজ হইতে আসিতেছি, আমাদের আরও পনের সন্বাদ জানি না। মহাশয় নমস্কার হই।”

স্বর্ধকুমার ‘নমস্কার—বন্দাকঠকে আমার প্রিয়ভাব দিবেন।’ বলিয়া গোবিন্দের নিকট হইতে কলত্রের দক্ষিণদিকস্থ হুড়ঙ্গ দিকে চলিল। হুড়ঙ্গের দ্বারের পার্শ্বে একটি ফোর্বোপের গবে কথোপকথনের শব্দ পাইয়া স্বর্ধকুমার তাহার পথ অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ার, একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে মালিকরাজের ধ্বনি যুক্তিরা উঠিলে বলিল, “মালিকরাজ, তুমি কোথায় আনি তোমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।” স্বর্ধকুমারের শব্দ হইবামাত্র কোপের কথোপকথন ক্ষান্ত হইল, তাহাই অব্যবহিতপরে মালিকরাজ কেতবীর কোপের নীচের কাঁটা ও ডাল সরাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া অঙ্গে অঙ্গে বাহিরে আসিলে স্বর্ধকুমার হানিয়া বলিল, “কি ভায়া, একে-বারে মৃৎশায়ী কেন?”

মালিকরাজ বলিল, “বিধাতা ফণেকে অতি উচ্চ পর্বত শিখরকে সমুদ্রতলে পাতিতে পারেন,—আমার মৃৎশয়নের অপচর্য কি?”

হৃদ্যকুমার মালিকরাজের শোকপূর্ণ ঔদাস্যাকো চমকিয়া উঠিলেন, আপনাকে হুসিয়া অগ্রসর হইলেন ও উৎখানোমুখ মালিকরাজের করতল ধরিয়া বলে ও প্রেমে জাহাকে বণ্ডায়মান করিয়া আলিঙ্গন করিতে করিতে বলিলেন, “ভাই, তোমার বখায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। আমি মূর্খ—সকল বিষয়েই সিদ্ধান্তের হার অগ্রাহ করিয়া এমত পদ্ধতি ব্যবহার করি যে, যাহাকে প্রণয়ন করি তাহার মন্ত্রভেদাপেক্ষা আমার মনস্তাপ গুরুতর হইয়া উঠে।”

মালিকরাজ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া বলিল, হৃদ্যকুমার! তোমার কোন দোষ নাই। ভাই, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত আশা উন্মূলিত হইয়াছে—এক্ষণে আমার জীবনে কোন সুখ নাই। তোমার দুর্কী-দিনের মুখে কি শুনিবে? তুমি কি একান্ত আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে?

হৃদ্যকুমার বলিল, “আমি ভাই একপ্রকার মস্তের ছায় হইয়াছি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন কি আমার কুহর কেন্দ্রী। নন্দরাম আমাকে অন্যই জয়ন্তীপুরের জয় যাত্রা করিতে অনুরোধ করিতেছে। এদিকে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হওয়ার আমার সমস্ত ভরসা উৎসন্ন হইল। আমার এখন শুনিতে পাইলাম, সভ্য মিথ্যা বলিতে পারি না, দক্ষিণ হুড়ঙ্গ বরা পড়িয়াছে।”

মালিকরাজ বলিল, “ভালই হউক অথবা মন্দই হউক, প্রতাপাদিত্যের অনেক গুণ ছিল। আমরা তখন বুঝিতে পারিলাম না। ব্যস্ত হইয়া এখন নিত্যন্ত ঘৃণাস্পদ হইয়াছি। আমার পিতার অবস্থার কথা কহিবার নহে—”

হৃদ্যকুমার বলিল, “তিনি এখন কোথায়? মহারাজ মানসিংহ যেহেতু উদার বচাব ও বিবেচক, তাঁহার নিকট কোল বিষয়ে অন্তর হইবেক না।”

মালিকরাজ বলিল, “তিনি এক্ষণে এই কোপে আছেন। আমাদিগের মহারাজও এই কোপে ছিলেন, কিন্তু চকল ২ ভাব সুলভ অস্থির বুদ্ধির দোষে এখন নষ্ট হইবেন। পিতা এত নিবেদন করিলেন, কিন্তু শুনিলেন না, বলিলেন বিজয়কৃষ্ণ! আমি দামল ভৌমিকের শিরোমণি হইয়া এখন সরোস্তপের মত, অনুহত মুগের মত, অনাথা ও পীড়িতা স্ত্রীর মত, কাপুরুষের মত লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিব না। যাই, দক্ষিণ হুড়ঙ্গ দিয়ার পেটায় যাই, দেখি, যদি রণভঙ্গসেনা সঞ্চলন করিয়া ও রামগড়ের স্বাধীন সেমাবলে পুনরায় রায়-পক্ষ লক্ষ করিতে পারি। মানসিংহ জয়মদে মত্ত হইয়া অবশ্যই বিক্রাম করিতেছে। এখন হুই একদিন কিছু আমার অনুসরণ ব্যতীত অপর কোন আক্রমণ বা হুঙ্কে ব্যস্ত হইবেক না। ততক্ষণে বশোহরের বে সেনাসকালনের আবেশ পাঠাইয়াছি, বলবান হইয়া থাকিবেক। একবার বশোহরের তটপ্তর এখানে উপস্থিত হইলে বসনদাস অপমানবাঞ্চে দেখি। বর্তমান চিরকাল জয়কেতে। যদি এক্ষণে আমাকে নিবৃক্তির দোখে, অবশ্যই আমার

বিপক্ষে অগ্রদ্বারের দুইবার ভাবিবেক না। যদি তাহাকে কোন বিতীৰ্ণিকা দেখাইয়া নিরস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে কতটা হয়। সে শুনিতে ছ এখন উপটোকন দিয়া ও অজ্ঞমূলের বেগমী রঙ্গ দিয়া স্নেহ সভায় মাছ হইয়াছে।" পিতা মহারাজের দুরাশা বশতী দেখিয়া এককাল বিতীৰ্ণিতে পারিলেন না। কেবল-মাত্র বলিলেন যে, "মহারাজ, এখন যে কথা জ্ঞানাত চোঁয়াছে, তাহার রায়গড়ে আপনি আসিয়া কাগদেও পাইবেন না—বলেই এখন মহারাজ মানসিংহের অনুগমন করিবে। আপনি এখন কোথাও থাকিয়া ঘটনায় গতি লক্ষ্য করুন। সময় সুযোগের প্রার্থনা করুন, এখন গ্রামকূটে আপনার বিপরীতচরণ করিতে বিলম্ব করিবেক না।" মহারাজ বলিলেন, "বিস্ময়কর, তুমি চিরকাল ভীক। কখন আমাকে বীরের হ্রায় পরামর্শ দিলে না।" পিতা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি একক এখন শত্রুসেনার হস্তে পড়িলে মান হারাইবেন। অতএব আমার পরামর্শ যে, আপনি কোন নিভৃত স্থানে অজ্ঞাতবাস করুন! এখানে প্রথম হাদ্যম স্থির হইলে, পরে আমরা সন্ধি প্রস্তাব পাঠাইয়া মানসিংহের মত অব্যাহত হইতে পারি। এখন আপনি সহায়হীন ও সম্পত্তিহীন; আপনার একটিও সৈন্যবাক্ষ আপনার নিকট নাই, আর আমার অনুমান, কেহই দলস্থ হইবেক না; কখনো রণবীর বাহাদুর মারা পড়িয়াছেন; হজুরমল নরখম মুসলমান জাতীয় আচরণ করিয়াছে—বিশ্বাসঘাতক এখন আপনার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে লজ্জিত হইয়া, স্বর্ঘ্যবীর স্পষ্টই মানসিংহের দলস্থ হইয়া রায়গড় অধিকার করিল; মালিকরাজ মহারাজার জন্ত অস্ত্র ধারণ করিবেক না—স্বীকার করিয়াছে; মহারাজ, আপাততঃ আপনার মঙ্গল দেখিতে পাই না। তবে যদিও অস্ত্রহীনসে কিছুদিন বিলম্ব করেন, তবে কালের মাহাত্ম্যে, ঘটনা-প্রবাহে, কোন নতুন সুযোগ উপস্থিত হইলে, যশোহরের প্রাণ রূপায় সমস্ত মঙ্গল হইতে পারিবে।" মহারাজ পিতার এই কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন বলিলেন, "তোমার সতর্ক পরামর্শে আমার প্রয়োজন নাই। আমি এক্ষণে দুর্গের বাহিরে যাইলেই গঞ্জালিস প্রভৃতি ফিরিঙ্গীদের সাহায্য পাইব।" তাহার দাড়াইতে নানামতে বুকাইলেন, কিন্তু মহারাজের কাল উপস্থিত—পরামর্শে কাণ দিলেন না; পিতাকে বলিলেন, "বিস্ময়কর, তুমি কিছুই বুঝিতে না; বাহা হউক, এখানে আমি সুদৃষ্টি দিয়া চলিলাম, তুমি আমার জন্ত একটা অশ্ব তুরায় বাগপোতার চড়িয়ারে বেড়াইয়া পাঠাইয়া দাও।"

স্বর্ঘ্যবীর বলিল, "মহারাজ চিরকাল আত্মাভিমानी।"

মালিকরাজ বলিল, "এখন এমত ভ্রম হইয়াছে যে, এই নিরাশ্রয় অবস্থায়, নারকী গঞ্জালিসের সাহায্য পাইতে দৃঢ়বিশ্বাস। তাঁহার কি স্মরণ নাই যে, যখন আরাণ্যকর রাজা বাহা অধিকার করিয়াছিল, তখন তাহার মনস্তত্ত্বের জন্ত ফিরিঙ্গী কিলোয়ার কার্বাল-

হঁকে আগ্রয় দিয়াও নষ্ট করিয়াছেন ? এখনও পিঙ্গ-তাহার ভাণ্ডপুর বিদ্যমান আছে, সে কি নিরাশ্রয়, ভট্ট-রাজ্য, নিঃস্বামীকে ছাড়িবেক ?”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “কার্বাল্‌হকে যেরূপে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা আধামতলোতে অনুপমেয়, অপূর্ণপ্রতিম হইয়াছে। যে কলক আধাপিঙ্গের শরীর তথ্যীভূত হইলেও যাইবেক না!”

মালিকরাজ বলিল, “তাহা লতরা আমার পিতার সাহিত কয়েক দিন মহারাজার বাক্যলাপ বন্ধ হইয়াছিল। কামিন্যলুৎ বাক্য হইতে সাহায্যের অন্ত প্রথমে দূত পাঠায়। সে দূত আনিয়া রাজজামাতা রামচন্দ্ররায়ের দেহান হইয়া ফার্সীরা বাক্সা শাসন করিতেছিল, বলায়, মহারাজ দূতকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া অর্থ ও নৈশা দিবার আশা দিয়া কার্বাল্‌হকে আসিতে অনুরোধ করেন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “সে কি রামচন্দ্ররায়ের কারারোধের পর?”

মালিকরাজ বলিল, “এব্যাপার রামচন্দ্ররায়ের কারারোধের অতি অল্প দিন পরেই ঘটয়াছিল। রামচন্দ্ররায় কারাগার হইয়াছে, সমাচার বাক্সায় পৌঁছিলেই, তত্ৰত্য ফিরঙ্গীরা এক মহান্ সভায় বাক্সার শাসনের ভার গ্রহণ করে ও যত দিন না রামচন্দ্ররায় অব্যাহতি পান, তত দিন এই নিষেধ শাসন চালিবেক এমন বন্দোবস্ত করে। ক্রমে রামচন্দ্ররায়ের নামমাত্র রহল, সমস্ত ক্ষমতা ও রাজভাণ্ডার ফিরঙ্গীরা হস্তগত করিল। ক্রমে উচ্চ রাজকক্ষ হইতে হিন্দুদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া ফিরঙ্গীকে অভিব্যক্ত দ্বারেতে লাগিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত আরাকানের মগেরা বাক্সা লুট করিয়া অনেক ফিরঙ্গীকে অকস্মাৎ রাত্রিতে আ সম্মানিত করত। বাক্সার মগশাসন স্থাপন করিল। কার্বাল্‌হ প্রাণভয়ে বাক্সা হইতে গোড়াজে যাইয়া আশ্রয় লইল ও তথা হইতে মহারাজার সহিত কথাবাণী চালাইতে লাগিল। কার্বাল্‌হর উদ্দেশ্য যাহা থাকুক, যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহায় বাক্সাতে মহারাজের শাসন স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে অথবা তাঁহার জামাতা রামচন্দ্ররায়ের পক্ষ হইতে ইজারা লইতে প্রস্তুত ছিল। মহারাজ সমস্ত স্বীকার করিয়া কার্বাল্‌হকে স্বীয় লভ্য আনাইলেন ও রাত্রিতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যশোহরের মন্দিরের নিবট লইয়া গেলেন, অন্ধকার রাত্রি, অপর কেহই সঙ্গে ছিল না, মন্দিরের দ্বারস্থ হইয়ামাত্র কয়েকজন লোক আসিয়া কার্বাল্‌হর মুখে বস্ত্রাদি দিয়া আবদ্ধ করত, তাহাকে শূণ্ণে তুলিয়া লইয়া দেবীর সম্মুখস্থ বাগানের স্থানে শুভ্রমধ্যে গন্তব্য কোলরা ছেদন করিল। নুশংস মহারাজ উপস্থিত থাকিয়া দেবীর উদ্দেশে নরবাল বাতন করিলেন। জনপ্রবাদ এই যে, বখন শুভ্রে কার্বাল্‌হকে ফেলিয়াছিল, তখন তাহার সমস্ত বন্ধন মোচন হইয়া, কার্বাল্‌হ মহারাজকে দেখিয়া অতি কাতর স্বরে বলিল, ‘মহারাজ, আমার কি

অপরোধে এমনত দণ্ড হইতেছে? আর একান্তই যদি আমাকে প্রাণে মারেন, তবে আমাকে পশুরূপে বলিদান দরিলেন না, আমাকে বীরের দায় কাটিয়া ফেলুন ও আমার মৃত্যুর পর আমাদিগের শাস্ত্রমতে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন। আমি প্রাণ তিকা চাহি না ও আগ্নার নিকট পাইতেও আশা করি না; তবে ধর্ম্মের জন্ত নিতান্ত উৎসাহ হইতেছি,’ কিন্তু পিতার নিমিত্ত স্তনিয়াছি যে, প্রতাপাদিত্য স্বয়ং তথায় ছিলেন না। এ সমস্ত ব্যাপারটি গোবর্দ্ধন নামক কিলেদারের পরামর্শ ও মাহু-রায় সহস্রকৃত।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “নরোধম এখন দেই দকল পাপের প্রতিফল পাইবেক। তোমার পিতা এখন কেমন আছেন?”

মালিকরাজ স্বর্ধাকুমারের এই প্রশ্নটি শুনিমাত্র একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল ও তাহার চমুর্দ্দয় দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। স্বর্ধাকুমার মালিকরাজের হাত ধরিয়া তাহাকে সাহুনা করিতে লাগিলেন, স্বীয় বস্ত্র দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিলেন ও বলিলেন, “তাই এত অস্থির হইও না। তোমার পিতার কোন অসুখ হয় নাই ত?”

মালিকরাজ বলিল, “স্বর্ধাকুমার, বলিতে কি তাই, আমার পিতা জীবিত আছেন, মাত্র। তাঁহার এ বুদ্ধাবস্থার কণ্ড কষ্টই পাইবেন তাহা বলিতে পারি না। রণবীর বাহাদুর যুদ্ধে মরণে, একপ্রকার লৌকিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন—আর যুদ্ধে মরণেতো স্বর্গলাভ। তিনি জীবিত থাকিলে, এ পরাজয়ের পর বন্দী হইয়া অতি কষ্টে জীবন কাটাতে হইত।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “তোমার এ আশঙ্কা একান্ত অমূলক, আমার সহিত মহারাজ মানসিংহের এই বিষয় লইয়া কথাবার্তা হইয়াছিল। তখন আমি রণবীর বাহাদুরের মৃত্যুর সংবাদ অবগত ছিলাম না। রণবীর বাহাদুর কোথায় ও কি প্রকারে প্রাণ হারাইলেন?”

মালিকরাজ বলিল, “পিতার নিকট শুনিলাম, তিনি কৃষ্ণবর্ষাবৃত পুরুষের আক্রমণ কালে প্রাণত্যাগ করেন। অন্ধকারে স্বীয় সেনার অন্তে, কি মহারাজ মানসিংহের সেনার হস্তে আত্ম হন—স্থির নাই।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, মহারাজ, মানসিংহ বলিয়াছেন যে, নির্দোষী কণ্ঠচারিগণকে, বিশেষে রণবীর বাহাদুর ও বিজয়কৃষ্ণ সচিবকে উচ্চপদ দিতে হইবেক; তবে তাঁহার। যদিও অস্বীকার করেন; মানসিংহের ইচ্ছা—তাঁহাদিগকে পদোপযোগী বৃত্তি দিয়া স্বশোভিত করিবেন।”

মালিকরাজ বলিল, “তাই, আমার পিতার জন্ত সমুহ চিন্তা হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যের প্রধান সচিব, যদিচ মহারাজ তাঁহার পরামর্শ লইয়া কোন কৰ্ম্ম

করেন নাই ও যদিচ দিল্লীর সম্রাটের সম্বন্ধে প্রতাপাদিত্য সমস্তই স্বীয় বুদ্ধিতে কল্পনাছেন, তথাপি তাঁহার সচিব দিল্লীর চক্ষে নির্দোষী হইতে পারিষেন না। এ বুদ্ধবরসে তাঁহাকে লইয়া আমি কি প্রকারে রক্ষা পাইব, বলিতে পারি না। তিনি ঐ কেতকীর কোণে বসিয়া ক্রমাগত ‘হা হতোহ্মি। আমার কি হইল ! আমি কোথায় বাইব।’ এবশিধ শোক করিতেছেন।”

হৃদ্যকুমার বলিল, “চল আমরা তাঁহার নিকট যাই ও তাঁহাকে সাভুনা করিয়া লইয়া আসি। এখল হইতে তাঁহাকে লইয়া কমলাদেবীর আবাসে রাখিব। পরে কচুয়ারকে সমস্ত অবগত করাইয়া তাঁহার সহিত বিজয়কৃষ্ণকে মহারাজ মানসিংহের দরবারে লইয়া যাইব।”

মালিকরাজ ও হৃদ্যকুমার কেতকীকোণে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মধ্যস্থ পরিষ্কার ভূমিতে নবীন কোমল ত্বণের উপর বিজয়কৃষ্ণ হেঁটমুণ্ডে বসিয়া আছেন ; স্বীয় করতলে কপোল গ্রস্ত করিয়া শৃঙ্গদৃষ্টি করিতেছেন ; চক্ষু উখলিত আছে কিন্তু দৃষ্টি নাই ; কর্ণে শব্দ প্রবেশ করে না ; অবরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ লম্বমান, এককালে শোকে অবসন্ন। হৃদ্যকুমার বিজয়কৃষ্ণের কাতর অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। অতি মন্দ মন্দ পদ-বিক্ষেপে নিকটস্থ ষণের উপর বসিল। বিজয়কৃষ্ণ হৃদ্যকুমারকে দেখিয়া আর চক্ষু চাহিয়া থাকিতে পারিল না, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিল, কতরূপ এরূপ নীরবে অশ্রুপাতের পর বরষারা মুখ মুছিয়া বলিলেন, “হৃদ্যকুমার—বাবাজী, কেমন আছ ? গত রাত্রির যুদ্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া থাকিবে, এত প্রত্যাঘে বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ? যাও—একটু বিশ্রাম কর। আমার জগু চিন্তিত হইও না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার মৃত্যুকে আশঙ্কা নাই, আমার জীবিতাশাও নাই। এখন আমার কারাগার ও প্রাণাধ উভয়ই তুল্য। তবে অপঘাত অদৃষ্টে ছিল—কি করিব—আমার সংকার নাই। মালিকরাজকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিও, আমার মৃত্যুর পর অনাগ্রাসে বল্যপি আমার অস্থি সম্বলন করিয়া ভাগিরথীর জলে দিতে পার, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট। মাদৃশ নারকীয় অস্থি ভগীরথ খাদে পড়িলেই কিছু আমার গদালাভ হইবে না—রুদ্রেশিষাচ আছে—তবে কোন পতিতে বল্যপি একবার নারায়ণক্ষেত্রে অস্থি-গুলিকে দিতে পার, তাহা হইলে স্পর্শফল অংশই লাভ করিব। পরে অবকাশ পাইলে একবার মালিকরাজকে পরাধামে পাঠাইও। মালিকরাজকে করুণদৃষ্টিতে দেখিবে—এখন সে অনাথ, আজ্ঞারহীন, হইল। হৃদ্যকুমার করুণস্বরে বলিল, “মহাশয়, অকারণ আত্মকে কষ্ট দিবেন না। যুদ্ধে জয় পরাজয় চিরদিন আছে। রাজসেবা যদিচ মানের কৰ্ম্ম, কিন্তু তাহা ভাল বুকের ছায়ার ছায় অস্থির ও চঞ্চল। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য নষ্ট হইল বটে, কিন্তু আপনার পদের কোন হানি এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় না ; আপনি হতাশ হইবেন

না। মহারাজ মানসিংহ অতি সুবিবেচক, তাঁহার নিকট কাহারও কোন চিন্তা নাই। প্রতাপাদিত্য স্বায় হুকুমের ফলভোগ করিবেন, তাঁহার সহিত আপনার এক্ষণে কোন সম্পর্ক নাই।”

বিজয়রূপ বলিল, “স্বর্ঘ্যকুমার, আমরা পূর্বধানুক্রেমে রায়বংশে প্রতিপালিত—রায়-বংশের উন্নতিতে আমাদের বৃদ্ধি ও তাহার অধোগতে আমাদের সর্বনাশ। মহারাজ বসন্তরায়ের আমলে আমরা মহামাণ্ডের সহিত কাটাইলাম, এখন আমাদের পাপে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অকালে অস্ত হইল। হা বিধাতঃ! আমি বহুমানের রায়বংশের এই দুর্দশা!”

বিজয়রূপ কাতর স্বরে বিধাতা স্মরণ করত করতল দ্বারা স্বায় ললাটে আঘাত করিলেন।

স্বর্ঘ্যকুমার বলিল, “মহাশয়, আপনি মুগ্ধ হইবেন না। বিজয় হইয়া এত অভিজ্ঞ হইলে আমরা নিরুপার—মালিকরাজ আপনার বাক্য শুনিয়া হতোদ্যম হইল। আপনি সাহস বাঁধিয়া তাকে আশ্বাস দিন। বিজয়ের আপৎকালে এত আচ্ছন্ন হয় না; আপনি অস্থির হইলে মালিকরাজের কি হইবে?”

বিজয়রূপ বলিল, “স্বর্ঘ্যকুমার, প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্টের কথা চিন্তিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। এক্ষণে তিনি নিঃশ্ব, ভ্রষ্টরাজ্য ও নষ্টস্বায়। যশোহর হইতে গুপ্তগতি প্রমুখাং যাহা শুনিতেছি, তাহা যত্নাশি সত্য হয়, তবে মহারাজের সে স্থানেও বড় মঙ্গল নহে। এ দিকে জনপ্রবাল যে, যশোহরেরপরী যশোহরধামে বাস হইয়াছেন। সরমার বেশে প্রতাপাদিত্যের সভায় উপস্থিত হওয়ায়, মহারাজা কুহকের বেশে তাঁহাকে পরুষ-বাক্য বলিয়াছেন। দেবী মন্দিরের বিমুখ হইয়া বসিয়াছেন। স্বর্ঘ্যকুমার, তুমি সুবোধ, সকলই বুঝিতে পার, ধেরূপ উপসর্গ আনুষঙ্গিক অমঙ্গল সূচনা চারিদিকে দেখা যায়, তাহাতে তো আমার হৃৎকম্প হয়। স্বর্ঘ্যকুমার তোমার ক্ষমতা, বলে তুমি ভরায় স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইবে। দেখ, অনাথা সরমাকে ত্যাগ করিও না। সরমা তোমারই—আর কাহাকেও জানে না। এক্ষণে যে প্রতাপাদিত্য এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, এমনত আশা করি না। সরমা আপাততঃ পিতৃহৃৎখে পাগলিনী প্রায় হইবেক। কস্ত তাহার মন তোমারই—প্রথম শোকের জ্বালা একটু শীতল হইলে তুমি বহু করিও,—সরমা তোমারই—! বাবাজি—আমার নিকট স্বীকার কর যে, পূর্বে মহারাজের উপর যে কিছু অভিমান ছিল, তাহা সরমার জন্ত বিস্মৃত হইবে। তুমি উদারহৃদয় ও দয়ার্জল্যবান—ক্ষমাগুণ তোমাতে যথেষ্ট আছে। এখন তোমরা স্বীয় কণ্ঠে বাও, আমি কমলাদেবীর মন্দিরে যাই—রাজমহিষী ও সরমাকে লভুনা করি, পরে অর্ন্তে বাহা থাকে, তাহা ষটিবেক।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “মহাশয়, আপনার বিষয়ে নিশ্চিত হাঁকুন। মহারাজ মান-সিংহের নিকট যাহা কিছু বলিতে হইবেক, তাহা আমি না পারি, কচুরায়ের দ্বারা বলা-ইব। সরমাকে আমার প্রেম জানাইবেন। তাহার মনের অবস্থা দেখিয়া যাহা বক্তব্য হয় বলিবন, আমি বালককালাবধি আপনাকে পিতৃব্যের হ্রায় দেখিয়া থাকি।”

স্বর্ধাকুমার মালিকরাজের সহিত একযোগে পথের কাটা সরাইয়া গিলে, বিজয়কৃষ্ণ কেতকৌশল হইতে বাহির হইলেন, স্বর্ধাকুমার ও মালিকরাজ সূড়ঙ্গের দিকে চলিল।

স্বর্ধাকুমারেরা কিছু দূর চলিয়া গেলে, বিজয়কৃষ্ণ নিকটস্থ অখণ্ড বৃক্ষের নীচেয় বিশ্রাম-প্রাপ্তরে বসিয়া চিন্তিতে লাগিলেন। ভাবিলেন ইহারা যৌবনমূলত ভাদমান্যনে সমস্ত বিষয়ের সুন্দর দিক্ দেখে; কিন্তু আমার বয়োধিক হইয়াছে, আমি শত শত বার হতাশ হইয়াছি, অনেক কষ্টও পাইয়াছি, আমার আশা এখন আর তত বলবতী নাই। এখন কখনা সকল কর্মে কৃতার্থ দেখায়। ফলে বিজ্ঞের কর্তব্য, ভবিষ্যৎ-বিচারে প্রথমে কূটর স্বরে লইয়া যাওয়া উচিত, পরে যদি কোন উপায়ে মনের কোঠরে স্থান না পায়, তবে এক দিন ভাল আশা করিতে পারি। এখন প্রতাপাদিত্য যেদ্রুপ আপন্ন, তাহায় যে তিনি আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেন, এমন বোধ হয় না। কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুরের মৃত্যু, ভজুরমলের পলায়ন, স্বর্ধাকুমারের প্রাণকূলতা, বর্দ্ধমানের অমৈত্রতা একত্র হইয়া অনর্থের মূল হইয়াছে। যখন কুলদেবতা বাম হইলেন এখন অবশ্যই বুদ্ধশার উদয় সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্যের অভিষেক পিতৃব্যশোণিতে হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অভিষেকের চরম উপস্থিত। কচুরায়কে দেবতা লুকাইয়া রক্ষা করে, এখন প্রতাপাদিত্য লুকাইয়াও বাঁচবেন না। যে দিন মহারাজ স্বীয় ভ্রাতৃত্বকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, তখন মহারাজের সর্বনাশ হইল জানিলাম। যখন শরণাগত ও অপ্রিত বর্দ্ধালুহ ফিরিঙ্গী আশ্রয় হইয়া মহারাজার আশ্রয় চাইবার পর, মহারাজ তাহাকে পশুরূপে হত্যা করেন, তখনই প্রতাপাদিত্যের শুভ স্বর্গান্ত হইল। যখন মহারাজের বাল্যচাপল্য বশতঃ গুরুজনে বিপরীত দৃষ্টি কারিতেন, তখনই তাহার সর্বনাশের ইষ্টকাহোপগণ হইল। যখন মহারাজ স্বীয় খল্লতাতে রাক্ষস চরিত্র বিবলেন, তখন জানিলাম যে, মহারাজ অধঃপতনে সংকল্প করিলেন। তবে যে এতদিন এমন স্থির সর্বনাশের রাজার অনুকরণ ও সেবা করিলাম, তাহার কারণ মালিকরাজ। মহারাজ বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় উপযুক্ত আশ্রয় রহিল না। আমার যদিচ তীর্থবাস করিলে চলিত, কিন্তু তনয়ের মঙ্গল চিন্তায় অগত্যা বর্দ্ধমানীল অধিপতির সেবা করিতে হইয়াছিল। এখন যেদ্রুপ গতি দেখিতেছি, তাহার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যের আর প্রেরণ নাই! এখন তাহাকে ত্যাগ না করিলে, গুরুতন্ত্র

নিমজ্জনের সহিত আমাকেও অধোদেশে বাইতে হইবেক। ক্রমে অবকাশ-মত মহারাজ মানসিংহের মনোরঞ্জন করিব। সূর্য্যকুমারের এখন সৌভাগ্যের উদয়; তাহার সহিত আমার চিরদিন প্রীতি আছে; সে বুঝা—বৌবনহুলত ওদার্য্যে সকল বিষয়ের প্রকৃত গিঙ্গ সমর্থনে ভ্রান্ত হইয়া থাকে; সংসারের মতে সে সরল, অতএব তাহার সরসতার ফলভোগ করা বাইবেক। যদি প্রতাপাদিত্য পুনরায় স্বীয় রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়, তবে তাহার সেবা গ্রহণ অসম্ভব। স্থিরবুদ্ধিতে বিবেচনা গেলে, এটা এফ প্রকার আমারই মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। বাহা হউক, পূর্ব্ব ঋণিলক্ষ্য অগ্রহণ হয় না,—সংসারে বুদ্ধিই একমাত্র ধন, বুদ্ধি থাকিলে দর্শনকষ্টকর কর্ম্মে সুখসেব্য ফল পাওয়া যায়। কচুরায় যদ্যপি আসিয়া থাকে, তবেই আমার কোন চিন্তা নাই।” এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণ কমলাদেবীর আবাসে চলিলেন।

এদিকে সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ ক্রমে দীর্ঘায় কূলে উপস্থিত হইলে, মোগল-সৈনিকের মুখে শুনিলেন যে, প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে। গড়ের প্রধান মন্দিরে সম্রাট সভা হইতেছে, স্বরায় সংলগ্ন প্রধান রাজপুরুষের অধিষ্ঠান হইবেক।

সূর্য্যকুমার বলিল, মালিক, চল আমরা বেশ পরিবর্তন করিয়া সভায় যাই।”

মালিকরাজ বলিল, “আর বস্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন কি? সভা অঙ্গরূপই বসিবেক।

সূর্য্যকুমার বলিল, “না—না সম্রাট সভার উপযুক্ত বেশ ধারণ না করিলে, মহারাজ মানসিংহের অপমান করা হয়। আমাদের বস্ত্র বর্ণাদি শোণিত কর্দমাগিতে দূষিত হইয়াছে।”

মালিকরাজ বলিল, তবে যদি বেশ পরিবর্তন করিতে হয়, চল যাই, কিন্তু তাহা হইলে রাজসভার বেশ করিতে হইবেক।

সূর্য্যকুমার কোন উত্তর না করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। পথে ভজহরির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার ভজহরি বলিল, “মহাশয়, কোথায় ব্যস্ত হইয়া, বাইতেছেন—সম্রাট-সভায় বাইবেন না?”

সূর্য্যকুমার বলিল, “আমি স্বীয় শিবিরে বাইতেছি—বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া আসিব।”

ভজহরি বলিল, “আপনাদিগের স্বজ্ঞাবার ওদিকে নাই; গড় নথলের পর মহারাজ মানসিংহের আদেশ, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ছাউনি রায়গড়ের অংশালায় নিকট আনীত হইয়াছে ও অপর সেনারা সকলেই রায়গড়ের ভিতরে আছে। বাহিরে কেবল গ্রহরীরা চতুর্দিক্ রক্ষা করিতেছে। গড়ে যেরূপ অবস্থান হয়, এখন তদ্রূপ হইতে চলিয়াছে।”

মালিকরাজ বলিল, “তবে চল, আমরা অংশালায় দিকে যাই।”

স্বর্ধাকুমার ও মালিকরাজ একত্রে পূর্বাভিমুখ হইয়া স্বরায় শিবির মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ধাকুমারের শিবির দেখিতে পাইয়া বলিল, স্বর্ধাকুমার, এই যে তোমার ‘শিবির’।

স্বর্ধাকুমার বলিল, “তাই ত। এ যে মহারাজ মানসিংহের শিবিরের পার্শ্বেই পাতিয়াছে।”

উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া হস্তপদাদি ধোত করিয়া বখাযোগ্য বস্ত্র ও বস্ত্রাদি পরিধান করিতেছে, এমনত সময় নন্দরাম আসিয়া বলিল, “জয়ন্তীরাজার জয় হউক। মহারাজ মানসিংহ আপনাকে সম্রাট-সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এক্ষণে মহারাজের সঙ্গে কি প্রকার রেবালা যাইবেক, অসুমতি করুন।”

স্বর্ধাকুমার একটু স্থির হইয়া বলিল, “নন্দরাম এ বিদেশ—আর আমি এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হই নাই। এখন আমার রেবালা সঙ্গে লইয়া যাওয়া তত সঙ্গত হয় না।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, বলেন কি? আপনি স্বাধীন রাজা, আপনি সম্রাটসভায় সমাগ্ন সৈন্তাধ্যক্ষের বেশে যাইবেন—ভাল নহে।”

মালিকরাজ বলিল, “জয়ন্তীরাজ, আপনার অন্য দেশীয় বেশ ধারণ করা উচিত।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “হাঁ, তাহা হইলেই তোমরা সফল আমাকে দেখিয়া উপহাস করা।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, আপনাকে উপহাস করে এতেন লোক ভূত্বারতে নাই। মহারাজ মানসিংহ আমাকে ডাকাইয়া আপনাকে দেশীয় বেশে ও যথোচিত রেবালা সঙ্গে বখাযোগ্য মানে যাইতে বলিয়াছেন। আমিও একশত দীর্ঘকায়, সুস্থ কুকী, অঝোরোহী প্রস্তুত হইতে বলিয়াছি, আর আমাদিগের দেশের ভবরুট বাদ্যও প্রস্তুতের আদেশ দিয়াছি। আমাদিগের দেশের প্রথা, জয়লাভ করিলে, পরাজিত নগরী প্রবেশ করিবার সময় কাতর ও করুণবাদ্য ও ভবরুট ঢকা বাজাইয়া থাকি।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “নন্দরাম, তোমার পরামর্শ আমার অবশ্য গ্রাহ্য। আমি এত অল্প বয়সে স্বদেশ ছাড়িয়াছিলাম যে, আমার দেশীয় রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি। বাহা ভাল হয় কর, আমি তোমার পরামর্শ অতিক্রম করিব না।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, আমরা অসত্য পার্শ্বভী—আমাদিগের রুচি প্রাকৃত ও নগরুল্য কঠিন। এক্ষণে দিল্লীর সম্রাটের সম্মুখে যাইতে হইবেক, একান্ত পার্শ্বভী প্রবেশভূমি এ সমাজে শোভা পাইবেক না। বাহ্যর শিজাতীয় না হয় অথচ সুস্থ হয়, এমত বেশ করুন।”

মালিকরাজ বলিল, “অগ্নে জালিকাচক্ৰ, শিরে দেশীয় ঐশিক উকীষ, ও হস্তে কুকীশেল, পৃষ্ঠে ভয়ভীষণটিকা ধারণ কর।”

স্বর্ধাকুমার শিবিরের মধ্যে সোপানপার্শ্বে বসিলে, সৈরিজ্ঞ দিব্য স্বর্ণশৃঙ্খল নিশ্চিত জালিকাচক্ৰ অগ্নে লাগাইল নীলবর্ণের পটবস্ত্র পরিধান করাইয়া দিল; কটিদেশে চিত্রিত উর্বার কটাবন্ধ বঁধিয়া তাহার কৃষ্ণচমরীকলনের পুচ্ছ সম্মুখে ঝুলাইল; জজ্ঞাশিঙে স্বর্ণপট্ট দ্বারা শোভিত করিল; পদে সূদৃশ চপলী, মস্তকে সমুদ্রের টোপী, তাহে হোমায় ও মনালের পক্ষ; কর্ণে মুক্তার গোল্ডন, তাহার নীচে প্রবালের ললিতুকা; চমরীকলনের পুচ্ছ বেষ্টিয়া স্বর্ণশৃঙ্খলা কটীদেশে শোভিল; পদে রৌপ্যহংসক; শৃঙ্খলা হইতে বামভাগে একটি ব্যাকৃশৃঙ্গ ঝুলিতেছে—প্রয়োজন হইলে তুরীর কক্ষ দেয়; পৃষ্ঠস্থ ভয়ভীষণটিকায় বামভাগে একটি নাগাপরুড়ীয়া তুল, তাহে নিশিত মনালপক্ষ্মমুক্ত কতিপয় কঙ্কপত্র, বাম-স্থক্ষে ভীমধনু, দক্ষিণ হস্তে দার্য কুকী শেল। স্বর্ধাকুমার অতি সূদৃশ সুবা—এবস্থিত পার্শ্বতঃশেষে যেন বটিক ভৈরবের হায় শোভিল।

মালিকরাজ বলিল, “স্বর্ধাকুমার, তোমাকে দেখিতে ই যে জ স্ত্রীরাজ বোধ হয়।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “তুমি এত্নীক অবার বেশ ধরিবে?”

মালিকরাজ বলিল, “আমার আশ্বাধক বেশ শোভিবেক না—আমি সভ্যবেশে ঘাইব। তোমার সভাসদের হায় তোমাকে অনুসরণ করিব। কেননা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে আমার কোন নির্দিষ্ট পদ ছিল না।”

মালিকরাজ সাদা ঢাকাই সর্বভেদ ভেড়া পরিল, বটীদেশে ঢাকাই ডিমটীর কোমর-বন্ধ, তাহে দিব্য পেষকবজ লাগাইল, শিরে বিড়বীদার পাগড়ী লাইল। স্বর্ধাকুমার একটি মণিপুরের কৃষ্ণবর্ণ উচ্চতর টাটু চাপলেন, মালিকরাজ একটি পারসীক দেশীয় দীর্ঘকার শেতবর্ণ অগ্নে আরোহণ করিল। নন্দরাম তাহার একশত কুকী অশ্বারোহী সম্মুখে উপস্থিত করিল, তাহাদিগের সবচেহই অশ্বনিগালে কি ধনী থাকায় একটি অনির্কচনীয়া মনোহর ঝুঁঝু—ধ্বনি উঠিল। অশ্বারোহীরা দুই ত্রৈলীতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব অশ্বকে স্থির করাইয়া স্ব স্ব শৃঙ্গ লইয়া এমত ভীষণ নাদ করিল, যেন প্রলয়হাস্তযুগ গর্জনে করিল। অশ্বের উপর পর্যাপ্ত নাই। যথেষ্ট বল্লাদও নাই, কেবল এক একটা উর্বা রজ্জ্বর গলপাশ অশ্বের প্রোথদেশে বাগুড়াবন্ধ করিয়া আরোহীর কটাবন্ধে লগ্ন আছে। আরোহীরা প্রায় নগ্ন, আবরণ মধ্যে লঙ্গোটা ও বটীদামন হইতে কৃষ্ণ চমরীর পুচ্ছ একটী করিয়া ঝুলিতেছে। সর্বাঙ্গ উন্মীণে ভূষিত। কর্ণে শত্রুদন্তের মালা, কাহার হস্তে শত্রুকপালের বলয়। অতি ভীষণমূর্ত্তি! শরীরে যেন দীর্ঘ, জায়গুও তেমন বঠিন। কাহার ললাটদেশে নাগগর্ভের রাজত। সকলেরই শিরের অগ্রভাগ উৎকণ্ঠ কেশে শোভিত। কপালদেশে আশ্রিত কাকপক্ষ। শিরোদেশে দীর্ঘ কপর্দ, তাহার উপর লণ্ডকাকের কৃষ্ণবর্ণ

চিহ্ন পক্ষ । সকলের অস্থ-মধ্যে দীর্ঘ লোমমুষ্টিশেল ও বামকটীতে প্রশস্তধার টাকী । তাহার স্বর্ধকুমারের সম্মুখীন হইয়া শূদ্রধর্ম কারয়া স্ব স্ব টাই এমত চালাইতে লাগিল যে, দেখিলে অনুমান হয়, অত্যন্ত দোঁড়তেছে, কিন্তু ফলে টাটগুলি একস্থানে দাঁড়াইয়া খুঁট খুঁট পদক্ষেপ করিতেছে, একপদও অগ্রসর হইতেছে না । জনৈক অর্থবিদ্যার নৈপুণ্য দেখাইয়া দ্বির হইল, স্বর্ধকুমার খীয় শূদ্র লইয়া বলে বাজাইয়া অগ্রসর হইলেন । মালিকরাজ দক্ষিণ পার্শ্বে ও নন্দরাম বাম পার্শ্বে চলিল । কিছু দূর ঘাইতে ঘাইতে কুকী অথারোহীরা চক্রাকারে তিন জনকে বেঁধেন করিয়া এখন চক্র গতিতে চলিল যে, তিন জনের গতি কণামাত্রেরও রোধ হইল ন, অথচ মন্দির তাহার কুকী সেনাচক্রের মধ্যে রহিলেন । এব প্রকার সজীবচরণ অথারোহীয়াবর্ত-মধ্যগত স্বর্ধকুমার মালিকরাজ ও নন্দরাম যেন তৈরব মধ্যে উমাকান্ত শোভিল । আবর্তের বহির্ভাগে সকলের আগে ছয় জন কুকী পায়িক করুণস্বরে বংশী বদন করিতেছে, তাহার পশ্চাতে কিকিণী-ধারী ছয় জন, তাহার পশ্চাতে ছয় জন ভবট বাজাইতেছে—ভুঙ্ক* দৃশ্যে আক্রান্ত গ্রামকূট ও ভটমগুণী, যেন ভাম বঙ্গব্যাঘ্রের দৃষ্ট-আহত করিয়া, যেন অঙ্গবরের নয়নাশ্রু পাকচয়, যেন ঐন্দ্রজালবেষ্টিত নিকোষ মণ্ডলী, কাহার বাহুনিপ্পত্তি নাই, যেন কাহার স্থান বহিত-তেছে না । কেহই এ অপরূপ কখন দেখে নাই, ও অথারোহি-আবর্তগত প্রথমস্তর কাহার, সে ব্যক্তি-জ্ঞান নাই । ক্রমে ভটমাত্রা যত সভামন্দিরের সমীপিত হইতে লাগিল, ততই লোকজনতা বৃদ্ধি পাইল, রাজমার্গের ভক্তপার্শ্বে পলাতশ্রেণী—মধ্যে মধ্যে ধ্বজা ও পতাকা । কেহবা রূপা বা মোণার আশা, কেহ সোঁটা, কেহ গজা, কেহ মংস্ত লইয়া কেহবা সদ্যাঃপ্রতিষ্ঠিত কদলী তরুর নিকট দাঁড়াইয়া আছে । মন্দিরের নিকটে গাবিকা-মণ্ডলী—সুবেশা সূন্তনী গাবকাগণ মন্দির বত্র পরিহিত হইয়া কেহ শম্ভাবদন করিতেছে, কেহবা উলুলবো' গাইতেছে, কেহবা শ্রী, স্বস্ত্র, প্রশংসাপত্রাদি হস্তে লইয়া মঙ্গল দর্শন করাইতেছে । পতাকাধারীর মধ্যে জনৈক স্বর্ধকুমারের আগমন দেখিয়া পতাকা উঠাইল । তাহার দৃষ্টান্তে সকল পতাকাধারী পতাকা উঠাইল, প্রভোলীপ্রাকারহ পতাকাধারী পতাকা উঠাইল, অতঃপর একটি তোপসন হইল, ক্রমে পকাশটি ধ্বল ছুটিতে ছুটিতে—স্বর্ধকুমার সভামন্দিরের দ্বারে প্রবেশ করিলেন । কচুরায় অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিলে স্বর্ধকুমার খীয় অস্থ হইতে এক লক্ষ অবতীর হইলেন ।

এ দিকে তাহার কুকী সেনারা দুই পংক্তি হইয়া তাহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল । স্বর্ধকুমারের হস্ত ধরিয়া কচুরায় বাললেন, “ভাই স্বর্ধকুমার, মহারাজ প্রতাপাদিত্য ধরা পাড়িয়াছেন, তুমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম । এটি তাহার খীয় দোষে ঘটিল,—তিনি বদ্যপি রায়গড় পরাজয়ের পর এ স্থান ত্যাগ করিডেন, তাহা হইলে ভাল হইত; দিল্লীরায়ের বেরূপ পুরুষ আদেশ—তাহাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যাইবে ।

আমি মহারাজ মানসিংহের নিকট করুণ ব্যবহারের জন্য ভিক্ষা পর্ধ্যন্ত করিব। কিন্তু হুজুরানী রাজার বন্দী হওয়াই যথেষ্ট। চল, এখন সভা আরম্ভ হইয়াছে, আমি তোমার প্রতীক্ষায় এখানে দাঁড়াইয়া আছি।”

সূর্যকুমার বলিল, “মহাশয় পূর্বে আমার বেরূপ প্রবৃত্তি থাকুক না, কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পরাভবে এখন বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বঙ্গের একটি বীর নিপতিত হওয়ার, অন্য বঙ্গের স্বাধীনতা উন্মূলিত হইল! মহারাজ মানসিংহ রাজগুণ্ডার লোক—বঙ্গের জন্য তাঁহার এত দরদ নাই। হায়! আমাদের গ্রেপ্তার করিয়া বন্দাপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহায়তায় থাকিতাম, তাহা হইলে যুদ্ধ জয়ী হই, বা না হই মনের এরূপ মালিছা জমিত না। আমাদের স্বার্থপরতাই আমাদের সর্বনাশ করিল! মহারাজ আমার পৈত্রিক রাজ্য হইতে আমাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন; আধুনিক অমুপযুক্ত জনৈক দল্লুইকে সিংহাসনে বসাইলেন; জনপ্রবাদ—আমার পিতার মৃত্যু ও মাতার মনোব্যথার কারণ মহারাজ প্রতাপাদিত্য!—যাহা হউক, এ সকল গেষ্টবাক্য বিস্মৃত হইয়া বন্দাপি আমরা তাঁহার দলভুক্ত হইতাম, তাহা হইলে যুদ্ধ মৃত্যুতে স্বর্গ হইত সন্দেহ নাই।”

কচুরায় বলিলেন, “তাই, আমিও ক্ষুদ্রচেতা—আমার পিতৃবৈর নির্ঘাতনেচ্ছায় ও পিতৃরাজ্য লাভের উদ্দেশে,—আমার রাজ্যই বা কেন তালুকদারী বলিলে হয়, কেননা প্রতাপাদিত্য ইদানী কাহাকেও কর দিতেন না—কিন্তু আমি কর স্বীকার করিয়া ও যতদিন জীবিত থাকিব, দিল্লীখরের ভর্তৃত্বাঙ্কিত হইয়া কাটাইব মানস করিয়াছি—সামান্য বিষয়াশায় দেশের সর্বনাশে প্রবৃত্ত হইলাম! আমার কুবুদ্ধি! যদি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করিতাম, তাহা হইলে একদিন মোগলসেনার সহিত যুদ্ধে অস্ত্র তুলিয়া বঙ্গোদ্ধারের উদ্যম করিতাম। যাহা হউক, এখন দিল্লীখরের সূত্রহে বঙ্গে পরস্পরের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত। এখন সকলেই আমাদের দিল্লীর শয়ল আপন আপন গলদেপে লাগাইলাম! আমরা পামর! স্বীয় ভ্রাতৃ ও সখীদের কণামাত্র, দৌর্জল্য সহ করিতে পারিলাম না, কিন্তু স্বেচ্ছ দিল্লীর পদানত হইতে আত্মকে চরিতার্থ মানিলাম!”

সূর্যকুমার বলিল, “রামচন্দ্ররায় এখন কি কারাগার হইতে মুক্তি পাইবেক না? তিনি এখন কোনভাবে অবস্থান করিবেন?”

কচুরায় বলিল, “আমি এখন তোমাকে অভিযর্থনা করিবার জন্য ঘরে আছি, তখন পক্ষে জনৈক বশোহরের সমাচারবাহক গুপ্তগতির সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে মহারাজ মানসিংহের নিকট যাইতেছিল। তাহার প্রমুখ্যৎ শুনিলাম;—অন্য কি গুপ্ত রাজিতে, সে নিস্তর বলিতে পারিল না, কেননা গুপ্তগতি নিকটস্থ অপর গুপ্তগতির প্রেরিত—

রানচন্দ্রের এখল বন্দী নাই ; তিনি স্বরাজ্যে গিয়া সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন । বশোহরে বিব্রোহ উপস্থিত, গোবর্দ্ধন নামক জনৈক রাজপুত্র প্রতাপাদিত্যের শাসন অস্ত্রধা করিয়া স্বয়ং রাজলিঙ্গাদি ধারণ করিয়া রাজকোষ দখল লইয়াছে ; যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে বঙ্গ একেবারে উচ্ছিন্ন নেল !”

সভা প্রবেশমাত্র নকীব উঠেঃস্বরে বলিল,—

“অন্নভৌকানিয়া নাগ হিমাচল পূর্বভাগ ভোট চীন সমিহিত দেশ

বৌদ্ধমধ্যে অগ্রগণ্য, বৈকবের মহামায়া ।

শিবচন্দ্র রাজা ধন্য ! তার পুত্র তেজ দেখি স্বর্ধ্য করে ঘেব ।

স্বর্ধ্যকুমার নাম ধরি সভায় উদিত । সভ্যগণ মায়া কর তার সমুচিত ।

সঙ্গে চলে বজ্ররাজ, বসন্তরায়ের পুত্র শ্রেষ্ঠ বীরবর ।

পরাজিয়া শত্রুদল, প্রচারিয়া নিজ বল, রাখিল পিতার নাম কৃকবর্ধধর।”

সভাস্থ সকলে, স্ব স্ব আসন ত্যাগ দিয়া সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল । মহারাজ মানসিংহও স্বীয় আসন হইতে উঠিলেন । কচুরায় কিঞ্চিৎ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিয়া স্বর্ধ্যকুমারকে ইঙ্গিত করিলে, স্বর্ধ্যকুমার সমাগত সম্ভ্রান্ত সভ্যপংক্তি-দ্বয়ের মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু উন্মোচন করিয়া সমস্ত্রমে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার মন একরূপ সম্মানে প্লাবিত হইল ; মনে মনে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করত রাজপদবিজ্ঞেপে মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন । স্বর্ধ্যকুমারের সাহস্কার ও বীর-গতি,—প্রশস্ত, উন্নত বক্ষঃস্থল,—উদার বীরনয়ন দোখরা লকলেই যুক্ত হইল । মানসিংহ ডিনপদ অগ্রসর হইয়া স্বর্ধ্যকুমারকে কোল দিলে, স্বর্ধ্যকুমার আলিঙ্গন করিয়া তাহার জামুদ্বয় স্পর্শ করিলেন । মানসিংহ পশ্চাত্ত্ব কচুরায়কে কোল দিলেন । কচুরায়ও জামুদ্বয় স্পর্শ করিল । পরে স্বর্ধ্যকুমারকে আপনার দক্ষিণহ আসনে বসাইয়া কচুরায়কে বামের চতুর্থ আসনে ইঙ্গিত করিলেন । কচুরায় স্বীয় আসনে আসীন হইলেন । ক্রমে সমস্ত সভেরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিল ।

মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণে স্বর্ধ্যকুমার, মহারাজ মানসিংহের বামে ঢাকার নবাব, স্বর্ধ্যকুমারের দক্ষিণে উড়িষ্যার মন্ত্রী । ঢাকার নবাবের বামে বর্দ্ধমানাধিপ । উড়িষ্যার মন্ত্রীর দক্ষিণে গোড়ের নবাবের ডাডুপুত্র । বর্দ্ধমানের বামে ডবালন্দ বজ্রমদার ও তাহার বামে কচুরায় । দিল্লীর অপরাপর রাজপুত্রেরা যথাস্থানে আসীন হইল । মহারাজ মানসিংহ আসীন হইলে কতিপয় খধুপ হইল । তাহার পর সভা মন্দিরের ঘরে নহোবত বাজিল ও চারিজন সুবেশা সুন্দরী যুবতী নটী আসিয়া সভায় সম্মুখে গান আরম্ভ করিল । কণ্ঠের বাদ্যাদি ও নৃত্যগীত হইলে, মানসিংহের ইজিতে জনৈক সভ্য উঠিয়া পান লইয়া নটীর সম্মুখে ধরিলে তাহার শির দোরাইয়া

পান লইয়া চলিয়া গেল। অবদার গোলাপ লইয়া স্বর্ণনির্মিত বৈঠকী লম্বলম্বা চারিদিকে পাটলামোদমাংস জল সিকন করিতে লাগিল। সভাস্থ বিচিত্র কবচধর শূরগণ মহাবীৰ্য, পরাক্রমশালী, বিচিত্র ধ্বজধারী, বিচিত্রাভরণোপেত, বিচিত্র রথবাহন, বিচিত্র অস্ত্র, বিচিত্রাস্ত্রভূষণ শত সহস্র বীর স্বদেশবেশান্তরূপভূষিত হইয়া ও সেনাপ্রণেতায়া যেন ভূত পঞ্চক ব্যথিত করিয়া, যেন মেদিনীকে কম্পাথিত করিয়া বাসিয়াছে। ইঙ্গিতমাত্রে একটি তুরী বাজিল, সভা নীরব হইল, স্নেহে জনৈক পেকদার দক্ষিণ বাহ উত্তোলনে আসিয়া। শির নোয়াইয়া মানসিংহকে অভিবাदन করিয়া বলিল, “আকবর হোআলা!” সভাস্থ সকলেই মধুরস্বরে “আকবর হো আলা” বলিয়া প্রতিশব্দ করিল। সকলে নিঃশব্দ হইলে পেশকার একথণ্ড দীর্ঘকাগজ বাহির করিলে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, “পেশকার ত্রি, সভা আরম্ভ কর।”

পেশকার বলিল, “আকবর হো আলা। দিল্লীশ্বরের জয় হউক, যাহার শাসন ভারত-ভূমির উত্তরখণ্ড দেবদান হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজসভায় অগ্রগণ্য ও দিল্লীশ্বরের ঐতিহাসিক ও প্রধান সেনানী মহারাজাধিরাজ মানসিংহের জয় হউক। সমাগত দেশবিদেশস্থ ছত্রধারী, সম্রাট, মন্ত্রী ও গণ্য আমীর ও ওমরাওগণের জয় হউক। সচিব আমাত্য দশহাজারী ও পঞ্চহাজারী সওয়ার ও পদাতিক জয় হউক। দিল্লীর কেতু অতিক্রম করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হন না। দিল্লীশ্বর যে রাজ্যের পালক ওধায় অনারুণি, মহামারী প্রভৃতি প্রজাপীড়ক ঐতি দৃষ্ট হয় না। মহারাজ মানসিংহ দিল্লীর ফরমান পাইয়া বেঙ্গল ফরিদৌল্লখান্টক উৎপাটন করত শান্তি সংস্থাপন করিলেন। বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর পতাকা রায়গড়ে পুনরায় স্থাপন করিলেন। এখন সমাগত জনসংঘে মহারাজ মানসিংহের রাজ্যনায়াসস্বত্ব আদেশ ভাটমুখে রাটীতে হুদায় প্রচারিত হইবেক ও দুই রাজ্যবিদ্রোহী, স্বজন আত্মীয় পীড়কের শাস্তি হইবেক, সমাগত সমাজ তাহা স্বচক্ষে দেখিবেন।” পেশকার শির নোয়াইয়া অভিবাदन করিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল।

অনন্তপালদেব সসম্মানে অগ্রসর হইয়া হস্তধর উঠাইয়া বলিলেন, “মহারাজ মানসিংহের জয় হউক। আমি মহারাজ বসন্তরায় বাহাদুরের প্রধান সচিব, তাঁহার জীবদশায় রায়গড়ের কিলেদার ছিলাম। তাঁহার অকালমৃত্যুর পর তাঁহার মহাবীর্যের অনুমতি মতে রায়গড়ে শান্তিরক্ষা, দুইদমন ও রাজ্যপ্রবাহ চালাইয়া আসিতেছিলাম। আজ ভিসদিন হইতে বনোবরের রাজ্য প্রতাপাদিত্যের বোনে, ফিরিঙ্গী সাহায্যে, অত্যন্ত রাজকন্ডা ইন্দুমতী দেবীর হরণ ও পরেই প্রতাপাদিত্যের দ্বারা বিনা যুদ্ধে রায়গড় অধিকৃত হয়। গতরাত্রি মহারাজ মানসিংহের বলে, দুই প্রতাপাদিত্য পুনরুত্থিত হইয়া গড় সাব্বাহ হইয়াছে, এক্ষণে গড় সম্বন্ধে মহারাজার যেরূপ অনুমতি হয়।”

অমরপাল দেব বলিলেন, সত্য নীরব হইল । সকলেই মহারাজ মানসিংহের দিকে চাহিল । মহারাজ কোন উত্তর না দিয়া হেঁটমুণ্ডে বলিয়া রহিলেন । ক্রমেক বিশেষ জনৈক দিল্লীর সেনানী আসিয়া করপুটে বলিল, “মহারাজার জয় হউক । রাণগড়ের কলত্রের দক্ষিণ দিকের সুড়ঙ্গের বহির্দ্বারে উগ্রসেন চণ্ডালের অনুচরের দ্বারা বশোহরা-ধিপ মহারাজাধিরাজ অমিতবিক্রম প্রতাপাদিত্য রায় বন্দী হইয়াছেন—বারে অবস্থান করিতেছেন ।”

মানসিংহের উজীর বলিল, “হজুর ! এই প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে দিল্লীরবের নিকট বহুল শেকসেৎ দাখিল হইয়াছে, ইহার উপর বহুসংখ্যক দোবারোপিত হইয়াছে । ইনি ইহার পিতৃব্য-পুত্রকে নষ্ট করণাভিলাষে আক্রমণ করিলে, তাহার ব্রাহ্মণী খাত্তী——”

ব্যস্তবেগে রেবতী আলুলায়িতকেশ্য হইয়া প্রবেশ করিল ও তাহারই পশ্চাৎ লোহ-বলয়-বদ্ধ-কর মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য সৈনিকবেষ্টিত হইয়া সম্মুখীন হইলেন । রাহগ্রস্ত রবি দর্শনে কাহার না মন টলে !

সভায় রেবতীর অকস্মাৎ প্রবেশ ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের হীনাবস্থা দেখিয়া সকলেই সিহরিল । অতি পরুষ-স্বভাব মুসলমান উজীরও বাক্যহীন হইল । যাহার প্রত্যপে বজ্র সকলেই ভীত ও কম্পাবিত হইত, সেই দ্বাদশ-ভৌমিক চূড়ামণি প্রতাপাদিত্য লোহ-বলয়-বদ্ধকর হইয়া মানসিংহের সম্মুখীন ! যেন তেজঃপুঞ্জ লুপ্তপুঞ্জ ধুমকেতু সবিভূসম্বি-হিত হইল ও হিরণ্যবপু মানসিংহের রক্তরক্তস দেখা দিল । বন্দী প্রতাপাদিত্যের জ্যোতি পদস্থ-মানসিংহকে আবারিল । বিধাতা কি বলবান্ ! তাহার অসংখ্য কিছুই নাই !

ক্রমেক নীরব হইলে রেবতী বলিল, “যম দণ্ডের জয় হউক,—বাহন মহিষের শৃঙ্গ বৃদ্ধি হউক,—ভূতপ্রোত সানন্দে নৃত্য করুক,—পিশাচী ও রাক্ষসী অট্টহাস করুক,—প্রলয়বায়ু প্রবাহিত হউক,—যুগান্তরের দ্বাদশাদিত্য উদিত হউক,—দশদিক্ দগ্ধ হউক,—সূর্য্য স্নিগ্ধ হউক—ব্রহ্মাণ্ড ভস্মাবশিষ্ট হউক ! আমি পাগলিনী ব্রাহ্মণী—নামে রেবতী চিরজীবী ! আমার মৃত্যু নাই, আমার শোক নাই, আমার মন নাই, আমার মান নাই, ধনত মূর্থের বল—কিন্তু সংসারের মূল ! মহারাজ আমি পাগলিনী, আমি অভাগিনী, আমি অনাধিনী, আমি সর্ব্বনাশী !—আমি বসন্তরাত্রে খাইয়াছি, আমি তাহার কর্ণে বিবসিরোজন করিয়াছি, আমি তাহার মহিষীর উপর কুদৃষ্টি করিয়াছি, আমি আবাস্য ভাষাকে শকলীভূত করিলাম । আমি কচুবনে ছিলাম, কচুরায় আমার শোণিত শোষিয়া বাঁচিল । মহারাজ, আমার এখন জ্ঞান আছে, আমাকে নিতান্ত ঘৃণা করিবেন না । আমি সমস্ত অবর্ণিত আছি,—জনসমাজে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে আমার লজ্জা হয় । কিন্তু হৃদয়ঙ্গর লজ্জা নাই, ধর্ম্মভয় নাই—ইন্দুমতী তাহার কথা, মহারাজ

শিবচন্দ্রস্বরের অকালমৃত্যুর পর তাঁহারই মহাবীর গর্ভে এই কথা জন্মে; পাপ নরাক্ষর এই কণ্ডার মাতার উপর কুতৃষ্টি করিয়াছিল, আমার সেদিন এই কণ্ডাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে!”—সমাজ সিংহাসন ও একটি পুতাকার শব চারিদিকে পুড়িল। “পত্নীরাতিতে কল্যাচারী বিমলাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করে ও আমার বশুকের তুলিতে বিমলার মন্দিরস্থ বারুণ রাশি প্রজ্জ্বলিত হইয়া মন্দিরটি শকলীভূত হইয়াছে। বিমলার শব সন্ধানিত করিয়াছি, এক্ষণে একবার নরাক্ষরকে সেই ব্যবস্থির শব প্রদর্শন করান।” এই কথা বলিয়া দেবতী মুচ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িল। কচুয়ার ব্যস্তে তাহাকে উঠাইয়া আপন ক্রোড়ে শুয়াইলে, হৃদয়ুমার তাহার নেত্রে গোলাপ দিকন করিতে লাগিল।

মানসিংহ বলিলেন, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য, আপনার বিপক্ষে যে সকল দোষা-
রোপ করা হইল, তাহার আপনার বক্তব্য কি?”

জৈনক প্রহরী বলন্ত গুরুমহাশয়কে ধরিয়া আনিল। এদিকে কচুয়ার ও হৃদ্য-
কুমারের শুভ্রাধার দেবতী সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। মহারাজ মানসিংহ
বলিলেন, “কচুয়ার, কল্যা প্রাচ্য যে পত্র পাইয়াছিলে তাহা পাঠ কর।”

কচুয়ার স্বীয় বস্ত্রমধ্য হইতে বর্জমানাধিপের সুজাতিস্থিত একখামি পত্র বাহির
করিয়া বৃদ্ধেরে পাঠ করিলে, সভ্যরা চমৎকৃত হইয়া ভূমিতে লাগিল। বর্জমানাধিপ
শুভ্রদৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় অপর কয়েকজন প্রহরী হজুরমলের গলদেশে
শৌহময় শূল দিয়া বাঁধিয়া আনিল। ক্রমে পত্রটি সমগ্র পঠিত হইলে মানসিংহ
বলিলেন, “ইমিই কি সেই বিষবাহক হজুরমল?” কেহ কোম উত্তর করিল না।
ক্রমে সভ্যগণে ইন্দুমতী, প্রতাপতী, অরুণতী প্রভৃতি সকলে আসিয়া এক এক
আসনে উপবিষ্ট হইল।

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, “মহারাজ প্রতাপাদিত্য, এ সকল বিষয়ে মহাশয়ের
কিছু বক্তব্য থাকে, প্রকাশ করুন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “আমার এখানে কিছুই বক্তব্য নাই—এ বোধোচিত স্থানও
নহে। তবে অকারণ বলন্ত গুরুমহাশয়কে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে—তাঁহার কথামাত্র
দোষ নাই, সে অজাতবালকের ত্রায় নির্দোষ।”

মানসিংহ হজুরমলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক,
প্রস্তুত হও।” কচুয়ারকে ইঙ্গিত করিয়া সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, “রাজকুমার! দিলী-
খরের আদেশ মতে আমি তোমাকে তোমার পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম, তুমি
স্বায়ংগতের অধিপতি হইয়া প্রজার মনোরঞ্জন করত কালযাপন কর।” হৃদ্যকুমারের
সম্মুখে উপস্থিত হইলে, হৃদ্যকুমার সজ্জমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসিংহ বলিলেন,

“জয়ন্তীরাজ ! তোমার পৈত্রিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন কর ; পরে আমার দিগের মন্ত্রী পাঠাইলে, তথায় তোমার সহিত দিল্লীখবরের কপালসন্ধি প্রস্তাব করিব।”
 সূর্য্যকুমার আলিঙ্গন করিল। পরে মানসিংহ বলিলেন, “অন্য দিল্লীখবরের আদেশমতে বর্তমানাধিপকে তাঁহার অধিকারের রাজত্ব তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া দিলাম। বাকুলার রাজ্যে মহারাজ রামচন্দ্র রায় গণ্ডকল্য পুনরভিষিক্ত হইয়াছেন ; তাঁহাকে সেই রাজ্যে দিল্লীখবরের পক্ষ হইয়া সম্ভাষণ পাঠাইব। বংশোত্তরের দক্ষিণ পূর্ব্ববিভাগ বাকুলা ভুক্ত হইল ও দক্ষিণ পশ্চিমবিভাগ রায়গড়ভুক্ত হইল। বিদ্রোহী, অস্ত্রায়ত্তাজলস্বধর গোবর্দ্ধন বধার্হ হইল। নিজ যশোহর বিজয়কৃষ্ণের তালুক হইল ! অনঙ্গপালদেব সরকার-হোঙ্গলার অধিপতি হইলেন। সনদ্বীপের রাজত্ব বরদাকঠের পিতাকে রাজা রামচন্দ্ররায় দিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, দিল্লীখবরের আদেশমতে বাকুলার অধীন হইয়া বৈদ্যনাথ সনদ্বীপের আধিপত্য পাইল। বরদাকঠ নির্দোষ, অসুমান করিতেছি, কিন্তু আপাততঃ তাহার বিষয়ে কোন অসুখতি দিলাম না ; চুই চান্নি দিবসে তৎসম্বন্ধে আমার বাহা অভিপ্রায় প্রকাশ হইবেক। অন্য সম্ভা বরখাস্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

“অংশবুবঃ ঋষ্টয়ঃ পংহুখোদয়ো বজ্রবু কৃষ্ণাঃ মরুতো রথে শুভঃ।

অগ্নি জ্বালাশো বিদ্র্যাতো গভস্তোঃ শিখাঃ সীর্ষযু বিতত্যঃ হিরণ্যায়ীঃ ॥”

“বামের লগী সামাল !” “গলুইরে কে আছ দড়ি টানিয়া বাঁধ।” “কুপকের খিলে দড়ি দাও।” “লগী ভাঙ্গিল আর নৌকা থাকে না।” সোঁ সোঁ করিয়া বরদাকঠ গভীরঘরে ডাকিতেছে, ফর ফর করিয়া নৌকার চালের খড় উড়িতেছে। মড় মড় করিয়া ছাল্লরের বাঁকাবী সব কাঁদিতেছে। কোঁ কোঁ করিয়া বাঁশে বাঁশে স্বর্ষণ। হু হু করিয়া বায়ুবেগ পাণে লাগিয়া নৌকার কুপক ঝুঁকিয়া পড়িল। সামাল সামাল শব্দ চারিদিকে ঝাটিল। নৌকা কাত হইয়া নকরবেগে ছুটিল। জলের উচ্চ উর্নি যেন ছুনি দিয়া কাটিল—যেন নব উখিত চড়ার উপর প্রকাণ্ড ফালের লাজল বায়ুবেগে চলিল। জল কল কল শব্দে কাটিতে লাগিল ; মারের মারের চটাশ চটাশ শব্দে নৌকার গোলুই আহাঙ্ক বাইতেছে ! দণ্ডবারক উঠিয়া দাঁড়াইল। আর দণ্ডে জল পায় না। নৌকা আরও ব্যস্ত হইল, কর্ণধার দণ্ড ধরিতে হুক্সারিয়া আদেশিল। দণ্ডবারকেরা পুনঃ বাসিয়া কটীদেশে বাঁকাইয়া পল্লবয় দীর্ঘ করিয়া মাথা নোগাইয়া বলে দণ্ডক্ষেপন করিল, কিন্তু নৌকার উমঙ্গস্রুতো ক্ষেপণীর অগ্রভাগও জলস্পর্শ করিল না। ভায়বেগে একটা

বায়ুর দমকে নৌকার চালের খর ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল, কেবল বাঁকান্নীর বাতাগুলি রহিল। সেই দমকে মড় মড় করিয়া কূপক ভাঙ্গিয়া গেল। পাল জলে গিয়া পড়িল। নৌকা একেবারে মুখ ফিরাইয়া তীরের দিকে ভাসিল। তীরে তুফান উঠানক! এতক্ষণ মক্ষপনই দেখা যাইতে ছল, এখন তাহাঙ্গিণের পিতা রুদ্রদেবও সহায়তা করিলেন। অশ্রুতালে সক্ষপকেই গোদন করাও বলিয়া তোমার নাম রুদ্র। আত্মগীর বাণ বাড় সহিত প্রকাণ্ড মটীর টাই জলে ভীষণ শব্দে পড়িল। বায়ুর গোগরানিতে কিছুই শোনা যায় না। রুষ্টির বাপটে কিছুই দেখা যায় না। মচাৎ করিয়া নৌকার হালসি ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ণধার ভগ্ন কর্ণধও হস্তে করিয়া জলে পড়িয়া গেল—বেগসম্মরণে অক্ষম। নৌকা ব্রুিতে লাগিল। গতিক দেধিয়া দণ্ডধরিকেরা কাঠপুস্তলিকার স্থায়—জীবহীন মাংসপিণ্ডের স্থায় নৌকায় বসিয়া রহিল। স্বর্ধ্যকুমার মল্লকচ্ছ পারিয়ঃ অনাবৃত দেহে নৌকার উপর পদবয় বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল। নন্দরাম ও মালিকরজ্ঞও মল্লকচ্ছ পরিধাত ভাগীরথীর জল অলোড়িত হইতেছে। এখন জল বলিয়া বোধ হয় না। প্রতি ঢেউ আঘাতে নৌকার তল যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। নৌকার প্রতি তক্তা-ফগক উর্দ্ধিবেগে ভর্জ্যরত, প্রতি কঁটা—শিখা, রজ্জ্ব ছিন্ন ভিন্ন। বায়ুর গর্জ্জন জলের কলরব, নৌকার অঙ্গানকরের মচ মগনি—। বায়ুবেগে উর্দ্ধদেশ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সপল্লব উড়িয়া যাইতেছে ও জলে পড়িলে প্রায় চতুর্দিক উৎপ্লুত-জলকণায় আবৃত হইতেছে। স্বর্ধ্যকুমার বলিলেন, “এত বড় ভীষণ দুর্ঘোপ! কর্ণধার কোথায়?”

নন্দরাম বলিল, “কর্ণধার কোথায় দেখিতে পাই না। কিন্তু নৌকার হাল নাই, ভাঙ্গিয়া গেছে, তাই নৌকায় এত ধাক্কা ও নৌকা এত ঘুরিতেছে।”

স্বর্ধ্যকুমার “কূপকও উড়িয়া গেছে আর ক্ষণকাল এ প্রকার থাকিলে নৌকা চূর্ণীকৃত—” বলিতে বলিতে নৌকাটি তীরের কাছাড়ে আছাড় খাইল, অমনি টুকরা টুকরা হইয়া গেল। নৌকাস্থ নাথক কি চড়নবার কাহাকেই দেখা গেল না। বাঁড়র বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন নদী আর জলের প্রবাহ নহে—কেবল শুভ্রর্ণ তুগরাশির নৃত্য। এদিকে তীরে আত্মগীর ও কাছার এত ভাঙ্গিতে লাগিল ও এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূখণ্ড—সবুজ, সবংশ, সতরু, সগৃহ, সবার জলে নিপাত্ত হইতে লাগিল ও চল এত উৎখলি যে, তীরস্থ গ্রামের উপর দিয়া বেগে উল্লম্ব দৌড়ল। কায়সারের মটকাও চাল উর্দ্ধতে ভানাইয়া লইয়া গেল। জলের পরমাণুগুণে পরস্পরের বেগ বর্ধনে যেন পবমানাঘি উত্তেজিত হইল, কেন না জগৎব্যাপ্ত জলকণা অগ্নিস্কুলঙ্গের স্থায় ছুটিল। ঈর্ষ্যমুগ্ধিত তক্তকণাইয়া কি অলোড়িত হয়—জলের আলোড়ন একান্ত অপূর্ণ প্রতিমা! বৃহৎ উর্দ্ধগুনি

কেহ গড়াইয়া, কেহ উঠাইয়া, কেহ আঘাত প্রাপ্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শুভ্রীকৃত হইয়াছে। পবনের বেগে পৃথিবী ও আকাশ জী'শূণ্য! অদূরে একটা আবর্তমান জলস্তম্ভ—যেন প্রাক্তনকালের অলৌকিক ছায়, যেন যাতুণানের ছায়, যেন সম্ভব বিরাট রজ্জুর ছায়, নদীর জলকে ভীমাকর্ষণে শূণ্যমার্গে তুলিতেছে; তাহার শোষণবেগে মৎস্তাদি ও ভাদমান নৌকাখণ্ড উৎক্ষেপিত হইতেছে। সংসার রক্ষা হয় না পৃথ্বী বায়ুবেগধারণে অক্ষম। যেন ভূমিকম্প হইতেছে। শব্দে গর্ভগির গর্ভপাত হয়। বেগে মৎস্যরাই দূরী উন্মূলীত হয়! পবনবরুণবিপ্লব কি উদ্যানক! তরল পদার্থ জল কাঠিগ্রে নৌগলোহ হইতে দৃঢ়, স্থিতিস্থাপকে বায়ু হইতে হুম্ম। তরলতম পবন সঞ্চালনে সুখংসবা—কিন্তু যখন প্রলয় প্রবাহে বহে তখন গিরিশিখর ভূম পাকিত হয়, তখন প্রবীণ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেন মূলকের ছায় উৎপাটিত হয়, আর তাহার সহিত এত মুগ্ধিকা সমুখিত হয় যে, মাসংবিধি বিশজনে পরিভ্রম করিল, এত মুগ্ধিকা উঠাইয়া গর্ভ করিতে পারে না। বায়ু বহিতেছে, পবন যেন উন্নত, জ্ঞান-রহিত। পূর্বের বায়ু পশ্চিমে ও উত্তরের বায়ু দক্ষিণে নৌড়িতছে, আবার উত্তরের বায়ু অগোভানে আহত হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড, সপল্লব, সমাধ সমুদগনিচয় সমুদ্রাশি ভিত্তিরীক্ষ দুই তিনবার আবর্তনায়ুত প্রালাড়িত হইয়া উৎক্ষেপ শূণ্য-মার্গে উঠিল। একি ইন্দ্রজাল! স্বস্থান হইতে হুইরশি দূরে অধঃশাখ উদ্ধমূল হইয়া পড়িল, আবার পবন পরক্ষণেই তাহাকে মৎস্যী করিল। ইহাতেও নিস্তার নাই। কতকগুলি শাখা যেন ছি'ড়িয়া দূরে উড়িয়া পড়িল। বৃক্ষ ক'য়ুধ ঘষাসাধ্য বলে শাখাচয় হস্তচতুষ্টয় ও লঙ্গুলবটনে ধরিয়াছিল, কিন্তু তখন বলিয়া পবন তাহাদিগকে অঙ্গরূপ হইতে ছিন্া লইল। তাহার শাখালী প্রক্ষুটিত, ফল-মধ্যস্থ তুলরাশির ছায় শূণ্য উড়িল ও শূণ্যে উঠিল ও যে যেখানে পড়িল সেইখানেই পশুভয় ত্যাগ করিয়া গর্জ্জয় লাভ করিল। কেহবা অপর বৃক্ষের স্বন্ধে আহত হইয়া ছিন্নপ্রব, ছিন্নবাহ বা ছিন্নবটী হইয়া পরলোক গমন করিল। কপিচয়ের কাতরধ্বনতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কিন্তু সে ধ্বনি কর্ণক, কেননা এখন আর কিছুই শুনা যায় না। প্রথম বেগেই বায়ুনাশি পক্ষীগুলি আহত হইয়াছে, এখন মকট বানরও পবনসেবায় গত। গাভীরবীজ জল, আকাশের বাষ্প, প্রলম বায়ুবেগে একীকৃত হইয়াছে, কি ভীমবাত্যা! প্রকৃতি পরিবর্তিত আলোড়িত ব্যথিত ও বিকৃত। বিরাটমুক্তির উলয়! বৃক্ষ ভস্মের শব্দ, বায়ুর গর্জন, জলের বলঃব, কিছুই শুনা যায় না। আকাশ অনির্বচনীয় গোঁগুয়ানিতে পূর্ণ। মেঘের অ'কার নাই। দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর। বায়ু বেগ অতীব তীক্ষ্ণ কিন্তু পৃথ্বীতে আলোক নাই—অন্ধকারও নহে; দিম্মগুল অর্ধনীর জ্যোতিতে পূর্ণ—যেন স্বয়ং গুল দাবানল, যেন সমুদ্রে বড়-

বালক। সূৰ্য্যবায়ু জনক ব্যাপিয়াছে। অবিভ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে বটে, কিন্তু ভয়ানক বাতাস বৃষ্টির ধারা ভঙ্গ হইয়া বণাকারে চাষিগণকে ছুটিতেছে। কত ঘরের চাল বায়ুর বেগে জলশায়ী হইয়া আবার স্রোতে ভাসিতেছে, তাহার উপর বংশবিশিষ্ট অনাথ বালক, চক্ষে অশ্রু নাই মুখে শব্দ নাই, স্পন্দরহিত হইয়া মটকার বাতা অমাহুযীদাঢ্য ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ক্রমে বায়ু লক্ষণবাহী হইল। ক্রমে বায়ুবেগ হ্রাস হইল। ক্রমে দমকে দমকে দীর্ঘশ্বাসের ছায় বহিল। ক্রমে বৃষ্টি প্রকৃতিস্থ হইয়া সুঘলধারে নিপতিত হইতে লাগিল। বায়ুর বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল বটে, কিন্তু ভাগীরথীর জলের বেগ এখনও কিঞ্চিৎশত্রু শাম্য হইল না, বরঞ্চ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেলার জ্যোত কিছু লুপসাগর পর্য্যন্ত অনুভব করা যায় না, কিন্তু অন্য ভাগীরথীর জল এত ক্ষীণ হইয়াছে ও উত্তরবাহিনী স্রোত উর্ধ্ব ও তরঙ্গসহ এত বেগে ছুটিতেছে যে অনুমান হয়, লবণাক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কূল আর তাহার জলরাশি ধারণে অক্ষম—যেন বরুণ দেব পাভাল-লেশ স্ফাটিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। স্রোতে কতগত গ্রামোপকর ভাসিয়া চলিয়াছে—তাহার প্রশস্ত ভাগীরথী আবৃত।

এদিকে সূর্য্যকুমার ভয়তরির কাঠফলক আশ্রয় করিয়া নির্জীবনবাকারে ভাসিতেছে ও প্রতিহিংস্রালে ফলকসহিত তাহার সর্কাস কস্পিত হইতেছে। জলের তীক্ষ্ণ টান, প্রতিবার অনুমান হইতেছে যেন ফলক হইতে বর শিখিল হইল ও সূর্য্যকুমার জলে ডুবিল। অদূরে নন্দরাম অপর একটি কাঠফলক আশ্রয় করিয়া বলাধিপ্য সত্তরপ করিয়া সূর্য্যকুমারের দিকে ঝাইতেছে। জলের ওরফে একবার নন্দরাম অভিভূত হইয়া মগ্ন হইতেছে, আবার তাহারই পরে বেগে বক্ষঃলেশ পর্য্যন্ত জগাইয়া উঠিতেছে। ক্রমে নন্দরাম সূর্য্যকুমারের পৃষ্ঠদেশে হাত লাগাইল। সূর্য্যকুমার কিন্তু স্পন্দরহিত। নন্দরাম ক্রমে সূর্য্যকুমারের দামন বামহস্তে ধরিয়া সূর্য্যকুমারের শরীর জগাইয়া সত্তরপ করিতে লাগিল। দীর্ঘপ্রমত্তান্ত নন্দরাম ক্রমে বলহীন হইলে সূর্য্যকুমারকে লইয়া মগ্ন হইল। আবার অনৈসর্গিক আশ্রাসে জলের উপর উঠিয়া বালক, “হায়! আর—আবার অসাম্য! আমি বলহীন হইয়াছি।” আবার মাথা নাড়া দিয়া ভাসিয়া বালক, “জয়ন্তীরাজ, কাঠফলক ছাড়িও না—আমি চলিলাম,” নন্দরাম এই কথা মাত্র হইতে না-হইতে ডুবিয়া গেল; তাহার হস্তের কাঠফলক কণেক বিলম্বে দূরে ভাসিয়া উঠিল ও জলের বেগে তীরস্থ বৃক্ষমূলে ঠেকিল; অব্যবহিত পরেই নন্দরামের মস্তক জলের উপর দেখা গেল। তীর হইতে মালিকরাজ একটি ডেলের কুপী আনাইয়া জলে অঙ্গ অঙ্গ করিয়া দিকিলে ভাগীরথীর জল ক্রমে সিক্ত হইল। নন্দরাম ও সূর্য্যকুমার জলে হারু ডুবু ঝাইতেছে দেখিয়া শুভে কটীদেশে

ভাল করিয়া বস্ত্র জড়াইল ও একটু উত্তর ধারে বাইরা অপন্ন হুইজনকে সঙ্গে লইয়া জলে নামিল । ফলপেকে স্বর্ধ্যকুমারের ও নন্দরামের নিষ্পদ শরীর তীরে উঠান হইলে মালিক-রাজ স্বীয় কটীদেশে যে রজ্জু বাঁধিয়াছিল তাহা খুলিয়া একত্র করিতে করিতে বলিল, “নাথিক ভাই, তুমি শীঘ্র করিয়া দেখ যদি গ্রামের নিকট কোন পাকাবাড়ী থাকে, তথায় ইহাদ্বিগকে লইয়া বাইবার বন্দোবস্ত কর । জীবন থাকেত আমি ইহাদ্বিগের শুভ্রাণা করি ।” নাথিক চলিয়া গেলে অপন্ন নাথিককে বলিল, “দেখ তুমি নন্দরামের হস্তপদাদি ভাল করিয়া স্বেদন করিয়া দাও । ইহার! এখনও জীবিত আছে ; একটু অগ্নি পাইলে জল হইত — ।” দ্বিতীয় নাথিকটি নন্দরামের করতল স্বেদন করিতে লাগিল । এদিকে মালিক স্বয়ং স্বর্ধ্যকুমারের সর্কাস করতল দিয়া বেগে অথচ কোমল হস্তে স্বেদন করিতে লাগিল । কিছুক্ষণ স্বেদনের পর স্বর্ধ্যকুমারের হস্তপদাদি সজ্জিত হইল ও পরক্ষণেই বিস্তৃত হইয়া এমত গাত্রভঙ্গ হইল যে, স্বর্ধ্যকুমার চক্ষু চাহিয়া একটি কষ্টহৃৎক অক্ষুট শল্যমাত্র করিল । তাহারই পর “সরমা কোথায়” বলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল । ক্রমে চেতনা হওয়ায় মনে আসে মালিকরাজের উপর তর দিয়া বসিল ।

মালিকরাজ বলিল, “ভাই, তোমার এখনও কি সম্ভব ভার বোধ করিতেছে ?”

নন্দরাম স্তম্ভিত করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, “জয়ন্তীরাজ, কেমন আছেন ?”

মালিকরাজ বলিল, “স্বর্ধ্যকুমারকে এক্ষণে কিঞ্চিৎ আহার দিতে পারিলে ভাল হইত—স্বর্ধ্যকুমার অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে ।”

স্বর্ধ্যকুমার মালিকরাজের ক্রোড়ে গুইল । নন্দরাম বলিল, “মহাশয়, আপনি কি প্রকারে রক্ষা পাইলেন ?”

মালিকরাজ ক্রোড়স্থ স্বর্ধ্যকুমারের উরঃদেশ স্বেদন করিতে করিতে বলিল, “নন্দরাম, আমি দৈববলে রক্ষা পাইয়াছি । নৌকা আছাড় খাইবামাত্র আমি একটা দীর্ঘ তক্তা লইয়া জলে পড়িলাম, আমার সঙ্গে হুইজন নাথিকও লাফাইয়া সেই তক্তা আশ্রয় লইল ! তিনজনে ধবাসাধ্যবলে ক্রমে কূলে আসিয়া উঠিয়াছি । কি ভয়ংকর টান ও বিবদ ব্যভ !”

নন্দরাম বলিল, “জয়ন্তীরাজ প্রথমে দিক্ সম্ভরণ করিতেছিলেন, ক্রমে জলেন্দ্র ভ্রোতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন । আমিও একক, ভ্রাত্ত হইয়াছিলাম, তাঁহাকে সাহায্য করিতে যাঁইয়া নির্জীবের মত হইলাম । আমার হস্তপদে খিল লাগিয়াছিল ।”

স্বর্ধ্যকুমার উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, “নন্দরাম, তোমার কৃত্তের পরিশোধ আমি জন্মাবচ্ছিন্নে করিতে পারিব না ।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, মালিকরাজের সাহায্যে আপনি জীবিত হইয়াছেন ।”

স্বর্ধ্যকুমার কিরিয়া মালিকরাজের গলদেশ ধরিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি প্রকৃত স্বর্ধ্য

এ বাত্যাতে আমার জন্ম জলে লক্ষ্য দিয়া পড়া তোমার উচিত হয় নাই । তোমার সহিত আমার এত নিম্ন সঙ্গত্ব যে, তোমাকে নমস্কারাদি করিলে আমার আত্মাভিমান হয়—তোমাকে আমি জন্মের সখা বলিয়া জানি । এখন নিকটে কোন গ্রাম আছে বল—আমার অভ্যস্ত ক্ষুধা হইতেছে ”

মালিকরাজ বলিল, “এস্থল নবদ্বীপের নিকট হইবেক । যাহা হউক, নাবিক কিরিয়া আসিলে সমস্ত অবগত হইব ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “মহারাজ মানসিংহ কোথায় ছাউনি করিয়াছেন ?”

মালিকরাজ বলিল, “নিকটের কোন মাঠে তাঁহার ছাউনি থাকিবেক, কেন না নদীর স্রোতে বড় একটা জলচক্রা ভাসিয়া যাইতেছিল ”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “ভাই, তাঁহার ছাউনীতে যদি এ বাত্যা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরম'র বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকিবেক । আহা ! পিতৃপরাজয়ে সে নবীন কণ্ঠে উদ্বিগ্না, তাহার আবার যদি কার্যিক কষ্ট হইয়া থাকে—। মহারাজ মানসিংহের মন অভ্যস্ত কঠিন—তিনি কেমন করিয়া ষাণ্ডশভে মিত্র চূড়ামণিকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেন ! আহা ! সরমা সেই অবধি যেন শুষ্ক লতার শ্রাব প্রিয়মাণা—শূন্যহৃৎয়ের শ্রাব সঙ্গুতি হইয়াছেন । তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেট ক্ষুদ্র মনুষ্যকার লৌহপিঞ্জরের নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন । আহা ! এখন আর চক্ষে মল নাই—তক্ষ টংস শুষ্ক হইয়াছে, তাহিলে আমার জন্ম বিদীর্ণ হয় । মালিকরাজ, এ দুর্বলতার মূল আমি । আমি হইতে যজ্ঞের অধোগতি । আমি নরাধম । আমাকে কালশাপের শ্রাব দ্রুত দিয়া পালন করিয়াছিলেন—। হা পাপিষ্ঠ মন ! তুমি স্বীয় প্রতাপালকের সমুচিত সংকার করিলে ! মালিকরাজ ! তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর,—এ নরাধমের সঙ্গে থাকিয়া তোমার আত্মাকে কলুষিত করিও না ।”

মালিকরাজ বলিল, “স্বর্ধাকুমার, তুমি অকারণ আত্মাকে নিন্দা করিতেছ । ইহাতে তোমায় কোনই দোষ দেখা যায় না ।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “আমার দোষ নহেত কাহার দোষ ? মহারাজ প্রতাপাদিত্য শৈশবাবস্থাবধি আমাকে প্র পালন করিলেন ; যখন তাঁহার বিপদ উপস্থিত—সেই সময় আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলাম, তাঁহার বিপদদলভূত হইলাম, আবার তাঁহার প্রতিকূলে সেনানিবোধন করিলাম ! হায় ! আমি কি প্রকারে সরমার সম্মুখীন হইব ? আমি তাহার পিতৃবানী—। আমার স্বীয় কৃতজ্ঞতার জন্ত যদি না হয়, প্রাণপ্রিয় সরমার পিতা বলিয়া স্মরণ করা উচিত ছিল !”

মালিকরাজ বলিল, “গত বৎসরের শোচনীয় কোন কল দেখি না । এখন বর্তমানের চিন্তা কর । মহারাজের স্বকাঁবারে সীত্র যাওয়া উচিত ; বাত্যার পর সেনামণ্ডলীতে

বিশেষ লুণ্ঠ উপস্থিত, সন্দেহ নাই। ঐ নাবিক আদিতেছে, অবশ্য কোন একটা আশ্রয় স্থির করিয়া থাকিবে।”

নাবিক আদিয়া বলিল, “মহাশয়, নিচুটে নবরৌশ গ্রাম, কিন্তু যেহেতু গ্রামের দুর্দশা দেখিয়া আশিলাম, তাহায় আশ্রয় পাওয়া একান্ত দুর্লভ। গ্রামের হাটাগাঝারে কিছুই নাই। জটনৈক গোয়ালার পাকবাড়া আছে, কিন্তু তাহায় এত গোটা সমাগা হইয়াছে যে, আমাদিগের সে স্থানে প্রবেশ করা কঠিন।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “আমাদিগের চোখ ও অস্থান করণের প্রয়োজন নাই। আমার লক্ষে কিঞ্চিৎ অর্থ আছে। যদি দুই দিনটা টাট্টিয়ে ডা পাওয়া যায়, তাহা হইলে লীজ করিয়া ছাউনীতে পৌছান যায়। চল দেখি কি উপায় হয়।”

নন্দরাম বলিল, “জয়ন্তীরাজ! আপনি যে দুর্বল—এখন আপনার স্থানান্তরে যাওয়া উচিত নহে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন। ততক্ষণে বন্ডার জগৎ কিঞ্চিৎ কমিয়া যাইবেক। তখন চেষ্টাচরিত্রের সময় হইবেক।”

নাবিক বলিল, “মহাশয় এখন বোড়া লইয়া কি করিবেন? বোড়া চলিবার পথ নাই। সমস্ত দেশ জলে প্রাবিত ও এত গাছ, বন ও বঁশবাড় উপড়ইয়া পড়িয়াছে যে, রাজপথও দুর্গম। গমনাগমনের সুবিধার মধ্যে নৌকা—চারি দিকে ডিক্কা ডোঙ্গা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চলিতেছে। গ্রামের মধ্যে এত নৌকা আছে আমার অহুমান ছিল না। কোন বন্দরের ঘাটে এত নৌকা এককালে দেখা যায় না। কতদিক হইতে কতপ্রকার ছোট ছোট নৌকা আদিয়া বেড়াইতেছে।”

স্বর্ধাকুমার বলিল “মহারাজ মানসিংহের ছাউনীর সমাগার কিছু পাইয়াছে?”

নাবিক বলিল, “মহাশয়, অনেক ডোঙ্গা সেই দিকেই যাইতেছে। ভবানন্দ মজুমদার নৌকা করিয়া ছাউনীর লগ্ন রসদ পাঠাইতেছেন। শাপুর বাটীর ব্রতপ্রতিষ্ঠার সম্ভার এখন দিল্লীর বাদসাহের ফৌজ রক্ষায় নিযুক্ত হইল।”

স্বর্ধাকুমার বলিল, “মালিক, চল একখানা নৌকা লইয়া ছাউনীতে পৌছিবার উপায় দেখা যাক।”

মালিকরাজ বলিল, “চল, কিন্তু আমাদিগের অপর নাবিক কোথা গেল? করজান বাঁচিল?”

নাবিক বলিল, “মহাশয়, আমরা সকলেই আপনার আশীর্ব্বাদে রক্ষা পাইয়াছি। অগ্নয়ের লহিত আমার এখন পথে সাক্ষাৎ হইল। তাহার একখানা ডিক্কা পাইয়াছে, সেই ডিক্কা করিয়া মাল বোঝাই করিয়া ছাউনি যাইবেক, এইমত চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছি, চলুন তাহার নিকটেই আছে।”

নন্দরাম বলিল, “ভাল হইল, চলুন তাহাদিগের সন্ধান করি।”

স্বর্ধকুমার এই সমাচারে সন্তুষ্ট হইয়া গাজোখান করিলে, মালিকরাজ ও নন্দরায় তাহার উক্ত পাপের ঝাঙ্কিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়া চলিল। ক্রমে কিছুদূরে ডিকি দেখিয়া তাহার নাবিককে ডাকিলে, সে ডিকি নিকটে আসিল। স্বর্ধকুমার ও মালিকরাজকে দেখিয়া ডিকির কর্ণধার ভিজ হইতে নামিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “মহাশয়, আপনাদিগের আলীকর্ষাদে আমরা সকলেই রক্ষা পাইয়াছি। আপনাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এখন এই ডি'গতে আসুন। আমরা এক ভাড়া পাইয়াছি। কিঞ্চিৎ সন্তায় নিকটের ছাউনীতে পৌঁছাইয়া দিব, আপনারাও ত ছাউনীতে বাইবেন ?”

মালিকরাজ বলিল, “তাল হইয়াছে, চল আমরাও বাই।”

নন্দরায় ও মালিকরাজের সাহায্যে স্বর্ধকুমার ডিকির উপর উঠিলে ডিকি ছাড়িয়া গিল। কিছুদূর বাইয়া প্রায়ের মধ্যস্থ উচ্চতর ভাগে একটা প্রকাণ্ড পাকাবাড়ীর ব'র দিয়া তাহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, প্রাঙ্গণেই অপর্যাপ্ত ডিকির নাবিকের সহিত কথা-বার্তার পর, পার্শ্বস্থ হইতে ডিকিতে আহার্যোপযোগী জব্য কতকগুলি বোঝাই লইয়া লাবিক দায় দিয়া বাহিরে আলিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। ক্রমে পাছের ডালের নীচে দিয়া কাহার বাটীর ছাঁচ দিয়া কাহার উঠান দিয়া, কোথাও বাশঝাক ঘুরিয়া ধ্বলি মারিতে মারিতে চলিতে লাগিল। কোথাও বা পুকুরিণীর স্তূভ পাহাড়ের শিখর মাত্র আলিয়া আছে, দুই চারিটি যে পাহা আছে, তাহার একটি মাত্রও পাতা নাই। তাহার দায় দিয়া বাইতে বাইতে মোহনায় নিকট দিয়া পুকুরিণীতে প্রবেশ করিল। সেখানে আর লগী ভলায় না, ডিকি ক্রমে ব'ঠিয়া বাহিয়া চলিল। কোথাও চলিতে চলিতে সিদ্ধক ভাসিতেছে দেখিয়া নাবিকেরা ব্যস্ত হইয়া তাহা ধরিয়া, টানটানি করিয়া সৌকার তুলিয়া লইল। এদিকে একটা বস্তুর পটুনি ভাসিয়া বাইতেছে, ওখানে মৃত গরু ভাসিয়া বাইতেছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া একটা বালক ভাসিতেছে। স্বর্ধকুমার দেখিয়া বলিল, “মালিকরাজ, ঐ বালকটিকে তুলিয়া লও।” মালিকরাজ ও নন্দরায় একযোগে নাবিককে বলিল, সে ডিকি কিরাইয়া বালকটিকে উঠাইয়া লইল। বালকটি প্রায় চারি বৎসরের—প্রথমে নাবিকের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রমে ক্রমে ফুলকামুখে ভিজিহ্ন সকলের মুখের দিকে চাহিল। পরে স্বর্ধকুমারের মুখদিকে বারবার চাহিলে স্বর্ধকুমার বাহু প্রসারিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। বালকটি স্বর্ধকুমারের নিকট বাইয়া বেশ স্থির হইল। পরে মালিকরাজ বালকের দিকে হস্ত প্রসারিলে, বালকটি মুখ কিরাইয়া স্বর্ধকুমারের গলদেশে জড়াইয়া ধরিল। স্বর্ধকুমার বালকটিকে লইয়া বন্ধ-হুলে রাখিল ও তাহার লগাটদেশ চুম্বন করিয়া বলিল, “কুমার আমিও তোমার মত স্নায়প্রিয় হইয়া পরার পুর হইয়াছিলাম। তুমি আমার সন্তান—আমি তোমাকে বহু প্রতীপালন করিব।”

মালিকরাজ বলিল, “স্বর্গ্যকুমার, শিশুটি অতি মূল্যবান। দর্শনে যেমত সুন্দর লক্ষণও তেমন শুভকর।”

নন্দরাজ বলিল, “অরস্তারাজ, এ বালকটি দেখিয়া আমার মায় জন্মিতেছে।”

মালিকরাজ বলিল, “এমন কমলীয় শিশু দেখিয়া কোন্ কঠিন হৃদয়ে মন না অধীভূত হয়? আহা! ইহার মাতা পিতা জীবিত থাকে ও ইহার অভাবে কতই শোক পাইতেছে! অনুমান করি, এ শিশু নিকটের গ্রাম হইতে আসিয়া থাকিবেক। কিন্তু গাভীর আশ্রয় কেমন করিয়া পাইল?”

নাথিক বলিল, “মহাশয়, দেখেন নাই? বালকটিকে গাভীর পুটে বাঁধিয়া দিয়াছিল। অনুমান করি, মহা বড় ও অলপাবনে গৃহ নষ্ট হওয়ার, ইহার আশ্রয়ের আশ্রয়রূপে অক্ষয় হইয়া ধর্মের হস্তে বালকটি সমর্পণ করিয়াছিল।”

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়,—ঐ ছাউনীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আলা! উক্ৰ হৃদয়ের চিহ্নও নাই। কত হাতী ঘোড়া, উট, বলল, গাধা তালিয়া বাইতেছে। আমরা এত ব্যয় হইল কিন্তু আমি এমত সর্লক্ষ্যশীল বড় কখন দেখি নাই। মহাশয়, এ ছাউনীতে একটিও তাঁবু নাই। এখানে দেখিতে পাই, বড় অত্যন্ত ভয়ানক বেগে বাহিয়াছিল।”

স্বর্গ্যকুমার বালকটি ফোড়ে লইয়া নৌকা হইতে লক্ষ দূর ভূমে না মিল। মালিকরাজ ও নন্দরাজ তহার পশ্চাৎ গমন করিল। ইহার ছিবড়ির উক্ৰ হৃদয়ের দিয়া ক্রমে বাইতে বাইতে মহারাজ মালিকরাজের শিবির অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু প্রায় সকল পক্ষের ছিবড়ির ও ভূমদায় হওয়ার, অহুসমান পাইতেছেন না। সন্ধ্যাবয়ের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্র, বিবর্ণবস্ত্র, কর্দমাচ্ছন্ন পরিয়া সেনাগণ ব্যস্তে নৌদানোড়ি করিতেছে। অনেক সৈনিক স্বর্গ্যকুমারকে দেখিয়া বলিল, “মহাশয়, কোথায় ছিলেন? আমাদের সর্ব সনষ্ট হইয়াছে। এখন অহার ও বস্ত্রভাবে ব্যাভ্যাহতাবশিষ্ট ভট-মণ্ডগীর রক্ষা পওয়া ভার। মহারাজ মালিকরাজ নিভৃত উদ্বিগ্ন হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; মহাশয়কে দেখিলে নষ্ট হইবেন। ভয়ানক মজুমদার অন্য বাকালে অনেক রণে যোগাইয়াছেন।”

স্বর্গ্যকুমার বলিল, “মহারাজ এখন কোথায়? কচুরায় কি এখানে আছেন?”

সৈনিক বলিল, “কচুরায় ঐ ভয়ানক উঠাইবার ভেড়া করিতেছেন। মহারাজ মালিকরাজ প্রতাপাদিত্যের দিকে দিয়াছেন। মহাশয়, এ বালকটি কাহার? আহা! এ স্বর্গ্যকুমার শিশু এ বড় কেমনে রক্ষা পাইল?”

স্বর্গ্যকুমার বলিল, “এটি জলে একটি গাভী আশ্রয় করিয়া তালিয়া বাইতেছিল; আমরা ইহাকে তুলিয়া লইয়াছি।”

স্বর্ধাকুমার ক্রমে ভগ্ন কণকের নিকটস্থ হইলে, কচুরার দূর হইতে স্বর্ধাকুমারকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহু প্রসারিতা বলিলেন, “ভাই, তুমি কোথা হইতে আসিলে? ঝড়ের সময় কোথায় ছিলে? রায়গড়ের সমাচার কি? আমরা এখানে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছি। আহা! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আহা! আমি সরমার কাতরোক্তি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না! মহারাজ পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া যে শিবিরে ছিলেন, প্রথম ঝড়েই সে শিবিরের কাণ্ডপট উড়িয়া গেল। পিতৃপ্রাণা সরমা সেই পিঞ্জরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথমে স্বীয় বয় দিয়া আশ্রয়ণ করেন, পরে বায়ুবেগ বৃদ্ধি হইলে আশ্রয়রীম দ্বারা প্রতাপাদিত্যকে রক্ষা করেন। আহা! নীর্ণা সরমা—প্রতাপাদিত্যের সেবার এত উৎসাহ ও প্রীতি যে, অপর কাহাকেও তাঁহার কণামাত্র সেবা করিতে দেন না। সরমার অপূর্ণদৃষ্ট পিতৃভক্তি, অনৌকিক শ্রদ্ধা, ও অসামান্য অধ্যবসায় দেখিয়া ছাটনীর তটমণ্ডলীতে তাহার জন্ত প্রতাপাদিত্যের প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে। সেই দুর্ঘ্যোগের সময় মহারাজ মানসিংহের অনুমতি লইয়া প্রতাপাদিত্যের পিঞ্জর মানসিংহের কদকের মধ্যে আনা হইয়াছিল। কিন্তু হায়! প্রতাপাদিত্যের কি দুর্জয় অহঙ্কার!—মনে করিলে হৃৎকম্প হয়! সেই দুর্ঘ্যোগের সময় বধন প্রকৃতি বিকৃত, বধন সংসারে শত্রুমিত্র ভাব ছিল না, যখন আশ্রয়ক্ষা ও বিন্যাস সাধারণ বিপদ হইতে মুক্তির চিন্তা সকলের মনে বলবতী ছিল, সেই প্রলয়কালে মহারাজ প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “আমাকে যবনসম্বন্ধী হিন্দু বুজাঙ্গার অপমানিতা ব্রহ্মসেবকের সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত কর। ঐ পাম’রর দর্শন পবনবল্লভের কোণ হইতে আমাকে লজ্জাশূন্য করুণে।” তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে মানসিংহের শিবির হইতে স্থানান্তরিত করা যায়। পরে তাঁহাকে আমার ভগ্ন শিবিরের মধ্যে লইয়া গেলে, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কচুরায় নিকটে আইস। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি; কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই যে, বঙ্গের এই অবস্থা ষড়্ভিবেক। আমি তোমাকে তোমার পৈতৃকরাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে, তোমার প্রতি ঘেব করি নাই। আমার ঘেবের কারণ কেহই জানে না ও বুঝিতে পারে নাই। আমার রাজ্যভাগ ছিল না—স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য—বঙ্গ স্বাধীনতা সংস্থাপন। আমি দেখিলাম যে, বঙ্গ বহুতর ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকিলে কখনই উন্নত হইতে পারিবেক না। আমি দেখিলাম, বঙ্গোদ্ধারের একমাত্র উপায় একাধিপত্য। আমার ইচ্ছা ছিল যে, বঙ্গ স্বাভ্যন্তরীণ সংস্থাপন করি। কিন্তু বঙ্গ রাজমণ্ডলীতে দেখিলাম যে, পরস্পরের প্রতি এত ঘেব ও পরস্পরের এত হিংসা যে একাত্ম্য লেশ নাই। একতান না হইলে কোন কর্ণই সিদ্ধ হয় না। বঙ্গের নীচ

প্রবৃত্তিহেতু রাজসভা হইতে কিছুকালের জন্ত ঐকমত্য দূরীকৃত হইয়াছে। এমত স্থলে যখন একতান করিতে অসমর্থ বোধ করিলাম, তখন প্রীতির শৃঙ্খল দূর করিলাম, তখন নও ও শ'সনের আশ্রয় লইতে হইল। অগত্যা হীমবুদ্ধি, ক্ষুদ্রচেতা, আত্মীয়বেদী, বন্ধুহিংসক, স্বার্থপর, নীচপ্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতর বাঙ্গালোদিগের পদাবনত করাই প্রায় জ্ঞান করিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, দাদশ ভৌমিককে পরাজয় করিয়া ভাষাদিগের রাজ্যে স্বীয় নায়কপদপূর্ব্বক প্রজাবর্গের অবস্থা উন্নত করিয়া ভাষাদিগের প্রীতিভাজন হইলে ভৌমিকের রাজকোষের সাহায্যে ও প্রজার বলে, যখন ও দিল্লীর যোগলকে বঙ্গ হইতে দূরীকরণ করিব। রাজস্থানের রাণা ও মহারাজদিগের সহিত আমার এ সম্বন্ধে বৈধি আলোচন হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগেরও এ সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ হইয়াছিল। যদি ক্রীষ্ণদেবরায় যখনশালক অপমানবা স্বীয় ভ্রাতার সহিত আপনার আত্মাকে না বিক্রয় করিত, যদি বর্দ্ধমানাধিপ ও বাকুলার মুচ জামাতা কাপুরুষ না হইত, তাহা, যদি তুমি সামান্য পৈত্রিক তালকের লোভ সম্বরণ করিতে, তাহা হইলে দেখিতে যে, একান্ত দিল্লীর মিনারে আমার মধ্যাহ্নবর্ষাপাতকা উড়ন্ত হউক বা না হউক, রাজমহলের পূর্ব্বের ধর্ম্মবেদী গাভীবাড়ী স্নেহের অধিকার থাকিত না! বাহা হউক, এখন কালের গতিতে, বঙ্গের পোড়! অতীত সকলেই স্বার্থচেষ্টায় অন্ধ হইলে, আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিলে, আমার বৈপরিত্যে প্রীতি পাইলে, কিন্তু বুঝিলে না যে, প্রতাপাদিত্যের অন্তঃকরণে অস্তমিত হইবে! আমি বঙ্গের জন্য কত ভানই করিয়াছি ও কত অকর্ম্মও স্বীকার করিয়াছি। আগামীকাল লোকেরা সমস্ত অবগত না হইয়া আমাকে কলির অবতাররূপে জানিবে। বাহা হউক, আমি এত উচ্চ ও এত উন্নত-ভিত্তি, যে, নীচ কীর্ণবুদ্ধির তিরস্কার ও পুংস্কার কিছুই গ্রাহ্য করি না। তাই, তুমি এখন রাগগড়ের শাদন স্বহস্তে পাইয়াছ; একবার মন খুলিয়া অকপটে আমাকে বল দেখি, তোমার অতীত শত্রু প্রতাপাদিত্যের শাসন ভাল, না কদাচারী বিজাতীয় মুসলমানের শাসন ভাল? যদি আমার শাসন তোমার মনোনিবেশ না হইল, তবে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে না কেন? তুমি রাজপুত্র হইয়া নিজে দৃষ্ট প্রতাপাদিত্যের নও না করিয়া বিপরীতধর্ম্মের পদনত হইলে, তাহার আধিপত্য স্বীকার করিলে, তুমি তালকের জন্ত আপনার মাথা কাটিইলে, আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিলে, দাসত্বশৃঙ্খল গলগলে লাগাইলে! তোমরা সুখশ্রিয় কাপুরুষ! আমি ত এখন মৃতকল্প হইয়াছি—আমার জীবনের আশা নাই ও ইচ্ছাও নাই, তবে অগতির দেশে প্রাণত্যাগ করিব না। আমার ইচ্ছা, বারানসীধামে পৌঁছিলে, আমাকে সপ্তাহ বাস করিতে দাও; তাহার মধ্যেই আমার জীব এ পিঞ্জর ত্যাগ করিবে, আমার শরীর এই ধানেই থাকিবেক। এখন আমার সাংসারিক কোন মায়াই নাই। তোমরা এখন কিছুকাল দাসত্ব করিবে,

সন্দেহ নাই। কিন্তু কিরিকীদিগের উপর দৃষ্টি রাখিও। যদি বজ্রের স্বাধীনতা, কখন ঘটে, তাহা কেবল কিরিকী সহায়তাতেই সম্ভব। তাহার। এখন ঘৃণিত দহনল যটে, কিন্তু তাহাদিগের বধেষ্ট গুণ আছে। তাহার। হীনমন রাজ্যলী অপেক্ষা উন্নত, তাহা-
রাই দিল্লীর কাপুরুষকে পরাজয় করিবেক, অতএব তাহাদিগের সহিত আত্মীয়তার
অভ্রাণা করিও না। যদি বজ্রের কুশল প্রার্থনা কর, তবে স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া
অগ্রশস্ত দৃষ্টি তুলিয়া যাও। কিরিকীর স্পষ্ট অনুগমন করিতে সুযোগ না পাও, তবে
অন্তঃকীলা বহিতে ছাড়িও না। অনেক যুদ্ধকৌশল, অনেক দেশ রক্ষার ক্রায়, তাহা-
দিগের দ্বারে পাইবে। জয়ন্তীর সূর্য্যকুমার কোথায়? তাহাকে বলিও, সে যেন
সহজে দিল্লীর দালত স্বীকার না করে। তাহার রাজ্য পর্ব্বতমধ্যস্থ থাকায় একান্ত
অগম্য, দিল্লীর এখন অধোগমনের সময়;—যদি সূর্য্যকুমার একটু বলপূর্ব্বক স্বীয়
রাজ্যের দণ্ড ধারণ করে, তবে সুখে কাটাইবে। তাহার স্বাধীনতা কেহ স্পর্শ
করিতে পারিবে না। পরে সরমার প্রীতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, ‘মা সরমা।
তোকে আমি সূর্য্যকুমার সুপাত্রে দান করিব মনন করিয়াছিলাম,—যখন। পরেইয়ে সেই
রাজি মা তোদের মুগলমুক্তি দেখিতাম। বিধাতার বিপাক! সূর্য্যকুমার বঞ্চিত আমার
সভা ত্যাগ করিয়াছে ও দুই রজপুতের আশ্রয় পাইয়াছে, কিন্তু মা তুই আমার নিকট
ধর্ম্মত স্বীকার কর যে, তাহা মনে করিয়া সূর্য্যকুমারের উপর কোপ করিবি না।
আহা! সে কোপের পাত্র নহে—বিধাতা তাহাকে তোরই অস্ত্র গড়িয়াছিল। মা!
সূর্য্যকুমার জয়ন্তীর স্বাধীন রাজ্য—তোর যোগ্য বরা।’ সরমা হেঁটমুণ্ডে নিকটে
দাঁড়াইয়া রহিল ও পিঞ্জর মধ্যে সুকোমল হাত দিয়া প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠদেশে বুলাইতে
লাগিল। সে আশ্রয়িত আশ্রয়কহৃৎক দৃষ্টি দেখিলে যেন হাস্য গলিয়া যায়,—
আমার লোম হর্ষণ হইল। সূর্য্যকুমার জুমি এববার প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ
কর।”

সূর্য্যকুমার বলিল, “মহাশয়, আমার মন তাহার অস্ত্র এখন জ্বলন করিতেছে,
কিন্তু স্বদেশভক্ত্যম আমাকে লজ্জিত করিয়া বিরত করিতেছে। বাহা হউক, আমি
তঁাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু তঁাহার কি পরিজ্ঞানের আর কোন উপায় নাই?
মহারাজ মানসিংহকে বলিলে কি তঁাহার দয়া হইবে না?”

কচুয়ায় বলিল, “ভাই, তাহার যোগ এখন চিকিৎসার বহির্ভূত হইয়াছে। দিল্লী-
ধরের আদেশ—প্রতাপাদিত্য জীবিত হউক বা মৃত হউক, বন্দী কর। এ অবস্থায়,
বিশেষ, যে সকল দিল্লীর বিপক্ষ, রাজবিদ্বেষীমূলক পত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে
প্রতাপাদিত্যবলি দিল্লীর কোপে উৎসর্গিত।”

সূর্য্যকুমার বলিল, “তাল, যদি তাহাই হয়, তবে এত বড় হত্যাধারী রাজাকে এক্ষণ

মহাপাতকীর দশ দিবার প্রয়োজন কি ? যেহেতু নোহপিঞ্জরের কথা শুনিতেই তাহাতে ত হস্তপাদি সকলই একান্ত অসম্ভব । এ অত্যন্ত অসত্য ও নিষ্ঠুর প্রথা ।”

কচুয়ার বলিল, “ইহার কোন উপায় নাই । আজ দুইচারি দিনের মধ্যেই প্রতাপাদিত্য শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়াছে । অতুমান হয়, আর অধিক দিন তাঁহাকে বাঁচিতে হইবেক না । এমন কি, অন্য সৌন্দর্য্যের রায়—প্রতাপাদিত্যেরই রাজবৈদ্য—একপে মানসিংহের সভ্য, বলিলেন যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য আর দুই চারি দিন আছেন । বান্ধাশলী পৌছান তাঁহার অন্তে বটে না বটে সন্দেহ । আহা ! তাঁহার অন্তে এ দুর্দশা ছিল, ইহা যথেষ্ট প্রকাশ ছিল না । আমি এই মহৎপাপের দায়িত্ব ইহার প্রাপ্তি করিলেও আমার মন কখন পবিত্র হইবে না ।”

স্বর্গকুমার বলিল, “মহিষী কোথায় ?”

কচুয়ার বলিল, “মহিষী রাগজের পরাজয়ের পর অবধি শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর মাথা তোলেন নাই । কবিরাজ যেন, তাঁহার রোগ সঙ্কট, তিনি কোন মতেই পরিজ্ঞাপাইবেন না । বাহা হউক, তিনি এক প্রকার আছেন ভাল । কেনসেই শোক যে আছাড় খাইয়াছিলেন, তাহার এমন দুই বায়ু প্রকাশ যে, আর তাঁহার চেতনা নাই । সরমা বালিকা—কেশবলক্ষ্মীর তাহারই জন্ত সকলেই অস্থির । প্রতাবতী ও অরুণতী ও ইন্দুমতী তিন জনে তাহার সেবাসুশ্রীয়া করিতেছেন । যখন সরমা প্রতাপাদিত্যের পার্শ্ব হইতে মহিষীর নিকট বসিয়া তাহার শীর্ণ ও স্নানবশনে চূষন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ মা মা বলিয়া ডাকেন, তখনই কেবল মহিষী অবসাদিত ও নির্জ্যোতি-নেত্রে চাহিয়া দেখেন—কিন্তু কোন উত্তর করেন না । সেই সময় ব্যতীত আর কেহ কখন মহিষীকে নেত্রোন্মীলন করিতে দেখে না । আহা ! সে নেত্রে আর পূর্বমত চাকচিক্য নাই, স্নেহপূর্ণ স্বচ্ছতা নাই, এখন চক্ষু—একে কোটরস্থ অবসাদিত, তাহে আবার আবিল হওয়ার একান্ত অমানুষী হইয়াছে । স্বর্গকুমার, এ মহাপাতক আমার শিরে বলিবেক ।”

স্বর্গকুমার বলিল, “ইন্দুমতী কেমন আছেন ?”

কচুয়ার বলিল, “তিনিও বিষয়া, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন কাতর হইয়াছে । বিমলাদেবীর অপঘাত তাঁহার বক্ষে শেলসম বিধিয়াছে । সর্বদাই তাঁহার জন্ত ইন্দুমতী হার হত্যা করেন । অন্য ভোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত দেখিবে । রায়-গড়ের যুদ্ধ আমাদিগের সকলেরই অমঙ্গলকর হইয়াছে । এখন আমরা বুঝিতেছি যে, এ একা প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশ নহে, এ রায়বংশ উচ্ছিন্ন হইবার প্রথম প্রতিভা !”

স্বর্গকুমার বলিল, “মহারাজ মানসিংহ, বলভৈরব প্রভি কি আদেশিলেন ?”

কচুয়ার বলিল, “সে বিষয়ে প্রতাবতীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে । পেড়িল হইতে

গজালিখ অমুপায় ও হজুংমল পলায়ন করিয়াছে, সমাচার পাইয়া মহারাজ মানসিংহ তাহাদিগের অবস্থানে বরদাকর্ষণ ও ভয়হরিকে আদেশ করেন। প্রভাবতী এই সমাচার পাইয়া বস্ত্রভঞ্জে পাঠাইতে অমুরোধ করে। বস্ত্রভঞ্জন স্বয়ং তাহার উৎসাহপ্রকাশ করায়, মহারাজ তাহাকে বরদাকর্ষণের সঙ্গে যাইতে আদেশ দেন। তাহার চট্টগ্রাম হইয়া রত্নপুরে গমন করিলে প্রভাবতীও তাহাদিগকে অনুসরণ করে। রত্নপুরে যাইবার সময় মহারাজার নিকট হইতে এক সনদ লইয়া যান। ওখায় পৌঁছিয়া আরাধ্যের রাজার সহিত বৈরুপ কপালসন্ধি করিয়া আসিয়াছেন, তাহার মহারাজ মানসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওয়ায়, প্রভাবতী রায়গড়ে প্রত্যগমন করিয়া বস্ত্রভঞ্জন জীবন-ভিক্ষা আর সমস্ত দোষ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এদিকে প্রতাপাদিত্য বার বার বস্ত্রভ নিন্দেবায় বলিয়া মানসিংহকে বলায় মানসিংহ বস্ত্রভকে নিন্দেবায় বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।”

হৃদয়কুমার বলিল, “চলুন, একবার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করি।”

কচুরায় হৃদয়কুমারের স্বকণ্ঠে হাত দিয়া স্বীয় কলকাত্তিমুখে চলিলেন। মালিকরাজ ও নন্দকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে যত কচুরায়ের শিবিরের নিকটস্থ হইলেন, ততই হৃদয়কুমারের মুখ স্নান হইতে লাগিল, ততই সকলের গতি মন্দ হইল। শিবিরে প্রবেশকালীন এত লঘুপদে তাহার প্রবেষ্ট হইল যে, প্রতাপাদিত্যের পিঞ্জরের সম্মুখীন হইলেও সরমা ও প্রতাপাদিত্য কেহই ইহাদিগের আগমন অবগত হইল না। প্রতাপাদিত্য লোহপিঞ্জর সহিত ভূমে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, পিঞ্জরাবদ্ধ—পদ-সকোচে অক্ষম—বসিতে অক্ষম। অশ্রু-বা দণ্ডায়মান আবার দণ্ডবৎ শয়ান। সরমা পিঞ্জরের বক্ষস্থলে মাথা নোয়াইয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছেন ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য পিঞ্জরের মধ্য হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহুর কারয়া সরমার মস্তকের উপর রাখিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যও অশ্রুবোচন করিতেছেন। পিতৃ-কন্যার পরম পবিত্র ও বিতৃক প্রেম-ভঙ্গের আশঙ্কায় কচুরায় ও হৃদয়কুমার অস্থিরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে কচুরায় ও হৃদয়কুমার নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আহা! সে কাতরমূর্ত্তি দেখিলে কে অশ্রুস্রবণে সক্ষম হয়? ক্রমে সকলে স্থির হইলে সরমা আপনায় অকল দিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চক্ষু মুছাইয়া দিলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “সরমা, তুমি সঙ্গদেবে আমাকেও কোমল করিলে। আমার লজ্জা হইতেছে—এখন যেভাবে হউক না কেন, এ আমার অশ্রুপাতের সময় নহে। তুমি অন্য কচুরায়কে আমার নাম করিয়া বলিবে যে, ওরায় হৃদয়কুমারকে ডাকাইয়া আন,—আমার অস্তিমকাল নিকট হইতেছে। ইন্দুমতী কেমন আছে? তাহাকে একবার আমার নিকট ডাকিও। আমি কচুরায়কে ইন্দুমতীর সহিত একত্র দেখিব ও সেই সময় হৃদয়কুমার থাকিলে ভাল হয়। হৃদয়কুমার কি জয়ন্তীপুর গিয়াছে?”

কচুরায় অগ্রসর হইয়া বলিল, “মহারাজ, স্বর্ঘ্যকুমার ও আমি উভয়ে উপস্থিত আছি।

এই কথা শুনিবামাত্র সরমা চমকিয়া আপনার শিরোনদেশে বস্ত্র টানিয়া দিলেন।

প্রতাপাদিত্য সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, স্বর্ঘ্যকুমার অগ্রসর হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “কচুরায়, তেমরা আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমার পিঞ্জরটা একবার দণ্ডায়মান করিয়া দাও। কচুরায় পিঞ্জর ধরিয়া দণ্ডায়মান করিলে, প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “স্বর্ঘ্যকুমার, তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই—তুমি কি জয়ন্তীপুর গিয়াছিলে?”

স্বর্ঘ্যকুমার বলিল, “মহারাজ আমি জয়ন্তীপুর যাচি নাই তবে আমার দেনীয় কুকী-ভটক ঢাকাপাধ্যস্ত পৌছিয়া দিয়া আমি নবদ্বীপ হইয়া আসিতেছি।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “তুমি কখন আসিলে?”

স্বর্ঘ্যকুমার বলিল, “মহারাজ, আমি এইমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছি।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “তুমি তবো বাড়ি কষ্ট পাইয়াছ? আমার অবকাশ অল্প,—একবার ইন্দুমতীকে আমার নিম্নে ডাকিয়া আন। মহিষী কোথায়?”

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, মহিষী রুগ্ন হইয়া শয্যাগত আছেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “কোমলহৃদয় হীনবল স্ত্রীজাতি কত সহ করিবে! ভাল, ইন্দুমতীকেই ডাক। রাজমহিলার মধ্যে আর আর কে কে আছেন?”

কচুরায় বলিল, “অনঙ্গপালদেবের কন্যা প্রভাবতী আছেন, আর আয়াকানের রাজসহোদরী অরুণভতী মহিষীর সেবা করিবার ইচ্ছায় স্বকাব্যারে আছেন। মাতা-ঠাকুরাণী আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া নিষেধ করার বিশি রায়গড়েই রহিলেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ভাল করিয়াছ, তিনি সঙ্গে থাকিলে কষ্ট পাইতেন। তবে অবকাশ পাইলে তাঁহাকে বারানসী ধামে পাঠাইও। স্বর্ঘ্যকুমার! ইন্দুমতী প্রভাবতী ও আয়াকানের স্বহিত্য ও অপরায়ণ রায়বংশীর বে কোন স্ত্রীলোক থাকেন, তাঁহাদিগকে এখানে আনিও।”

স্বর্ঘ্যকুমার চলিয়া গেলে মহারাজ বলিলেন, “ভাই কচুরায়! স্বর্ঘ্যকুমার অত্যন্ত সুপুত্র। আমি তাহাকে বালককাল অবধি দেখিতেছি, তাহার প্রায় উদারস্বভাব যুবা আমি প্রায় দেখি না। নন্দরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এ লোকটা কে? মালিকরাজ কেমন আছে? তোমার পিতা কোথায়?”

মালিকরায় বলিল, “মহারাজ, এটি স্বর্ঘ্যকুমারের জয়ন্তীপুর অমাত্য নন্দরায়। আমার পিতা বশোহরে গিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “বিশ্বকৃষ্ণ, আমার পৈত্রিকলোক ও অত্যন্ত বিখ্যাত,

আমায় পরাজয়ে তাহার সর্বনাশ হইল। অদৃষ্টে সকল ঘটে— তাহার বৈরুপ ক্ষতি হইয়াছে, আমার ক্রমতা থাকিলে তাহা পূরণ করিতাম। এ বিধাতার হাত! এত বয়োধিক্য তাঁহার অপর কাহার সেবা করা সম্ভবে না। তুমিও আমার সত্য থাকিয়া অরোদ্ধতির কোন উপায় করিলে না। তোমারও ক্ষতি দেখিতে পাই। বাহা হউক, তুমি বুঝা, তোমার এখনও সময় আছে। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ—! হায়! এতকালের রাজ-সেবার পর নিরাত্ম হইল!”

কচুয়ায় বলিল, “মহারাজ, বিজয়কৃষ্ণের ভার আমি লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহারাজের নিকট এক মানে ছিলেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “অনুমান করি, যুদ্ধে বন্দী হওয়ার আমার রাজত্ব সমস্তই বনন পামরের অধিকারে হইল। আমার খাষ খামারের প্রতি কি রেজ্জসম্বন্ধীয় কোন দৃষ্টি আছে?”

কচুয়ায় বলিল, “মহারাজ সে সকল সম্বন্ধে মানসিংহ কিছুই পরিষ্কার আদেশ দেন নাই। আমার বোধ হয় সে সমস্তে মহারাজের যথেষ্ট অধিকার আছে, মহারাজ ইচ্ছা করিলে তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “আমার যশোহরের রাজকোষ কি হইল?”

মালিকরাজ বলিল, “মহারাজ, গোবর্দ্ধন যশোহরে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া স্বয়ং রাজচিহ্ন ধারণ করিয়াছে।”

প্রতাপাদিত্য শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, “যশোহর তবে এখন কি স্বাধীন?”

কচুয়ায় বলিল, “মহারাজ, যশোহর স্বাধীন নহে, মানসিংহের সেনাপতি, অনুমান করি, এখন যশোহর দখল করিয়াছে। আমরা সে সমাচার এখনও পাই নাই, ঢাকার মতাব দিল্লীর পক্ষ হইতে যশোহরে গিয়াছেন। গোবর্দ্ধন এতদ্ব্যতীত রোপের মত ঔষধ পাইয়া থাকিবেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “নরায়ণ বন্দ্যপি ঢাকাকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে কচুয়ায় তুমি তাহার সাহায্য করিও। ভাল, আমা হইতে যে কর্ত্ত্ব সিদ্ধ হইল না, তাহা বন্দ্যপি আমার কিলেন্দার সম্পাদন করিতে পারে ইহাওও আমার সন্তোষ।”

কচুয়ায় বলিল, “মহারাজ, সে যে আপনায় বিপক্ষে বিজোহবন্দ্য উঠাইয়াছে, আপনায় কোবহুনিধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, স্বীয় নামের সন্দর্ভাঙ্গি করিয়াছে ও কদমাল-বারা কিলেন্দার কোজদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ত্ত্বচারী নিযুক্ত করিতেছে।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “কচুয়ায়, তুমি আনন্দে আমার মন প্লবিত্ত করিতেছ। গোবর্দ্ধন যে এমত দক্ষ আমি অবগত ছিলাম না। আমি পূর্বে জানিলে তাহার সম্ভ-

চিত্ত সমান করিতাম । যাহা হউক, তাহার আচরণে আমার বখেঁট অনুমোদন আছে । আমার এক্ষণে কিছুই ক্ষমতা নাই কিন্তু গোবর্দ্ধন আমার সহায় আশীষ লাভ করি-
য়াছে । কচুরায়, যে ব্যক্তি যে প্রকারে হউক না কেন দাসত্বশৃঙ্খলের বন্ধনমোচন
করিতে সমর্থ, যে ব্যক্তি পরাধীনতা ঘূর্ণা করে ও স্বপ্নেও সেই বন্ধনমোচনে বদ্ধবান
হয়, সে আমার মাতাপিতা—আমার প্রীতিভাজন । যে ব্যক্তি পরাধীন হইয়া সমাগরা
পৃথীর অধিপতি হয়, সে আমার চক্ষে তত সত্তম লাভ করে না, কেননা আমি স্ববাহ-
লক্কাধীন অসত্য কোল বা রাজবংশীকে ভক্তি করি । কচুরায়, তুমি কটু মনে
করিও না । আমি স্বার্থচেষ্টে গোবর্দ্ধনকে বহমপূজক অপমানবা অপেক্ষা ঐষ্টজ্ঞান
করি ; এমন কি, আমার রাজ্যে বদ্যপি গোবর্দ্ধনের এই ঘটনা হইত, তাহা হইলে
আমি কখন রুষ্ট হইতাম না ।—”

প্রতাপাদিত্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, পরে বলিলেন, “কচুরায়, বাক্সার রামচন্দ্র
রায়কে চাঁদখানের কারায় রাখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তাহার কি অবস্থা ? সে কি
এখন কারাবদ্ধ আছে ?

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, রামচন্দ্র রায় স্বরাজ্যে গমন করিয়াছেন । রমাইবীরের
সাহায্যে চাঁদখানের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন । যেদিন এই ঘটনাটি হয়, সেই
দিন গোবর্দ্ধন যশোহরের রাজত্ব গ্রহণ করে ।”

মালিকরাজ বলিল, “মহারাজ, আমি শুনিয়াছি স্মৃতিও রাজা রামচন্দ্র রায়
আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন ।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “রামচন্দ্র, এত সমর্থ হইয়াছে, ভাল আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট
হইলাম ।—” স্বর্ধাকুমারকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, “কচুরায়, স্বর্ধাকুমার এ সকল
সম্ভার অবগত আছে ?”

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, স্বর্ধাকুমার নন্দরামের প্রমুখ্যে সমস্ত অবগত হইয়াছেন ।
নন্দরাম রমাইবীরের সহিত পরামর্শে একযোগে সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে ।”

ইন্দুমতী পিঞ্জরের নিকটে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সরমার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলে,
প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ইন্দু, আমার শেষকাল উপস্থিত । সরমা, শোক করিও না,
আমি এখনও চার পাঁচ দিন জীবিত থাকিব । কিন্তু অন্তিমকালে আর বিধব কণ্ঠের
কথা কিছু কহিব না ও কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না বলিয়া তোমাদিগের এখন
ডাকিলাম ।” ইন্দুমতীর ও প্রভাবতীর চক্ষু জলে ছল ছল কবিত্তে লাগিল । সরমা
একদূর্ভে চাহিয়া গহিলেন ।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ইন্দুমতি, কমলানদীবীকে আমার প্রণাম জানাইও । বলিও
যে না । তোমার প্রতাপাদিত্য এখন স্থানান্তরে উদিত হইল ! আমি কমলানদীবীকে

নালাপ্রকারে বাতনা দিয়াছি; কিন্তু কি মধুর স্বভাব! তিনি চিরকাল অবিচলিত রেখে আমাকে দেখিয়াছেন। তিনি সত্যকালের লোক, তাঁহার শাস্তি কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। কচুরায়! এতদুত্তা মাতা তার কাহারও হয় না, যেমন উদার ভৃত্যবিক সরল, এমন মহাশয় অন্তঃকরণ আমি দেখি নাই। তিনি যেন তাপসকণ্ঠা, তাঁহার চরণে আমার নমস্কার —”

প্রতাপাদিত্য ক্ষান্ত হইল, সমান্ত আত্মীয় মধ্যে শঙ্কের নাম নাই। এমত নীরব ও নিস্তব্ধ যে হৃদয়পনের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য একটু হাস লইয়া বলিলেন, “ইন্দু, তুমি জয়ন্তীশঙ্ক শিবচন্দ্রের মৃত্যুসংজ্ঞা কহা। সূর্য্যকুমার তোমার সহোদর। তুমি বসন্তরায়ের প্রতিপালিত। আমি তোমার বিপক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, তে'মাকে হস্তগত করিয়া তোমার নাম লইয়া সূর্য্যকুমার যদি অব্যাহত হইত তাহার বিপক্ষে জয়ন্তীরাজ্য অধিকার করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে বিধাতা বিপরীত বিধান করিলেন। আমার সমস্ত আশ উন্মূলিত হইল। আমি আগ্রের অমৃত রোপণ করিয়াছিলাম বিধাতা বাম হইয়া কলকূট দিলেন। সাগর মহানন্দ্রম নিষ্ফল হইয়া নিরস্ত হইল না আবার গরল জ্মিল। ভাল! আমার তাহাও ভূষণ, আমি সহ্য করিলাম। যাহা হউক কিন্তু তুমি ধেরূপ উচ্চ বংশজাত, তোমার বোণ্য বর কচুরায়। কচুরায়ের প্রতি তোমার অপ্রীতি নাই; অতএব এক্ষণে তোমার পিতৃবন্ধু, তোমার পিতৃতুল্য পিতৃব্য বলিলেও হয়, আমার দীর্ঘদশায় আমার একটি প্রিয়কাৰ্য্য কর। তোমার মা'র মুমূর্ষুকালে আমি স্বীকার করিয়াছিলাম যে, তাঁহার কঙ্কাকে আমি লালনপালন করিব। কিন্তু বহুদিন যাবৎ তোমার অনুসন্ধান না পাওয়ায় তোমার সহোদর সূর্য্যকুমারকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়াছি। এখন তোমার বংশের উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছি, তোমাকেও চিনিয়াছি। এখন সেই অঙ্গীকার পূরণ করিয়া তোমার নিকট তিচ্ছা চাহি। তুমি আমার মুমূর্ষুকালে স্বীকার পাও যে, কচুরায়ে যদি প্রীতি থাকে ত আমার ভাণ্য বলিয়া ঘৃণা করিবে না।”

মহারাজ একটু হাস লইলে ইন্দুমতী কচুরায়ের প্রতি ত্রিভিতি হইয়া কটাক্ষপাত করিলেন। জ্ঞাপ্তভাবনতমুখী ইন্দুমতীর হাবভাজ কচুরায়ও লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করিলেন না। প্রতাপাদিত্য পরস্পরের চক্ষের ডাব দোঁখিয়া বুঝিয়া বলিলেন, “কচুরায়, নিকটে আইস” কচুরায় নিকটে আসিলে ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া কচুরায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়ের মস্তকে হস্তদ্বয় দিয়া বলিলেন, “কালী দম্পতীকে চিরজীবী করুন!” প্রতাপাদিত্যের চক্ষের জল পড়িল। ভাবে গদগদ হইয়া প্রতাপাদিত্য নিঃশব্দ হইলেন।

কচুরায় ও ইন্দুমতী উভয়েই অঙ্গপূর্ণনয়নে প্রতাপাদিত্যের হস্ত করণে ধরিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “কচুরায়! ভাই, আরও নিকটে আইস, এই পিঞ্জরের নিকট

মস্তক আন।” কচুরায় পিঞ্জরে মস্তক রাখিলে প্রতাপাদিত্য তাহার ললাটদেশ চুম্বন করিয়া ইন্দুমতীরও ললাটদেশ চুম্বনলেন। তাহা দেখিয়া সরমা ইন্দুমতীর গলদেশে জড়াইয়া ধরিলেন, প্রতাবতীও গলদেশে ধরিলেন, আহা হিনজনের মিলনে যেম ত্রিবেণী বহিল।

কতক্ষণ পরে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “মালিকরাজ! বঙ্গভকে ডাকাও” মালিকরাজ চলিয়া গেলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “মা! সরমা! নিমটে এস! স্বর্ধাকুমার, নিকটে এস। স্বর্ধাকুমার তোমাদিগের মনের ভাব আমরা বহুকাল অবগত আছি। আমার দর্শন-দৃষ্টে অচরণে তোমার মন বিভ্রান্ত হইয়াছিল। কালে সমস্ত অবগত হইবে, এখন বর্ণনার সময় নহে! আমি দিব্য দেখিতেছি যে, সরমার প্রতি তোমার ভাবের অশ্রুধা হয় নাই। সরমার পিতার যদি কোন দোষ থাকে, সরমা তাহার কলুষিত হয় নাই। স্ত্রীর হৃদয় হইতেও গ্রহণ করা উচিত। আমার অস্তিমকাল, এখন আমার স্ত্রী কন্ডার উন্নতি বাসনা নাই। আসি স্বার্থপরায়ণ হইয়া হৃহেতুবাদে তোমাকে প্রবৃত্ত করিতেছি না। প্রবৃত্ত করা আমার স্বভাব নহে, বিশেষে জামাতাসংগ্রহে সেটা একান্ত দৃব্য। বাহা হউক, তোমাদিগের উভয়ের সুখবর্ধন আভিলাষ করি। তুমি স্বাধীন রাজা। দেখে যেন মূলমামানুহকে পড়িয়া স্বীয় আশ্রায় বিনিময় করিও না। তোমরা পরস্পরের উপযোগী, আমি কোন অনুরোধ কারব না। উভয়কেই আশীর্বাদ করি, “স্বর্ধাকুমার, তুমি স্বাধীন থাক। সরমা, তুমি বীরপ্রসূ হও।” মহারাজ দ্বন্দ্ব হইলে মালিকরাজ বঙ্গভকে লইয়া প্রত্যাগত হইয়া মহারাজার শেষবাণী শুনিয়া উভয়ে এক স্থানে বলিল, “ওঁ স্বস্তি!”

প্রতাবতী বলিল, “ওঁ স্বস্তি।” ইন্দুমতী বলিল, “ওঁ স্বস্তি!” কচুরায় বলিল, “ওঁ স্বস্তি!” অরুণভাও বলিল, “ওঁ স্বস্তি!”

কলকাল বিগমে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “বঙ্গভ ও প্রতাবতী! তোমরা উভয়েই মদুবংশপালিত, তোমরা পরস্পরের উপযোগী। আমি রায়বংশের নামে তোমাদিগকে দম্পতিবরণ করিলাম। মালিকরাজ! তোমার পিতার জন্ত আমার কিঞ্চিৎ গুপ্তমিধি আছে। তাহা ধুমঘাটের কালীর মন্দিরের ঈশান কোণে লাড়িস্তব্রহ্ম মূলে পোষিত আছে, তাহা তুমি উঠাইয়া আমার নামে বিঘ্নরক্ষকে দিবে। আমার আর ধনে প্রয়োজন নাই। বাহা আছে তাহা সমস্ত পাইলে তোমরা পুরুষানুক্রমে পরম সুখে রাজ্য করিতে পারিবে। আর আমার খানখানার সমস্ত আমি বঙ্গভ ও প্রতাবতী দম্পতিকে দিলাম। কচুরায়! দেখও যেন ইহার অশ্রুধা না হয়। যখনসম্বন্ধে যেন ইহাতে লোভ না করে। এখন তোমরা বিদায় হও, অদ্যাবধি ষতদিন আমি জীকিত থাকিব, আমার প্রার্থনা—যেন কেহ আমার নিকট না আইসে। আমি আর নারাবহ

হইব না। যা! সরমা এখন বিদায়! এখন আমি জনজাতীর পোষণে আত্মকে অর্পণ করিলাম। যা সরমা, তোর সম্পর্ক আশ্রয়! আজীব! এখন জীবন্তকে ত্যাগ কর, এই আত্মর তিকা। কালীপদ ভরসা! কচুরার, আবার আহার তুমিই আনিও আর আমাকে কাহারও কোন সমাচার শুনাইও না। আমি আর কাহাকেও চাই না। তুমি আসিয়া নীরবে আহারাদি দিবা। এখন কালীপদ সার! এখন কালীপদ ভরসা!”

অষ্টাদশ অধ্যায়।

“দিব্যশিচ্ছেদবৃহতো জাতবেদো বৈখানর ঐরিরিচে মহিষম্।

রাজা বৃষ্টীনাংসি মানুযীণাং যুধা দেবেভ্যো বরিবচকর্থঃ”

নিঃশলাক জনশূন্য উপত্যকা নিকটে বিরাট অভ্রভেদী শুভ্র শৃঙ্গপক দেখা যাইতেছে; কিন্তু নীচের দিকে দৃষ্টি করিলে তালু শুষ্ক হয়, ছংকম্প হয়, মস্তক অস্থির হয়, পদ-বিচলিত হয়, নেত্র আয়ত-অতীত হয়, অনুমান হয় যেন সশুণের গিরি সকল সরিয়া আসিতেছে, যেন নীচের অচল চলনশীল হইল। দূরে শিখরধরমধ্যগত বায়ুরুদ্ধহাসে ধবল রক্তবর্ণ তেজোময় চঙ্গহিমবিশ্ভার। শিখ্রী নিশ্চয় অথচ মন্দগতিতে হৃদ্য-রশ্মি প্রভিবিশিত হইয়া অপূর্ণ শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্রদ্রদেণের সরল, চৌর, দেবদাক্ষর অত্রভাগ স্নান ও শুক। হৃদ্যরোমসমিত কণ্টকাকার পত্রসিকর কুবারে শুভ্রাঙ্কত, কোথাও হিমবক্র, কোথাও হিমকররঞ্জিত, কোথাও বা হিমিকা মট-হেতুক বিবর্ণীকৃত। ক্ষুদ্র উত্তীর্ণমাত্র দৃষ্ট হয় না। একেই ও অত উচ্চভরণে উত্তীর্ণ বিরল, তাহে আবার হিমাগমে অধিকাংশই হিমানেলে পতানুপ্রায় হই-রাছে। তুমি দৃষ্ট হয় না, প্রান্তর দেখা যায় না; সমস্তই রক্তগিরি।—সমস্ত বেত।—সশুণে খেত শৃঙ্গ, পার্শ্বে বেতভিত্তি, পশ্চাতে বেত ভরুচর, নিম্নে ও অধোভাগে বেতগিরিপৃষ্ঠ। সবে হৃদ্যোদয় হইতেছে, পূর্বদিক্ অরুণদেব অরুণবর্ণ করিয়া দিনপতির আগমন হুচনা করিতেছেন। মর্শ্বভেদী লীভবার সর্কাক জড়ীভূত করিয়া মনকে নির্বির করিতেছে। পাশ্চাত্যের সর্কাক উর্বর ও সলোম সমরচর্মে আবৃত থাকার বদন ব্যতীত সর্কাক শুলীকৃত হইরাছে ও কতকটা তীব্র হিষের কোপ হইতে রক্তা পাইতেছে। কিন্তু মুখে আবরণ না থাকার হিমে শুক হইয়া বিবর্ণ হইরাছে। নীলীনিভ অগাঢ় বাষ্প চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছিল এখন শীততম বাহুতে কুবাররূপ পরিণত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

গোবর্ধন বলিল, “অনুগাম আমি আর লীত সহ করিতে পারি না। সোণারপ্রাচীর

সবাবের কশাঘাত ও মুসলমান শত্রুর লোহপিণ্ডের অবস্থা হইতে লক্ষণে ভাল।
বেরূপ তীব্র বায়ু, আর একপদ অগ্রসর হওয়া কঠিন। চল আমরা গুহা হইতে অধিক-
দূর আসি নাই, এখন অগ্নেই কিরিয়া বাইতে পারিব। অনুমান করি, গুহার অগ্নিও
এখন নষ্ট হয় নাই।”

অনুপরাম বলিল, “গুহার কয়দিন থাকিয়া আমাদের রসদও প্রায় শেষ হইয়া
আসিল! চল আর একটু চলিলেই ভেটি রাজধানীতে পৌঁছিব। সেখানে কোম
ব্যয়াজে পৌঁছিলে হুখকর অগ্নি ও ভেজকর পানীয় পাইব। পক্ষশূন্য দেখা বাইতেছে,
ইহার পূর্বেই একটা ভাণ কোয়াজ আছে।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “আজ চারি দিন ধরিয়া তুমি ঐ কথাই বলিতেছ। ক্রেমাধরে
চারি দিন হইতে ঐ পক্ষশূন্য দেখা বাইতেছে; কিন্তু এত চলিলাম পথও কমিল না।
এখনও পক্ষশূন্যের আকার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বেরূপ উচ্চ ও হুচ্যা
শিখর অনুমান, তাহার কিছুই নাই কেবল তুষারাবৃত। আমার শরীর অত্যন্ত অবশ
হইয়াছে। আমি আর পদ উঠাইতে পারি না।”

অনুপরাম বলিল, “গোবর্দ্ধন, আমিও হিমেলু হইয়াছি। কিন্তু এখানে বসত বিনয়
করিয়ে ততই কষ্টবৃদ্ধি হইবেক। হিমেলু ব্যক্তির পক্ষে পরিভ্রম একমাত্র প্রাতি-
কার; অতএব একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া চল ক্রেম শরীরের বেদনা ও জালা দূর
হইবেক। গুহার প্রত্যাপনময় করিতে বস্তুটুকু শ্রম হইবেক, ভস্তুটুকু শ্রম করিলে
ভেটি নগরীর নিকট হইবে।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “আমার আর কক্ষতা নাই, আমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদ-
নার পূর্ণ, আমার সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হইয়াছে, আমার বস্ত্রাদি বহনে কষ্ট হইতেছে।
আমি আর নীত সহ করিতে পারি না।”

অনুপরাম বলিল, “তোমার বলি শরীর এত কোমল, তবে তুমি কি বলিয়া বলের
সিংহাসনের নিকে হৃষ্টি করিয়াছিলে? পক্ষতান্নোহনে যে অলক্ত, সে কি সাহসে চক্র-
বর্তী হইতে ইচ্ছা করে?”

গোবর্দ্ধন বলিল, “তোমার ম্যার ত্রুহ্লদয় লোক আমি কখন দেখি নাই। এখনও
তোমার স্বভাবসিদ্ধ নটবুদ্ধির প্রাণ্ড্য হ্রাস হয় নাই।”

অনুপরাম বলিল, “হাঁ! আমি ত্রুহ্ল বটি, আমার বুদ্ধিও কুটিল, কিন্তু গোবর্দ্ধন বর্ণিত
বল দেখি, ক্ষুদ্রত্ব অপেক্ষা কুটিলতা কি ভাল নহে? আমি ত রাজবিজোহী হইয়া
যীর তত্ত্বার” বিপক্ষে হস্তোস্তলন করি নাই। বাহা হউক, এক দিন রাজত্ব করিয়া তুমি
এত হুহুমার হইয়াছ; কিন্তু আমি রাজবংশে জন্মিয়া এ সকল কষ্ট ও অত্যাগ অমানবদনে
সহ করিতে পারগ হইলাম। আধুনিকের স্বীতিই এই।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “পাষণ্ড ! তোমার পরামর্শেই ত আমি এই অবর্ণনীয় কষ্ট পাইতেছি। আমি কুবুজি করিয়া তোমার সঙ্গে লইলাম, আমি যদি উড়িষ্যার দিকে বাইতাম, তাহা হইলে সুখে জীবন কাটাইতাম, আর হয় ত পঞ্চাস্তর আশ্রয় লইলে পাঠান নবাবের অধীন কোন একটা মানের কর্ম পাইতাম। হায় ! আমার ক্রীত দশা কি হইল ! আর আমারই বা কি হইল !”

অনুপরাম বলিল, “ঠিক বলিয়াছ উড়িষ্যার পাঠানের অধীনে কর্ম পাইয়া আবার তাহার সিংহাসন পাইবার সুযোগ হইত। তোমার মত স্বার্থপর লোকের সঙ্গে পথ চলা উচিত নহে। নরাদম কৃতর ! এখন আমার আশ্রয় লইয়া তোর মনস্তাপ হইতেছে ; কিন্তু যখন মসনদঅলির সৈনিকে তোকে অনুসরণ বয়ে, মনে করিয়া দেখ দেখি, তখন আমার সহায় পাইয়া আত্মকে কৃতার্থ ও লব্ধ-আশ্রয় মনে করিয়াছিল কি না ? তুই পায়স, তুই এখন আবার ক্রীত জঘ্ন ভাবিতেছিস ? আহা ! তোর ক্রীত প্রাতি যে দয়ল ! তখন আমি বলিয়াছিলাম যে, তোর ক্রীকে সঙ্গে আন। তুই তখন বলিয়াছিলি যে, “পথে নারী বিবজ্জিতা,” আবার বলিলি যে, “স্বাত্মানং সত্ততং রক্ষ্যে দারৈরাপি” এখন আবার মায়াবান কানিতেছিস ?”

গোবর্দ্ধন বলিল, “শবধানক মগ ! তুই আমার ক্রীত নাম উচ্চারণ করিস না। তুই ও আপনার ভগ্নীকে পাঁচাবেচা করিয়া ফিরিস্ত্রী পদানত হইয়াছিল। তেঁদের ধর্মও নাই, মায়াও নাই।”

অনুপরাম বলিল, “আহা, ভূমি হিন্দুধার্মিক ! ভূমি সনাতনধর্ম রক্ষা কর,—তাই তুই খীর ক্রীকে বোলাচন্দনবাড়ি হইতে পথে ফেলিয়া আসিলি—তাই ত পাছে দ্রাপকুম্বে একত্র থাকিলে নবাবের লোক তেঁদের সন্ধান পায়, ভয়ে, ক্রীকে তীত্বার ভীরে তোর মৃত্যুভান ক’রে কানিতে কানিতে বসাইয়া আসিলি।”

গোবর্দ্ধন বলিল, “হাঁ ধর্ম ! ‘যার জগে করি চুরি সেই বলে চোর।’ তুই না আমাকে ঐ পরামর্শ দিয়া ক্রী ত্যাগ করিয়া আসিতে বলিল। তোরই কুবুজি ভাবিয়া আমি সন্ধ্যার পর লুকাইয়া রহিলাম ; তুই আমাকে কুন্তারে লইয়া গেছে বলিয়া আমার ক্রীত নিকট সমাচার দিলি ; তার পর সে সত্য শোকে অভিভূত হইলে, তুই তাহার অনাথ অবস্থায় সুযোগ পাইয়া কত নষ্টাম করিলি, অংশে যে তাহাকে সেই হাসে রাখিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া ভুলাইয়া আসিলি। আমি তবে অভিভূত হইলাম—ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম না,—তোমার পরামর্শে মুগ্ধ হইলাম—আপনার প্রাণের ক্রীকে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলাম। এখন সে আমার সঙ্গে থাকিলে এ দুর্গমপথের দোঙ্গার হইত, কত সেবা করিত, কতই লাভনা করিত। আহা ! যাহার এ বয়সে ক্রী নাই সে মনুষ্যই নহে আমি কি বলিব, এখানে তোর সমুচিত শাস্তি দিবার স্থান নহে, মতুষ্য

তোর মৃৎস ব্যবহারের শিকা নিভাম । পাষণ্ড দূর হ—আমি আর তোর সঙ্গে
বাইব না।”

গোবর্দ্ধন এই কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া। যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া
চলিল ।

অনুপগ্রাম গোবর্দ্ধনের দিক এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল । ক্রমে গোবর্দ্ধন দূরে গেলেন।
বসিল, “রে নরাধম বাঙ্গালি ! একাগ্রই শুধায় চালালি । তাহা কখনই হইবে না।
একা এ পথে যাওয়া আমার উচিত নহে । পক্ষিতে অপর কাহাকেও আজ তিন দিন
দেখি নাই, অনুমান আমার পথ ভুলিয়া আসিয়াছে । গতকল্য রাত্রে যে আলোক
দেখিয়া লোকালয় মনে করিয়াছিলাম, তাহা জনকৃত অগ্নি নহে, তাহা পার্বত্য অগ্নি স্বতঃ
জলিয়া থাকে । অন্য সেই দাবানল পথে দেখিলাম । পথ বলিই বা কেন ? যে ভুবান্নাবৃত-
প্রদেশ দিয়া যাইতেছি, তাহাতে জনসমাগমের কোন সূত্রাকর চিহ্নও দেখি না । এ নিঃ-
শলাক পক্ষে যে অপর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমনত আশা করা মূর্থের কর্ম ।
আজ ষষ্ঠদিবস হইল একজন উলঙ্গ গারো দেখিয়াছিলাম । সে আমার আশাঙ্গিকে
দেখিয়া পলায়ন করিল । তাহার পর একটি পক্ষীও দেখি নাই । ভোটরায়ে অবশ্যই
প্রবেশ করিয়াছি—কেননা কালোজান নদীপার ওলোপুর, ভোটের প্রথম দ্বার । তেরাই
জঙ্গলমধ্যে যেখানে পানিলহরীয়ার লতা হইতে পানজল পাই, সেই ত রাজভাতখাওয়া ।
তাহার পর শাল ও শিমুর প্রবাণ অসম্য বন । তেরাই পার হইলে যখন বৃদ্ধতুরসার
উন্মেষ পৌঁছিলাম, তখন ত খাষ ভোটমধ্যগত হইয়াছিলাম । তাহার পর ক্রমাগত
উত্তরে আসা উচিত হয় নাই । এখন উপায় ত কিছু দেখি না । বহিচ কান্তন্যাস—
কিন্তু এখনও তুষার দ্রব হইবার কোন চিহ্নও দেখি না । আহারও হ্রাস হইয়াছে ।
আমার বৈশি ক্রমে লঘু হইয়াছে, আর তিন দিনের ঋ উপযুক্ত আহার আছে । কি
করি—দেখি ফ্রার যেমন অভিক্ষিপ্ত । বাঙ্গালিটা চটিয়া স্বতন্ত্র হইলে ভাল হইবেক
না । তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই । এখন যদি দুই তিন দিন মধ্যে
লোকালয় না পাই তাহা হইল অনাহারে মৃত্যু । অনুপগ্রাম এত দিন কাটাইয়া অব-
শেষে অনাহারে মরবেক ?—না ! ফ্রার এমনত আদেশ নহে । অনুপগ্রামের বহিচ
এখনও ক্রোধ কাটে নাই, কিন্তু তাহার সাহায্যে কষ্ট আছে । নটের প্রাণাণাৎ ও ফ্রার
অনুমতিতে এত সমুহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, এখন কি জীবনরক্ষার আহারও
পাইব না ?—না ! না ! তাহা কখনই হইবেক না । উঃ কি ভীষণ বিষম !
হিমসংহতিতে অস্থির । মজ্জা পর্যন্ত বিকল হইতেছে । যাই—দেখি বাঙ্গালী কতদূর
গেল । এ বাতায় উত্তরায় চলাও সুকঠিন । বাপ রে বাপ ! আমার মুখ
হিমেলু হইল । দেখি যদি তুষার বর্ষণে কোন উপকার হয় । আশাঙ্গির দেশের

পূর্বকালের মটেরা হিমেলুর ঔষধ—তুয়ারবার। সেই অল্পবর্ষণ ও লেগুচোবণ বলে ।” অনুপরাম তুমি হইতে কার্পাসরাশিলিত তুয়ার হই হাতে উঠাইয়া লইয়া যীর বদলে বেগে বর্ষিতে লাগিল। তুয়ারবর্ষণ সেই শীতের সময় একান্ত ক্লেশ-কর, কিন্তু কি করে, শীতানে ও হিমেলুতে শরীর শিথিল ও ব্যথিত হওয়ার তুয়ারবর্ষণে সাহস করিল। অপরকাল বেগে বর্ষণে মুখের ও করবরের রক্তস্রাব হওয়ার, বাতসার কতকটা উপশম হইল। নিকটস্থ তুয়ারে হিমশিখরের দক্ষিণ আশ্রমে বসিয়া পানঘর হইতে মূল পাতুকাতল খানাইয়া পদতলে অষ্টাবৎ পর্যন্ত তুয়ার লইয়া বর্ষণ করিল। ক্রমে ক্রিষ্ণং স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় মূলতলপাতুকা লাগাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে পৃষ্ঠস্থ অজচ্ছন্নহাত হইতে ক্রিষ্ণং বাজরা ও গোবর্ধমিজিত আটার কটীর টুকরা বাহির করিয়া তাহার ক্রিষ্ণং ঘৃত ও লবণ মিলাইয়া আহার করিল। পরে কটীদেশস্থ বংশপাত্র হইতে ক্রিষ্ণং সুরাও পান করিল। বল পাইয়া বলিল, “বাই—অস্তর হইতে গোবর্ধনের গতিকটা দেখি; তাহার সহিত এখন আর সাফাৎ করা বিধের সবে;—অবস্থা বিচার করিয়া আচরিত্ব।”

ক্রমে দক্ষিণাতিমুখ হইয়া একটা হিমটলা পার হইলে দেখিল, পত রাজিতে বে গুহার উত্তরে আশ্রয় লইরাছিল, গোবর্ধন সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অনুপরাম কিছুক্ষণ টিলায় অস্তরালে অবস্থান করিলে, গোবর্ধন গুহার প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহির হইল না, দেখিয়া অপর তিনচারি টিলা ঘুরিয়া গুহার দ্বারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তথায় অপরকাল দাঁড়াইতে, গুহার মধ্যে হইতে গভীর কাতর ক্রন্দনধ্বনি পাইয়া অতি সতর্ক পদক্ষেপে গুহার দ্বারে গেল। গুহার দ্বার হইতে হৃৎস্রোত প্রায় বে গুহা ছিল, তাহার প্রবেশ করিয়া প্রথম বৈক্যের পর বে কোটর ছিল, তাহার বাইরা বলিল।

গোবর্ধন সেই কোটরের অস্তরালে, প্রাথম প্রাথম কোটরে প্রবেশ করিয়াই নিকটস্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য একটা অগ্নস্ত কাঠ লইয়া অগ্নি লাড়িয়া দিতে দিতে তাহার করে এমনত খিল লাগিল যে, চৌংকার করিয়া ঐ অগ্ন্যস্তকাঠটি দূরে নিক্ষেপিল; কিন্তু ক্রমে হস্ত পদাদিতে শীতানজনক ব্যথা বৃদ্ধি পাইল, ও বহু বাতনা বৃদ্ধি হইল, ততই কষ্টমুচক ক্রন্দন করিতে লাগিল। করণিনের পবিত্র, লঘু আহার ও অতীব শীতের বায়ু সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ার, ক্রমে শীতান এমন বলবতী হইয়া উঠিল যে, এক্ষণে বেন তাহার গ্রহি গ্রহি কেহ টপটাইয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে। হিমেলুতে মূখে ক্ষত দেখা দিয়াছিল, তাহার উপর গ্রহি ব্যথা এমনত কষ্টকর যে, ক্রমে গোবর্ধনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তীব্রবেদনার তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ সকালিত হইতে পুলাগিল। গোবর্ধন বাতসার কাতরভাবে আর্দ্রবাদ করিল বটে, কিন্তু সে শব্দ কেবল গোবর্ধনদ্বারা হইল—

ক্রমে শীতান গোবর্দ্ধনের কণ্ঠ আশ্রয় করিল। অনুপন্নান ক্রমে গোবর্দ্ধনের হীসাবস্থা দেখিয়া সেই কোঠরে প্রবেশ করিলে, গোবর্দ্ধন দন্তে দন্তে বর্ষণ করিয়া বিকটবরে বলিল “সন্ন্যাস! তুই এখানে কেন? আমার বাতলা বুদ্ধি করিস্ না—আমি তোকে দেখিলে খিন্ন হইরা থাকিতে পারি না। তোমাই বুদ্ধিতে আমার এই দশা।”

অনুপন্নান বলিল, “কৃত্রিম বাক্যনি। এখন তুই অজ্ঞাত শিশু অপেক্ষা ক্রীণবল—আমি মনে করিলে তোর গলদেশে পদ দিয়া তোর খাটকরব ঘোষণা করিতে পারি। না—তাহার যে ভ্রম হইবেক—সে নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন; তোর ক্রটীর স্রুত কোথায়? গোবর্দ্ধন শীতান বেদনার প্রায় সংজ্ঞাপূর্ণ ছিল, উত্তর করিল, “কেন—এই আমার মাথার নীচে আছে, আমি তাহা খাইতে পারি না। আমার আহায়ে এমন অনিচ্ছা, অন্নটি এত তীব্র, যে আহারের নাম আমার লজ্জা হয় না।”

অনুপন্নান “হী, তাই তোমার কটকর অব্য তোমার নিকট হইতে দূর করিব।” বলিয়া গোবর্দ্ধনের ক্রটীর স্রুত লইয়া বধন কোটর হইতে চলিয়া গেল, তখন গোবর্দ্ধন বলিল, “পামর আমার আহার লইয়া পলাইল। হার! আমার কি হইবে?” কিন্তু ক্রীণবল হওয়ার আর অন্নটি থাকার নিশ্চয় হইয়া রহিল।

অনুপন্নান শুভার বাহিরে আসিয়া স্রুত খুলিয়া দেখিল যে স্রুতটি প্রায় পূর্ণ, গোবর্দ্ধন হিমেলুপ্ত হওয়া অবধি অন্নটি থাকার, কিছুই আহার করিতে পারে নাই। শুভার বাহিরে একটু দাঁড়াইয়া কিরিয়া গিয়া গোবর্দ্ধনের কটীদেশ ও বস্ত্রাদি অস্ত্র ব্যস্ত করিয়া বাহ্য কিছু ছিল, তাহা কাড়িয়া লইল। গোবর্দ্ধন ক্রীণবল হওয়ার কেবল লাকৃত্যবশে যোবহুতক খসি করিল, ফলতঃ অনুপন্নানকে নিবেদন করিতে অক্ষম হইল। অনুপন্নান এইরূপে গোবর্দ্ধনকে নিবেদন করিয়া আহারীয়, পানীয়, অর্থ ও বস্ত্রাদি সমস্ত লইয়া শুভা হইতে বাহিরে আসিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেল।

উনবিংশ অধ্যায়।

“উদ্যোগ্যাবতি জীবলোকঃ পতান্নমেন্তনুশ্চেন্দ্র্যং” ইতি।

হস্তপ্রাপ্ত দিব্যবোক্তবেদং পতুর্জনিভমতিসংবত্ধং।”

“তঁাহারা কি আজও এখানে আছেন, না আরও অগ্রসর হইয়াছেন? আমার অন্য প্রাক্তকাল হইতে মন কেমন অস্থির হইয়াছে; তাই আমি অন্য এক যাত্রা থাকিতে তোমাকে ত্যাগ করিলাম।”

রামচন্দ্রার বলিলেন, “অনুমান করি, তঁাহারা বারানসীবাসে অন্ততঃ ত্রিয়ারি বাস করিবেন। কল্য তঁাহারা বারানসী পৌছিয়াছেন। তারিখাটের লোকেরাও সেই সমাজের

ছিল। আমরাও ত কোন বিষয়ে ক্রটি করিতেছি না, রমাই তাই, তোমার অব অন্য কি প্রকার দেখিতেছ ?”

রমাইবীর বলিল, “মহারাজ, অন্য এ চটিতে বেরূপ বলবান্ অশ্বচতুষ্টয় পাইয়াছি, অনুমান করি, হুই প্রহরের পূর্বেই বারানসীধামে পৌঁছিব। রামনগর সম্মুখে দেখা যায়।” এই কথা বলিতে বলিতে তুরগচতুষ্টয় কষাঝাতে উর্দ্ধ্বাঙ্গে দৌড়িল। একার চক্রেয় বর্ষয় শব্দ, অক্ষদণ্ড-সংলগ্ন বল্লরীর বঞ্জনা, অগ্নিগাল লম্ব কিঙ্কীর মধুর ধ্বনি একীকৃত হইয়া অন্তীম মনোহর লাগিল; যদিচ প্রাতঃকাল কিন্তু রথচক্রেয় বেগ ভ্রমণে ও অশ্বচতুষ্টয়ের বলবতী গতিতে এত ধূলি উখিত হইল যে, স্মৃতি মুখে আবরণ টানিয়া দিলেন।

রাজা রামচন্দ্ররায় চান্দখাণের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাজ্যে পৌঁছিবায় পরই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রায়গড়ের যুদ্ধে পরাজয় ও পরকণ্ঠেই স্বচ্ছন্দেয় ঘারে হুত হইয়া বন্দী হইয়াছেন, কুসমাচার পাইলে; স্মৃতি পিতৃচর শব্দের জন্ত অত্যন্ত অস্থির হইলেন। রামচন্দ্ররায়কে ভয়ঃ ভয়ঃ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তাহার কৃত-কার্য্য না হওয়ার, রমাইবীরের সাহায্যে অনেক আশ্রমে ও সনদ্বীপের প্রধান ধনী ও মহাজন বৈদ্যনাথের সহায়তার অবশেষে রামচন্দ্ররায়কে সম্ভব করিলেন। বৈদ্যনাথ এই অবকাশে বরলাকর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক ও রায়গড়ে অরুদ্ধতী আছেন শুনিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবেন, অনুমানে, রাজসঙ্গে রায়গড় যাত্রা করিবেন, অভিশ্রম প্রকাশ করিলেন। রাজা রামচন্দ্ররায় রায়গড়ে যাইবেন স্বীকার করিলে, স্মৃতি বৈদ্যনাথকে ডাকাইয়া বাহাতে সদ্য রায়গড়ে পৌঁছান যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। বৈদ্যনাথ আপনার নির্ঘাণ ও উড়ুপিক ডাকাইয়া জবগামী ছিপ একখানা প্রস্তুত করাইয়া রাজা রামচন্দ্ররায়কে সম্বাদ দিলেন। রাজা, স্মৃতি ও রমাইবীরকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথের নৌকায় আরোহণ করিয়া রায়গড় যাত্রা করিলেন। পশ্চাৎ তাহার লোকলব্ধর রায়গড়ে উপস্থিত হইতে আদেশিলেন।

রামচন্দ্ররায় পরদিবস প্রাতে রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, মহারাজ মানসিংহ ছাউনী লইয়া দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য লৌহপঞ্জরবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত নীত হইয়াছেন। তাহার সঙ্গে কচুরায় দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। মহিষী অভিজ্ঞতা থাকায়, তাঁহার সেবাসুগ্রহণের জন্ত ইন্দুমতীদেবী মানসিংহের সৈন্তসহ যাত্রা করিয়াছেন। প্রভাবতী ও অরুদ্ধতী সরমার রক্ষণাবেক্ষণে সরমার সহিত যাত্রা করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান অমাত্যেরা কেহ দিল্লী হইতে সন্দর্শ পাইবার আশ্রয়ে, কেহবা প্রভুভক্তিবলে, কেহবা কচুরায়ের আত্মীয়তার টানে, সকলেই প্রতাপাদিত্যের অনুগমন করিয়াছে। রায়গড়ে বাহারা ছিল, তাহার বিমলাদেবীর অকস্মাৎ

মৃত্যুর সমাচার রাখেন্দ্ররায়কে দিল । রামচন্দ্ররায় কমলাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহার আবাসে রেবতীর রেখা পাইলেন । রেবতী এখন পূর্বমত পাগলিনী নাই বটে, কিন্তু রামচন্দ্ররায়কে দেখিয়া তাঁহার কতকটা পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায়, উত্তেজিত হইয়া অনেক কথাবার্তা কহিয়া অবশেষে স্মৃত্তিকে ও রাজা রামচন্দ্ররায়কে ভরায় প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করিতে বলিল, এরূপে কহিল যে, যদ্যপি বিলম্ব হয় তাহা হইলে হয় ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক না । রামচন্দ্ররায় বহুদিন ব্যবধানে স্বাধীনতার সহিত স্বরাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার অবিদ্যমানে যে সফল বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করা দূরে থাকুক, সমস্ত অবগত হইবার অবকাশও পান নাই,—এখন কে কোন রাজকর্মের ভারে আছে ও কাহার দ্বারা কোন কর্ম সুসম্পাদিত হইবেক, তাহা বিচারের সুযোগও পান নাই,—এমত অবস্থায়, ত্রীর বিশেষ অনুরোধে স্বজ্ঞানের জ্ঞান রায়গড়ে যাইতে অমত করেন নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে আবার দিল্লীপর্ষদে গমনে কতদূর সম্মত থাকিতে পারেন—সহজেই বোধগম্য । তিনি রেবতীর কথায় অসম্ভোষ প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু রেবতী পশ্চাৎ দেখাইলেই বলিলেন, “বায়ুর বিচিত্র গতি, উনি যেমন বসিলেন, তেমনই বলিলেন—তাঁহার কথা ভাবিয়া বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া হুমুসু খণ্ডরের অনুসরণ করিতে হইবেক । আর অনুগমন করিলেই বা তাঁহার কি উপকার ঘটিতে পারে ? তাঁহার প্রাণদণ্ড ও কৃতসঙ্কল্প । দিল্লীর আদেশ—প্রতাপাদিত্যকে জীবিত বা মৃত হউক, দিল্লীতে আনহ । আমি যাইয়া কিছু মানসিংহের প্রতি দৃঢ় আজ্ঞার অর্থতা করিতে পারিব না । তবে সঙ্গে থাকিয়াই বা কি করিব ? দিল্লীতে আমার প্রতিপত্তি নাই, যে আমি দিল্লীধরের জাতক্রেধ লীড়ল করি । চল স্মৃতি, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই । আমার নিম্নের রাজ্য অশাসনে ভ্রষ্টপ্রণালী হইয়াছে ; এখন কতদিনে পুনরায় হ্রাসশাসন সংস্থাপিত হইবেক, বলিতে পারি না । মসনদ আলির উপর বজ্রের কার্ণের ভার হইতেছে ;—ভরায় করের জন্ত লোকও আসিবেক । বহুকালের পর বজ্রের করসংগ্রহ হইতেছে, প্রথম করদানে নবাবকে সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে চিরকালের জন্ত বিঘ্নবৃষ্টিতে পড়িতে হইবেক । এসকল অপ্রশস্তাৎ বিবেচনায়,—আমার পরামর্শ—স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন । বরঞ্চ মসনদ আলির সহিত সোণার গ্রামে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা অবগত করাইতে পারিলে, করগ্রহের গ্রহি কতকটা শিথিল হইতে পারে ।” রমাই, এ বিষয়ে কি বল ?

রমাইবীর বলিল, “মহারাজ, আপনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই সুত্বযুক্ত । আপনার রাজ্যে এখন যেরূপ অবস্থা, তাহে প্রতাপাদিত্যকে অনুসরণ করা দূরে থাকুক, আমি স্বরাজ্যেও প্রতিগমন করিতে নিষেধ করি । আমার পরামর্শ বহু সোণারগ্রাম যাইয়া নবাবের নিকট মহারাজের কারাবদ্ধ ও সন্ধ্যা মুক্তির কথা কহিয়া

করলংগ্রহের জন্ম কতকাল অবকাশ লইতে পারিলে ভাল হয় । এমন কি এ সময়ে রসদী বন্দোবস্তের রহস্যবৃত্তি বরক জুরিপেশগী পাণ্ডেনের চেষ্টা বিধি । কিন্তু জুরিপেশগী পাণ্ডেনে অসমর্থ হইলে, অবশেষে রসদী বন্দোবস্ত লাভ করিতে পারিবে, লগ্নেই নাই । রাণী কিন্তু বাহা বলিতেছেন, মহারাজ, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিলে—কিছু মিথ্যাত্ব অসঙ্গত বোধ করিবেন না । ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—ভারমালা রচনার এমন পট্টবে, সহজে ঔঁহাদিগের পরামর্শের মর্শ্ববোধ হয় না । এতাপাদিত্যের অনুসরণ কর— একটা উপলক্ষ মাত্র । মহারাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাশয়ের সমস্ত অবস্থা অবগত করাইতে পারিলে, করগ্রহে বধেই উপকার সম্ভবিবে; আর মহারাজ মানসিংহের নিকট প্রতিলভি লাভের এই মুখ্যকাল ; কচুরায় তথায় উপস্থিত আছেন, তিনি থাকিতে মহারাজের সহিত দর্শন হইলে আপনার পক্ষে বধেই কুশল; আরও মনসদু আলি বলাপি মহাশয়ের সহিত দিল্লীর সাক্ষাৎ সংস্থার বিষয় অবগত হন, তাহা হইলেও বধেই সমাপন করিবেন; ইহাতে আপনার যে মত অভিরুচি ।”

রমাইবীরের পরামর্শে রামচন্দ্র কতকটা প্রতীতি পাইয়া কমলাদেবীর নিকট থাকিয়া অন্তঃপাল দেবের মতামত অবগত হইলেন । পরে বৈদ্যনাথেরও সম্মতি দেখিয়া সেই দিবসই এতাপাদিত্যের অনুসরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । বৈদ্যনাথের উপর আপাততঃ প্রয়োজনীয় কর্মাদির ভার দিয়া ও বীর অবস্থানুযায়ী অনুচর ও সৈন্ত-সম্প্রদায় স্বানুসরণ করিতে আদেশ দিয়া সেই স্নাত্তিতে পশ্চিম রাজ্যভিমুখে বাজা করিলেন । রমাইবীরের পরামর্শে জবগামী অবচকুটের একার যোজনা করিয়া লইলেন । রমাই সারথি হইল ও সন্মতি সঙ্গে চলিলেন । বাজাকালে অন্তঃপালদেবের পরামর্শে রায়গড়ের অন্ত্রাশালা হইতে বধাধোপ্য বনুক, বান্দু ও গুলী লওয়া হইল । বৈদ্যনাথকে সম্বোধনে বিদায় দিয়া রমাই রথ চালাইল । কয়েকদিনে ক্রমে মানসিংহের স্বকাবার নিকটস্থ হইতে লাগিল । অন্য বেলা দেড়গ্রহের সময় রামচন্দ্রের পৌছিয়া মানসিংহের ছাউনীর জনৈক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, অবগত হইলেন যে, মহারাজা মানসিংহ সারনাথের মাঠে ছাউনী করিয়াছেন ।

রামচন্দ্ররাজ জিজ্ঞাসিলেন, “মানসিংহ এখানে কবে আসিলেন ।”

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, তিনি আজ তিনদিন এখানে আসিয়াছেন । কল্যাসারংকাল নাগাইন রওয়ানা হইবেন—এমত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে । আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন ?”

রমাই বলিল, “আমরা বাদলা হইতে আসিতেছি—কচুরায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব ।”

সৈনিক বলিল, “চলুন, আমিও এক্ষণে ছাউনীতে বাইতেছি; আমি ঔঁহায়াই

অল্পকালে এখানে—প্রতাপাদিত্যের কি প্রয়োজন আছে বলিয়া—সোমলতার অব্যবহা-
সাসিদ্ধিলাভ ।”

রামচন্দ্র বলিলেন, “কোথা সোমলতা পাইলেন ?”

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, রায়বড়ের দক্ষিণে, একজন বৃদ্ধ ব্যাপারী আছে, তাহাকে
জিজ্ঞাসা করায়, সে লোক দিয়া একবোকা আনাইয়া দিল । বারানসীর বজ্রীয় সন্তের
সেই সমাহরণ করিয়া দেয়, সে আভিষেক শাকবীণীর ব্রাহ্মণ ; বজ্রপাশে বধেই অধিকার ।
তাহার প্রকৃত উপাধি বাজপেয়ী—কেন না, সে বহু বোড়শ বাজপের বজ্রানুষ্ঠান
করিয়াছে, কিন্তু এখন বজ্রকাঠ ও অপরায়ণ সন্তার সংগ্রহ করিয়া দেয় বলিয়া জন-
সমাজে তাহাকে ব্যাপারী বলিয়া থাকে ।”

রামচন্দ্র রায় বলিল, “কেন—সোমলতা লইয়া কি হইবেক ?”

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, আমি নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, কিন্তু অনুমান করি
যে, সোমলতা লইয়া প্রতাপাদিত্য বীর গার্হপত্য অগ্নির হোম্যানুষ্ঠান করিবেন ।”

রমাই বলিল, “মহারাজ, এই দশাধর্মের ষাট—তালীস্বীতে অবগাহন করিয়া
বিবেকের দর্শনে আত্মাকে পবিত্র করুন ।” রামচন্দ্র রায় এই কথা ভাবিযামাত্র নৌকা
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সচেল পবিত্র হ্রদধুনী জোড়ে আবেশন করিলেন । স্মৃতিও
পতির অনুগমন করিল, রমাই নৌকা হইতে রথ নামাইয়া সচেল জল প্রবেশ
করিল । পরে সকলে স্নানান্ত্রিক তর্পণাদি সমাপন করিয়া পলত্রেজে মণি-
কর্ণিকার অংগাহনান্তর পরমারাধ্য বিবেকের মন্দিরে প্রবেশ করিল । তথায়
অলাদি ও অনন্ত নৈবেদ্যের নিদার্তন করিয়া অগচ্ছাত্রী অন্নপূর্ণার দর্শনাদি করিয়া
বাহির হইলে, সৈনিক বলিল, “আপনারা রথে আরোহণ করুন, আমি আমার অস্ত্রের
সঙ্গে বাইতেছি ।” রাজা ও স্মৃতি আসীন হইলে, রমাই অর্থবোজনা করিয়া সৈনি-
কের পশ্চাতে রথচালন করিল । অল্প কাল মধ্যে দূর হইতে দিল্লীর ছাউনী দৃষ্টিগোচর
হইল বটে, কিন্তু ছাউনী মধ্যে মহা কোলাহল ও জনতা ।

সৈনিক বলিল, “এ জনতার কারণ কি—আমি একটু অগ্রসর হইয়া দেখি ।” হুই ।
চার রশি বাইরা দ্রুতপদে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, “মহাশয়েরা এখন খামের নিকটে
একটা হাসে আশ্রয় লইয়া বিজ্রম করুন—এখন কচুরারের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না—
তিনি ব্যস্ত হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শবের সঙ্গে পদাতীয়ে মণিকর্ণিকার ষাটে
বাইতেছেন ।”

স্মৃতি ভবিয়া ব্যভে “কি ! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছে । আমি
দেখিতে পাইলাম না !” বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।

রমাই সৈনিককে দিক্‌তে ডাকিয়া বলিল, “মহাশয়, ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের

প্রথমা কড়া, আর ইনি বাকলার অধিপতি — রাজা রামচন্দ্ররায়; ইহার মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় বঙ্গ হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এখন এখানে আসিয়া এ সময়ে তাঁহার ঔদ্ধমৈহিককর্মে সাহিত্যলাভ করিতে ইচ্ছা করেন। আপনি কৃপা করিয়া মহারাজ মাংসহকে এই সমাচার দিন। অনুমান করি, তিনি কখনই অস্ত্র মন করিবেন না।”

সৈনিক বলিল, “আমি তাহা অবগত থাকিলে অগ্রেই সঙ্গে করিয়া লইয়া বাইতাম। যাহা হউক,” রাজার প্রতি করথোড়ে “মহারাজ, আমার দোষ ক্ষমা করুন, আমি পরিচর না পাইয়া যথাযোগ্য মাত্ত করি নাই। রণি, আমি আপনাদিগের দান—আমার নিবাস রায়গড়। চলুন, আপনারা ঐ গঙ্গাধাত্রার মধ্যে সকলেরই সাক্ষাৎ পাইবেন। আমি শুনিয়াছি, মহারাজা মানসিংহ সকল প্রধান অমাত্য সঙ্গে প্রতাপাদিত্যকে অসুগমন করিতেছেন।” এই কথা বলিতে বলিতে রমাই রথ লইয়া ছাউনীর দ্বারে লাগাইল। রমাইবীর একলক্ষে রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অস্ত্রধারণ করিলে, রাজা রামচন্দ্ররায় সূমতিকে রথ হইতে অবতরণ করাইয়া পদব্রজে স্বকাবাসে প্রবেশ করিলেন। সৈনিকও স্বীয় অস্ত্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া জনৈক লোককে রমাইবীরের রথের তত্ত্বাবধারণ করিতে বলিয়া ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল।

এদিকে অন্য প্রাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই কচুয়ায়কে ডাকিয়া বলিলেন, “ভাই, অন্য আমার বারানসীতে চতুর্থ সূর্যোদয়—অন্য আমার শেষ দিন। তোমার সৈনিক প্রাতে সোমলতা ও অপরাপর যস্ত্রীর সত্তার আহরণ করিয়া আনিবে। আমার গার্হপত্য বহিঃ সরমার নিকট একটি কঁকড়াতে আছে, দে বৎস রক্ষা করিতেছে। সেই বহিতে আমার সংকার করিও ও আমার চিতার উপর দেই অগ্নি সংস্থাপন করিয়া তাহার আমার পক্ষ হইতে তুমিই বিষ্টকৃতাদি বহির হোমানি করিয়া বিসর্জন করিও—এই আমার শেষ অভিলাষ। আমার শেষকণ উপস্থিত—আমি আর চক্ষে ভাল দেখিতে পাইতেছি না—আমার অধমাজ অবশ হইয়াছে—বাড়িম্পিত্ত হইতেছে না—আমার শেষ উপস্থিত, কালাপদ ভরসা। মাপো! পারে—প্রতাপাদিত্য এতক্ষণে নিশ্বস হইলেন। হায়! বঙ্গের স্বাধীনতা অন্মের তরে নষ্ট হইল।

কচুয়ায় ব্যস্ত নিকটের স্বর্ণপাত্রস্থ গাজবাগি কুশা করিয়া লইয়া প্রতাপাদিত্যের সূখে দিলেন ও উঠেক্ষণের সরমাকে ডাকিলেন। সরমা প্রতাপাদিত্যের পূর্ব অসুখতি অবধি কখন সন্মুখান হন নাই বটে, কিন্তু কাণ্ডারের অন্তরালে দিবানিশি বসিয়া থাকি-
তেন ও যখন বেক্রপ প্রয়োজন হইত, কচুয়ায়কে বলিলে, কচুয়ায় মহোদয়ের দ্বার খসে তাহা সম্পাদন করিতেন। প্রতাপাদিত্যের শুভ্রবায় কচুয়ায়ের কোমল অন্তঃকরণ ও

উজ্জ্বল কোমল হস্ত প্রকাশ পাইরাছিল। সরমাকে বেষ্টিয়া ইন্দুযতী প্রভৃতি রাজাদ-
নারা সর্বদা বসিয়া থাকিতেন ও পিতৃসেবার নৈরাশ হওয়া অবধি সরমা মহিষীকে
যিচ্ছন বস্ত্রে সেবিতেন। কাণ্ডপটের অন্তরালে থাকিয়া প্রতাপাদিত্যের শেখবাচা ও
তাহারই অব্যবহিত পরে কচুরায়ের ধ্বনি শুনিয়া সরমা কাতরস্বরে কানিয়া মৌড়িয়া
পিঞ্জরের নিকটে গেলেন। ইন্দুযতী প্রমুখ রাজানারাগ তাঁহাকে অনুসরণ করিল।
মহিষী রায়গড় পরাজয় সমাচার পাইয়া অবধি পক্ষ্যহত হইয়া অজ্ঞানা ও অভিজ্ঞতা
ছিলেন, অদ্য যেম বৈজ্যভবনে স্বীয় শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া পিঞ্জরের নিকটে
উপস্থিত হইলেন। তৎপারিষদ স্ত্রীগণ মহিষীর অকস্মাৎ অলৈঙ্গনিক আচরণে চমকিত
হইয়া নিষ্পন্দপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিল। সরমা নিকটে আসিলে কচুরায় বলিলেন, “সরমা,
মহারাজার শেখকাল উপস্থিত, তুমি তাঁহার মুখে গঙ্গাজল লাও। এমত ইচ্ছামত্যা আমি
কখন দেখি নাই! কোন রোগ নাই অথচ অকস্মাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে,
তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। বীরপুরুষেরই এমত ইচ্ছামত্যা পূরণে শুনা যায়। হায়!
এতদিনে আমার ভ্রাতৃশোক লাগিল। আমি কখন মহারাজকে ভ্রাতার স্তায় দেখি নাই,
কিন্তু অদ্য আমার হৃদয়ে নূতন ভাবের উদয় হইতেছে। মহারাজকে আমি চিরদিন
জ্ঞাতির স্তায় বোধ করিতাম। হায়! আমি কি পামর!—এরূপ সদ্ভ্রাতার মর্ন্ত বুঝি-
লাম না, জীবিত থাকিতে তাহার সমুচিত আদর করিলাম না, বরং ঘেব ও হিংসা
করিয়া ছিলাম; এখন জানিলাম যে, মহারাজের স্মৃত্যুতে আমরা চিরদিনের স্তরে
পর্যবসিত হইলাম; বঙ্গ একেবারে নষ্ট হইল। হা বিধাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা মহারাজ!
হা প্রতাপাদিত্য! হায়! হায়!”

সরমা চীৎকার করিয়া কানিতে কানিতে সঙ্গত্রে সুরধুমীর জল মহারাজের
মুখে দিলেন ও চক্ষুঃস্র মুদ্রিত করিয়া স্বীয় অঞ্চল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। এদিকে
মহিষী আসিয়া পিঞ্জরের সম্মিথানে গেলেন সস্ত্রমে কচুরায় একটু সরিয়া গেলেন। মহিষী
নিকটে আসিয়া একদৃষ্টে কতক্ষণ প্রতাপাদিত্যের নিদ্রিতপ্রায় মুখাবলোকন করিয়া
একটু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, “মানি! স্বামান রক্ষা করিলে—এখন এ অভা-
গিনীর মান রক্ষা কর। আমার রোগ হয় নাই, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমি
তোমার চিরদিনের দাসী।” হস্তস্র উর্দ্ধে তুলিয়া উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধনয়নে বলিলেন,
“দর্পহারি অধুহনন। দ্রোণদীর লজ্জা-নিবারণ! অঘল্যার-পুনর্জীবন! আমাকে
অনাধিনী করিও না। যেমন বঙ্গাধিপের মান রাখিলে, তেমনি আমারও মান
রক্ষা কর।”

মহিষীর কাতর সঙ্গরূপ ধ্বনিতে সকলেই গঙ্গগদ হইল। সরমা একবার নীরবে
মাকুলনয়নের নিকে দেখিয়া তুমি দৃষ্টি করিলেন। ক্রমে স্বক্কাবারে এই সমাচার রটিলে,

মহারাজ মানসিংহ, হৃদয়ঙ্গম, মানিকগঞ্জ, বরনাকর্ষ প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তর্গত সৈনিক আসিয়া কচুয়ারের নিকটে উপস্থানে গ্রামচন্দ্রস্বামীকে সর্বাধ বিদে, তিনি বলিলেন, “রাজ্য রক্ষাচন্দ্রস্বামী ও সুমতি ও মহাবীরকে প্রবলে করায় আস। যে সৈনিক বজ্রীয় কাটা দি আহরণে গিয়াছিল, সে কৃতকাব্য হইয়া প্রত্যাপন করিয়া থাকে, তাহাকে সমস্ত সত্তার সহিত এখানে আসিতে বল ” সৈনিক চলিয়া গেলে মহাবীরকে বলিলেন, “মহাবীর, সুমতি ও বাহুলাপতি মহারাজকে দর্শন করিতে বহু হইতে এইখানে আসিয়াছেন।” মহাবীর বলিলেন, “তাই! রামচন্দ্র অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, আবার সুমতিও যথোচিত কষ্ট পাইয়াছে! আসিয়া যদি মহারাজকে জীবিত দেখিত, তাহা হইলে প্রম সার্থক হইত। তাহাবিন্দকে ভাকাও।”

মহাবীর শান্ত ও অশোচিত অবস্থা দেখিয়া সকলেই সিহরিল ও মহাবীর দিকে এক-গুণ্টে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী কেবল তুমি হৃদয় হতে বকপোন ভক্ত করিয়া তুম্যাদলে বসিয়া বহিলেন। মহারাজ মানসিংহ কখনকাল ছিন্ন হইয়া থাকিয়া বহিলেন, “কচুয়ার, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অকালমৃত্যু হওয়ার—আমাদিগের অন্য প্রবলে হইতে রক্তমালা হওয়া রহিত কর। মহারাজের বখাবোধ্য ঐর্ষ্যদেহিক ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া পরে রাজ্য পুনরাবস্থা করা যাইবেক। ভাব্যবাসে এই সমাচার পাঠাও। মহারাজের শব রাজ-পথকে শরান করাও। আমি কি করিব? আমার অতিক্রমিত বিপরীত আচরণ করিতে হইয়াছে; দিল্লী-বরের বেরূপ কঠিন আদেশ—তাহার পিঞ্জরবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। এক্ষণে মহারাজ প্রতাপাদিত্য মর্ত্যলোকের অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন! মহাসমারোহে তাঁহার সৎকার কর। ভাব্যবাসে পরীক্ষিত বহুশ চালাইতে আদেশদিয়ে ও বধন নগাভীয়ে বাইবে, তখন সমুচিত সেবা ও রেষণা সঙ্গে লইও; আমিও সঙ্গে বাইব।”

মানসিংহ এই আদেশ দিয়া চলিয়া গেলে, কচুয়ার তাহার পশ্চাৎ শিবির হইতে বাহিরে বাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দ্বাদশদণ্ডকাল শব বিবিধত রক্তিত হইলে, দ্বাদশ বসীর্দরুজ একটা তোপের শকট আসাইয়া তাহা মালাবিধ পুষ্পমালা ও পতাকা দি বারা রক্তিত করিয়া শিবির দ্বারে আনীত হইল। অপর শিবিরে প্রবেশ করিয়া দাসদাসীরা দ্বারা পিঞ্জর হইতে শব বাহির করাইয়া বখাবিধি কৌর বিধান ভক্ত বশাবোক্ত বিধিতে সৎকার ও কেশবণন হইল; পাটলাঘোরদর্য জলে বৌত করাইলেন, বৃগ-মদ কচুয়ারাওজনাদি দ্বারা সর্বাঙ্গ চর্চিত হইল। পরে জটামণীয়া জল লিকন করিয়া জটামণীয়া দ্বারা সলাটে বাঁধিয়া দিল। শব মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বীর উৎকৃষ্ট রাজবেশ পরিবীত হইল। বস্ত্রের দশা পূজাভাবে স্মৃতির বস্ত্র অর্পিত হইল। দাস-দাসীরা শব লইয়া শকটে শরান করাইল। দক্ষিণাঙ্গ লম্বল স্তম্ভল শবের বামভাগে

রাখিল। শবের বাসবভেতে সন্তপ্ত হৃদয় ও দক্ষিণ হাতে হুতীর বর্ণবিজিত শর দেখা হইল। শবের বাসবভেতে তলবার রক্ষিত হইল। শব রক্ষার্থে পঞ্চাশ জন জনাবৃত্ত প্রহরীরা দক্ষিণ হইয়া শবের উত্তর পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন কচুরার বলিলেন, “সন্ন্যাসী, মহারাজী তাঁহার পার্শ্বে পতা অগ্নিবারা সংকারের অনুমতি দিয়াছেন। তোমার দিকট কাক্রীতে সেই অগ্নি আছে। না! সেই অগ্নি লইয়া তোমাকে বাইতে হইবেক। অগ্নি কোথায় আছে আন। হুতীপাশতঃ আমাদিগের কুলপুত্রোহিত সজ্ঞে নাই—এক্ষণে আমাদিগের শরণ করিয়া সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবেক।”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “তাই, তুমি তাহার অস্ত্র চিত্তিত হইও না। এ বাগ্মণীদ্বারা এখানে পুত্রোহিতের অভাব হইবেক না। মালিকরাজকে বলিলে, মালিকরাজ আমাদিগের কুলপ্রাণ সমস্তই অবগত আছেন, দেখাইয়া দিতে পারিবেন।”

কচুরার বলিল, “মালিকরাজ এইখানেই উপস্থিত আছেন; আমাদিগের সমস্ত পুত্রোহিতের সাহায্যে সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবেক।”

সন্ন্যাসী কচুরারের কথা শুনিয়া আপনার বস্ত্রের মধ্য হইতে একটি বর্ণনির্মিত পদ্মদত্ত-মণ্ডিত হুতী কাক্রী বাহির করিয়া দিলেন। কচুরার সেই কাক্রী লইয়া শবের পতাং চলিলেন। প্রবেশ মহাসমারোহে শবট চলিল। মালিকরাজ বাজার পূর্ব্বেই একটি বর্ণপাশ করিয়া ত্রিকিৎ চক্র পাক করাইয়া লইলেন। স্বীয় উত্তরীয় দক্ষিণাবীতি করিলেন, সজ্ঞের আচরণ্যরূপে সেই হুতীস্বাসরে দক্ষিণাবীতি হইলেন। পিতৃলোকের অস্ত্র হুতী ও মনোভিষিক্ত পূবদাত্য সজ্ঞ চলিল। হুতী প্রৌড়ারি বহন করিলেন, সন্ন্যাসী আত্মবলীয়াগি লইলেন, সন্ন্যাসী সহস্ররূপ করিলেন, প্রকাশ করার, কেবল আত্মশাখা বাসবভে লইয়া চলিলেন। শবটের পুরায় একটি কুকবর্ণ ছাপ অনুভবপরিণে পুত্রবৎ হইয়া চলিল। তাহার পতাং বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়সণ ও তাহারিগের পতাং অপরাপর আত্মীয়, সর্বপতাং বয়ঃকমিষ্ঠ। বাজার অগ্রভাগে জয়জ্ঞা প্রভৃতি রাজবাণ্য কুম্ভসান তালে চলিল। তাহার পতাং একশত বেদবিৎ ব্রাহ্মণ সৈন্যত্যাগী কুল হইয়া উগ্রসান গান করিতে করিতে চলিল। পরে হস্তিমালা উষ্ট্রপ্রাণি অথবোহী ও পদাতি। মহারাজ মামসিংহ সকলের পতাংতে চলিলেন—সকলেই দক্ষিণাবীতি। প্রবেশ বাজা মনিকর্ণিকার পুঞ্জিলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, দলেরা পদাতীরহ সর্বভঃ আকাশশালী, বহুলৌচিক, কটকিকারি প্রভৃতি বহুবল উভাসিত, সর্বভঃ অলপমাত্র দক্ষিণপ্রবেশে দেশে—কোণাংক লৌহমখাদিবিহীন, হানে উর্ধ্ববাহক পুরুষপরিণাম দীর্ঘ ও বিততি পরিমিত অধঃখাত বহন করিল। পরে শবট হইতে শবকে লাইয়া নিঃপুত্রীক করিয়া পূবদাত্য দ্বারা শবীর পূর্ণ করিল। পরে পাঁচদশে চললদি পদকাটী কুপাকারে রক্ষিত হইলে, পূবদাত্য পুঁথি অর্ধভাড়াবাণিষ্ট চক্র খাতদেশের দক্ষিণে স্থাপিত হইল। আত্মক বজ্রসত্তার লইয়া

সরমা শবের দক্ষিণ হস্তে জুহু নিয়োজন করিলেন। স্নমতি সন্ধ্যাহস্তে যন্ত্রপাঠান্তে উপহৃত্য নিয়োজন করিলেন। রামচন্দ্ররায় দক্ষিণপার্শ্বে ক্ষ্য নিয়োজন করিলেন। হৃদ্যকুমার সন্ধ্যা অগ্নিহোত্র-হবনী নিয়োজন করিলেন। কচুরায় ন্তে গ্রাব্ণো নিয়োজন করিলেন। মহারাজ মানসিংহ সন্ত্রনে উরোগ্রোদ্যে ক্ষব ও শিরোভাগে কপাল নিয়োজন করিলেন। মহিষী নাসিকায় ক্ষক্ নিয়োজন করিলেন। সরমা কর্ণধরে প্রাশিত্র নিয়োজন করিলেন। স্নমতি উদয়ে পাত্রী নিয়োজন করিলেন। মালিকরাজ সমাধারে শবের উদয়ে চমস্ নিয়োজন করিলেন। বরদাকর্ষ জঙ্ঘাধরে উদ্বল মুঘল নিয়োজন করিলেন। কচুরায় পাদধরে শূর্ণ নিয়োজন করিলেন। মালিকরাজ অবশিষ্ট যজ্ঞীয় পাত্র সকল পূবদ্যো পূর্ণ করিলেন। পরে সন্ধ্যা নিস্তৃতীকৃত কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তাহার উপর শব রাখিল। পুরোহিত ঋতুস্তরগীর বণা উৎখেল করিতে চাহিলে মালিকরাজ বলিলেন, মহারাজ ঐতাপাদিত্য কাতীরশাখাভুক্ত, অতএব ঋতুস্তরগী হনন করা উচিত নহে। পরে কৃষ্ণাজিনে শব প্রচ্ছাদিত হইলে চমস্ ও প্রণীতা প্রণয়ন হইল। পরে চক্রবারা পিণ্ড দান করা হইলে, মহিষী বামহস্তে আশ্রাশাখা লইয়া রক্তবস্ত্র পরিবীতা, সিন্দূররঞ্জিত-ললাটা, আলুলায়িতকবরী হইয়া চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক শবের বামস্থ ধনু হস্তে লইলে, সরমা ও স্নমতি আসিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহিষী কোন উত্তর না দিয়া উদ্ধৃষ্টিতে জলকাল দাঁড়াইয়া অবশেষে বলিলেন, “স্নমতি ! সরমা ! মা ! তোমরা চিরজীবিনী হও।” পরক্ষণেই এক লক্ষ্যে চিতারোহণ করিয়া শবের বামতানে শয়ান হইলেন। চক্ষুর্দিকে বাদ্যোদ্যম হইল, কচুরায়, স্নমতি ও সরমার হস্তদ্বয় লইয়া উজ্জ্বা ধরিয়া চিতাতে নিয়োজন করিলেন। স্নত, ধূপ সজ্জরসাদি পূর্ব চিতা অগ্নি গ্রহণ করিল। কালী, কবালী, মনোজবা, সুলোহিতা, স্নগ্ধবর্ণা, স্কুলিজিনী ও বিশ্বরূপী-লোলায়মানা সপ্তজিহবা অগ্নি মহাবেগে জলিয়া উঠিল ও বজ্রধ্বম মহান্ধাঘরের জীবান্না পরমাস্ত্রায় বহন করিল। বঙ্গাধিপ পঞ্চভূতে মিলিত হইল।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কারয়া মানসিংহ সদলবল প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন প্রাতে কচুরায় অস্থিসংকলন করিয়া ভাগীরথীর তীরে সমাধি দিলেন ও প্রত্যাপাদিত্যের স্বর্ণপার্শ্বে বেদবিৎ ব্রাহ্মণদ্বয়কে গোসহস্র ও স্বর্ণাদি দান করিয়া প্রীতিলভ করিলেন। পরদিন মহারাজ মানসিংহ দিল্লী যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কচুরায় সরমার নিকট বিদায় হইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। ইন্দুমতী, সরমা ও স্নমতিকে লইয়া প্রভাবতী অরুণকর্তী সৈন্যে রায়গড় যাত্রা করিলেন। হৃদ্যকুমার, বরদাকর্ষ, মালিকরাজ, রাজা রামচন্দ্র-অজ্ঞতি সকলেই তাহার অহ্নয়ন করিল। রায়গড়ে পৌঁছিয়া রাজা রামচন্দ্র দ্বার কিস্কদিবল অবস্থানলব্ধ সরমা কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইলে, স্নমতিকে রাখিয়া রুমাইবীরের সহিত স্বদেশ

গমন করিলেন। স্বর্ধ্যকুমার প্রায় দুই বৎসরকাল রায়গড়ে সরমার সেবার নিযুক্ত
রহিলেন, কিন্তু পিতৃবিয়োগ অবধি সরমা ক্রমে নীর্ণা ও জীর্ণা হইয়া কালগ্রস্ত হইলেন।
মৃত্যুকালীন স্বর্ধ্যকুমারকে বলিলেন, “স্বর্ধ্যকুমার! ইহজন্মে তোমার সাহিত মিলন
আমার অসম্ভব! আমাকে পরজন্মে চরণে স্থান দিও। আমার মন তোমার—শরীর
পিতার”। সরমার অকালমৃত্যুর পর স্বর্ধ্যকুমার ইন্দুমতী ও কচুরায়ের নিকট বিদায়
লইয়া স্বরাষ্ট্রে গিয়া প্রজ্ঞানন্দন করিতে লাগিলেন। বরদাকর্ষ রায়গড়ে প্রত্যাগমন
করিয়া কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলে, রাজা রামচন্দ্র রায় কচুরায়ের অনুমতি লইয়া
অন্ধকূটীকে সনদ্বীপে লইয়া গিয়া উভয়ের বিবাহ দিলেন। দম্পতি পরম সুখে জীবন-
যাত্রা নির্বাহ করিয়া বৃদ্ধবয়সে পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিল। অন্ধকূটী
বরদাকর্ষের সহ মরণ করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, উভয়ে একত্র বসিলেই সরমার
নিষ্কল প্রেম ও স্বর্ধ্যকুমারের অকপট হৃদয়ের প্রশংসার সময় অতিবাহিত করিতেন।
সরমার মৃত্যুর তৃতীয় বৎসর পরে কমলাদেবীর বিশেষ অনুরোধে কচুরায় ইন্দুমতীর
পানিগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর রায়বংশ প্রায় নির্বংশ হয়। ইহাদিগের
বিবাহের পর কমলাদেবী বারণদ্বী বাস করেন ও যথাকালে শিবলোক লাভ করেন।
ইন্দুমতীর বিবাহের লগ্নে বরদাকর্ষের সহিত প্রভাবতার পরিণয় হয়। এই পরিণয়ের
কাল—শরশুণার বুস্কীবংশ এক্ষণে কালকবলিত। যাহার প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চ জগদ্বাণ-
কুস্কীর নাম রায়গড়ে বোম্বেনের ভদ্রাসনের নৈঋতকোণে ছিল, তাহাও এক্ষণে গভমধ্যে
পণিত।

পাঠক! জয়ন্তীর ইতিহাস ও ষ’দশভৌমিকের বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দেখ।

“সবিতা যত্রৈঃ পৃথিবীমহমাদেকান্তনে সবিতাদ্যামদৃহং

অশ্বমিব অধুক্ষন্ ধূমিমন্ত্রিকমতুর্থে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম্।

যত্র সমুদ্রঃ স্কজিতোবি ঔনদপাং নপাং সবিত উস্ত বেদ

অতো ভূরতঃ আঃউখিৎং রভো অতোদ্যাবা পৃথিবী অঃধেতাম্ ॥”

NOTES.

Extracts from A Chronicle of the Family of Raja Krishna chandra
of Navadvipa, Bengal, Edited and Translated by
W. Pertach, Berlin, 1852,

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ ।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

*

*

*

তদানীং বঙ্গাদিবিষয়েষু প্রতাপাদিত্যপ্রধানা স্বাক্ষরপ্রাপ্তানো নিবন্ধঃ পৃথিবীমুপ-
ভূজতে ন । তেহপি প্রতাপাদিত্যো মহাসত্যো বিজিতান্ধিযুগো যদ্বাধনসম্পন্নঃ ক্রিতিভল-
বিখ্যাত আসীৎ । ইত্ৰপ্রহরপুত্রেরোহপি করং গ্রহিকুং বহুসৈন্যভাতিশ্রু একাদশ-
বৃণতীন্ স্ববংশমানিনায় প্রতাপাদিত্যস্ত পুত্রঃপুত্রঃ প্রেষিতেষ্বপ্রহরপুত্রের বহুসৈন্যাসি
নির্জিত্য বিতৌরেষ্বপ্রহরপুত্রের ইব ররাজ । অশ্বিরেব সমরে জ'হাসীরনপরাধিকৃত-
মাতেন হুগলিসংহিত'মাতেন চ প্রতাপাদিত্যস্ত দৌর্জিত্যং বহুবিধং লিপিবারা ইত্ৰ-
প্রহরপুত্রেরং বিজ্ঞাপয়ামাস বধা—প্রতাপাদিত্যো বহুবলসম্পন্নঃ বস্ত হ্যসি হিপকাশং-
সহস্রচক্রিণঃ একপকাশংসহস্রংবিনঃ অশ্বরোহা অপি বহবঃ মন্তহস্তিনাং বহুবুধাঃ
সন্তি অস্তে চাসংখ্যা দুঃসরপ্রাসাদিহতাঃ এতর্জুনৈঃ স ক্ষুজানুপানু বাধতে । কিং
বহনা স্ববংশানপি প্রেরো নিঃশেষয়ামাস । তবংশে তদ্রিহতপিত্রাদিহজন একঃ শিশুঃ
পলায়নপরো ধাত্র্য কটীবনে রক্ষিতঃ অতস্তং কচুরায়নামানং কথয়ন্তি । কচুরায়ঃ
পায়সোকাশিত্রমবীতে দধানুর্নপলক্ষণশীলক প্রতাপাদিত্যস্তং হস্তমুদিলং বৃণয়তে ।
অশ্বানপি বাধিকুং প্রবর্ততে । অতো পলায়াদিপরিবারিতবহুসেনাপতিভিঃ সহ যদি
কশ্চিৎ প্রধানামাত্যঃ সমাগন্ততি তদা বয়ং তদনুচরীকৃত্য প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা প্রেষয়ি-
ষ্যাম ইত্যাদি । অনন্তরমিত্ৰপ্রহরপুত্রেরো লিখিঙঃ প্রতাপাদিত্যস্ত দৌর্জিত্যং সমধি-
গচ্ছন্ কচুরায়েরাপি ইত্ৰপ্রহরপুত্রের সাক্ষিণেব তদানীমেব তদৌর্জিত্যং গোচরীকৃতং ।
অথ ইত্ৰপ্রহরপুত্রেরো যোবাং প্রকুরিতাধরো বাবিশংখ্যো সেনাপতিভিঃ সহ মাল-
সিংহনামানং ককিৎপ্রধানামাত্যাদিদেশ বধা মালসিংহ তবানু মহতা সৈন্যেন
পরিবারিত্ত্ব প্রতাপাদিত্যং হুদ্রান্নানং বাচিতি বদ্ধামমানয়তু । ততো মালসিংহো মহা-
প্রসাদোৎসবং দেখতেত্যজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যবৃত্তো নির্জগাম নির্গতচ বজ্র বজ্রো-

তাঁহার পল্লেশ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অসহ্যপাল অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন দেখিলে এককালে আনন্দাক্রান্তে তাঁহার বক্ষোদেশে তানিয়া গেল। ঘন ঘন প্রত্যাবর্তী শিরোভ্রাণ ও ললাট চূষন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরস্পরের মিলনে সুখলাভ করিলে বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “বরদাকণ্ঠ! তুমি অশ্রুজ্ঞ বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া তোমার গনিতে লইয়া যাও, আমি একবার স্বর্ধাকুমারের যুদ্ধ দেখিয়া আসি। তাহার জন্ত আমার অত্যন্ত চিন্তা হইয়াছে।”

বরদাকণ্ঠ বলিল। “ইহাদিগের জন্ত আপনি তিলেক ভাবিবেন না। আপনি স্বর্ধাকুমারের নিকট যান।”

বর্ষাবৃত পুরুষ অন্তর্গেঁড়জ হইতে বাহির হইলেন। ঘরের বাহিরে আসিয়া একটা অশ্ব লইয়া দ্রুত আশ্রয়ভাগানের দিগে চলিলেন। দূর হইতে দেখেন, ফিরিঙ্গি সেনারা পলায়ন করিতেছে। রায়গড় ও বৈদ্যনাথের সেনা জয়ধ্বনি করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে। কিছু দূর যাইয়াই ফিরিঙ্গি সেনাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা ভীম বেগ সহ করিতে পারিল না। অধিকাংশ যমকবলে নিপতিত হইল। দুই চারিজন পলাইয়া গেল। আর প্রায় সাতজন প্রধান প্রধান সেনাপতি বন্দী হইল। দেখিতে দেখিতে বর্ষাবৃত পুরুষ স্বর্ধাকুমারের পার্শ্ব যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বর্ধাকুমার বলিলেন। “গেঁড়জের সমাচার কি?”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “দুর্গ আমাদিগের হইয়াছে, পাপেয়া পাহারন করিয়াছে। তোমারও জয় দেখিতে পাই। ভাল হইল। এখন সেনাদল শীঘ্র একত্র করিয়া রায়গড়ে যাওয়া কর্তব্য। আমার মূল কর্তব্য এখনও হইল না।”

স্বর্ধাকুমার বলিলেন। “ইন্দুমতীলাভই আমার মূল উদ্দেশ্য। আহা, তাহা যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আর আমাদিগের এখানে থাকার প্রয়োজন নাই।”

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “এক্ষণে সকল সেনা একত্র কর। আর জাহাজ ও নৌকা হইতে সকল নিশান আনিতে বল। প্রত্যুবেই আমরা আমাদিগের সেনা লইয়া যাত্রা করিব।

স্বর্ধাকুমার আপন তুরী লইয়া বাজাইলেন। অমনি সেনারা জাগ্রত হইল। পরে একে একে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা মাঠে দাঁড়াইল। চক্ষের কিরণে কি অমির্কচনীয় শোভিল। সেনারা একত্র হইয়া দাঁড়াইলে স্বর্ধাকুমার তাহাদিগকে ভিন ভাগে বিভক্ত হইতে অনুমতি দিলেন। অমনি তাহারা দুই পার্শ্ব হইতে হটিয়া গিয়া দুই দিকে দ্রুত পক্ষে দাঁড়াইল।

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন। “কাহাকে গেঁড়জ হইতে সেনাদলকে এখানে আনিতে বল।”

স্বর্ঘ্যকুমার একজনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলে সে দ্রুত আজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল।

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন, “এখন আর সকল সেনা একত্র করা উচিত নহে। রায়গড়ের সেনা ও মহারাজ মানসিংহের সেনারা ভিন্ন ভিন্ন হউক, বৈদ্যনাথের সেনারা একদল হইয়া যশস্বতীতে দাঁড়াক।”

স্বর্ঘ্যকুমারের অনুমতিমাত্র সেনারা পৃথক হইতে লাগিল; ক্রমে মঠের তিন অংশে তিন থাক সেনা দাঁড়াইল।

বর্ষাবৃত পুরুষ বলিলেন, “ঐ পেড়িঙ্গ হইতে অপর সেনারা আসিতেছে, তাহাদিগকে আপন আপন দলে মিশিতে আজ্ঞা দাও।”

স্বর্ঘ্যকুমার সেই মত আজ্ঞা দিলে তাহারা যে বাহার দলভুক্ত হইল। স্বর্ঘ্যকুমার সেনাশ্রেণী ত্যাগ করিয়া বর্ষাবৃতপুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মালিকরাজ ও বরভট্ট সেইখানে দাঁড়াইল। পরে নসীরাম আসিলে সেও অন্তরে দাঁড়াইল। শকর প্রভৃতি অষ্টাশ্র রায়গড়ের লোক যে বাহার পদে থাকিয়া সেনামধ্যে গণ্য হইল। ওদিকে বৈদ্যনাথের সৈন্যভাগপু ও অষ্টাশ্র লোকেরা বৈদ্যনাথের সেনামালায় দাঁড়াইল। বর্ষাবৃতপুরুষের অনুমতিতে মহারাজ মানসিংহের সেনানীরা আপন আপন স্থানে দাঁড়াইল। কিছু পরেই লোকেরা মহারাজ মানসিংহের সেনাদিগের পতাকা লইয়া উত্তীর্ণ করিল। আপন আপন পতাকা ভিন্ন পদ্ধতিবিশিষ্ট সেনা ও সেনাপতিরা বাহিয়া লইল। পরে বর্ষাবৃতপুরুষ সকল সেনাকে আপন আপন বাহ্য বাজাইতে অনুমতি দিলেন। জয়বাহ্য বাজিতে লাগিল। বাহ্যোদ্যমে সনদ্বীপ পুরিল।

ক্রমে অরুণোদয় হইলে গ্রামস্থ লোকেরা দেখা দিল। তাহারা সমস্ত রাজি ভোপদ্বনিতে ভ্রম পাইয়া আপন আপন ঘরে লুকাইয়াছিল। স্বর্ঘ্যকুমারমাজে দূর হইতে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে বাহ্যদ্বনিতে মোহিত হইয়া ক্রমে অগ্রসর হইল। বন্ধী, ফিরিঙ্গিদিগকে লোহের পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পিঞ্জর বসান হইল। পরে বর্ষাবৃতপুরুষ সেনাদিগকে সমুদ্রতীরে বাইতে আদেশিলেন। সেনা-স্রোত তালে তালে সমুদ্রদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তীরে উপস্থিত হইলে রায়গড়ের সেনাদিগকে আপন আপন অস্ত্র, ভোপ প্রভৃতি লইয়া নৌকারোহণ করিতে আদেশিলেন। তাহারা ভোপ খুলিতে লাগিল। তাহার পর দিল্লীরবরের সেনাপতি কুতুব-উদ্দিনকে ডাকাইয়া বলিলেন, “তুমি সহস্র অঝোরোহী ও পাঁচ শত পদাতি ও চারি ভোপ লইয়া সনদ্বীপে থাক। পরে আমি বজ্রকজ বাইয়া যেমত সমাচার পাঠাইব, সেই মত করিও। বাকী সেনাদিগকে অদ্বাই বাইতে বল।” সেনাপতি অনুমতি পাইয়া সেইরূপ

বাস তদ্যাক্ষাৎ লোকাঃ পলায়াক্ষিরে রাজানন্ত প্রায়ো ন সাক্ষাৎকৃতঃ । অথ কতি-
 পরদিনমভ্যন্তরং চাপত্যগ্রামসমীপবর্তিনীভ্যন্তে তৎ সৈন্তং সমাগম্য । তৎসমীপ-
 রাজানঃ সপরিবারান্তরাতিরোহিতা বহুগুঃ তদানন্দমজমুদারন্ত মহাদাহসিক এক এব
 সাক্ষাৎস্মৃতিস্মৃতিশিবেদনাদিপুত্রঃসহঃ করবিনিহিত হৈমব্রাহ্মণিকং সাক্ষাৎকারয়ন্ত
 সংকৃত্য মানসিংহং বহুপরিভোষয়ামাস । জগাব চ । প্রত্যো মহাবলপরাক্রম ! তবতা-
 মানসেনৈবতদেদীয়াঃ সকলরাজানঃ পলায়িতা অহমেবঃ কতিপরগ্রামাধিপো বর্ধাব-
 নেভ্যন্তরং ভবন্তং নিরীক্ষিতুমিহাসং মহানীর্কানকেন যদি কিঞ্চিৎকার্যমভি তদাত্ম-
 পয়েতি । তদা মানসিংহো মজমুদারমুবাচ । তো মজমুদার নদীমুত্তরিত্বং সমুচিতো-
 বোগঃ ক্রিয়তাং বধাত্মধেন সৈনিকঃ পারং বাতি । মজমুদারঃ পুনরাহ । প্রত্যো
 বদ্যপ্যহমপরিবারস্তথাপি ভবনাজয়া সর্বং নিম্পাদয়িষ্যামিতি । ততো বহুবিক্রমোকা-
 বাহকাদিসমবধানেন করিত্তুরগাদিসমাতুলং তৎসৈন্তং সুখেদনোত্তরয়ামাস । অনন্তরং
 মানসিংহোহপি প্রাপ্তনদীপারোমমজমুদারং প্রশংসয় । অথ প্রাপ্তনদীপারে সপরিবারে
 তস্মিন্ নিরন্তরপতনমুদ্রাসিক্তধরশীমন্তলপ্রবলভরবাংকানিসংমর্দিতদগন্তগালভিরো-
 হিতদিনকরভাগবতয়া দিননিশাংশেবোপলভিত্যহিতং হৃদিনং সপ্তাহান্তিঃ এবর্বত স
 কুত্রাপি গন্তবসনর্থং সমস্তসৈন্তং চ চিত্তব্যগ্রং বভূব । তত চ নাতিপূর্বং মজমুদা-
 রোহপি লক্ষীপ্রতিময়া সহ পৌবিন্দপ্রতিময়া বিবাহমহোৎসবং কারয়িত্বং বহুবিধ-
 তক্যজ্ঞবাদিসমুপচিতং মহাসভারমাসাদিতবান্ তাদৃশমহাঃসিনয়ে চ তদ্বিবাহত
 শান্ততোৎকর্ষভ্যন্তর্য ততো নিবৃত্তমনাভেন সভারোণ তদানীং ক্রৌড়কৃত্যজ্ঞব্য-
 দিনা চ করিত্তুরগপাদতেনোপভিবন্ধিমাগধপ্রভৃতীনাং মানসিংহন্ত চ বখোচিতাহার-
 জ্ঞানেনে পরমকৃপিতকরমাতিব্যং সম্পাদয়ামাস । সপরিবারোমানসিংহস্তাদৃশহৃদিনমপি
 সুখেদনবাতিবাহয়ামাস । ততঃ সপ্তাহানন্তরং হৃদিনাবসানতয়া একাশিতদিত্তমন্তলে
 পরমতেষপরাঃ পুনর্দ্বিজমুদারমুবাচ । তো মজমুদার ইত্যপ্রতাপাদিত্যনগরং ক্রিয়তা
 দিনেন গন্তং শক্যতে কস্মিন্ দিনে বা কুত্র সেনানিবেশঃ কর্তব্য ইতি নিবিত্বা দেহি ।
 ক্ষুদ্রা চ মজমুদারঃ সবিবেশং সর্বং নিবিত্বা সমর্পয়ামাস মানসিংহোহপি বহতিঃ সাধু-
 বনৈশ্বজমুদারং সংকৃত্য সপ্রদানমাহ । তো মজমুদার মহামতে । ময়া প্রতাপাদিত্যং
 সপরিবারং বিনিক্কিত্য পুনরাগমনসময়ে তবতাভিলষিতং বস্তব্যং ক্ষুদ্রা তৎ সর্বমবস্ত্রং
 কর্তব্যং স্বমপি ময়া সার্ভং প্রতাপাদিত্যপুত্রমগচ্ছ । ইত্যুক্ত্য বিস্রাম । ততঃ কতিপয়ৈর্দি-
 বনৈশ্বানসিংহো বহুবলপদ্বিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যনগরং পরিপ্রাপ্তঃ । অনন্তরং চরপ্রমুখাৎ
 বিদিতমানসিংহানগরনব্রতাত্য বিরচিতচুর্ভেদ্যেহুর্গান্তরবিত্তন্তসেনাসমুদারোহনবগিতমানসিংহ
 সৈন্তপ্রকিণ্ডিতশত্রুপ্রহারো মানসিংহসৈন্তং বহতিঃ শত্রুট্টেদ্বীপকানংসহস্রচন্দ্রিত্তিরেকপক-
 শংসহস্রাধিত্তিরহাবলৈরগারতে চ পরিকৃত্য বহলজ্যোতকার । এতৎ সর্বং ক্ষুদ্রা সিংহঃ

সক্ৰোধঃ সেনাপতীনাং । তো সেনাপতয়ঃ শীত্রং বহুভিবিলৈর্মিনিত্বা দুর্গং ভেদয়ত নোচে-
 ত্ববতঃ সমুচিতং দণ্ডং বিধাতামি । ইতাক্তা সর্কানেকদা দুর্গভেদেন নিয়োজয়ামাস তে চ
 মানসিংহাজ্ঞাধিপপরাক্রমা ইব ক্রোধকষায়িতনেত্রাতা যুগপৎ কৃতবহসংগ্রাহরা
 দুর্গং নির্ভেকরামাসুঃ । অথ বিনষ্টদুর্গপ্রতাপাদিত্যসৈন্ত্য মানসিংহসৈন্যং চ পরস্পরপ্রাপ্ত-
 সমক্ষং বহুধা বহু দিবসং যুদ্ধপরায়ণং বভূব উভয়সৈন্তমেব কিয়ং কিয়ং ননাশ । অথ
 প্রতাপাদিত্যবলং স্বজ্ঞাবশিষ্টতুরগসমাকীর্ণমবলোক্য মজমুদারেন সহ-মস্ত্রমিত্তা মানসিংহে ।
 বহুবিধবহুকারিতুরগগণঅকীর্ণ একদৈব সহস্রসহস্রতুরগাদিতিক্রপেতঃ প্রতাপাদিত্যসৈন্যং
 পরিপ্রাপ্তঃ কপেন তহপমর্দ্য প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা লৌহময়পিঞ্জরে নিকিপ্য পুনরিত্তপ্রস্থং
 অবনাদিপং নিবেদিতুং চলিতঃ । অথ কিয়তাকালেন চাপত্যাগ্রামমাগত্য পুরোহবস্থিতং
 মজমুদারমুবাচ । তো মজমুদার ভবতো ব্যাপারেষামিহ সংগ্রামে মহান্ সন্তোষো বৃদ্ধঃ
 অধিরাসপ্তাহ হৃদিনে চ মম সৈন্তস্ত প্রাণরক্ষা কৃত্য । অতস্তব সমীহিতং ক্রহি ময়া তদ-
 বস্ত্রং কর্তব্যং । ইত্যেবং সমাদিত্যো মজমুদারো ত্রটনারায়ণস্ত আদিমুদনগরগমনবংশ-
 পরস্পরারাজ্যশাসনকামীনাথরায়পরায়নঅবনাদিপকর্তৃকতদ্বিধাধিকং সর্কং কথয়ামাস
 বাণেশানাথ্য প্রভৃতিচতুর্দশপ্রদেশরাজ্যার্থং স্বাভিলাষং চোদ্যটয়ামাস । এতৎ সর্কং
 সমাকর্ষ্য মরৈতদবস্ত্রং কর্তব্যমিতুদীর্ঘ মজমুদারেন সহ ইন্দ্রপ্রস্থাদিপং অবনবরং জষ্টুং
 চলিতঃ । অথ বুদ্ধস্ত পথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্ত বারানস্তাং পঞ্চতুমভবৎ । অনন্তরং
 মানসিংহ ইন্দ্রপ্রস্থং গতা তত্র অবনাদিপং সর্কং জয়বৃদ্ধাতং বিজ্ঞাপয়ামাস মজমুদারস্ত
 মহাশুদ্ধিনসপ্তাহে সমস্তসৈন্তস্ফাতিখ্য প্রতাপাদিত্যজয়ে সহকারিত্বং বিস্তরেণ অবনাদিপং
 প্রাণয়ামাস । অত্যা চ অবনাদিপঃ পূর্ষপরিচিৎ ৫৫ প্রতাপাদিত্যদ্যাদিঃ বচুরায়নামনিং
 মশোহস্ত্রেশরাজ্যং শাসিতুমাজ্ঞাপয়ামাস বশোহরাজ্যমিতি নামরূপপ্রসাদকং চ লগৌ ।

ইতি ক্রিডীশবংশাবলীচরিতে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

Extracts from Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I.—History, Literature, &c, No. III.—1874. DR. JAMES WISE'S BARAH BHUYAS OF EASTERN BENGAL.

The history of Bengal furnishes little information regarding the seventeen years that elapsed from the death of Dāūd Shāh in 1576 to the final conquests of Raja Man Sing in 1593. The great military revolt, and the stubborn resistance of the Afgans, sadly tried the stability of the newly established empire, and it was only after repeated defects that the power of the malcontents was broken, and the villages of Bengal were relieved from the requisitions of the rival armies. In eastern and southern Bengal the contest was most prolonged, and amid the swamps and rivers the Mogul troops were harassed by an enemy who selected his own time and place for fighting, but who generally retreated carrying with him all the boats on the rivers. But besides these advantages the rebels were assisted by many of the great landholders of the country and by their troops, who were inured to the country and accustomed to overcome the physical difficulties which threw so many obstacles in the way of the invaders.

Among the vague traditions lingering in Bengal is one, that at the period mentioned the whole of the country was ruled by twelve great princes, and hence Bengal is often spoken of by Hindus as the "Barah Bhuya Mulk."

*

*

*

The five Bhuyas, whose history is now to be narrated, are—

1. Fazl Ghazi of Bhowal.
2. Chand Rai and Kedar Rai of Bakrampur.
3. Lak'han Manik of Bhaluah.
4. Kandarpa Narayana Rai of Chandradip.
5. I'sa Khan, Masnad i' Ali of Khizrpur.

Of the remaining seven Bhuyas, Raja Pratapaditya of Jessore was one, and perhaps Mukund Rai of Bosnah was another.

IV. Kandarpa Narayan Rai of Chandradip.

It is currently believed that the sons of the five Kayasthas who accompanied the five Brahmans from Kanauj in the reign of Ballal Sen, settled in Bakla-Chandradip, a parganah which included the whole of the modern zil'ah of Baqirganj with the exception of Mahall Salimabad. The first of the Chandradip family was Danuj mardan De. He is styled by the Ghataks as Raja, and he was the first Samaj-pati or president of the Bangaja Kayasthas. He lived,

according to the pedigree, in the fourteenth century. The Ghataks enumerate seventeen Rajas of Chandradip up to the present day, while they name twenty-three generations since the immigration of the Kayasthas from Kanuj.

It is not improbable that the founder of the family is the same person as the Rai of Sunargon, by name Danuj Rai, who met the Emperor Balban on his march against Sultan Muhiisuddin in the year 1280. It is not likely that the Muhammadan usurper would have allowed a Hindu to remain in independence at his capital Sunargaon. If the principality of Chandradip extended to the river Megna, the agreement made with Emperor that he would guard against the escape of Tughril to the west, becomes intelligible.

The chief event, however of his rule was the organisation of the Bangaja Kayasthas. He appointed certain Brahmans, whose descendants still reside at Edilpore (Adilpore), to be Ghataks or Kul-Acharyas of the Kayasthas, and he directed that all marriages should be arranged by them, and that they should be responsible that the Kulin Kayasthas only intermarried with families of equal rank. He also appointed a Swarna-mata, or master of the ceremonies, who fixed the precedence of each member of the Sabha, or assembly, and who pointed out the proper seat each individual was to occupy at the feasts given by the Raja. These offices still exist, and the holders of them are much respected by all the Kayasthas.

Jay Deb Rai, the fourth in descent, died childless. His heir, a sister's son, was Paramanand Rai of the Basu family of Dihurghati in Chandradip, who traced their pedigree to Dasarath Vasu, one of the original Kanauj Kayasthas. He and his successors were acknowledged as the samaj-pati of the Kayasthas of southern and eastern Bengal. This Paramanand Rai is mentioned in the Ain-i-Akbari by Abulfazl as the son of the Zamindar of Bakla, and his almost miraculous escape during the cyclone of 1583 is described.

The grandson of Paramanand Rai was Kandarpa Narayana Rai, one of the five Bhuyas, whose history is now being detailed. It is of him that Ralph Fitch writes in 1586—"From Chatigam, in Bengal, I came to Bacola "(Bakla) the king whereof is a Gentile, a man very well disposed, and delighteth much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses be very fair and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste. The women wear great store of silver hoops about their

necks and arms and their legs are ringed about with silver and copper, and rings made of elephants' teeth."

The only memorial of this Bhuya is a brass gun, still preserved at Chandradip, with his name and that of the maker Rupiya Khan of Sripur engraved on the breech. This gun is $7\frac{1}{2}$ feet in girth at the breech ; and $19\frac{1}{2}$ inches at the muzzle. Through the trunnions, rings had been inserted by which the gun was fastened to the carriage.

The residence of the Rajas of Chandradip was at Kachua, close to the modern station of Baqirganj ; but during the lifetime of Kandarpa Rai, or immediately afterwards, they were obliged to move further inland to a place called Madhavapasha, where the Raja's have resided ever since. This removal was necessitated by frequent forays made by the Mags and Portuguese of Chittagong, against whom the Rajas were unable to contend.

The ruins of temples and dwelling houses are still to be seen at Kachua, but the majority of the Kayasthas followed their chief to the newly selected town.

Ramchandra Rai succeeded on the death of his father Kandarpa Rai. Of him many stories are still extant. He married a daughter of Rajah Pratapaditya of Jessore. Between the families of Jessore and Chandradip there were many ties of friendship, and the marriage was celebrated with great pomp, but ended in a permanent quarrel between the families. Ramchandra, against the advice of all his friends, insisted on taking with him a famous jester, named Ramai Bir, who amused him by his wit and frolics. On the marriage day, this jester, dressed in female garments, entered the house occupied by the Rani, and conversed with her. His disguise was complete, and she did not detect the imposture. Shortly afterwards, it was discovered, and Raja Pratapaditya was so enraged, that he vowed he would put his newly-made son-in-law to death. The bride, however, warned her husband, and at night he escaped from the place and reached the encampment where his followers were. The rivers had all been obstructed, but accompanied by a trusty servant, Ram mohan Mal, famous for his strength, he embarked in a small canoe and fled. At the places where the obstructions were, Ram mohan dragged the boat over the bank, and launched it on the other side. In this way the Raja escaped and reached Chandradip in safety.

It was not until after the lapse of many years, and probably not until the death of Pratapaditya [in 1598] that the bride joined her

husband. At the place where she halted, until permission was obtained from her husband to proceed, a market was established, which is still called the "Badhu Thakurain Hat."

Extracts from Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I History, Literature, & No II.—1875. DR. JAMES WISE'S BARAH BHUYAS OF EASTERN BENGAL.

* * * *

Jarric, who derived his information from the Jesuit fathers, sent to Bengal in 1599 by the Archbishop of Goa, mentions that the "prefects" of the twelve kingdoms governed by the king of the Pathans, united their forces, drove out the Mughuls.

D'Avity copies this description of Bengal, but gives a few additional particulars of these twelve sovereigns, as he calls them. The most powerful, he informs us, were those of "Siripur et Chandekan, mais le Masandolin on Maasudalin," is the chief. This is evidently the primitive way of spelling Masnad i-'Ali, the title of Isa Khan of Khizrpur.

One of the earliest travellers and writers on Bengal was Sebastien Manrique, a Spanish monk of the order of St. Augustin, who resided in India from 1628 to 1641. On his return he published his Itinerary, in which he states that the kingdoms of Bengal are divided into twelve provinces, to wit, "Bengal, Angelim, Ourixa, Jagarnatte, Chandekan, Medinipur, Catrabo, Bacala, Solimanvas, Bulua, Dacca, Ragamol." The king of Bengal, he goes on to say, resided at Gaur. He maintained as vassals twelve chiefs in as many districts.

* * *

Finally, Purchas describing Sondip in 1602 gives us some insight into the civil war then waging between different nations at the mouths of the Megna. When Bengal was conquered by the Mughuls, they took possession of the island, but Cadaragi [Kedar Rai of Sripur] still claimed it as his rightful property. The Portuguese captured it; but this roused the anger of king of Arrakan, who sent a fleet to drive the Portuguese out, "and Cadaray (Kedar Rai), which they say was true Lord of it," sent one hundred Cossi (kosahs) from Sripur to help him. The combined fleets were defeated, and the Portuguese entered into a treaty with Kedar Rai. Carnatus, the leader of the Portuguese, took his disabled vessels to Sripur to refit them. There he was attacked by one hundred kosahs under command of Mandaray, a man famous in those parts. The Mughul fleet was defeated and its admiral Mandaray killed.

These authorities advance our knowledge considerably. The Bhuyas, according to them, had been dependants of the king of Gaur, but had acquired independence by force of arms. They refused to pay tribute, or to acknowledge allegiance to any one. From being prefects appointed by the king, they had become kings, with armies and fleets at their command, ever ready to wage war against each other or to oppose the invasion of Portuguese pirates and Mag free-booters.

Extracts from journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I History, Literature, &c. No II 1876 H. BEVERIDGE, Were the Sundarbans inhabited in ancient times ?

*

*

*

*

Sondip itself was, it is true, cultivated in Caesar Frederick's time (1569), but so it is now, and there is no reason to suppose that its civilization was greater then than it is at present. It may have, but then it certainly had, some thirty or forty years later, one or two Forts, which were marks of insecurity rather than of prosperity, and which do not exist now, simply because the Aracanese and the Portuguese pirates are no longer formidable. Rolph Fitch visited Bacola in 1586, and describes the country as being very great and fruitful. He does not, however, expressly say that Bacola was a city, and it is possible that the people lived then as now in detached houses, and did not lodge together in any great town or mart. But even if we take the words "the houses be very fair and high builded, the streets large" (a most unlikely thing in any oriental city (to mean that there was a city of Bacola and give full credence to Fitch's statements, the next clause of the description, viz., "The people naked, except a little cloth about their waist" does not suggest the existence of much civilization or refinement.

Moreover, there is nothing to show that Bacola was in what are now known as the sundarbans. It probably was the same as Kochua which, according to tradition, was the old seat of the Chandradip Rajas. But Kochua is at this day one of the most fertile and best cultivated parts of Bakirganj and is the only place in the south of the district which contains a large Hindu population. No doubt there has been a great amount of diluviation near Kochua, and the river between the mainland and Dakhin Shahbazpur has become much wider than it was in old times. In this way the old city of Bakla and

much of its territory may have disappeared, and to this extent there probably has been a decay of civilization, but this is a different thing from the supposition that the tract now existing as forest was formerly inhabited by a civilized people. It seems to me also that Fitch cannot have been a very observant traveller, as otherwise he would have noticed the terrible storm which overwhelmed Bakla only a year or two before his visit, and that therefore we should not press his statement too far. Possibly all physical traces of the storm had disappeared, but surely people must still have been telling of it, and Fitch must have heard of it if he stayed at Bakla any time or had any intercourse with the inhabitants.

* * * *

Fonseca's letter is most interesting. He describes how he came to Bacola, and how well the king received him, and how he gave him letters patent, authorising him to establish churches, &c., throughout his dominions. He says that the king of Bakla was not above eight years of age, but that he had a discretion surpassing his years. The king "after compliments asked me where I was bound for, and I replied that I was going to the king of Ciandecan, *who is to be father in law of your Highness*. These last words seem to me to be very important, for the king of Ciandecan was, as I shall afterwards show, no other than the famous Pratapaditya of Jessore, and therefore this boy-king of Bakla must have been Ramchandra Rai who we know married Pratapaditya's daughter. * * *

Now though the good father evidently had an eye for natural scenery and was delighted with the woods and rivers, it is evident that what he admired so much must have appeared to many to be "horrid jungle", and was very like what the Sunderbans now are. In fact, a great part of this description of the route from Bakla to Ciandecan is still applicable to the journey from Barisal to Kaliganj, near which Pratapaditya's capital was situated.

The fair prospects of the mission as described by Fernandez and Fonseca were soon overclouded. Fernandez died in November 1602 in prison at Chittagong, after he had been shamefully ill-used and deprived of the sight of an eye; the king of Ciandecan proved a traitor and killed Carvalho the Portuguese Commander, and drove out the Jesuit priests. Leaving these matters, however, for the present, let us first answer the question, Where was Ciandecan? I reply that it is identical with Pratapaditya's capital of Dhumghat and that it was situated in the 24-Parganahs and near the

~~CHAND KHAN~~

modern Kaligunj. My reasons for this view are first that Chandecan or Ciandecan is evidently the same as Chand Khan, and we know from the history of Raja Pratapaditya by Ram Ram Bosu (modernised by Harish Tarkalankar) that this was the old name of the property in the Sundarbans, which Pratapaditya's father Vikramaditya got from king Daud. Chand Khan, we are told, had died without heirs, and so Vikramaditya got the property.

But besides this, Du Jarric tells us that after Fernandez had been killed at Chittagong in 1602, the Jesuit priests went to Sondip, but they soon left it and went with Carvalho the Portuguese Commander to Ciandecan. The king of Ciandecan promised to befriend them, but in fact he was determined to kill Carvalho, and thereby make friends with the king of Arakan, who was then very powerful, and had already taken possession of the kingdom of Bakla. The king therefore sent for Carvalho to "*Yasor*," and there had him murdered. The news reached Ciandecan, says Du Jarric, at midnight, and this perhaps may give us some idea of the distance of the two places.

I do not think that I need add anything to these remarks except that I had omitted to mention that Fernandez visited Ciandecan in October, 1599, and got letters patent from the king. As an additional precaution, Fernandez obtained permission from the king to have these letters also signed by the king's son, who was then a boy of twelve years age. The boy may have been Udayaditya, and as he must have been only three or four years older than Ramchandra Rai of Bakla.

Extract from the Proceeding of the Asiatic Society for December 1868. H. J. Rainey on Sunderban.

In the reign of Akbar, (16th century) "Maharajah Pratapaditya" established a magnificent city (founded by his father and uncle, Maharajah Bikramaditya and Raja Bosontori respectively) in the grant of one Chand Khan, (who dying without heirs, his property was escheated by the paramount power, Nawab Daud, and transferred to the said Maharajah and Rajah,) in what may now be considered the 24-Parganah portion of the Sundarban, then appertaining to Jessore. This Maharajah Pratapaditya became so powerful as to exercise sway over all the Rajhas of Bengal, Behar and Orissa, including even Assam. His great successes induced him to refuse to pay his tribute, and to throw off his allegiance to the Great Mogul. For many years, he succeeded in defeating the armies sent against him. The

first general sent was Abrai Khan, whose army was nearly annihilated near the fort of Mutlar (Mutlah, now Port Canning). Twenty five other generals are stated to have been delcated in succession. Finally the Maharajah Pratapaditya surrendered himself a prisoner, and was sent to Delhi in an iron cage. He died at Benares on the way.

The author shews that at the time of Pratapaditya, though parts of the Sundarban were populated, a great portion was still wild and uncultivated, and thinks the vast progress in improvement was owing to the great exertions of these princes, and that the impetus given by them, gave way with the imprisonment and death of the Maharajah. Subsequently only the very best and most favorably placed portions of the district were cultivated. In addition the place was exposed to predatory incursions of practical Mugs, and even of Portuguese buccaners,—quite sufficient to scare away a timid and probably disunited population.

There remain yet to be considered the effect of a cyclone and its storm waves. This occured in Calcutta in 17, when a wave 4 feet higher than usual came up. Such would have been sufficient to produce an almost total loss of life in the Sundarban, and its consequent abandonment.

The author thinks the true name of Sundarban, or beautiful forest, as preferable to Sundriban Soondree forest, or Sundar band, beautiful band or embankment, or Somudra ban, the Sea Forest. He thinks the name is of recent origin as applied to the entire district. A record exists of many well-known places described as belonging to zemindarees.

The author concludes by briefly summing up his views, and stating that the country suffered severely from the attacks of Mug pirates and the Portugese who finally effected a looting in the country, and that a terrific gale or Cyclone, probably that in A. D. 1707, accompanied by a storm-wave passed over that tract of country on the sea-board, now known as the Sundarban, resulting in the most awful destruction of lives, and devastation of properties, which caused the few remaining survivors to totally abandon the place, and move northwards, where finding sufficient surplus land for their habitation and cultivation, they never returned to the south—

The President then invited discussion on the paper.

The Rev J. Long stated that when in Paris in 1848, Monsieur [illegible], the head of the Geographical Department of the Bibliothé

